সেই সব মাটি সেই সব মানুষ

প্রাপ্তিস্থান

প্রভা প্রকাশনী

আবাহনী
১১, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা—৯

সৃষ্টির চালচিত্র

কন্যাপ্রতিম রোমি সাহা আমার সৃষ্টিকর্মের ভাণ্ডারী। শিক্ষিতা, সুলেখিকা, সম্ভ্রান্ত এই কন্যাটির সুগৃহিণীপনায় আমি মাঝে মাঝে বিস্মিত না হয়ে পারি না। বহু জায়গায় ছড়িয়ে থাকা আমার বিশেষ এক শ্রেণীর লেখাকে সংগ্রহ করে এনে ও একই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছে। ওর মনে হয়েছে এই লেখাগুলির ভেতর রয়েছে অন্য এক ভুবনের স্বাদ।

আমার ভ্রাম্যমান জীবনের গভীর অনুসন্ধিৎসার ফসল এগুলি। রোমান্টিক এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবার পর এই উপন্যাস-সংকলনটি পাঠকের ভাবনায় অন্য এক হাওয়ার প্রবাহ এনে দেবে বলে আমি মনে করি।

প্রতিবারের মতো রোমি আমার এই কাহিনীগুলির পশ্চাদপট সম্বন্ধে জেনে নিয়ে স্মৃতি থেকে সাজিয়ে লিখে দিয়েছে। গভীর স্নেহের সম্পর্ক তার সঙ্গে তাই ধন্যবাদের প্রশ্ন অবান্তর।

বনবাবু

বনবাবু চলে গেলেন। চোখে যাঁর আমি দেখেছি অরণ্যের ছবি। আজ চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে তিনি কী তারই স্বপ্ন দেখে চলেছেন?

অরণ্যের প্রেমে মগ্ন হয়ে সেই সুদর্শন মানুষটি বুঝি সংসারের বাঁধনে ধরা দিতে পারলেন না। অন্তরের আনন্দকে খুঁজে পেলেন না কোন মানুষীর প্রেমমুগ্ধ আলিঙ্গনে।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর শেষ শয্যার চারদিকে। আগেই গত হয়েছিলেন মা-বাবা, ভাই-বোন বলতে কেউ ছিল না তাঁর।

একদিন বলেছিলেন, আমি দস্যু রত্নাকরের মতো খুন করে বিত্তের পাহাড় জমিয়েছি কিন্তু ভোগ করার কেউ নেই। ভোজনে, পরিধানে আমি নিজেও নিরাসক্ত।

উত্তরে বলেছিলাম, রত্নাকর দস্যুকে আমি দেখিনি কিন্তু দেখেছি কবি বাল্মীকিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই দুটি চোখের দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসার চিহ্ন এঁকে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন 'বনবাবু'।

আমি বলেছিলাম, আপনি যখন বনের ইজারাদার হয়ে, গাছগুলোকে খুন করে অর্থ উপার্জন করতেন তখন আমি আপনাকে চিনতাম না। কিন্তু যেদিন আপনার সঙ্গে পরিচয় হল সেদিন আপনাকে অরণ্যের মহাকবি বাল্মীকিরূপেই দেখেছিলাম।

আমার কথা শুনে হেসেছিলেন উনি। উচ্চগ্রামে নয়, মুখের প্রসন্ন, প্রহৃষ্ট রেখায় ফুটে উঠেছিল সে হাসির দ্যুতি।

বলেছিলেন, অনেক খুঁজেছি, কিন্তু আমার মনের কথা শোনার মতো মানুষ এতদিনে খুঁজে পেলাম।

এবার ছিল আমার হাসির পালা, কিন্তু হাসতে পারিনি। ওঁর বলার অকৃত্রিম গভীরতা স্তব্ধ করে দিয়েছিল আমার হাসিকে।

ওঁর প্রাণশূন্য দেহটাকে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে। ইলেকট্রিক চুল্লি নয়, কাঠের আগুনেই যেন তাঁকে দাহ করা হয়, এই ছিল তাঁর অন্তিম ইচ্ছা।

মনে হয়, বনের গাছ নির্বিচারে কেটে যে পাপ তিনি করেছিলেন, তারই প্রায়শ্চিত্ত তিনি করতে চেয়েছিলেন কাঠের আগুনে দগ্ধ হয়ে।

তাঁর আরও একটি নির্দেশ ছিল, দেহান্তের পর তাঁর শবদেহকে যেন বাজারের কেনা ফুলে সাজানো না হয়। মানুষ ফুল তুলতে জানেনা, গাছকে কষ্ট দিয়ে, যেমন তেমন করে ফুল ছিঁড়ে আনে। গাছের কাছে নত হয়ে ফুল প্রার্থনা করতে হয়।

তাঁর ছোট্ট বাগানে হরেক রকম ফুলের গাছ ছিল। তখন শরতের সোনালী রোদ্দুর আর শির শিরে হাওয়ার ছোঁয়া লেগে শিউলি তলায় ঝরে পড়েছিল অজস্র সাদা ফুল। প্রকৃতির অযাচিত দানে গাঁথা হয়েছিল তাঁর শেষযাত্রার মালা।

আজ কোথাও আর বনবাবুর কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু আমার সংবেদনশীল মনে তাঁর নিত্য যাওয়া আসা।

তাঁর মুখে শোনা বিচিত্র অরণ্য-কাহিনী নিয়েই আমার এই ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস।

*

কালের রাখাল

তুষার শৃঙ্গের শোভা দেখতে দেখতে, বন পাহাড় আর ঝরনার গান শুনতে শুনতে আমি একসময় বিভিন্ন ঋতুতে ঘুরে বেড়িয়েছি কুলুর সীমাহীন সৌন্দর্যলোকে। নিশি পাওয়ার মতো বাক্যহীন বিস্ময়ে ঘুরেছি পাহাড়ী পথে চির-পাইন অরণ্যের আলো-আঁধারি ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রধানতঃ খেলা করে কুলু, কাংড়ার পাহাড়, উপত্যকা আর বনবনান্তে। শরৎ, হেমন্ত আর বসন্ত ওরই মাঝে ক্ষণিক দেখা দিয়ে যায় ঋতু রঙ্গমঞ্চে।

গ্রীষ্ম (তউন্দি)—মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন।
বর্ষা (বরসাৎ)—জুলাই-অগাস্ট-সেপ্টেম্বর।
শীত (হাইউন্দ্)—অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি।

আমি কুলুর পাহাড় থেকে পাইন অরণ্যে যেদিন মেষচারক গদ্দীদের ভেড়ার পাল নিয়ে নেমে আসতে দেখি, সেদিন মনে হয়েছিল তরঙ্গিত একটা ঝরনা যেন সাদা ফেনার ফুল ছড়াতে ছড়াতে এঁকে বেঁকে উপত্যকায় নেমে আসছে।

সেই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য আজও আমি আমার নির্জন অবসরে দেখতে পাই। ওদের বিচিত্র জীবনযাত্রার কথা জানার প্রবল আগ্রহে আমি কয়েক বছর ধরে ঘুরেছি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। মিশেছি ওদের সঙ্গে, মক্কির মোটা মোটা রুটি চুবিয়ে খেয়েছি ভেড়ার ঘন গরম দুধে।

কাশ্মীরে ভেড়া চারকদের বলে চৌপান। অমরনাথ যাত্রার পথে শেষনাগে রাত্রিবাস করছিলাম তাঁবুতে। রাতে ফিন্‌কি দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে বাইনাকুলারে চোখ বেখে দেখতে পেলাম, তুষার পর্বতের কোলে কোন গুহায় আগুনের শিখা নাচছে।

আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘাসে ছাওয়া প্রান্তর পেরিয়ে আগুনের উৎসের কাছে পৌঁছলাম।

চেলা কাঠে আগুন জ্বলছিল। তাকে ঘিরে বসেছিল জনা চারেক মেষপালক বা 'চৌপান'। গুহার ঠিক বাইরে অর্ধ বৃত্তাকারে শুয়েছিল তুলোর পুঁটলির মত ধবধবে সাদা ভেড়ার পাল। একটি মেষচারক অদ্ভুত ভঙ্গীতে ভেড়াগুলোর জটলার ভেতর হাত পা সিঁধিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছিল।

সে রাতে সামান্য সময় ওদের ভেতর ছিলাম। দূর কোন পাহাড়ি গাঁয়ে ওদের ডেরা, কিন্তু শীতের দু'তিনটে মাস ছাড়া ওরা সেখানে থাকে না। বছরের বেশির ভাগ সময় ওরা থাকে নীল আকাশের নীচে কোন পাহাড়ি গুহায় অথবা সবুজ ঘাসে ভরা কোন বুগিয়ালে (চারণভূমি)।

কিন্নর যাত্রায় যখন 'সাংলা' থেকে 'পু'-এর দিকে জিপে করে যাচ্ছিলাম, তখন সুউচ্চ নেড়া পাহাড়ের কোলে ওম্ পথ ধরে ওদের ভেড়া নিয়ে উঠতে দেখেছিলাম।

জিপ থামিয়ে ওদের সঙ্গে কিছু পথ উঠে যাই।

কিন্নরে মেষচারকদের বলে 'পালস'। ওরা যে ছড়ি দিয়ে ভেড়াদের তাড়ায় তাকে বলে 'খেচু'। মুখে বিচিত্ররকম আওয়াজ তুলে ওরা ভেড়াদের ডাইনে, বাঁয়ে অথবা সিধে চালিয়ে নিয়ে যায়। ওদের মুখের ওই আওয়াজকে বলে 'চিতরং'।

আমি কিন্তু এই শ্রেণীর মেষচারকদের সঙ্গে গভীরভাবে মিশেছি কুলু, কাংড়ায়। বারে বারে ছুটে গিয়েছি ওদের ডেরায় তথ্য সংগ্রহের আশায়।

কুলু, কাংড়ায় এই মেষচারকদের বলে 'গদ্দী'। তাদের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে কত কথা, কত কাব্য।

গদ্দী চরদা ভেদন
গদ্দান দিন্দি ধূপ,
গদ্দী জো দিন্দা ভেদন
গদ্দান জো দিন্দা রূপ।

গদ্দী ভেড়া চরায়, তাই শিব দিলেন তাদের একপাল ভেড়া। আর গদ্দান জ্বালায় শিবের উদ্দেশ্যে ধূপ, তাই শিব দিলেন তাদের রূপ।

এই ছড়ার আকারে প্রবাদটি গাদেরানের সর্বত্র প্রচলিত। গাদেরান বলতে গদ্দীদের বাসভূমি।

চম্বার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, কাংড়ার উত্তরে, পাঙ্গীর উপত্যকা ও পাহাড়ী এলাকার কোনও কোনও জায়গায় গদ্দী সম্প্রদায়ের বাস।

গদ্দীরা শিবের উপাসক বলে গাদেরানকে বলা হয়, শিবভূমি। মণিমহেশে গদ্দীদের আরাধ্য দেবতা মহেশ্বরের অধিষ্ঠান।

সাধারণত ধৌলাধার পর্বতের সাড়ে তিন হাজার থেকে সাড়ে সাত হাজার ফিট ওপর পর্যন্ত শৈলগাত্রে দেখা যায় গদ্দীদের কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি ছোট ছোট কুটিরগুলি।

এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা কিন্তু অর্ধ-যাযাবর। তাদের সামান্য ক্ষেতি আছে, সেখানে তারা ফসল ফলায়। মেয়েরা সেই ফসল কেটে ঘরে তোলে।

গদ্দীরা চারমাস মাত্র বাড়িতে কাটায়, বাকি সময়টুকু তারা ভেড়া চরিয়ে বেড়ায়।

দেওদার, পাইন, বার্চের বনভূমি যেখানে শেষ হয়ে যায়, তার পর বারো হাজার থেকে প্রায় সাড়ে চোদ্দো হাজার ফিট পর্যন্ত স্থানে বিশেষ কোনওরকম বৃক্ষ দেখা যায় না। সেই সুউচ্চ পাহাড়ী এলাকার কোনও কোনও স্থানে ঘন-সবুজ নিরুঘাসের বুগিয়াল বা চারণক্ষেত্র আছে।

গদ্দীরা ভেড়া নিয়ে ওই সব অঞ্চলে চরিয়ে বেড়ায়। পনেরো হাজার ফিট ওপরের পর্বতশৃঙ্গগুলি চিরতুষারাবৃত। তাই এত ওপরেও বুগিয়ালগুলিতে ঝরনার জলের অভাব হয় না।

গদ্দীরা ওই সব খোলা আকাশের নীচে ভেড়াদের সঙ্গেই দিনরাত্রি কাটায়। তারা মক্কির রুটি বানিয়ে খায়, বেশিরভাগ সময় ভেড়ার দুধে চুবিয়ে খায়।

সেপ্টেম্বরে যখন উঁচু পাহাড়ে প্রবল শীতের হাওয়া বইতে থাকে তখন গদ্দীরা তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে নীচের দিকে নেমে আসে।

এ-সময় প্রায় আড়াই মাস ওরা নিজেদের পাহাড়ী ডেরায় কাটায়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওরা আপনজনদের সান্নিধ্যে দিনগুলো কাটিয়ে দেয়।

এর পর ডিসেম্বর-জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ গদ্দীরা নীচের পাহাড় এবং উপত্যকায় ভেড়ার পাল নিয়ে চরিয়ে বেড়ায়। মাঠ থেকে ফসল উঠে যায় এই সময়। ক্ষেতের মালিকরা গদ্দীদের এক-একটা দলকে তাদের নিজ-নিজ মাঠে ভেড়া চরাবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ভেড়াদের পরিত্যক্ত বস্তুগুলি ক্ষেতের উৎকৃষ্ট সার হিসেবে কাজ করে। এ-জন্যে গদ্দীরা ক্ষেতের মালিকদের কাছ থেকে কিছু অর্থ এবং খাদ্যসামগ্রীও পায়।

নীচের পাহাড় এবং উপত্যকায় চারণের সময় গদ্দানরাও গদ্দীদের সঙ্গে থাকে। কিন্তু কখনও সুউচ্চ পর্বতের চারণক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গী হয় না।

উঁচু পাহাড়ে যাত্রার সময় ওরা মাস দেড়েক নিজেদের ডেরায় কাটায়।

গরম পড়া শুরু হলেই ওরা দ্রুত ওপরে উঠতে থাকে। বর্ষার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওরা বৃষ্টিহীন উচ্চতায় পৌঁছে যায়।

পার্বত্য অরণ্য, সংক্ষুব্ধ স্রোতধারা এবং তীক্ষ্ণ শীতের হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করতে হয় বলে ওরা প্রতিকূল প্রকৃতির মধ্যে এক একটি দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করে নেয়।

এক একটি গিরি-পাস অতিক্রম করার সময় ঝড় এবং খসেপড়া পাথরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওরা গিরিসঙ্কটের অধিষ্ঠাতা দানবকে তুষ্ট করে। একটি বাঁশের মাথায় লাল পতাকা উড়িয়ে উঁচু পাথরের গায়ে আটকে দিয়ে আসে।

অরণ্যের ভেতর দিয়ে আসার সময় যাতে কোনওরকম বিপর্যয় না ঘটে সেজন্যে ওরা অরণ্যদেব 'বানবীর'-এর পুজো দেয়।

উৎরাইতে নামার সময় 'কেহ্‌লু বীর'-এর পুজো দেয়, যাতে পা ফসকে নীচে না গড়িয়ে পড়ে।

সর্প দংশনে মৃত্যু যাতে না হয় সেজন্যে একটা কাস্তেকে সর্পের প্রতীক হিসেবে ভেবে পুজো করে। সেই কাস্তের নাম হয় তখন সর্পের রাজা 'কৈলাং'।

দুরন্ত স্রোতধারা পার হওয়ার সময় যাতে ভেড়াগুলো ভেসে না যায় সেজন্য জলের দেবতা 'বাতাল'-এর পুজো দেওয়া হয়।

এইভাবে চলে গদ্দীদের বিচিত্র ধর্মাশ্রয়ী জীবনযাত্রা। ভেড়ার লোম বিক্রি করে ওরা প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করে। বছরে অন্তত দুবার উলের জন্য ভেড়ার লোম ছাঁটাই করা হয়।

গদ্দীরা বছরের অধিকাংশ সময় ভ্রাম্যমাণ। গদ্দানদের সান্নিধ্যে মাত্র চার মাস থাকার সুযোগ পায় তারা। এজন্যে গদ্দী নারী সমাজের বেদনার অন্ত নেই। তাদের ব্যথা-বেদনা নিয়ে তাই অজস্র লোককথা ও সঙ্গীত রচিত হয়েছে। তারই কয়েকটি মাত্র এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি।

বরসাত শুরু হয়েছে। কাল কাল মেঘ পাহাড় পর্বত থেকে বেরিয়ে ছেয়ে ফেলছে আকাশ। চিক্কুর হানার সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে যাচ্ছে গুড়কানা বা বাজের ডাক। সে-ডাক আর যেন থামতেই চায় না। সারা উপত্যকার পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে-খেতে সে-ডাক কতক্ষণ ধরে বাজতে থাকে। শুরু হয়ে যায় অঝোর বর্ষণ।

বিরহিণী তার প্রিয়তমের কথা স্মরণ করে গান ধরে,—

'ঘানি ঘানি ধোরি পেইও
আয়া জিন্দে
আবে বর্ষালা।'

ঝরঝর করে বর্ষার ধারা ঝরে পড়ছে, এমন দিনে তুমি আমার কাছে এসো প্রিয়তম।

বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেউবা গায়,—

'ও গয়ে সজন ও গয়ে
লংগি গয়ে দরায়া
বজ্জি নি কীত্যা গলন্ গুড়িয়াঁ
সদে দিলে দা চুকেয়া নি চা।'

নদী পেরিয়ে আমার প্রিয় তার বুগিয়ালের দিকে চলে গেছে। হায়, মন ভরে দুজনে দুটো কথা বলব, কি শুনব, তার সুযোগ পেলাম না।

কখনও বা অভিযোগের সুরে গায়,—

'আপুন ভি নই, আউন্দা ও
লিখি ভি নই ভেজ্‌দা
কীয়াঁ তন্ কাট্‌নি ও
বলারি বরেয।'

তুমি ঘরে আস না, কোনও খবরও পাঠাও না। বলো, আমি আমার এই যৌবনের দিনগুলো কেমন করে কাটাই।

রুজি রোজগারের ধান্দায় বাইরে বেরুতে হয় পুরুষদের। গৃহসুখ থেকে তারা বঞ্চিত থাকে বছরের বেশিরভাগ সময়। গৃহবন্দী মেয়েরাও প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়। তাই পুরুষকে একান্ত কাছে পাওয়ার জন্য গদ্দী রমণী বলে, এত কষ্ট করে উপার্জনের কোন দরকার নেই তোমার। এক চিলতে ক্ষেতি থেকেই আমি তোমার ভরণপোষণের সব ব্যবস্থাই করে দেব।

'ক্ষেতিয়া কানক কুপাহ্
মেঁ কাত্তন তু খা
পরদেশ ন যা
পরদেশন্ দি মম্লে জি তোলা মন্দ্‌রে।'

ক্ষেতিতে গম আর তুলো ফলবে। আমি তোমার খানা বানিয়ে দেব, কাপড় বুনে দেব। ওগো আমার মনের মানুষ, তুমি পরদেশে যেওনা, যেওনা, যেওনা।

তবু চলে যেতে হয়। মেয়েদের অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে করুণ সুরে বাজতে থাকে।

এত অধীরতা কেন?—কেউ যদি প্রশ্ন তোলে, তার উত্তরে প্রোষিতভর্তৃকা বলে,—

'নদীরে কট্‌লা মনরো তত্‌রু চীযে
জীনা রে রুযো সজনো
তীনে গি জীব্‌না বোলো কিসে।'

নদীর ধারে থেকেও তিতির পাখি কাতর হয়ে থাকে পিপাসায়। বল, একজন নারী তার প্রিয়তমের কাছ থেকে এত দূরে থাকলে তার অবস্থাটা কি রকম হয়।

বিরহিণী রমণীরা যখন পাণিভরণে কোন ঝরনার ধারে সমবেত হয় তখন একদল প্রশ্নের ভঙ্গীতে গেয়ে ওঠে,—

'কুথুঁ তে উম্‌দি কালি বাদ্‌লি
কুথুঁ তে বরবিয়া থাগুা নীর?'

বল, বল, কোথা থেকে আসে কালো মেঘ, আর কোথা থেকেই বা নামে বৃষ্টি ?

অন্যদল উত্তর দেয় গানে,—

'দিলাঁতে উম্‌দি কালি বাদ্‌লি
নৈনাতে বর্‌ষিয়া থাগুা নীর।'

শোন, শোন, ঐ কালো মেঘ উঠে আসে আমার বুকের ভেতর থেকে। আর বর্ষার ধারা নেমে আসে আমার এই দুটি চোখ বেয়ে।

এত বেদনা, এত অশ্রুতেও টলে না যাযাবর গদ্দীদের প্রাণ। তারা ঘরের সুখ ফেলে পথের কষ্টকে আনন্দে বরণ করে নেয়। একি কেবল অর্থ উপার্জনের মোহ, না অন্য কোন অন্তর্নিহিত আকর্ষণ?

হিম-প্রবাহের মত পর্বতশীর্ষ থেকে নেমে আসছে সাদা সাদা ভেড়ার পাল। তাদের তাড়িয়ে আনছে, লোমওয়ালা গদ্দী কুকুর। সামনে 'হ্যালা হুই, হ্যালা হুই' আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলেছে গদ্দী পহাল। কখনো সুর তুলছে বাঁশুরীতে, কখনো বাজিয়ে চলেছে রুবাণা।

পরণে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ঝোলা চোল। কোমর বেষ্টন করে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে ছাগলের লোমে তৈরী প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা ডোর। তার থেকে ঝুলছে ভেড়ার চামড়ায় তৈরী বজ্জু। নানারকম দরকারি জিনিসপত্রে ভরা সেই থলে। একখানা কুলহারা বা কুঠার ঝুলছে সেই ডোর থেকে। অনাবৃত পায়ে কেবল শোভা পাচ্ছে চম্বা থেকে কিনে আনা একজোড়া জব্বর নাগ্‌রা। মাথায় কৈলাস পর্বতের চূড়োর আকারে টোপি।

ওরা চলেছে নালা, নালু, ঝোরা, কুহলের জলস্রোত পেরিয়ে। ওরা চলেছে উপত্যকা জুড়ে আপেলের পুষ্পিত ডাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কখনো বা বাউড়ির আঁকা বাঁকা জলস্রোতে সোনার কুচির মত ঝিলিক দিচ্ছে সোনালী রোদ্দুর। ঘড়েলু (ঘড়া) মাথায় নিয়ে বাঁহাত নৃত্যের তালে আলে দোলাতে দোলাতে চলেছে একসারি মেয়ে 'পানিয়া ভরণে'। প্রি গাছের ডালে ডালে ছটোপুটি করছে এক ঝাঁক চিড়িপাখি।

হঠাৎ গদ্দী পহালদের সামনে পড়ে গিয়ে হাসির জলতরঙ্গ বাজালো মেয়ের দল। তারপর ঘুন্ডি উড়িয়ে, ঘুঙুর বাজিয়ে উড়ে চলে গেল চিড়ি পাখিগুলোর মতো।

কখনওবা ওদের দেখা যায় রক্তিম পুষ্পে ভরা রোডোডেনড্রনের তলায়। ভেড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে। ওরা স্তব্ধ হয়ে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করছে দূরে নীলাকাশের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা শুভ্র তুষার-মূর্তি মহাদেবকে।

এই বিরাট ব্যাপ্ত সুন্দরের স্বাদ যারা পেয়েছে তারা কি সুখী গৃহকোণে কখনও বন্দী হয়ে থাকতে পারে?

*

বনপর্ব

তরঙ্গের তুঙ্গে উঠে অতলান্ত অন্ধকারে তলিয়ে যাবার অভিজ্ঞতা নিয়ে বড় একটা কেউ ফিরে আসে না, কিন্তু ফিরে এসেছিল একজন। জীবনের এত বৈচিত্র, এত উত্থান-পতন নিয়ে আর কোনও চরিত্র আমাকে এতখানি অভিভূত করেনি।

দশ বছর বয়সের একটি গ্রাম্য বালক চটের থলেতে চাল আর আলু নিয়ে সারারাত মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে ভোরবেলা নদীঘাটে এসে হাজির। তখনও শুকতারা ভোরের আলোয় ভেসে যায়নি।

খড় বোঝাই নৌকোগুলো দাঁড়িয়েছিল কলকাতা যাবার জন্য। মাঝিদের ভেতর যাত্রার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটি তাদের সঙ্গে কথা বলে একটা নৌকোয় উঠে বসল। সে অনেক গল্প শুনেছিল কলকাতার। এখন নিজের চোখে সেই স্বপ্নের শহরটা ঘুরে দেখতে চায়।

নৌকো থেকে নেমেছিল গঙ্গার ঘাটে। তারপর বিডন স্ট্রিট খুঁজে পেয়ে তার ওপর 'পুরসুন্দরী'-র ধর্মশালায় বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে পায়ে হেঁটে সারা কলকাতা চষে বেড়িয়েছিল।

খড়ের নৌকো কবে কখন কলকাতা থেকে মালপত্র বোঝাই করে দেশে ফিরবে সে-খবর সে রেখেছিল, তাই নির্দিষ্ট দিনে সে ফিরতি নৌকোয় উঠে পড়ল। তার শেষ সম্বল দিয়ে সে ছোট ভাইয়ের জন্য নিয়ে গিয়েছিল একটা কেক।

বারো তেরো বছর যখন তার বয়স তখন সে ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে গভীর রাতে মাঠের মাঝখানের শ্মশান থেকে তুলে এনেছিল সদ্য মড়া পোড়ানোর আধখানা কাঠ।

ভূত-প্রেত, সাপ-শেয়াল, জল-কাদা কোনও কিছুর পরোয়া ছিল না তার।

তখন সে তরুণ যুবক, ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স নিয়ে পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে, এমন সময় সমস্যার সৃষ্টি হল ফি-এর টাকা জমা দেওয়া নিয়ে।

বহু পুরুষের জমিদারী তখন তলানিতে এসে ঠেকেছিল, তাই নানা সময়ে নানা সমস্যা দেখা দিত।

হঠাৎ তার মনে হল, এইসব আর্থিক সমস্যা থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে।

কোনও বন্ধুর সাহায্যে সে টিউবওয়েল বসানোর পদ্ধতিটা শিখে নিল। তারপর ভাল একটা যোগাযোগ ঘটে গেল তার।

কর্ণিকার রাজ-এস্টেটে বেশ কতকগুলো টিউবওয়েল বসানোর কাজ পেল সে।

কাজের শেষে রাজা বাহাদুর দারুণ খুশি হয়ে তার পাওনা তো মিটিয়ে দিলেনই, উপরন্তু বললেন, আমি তোমাকে আরও কিছু দিতে চাই, তুমি কী পেলে খুশি হবে বলো?

যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, রাজাবাহাদুর, শুনেছি আপনার বহু জঙ্গল-এলাকা আছে। তার সামান্য কিছু অংশ যদি আমাকে দেন, তাহলে আমি জঙ্গল কাটিয়ে চাষ-আবাদ শুরু করতে পারি।

পূর্ণ হল তার প্রার্থনা। জায়গাটাও মনে ধরল তার।

ব্রাহ্মণী নদী ছুটে চলেছে সমুদ্রে ধারা মেলাতে। চিতি নদী এসে মিশেছে তার সঙ্গে। তাদেরই মোহনা ঘিরে প্রসারিত জঙ্গল-এলাকা।

জঙ্গলের কিছু অংশ নির্ধারিত হল তার জন্য। হরিণ, বন্যবরাহ, বন্য মহিষে পূর্ণ সে জঙ্গল।

কাঠুরিয়ারা সাত আট মাইল দূরের লোকালয় থেকে বন পেরিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় আসে গাছ কেটে জঙ্গল সাফ করতে। মাথায় পান্তার হাঁড়ি, কাঁচা লংকা, পেঁয়াজ আর চিতি কাঁকড়ার টক দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারে। শেষ বেলায় ঘরে ফেরে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে।

মালিকের জন্য একটা ঢিবির ওপর বাঁশ, কঞ্চি আর মাটির প্রলেপে আস্তানা তৈরী হয়েছে। তার ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে গোরা সৈন্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত একটা জলনিরোধক ক্যাম্বিসের তাঁবু। কুঠির দাওয়ায় রাখা আছে প্যাঁচ লাগানো মুখওয়ালা অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় ধাতুতে তৈরি বিশাল এক ড্রাম। এটিও গোরা সৈন্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত একটি কন্টেনার। সবকটিই নিলামে কিনেছিলেন রাজা। তাঁরই প্রীতির দান এগুলি।

ঐ ড্রামটি এখন বেশ কাজে লেগেছে। ওটিতে চড়ে দুঃসাহসী মালিক চিতি নদীর একটা খালে জাল ফেলে মাছ ধরে।

কাঠুরিয়ারা দিনের কাজ শেষ করে চলে যাবার পর জল-জংগল ঘিরে রাক্ষুসে অন্ধকার নামে। জংগলে জানোয়ারদের ভেতর মাঝে মাঝে হুড়দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। বাতাসে দুর্বল প্রাণীর আহত, আর্ত আওয়াজ ভেসে আসে।

ঘরের ঘেরা দাওয়ায় টেমির আলোতে মালিক রান্না চাপায়। বৈতালপাখিরা ধানের মোটা লাল চালের ভাতে কি মিষ্টি স্বাদ। চিংড়ি আর পেঁয়াজ দিয়ে মাখা মাখা একটা তরকারি, কাঁকড়া অথবা চুনোমাছ দিয়ে পাকা তেঁতুলের টক। তাতে একটামাত্র গুজ্‌রি লংকা গুলে দিলে লংকাদহন শুরু হয়ে যায়।

জোছনা রাতে চরাচর মায়াময়। দাওয়ায় বসে তরুণ মালিক চেয়ে থাকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া একটা চরের দিকে। তার প্রান্তে ছোট একখণ্ড জংগল। তার ভেতর ঢেঙা একটা তালগাছ প্রায় আকাশের নীল ছুঁয়ে হাওয়ায় পাতা নাচাচ্ছে। সেই জংগল-খণ্ড ছুঁয়েই চিতি নদীটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ব্রাহ্মণীতে।

সন্ধ্যায় জলযোগ ঐখানেই সারে জংগলের তাবৎ প্রাণীকুল। বিভিন্ন দলের মহাসমারোহপূর্ণ শোভাযাত্রা চলে কতক্ষণ। সেদিকে তাকিয়ে বনলক্ষ্মীর প্রজাকুলকে মুগ্ধ চোখে দেখতে থাকে তরুণ মালিক।

কখনো অন্ধকার রাতে অহিরাজের ফোঁস ফোঁস তর্জনে ঘুম ভেঙে যায়। বন্ধ ঘরের চারদিকে কতক্ষণ পাক খেতে থাকে সে সগর্জনে ফুঁসতে ফুঁসতে। তারপর একসময় কেউ দরজা খুলে তাকে অভ্যর্থনার জন্য বেরিয়ে এলোনা দেখে নেমে চলে যায় বনের দিকে।

শেষ রাতে আবার ঘুম ভেঙে যায়। কে কাঁদে। জংগল থেকে ভেসে আসছে একটা করুণ আর্ত সুর। ধীরে ধীরে সে আওয়াজ ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যায় একসময়।

কাজে আসে সকালে জংগল-সাফাই-এর দল। মালিক বসে কুঠির দাওয়ায় মুড়ি চিবোচ্ছিল, ভোরের জলখাবার।

একটি কুড়ুলধারী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দেয়, বাবুমশয় চলুন আজ্ঞা. অহিরাজের দশা দেখুন।

মালিক গিয়ে দেখে, রাতের সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র অহিরাজ চোখ উল্টে শেষ দশায় এসে পৌঁছেছে। রাতের আবছা চাঁদের আলোয় সে একটা হরিণকে ধরে গিলতে শুরু করে। ঠাওর করতে পারেনি হরিণটার দুটো শিং গজিয়েছে। কপাল দোষে সেটাই আটকে গেছে গলার নলিতে। তাতেই দম বন্ধ হয়ে চোখ উল্টেছে।

তাহলে শেষ রাতে হরিণটার কাতর কান্নাই শোনা গিয়েছিল।

মাস খানিকের ভেতর আর একটি ঘটনার মুখোমুখি হতে হল।

মালিক গিয়েছিল ভোরবেলা দূরের কোন গঞ্জের বাজার থেকে কিছু দরকারী জিনিস সওদা করতে। সামনে শীত, তাই এক পোঁটলা টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে একখানা গাঢ় লাল পশমের চাদরও কিনে ফেলল।

চাদরটা গায় দিয়ে পোঁটলা মাথায় আস্তানায় ফিরছিল। মাঠের পরে বন, বন পেরিয়ে আবার মাঠ। এমনি তিনখানা মাঠ আর বন পেরিয়ে গেলেই চিতি নদীর মোহনায় মালিকের রাজভবন।

দুখানা মাঠ আর বন পেরিয়ে তৃতীয় মাঠের প্রায় মাঝ বরাবর এসেছে, সামনের বনটা পেরোলেই যাত্রা শেষ। এমন সময় একটা আওয়াজ শোনা গেল পেছনে।

থমকে দাঁড়াল সে। শব্দও থেমে গেছে। মাথায় ভারী পোঁটলা, তাই পেছন ফিরে না তাকিয়ে হন হন করে সামনের বনের দিকে পা চালাল।

আবার পেছনে সেই শব্দ উঠেছে। সে যত জোরে এগোচ্ছে, শব্দও তত দ্রুত ধেয়ে আসছে তার দিকে।

বেলা শেষের আলোয় মরা সোনার রঙ। সে একবার পেছনে না তাকিয়ে পারল না।

একপাল বুনো মোষ ধাওয়া করে আসছে পেছনে।

ওরেব্বাস্! পোঁটলা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে দৌড়ল সামনের বন লক্ষ্য করে। ভাগ্যিস সামনে পেয়ে গেল একটা অশত্থ গাছ। সে হনুমানের মত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠে গেল গাছ বেয়ে। একটা মোটা ডাল আশ্রয় করে চেপে বসল।

এবার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে দশ বারোটা তাগড়াই বুনো মোষ ওপর দিকে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। কোন কোনটা রাগে ফুঁসে উঠে বাঁকা শিং ঘষে নিরপরাধ গাছটার ছাল চামড়া তুলে দিচ্ছে।

হঠাৎ মগজে এলো তার, গায়ে জড়ানো লাল রঙের চাদরখানাই মোষগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে।

ততক্ষণে সবকটা মোষই বটগাছটা ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ওপরের দিকে আর ফুঁসে উঠছে রাগে।

সন্ধ্যা ঘনাবার আগে বনটা পেরিয়ে যেতে না পারলে সমূহ বিপদ, এদিকে নিচে নেমে পালাবারও উপায় নেই।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গা থেকে চাদরটা খুলে নিয়ে পোঁটলা বানিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুঁড়ে দিল মাঠের দিকে।

লাল বস্তুটার ওপর চোখ গিয়ে পড়ল মোষগুলোর। অমনি ওরা শিং উঁচিয়ে ছুটে চলল পোঁটলা লক্ষ্য করে। গাছের ওপরের মানুষটা তখন আর তাদের লক্ষ্যবস্তু নয়।

মোষগুলো শিং-এর গুঁতোয় লাল চাদরটাকে ফারদাফাঁই করতে করতে মাঠ পেরিয়ে তাদের আস্তানার দিকে চলে গেল। অমনি গাছ থেকে নেমে দুঃসাহসী যুবকটি বন চিরে এগোলো নিজের ডেরার দিকে। ততক্ষণে আকাশের চাঁদটা উঁকি দিচ্ছে বনের গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে।

এরপর পাঁচটি বছর ধরে লক্ষ্মীর প্রসাদ পেল যুবকটি। সম্পদের সিংহভাগ দেশে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল সে।

বনবাসের সপ্তম বছরে হঠাৎ তার ওপর বিমুখ হলেন ভাগ্যদেবী। ভয়াল এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হল সে।

তার মুখেই শুনেছিলাম অভাবনীয় সেই প্রাকৃতিক তাণ্ডবের কাহিনী। অবিশ্বাস্য প্রাণরক্ষার দুরন্ত সংগ্রাম।

শেষ রাতে বোঁ বোঁ একটা আওয়াজ শুনে বিছানার ওপর উঠে বসল নতুন পত্তনির মালিক।

চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঝোরকার ঝাঁপ তুলতেই হাওয়ার একটা ঝাপটা চাবুকের মত মুখে আছড়ে পড়ল।

ঝাঁপ বন্ধ করে দিতেই ঘূর্ণি হাওয়ার গোঙানিটা জলস্থল বনবাদাড় কাঁপিয়ে বাজতে লাগল।

ঘড়ি রাখে না মালিক, তবু দিনরাত্রির নিরন্তর পরিক্রমার নির্ভুল হিসেব তার অনুভূতিতে।

এখন নিশ্চয়ই সূর্যোদয়ের সময় হয়ে গেছে, কিন্তু আলোর এক চিলতে রোশনাই নেই কোথাও।

সাহস করে আর একবার ঝাঁপটা তুলল ঘরের মালিক। ঘূর্ণি হাওয়ায় তাল তাল কালো মেঘ ওলটপালট খেতে খেতে সূর্যের সবটুকু আলো শুষে নিচ্ছে।

মুহূর্তে ঝোরকার ঝাঁপ তোলার মাসুল দিতে হল মালিককে। ঘূর্ণি হাওয়ার ঝটকায় উলটোদিকের ঝোরকার ঝাঁপটাও খুলে গেল। অমনি হাওয়ার তাণ্ডবে ঘরের ভেতর বাসনকোসন, ড্রাম বালতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে, গড়িয়ে লুটিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

মোটা কেম্বিশের ওয়াটার প্রুফ চালাটা বাঁশের খুঁটির পোক্ত বাঁধন ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাবার জন্য মারতে লাগল প্রবল ঝাপটা।

এতক্ষণে গৃহস্বামী ঝড়ের বিভীষিকার আন্দাজ পেয়ে গেছে। পশ্চিমের শিমূল গাছটার ডালপাতা ভেঙে ছিঁড়ে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে ঝড়। কোনওরকমে অস্তিত্ব রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা মোটা কাণ্ডটা।

ওদিকে ব্রাহ্মণী আর চিতি নদীর জল ফুলে ফেঁপে ঢুকে পড়েছে জংগলের ভেতর।

সঙ্গে সঙ্গে কিংকর্তব্য স্থির করে ফেলল মালিক। যে কোন মুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে সমুদ্রের লোনা ছয়লাপি।

ঘণ্টা তিনেকের অক্লান্ত চেষ্টায় বিশাল মুখবন্ধ ড্রামটার চারদিকে একটা বাঁশের ফ্রেম তৈরি করা হল।

কাছি দিয়ে বাঁধা হল কন্টেনারের লম্বা, মোটা মুখ-সংলগ্ন দুটো মজবুত আংটা।

বাঁশের অনুচ্চ ফ্রেমে চাপান হল জলনিরোধক ছাউনিটা।

এক ব্যাগ শুকনো চিড়ে আর এক ঘড়া জল নিয়ে মালিক ঢুকল নোয়ার নৌকোয়। ঘোড়ার লাগামের মত শক্ত দুটো কাছি ধরে দুর্জয় যোদ্ধার মত বসে রইল সে।

অনুমান ঠিক ছিল তার। শেষ বেলার দিকে ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রে তুলল একটা জলস্তম্ভ। মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল বাতাস। চরাচর নিস্তব্ধ। পরমুহূর্তেই কোটি রাক্ষসের প্রাণফাটা আর্তনাদ তুলে আছড়ে পড়ল ঐ জলস্তম্ভ। বিদ্যুতের আলোকে দেখা গেল সেই অকল্পনীয় দৃশ্য।

সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে এক লহমায় শূন্যে উঠে গেল কলার মোচার মত নোয়ার নেই নৌকোখানা। নির্ভীক এক নাবিক বসে আছে সে নৌকোয় শক্ত হাতে দুটো কাছি ধরে।

নৌকো পাক খাচ্ছে, উঠছে ওপরে, নামছে অতলে। আবার কখনো মনে হচ্ছে, উল্কার গতিবেগে অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলেছে অলৌকিক জলযানটা।

সারারাত অভুক্ত রইল মালিক। দুটি হাত জোড়া তাই খাদ্য পানীয় কিছুই গ্রহণ করতে পারল না সে।

ভোরের আলো ফুটছে। চড়ায় আটকে গেছে দুঃসাহসী নাবিকের ভেলা।

দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই। আলো ঝলমল চরাচর। জলযান থেকে চরের পলিতে নেমে দাঁড়াল এ

যুগের নোয়া। চারদিকে তাকিয়ে দেখল। না, সেই বিশাল জংগল এলাকার চিহ্নমাত্র নেই। এক রাত্রির তাণ্ডবে রূপকথার দৈত্যটা জংগল সাফ করে ধূ ধূ প্রান্তর বানিয়ে দিয়েছে।

বহুদূরে দেখা যাচ্ছিল শিমুলের মোটা সেই কাণ্ডটা।

খালি ট্যাঙ্কটা পলির ওপর দিয়ে টানতে টানতে সে নিয়ে গেল চিতি নদীর ধারে। স্রোতের গতি দেখে সে ট্যাঙ্কটা ভাসিয়ে ওপারে গিয়ে উঠল।

অনেক সন্ধান আর অনুমানের পর হদিস পেল তার ডেরার। উঁচু ঢিবির ওপর দু চারটে ভাঙা বাঁশের খুঁটি তখনও দেখা যাচ্ছিল।

মালিক তার শূন্য ভিটের ওপর বসে রইল কতক্ষণ। কয়েকটা বছরের টুকরো টুকরো স্মৃতি রোমন্থন করল সে।

একসময় দীপ্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে দিগনির্ণয় করে উঠে দাঁড়াল। চারদিকে তাকাল একবার। চিতি নদীর ধারে খুঁটিতে বাঁধা ধাতব ট্যাঙ্কটা নাচছে।

মালিক হাত নেড়ে নেড়ে বলল, আমি আবার আসব। তখন এই বন সবুজ, শ্যামল শোভা নিয়ে জেগে উঠবে। পাখিরা উড়ে আসবে। বনচর পশুরাও নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াবে এই বনে। জ্যোৎস্না রাতে জল খেতে আসবে এই চিতি নদীতে। ঘরের দাওয়ায় বসে আবার আমি দেখব সে ছবি।

'বনপর্ব' উপন্যাসের নায়ক অফুরন্ত মানসিক শক্তির অধিকারী, এই মানুষটি। সৌভাগ্যক্রমে এই উপন্যাসের রচয়িতা তাঁর অনুজ, সহোদর ভ্রাতা।

*

অক্ষয় বটের কড়চা

আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসন থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে এককালে আমার প্রপিতামহের পিতৃদেব আদিবাসীদের দিয়ে জংগল কাটিয়ে একটি খামার বাড়ির পত্তন করেছিলেন। ঐ চাষ বাড়ির উত্তরে প্রবাহিত নদীটিব সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অদূরবর্তী সমুদ্রের। তাই জোয়ার ভাটা খেলত সেই নদীতে। নাশিখাল বেয়ে উঠে আসত মন মন মাছ। আদিবাসী অর্ধ উলঙ্গ মানুষজন খালে বিলে নেমে সেই সব মাছ ধরত। নদীর চরে চাষ আবাদ শুরু হবার পর ওদের ভেতর অনেকেই চাষের কাজে লেগে যায়। সেই থেকে আরম্ভ গোচারণের কাজও।

বহু প্রাচীন বট অশ্বত্থ গাছগুলো এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকত জটাজুটধারী মুনি ঋষিদের মত। জলচর স্থলচর পাখিদের আশ্রয়স্থল ছিল ঐসব বৃক্ষের অজস্র শাখা প্রশাখা।

ছেলেবেলা স্কুলের ছুটি পড়লেই আমি চকে চলে যেতাম ঠাক্‌মার কাছে। সেখানে অবাধ মুক্তি, অখণ্ড স্বাধীনতা।

ভোরবেলা আলো ফুটলেই হই হই করে পাখিরা বাসা ছেড়ে বাতাসে ভেসে যেত। আমি হুড়মুড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে ছুটতাম পোস্তা বাঁধের ওপর দিয়ে নদীর দিকে। আমিও সে সময় দুবাহু ডানার মত বাতাসে মেলে দিয়ে ছুটতাম। শৈশবে যেমনটি সকলেই করে। বাগ্‌দিদের ছেলেরা তখন আমার বন্ধু, খেলার সাথী, একান্ত প্রিয়জন।

ওদের ভেতর দু'একজনকে আমি দেখেছি, অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, স্পষ্ট বক্তা, অন্যায়দ্রোহী, প্রতিবাদী চরিত্র।

আমাদের পূর্বপুরুষের জংগল কেটে খামার বাড়ি পত্তনের পর অনেক চকদার এ অঞ্চলে জমির আকর্ষণে ভিড় করে এসেছে। তাদের কাছারি বাড়ি জমজমাট।

আমাদের বিত্তবান জ্ঞাতিদেরও পোস্তা বাঁধের এপারে ওপারে একাধিক খামার বাড়ি রয়েছে। বোধকরি মহাভারতের আমল থেকে জ্ঞাতি-শত্রু বলে একটা কথা বিশেষভাবে চালু হয়েছে। সেটি আমি আকৈশোর চকবাড়িতে যেতে যেতে উপলব্ধি করেছি।

বন্যাপ্রবণ এলাকা এ অঞ্চল। কেলেঘাই নদীর জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যায় এই জংগল জালপাই এলাকা।

পোস্তা বাঁধের এ পারের জমি ডুবে গেলে ওপারের মানুষ দল বেঁধে লাঠি সোটা নিয়ে পাহারা দেয়। এ পারের জলবন্দী মানুষজন প্রাণের দায়ে কোদাল, শাবল নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাঁধ কাটাতে ছোটে। এ পারের বদ্ধ জলের কিছু অংশ ওপারে বের করে দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা।

সংঘাত লেগে যায় দুপারের মানুষের। কেবল লাঠি নয়, বর্শা, টাঙি, হাসুয়া ইত্যাদি লৌহাস্ত্রের প্রয়োগ চলে নির্বিচারে। বাঁচার জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়।

আর এক সংগ্রাম চলে প্রথম আর দ্বিতীয় রীপুর।

কাছারিবাড়ির বাবু গোমস্তাদের কামনার দৃষ্টি পড়ে অসহায় ভূমিকন্যাদের ওপর। কখনও কখনও তাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে প্রতিবাদী নারীপুরুষ চরিত্র।

আমার একাধিক উপন্যাসে আমি লিখেছি এদের কথা। 'অক্ষয়বটের কড়চা' উপন্যাসটি তেমনি এক অনগ্রসর অঞ্চলের কথা। প্রতিবাদী ভূমিপুত্রদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোযহীন সংগ্রামের কাহিনী।

*

মাসাম্‌মা

প্রবোধের সঙ্গে আকৈশোর আমি বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা। একই অঞ্চলের অধিবাসী, একই স্কুলের ছাত্র। ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক (প্রাক্তন ডিন, ফ্যাকালটি অব সায়েন্স, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন নৃতত্ত্ববিদ।

আবাল্য প্রবোধ অতি দুর্দান্ত প্রকৃতির। কৈশোরে সে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' কাহিনীটির নাট্যরূপ দেয়। তার নিমন্ত্রণে আমরা কয়েক বন্ধু তার গ্রামে ঐ নাটক দেখতে যাই। সেখানে প্রবোধের মমতাময়ী বউদি আমাদের খুব যত্ন করেন।

রাতে নাটকের অনুষ্ঠান হয়। গ্রামের চাষাভূষো ছেলেমেয়েদের দিয়ে ও নাটকটি মঞ্চস্থ করে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে সে রাতে ওর নাটকটি উপভোগ করেছিলাম।

বিয়াল্লিশের ভারতছাড় আন্দোলনের ঢেউ এসে যখন আছড়ে পড়ে আমাদের স্কুলে, প্রবোধ তখন মহাবিক্রমে আন্দোলনের সামিল হয় ও কারাবরণ করে।

ইউনিভারসিটির পড়াশোনা শেষ করে ও যখন গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিল তখন ইংরাজদের ছাপমারা 'বর্ণ ক্রিমিনাল' লোধাদের সংস্পর্শে আসে। তারা থাকত ঝাড়গ্রামের দুর্গম বনপাহাড়ী অঞ্চলে।

সে সময় বন্ধুবরকে অনেক ঝুঁকি নিয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হতো। কিন্তু একসময় প্রবোধকে ওরা বন্ধু বলে গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে লোধাদের নিয়ে ও কেবল গ্রন্থ রচনাই করেনি তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য তৈরী করেছে বিশাল কর্মশালা। মেদিনীপুরে বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে গড়ে তোলা ওর 'বিদিশা' যেন শান্তিনিকেতনের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে পড়াশোনা আর ক্ষেতখামারের কাজ করছে আদিবাসী ছেলেরা। আনন্দের বহু আয়োজন তাদের সামনে। বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে ওরা উৎসব-আনন্দে মেতে ওঠে। প্রান্তবর্তী দু একটি রাজ্য থেকে আদিবাসী তীরন্দাজ, বাদ্যিকার আর বিচিত্র সাজে সজ্জিত নর্তকেরা আসে। সারারাত আলোর মালায় সাজে বিদিশা। নাচেগানে খুশির লহরী বইতে থাকে।

নৃতত্ত্বের সেমিনারে দেশবিদেশের নৃতত্ত্ববিদদের সমাবেশ ঘটে। নৃতত্ত্ববিষয়ক বহু সমাদৃত গ্রন্থের রচয়িতা ডক্টর পি. কে. ভৌমিক। দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে ফিল্ডওয়ার্ক করে তথ্য সংগ্রহ করার ভেতরেই ওর আসল আনন্দ। ডক্টর ভৌমিকের সৃষ্ট গ্রন্থগুলি তাই মৌলিক উপাদানে সমৃদ্ধ।

বন্ধুবর সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ, আমার একাধিক উপন্যাসের উপাদান আমি ওর উপহার দেওয়া গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি।

মাসাম্‌মা উপন্যাসের নায়িকা মাসাম্‌মা অন্ধ্রপ্রদেশের অরণ্যভূমির অধিবাসী 'চেঞ্চু' সম্প্রদায়ের এক আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত কন্যা।

চেঞ্চুদের আচার আচরণ, রীতি নীতি, ক্রিয়াকর্ম আমাদের সমাজ ব্যবস্থা থেকে অনেক স্বতন্ত্র আর বিচিত্র।

বন্ধুবর সশিষ্য ঐ টিলা পাহাড় সংকুল অরণ্যভূমির বিস্তৃত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে চেঞ্চু সম্প্রদায়ের ওপর দীর্ঘদিন কাজ করে 'চেঞ্চু' নামে একটি মূল্যবান ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করেছে। ঐ গ্রন্থের এক কপি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রে আমি পাই।

ভ্রাম্যমাণ হিসেবে ঐ অঞ্চলটিতে আমি গেলেও ডক্টর ভৌমিকের মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি না পেলে আমার পক্ষে মাসাম্‌মা উপন্যাসটি রচনা করা কোনওভাবেই সম্ভব হত না। অকুণ্ঠে বন্ধুবরের কাছে এই ঋণ স্বীকার করছি।

মাসাম্‌মা আমার বড় প্রিয় চরিত্র। লেখক একান্তে আপন মনে নিজেব সৃষ্টির আস্বাদন করেন। আমি চেঞ্চু-কন্যা মাসাম্‌মাকে বড় সমাদরে অন্তরে লালন করি।

মেয়েটি ঠিক মেঘের মত। কখনও আকাশের গায়ে থমকে থেমে থাকে, কখনও বা ঝড় তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তার ভেতরে ভালবাসার উত্তাপ আছে, অশ্রুও আছে, কিন্তু সে অশ্রুকে বর্ষণে সে রিক্ত হতে দেয় না।

প্রয়োজনে আত্মরক্ষার জন্য সে অন্তরে সঞ্চিত রেখেছে বিদ্যুৎ। যথাসময়ে যথাস্থানে তা বার বার ঝলসে উঠেছে।

দু-তিন বছর সে তার স্বামীকে কোন সন্তান উপহার দিতে পারেনি, সেই অজুহাতে তার স্বামী গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাকে বন্ধ্যা অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলাবৃত এক টিলারগুহায়। সেখানে একসময় ছোট্ট একটা প্লেন ভেঙে পড়ে। তার একমাত্র বিদেশী পাইলটটি দুটি পা ভেঙে কোন রকমে বেঁচে যায়। পুরো একটি বছর মাসাম্‌মা তাকে তার গুহায় রেখে সেবা করেছে। বনৌষধি প্রয়োগে প্রায় সুস্থ করে তুলেছে সেই বিদেশীকে। তার বঞ্চিত জীবনে এই পুরুষটি যেন দেবতারই অযাচিত দান।

ভাগ্যচক্রে স্বামীর অন্বেষণে একদিন এসে পড়ল তার স্ত্রী আর শিশুকন্যাটি। হারানো মানুষটি তার আত্মজনকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আবেগে অধীর।

অদূরে দাঁড়িয়ে সেই মিলনদৃশ্য দেখল মাসাম্‌মা। যাকে বৎসরাধিককাল সেবাযত্নে সুস্থ করে তুলেছে, যার সঙ্গে দেহমনের সংযোগ ঘটেছে তার, বিদায় মুহূর্তে কিন্তু নিজের মনের কোন ক্ষোভ বা ব্যথা সে প্রকাশ করল না।

নিঃসন্দেহে মাসাম্‌মার চোখের ওপর তখন ফুটে উঠছিল এক অপার্থিব ছবি। এক দেবশিশু জড়িয়ে ধরে আছে তার মা বাবাকে।

সেই মিলন-স্বর্গ থেকে কাউকেই বিচ্ছিন্ন করার কথা সে ভাবতেই পারল না।

ওরা চলে যাবার কয়েকদিন পরেই মাসাম্‌মা বুঝতে পারল, সেও মা হতে চলেছে। তাহলে সে বন্ধ্যা নয়!

এই মিথ্যা অপবাদের জবাব দিতে একদিন সে তার শিশুটিকে বুকে বেঁধে নিয়ে বনচিরে চলল তার গাঁয়ের দিকে।

মাসাম্‌মা উপন্যাসে এই প্রতিবাদী চরিত্রটিকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

যে মেঘ বর্ষার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ, তারই ভেতরেই তো রয়েছে বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ।

*

ময়ূরপঙ্খী

কাহিনীর নামকরণে আপনি 'ময়ূরপঙ্খী' শব্দটি নির্বাচন করলেন কেন? নুলিয়াদের জীবন এবং নৌকোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে বিশেষ কৌতূহল বোধ করছি।

লেখাটি প্রকাশিত হবার পর আমার এক পাঠিকা যে পত্রটি পাঠিয়েছিল তার দুটি মাত্র বাক্য এখানে তুলে দেওয়া হল।

প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তরে লিখেছিলাম, আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করলে সওদাগরদের নৌবহরে নানারকম নৌকোর নাম পাওয়া যায়। ধনপতি সদাগর ও তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর প্রথম সিংহল যাত্রা করেছিলেন সপ্তডিঙ্গা সমুদ্রে ভাসিয়ে।

বহু বিচিত্র নামের নৌকো সে সময়ে সমুদ্রযাত্রায় বের হত। তাদের কয়েকটির নাম এবকম ঃ ময়ূরপঙ্খী, মধুকর, সাগরনটী, শঙ্খচূড়, চন্দ্রপাল, দুর্গাবর, গুয়ারেখী, রণজয়।

ময়ূপঙ্খী ছিল আমার প্রথম পছন্দের নাম। ওর ভেতর ময়ূরের লীলাভঙ্গী আর স্বপ্নময়তার একটা সার্থক রূপ দেখা যায়।

কাহিনীর নায়ক সোন্দর মালো অন্যের নৌকোয় মাছ ধরতে যায় সমুদ্রে। সেখান থেকে যা রোজগার করে তার পুরোটাই প্রায় রেখে দেয় মালোপাড়ার এক হতদরিদ্র মেয়ে দুখিয়ার কাছে। তার স্বপ্ন—একদিন সে নিজস্ব একটি নৌকোর মালিক হবে।

কিন্তু সোন্দর মালোর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। তার জীবনে নেমে আসে এক বিপর্যয়।

যে নৌকোয় সে মাছ ধরতে গিয়েছিল সে নৌকোটি ডুবে যায় ঝড়ের মুখে পড়ে। অচৈতন্য অবস্থায় সোন্দর মালো গিয়ে পড়ে সুবর্ণরেখার এক চরে। সেখানে জেলে পাড়ার সুখী সেবা যত্নে সোন্দরকে দান করে নতুন জীবন।

অদ্ভুত চরিত্রের মেয়ে তালসারি গাঁয়ের ধীবর কন্যা সুখী। তিনবার বিয়ে করে তিনবারই সোয়ামি ত্যাগ করেছে সে। কিন্তু এই শালতরুর মতো শক্ত শ্যামল সোন্দরকে মনে ধরেছে তার। সহজ, সরল, বলিষ্ঠ চরিত্রের যুবক এই সোন্দর মালো। মেয়ে মানুষ দেখলেই সে হামলে পড়ে না।

এদিকে সুখী জেলে পাড়ার মেয়ে হয়েও মাছের কারবার করে না, সে মনে প্রাণে শিল্পী। ঝিনুক, শামুক, কড়ি, গুগ্‌লি দিয়ে সে তৈরি করে নানাধরনের মালা আর পুতুল। সেগুলো বিক্রি করে আসে সমুদ্র-সৈকত দীঘার বাজারে। তার জিনিসের কদর আছে তাই উপযুক্ত দামও পেয়ে যায় সে।

একসময় ঘটনাচক্রে সোন্দরকে যেতে হয় তার নিজের গাঁয়ে। তার ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে থাকে সুখী। সোন্দর তার সওদাগর। সে সমুদ্রযাত্রায় যাবে তার সাধের নৌকোয় চড়ে। তাই সুখী তার সমস্ত শিল্প-প্রতিভা উজাড় করে ঝিনুক, শামুক, গেঁড়ি, গুগ্‌লি দিয়ে বানিয়েছে এক ময়ূরপঙ্খী। বহু ক্রেতা ভিড় করেছে সেই শিল্পকর্মটি কিনবে বলে, কিন্তু সুখী বহু মূল্যের প্রলোভনেও দেবে না তার সৃষ্টি। সে যে তার স্বপ্নদর্শী সওদাগরের জন্যই তৈরি করেছে এই ময়ূরপঙ্খী।

সুখীর এই নৌকো সোন্দর মালোর সফল নাবিক-জীবনের এক সার্থক প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে।

পাঠিকার দ্বিতীয় কৌতূহলের উত্তরে জানিয়েছিলাম,— বিভিন্ন স্থানে নৌকোর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন করম নাম দেখা যায়। আমি যে নামগুলো ব্যবহার করেছি, সেগুলো দীঘা ও শঙ্করপুরের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের নৌ-নির্মাণ-শিল্পীদের সান্নিধ্য থেকে পাওয়া।

সাধারণভাবে নৌকোর বিভিন্ন অংশের যেসব নাম প্রচলিত তার উল্লেখ করছি।

নৌকোর দু'প্রান্তের সংকীর্ণ জায়গাটুকুকে বলে, গলুই। হাল—কেরোয়াল। গুড়া—নৌকোর মাচান তৈরির জন্য আড় দিয়ে বসানো তক্তা। নৌকোর এক ডালি হেকে অন্য ডালি পর্যন্ত বিস্তৃত কাষ্ঠখণ্ড। ডালি—নৌকোর দুই কিনারার কাঠ। ধার বা কানা। পাটা—তক্তা। পাটাতন—পাটা ছাওয়া মাচান।

রইঘর বা ছইঘর—নৌকোর মাচানের ওপর ছাদ বিশিষ্ট বসার ঘর। ডহর—নৌকোর খোল। বাইল—লোহার পাতের বাঁধন। বৈঠা বা দাঁড়—যে কাঠের দণ্ড তাড়নায় নৌকো চলানো হয়। মালুম কাঠ—প্রধান মাস্তুল। সিউনি বা সেচনী—খোলের জল তুলে ফেলার জন্য কাঠের পাত্র। লগি—নৌকো ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য বংশদণ্ড। গুণ—যে কাছি মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে প্রয়োজনে নদীর কিনার ধরে নৌকোকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। গোঁজ—যে খুঁটায় নৌকো বেঁধে রাখা হয়। নোঙর—লোহার কাঁটা আকৃতির দণ্ডযুক্ত ভারী বস্তু যা মাটির সঙ্গে গেঁথে রেখে শেকল-বন্ধনে নৌকোকে আটকানো হয়। পাল—মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা শক্ত বস্ত্র, যা হাওয়ায় ফুলে উঠে নৌকোকে গতিবেগ দান করে। জুলি যে দণ্ডের সাহায্যে নৌকাকে ইচ্ছামতো ঘোরানো যায়।

একসময় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে আমি নানা ধরনের নৌকো এবং নুলিয়াদের জীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতাম। কতবার যে পুরীর নুলিয়া পাড়ায় গিয়েছি তার হিসেব নেই। নৌজীবন নিয়ে ওদের সংস্কার, পুজো-আচ্চা—সবকিছুই আমার নৌটবুকে বন্দি হয়ে আছে।

এবার আমি ভারতের উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তের নৌজীবনের পরিচয়বাহী দুটো ছবি আঁকার চেষ্টা করব, আশা করি তাতে তোমার অনুসন্ধিৎসার কিছু খোরাক পেয়ে যাবে।

কেরালার সোনালি বালু ছড়ানো সুনীল সাগরের তীব্র একটা আকর্ষণ আছে ট্যুরিস্টদের কাছে।

ঐ দিগন্তজোড়া সমুদ্রের হাওয়ায় দোল খায় তীর সংলগ্ন সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ। মায়াময় জ্যোৎস্না রাতে মনে হবে, সুপুষ্ট ফলভারে আনত একদল তরুণী নর্তকী শাখাবাহু প্রসারিত করে হাওয়ার দোলায় ঋজু অঙ্গ দোলাচ্ছে। তারই ভেতর কোথাও কোথাও ধীবরদের আস্তানা।

ওরাও নারীপুরুষ মিলে নাচে। সারাদিন সমুদ্র-তরঙ্গে নৃত্যলীলায় মাতে ওদের নৌকোগুলো। সে নৃত্যের শিহরন জাগে ওদের অঙ্গে। দ্বিপ্রহরে ফিরে আসার আগে সমুদ্রের দেবতা ওদের পাত্র ভরে দেন রুপোলি ফসলে।

সন্ধ্যায় ওরা জমিয়ে তোলে নাচের আসর। সংগীত আর সংগতের ধ্বনি ওঠে সমুদ্র-তরঙ্গে।

ওদের নৌকোগুলো কাৎ হয়ে শুয়ে থাকে সোনালী বালুর বিছানায়। পাশেই তাদের ছায়া পড়ে। সেই ছায়ার চাদরে দেহ ঢেকে কখনও কখনও ধীবর-দম্পতি সুখনিদ্রা ভোগ করে।

কেরালার বিখ্যাত উৎসব 'ওনাম'। ঐ উৎসবে সারা কেরালাবাসী আনন্দে মাতে। ওনাম উৎসবের সবথেকে আকর্ষণীয় অঙ্গ বোট রেস।

কায়েলের জলে ভেসে আছে একসারি চুন্ডন ভাল্লম্। আশি থেকে একশো বিশ ফুট অবধি লম্বা এই নৌকোগুলোর চৌদ্দ ফুট আমরণ উঁচু হয়ে জেগে আছে নৌকোর পেছনে। কাপড় আর মালায় সুন্দর করে সাজান হয়েছে সেই আমরণ। তার নীচে বিরাট ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে গায়কেরা করে চলেছে ওয়াঞ্জীপাট। উৎসাহে কায়েলের জলের মত ফুঁসছে শত শত দাঁড়ি। সঙ্কেত পেলেই শুরু হয়ে যাবে রেস। কাচের মত ঝিলিক দিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে জলের বিন্দুগুলো।

শুরু হয়ে গেছে রেস। ওয়াঞ্জীপাট চলেছে দাঁড়ের ওঠা পড়ার তালে তালে ঃ

কুট্টানাড়ম পুঞ্জইলে
কচ্ছু পেন্নে কুইলাল্লে
কুট্টাভেনম্ কুঁডাভেনম্
পুডাভাভেনম্
ও তিত্তিত্তাগা
তিত্তিথেই
তিথেই
তাগদাই তোম্।

তরুণী বউ তার মানুষটিকে বলছে, এমন সোনার ফসল ফলেছে, তুমি আমাকে কিছু দেবে না?

একটি মনপছন্দ তোরঙ্গ, একখানা শাড়ি, আর বর্ষার দুরন্তপনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একটি ছাতা। হ্যাঁ গো, এটুকু অন্তত দেবে না আমাকে ?

ওয়াঞ্জীপাটের ভেতর দিয়ে এই সামান্য চাওয়ার সুরটি অসামান্য হয়ে উঠেছে।

কেরল থেকে এবার চোখ তুলে তাকানো যাক কাশ্মীরে।

দিনের শেষে ঘুমের দেশে যাত্রার আয়োজন করছে সূর্য। চিনার গাছের ফাঁকে ফাঁকে এখনও কাঁপছে তার স্নিগ্ধ সোনালী উত্তরীয়। সুসজ্জিত শিকারাগুলো যেন ভেসে চলে যাচ্ছে স্বপ্নের দেশে।

আমি বসে আছি ঝিলমের একটা হাউসবোটে। ঝিলম নামটা বড় মিষ্টি। ওর একটা পোশাকি নাম আছে—বিতস্তা। ঋগ্‌বেদে নদী বিতস্তার উল্লেখ দেখা যায়।

ভেরিনাগ পর্বতকন্দর থেকে বেরিয়ে এসেছে সোহাগিনী জলকন্যা ঝিলম। কাশ্মীর উপত্যকার বুকের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে তার স্রোতধারা। অসাধারণ রূপবতী এই কন্যাটি প্রায় একশো পঁচাত্তর কিলোমিটার ছুটে গিয়ে পৌঁছেছে বারামুলায়। সাদিপুরে ওর প্রথম মিলন সিন্ধুনদীর সঙ্গে। ওই মিলন স্থলটির নামই সাদিপুর। গ্রামের নামটিও তাই। অর্থাৎ দুই জলধারার বিবাহ হয়েছে এখানে।

ঝিলমের কথা এমন করে বলার কারণ, তার বুকের ভেতর বইছে কাশ্মীর উপত্যকার প্রাণধারা। এই জলপ্রবাহ স্পর্শ করে আছে কাশ্মীরের অতি সুদৃশ্য ডাল, মানসবল, উলার প্রভৃতি হ্রদকে।

কাশ্মীরের পাহাড়ঘেরা লেকগুলি অপূর্ব শোভার আধার। জলের দর্পণে তুষার পাহাড় দেখছে তার প্রতিবিম্ব।

কত বিচিত্র ধরনের নৌকো যাতায়াত করছে নদীর ওপর দিয়ে। ঝিলমের জলে স্থির হয়ে ভেসে আছে কত শ্রুতিমধুর নামের সব 'হাউসবোট'। ওগুলি সাধারণত একই জায়গায় আস্তানা গেড়ে থাকে। প্রধানত ওক কাঠের তৈরি এসব হাউসবোট। ঝক্‌ঝক্ তক্ তক্ করছে। দুতিনখানা করে সর্বসুবিধাযুক্ত সুসজ্জিত রুম। দরজায় দরজায় ঝুলছে সুদৃশ্য দামী পর্দা।

সচল আর এক ধরনের হাউসবোট আছে, তার নাম 'ডুংগা'। বহু কাশ্মীরী মুসলমান পরিবার এইসব ডুংগাতে বসবাস করেন। এমনকি ট্যুরিস্টরাও। এগুলি লম্বায় সাধারণত চল্লিশ ফুট আর চওড়ায় মাত্র ছ'ফুট। যেখানে খুশি ডুংগাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে বেখে দেওয়া যায়।

ঝিলমের বুকে ভারী মালপত্র নিয়ে ভেসে যেতে দেখা যায় এক শ্রেণীর নৌকোকে। ওদের নাম 'বাহাট'। আটশো থেকে হাজার টন মাল বয়ে নিয়ে যেতে পারে ঐসব নৌকো।

ওর অর্ধেক মাল বইতে পারে, এমন ধরনের নৌকোকে বলে 'ওয়র্'।

'ডেম্‌নে' আর 'খচু' ছোট আকারের নৌকো।

ডেম্‌নেগুলো দুধ আর তরিতরকারি বয়ে নিয়ে যায়। ফুলওয়ালা ওতে ফুল নিয়ে আসে, ফলওয়ালা ফল।

খচুতে সাধারণত জ্বালানি বয়ে আনা হয়। ঘাসওয়ালি মেয়েরা ঘাস কেটে খচুতে বোঝাই করে লেকের জল বেয়ে যে যার আস্তানায় চলে যায়।

'শিকারা' ছোট নৌকো কিন্তু অত্যন্ত সুদৃশ্য। নৌকোর এক অংশে ফ্রিল দেওয়া চাঁদোয়ার তলায় দু'চার জনের বসার মত এমব্রয়ডারির কাজ করা সোফা থাকে। যাত্রীরা নবাবের মত তার ওপর বসে জলভ্রমণ করেন। তাছাড়া ডাঙা থেকে যাত্রী নিয়ে শত শত শিকারা রাতদিন হাউসবোটে যাতায়াত করে।

নানা ধরনের বোটই কাশ্মীরের বয়ে চলা জীবনযাত্রার মাধ্যম। তার অর্থনৈতিক জীবনের বিরাট আশ্রয়।

লেকের অথবা ঝিলমের জলে সরু সরু নৌকো ভাসিয়ে মৎসশিকারীরা বর্শা ছুঁড়ে মাছ গেঁথে তোলে।

উলার হ্রদের তীরসংলগ্ন জলে সিঙাড়া (পানিফল) জন্মায়। পানিফল সংগ্রহকারীরা নৌকো নিয়ে পানিফল তুলতে আসে। তাদের ফল তোলার পদ্ধতি কিছুটা অভিনব।

পানিফলের লতাগুলি জলে ছড়িয়ে থাকে জালের মত। ঐ জটাজালের ভেতর দিয়ে ফল সংগ্রহকারীরা একটা লম্বা বাঁশ জলের তলায় পুঁতে দেয়। জলের ওপর জেগে থাকা বাঁশে একটা কাছি বাঁধা হয়। ঐ কাছিটির অন্যপ্রান্ত বাঁধা হয় নৌকোর সঙ্গে।

এবার নৌকোটি ঘুরতে থাকে বাঁশের চারদিকে। সঙ্গে সঙ্গে পানিফলসহ লতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে জড়ো হতে থাকে। নৌকো যখন ঘুরতে ঘুরতে একেবারে বাঁশে গিয়ে ঠেকে তখন নৌকোর পাশে লতার বোঝা জমে যায়। সংগ্রহকারীরা ফলসমেত সেই বোঝা নৌকোয় তুলে নেয়।

উলারের হ্রদে নৌকো ভাসায় জেলেরা। তারা জাল পেতে রাখে। আর একদল জল পিটিয়ে মাছ তাড়া করে আনে। তরাসে মাছগুলো ঢুকে পড়ে পাতা জালের ফাঁদে।

দিনের একটা বিশেষ সময়ে প্রচণ্ড ঝড় বয় উলার হ্রদে। তখন উত্তাল হয়ে ওঠে বিস্তীর্ণ জলরাশি। কোন নৌকো সে সময় জল কেটে এগোবার সাহসই পায় না। কেবল 'তাস্তাওয়ার' নামের এক ধরনের নৌকো নিয়ে দুঃসাহসী একদল মাঝি ঐ উত্তাল ঢেউ ভেঙে পারাপার করতে পারে।

প্রাক্তন রাজ পরিবারের ব্যবহারযোগ্য কতকগুলি লম্বা সুদৃশ্য নৌকো ছিল। প্রায় পঞ্চাশ জন দাঁড়ির বসার ব্যবস্থা ছিল সে নৌকোয়। 'পারেন্দা', 'লারিনাও' 'চাকওয়ারি' নামের সুসজ্জিত নৌকোগুলো যখন জলকেটে ছুটত তখন মনে হত মুক্তোর দানা ছড়িয়ে অপূর্ব রাজহাঁসগুলি পাখা টেনে উড়ে চলেছে। দুই তীরের অগণিত জনতা সে দৃশ্য দেখে করতালি দিয়ে উঠত উল্লাসে।

কাশ্মীরের নৌচালক মাঝিদের বলা হয় 'হান্‌জি'। ওরা এখন সকলেই মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক। হানজিরা বলে, তাদের পূর্বপুরুষরা নোয়ার বংশধর।

রাজতরঙ্গিনীতে লেখা আছে, কাশ্মীরের মাঝিরা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত।

*

বানজারা

বিদেশী একাধিক শ্রেষ্ঠ লেখক, ভবঘুরে বা যাযাবরদের চলমান জীবন নিয়ে লেখা বিচিত্র উপভোগ্য গল্প, উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন।

আমাদের দেশেও প্রায় দশ বার রকমের যাযাবর সম্প্রদায়ের মানুষ খোলা আকাশের নিচে অথবা গাছতলায় তাদের সাময়িক ডেরা রচনা করে থাকে, তারপর হঠাৎ তাদের মনে হয়, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' অমনি সঙ্গের সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে পাড়ি দেয় নিরুদ্দেশের পথে।

কবির ভাষায় ওরা যেন বলতে চায়, 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।'

খাজুরাহোর পথে যেতে যেতে এমনি এক ভবঘুরে দলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তারা বেরিয়ে আসছিল পথের ধারে গাছগাছালির আড়াল থেকে।

তাদের যাত্রা-সমারোহ দেখলে দৃষ্টি ফেরানো যায় না।

সবার আগে চলেছে সুসজ্জিত একটি বলদ। ধবধবে সাদা। নানারঙের রেশমী সুতোর কাজ করা বং বাহারি আস্তরণ তার পিঠে। ওই সুতোরই তৈরি দড়িতে গাঁথা একসার বাজনদার ঘণ্টা গলায় বাঁধা। চলার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠছে, টুং টুং টুং টুং।

বলদটির পেছনে এক প্রৌঢ় মানুষ। লম্বা দোহারা চেহারা। কাঁচা পাকা একজোড়া চোমরানো গোঁফ।

লোকটি পরেছে ডবল পাক দেওয়া দেহাতি ধোতি। গায়ে চাপিয়েছে ফুলহাতা জামা-বারকাসি। বুকের দিকটা ঢেকেছে বোতামের বদলে বারোটা ফিতের বাঁধন দিয়ে। কাঁধের ওপর পড়ে আছে হলুদ রঙের সেলা বা দোপাট্টা। মাথার পাগড়িখানা দেখার মতো। গোলাকার একটা ধুচুনি-টুকটুকে লাল। ঐ লালের গায়ে রুপোলি সুতোর টান। কানে পরেছে রুপোর রিং-বালি। কোমরে বেঁধেছে রুপোর ঝকঝকে কোমর-বন্ধনী। ডানহাতে ধরা লম্বা বর্শাখানা কাঁধে ঠেকিয়ে চলেছে।

ঐ সজ্জিত বলদটাকে ওরা বলে, 'নন্দীবইল'।

এরপর বন থেকে বেরিয়ে এলো একপাল বলদ। তাদের পিঠে নানারকম বোঝা। আগের মতো সুসজ্জিত বর্শাধারী কয়েকজন লোক এগিয়ে আসছে বলদগুলোর সঙ্গে।

ঠিক তাদের পেছন পেছন দেখা গেল একসার গাইগোরু। দুপাশে ছেলের পাল তাদের সামলাচ্ছে।

সবার পেছনে কোলে কাঁখে কাঁধে বাচ্চা নিয়ে একদল মেয়ে। তাদের দেখলে মনে হবে সেজেগুজে যেন মেলায় চলেছে। পরনে উজ্জ্বল, নানা রঙের ঘাগরা, গোল ছোট ছোট আয়না আর রঙীন সুতোর নকশাদারী কাজ। দোপাট্টার একপ্রান্ত ঘাগরার সঙ্গে বাঁধা, অন্য প্রান্ত পিঠ ঘুরে মাথায় আধ-ঘোমটা তৈরি করেছে। নাকে সোনার নাথলি, কানে ঝুমকো। টাকার তৈরি হাঁসুলি পরেছে গলায়। রুপোর কোপরা বা চুড়ি হাতে, আঙুলে হাতির দাঁতের ছল্লা বা আংটি। কনুইতে বাজুর মতো বাঁধা কোপ্‌রা। রুপোর তোড়িয়া ঝমঝম করে বাজছে পায়ে।

এসব তথ্য খুঁটিয়ে জেনেছি ওদের কাছ থেকে। আরও অনেক খবর জেনেছি খাজুরাহোর কান্ডারিয়ো মহাদেবের মন্দির চাতালে বসে।

ছেলেবেলা থেকে আমি দু'-তিন শ্রেণীর যাযাবর দেখেছি, কিন্তু এই বানজারাদের মতো পরিচ্ছন্ন, সুশোভন যাযাবর সম্প্রদায় আমি দেখিনি।

ওরা বানজারা, অর্থাৎ বনবাসী। ওরা বনচ্ছায়ায় চলতে ভালবাসে। সাময়িক ডেরা রচনা করে গাছতলায় কিন্তু কখনো বাঁধেনা চিরস্থায়ী বাসা।

কোন কোন সম্প্রদায়ের যাযাবর গোষ্ঠী গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে পড়ো ঢিবি দেখলে সাময়িক আস্তানা গাড়ে। তারা সঙ্গে আনে মূল্যবান গাছগাছালির চারা। গৃহস্থের বাড়িতে বিক্রি করে। অবশিষ্ট গাছ লাগিয়ে দেয় ঐ পড়ো ঢিবিতে। একদিন ঐ ঊষর জায়গা শ্যামকান্তিময়ী হয়ে ওঠে। ওরা চলে যায়, পৃথিবীকে শ্যামল সুন্দর করার একটা ব্রতচিহ্ন রেখে।

অনেক হাঘরে সম্প্রদায়ের মেয়েরা গৃহস্থের আঙিনায় নাচ দেখায়। পুরুষরা বাঁশি আর ঢোলক বাজিয়ে সংগত করে। কিছু চালডাল পায়। জড়িবুটি বিক্রি করে পয়সাকড়িও কামায়।

বানজারা সম্প্রদায় গোরুর পাল সঙ্গে রেখে প্রচুর রোজগার করে। শহর, জনপদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওরা খাঁটি ছানা আর ঘি বিক্রি করতে করতে যায়।

বানজারাদের ভেতরেও উঁচুনিচু ভাগ আছে।

মাথুরিয়া বানজারার দল ওদের ভেতর সব থেকে উঁচু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ওরা নিরামিষাশী। পথচারী হয়েও ওরা যথাসময়ে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করে।

ক্ষত্রিয় রাজপুত হল, গোর বানজারার দল। ওদের চারণ-বানজারাও বলে। তুনওয়ার, ভুকিয়া, বাদতিয়া-এরা সব এই দলের লোক।

বানজারা সম্প্রদায় পুজো বা কোন উৎসবে নাচে গানে মেতে ওঠে। হোলির সময় তো কথাই নেই।

উতল হয়ে ওঠে আকাশ হোলির মিঠে সুরে। রঙীন ফাগ ওড়ে বাতাসে। বেজে ওঠে সারেঙ্গি, করতাল, ঢোলক আর বাঁশি। দোপাট্টা উড়িয়ে রঙীন পরীর মত মেয়েদের বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে সে কি নাচ আর গান!

'মন্থর পাদেপ বল রিচ হোলি,
অনুসুয়া করমেলি ক্ষীর পোলি,
দত্তারো বল রামরো হোলি,
পন্ধারপরম বল রিচ হোলি।'

মন্থরেতে চলেছে হোলি খেলা। দেবী অনসুয়া বানিয়েছে ক্ষীর আর পুলি। প্রভু দত্তাত্রয় খেলছেন। পন্ধারপুরমে লেগেছে হোলির মাতন।

বানজারাদের নিয়ে একটা ছোট্ট উপন্যাস লেখার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠল।

*

শনিচারি

এক যুবতী বধূ উঁচু বালিয়াড়ির ওপর থেকে নেমে আসছে নীচের ময়দানে। কাঁখে কলস। ডান হাত দোলাতে দোলাতে লীলাভরে নামছে সে।

বনঝাউয়ের পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল এবার বাদাম বাগানের ভেতর।

এরপর বহুকালের বট অশ্বত্থ বৃক্ষশোভিত প্রান্তর। সেই প্রান্তরে বিশাল বটবৃক্ষের তলায় বসে আছে ভলেনটিয়ার্সবা। লবন আইন অমান্য আন্দোলনের অহিংস সৈনিক এঁরা। অদূরে সমুদ্র। সেখান থেকে লবনাক্ত জল এনে এই ময়দানেই আগুন জ্বেলে লবন তৈরি করে আইন অমান্য করবে স্বেচ্ছাসেবীরা। কিন্তু নিশ্ছিদ্র পুলিশি বেষ্টনির ভেতর বন্দী হয়ে আছে তারা। গ্রামে যাতায়াতে কোন বাধা নেই কিন্তু লবন জল এনে আইনভঙ্গ করতে পারবেনা কেউ।

সুউচ্চ বালিযাড়ির ওপারে গ্রাম, অন্যদিকে মহকুমা শহর। কোর্ট কাছারি, থানা জেলখানা, স্কুল কলেজ, দোকান বাজার—সবকিছু।

শহরে ঢোকা এবং বেরুনোর সময় পুলিশ তীক্ষ্ণ নজরে সবাইকে জরিপ করে নিচ্ছে। বিশেষ করে বালিয়াড়ি ঘেরা ময়দানের ভেতর দিয়ে যারা যাতায়াত করছে।

যুবতী এখন এগিয়ে আসছে শহরের দিকে। স্বাস্থ্যবতী সুদর্শনা, অতীব আকর্ষণীয়া।

শহরে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেল সে। গাছতলায় বেঞ্চ পেতে বসে আছে বন্দুকধারী কজন সেপাই।

একজন উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় চলেছ, কলসিতে কি আছে?

কলসি উবুড় করে দেখাল মেয়েটি,—একবিন্দু জল নেই।

এবার এক ঝাঁক কথা বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে, মহিষামুন্ডা গেরামে আমার ঘর। সব কটা পুকুরের জল খারাপ। পেটের অসুখে ভুগছে বাচ্চা কাচ্চাগুলা। তাউ সরকারি পুকুরের ভাল জল লিতে আসছি গো।

একটু থেমে আবার বলল, গেরামের লোক কইল, তোর বুকের পাটা তো খুব। পুলিশ বুসি আছে, যা তোর কলসি ভাঙি দিবে।

আমি কইলি, পুলিশ বলি কি প্রাণে দয়ামায়া নেই, তাদের ঘরে কি দুধের বাচ্চা নেই গো। ভাঙে ভাঙু কলসি, আমি যাব।

বোধহয় সুন্দরী মেয়ের কাতর কথায় নরম হল সেপাইয়ের মন। সে বলল, যাও, জল নিয়ে ফেরার পথে আমাদের দেখিয়ে নিয়ে যেও। জল পরীক্ষা করে তবে যেতে দেব।

ঘড়া কাঁখে সরকারি পুকুর থেকে জল আনতে চলে গেল মেয়েটি।

ফেরার পথে আবার এসে পড়ল সেই সেপাইদের গুমটিতে।

একটি সেপাই এগিয়ে এসে বলল, জল ভরা হয়ে গেল?দেখি ঢালত এক আজলা জল?

নির্বিকার বধূটি জল ঢেলে দিল সেপাইয়ের অঞ্জলিতে।

জল খেয়ে সেপাই তার সঙ্গীদের বলল, সরকারি পুকুরের জল আমিও খাই কিন্তু এমন মিঠে জল কখনো খাইনি।

একজন মন্তব্য করল, হাতের গুণরে-হাতের গুণ।

অমনি হাসির হর্‌রা ছুটল। লীলায়িত ভঙ্গীতে মুচ্‌কি হেসে মেয়েটি চলে গেল ময়দানের পথে গাঁয়ের দিকে।

দুদিন এমনি জলপরীক্ষা চলল। তৃতীয় দিন থেকে পরীক্ষা বন্ধ। মেয়েটি এখন জলভরা কলসি রেখে সেপাইদের সঙ্গে হাসিমস্করা, রঙ্গরসিকতায় মেতে ওঠে।

পঞ্চম দিনে ভারী তাড়া মেয়েটির—বলল, আজ চলিগো। ছেলেটা কেবল মা মা করছে, আগুনের হল্‌কা ছুটছে সারা গায়ে।

হাজার হোক্, সেপাইদের ঘরেও তো বালবাচ্চা আছে। তাই সবাই হই হই করে উঠল, যাও যাও, অসুস্থ ছেলেকে ফেলে আসে কেউ।

মেয়েটি যেতে যেতে বলল, কি করব-প্রাণের দায়। জল নইলে যে প্রাণ বাঁচে না।

এদিকে কলসি বদল হয়ে গেছে। জুনপুটের দিক থেকে এক মেয়ে ভলেনটিয়ার রাতের আঁধারে কথামত সরকারি পুকুরের এক ঝোপের আড়ালে কলসি ভরতি সমুদ্রের জল রেখে গেছে। সেই জল বধূটি নিয়ে চলে গেছে ময়দানে ভলেনটিয়ার্সদের জমায়েতে।

বিশাল বটবৃক্ষের তলায় জ্বলে উঠল আগুন। তার ওপর কলসি বসিয়ে বীরাঙ্গনা বধূ 'পদ্মা' শুরু করল লবন তৈরির কাজ।

চরাচর কাঁপিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হতে লাগল মাতৃবন্দনার অমর মন্ত্র— বন্দেমাতরম্।

সচকিত হয়ে উঠল পাহারাদার পুলিশেরা। সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌঁছে গেল পুলিশের বড়কর্তাদের কাছে। অমনি ময়দানের দিকে ধেয়ে গেল সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী।

তারা দেখল, ইতিমধ্যেই তাদের পরাজয় ঘটে গেছে। শুরু হল বেধড়ক মার। আহত আন্দোলনকারীরা মার খেতে খেতে সরে গেল দূরে।

বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার নির্ভীক পদ্মা। মুখে লেগে আছে আত্মতৃপ্তির একটুকরো হাসি। যেন যুদ্ধজয়ের পর দাঁড়িয়ে আছেন বিজয়িনী জোয়ান-অব-আর্ক।

শত্রুকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবার পাত্র নয় ইংরাজ-শাসক।

মোটা কাছি এনে বটগাছের সঙ্গে বাঁধা হল পদ্মাকে। সামনের দিকটা রইল বটগাছের সঙ্গে লেপ্টে।

পশুদের যেমন ছাল ছাড়ানো হয়, তেমনি করে টেনে হিঁচড়ে খুলে নেওয়া হল পোশাক।

ডি. এস. পি.-র হাতের চাবুক খোলা চামড়ার ওপর পড়তে লাগল সপাসপ। চামড়া ফেটে সারি সারি রক্তমুখী দাগ। তাতেও প্রশমিত হল না পুলিশ সাহেবের ক্রোধ। এবার একজন বন্ধুকধারীকে ডেকে বললেন, বেয়নেট চালিয়ে ওর পিঠের দাগগুলো আরও গভীর করে দাও।

আদেশপালিত হল, কিন্তু একবিন্দু কাতরোক্তি বেরুল না সর্বংসহা ধরিত্রীর মত অবিচল পদ্মার কণ্ঠ দিয়ে।

বীরাঙ্গনা জননী পদ্মাকে আমি দেখেছি বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে একটি বক্তৃতা মঞ্চে। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। সমুদ্র তরঙ্গের মতো উত্তাল হয়ে উঠেছে আন্দোলন। সীমাহীন হয়ে চলেছে সরকারি অত্যাচার।

আগুনঝরা বক্তৃতা দিতে দিতে জননী পদ্মা একসময় উত্তেজিত হয়ে টেনে খুলে ফেলল তার উর্ধ্বঅঙ্গের বাস।

চিৎকার করে বলতে লাগল, দেখ্-দেখ্, আমার পিঠের ক্ষতগুলো দেখ। ছমাস পরে হাসপাতাল ছাড়ছি। তোরা ঐ গুলামের বাচ্চাগুলাকে আচ্ছা করি ঠ্যাঙাইতে পারবুনি।

উত্তেজিত কৃষক আর ছাত্র জনতা বাঁধ কেটে কেটে মিলিটারি গাড়ির গতিপথ রুদ্ধ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে ঝাঁক ঝাঁক গুলি। লুটিয়ে পড়েছে কত তাজা প্রাণ। আহত, মৃত, অর্ধমৃতদের ট্রাকে বোঝাই করে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। জায়গা দিতে পারা যায়নি, গাদাগাদি হয়ে পড়ে আছে বারান্দায়, উঠোনে। তখনও কোন কোন মৃত্যু পথযাত্রীর মুখে 'বন্দেমাতরম্', 'ভারত মাতা কী জয়'-ধ্বনি।

অদূরে 'খড়্গচণ্ডী'-শ্মশানক্ষেত্র কর্ডন করে রেখেছে বন্দুকধারী পুলিশ। একসঙ্গে ট্রাক বোঝাই মৃতদেহ গিয়ে পড়ছে সেখানে। জনতাকে বহুদূরে হটিয়ে দিয়েছে আর্মড ফোর্স।

পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালানো হয়েছে স্তূপীকৃত শবে।

রাত গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানক্ষেত্র থেকে সরে গেছে পাহারাদারেরা। পেছনের জঙ্গল চিরে, উঁচু ঢিবির মাটি আঁচড়ে কামড়ে উঠে আসছে একটা ছায়ামূর্তি।

শ্মশান থেকে হাতড়ে হাতড়ে কি যেন সংগ্রহ করে নিয়ে যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে।

পরদিন মিছিলের জন্য জমায়েৎ হয়েছে ছেলেরা, অমনি তাদের দিকে এগিয়ে এলো অগ্নিকন্যা পদ্মা। রাতের অন্ধকারে শ্মশান থেকে সংগ্রহ করা চিতাভস্ম নিয়ে নির্ভীক সংগ্রামীদের ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়ে বলল, এরা ভয় পায়নি, গুলির মুখে পিছিয়েও যায়নি, এরা রইল তোদের সঙ্গে। কোটালের বানের মত ভাসিয়ে লিয়ে যা ঐ গুলামের বাচ্চাগুলাকে।

সারান্দা বনভূমিতে ভ্রমণে গিয়ে রেঞ্জার সাহেবের বাংলোতে থাকার সময় আমি এক অত্যন্ত সপ্রতিভ বিদ্রোহিনী আদিবাসী কন্যাকে দেখি। সে এসেছিল তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে নির্বিচারে গাছকাটার প্রতিবাদ জানাতে।

ওঁরাও, মুন্ডা, হো সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা কৃষিকর্ম জানেনা। তারা আদিম যুগ থেকে বনবাসী। পশুপক্ষী শিকার, কন্দমূল ফল সংগ্রহই তাদের প্রধান জীবিকা। মহুয়া তাদের কাছে শুধু আনন্দদায়ক, উত্তেজক মদই নয়, অভাবের সময় আহার্যও বটে।

বন নির্বিচারে ধ্বংস হলে পক্ষী নীড় রচনা করতে পারবে না, পশু পাবে না তাদের স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র। তাছাড়া বনবাসীদের রোগ নিবারণের উপাদান, বনকন্যাদের অঙ্গসজ্জার কুসুম দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাবে।

ইজারাদারদের অন্যায়ভাবে বন ধ্বংসের প্রতিবাদ জানালো তারা। শেষে দৃপ্ত কণ্ঠে নেত্রী হুঁশিয়ারি দিল, অবিলম্বে সরকার থেকে এর প্রতিবিধান না হলে তারা নিজেরাই বাঁচার পথ বেছে নেবে।

আমি সেদিন আদিবাসী কন্যাটির মুখে চোখে, প্রতিবাদের দৃপ্ত ভঙ্গীতে বিদ্রোহিনী পদ্মার ছবি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম।

*

বনবাবু

মানুষটিকে আবিষ্কার করি ঢাকুরিয়া লেকে বেড়াবার সময়। সন্ধ্যার আয়োজন চলছিল তখন। চৈত্রমাস। আমার মাথার ওপর কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে হলুদ লাল সবুজে সাজানো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মণিকারের তৈরি শত শত মুকুট। আমি তখন প্রলুব্ধ হয়ে হাত বাড়িয়েছি। ফুল আমার নাগালের বাইরে হলেও গাছের প্রসারিত ডালখানা আমার হাতের সীমার মধ্যেই ছিল। আমি ফুলের লোভে ডাল ধরে টানাটানি শুরু করেছি। খানিকটা ডালপাতা ভেঙে এল আমার হাতে, ফুলের গুচ্ছ তেমনি রয়ে গেল নাগালের বাইরে। ঠিক সেই মুহূর্তে মানুষটি আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। একমুখ হাসি হেসে বললেন, ফুলের লোভ সামলানো দায়, তাই না?

আমি কেমন যেন একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসলাম। নিজেকে সেই মুহূর্তে কেন জানি না, কিছুটা অপরাধী বলে মনে হতে লাগল।

আবার প্রশ্ন, কাছাকাছি কোথাও থাকেন নিশ্চয়?

হাতে ধরে থাকা ভাঙা ডালখানা পথের ওপর ফেলে দিয়ে বললাম, এই গোলপার্কের কাছেই আমার বাড়ি।

এবার প্রসন্ন উচ্ছ্বাসে বললেন ভদ্রলোক, তাহলে তো আপনি আমার প্রতিবেশী মশাই।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, খুব কি তাড়া আছে?

বললাম, বেড়াতেই তো বেরিয়েছি, তাড়া নেই কিছু।

আপত্তি না থাকলে আসুন একটুখানি আলাপ করা যাক।

পাশেই একখানা বেঞ্চ খালি পড়ে আছে, ভদ্রলোক সেদিকে হাত দেখালেন।

আমরা দু'জনে সেদিকে এগোতে লাগলাম। উনি একটু পেছনে আর আমি সামনে।

বেঞ্চে বসতে গিয়ে হঠাৎ তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক সামনের লেকের জলের দিকে নেমে গেলেন। আশ্চর্য, তাঁর হাতে ধরা রয়েছে আমার ফেলে দেওয়া সেই ছোট ভাঙা ডালখানা!

ভদ্রলোক পাতাসমেত ডালটাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না, আস্তে করে যেন জলের বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

উঠে এসে একটু হেসে আমার পাশেই বসে পড়লেন।

এবার যেন আপনমনেই বলে উঠলেন, গাছ হলো প্রেম-প্রিয়াসী। ভালবাসাটুকু পাবার জন্যে কী ব্যাকুলতা তার।

তখনও আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। মানুষটিকে অদ্ভুত ঠেকছে। তবু আমার দিক থেকে কিছু একটা বলতে হয় তাই বললাম, আপনি গাছপালা নিশ্চয়ই খুব ভালবাসেন?

আমার দিকে ফিরে বললেন ভদ্রলোক, কে না ভালবাসে বলুন? এই যে একটু আগে আপনি ফুল তোলার চেষ্টা করছিলেন, সেটা ফুলের প্রতি আকর্ষণের জন্যেই তো।

তা ঠিক।

অভয় দেন তো একটা কথা বলি।

বলুন না। প্রাণ খুলেই বলুন, কোনও বাধা নেই।

ভদ্রলোক বললেন, আমি আপনার প্রতিবেশী। আপনার ছোট্ট মেয়েটিকে ধরুন আমি ভীষণ ভালবাসি। তাকে যদি কোনওদিন আদর করে কাছেপিঠে বেড়াতে নিয়ে যাই, দেবেন তো?

হেসে বললাম, ভালবাসা এমন জিনিস যেখানে না বলার উপায় নেই।

কিন্তু আমার স্বভাবটা যদি ভাল না হয় তাহলে পারবেন আমার সঙ্গে ছেড়ে দিতে?

সম্ভব নয়। অবশ্য যদি চুরি ডাকাতি করে নিয়ে যায় কেউ, সে আলাদা কথা।

ঠিক ওই কথাটাই আমি শুনতে চেয়েছিলাম আপনার মুখ থেকে।

একটু থেমে ভদ্রলোক বললেন, গাছের বেলাতেও ঠিক তাই। আপনি জোর করে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যেতে পারেন আবার ভালবাসা দিয়েও ফুল চেয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

বললাম, আপনার কথা শুনে সত্যি নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ আমার হাতের ওপর তাঁর হাতখানা রেখে বললেন, আরে না মশায় না। অপরাধ-টপরাধের আবার কী হল। ভালবাসেন, তাই তো এসেছেন ফুল তুলতে। তবে এমনভাবে ফুল তুলতে হবে যাতে মনে হয়, গাছই স্বেচ্ছায় আপনাকে তার ফুল দিচ্ছে।

বললাম, যেমন শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় দেখা গেছে।

ঠিক। একটি শিশু যখন তার কচি নরম হাতে ফুলটিকে ধরে তখন ফুলও ভালবেসে তার হাতটা ভরে দেয়, কিন্তু কাজের মানুষ যখন তাড়াহুড়ো করে ফুল টেনে ছিঁড়ে তোলে তখন ফুল ব্যথায় কাতর হয়ে বলে, আঃ আঃ, কী করছ! কী করছ!

ভদ্রলোকের কথার ধরন দেখে আমি মানুষটির ওপর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম।

আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই অনেক গাছ রয়েছে? প্রশ্ন করলাম।

ভদ্রলোক বললেন, না, পুজোর ফুলের জন্যে একটা টগর গাছ ছাড়া বারমাসের কিছু নেই।

কতক্ষণ মুখটা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন। একসময় মাথা তুলে সোজাসুজি আমার দিকে চেয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, খুনি দেখেছেন, খুনি?

বললাম, না মশায়, খুনিটুনি দেখিনি। তবে কাগজে খুনখারাপির অনেক খবর পড়ি।

ভদ্রলোক হঠাৎ নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এই যে দেখে নিন, আপনার সামনে বসে রয়েছে মস্ত বড় এক খুনি।

গা-টা হঠাৎ ছমছম করে উঠল. বলে কী লোকটা। সত্যি খুনটুন করেছে নাকি?

একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম. কী যে বলেন। আপনি খুনি হতে যাবেন কেন!

ভদ্রলোক বললেন, প্রাণ হরণ করলে যদি খুনি হয় তাহলে গাছেরও প্রাণ আছে। আর আমি হাজারে হাজারে সেই সব প্রাণহরণ করেছি। খুনি নয়তো কী?

বললাম. ঠিক বুঝতে পারছি না মশায় আপনার কথা।

এবার মনে হল ভদ্রলোক একটু সহজ হলেন। বললেন, বনের ইজারাদার ছিলাম ভাই। জীবনের অনেকগুলো বছর আমার কেটেছে বনের মধ্যে। বাপঠাকুরদার আমলের ব্যবসা। অনেক গাছকে নিষ্ঠুরের মতো হত্যা করতে হয়েছে।

বললাম, সে তো আপনার ব্যবসায়ের খাতিরে আপনাকে করতে হয়েছে, তাকে খুন বলছেন কেন?

গাছের আর্তনাদ তো শোনেননি ভাই। বিরাট বিরাট গাছ কাটার সময় ঘগ্ ঘগ্ ঘগ্ একটা শব্দ গুমরে উঠতে থাকে। তারপর কড়্ কড়্ কড়্ কড়্ ক-র-র...এমনি একটা আর্তনাদ তুলে বিরাট গাছটি মাটিতে আছড়ে পড়ে। ডালপালা পাতাপত্রে সে কী শোকের হাহাকার। এক সময়

থেমে যায়। তার শবদেহটাকে কেটেকুটে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন মশাই, রাতের পর রাত ঘুম থেকে চমকে বিছানায় উঠে বসতাম। নিহত শত শত গাছের আর্তনাদ আমার কানে বাজত।

বললাম, আপনি দারুণ সেন্টিমেন্টাল, তাই অকারণে কষ্ট পাচ্ছেন। গাছপালা অনাবশ্যক কাটা না হয় তা দেখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু প্রয়োজনে তাদের না কেটে উপায় থাকে না।

ভদ্রলোক বললেন, মা বাবা কারুর চিরদিন থাকেন না, তবু তাঁরা চলে গেলে আমাদের মন হাহাকার করে। প্রিয়জনের প্রতিটি দিনের সব খুঁটিনাটি আমাদের স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। ঠিক তেমনি গাছের বিয়োগও আমার মনের মধ্যে গভীর একটা আলোড়ন তোলে।

কৌতূহলী হয়ে বললাম, গাছেদের প্রতি আপনার অনুভূতি সত্যি অবাক করে দিচ্ছে আমাকে। ঠিক যেন সচেতন অনুভূতিশীল প্রাণী তারা।

নয়তো কী! ওদের ক্রিয়াকর্ম, অনুভূতির গভীরতা যদি দেখতেন তাহলে অবাক হয়ে যেতেন!

বললাম, আচার্য জগদীশচন্দ্রও তাই বলেছেন।

ভদ্রলোক বললেন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে বোঝার দরকার নেই, একটু চোখ থাকলেই দেখা যায় আর মন থাকলেই বোঝা যায়।

একটু থেমে বললেন, অনেক ঘুরেছি মশায় বনে বনে। প্রথমে প্রয়োজনে, পরে অপ্রয়োজনে। তাই গাছেদের ভাষা আর ভাব বুঝতে আমার কষ্ট হয় না।

ওদের অনুভূতি সম্বন্ধে দু'একটা কথা যদি বলেন তাহলে খানিকটা অনুমান করতে পারি।

ভদ্রলোক বলে চললেন, কত শোনাব ওদের কথা। বলে শেষ করা যাবে না। মামা তখন পালামৌ জেলাতে ডি. এম। ওঁর কাছে গিয়েছি বেড়াতে। একদিন ঘুরতে ঘুরতে এলাম একটা ডাকবাংলোতে। কোয়েল আর দানসা নদী এসে মিলেছে সেখানে। সন্ধ্যারাতেই চাঁদ উঠল। আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখন সবে তরুণ। ঘরের ভেতর বসে সন্ধে কাটাতে মন চায় না। আকাশ নীল। শরতের চাঁদ জলো দুধের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলোর বাইরে একচিলতে বাগান। একটা বেতের চেয়ার পড়েছিল, তার ওপর বসে পড়লাম। নদীর ধারে দুটো পত্রবহুল গাছ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বসে থাকতে থাকতে কানে একটা শব্দ এসে বাজল। কান পেতে শুনলাম, সাধারণ শব্দ নয়, মধুর এক ধরণের সংগীত। কোয়েল নদীর স্রোত যেন সেতার বাজিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে সঙ্গতে মেতেছে তীরে দাঁড়ানো গাছ দুটির বড় বড় পাতাগুলো। অতি ক্ষীণ সে শব্দ, কিন্তু কান পাতলেই শোনা যায়। ওপর থেকে ঝরে পড়ছে দুধে জ্যোৎস্না। সে যে কী অপূর্ব অনুভূতি কী বলব!

পরে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে বাতাসের সঙ্গে গাছের পাতার সংগীত আর সঙ্গত দুই-ই শুনেছি। ভোরের নীলাভ আলোর স্রোত পূর্ব দিক থেকে বয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পাখিরা জেগে উঠে আনন্দধ্বনি তুলত আর তার সঙ্গে সুরে তালে মেতে উঠত বনের শত শত গাছ। আবার কখনও শুধু গাছের ঐকতান শুরু হত। বিভিন্ন গাছের পাতা, শাখা প্রশাখার বিভিন্ন ধ্বনি। বাতাস তাদের ভেতর দিয়ে কখনও ধীর কখনও মধ্য দ্রুত লয়ে বইছে। গাছেরাও সুর তুলছে বিভিন্ন ধরনের। কিন্তু সব মিলে যেন নানা রকমের বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান বেজে উঠেছে।

হিমাচল প্রদেশের কুলুভ্যালিতে একসময় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেখানে থাকার জায়গা হয়েছিল এক ফরেস্ট বাংলোতে। পাইনের ঘন বন। সেই বনের ধারে বাংলো। বন পেরিয়ে দক্ষিণে সামান্য পথ গেলেই একটা পাহাড়ি ঝরনা দেখতে পেতাম। সেখানে বড় একটা পাথরের মসৃণ চাঁইয়ের ওপরে বসতাম। পাশেই একটা পপলার গাছ লম্বা হয়ে উঠে গেছে। মাথার দিকে কয়েকটা সরু সরু ডালের ওপর মাঝারি আকারের পাতা। সন্ধ্যায় কিংবা ভোরবেলায় আমি সেখানে গিয়ে বসলেই ঝরনা আর ওই পপলার গাছের পাতার নানা ধরনের কথাবার্তা শুনতে পেতাম। একটু বাতাস লাগলেই পপলার পাতার কাঁপন শুরু হয়ে যায়। ওরা যেন থামতেই জানে না। এদিকে ঝরনা তো কথার ভটচায্যি। দু'জনের কী নিবিড় আলাপ। নির্জনে দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা যেন কথা বলছে। আমি সেবার যে ক'দিন ছিলাম, ওদের ভালবাসার আলাপ শোনার জন্যে ওখানে গিয়ে বসতাম। কিন্তু দূর থেকে টিকা বা পাহাড়ি গাঁয়ের মেয়েরা যখন ঘাঘরা, চোলি পরে দোপাট্টা উড়িয়ে কলরব করতে করতে জল আনতে আসত তখন মনে হত যেন ওরা আলাপ বন্ধ করে দিয়েছে।

সেবার কুলু থেকে চলে আসার দশ বছর পরে আবার একবার লাহুল যাবার পথে ওখানে যাই। পুরনো স্মৃতি কি ভোলা যায়। ফরেস্ট বাংলোতেই ছিলাম। দশ বছরে ঘরদোরের চেহারাই বদলে গেছে। রঙে, পর্দায় ঝলমল। ওদিকে পাইন বনে কত নতুন অতিথি এসেছে। প্রাচীনরা সরে গেছে জায়গা ছেড়ে দিয়ে। তার চেয়ে বলা ভাল, বনবিভাগের লোকেরা ওদের সরিয়ে নতুনদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসেছে।

আমার হাতে সময় ছিল না। পরের দিন ভোরবেলাতেই রেঞ্জ অফিসারের জিপে এগিয়ে যেতে হবে। সন্ধ্যা নেমে আসছিল। ছুটলাম আমার সেই পরিচিত পুরনো প্রেমিকদের দেখবার জন্যে। খানিক পথ গিয়েই দেখা মিলল জায়গাটার। প্রথমে চিনতেই পারিনি। গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। তার নীচে সেই পাথরের চাঁই, কিন্তু ঝরনাটা গেল কোথায়! কপালে হাত ছুঁইয়ে চোখ ছোট করে অনেকখানি দূরে একটা ঝরনাকে বয়ে যেতে দেখলাম। আগের ঝরনা যেখানে ছিল সেখানে একটা নুড়িপাথর ছড়ানো খাত পড়ে আছে। হয়তো এই দশ বছরে আমার দেখা ঝরনাটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তার গতি পথ পালটে নিয়েছে। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল।

কিন্তু আমার বিস্ময়ের তখনও বেশ কিছুটা বাকি ছিল। আমি পাথরের চাঁইটার ওপর দাঁড়িয়ে গাছটাকে ভাল করে লক্ষ করলাম। বুকে যেন কে আমার হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিলে। এমন ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা আমি কোনও ব্যর্থ প্রেমিক মানুষের ভেতর দেখেছি বলে মনে পড়ল না। ওপরের অনেকগুলো ডাল ইতিমধ্যেই নিষ্পত্র হয়ে গেছে। নীচে দু'চারটে ডালে শুকনো পাণ্ডুর ক'টা পাতা জেগে আছে। ওরা মাঝে মাঝে হালকা বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে কিন্তু কথা বলছে না। এমন বিষণ্ণ, ব্যথাতুর মৃতপ্রায় চেহারা আমি আর দেখিনি। এ যেন প্রিয়ার ওপর অভিমানে আত্মহত্যার পথটি বেছে নিয়েছে ঋজুদেহী পপলার গাছটি!

তাই বলছিলাম, গাছ হলো মিলন-পিয়াসী। কোনও কারণে মনে দুঃখ পেলে সে পাতায় শাখায় হাহাকার তোলে। অতি বেদনায় আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়।

বললাম, কিছু যদি মনে না করেন, আপনার ধারণাকে ভুল বলছি না, কিন্তু এমনও তো হতে পারে ঝরনাটার জলেই পপলার গাছটার গোড়ার জমি ভিজে থাকত, ঝরনার স্রোত পথ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ওটা শুকিয়ে আসছিল।

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, আমি তা বিশ্বাস করি না। জলা জায়গা থেকে বহু দূরে সারি সারি

পপলার গাছকে আমি রাশি রাশি পাতার পোশাক পরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। সেখানে বিষণ্ণতা বা মৃত্যুর লক্ষণ নেই।

ভদ্রলোকের কথা আমাকে মেনে নিতে হল। বৈজ্ঞানিকেরা যে ব্যাখ্যাই দিন, প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞ চোখ আর সংবেদনশীল মন অন্য কথা বলে।

এবার ভদ্রলোক বললেন, গাছের আর ফুলের প্রেম-আনন্দের কত পরিচয়ই না আমি পেয়েছি।

কী রকম, দু'-একটা যদি বলেন।

ভদ্রলোক স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। একসময় ধীরে ধীরে বললেন, রাতের প্রথম যামে ফুল বড় মিলন-পিয়াসী হয়ে ওঠে। ছোট ছোট ফুল, গোধূলির সময়েও যাদের পাপড়ি বন্ধ থাকে হঠাৎ সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাপড়ি মেলতে দেখেছি। কতদিন বনের ভেতর বসে বেগুনি ছোট ছোট ফুলকে পাপড়ি মেলে তিরতির করে কাঁপতে দেখেছি। চাঁদের আলোয় সে কী কামনার শিহরন! মশায় চোখে না দেখলে বুঝবেন না। আমি সব কাজ ভুলে ওদের পরস্পরের মিলন প্রার্থনা চেয়ে চেয়ে দেখতাম। আমার মনে হত, ওরা এত কাছাকাছি থেকেও মিলিত হতে পারছে না সেজন্যে পরস্পরের কী বিরহ, কী আকুলতা।

শুধু গাছের প্রেম-বিরহ নয়, গাছকে মহাশক্তির কাছে প্রণত হতে দেখেছি। সে এক অভিজ্ঞতা।

বললাম, এমন তো কখনও শুনিনি বা দেখিওনি।

ভদ্রলোক বললেন, পূর্ণিমার রাতে যখন পূর্ণচন্দ্র আকাশে ঈশ্বরের প্রসন্ন করুণাঘন মুখের মতো প্রকাশিত তখন আপনার গ্রামের বাড়ির পরিত্যক্ত কচুর বনে গিয়ে দেখবেন, কী আশ্চর্য করজোড়ের ভঙ্গিতে কচুর পাতাগুলি ঈশ্বরকে তাদের অন্তরের নমস্কার জানাচ্ছে।

স্বীকার করলাম, এ অভিজ্ঞতা আমার হয়নি তবে নিশ্চয় এটি একটি চমকপ্রদ ঘটনা।

উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, খুব লক্ষ করে দেখবেন, কচুর পাতাগুলো অনেকখানি গুটিয়ে অঞ্জলির আকার নিয়েছে।

বললাম, বড় অদ্ভুত লাগছে আপনার কথাগুলো।

সত্যি কথা বলতে ভাই, পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের আলোয় দু'বার আমি এ দৃশ্য দেখেছি। অন্য সময় গিয়ে এ ছবি আমি দেখতে পাইনি।

বললাম, কিছু মনে করবেন না, সাধারণের দৃষ্টির সঙ্গে আপনার দৃষ্টির কিছু তফাত আছে।

তা জানি না। তবে আমার মনে হয় বৃক্ষকে যদি আমরা মনেপ্রাণে আমাদের আত্মীয় জ্ঞান করি তাহলে এসব ছবি সহজেই চোখের ওপর ফুটে উঠবে।

আপনার আর কোনও অভিজ্ঞতা?

বলে শেষ করতে পারব না ভাই। বেড়াতে তো আসেন, দু'চার দিন আসুন, বসে বসে গল্প করা যাবে।

একটু থেমে আবার বললেন, এই যে বড়র কাছে, মহতের কাছে নত হবার কথা হচ্ছিল না, তার আর একটা পরিচয় পেয়েছিলাম আন্দামানে।

আমি কৌতূহলী হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক বললেন, সমুদ্র তীরে পাহাড়ি এলাকায় উঁচু গাছগুলো হয়ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য শাখাপত্রের আন্দোলনও তেমন চোখে পড়ছে না। হঠাৎ নিজেদের ভেতর কী

যেন কানাকানি হয়ে গেল। অমনি শুরু হয়ে গেল আলোড়ন। ক্রমে বেড়ে উঠল আন্দোলন। তারপর একসময় উঁচু গাছগুলো মাথা নিচু করে সমুদ্রের দিকে প্রণামের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটে এল সাগর উত্তাল করা ঝড়। তাই বলছিলাম, বড়র কাছে বৃক্ষের নত হওয়ার ভাবটি দেখবার মতো।

পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে গেছে। লেকের মাঝে আইল্যান্ডটার গাছগাছালি লক্ষ্য করে ঝাঁক ঝাঁক কালো রঙের পানকৌড়ি উড়ে চলেছে। ভদ্রলোক সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, পাখিরা গাছের শাখায় বিশ্রামের জন্য চলেছে।

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রতিটি গাছ কিন্তু প্রত্যেক ধরনের পাখিকে আমন্ত্রণ জানায় না।

বললাম, কথাটার অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হল না।

পাঁচটা গাছ পাশাপাশি রয়েছে। সব ক'টি গাছই পাতাপত্রে সমৃদ্ধ, তবু দেখবেন টিয়ে পাখির ঝাঁকটা একটা বিশেষ গাছে বসেছে। বিভিন্ন রকম পাখিকে বিভিন্ন গাছ আমন্ত্রণ জানায় আন্তরিক ভাষায়। পাখিরা তা বুঝতে পারে। কেবল, ফলের আমন্ত্রণ নয়, আশ্রয়েরও আমন্ত্রণ।

আচ্ছা, পাখিদের কি গাছ ভালবাসে?

ভালবাসে মানে? সে ভালবাসার তুলনা নেই। গাছের শাখায় সকাল সন্ধে পাখিরা যখন গান করে বা নিজেদের ভেতর সারাদিনের কথাবার্তা বলে তখন গাছ এক ধরনের ঘরোয়া আনন্দ অনুভব করে। আবার দুষ্ট প্রাণীকে শাসন করতেও দেখেছি।

কী রকম?

আমার ইজারা নেওয়া জায়গার বাইরে অনেককালের একটা ছাতিম গাছ ছিল। আমি তার তলায় বসতাম প্রায়ই। সেই সূত্রে একটা কাঠবেড়ালির সঙ্গে পরিচয় হয়। সে ওই গাছের একটা কোটরে বাস করত। আমার দিকে পিটপিট করে তাকাত। কখনও নীচে, কখনও ওপরের ডালে লেজ তুলে তুলে ছুট লাগাত। কিছুদিন পর সে নির্ভীক হয়ে গেল। আমি ওকে সাহসী আর আত্মীয় করে তোলার জন্যে প্রতিদিন কিছু না কিছু খাবার পকেটে করে নিতে যেতে লাগলাম। খাবারের লোভ দেখিয়ে এমনি করে কাছে টানলাম। প্রথমে বাদাম কিংবা ছোলা ছড়িয়ে দিলেও ছুটে আসত না। ছাতিম গাছের পাতার আড়াল থেকে আমাকে পর্যবেক্ষণ করত। তারপর আমার চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলে ও নেমে আসত নীচে। ছুটে ছুটে খাবার কুড়িয়ে খেত, আবার এক নিমেষে তিরতির করে গাছের ওপর উঠে যেত। ছাতিম গাছটি মনে হত, হাজার পাতার চোখ মেলে ব্যাপারটা উপভোগ করছে।

একদিন আমি কাঠবেড়ালিটাকে এমনি করে খাওয়াচ্ছি। সে-ও ছুটে ছুটে খেলা দেখিয়ে খাচ্ছে। গাছের পাতাপত্রের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোটা আনন্দের ঝরনা হয়ে এসে পড়েছে খেলার জায়গায়, এমন সময় একটা অঘটন ঘটল।

একটা কাক খাবার লোভে উড়ে এল সেখানে। বোধহয় কাঠবেড়ালিটাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তাড়া করল। হঠাৎ বুনো কাকটার রাগ চড়ে যেতে সে ছোঁ মেরে কাঠবেড়ালিটাকে ধরে নিয়ে গাছের একটা ডালে উঠে গেল। আমি ব্যাপারটা বুঝে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই দেখলাম, গাছের একটা ডালের ঝাপটা এসে পড়ল কাকটার ওপর। অমনি ঠোঁট থেকে খসে পড়ল কাঠবেড়ালিটা। গাছের বাড়ি খেয়ে কা-কা আওয়াজ তুলে উড়ে গেল কাকটা।

একটু থেমে আবার বললেন, এমনি আরও একটা ঘটনার কথা আমি জানি।

বললাম, সত্যি আপনার অভিজ্ঞতার তুলনা নেই।

ভদ্রলোক বললেন, কত ঘটনা ঘটছে আমাদের চারদিকে, একটুখানি চোখ মেলে রাখলেই কতকিছু দেখা যায়। শুনুন আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার কথা। মানুষের বিজ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যাবে কিনা জানি না।

সে সময় ছিলাম বীরভূমের খোয়াই অঞ্চলে। বর্ষাকাল। গেরুয়া রঙের জলধারা খাল বেয়ে ঘুরে ঘুরে চলেছে। আমি যেখানে ছিলাম তার একটু দূরে সাঁওতাল পল্লী। ভোরবেলা সাঁওতাল ছেলেরা মোষের পিঠে চড়ে আমার আস্তানার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেত। দুপুরে প্রায় প্রতিদিনই একটি কিশোরকে আমার বাসার সামনে মোষ চরাতে দেখতাম। সে অদূরে একটা তালগাছের তলায় বসে আপন মনে বাঁশি বাজাত। কখনও বা গাছটাকে জড়িয়ে ধরে পাক খেত। কখনও বা হেলান দিয়ে দাঁড়াত। বাতাসে তালের পাতা আন্দোলিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করত। আমি বেশ বুঝতে পারতাম ওই কিশোর আর গাছের ভেতর নিবিড় একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

একদিন সকাল থেকে বাদল ছেয়ে এসেছিল। কিছু দূরে তালগাছে ঘেরা জলার ভেতর মোষগুলো গা ডুবিয়ে আরাম করছিল। ওই ছেলেটাকে অল্প বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একসময় তালগাছটার তলায় চলে আসতে দেখলাম। তখন গাছটা ঝড়ো বাতাসে দুলছিল। ছেলেটা গাছ ধরেই দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ একটা চেঁচানি আমার কানে এল। আমি দরজার বাইরে এসে ভাল করে চেয়ে দেখলাম, ছেলেটা মাটিতে থেবড়ে বসে কাতরাচ্ছে। কী হলো, দেখার জন্যে আমি জোরে পা চালিয়ে গাছতলায় গেলাম। ব্যাপারটা গুরুতর। এত উঁচু থেকে একটা পাকা তাল এসে পড়েছে ওর পায়ের ওপর। পা'টা জখম হয়েছে ঠিক কিন্তু তালটা যে মাথায় পড়েনি, এই রক্ষে। বৃষ্টি আর ঝড়ে ভিজতে ভিজতে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে আমি বাসায় এলাম। ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার ওপর ভর রেখে সারা পথ হেঁটে এল। আমি ওকে দাওয়ায় বসিয়ে রেখে ঘরের ভেতর থেকে হোমিওপ্যাথির একটা ওষুধ আনতে গেলাম। ওষুধ খোঁজার ফাঁকে জানালা দিয়ে দেখলাম, ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। তালগাছটা ঘন ঘন শরীর দুলিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে অদৃশ্য কোন শক্তির হাত থেকে যেন আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে।

ওষুধ নিয়ে আমি বেরিয়ে আসতে না আসতেই সারা আকাশ চিরে আলোর একটা তলোয়ার ঝলসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর গর্জন করে আকাশ ভেঙে পড়ল বাজ। সেই মুহূর্তে দারুণ চমকে উঠেছিলাম। কানের পরদা যেন ফেটে গেল। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে দেখি, বাজ পড়েছে সামনের তালগাছটার ওপরেই। দাউ দাউ করে গাছটা প্রথমে জ্বলে উঠল, তারপর বৃষ্টিতে আগুন ধীরে ধীরে নিভে গেল। ছেলেটার দিকে চেয়ে দেখলাম, তার চোখেমুখে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই, কান্নার একটা ঢেউ দু'চোখ ছাপিয়ে উপচে পড়ছে।

পরের দিন গাছটার কাছে গিয়ে দেখি, ওপর থেকে তলা অবধি গাছটাকে কে যেন চিরে দিয়ে গেছে। বজ্রের কী অসীম ক্ষমতা!

কিন্তু আমি ওই তালগাছটার মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আর একটা অনুভূতির স্পর্শ পেলাম। গাছটা বাজের ঘায়ে মৃত্যুর হয়তো একটা পূর্বাভাস পেয়েছিল। তাই সে তার একটা ফল আগেই প্রিয়জনের ওপর ফেলে দিয়ে সাময়িক আঘাতের পরিবর্তে মহামৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাতে চেয়েছিল।

একটু থেমে ভদ্রলোক বললেন, আমরা বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু বিচারের চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণের জগতটা কত ছোট আর তার বাইরের জগতটা কী বিশাল!

বললাম, আপনার অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা এই বৃক্ষজগতের বিষয়ে এত বেশি যে আমার কোনও বিচার বিশ্লেষণ সেখানে অবান্তর বলে মনে হবে।

জানেন ভাই, কলাগাছগুলো হেলে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি তাকালেই দেখতে পাই যেন জননী দাঁড়িয়ে আছেন ফল দেবার জন্য।

আপনার অনুভূতিটি বড় সুন্দর।

ভদ্রলোক লেকের জলের দিকে চেয়ে বললেন, সুন্দর অসুন্দর জানি না, তবে আমি যা অনুভব করি তা বিশ্বাস করি ভাই! এই যেমন কেরালার পাহাড়ি এক দারুচিনি বনে আমি সারারাত নাচের ঘুঙুরের শব্দ শুনেছিলাম।

কী রকম? অলৌকিক কোনও ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে!

না, অলৌকিক কোনওকিছু নয়। রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। জ্যোৎস্নায় আশ্চর্য মায়াময় হয়ে উঠেছে দারুচিনি বন। সারা বন জুড়ে একটা মৃদুমধুর শব্দ উঠেছে। ঠিক যেন এক দল নর্তকী নাচছে, আর তাদের পায়ের নূপুর বেজে চলেছে ঝিনি ঝিনি, ঝিনি ঝিনি, ঝিনি ঝিনি!

এর কোনও ব্যাখ্যা কি পেয়েছেন?

হ্যাঁ, গাছে গাছে ঘর্ষণের ফলে এমনি এক ধরনের শব্দ ওঠে। হয়তো ওটা ওদের একরকমের আনন্দধ্বনি।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠছিল। লেকের থেকে একটা বাতাস বয়ে এসে আমাদের মাথার ওপরের ডালপালা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। আশেপাশের গাছের পাতাগুলো যেন পরস্পরের সঙ্গে কলকল শব্দে কথা বলে উঠল। আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

ভদ্রলোক বললেন, আবার দেখা হবে।

আমি তখন বৃক্ষের সংসার নিয়ে সত্যিই মোহগ্রস্ত। বললাম, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আপনার অশেষ, যত নেব ততই আমার লাভ। আপনি আমাকে সত্যি নতুন এক জগতের সন্ধান দিলেন।

ভদ্রলোক হাত তুলে বিদায় নিয়ে অন্য রাস্তা ধরলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, এমন মানুষ আমি দেখেছি যারা প্রতিবেশী বা আত্মীয় হিসেবে মানুষের চেয়ে গাছপালার সান্নিধ্যই বেশি পছন্দ করে।

বললাম, এরপর দেখা হলে ওদের কথাই আপনার কাছে শুনব।

পরের দিন ভদ্রলোক আবার গল্প শুরু করলেন ঃ—

খাজুরাহো মন্দির দেখে ফিরছিলাম বাসে। ছোট বড় উচ্চাবচ পাহাড়ি ভূমি। তার গায়ে কোথাও ঝোপ, কোথাও ছোটখাটো বন। খাজুরাহো মন্দিরের গায়ে ভাস্কররা কত মূর্তিই না খোদাই করেছে। দেশ-বিদেশের কত মানুষজন সেইসব মূর্তি অবাক হয়ে লক্ষ করছে। আমিও রুক্ষ প্রান্তরে সারাদিন ঘুরে ঘুরে তাই দেখেছি। ভাল লেগেছে নিশ্চয়ই, তবে মূর্তির চেয়ে মন্দিরের সমগ্র গঠনটা আমাকে বেশি স্পর্শ করেছিল। সে যাই হোক ফেরার পথে ওই ঝোপঝাড় দেখতে দেখতে আমি দারুণ খুশি হয়ে উঠলাম। মন্দিরের পাষাণদেহে প্রাণ ফোটাবার চেষ্টা করেছে শিল্পীরা আর এই পাষাণ-প্রান্তরে সবুজ প্রাণের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন অদৃশ্য এক শিল্পী। কাকে ফেলে কাকে দেখি। মধুর মতো অপরাহ্নের আলো লুটিয়ে পড়েছে প্রান্তরে। একটা হাওয়া বয়ে চলেছে প্রান্তরের বুকে ঢেউয়ের মতো। ওই তো টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে একটা লোক

সূর্যাস্তের দিকে চলেছে। ক'টি মেয়ে মাথায় ঘড়া বসিয়ে চলে যাচ্ছে গাঁয়ের পথে। এক ঝাঁক পাখি হুই হুই করতে করতে উড়ে গেল। এ দৃশ্য, এ অনুভূতি, এ সৌন্দর্যের কি শেষ আছে!

ভূপালে গেলাম বাসে, সেখান থেকে চলে গেলাম মাণ্ডুপুরা। সেখানে ডাকবাংলোতে জায়গা পেয়ে থেকে গেলাম। পরের দিন শেষবেলায় একটা গাছের তলায় বসে আমি সূর্যাস্ত দেখছিলাম, হঠাৎ একটা একতারার সুর আমার কানে এসে বাজল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি গলার অপূর্ব ভজন। এমন নির্জন বাংলোর চত্বরে কে গান গায়। অনেকক্ষণ গায়িকা আপন মনে গান করে চললেন। গিরিধারী নাগরকে নিয়েই গান। মনে হল, আমি গান শুনছি না। কৃষ্ণের চরণে মীরার আত্মনিবেদনের ছবিটি দেখছি।

এক সময় গান থামল। সূর্য অস্ত গেছে কখন, সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরে দিল শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ।

গাছতলা থেকে উঠে আসছিলাম বাংলোর দিকে, হঠাৎ সাধিকা রম্ভাবাইকে দেখতে পেলাম। নামটা পরে জেনেছিলাম বাংলোর চৌকিদারের কাছ থেকে। যৌবনের শেষ সীমায় তখন রম্ভাবাই। কিন্তু এমন অভিভূত করা উজ্জ্বল মূর্তি আমি আগে কখনও দেখিনি। সাদা থান তাঁর পরণে। মাথায় ওড়নার অবগুণ্ঠন। হাতে একতারা নিয়ে সামনের জ্যোৎস্না-প্লাবিত ঝিলের দিকে চেয়ে বসে আছেন। প্রান্তরের এক অংশে ঝিল। চাঁদের জোৎস্নায় ঝিলমিল করছে ঝিলের জল। ঝিলের তীরে অজস্র কাঞ্চন ফুলের সমারোহ। দুপুরে দু'চোখ ভরে সাদা আর পিঙ্ক রঙের কাঞ্চনফুল দেখেছি।

আমার পায়ের সাড়া পেয়ে আমার দিকে চোখ ফেরালেন রম্ভাবাই। চোখে কী প্রসন্ন গভীর দৃষ্টি। তাঁর প্রথম কথা, তুমি তো উদাস হো।

আমি বললাম, স্রেফ এক লকড়ির কারবারী আমি। ধান্দাবাজ ব্যাপারী বলতে পারেন। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে চালান দিই। আমি কী করে উদাসী হলাম দিদিজি?

রম্ভাবাই তাঁর নিজের ভাষায় যা বললেন তার অর্থ, তোমার আঁখি বলছে তুমি উদাসী। গাছকে তুমি ভালবাস। তার ছবি তোমার চোখের আয়নায় ধরা পড়েছে। তুমি কাম করতে করতে নাম করো কিষণজির।

কথা শেষ করে উনি পাশে বসতে বললেন। আমি একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসলাম। বসেই বললাম, আমাকে আপনি উদাসী বললেন, কিন্তু আসল উদাসী তো আপনি।

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন রম্ভাবাই, নেহি নেহিরে ভেইয়া, ম্যায় উদাসী নেহি, ম্যায় তো কিষণজিকা দাসী হুঁ।

সামান্য সময় দু'জন চুপ করে থাকার পর আমি বললাম, দিদিজি একটা গান শোনাবেন?

হেসে বললেন, গান শুনতে যে ভালবাসে তার সিদ্ধির পথ তো অনেক সহজ হয়ে গেছে। চলো ওই ঝিলের ধারে বসে গান শোনাই।

আমরা প্রান্তরে নেমে ঝিলের ধারে এলাম। একটি বটগাছের তলায় পরিষ্কার জমি দেখে বসলাম। চাঁদের আলোয় চরাচর উজ্জ্বল আর স্নিগ্ধ। সামনে ডানদিকে কাঞ্চন ফুলগুলো জ্যোৎস্নায় মায়াময় হয়ে উঠেছে। ঝিলের বুক ছুঁয়ে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে আসছে। ফুলগুলো সরু সরু ডালপাতার ওপর হেলেদুলে নর্তকীর মতো নাচছে।

গান ধরার আগে রম্ভাবাই ফুলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, দেখো ভেইয়া, রাধারানি, আমার কিষণচাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন নাচছে।

বলতে বলতেই একতারা বাজিয়ে গান ধরলেন—

'ও মেরে ফুলিয়া
ও মেরে সেঁইয়া
শুন্ মেরে থেরিয়া বাতিয়া,
ম্যায় হি কহতি হো
তুমি হো রাধা
ঠাহর ন চপল তু রোখ যা।'

বেশ বুঝলাম, গান গাইতে গাইতে আবেশে বিহ্বল হয়ে গেছেন রম্ভাবাই। এক সময় গাইতে গাইতে উঠে দাঁড়ালেন। নাচের ভঙ্গিতে ফুলগুলোকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।

আমি স্পষ্ট দেখলাম, ফুলগুলোর দুলুনি বন্ধ হয়ে গেছে। তারা স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে।

রম্ভাবাই গান থামিয়ে কী যেন দেখলেন। হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন আমাকে। কাছে যেতে বললেন, দেখো দেখো ভাইয়া, ফুল কেমন প্রার্থনা জানাচ্ছে।

সেই প্রথম আমি তাঁর কাছ থেকেই জানলাম, ফুল প্রার্থনা জানায়, পাতা নমস্কারের ভঙ্গিত ঊর্ধ্ব দিকে তাকিয়ে থাকে।

আবার গাইতে লাগলেন রম্ভাবাই—

'ফুলুয়া তুহারি রূপ দেখতি
মেরে মনকা সুহাসি,
তুহুঁ হ্যায় কিরণকা সাঁহাসী।'

ভদ্রলোককে আমি বললাম, মশায় রম্ভাবাইয়ের গানগুলো আপনি মনে রাখলেন কী করে?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, অনেক কিছুই আমি মনে রাখতে পারি না। আত্মীয় বন্ধুর নাম, অথবা কোনও ঘটনার কথা আমি বেমালুম ভুলে যাই। কিন্তু ভুলি না সে-সব কথা যা আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তবে মশায় কাজ চালাবার মতো হিন্দি জানি, তাতে শব্দের ভেতর ভুলভাল থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বললাম, রম্ভাবাইয়ের কথা যা বললেন তা বেশ চমকপ্রদ।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, এটুকু শুনেই মন্তব্য করছেন! ওঁর জীবনের অনেক ঘটনাই সেদিন ওই ঝিলের ধারে জ্যোৎস্না রাতে গাছতলায় বসে আমার শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল।

বললাম, রম্ভাবাইয়ের বিষয়ে আরও কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে। বড় আকর্ষণীয়া এই নারী।

ভদ্রলোক বললেন, স্রেফ কদম গাছ আর কৃষ্ণকে ভালবাসতে গিয়ে তিনি প্রতিটি বৃক্ষকেই ভালবেসে ফেললেন। এখন গাছ দেখলেই কদম আর তার তলায় বাঁশি হাতে দাঁড়ানো কৃষ্ণের রূপটি ওঁর চোখে ফুটে ওঠে।

বললাম, সাধিকাদের এমন ভাবান্তর হয় বলেই শুনেছি।

ভদ্রলোক বলে চললেন, যোধপুর শহরের কাছাকাছি চুরুল গ্রামে রম্ভাবাইয়ের পৈতৃক নিবাস ছিল। বড় পরিবারের মেয়ে ছিলেন ইনি। রাজস্থানের যোধপুর শহরে ওঁর বাবা ঠাকুর সাহেবের নাম সকলে এক ডাকে চিনত। সেই খানদানি বাড়ির মেয়ে রম্ভাবাই একবার তাঁর মাতামহীর সঙ্গে বৃন্দাবনে যান। তখন কিশোরী বয়েস কিন্তু রূপ দেখে চোখ ফেরানো যেত না। যেখানে দিদিমার হাত ধরে কিশোরী রভাবাই যেতেন সেখানকার মানুষজন ওঁর মুখের দিকে

চেয়ে চেয়ে বলত, কৃষ্ণের খোঁজে রাধারানি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মন্দিরে, অলিতে গলিতে, যমুনা তীরের কুঞ্জে কুঞ্জে সকলের মুখে এক কথা, স্বয়ং রাধারানি বৃন্দাবনে এসেছেন।

মন্দির চত্বরে একদিন গান হল। গোস্বামীদের অনুরোধে কিশোরী রম্ভাবাই গিরিধারীকে ভজন শোনালেন। সে কী কণ্ঠ! গান নয় যেন স্বয়ং রাধারানির আকুতি শ্যামসুন্দরের চরণে ঝরে ঝরে পড়ছে।

যে কদিন বৃন্দাবনে রইলেন রম্ভাবাই সে কদিন ঠাকুরকে ভজন শোনাতে হল। শুধু কি গিরিধারী শুনলেন? তামাম বৃন্দাবনবাসী ভেঙে পড়ল রম্ভাবাইয়ের গান শুনতে। দই, ছানা, ক্ষীর, লাড্ডু, মেঠাই স্তূপাকার হয়ে গেল তাঁর আস্তানার সামনে। ভালবেসে রাধারানিকে ভোগ দিয়েছে বৃন্দাবনবাসী। এই ভালবাসার দান ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। উপস্থিত দর্শনপ্রার্থীদের হাতে হাতে সে সব বিলিয়ে দেওয়া হত।

নাতনির বৈভব দেখে দিদিমা খুশি হয়েছিলেন কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি কিশোরী মেয়েটির অবচেতন মনে ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

একদিন যমুনার কূলে কদম্ব বৃক্ষের তলায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সঙ্গিনীদের বলে উঠলেন, ওই তো কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সবাই অবাক হয়ে বলল, কোথায়, কোথায়?

ওই তো, ওই তো, বাঁশি হাতে নিয়ে হাসছে। ওই তো বনের ভেতর চলে যাচ্ছে!

রম্ভাবাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকতে ডাকতে সারা কদম্ব বন তোলপাড় করে সেদিন কিষণজির সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলেছিলেন।

প্রায় একটি ঘণ্টা সেই যমুনাতীরের বনে সেদিন কৃষ্ণের সঙ্গে ভাবলোকে খেলেছিলেন রাধারানি, কিন্তু সেই খেলা যোধপুরে ফিরে গিয়েও আর ভাঙল না। কিশোরী রম্ভাবাই তখন মনে মনে সত্যিকারের রাধারানিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। এ যেন আর এক মীরাবাই।

ঠাকুরসাহেবের মহল সংলগ্ন বিরাট বাগিচা। ওই বাগিচা এখন রম্ভাবাইয়ের চোখে বৃন্দাবন। তিনি ওই বাগিচার গাছের আড়ালে খোঁজেন গিরিধারীলালকে কিন্তু এখানে তিনি দেখতে পান না প্রাণের প্রভু কৃষ্ণকে। কাঁদেন আর খোঁজেন। একদিন বর্ষা ঘনিয়ে এল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল মেঘের বুক চিরে। রম্ভাবাই একটি গাছ বেষ্টন করে মেঘের দিকে অপলক চেয়ে রইলেন। শ্যামল মেঘের মধ্যে ওই তো শ্যামরায়ের দেহকান্তি। আকুল কান্নায় বুক ভেসে যেতে লাগল তাঁর। আকাশের বর্ষণ মিশে গেল তাঁর কান্নার সঙ্গে।

সহসা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন বৃন্দাবনে দেখা সেই পুরুষ। এ যে তাঁর কৃষ্ণমনোহর। রম্ভাবাইয়ের হাত ধরে কিষণজি বললেন, এমন করে কাঁদছ কেন, এই তো আমি তোমার কাছে এসেছি।

বলতে বলতে মুরলীমনোহর রম্ভাবাইয়ের চোখের জল মুছে দিলেন। বললেন, এসো, এই গাছতলার বেদিতে আমরা বসি।

রম্ভাবাই দোপাট্টাখানা বিছিয়ে দিয়ে বললেন, গিরিধারী, ভিজে মাটিতে তোমার পোশাক নষ্ট হয়ে যাবে, তুমি ওই দোপাট্টাখানার ওপর বসো।

কিষণজি হেসে আকাশের দিকে আঙুল দেখালেন। কোথায় মেঘ, কোথায় বৃষ্টি, আকাশে চাঁদ হাসছে।

এবার রম্ভাবাইয়ের হাত ধরে বললেন, এসো তোমার বাগিচাখানা ঘুরে দেখি।

ওঁরা দু'জনে হাত ধরে প্রতিটি গাছের পাশ দিয়ে হাঁটলেন। রম্ভাবাইয়ের অন্তর আনন্দে আকুল। তাঁর আনন্দকিশোর আজ তাঁর কাছে ধরা দিয়েছেন।

এক সময় ওঁর বাগিচার অনেক ভেতরে গিয়ে একটি অশোক গাছের তলায় বাঁধানো বেদিতে পাশাপাশি বসলেন। সদ্য বর্ষাধোয়া পাতাগুলি চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে।

কিষণজি বললেন, এতদিন তোমার কাছে আসতে না পেরে বড় কষ্ট হচ্ছিল।

রম্ভাবাই বললেন, তাহলে আসনি কেন? আমি তো পাগলের মতো তোমাকে ডাকছি।

ওই জন্যেই তো আমার আসা হয়ে ওঠেনি।

সে কী রকম প্রভু, ডাকলে তুমি আসবে না?

তেমন করে ডাকলে না এসে কি থাকতে পারি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রম্ভাবাই বললেন, কেমন করে ডাকলে তুমি কাছে আসবে তাই আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাও। তোমাকে ডাকতে গিয়ে আমি তো শুধু চোখের জল ফেলি।

কিষণজি রম্ভাবাইয়ের দুটো হাত ধরলেন। কাছে আকর্ষণ করে মধুর হাসি হেসে বললেন, দেখ তো চেয়ে আমার মুখে কি কান্নার ছাপ আছে?

না।

তবে?

তুমি আনন্দময়।

কিষণজি বললেন, আমার জগৎ আনন্দে ভরা। আমাকে পেতে গেলে গভীর আনন্দের ভেতর দিয়েই পেতে হবে। নিজেকে আনন্দময়ী করে তোলো, তবেই সহজ হয়ে যাবে তোমার পাওয়া।

রম্ভাবাই মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, আমি আর কাঁদব না।

কিষণজি বললেন, চারদিকে তাকিয়ে দেখো, আনন্দ। কচি চারাগাছটি কেমন বাহু তুলে আকাশকে বলছে, আমি তোমার আলো হাওয়ায় খেলতে চাই, তোমার মেঘের জলে নাইতে চাই। তার ওই আনন্দই শাখায় শাখায় ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে।

একটু থেমে আবার বললেন কিষণজি, যদি তুমি আনন্দের ওই শ্যামল সুন্দর বৃক্ষরূপটিকে ভালবাসতে পারো, তাহলেই তার ভেতর আমাকে দেখতে পাবে।

অনেক রাতে ঠাকুর সাহেবের বাড়ির লোকেরা হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখতে পেল, রম্ভাবাই অঘোরে ঘুমিয়ে আছে একটা গাছের তলায়। মুখে লেগে আছে এক টুকরো দিব্য হাসি।

মেয়ে তরুণী, বিবাহযোগ্যা। কিন্তু পুরুষ প্রসঙ্গে নিস্পৃহ। এ বয়সে মেয়েদের যে ধর্ম তার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করছে রম্ভাবাই। রাত্রি দিন ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগিচার গাছপালার ভেতর। মনে হচ্ছে এ সংসারে বৃক্ষরাই তাঁর আত্মীয়।

ঠাকুরসাহেব সব দেখে শুনে ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি আদেশ দিলেন, বাগিচার সব গাছপালা কেটে মাঠ করে ফেলা হোক।

ঠাকুরসাহেবের আদেশ প্রতিপালিত হল। অন্দরমহলে কান্নায় ভেঙে পড়ল রম্ভাবাই। গাছ নইলে, বন নইলে সে তো এক মুহূর্তও বাঁচতে পারবে না।

বিয়ের পাত্র খুঁজতে লাগলেন ঠাকুরসাহেব আর ঘর থেকে পালানোর পথ খুঁজতে লাগলেন রম্ভাবাই।

একখানি একতারা সম্বল করে রম্ভাবাই এক অন্ধকার রাতে ঘর ছাড়লেন। আশ্চর্য, তাঁকে গোপনে গৃহত্যাগে সাহায্য করলেন যিনি তিনি ছিলেন তাব প্রার্থী। ঠাকুরসাহেবের দোস্ত জায়গিরদার সুরীন্দর সিং-এর ছেলে রণধীর সিং।

গোপনে এক মন্দির চত্বরে রম্ভাবাই রনধীরের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। নির্জনে সে সাক্ষাৎকার ঘটল।

রম্ভাবাই বললেন, আপনি আমাদের পরিবারের বন্ধু ছিলেন এখন পরম আত্মীয় হতে চলেছেন, তাই নয় কি?

রণধীর বললেন, সত্য, অবশ্য ও বিবাহে যদি তুমি সুখী হও।

অমনি মাথা নেড়ে জানাল রম্ভাবাঈ, সে সুখী নয় এ বিয়েতে।

বিস্মিত রণধীর প্রশ্ন করলেন, আমি অযোগ্য বলেই কি তোমার এই উপেক্ষা?

রম্ভাবাই দুটি হাত জোড় করে বললেন, আমাকে ও কথা বলে অপরাধী করবেন না। ছেলেবেলা থেকে আপনাকে চিনি, আপনার কৃতিত্ব, যোগ্যতা আমার অজানা নয়। বরং যোগ্যতার বিচারে আমি আপনার সঙ্গী হতে পারি কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে আমার মনে।

হাসলেন যুবক রণধীর। বললেন, উভয় পরিবারের অভিভাবকেরা এই বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। তাই আমার নিজস্ব কোনও মতের প্রশ্নই আসে না এখানে। তবু বলি, রাজপুতানার যে কোনও রাজপ্ররিবার তাঁদের অন্দরমহলে তোমাকে বধূরূপে পেলে ধন্য মনে করবে রম্ভাবাই।

কোনও রাজপরিবারে বধূ হয়ে যাবার আগ্রহ আমার নেই জানবেন। আমি আপনার গৃহে যেতে পাবলে ধন্য মনে করতাম, কিন্তু...।

কিন্তু কী রম্ভাবাই?

আগে একটা প্রতিশ্রুতি দিন তাহলে সবকথা খুলে বলব।

কীসের প্রতিশ্রুতি?

আমাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

রণধীর বললেন, আমার সাধ্যের মধ্যে হলে অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব।

অভিভূত রম্ভাবাই বললেন, সত্যি আমাকে সাহায্য করবেন?

তুমি তো জানো রম্ভাবাঈ রাজপুতের কথার খেলাপ হয় না।

আমি এই সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্তি চাই। যোধপুর ছেড়ে বহুদূরে চলে যাব আমি। আমার এই পরিকল্পনায় কেবল মাত্র আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রণধীর বললেন, আমি যখন কথা দিয়েছি তখন আমি কথা রাখবই। তবে তোমার এই গৃহত্যাগের কারণটুকু জানাবে কি?

আমি অরণ্যপত্রের মত শ্যাম শোভাময় কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্ত। বনই আমার আবাস। কৃষ্ণই আমার একমাত্র পুরুষ।

রণধীর বললেন, কবে যেতে চাও এবং কোথায়?

কোনও কিছুই স্থির করিনি। এক রাতে গৃহত্যাগ করব এই বাসনাই ছিল মনে।

মৃদু হেসে বললেন রণধীর, পায়ে হেঁটে ঠাকুরসাহেবের সন্ধানী অশ্বারোহীদের কি এড়িয়ে যেতে পারবে?

রম্ভাবাঈ বললেন, সে কথা তো ভাবিনি। শুধু ঘর ছেড়ে চলে যাবার কথাই ভেবেছিলাম।

রণধীর একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আজ রাতে চৌমাথার মোড়ে বটবৃক্ষের তলায় আমি দুটি ঘোড়া নিয়ে আসব। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করব ওখানে। আশা করি তার ভেতরেই তুমি প্রস্তুত হয়ে আসতে পারবে।

মাথা নাড়লেন রম্ভাবাই। সারারাত দু'জনে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পৌছোলেন এক পার্বত্য বনভূমির পাদদেশে।

ভোরের আলো ফুটলে রণধীর বললেন, আমাকে ঈশ্বর যেন ক্ষমা করেন, আমি তোমাকে একা এই নির্জন বনভূমির প্রান্তে পরিত্যাগ করে যাচ্ছি।

রম্ভাবাই বললেন, আপনি নির্ভাবনায় ফিরে যান। বনভূমি কোনও দিনই আমার কোনও অনিষ্ট করবে না। অরণ্যবৃক্ষের সঙ্গে আমার প্রভু যে অভিন্ন।

রণধীর বললেন, তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে আমার কোনও দায়িত্ব নেই জানি, তবু মনে হয়, নিদ্রাহীন ক্লান্ত অভুক্ত এক নারীকে আমি অরণ্যে ত্যাগ করে গেলাম।

হেসে বললেন রম্ভাবাই, প্রভু যার রক্ষক তার চেয়ে নির্ভয়ে কে বিচরণ করতে পারে। আর প্রভুর নামগান সারাক্ষণ যার অন্তরে তার নিদ্রা জাগরণ সবই ক্লান্তিহীন। যিনি সামান্য কীটেরও আহার জোগাচ্ছেন তিনি আমারও আহারের ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনি নির্ভাবনায় ফিরে যান।

রণধীর দুটি অশ্ব সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন। যাবার সময় রম্ভাবাঈ নত হয়ে নমস্কার করে বললেন, চিরদিন আমার প্রভুর নামের সঙ্গে আপনার নাম গাঁথা হয়ে থাকবে। আপনিই আমাকে তাঁর আশ্রয়ে পৌছে দিয়ে গেলেন।

আবার সেই বন। অপরিচয়ের অন্ধকার নেই। সবাই যেন জন্মজন্মান্তরের আলোকে উদ্ভাসিত। বনের ভেতর প্রথম প্রভাতের আলো এসে পড়েছে। গাছের তলায় বসে নামগান করছেন রম্ভাবাই। একটা গাছের হলুদ রশ্মি হঠাৎ গাছের ফাঁকে লম্বভাবে এসে পড়ল ঘাসের জমিনের ওপর। রম্ভাবাই বীণা থামিয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে।

তুমি এসেছ প্রভু!

হলুদ বস্ত্র পরে হাতে বাঁশিটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামসুন্দর।

মুখে মৃদু হাসি টেনে বললেন, আমার ভক্ত যদি আমার জন্যে সবকিছু ত্যাগ করতে পারে তাহলে আমি তার কাছে না এসে কি থাকতে পারি?

আবার সেই বনে বনে ঘুরতে লাগলেন রম্ভাবাই আর তাঁর প্রভু শ্যামসুন্দর। দিনান্তের আগে একটি গাছের তলায় বসে একতারা বাজিয়ে গান ধরেছেন রম্ভাবাই, এমন সময়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল ক'টি রমণী।

গান থামিয়ে তরুণী রম্ভাবাই প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালেন।

মেয়েদের ভেতর থেকে এক বয়স্কা রমণী এগিয়ে এসে বলল, এমন ঘোর বনে তুমি একাকী কেন এসেছ মা? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি রাজবাড়ির মেয়ে।

রম্ভাবাই বললেন, বনই আমার ঘর। বৃক্ষই আমার আত্মীয়। আর যৌবন তো একটা কাল, সে এই আছে এই নেই। তার জন্যে আমার কোন উদ্বেগও নেই। কিন্তু তোমরা কারা মা?

আমরা বাছা ভীল রমণী। বনে এসেছিলাম কাঠ কুড়োতে। সারাদিন কাঠ সংগ্রহের ফাঁকে তোমাকে লক্ষ করছিলাম। তুমি আপন মনে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। তোমার গান,

তোমার নাচ আর হাসি দেখে মনে হল, তুমি ওই ওপরের জগৎ থেকে নেমে এসেছ। কিন্তু সারাদিন তোমাকে কোনওকিছু খেতে দেখেনি আমরা, তাই কিছু ফল এনেছি তোমার জন্যে।

বয়স্কা মেয়েটির ইঙ্গিতে দলের একটি মেয়ে এগিয়ে এসে গাছের পাতা বিছিয়ে তার ওপর কয়েকটি ফল রাখলে। অন্য একটি মেয়ে ঝকঝকে মাজা লোটায় খানিকটা ছাগীর দুধ এনে বসিয়ে দিলে তাঁর সামনে।

সবার আগ্রহে আর অনুরোধে ফল দুধ খেলেন রম্ভাবাই। খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বললেন, তোমরা আমার প্রভুর সখী। কী অপার করুণা তাঁর, তিনি আমাকে অভুক্ত দেখে তোমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ভীল মেয়েরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারা রম্ভাবাইয়ের কথার তাৎপর্য কিছু বুঝল না।

রাতে মেয়েরা রম্ভাবাইকে ডাকল তাদের ভীল-পল্লীর আস্তানায়। কিন্তু রম্ভাবাই যেতে চাইলেন না। অরণ্যের চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর কী থাকতে পারে।

তিনদিন মেয়েরা তাঁর জন্যে খাবার নিয়ে এল বনে। চতুর্থ দিনে তাদের আর দেখা গেল না। ওই চতুর্থ দিনেই শুরু হল এক নতুন বিপর্যয়। সেই অঞ্চলের প্রতাপান্বিত জায়গিরদার যোধসিং ঘোড়ায় চড়ে বন্দুক ঘাড়ে করে শাগরেদদের সঙ্গে নিয়ে এলেন শিকার করতে। তাঁবু পড়ল বনের মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গায়। পানভোজনের এলাহি ব্যবস্থা। হাসি, হল্লা, মত্ততা। ভীল পল্লীর মানুষজন জানে যোধসিংয়ের চরিত্র। তাই যোধ সিং এ অঞ্চলে এলে ভীল মেয়েরা নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বেরুত না বনের পথে।

রম্ভাবাঈ ভাগ্যচক্রে পড়ে গেলেন প্রমত্ত যোধসিংয়ের হাতে। তখন সন্ধ্যাকাল। ক্লান্ত শিকারিরা তাঁবুতে ফিরে পানভোজনে ব্যস্ত, আলো জ্বেলে যোধসিং গানের আসর বসিয়েছেন বাইজিদের নিয়ে।

একটি শাগরেদ বাইরে গিয়ে এক গাছের তলায় আবিষ্কার করল পরমা সুন্দরী রম্ভাবাইকে। তিনি তখন প্রভুর ধ্যানে মগ্ন। লোকটি তাঁর ধ্যান ভাঙিয়ে মিথ্যে করে বলল, বাহাদুর যোধসিং আপনার দর্শনপ্রার্থী।

কথাটা শুনেই নির্ভীক রম্ভাবাই চললেন যোধসিংয়ের এজলাসে। তাঁবুতে পৌঁছেই অপ্রকৃতিস্থ লোকগুলোকে দেখে তিনি বুঝলেন, গুরুতর এক পরিস্থিতি তাঁর সামনে উপস্থিত।

সঙ্গের লোকটি পানমত্ত যোধসিংয়ের কানে কানে কী যেন বলল। অমনি অট্টহাসিতে বন কাঁপিয়ে যোধসিং স্খলিত পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন রম্ভাবাইয়ের দিকে।

রম্ভাবাই পিছিয়ে যেতে লাগলেন বনের ভেতর। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন যোধসিং। শাগরেদরা এই নতুন মৃগীটির শিকার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু সবাইকে নিরস্ত করলেন যোধসিং। এ শিকার তাঁর, সুতরাং এই মৃগী শিকারের আনন্দ তিনি একাই পেতে চান।

রাতের অস্পষ্ট আলো আঁধারীতে রহস্যময় বন। রম্ভাবাই ছুটছেন আর তাঁকে দ্রুত পায়ে অনুসরণ করছেন যোধসিং। মনে হচ্ছে, সারি সারি বৃক্ষ নিশ্চল স্তব্ধতায় দেখছে এই আকস্মিক অঘটন। রম্ভাবাঈ ছুটছেন আর প্রভুকে কান্নাভাঙা গলায় ডাকছেন। দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন যোধসিং। হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল। পরক্ষণে সবকিছু স্তব্ধ। মূক অরণ্য কোটি কোটি পাতার চোখ মেলে চেয়ে রইল সে দৃশ্যের দিকে।

দশটি বছর পরে সাধিকা রম্ভাবাই একবার এসেছিলেন সেই ভীল অধ্যুষিত অঞ্চলে। ভীল রমণীরা এতকাল পরেও তাঁকে চিনতে পেরেছিল। যে রাতে যোধসিংয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যান বনের গভীরে সে রাতে অরণ্যদেবতাই যোধসিংয়ের ওপর তাঁর প্রতিশোধ নেন। যোধসিং রম্ভাবাইকে ধরবার জন্য হাত বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষের মূলে পা আটকে পড়ে যান। আশ্চর্যভাবে তাঁর দুটি চোখ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্ধ হয়ে যায় শিংয়ের মতো উঁচু হয়ে থাকা দুটি শেকড়ে।

এ ঘটনা অন্ধ যোধসিং সবার কাছে ব্যক্ত করেন। তিনি সাধিকা রম্ভাবাইয়ের খোঁজে লোক নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু সে সময় রম্ভাবাইয়ের কোনও খোঁজই পাওয়া যায়নি। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে এখন অন্ধ জায়গীরদার যোধসিং নাকি খাঁটি সোনা হয়ে গেছেন।

রম্ভাবাই কথাটা শুনে নিজেই গেলেন যোধসিংয়ের কাছে। পরিচয় দিতেই যোধসিং আকুল হয়ে চরণ স্পর্শ করতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু রম্ভাবাই তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, সেদিন আমারই অপরাধে আপনি অমূল্য দুটি চোখ হারালেন। আমি যদি উদ্‌ভ্রান্তের মতো পালিয়ে না যেতাম তাহলে আজ আপনার এই অবস্থা হত না।

অন্ধ যোধসিং হাত জোড় করে বললেন, তুমিই আমার দৃষ্টি খুলে দিয়ে গেছ মা। বাইরের আলো হারিয়ে আমি এখন সত্যপথের সন্ধান পেয়েছি। তুমি আজ দয়া করে আমার এখানে চরণধূলি দিয়েছ, এখন বলো মা আমি কেমন করে তোমার সেবা করব?

রম্ভাবাই বললেন, আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করতে পারবেন বাবা?...প্রভু আপনাকে তাহলে অন্তরের গভীর থেকে আশীর্বাদ করবেন।

বলো মা, অসম্ভব না হলে আমি প্রাণ দিয়ে তোমার অনুরোধ রক্ষা করব।

আপনার এলাকার ওই বনটিতে শিকার নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। কেবল ভীলেরা কাষ্ঠ আহরণ করতে পারবে, কিন্তু কেউই পশুপক্ষী বধ কিংবা বৃক্ষ হত্যা করতে পারবে না।

যোধসিং বললেন, যতদিন অঞ্চল আমার অধিকারে থাকবে ততদিন তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে। সেই নির্দেশ দেশের আইন না পালটালে আমার মৃত্যুর পরেও বলবৎ থাকবে মা।

পশুপাখিদের জন্য এমনি এক অনন্ত আনন্দ রাজ্য গড়তে চেয়েছিলেন রম্ভাবাই। যেখানে অরণ্যবৃক্ষেরা পশুপক্ষীদের জানাবে আমন্ত্রণ। দেবে স্নিগ্ধ, শীতল, নির্ভয় এক আশ্রয়।

সেদিন রোববার। বহুলোকের ভিড়। আমরা দুটি বৃক্ষ প্রেমিক পুরো বেঞ্চটা অধিকার করে বসে আছি। আমি আজকাল ভদ্রলোককে বনবাবু বলেই ডাকি। এ ডাকটা এখন ওঁর বেশ রপ্ত হয়ে গেছে।

একটু ভিড় কমলে হঠাৎ ভদ্রলোক চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটি সাধারণ মানুষের দল চলে যাচ্ছিল আমাদের পাশ কাটিয়ে। ছেলে বুড়ো যোয়ান নরনারী মিলে দশ-বারো জনের কম না। মাথায় পোঁটলা পুঁটলি। হাতে দু'-চারটে চাবাগাছের মতো কী যেন।

আমাকে বেঞ্চের ওপর বসিয়ে রেখে ভদ্রলোক মুহূর্তে মিশে গেলেন ওই দলটির সঙ্গে। কথা বলতে বলতে চলে গেলেন অনেক দূর। আমি ওই পাগল মানুষটার কাণ্ড কারখানার কথা ভাবছি আর উঠব উঠব করছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন ভদ্রলোক। পাশে বসতে বসতে বললেন, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই।

বললাম, লোকগুলো চোর বদমায়েস নাকি?

বনবাবু বললেন, আরে না মশাই, আমি পুলিশ নই যে চোর ধরতে যাব। ওরা সাঁই সম্প্রদায়ের লোক। মুসলমান।

বললাম, তা আপনি হঠাৎ ওদের দলে ভিড়ে গেলেন কেন?

সাধে কি ভিড়েছি মশাই, ওরা আমায় ঘাড়ে ধরে ভিড়িয়েছে।

কী রকম?

ছোটবেলায় বাঁকুড়ায় পিসির বাড়ি থাকতে ওদের মতো এক সম্প্রদায়কে দেখেছিলাম।

তা, এদের বৈশিষ্ট্যটা কী দেখলেন?

ভদ্রলোক গভীর গলায় বললেন, এরা যাযাবর সম্প্রদায়ের লোক। এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। চলার পথে কোনও সম্পন্ন গৃহস্থের পোড়ো জমিতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। অনুমতি মিললে দু'-চার মাসের জন্যে সেখানে ঝোপড়ি বানিয়ে থাকে। কিন্তু চলে যাবার আগে তারা গৃহস্থের একটি উপকার করে দিয়ে যায়। আশ্চর্য সব ফলকর গাছ লাগিয়ে পোড়ো জমিকে রূপান্তরিত করে দিয়ে যায় সুন্দর ফলের বাগানে।

সত্যি অদ্ভুত তো, এ যে দেখছি বিভূতিভূষণের সেই যুগলপ্রসাদ। সারা পৃথিবীকে পুষ্পিত করে তোলার প্রতিজ্ঞা।

ওরা যখন পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন ওদের আমি গাছের চারা নিয়ে যেতে দেখেছি। আর ছেলেবেলার স্মৃতি দিয়ে ওদের ওই ধরণের মুখগুলো মিলিয়ে দেখলাম। তাই তো ওদের খোঁজ পাওয়া সম্ভব হল।

কোথায় যাচ্ছে ওরা, কোনও হদিস পেলেন?

ঝাড়গ্রামের দিকে চলেছে।

এদিকে হঠাৎ এসেছিল কোথায়?

বারুইপুর স্টেশনের কাছাকাছি কোথাও মাস দু'য়েক ডেরা বেঁধে ছিল। ওখান থেকে লিচু আর পেয়ারার চারা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে।

বললাম, অদ্ভুত আপনার চোখের দৃষ্টি মশায়।

ভদ্রলোক লজ্জিত হলেন। ঈষৎ হেসে মুখখানা নিচু করলেন।

এবার ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম, আচ্ছা বনবাবু, আপনি তো সেদিন রম্ভাবাইয়ের গল্প করলেন, তিনি এখন কোথায়, তার কোনও খোঁজ রাখেন?

উনি তো ঘর বিবাগী উদাসী পথিক, ওঁর খোঁজ রাখব কী করে? সারা জীবন বনের বৃক্ষকে গান শুনিয়ে চলেছেন। মাণ্ডুপুরা থেকে ওঁর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়। উনি তিন-চারদিন ছিলেন ওখানে। যাবার সময় বলেছিলেন, ভেইয়া বনকে তুই ভালবেসেছিস, সংসার আর তোর হবে না। তবে একটা কথা মনে রাখিস, যাবি সাদা মন নিয়ে, তবেই বন তোর সব প্রার্থনা পূর্ণ করবে। গাছ যখন কাটবি তখন নত হয়ে তার কাছে প্রার্থনা জানাবি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষ কথাটা বলেছিলেন, মানুষের চাহিদা বড় বাড়ছে রে। দুঃখ পাবে। বন কেটে বসত যত বাড়ছে, মানুষের প্রাণের সীমা তত ছোট হয়ে আসছে। একদিন বনের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে। যে দেশে যত বন বাড়বে, সে দেশে প্রাণের শক্তি তত বাড়বে।

আমি বললাম, গাছকে ঈশ্বরের মূর্তিতে দেখেছেন এমন এক সাধিকার কথা আপনার কাছে শুনলাম কিন্তু এমন কোনও সাধারণ মানুষকে আপনি দেখেছেন যিনি বনের প্রেমে পাগল?

হেসে বললেন ভদ্রলোক, শুধু বনের প্রেমে নয়, বনবিবির প্রেমে পাগল এমন মানুষও আমি দেখেছি।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী রকম?

সারান্দা বনে ওডেন সাহেবকে দেখেছিলাম। এমন আশ্চর্য মানুষ একমাত্র রসিদ আলি ছাড়া আর কাউকে আমি দেখিনি। অবশ্য দু'জনে দু'রকম। একজন বনকে ভালবেসে বনবিবিকেও তার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন আর অন্যজন বনের প্রেমে পাগল হয়ে ঘরের বউয়ের মায়া ত্যাগ করেছিলেন।

কৌতূহলী হয়ে বললাম, দু'জনের গল্পই শুনতে চাই আপনার মুখ থেকে, আগে ওডেন সাহেব দিয়েই শুরু হোক।

ভদ্রলোক বললেন, ওডেন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা সারান্দা ফরেস্টে। তখন ওখানে বনের ইজারা নিয়ে কাঠ কাটা চলছিল। ওঁর সঙ্গে দেখা হবার আগে একটা ছোট ইতিহাস আছে।

একটু কী যেন ভেবে নেবার জন্যে চুপ করলেন ভদ্রলোক। খানিক পরে মুখ তুলে বললেন, রেঞ্জার মিঃ সোম চৌধুরীর বয়স ছিল অল্প। তার সঙ্গে কিছুদিনের ভেতরেই আমার বন্ধুত্ব বেশ প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। ভারী আমুদে মানুষ ছিল সোম চৌধুরী। ওর সদ্য বিয়ে করা তরুণী বউটি ভারী সুন্দর গান করতে পারত। আমাকে প্রায়ই সাসাংদার ডাকবাংলোতে ডেকে নিয়ে যেত বউয়ের গান শোনাবে বলে। মেয়েটির নাম ছিল, শুক্তি। ভারী মিষ্টি চেহারার মেয়ে। সব কাজের ভেতর ওর একটা ছন্দ ছিল। কিন্তু ও ছিল মনে মনে উদাসী। ওর আপন মনে খেলার ভাবটুকু আমার চোখ এড়ায়নি।

শুক্তিকে আমি ইচ্ছে করেই ঝিনুক বলে ডাকতাম। ও আমাকে দাদার সম্মান দিত।

সোম ছিল দারুণ হুল্লোড়বাজ। বনমোরগ মেরে আমার আস্তানায় গিয়ে হাঁকত, ওঠো, ওঠো চটপট। শুক্তির হাতে বনমোরগের রোস্ট খাওয়া যাবে।

কাজের অজুহাত দিলে বলত, গুলি মারো। কাজ আপনিই হয়ে যাবে।

অগত্যা উঠতে হত ওর জিপে। দুপুর নেই, রাত বারোটা নেই, উত্যক্ত করে মারত শুক্তিকে। শুক্তি নির্জীব ছিল না ঠিক কিন্তু ওর সঙ্গে হুল্লোড়বাজিতে পাল্লা দিতে পারত না সে। বোধহয় কারুর পক্ষে পারা সম্ভবও ছিল না। তবু রান্নাঘরে অবেলায় ঢুকে স্বামীর বায়নাক্কা সামলাত। অতিথি বন্ধুদের চায়ের আসরে গানও শোনাতে হত।

একদিন সোম কাজে গিয়েছিল রাঁচি। আমাকে খবরটা দেয়নি। পরের দিন দুপুরে চৌকিদারের মুখে খবরটা পেলাম। আরও শুনলাম, রাতে নাকি মেমসাহেব বহুৎ ডর পেয়ে গিয়েছিল।

আমি চৌকিদারকে বেশি কথা জিজ্ঞেস করলাম না। তখনই ছুটলাম শুক্তির খোঁজ নিতে। পাঁচ কিলোমিটাব পথ হেঁটে যখন ওর বাংলোতে পৌঁছোলাম তখন বেলা প্রায় দুটো।

বাইরের দাওয়ায় একটা বেতের চেয়ার পেতে শুক্তি বসেছিল। দূর থেকে বললাম, কেমন আছ মেমসাহেব।

শুক্তি কোনও উত্তর করল না। কাছে গিয়ে দেখি তার ঝিনুকের মতো চোখে টলমল করছে দু'ফোঁটা জল।

পরিস্থিতি হালকা করে দেবার জন্যে বললাম, ঝিনুককে দেখছি পরমাশ্চর্য দু'টি মুক্তোর জন্ম দিয়েছে।

ও কান্নার ভেতরেও এক ঝলক হাসি ছড়াল। কিন্তু রাগ করে বলল, যান, আপনাদের আর আসতে হবে না। খুব দরদ দেখা গেছে। একা ফেলে সবাই পালিয়েছেন।

বিশ্বাস করো ঝিনুক, সোম যে কাল রাতে বাংলোতে থাকবে না তা আমাকে জানায়নি। তাহলে তোমার শঙ্কা হরণের একটা ব্যবস্থা অন্ততঃ করা যেত।

শুক্তি আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে মুখোমুখি হল।

আপনি বিশ্বাস করুন দাদা, কাল রাতের অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। সেটা ভয়ের কি বিস্ময়ের, কি আর কোনও সুখ-দুঃখে মিশ্রিত অনুভূতির তা আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করে বলা অসম্ভব।

বললাম, রামসিং তো খবর দিয়ে এল মেমসাহেব বহুৎ ডর পেয়েছে।

শেষ রাতে আমি যখন কিছুটা ভয় পেয়ে ওকে ডাকি তখন ওর দেখা নেই! এল সাতটা বাজিয়ে, সূর্যকে বগলদাবায় পুরে নিয়ে। আস্ত একটা হনুমান। আমি ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করি, কোথায় ছিলে রাতে? ও খালি মাথা চুলকে বলে, মেমসাব কসুর হইয়ে গেছে। ব্যস্ আর কোনও উত্তর নেই।

এখন তোমার একলা রাতের অভিজ্ঞতার কথা বলো।

শুক্তি বলল, সত্যি একখানা অভিজ্ঞতাই বটে। ও তো ব্রেক ফাস্ট করে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় শুধু বলল, এই প্রথম বনের ভেতর তোমাকে রাত কাটাতে হবে, এরপর আরও অনেক রাত তোমার একা কাটবে। ভয় পেলেই ভয় চেপে ধরবে। একটা রাত টেনে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারলে আগামী দিনের নিঃসঙ্গ রাতগুলো নির্ভয়ে কেটে যাবে।

টা—টা—বলে তালুতে জিভ ঠেকিয়ে হাওয়ায় হাত নেড়ে আপনার বন্ধুটি তো রথে চেপে চলে গেলেন। আর আমি সারাদিন একা একা উল বুনে, খাবার বানিয়ে, পাশের নদীতে পা ডুবিয়ে, জনাপা লতা থেকে ফুল পেড়ে সময় খরচ করতে লাগলাম। কী নিদারুণ লম্বা সময় বিধাতা বানিয়ে রেখেছেন, যেন কাটতেই চায় না।

কম্পাউন্ডের বাইরে দু'-একবার রামসিং-এর মুখ দেখলাম। নদীর ওপারের জংলা রাস্তা ধরে কয়েকটি 'হো' মেয়ে পুরুষ চলে গেল। মেয়েরা পিঠে বেঁধেছে বাচ্চা, মাথায় নিয়েছে কাঠের বোঝা। পুরুষদের হাতে লম্বা ধনুক আর লতায় বাঁধা দু'-চারটে পাখি। আমি ওদের দেখছি আর গুনগুন করে এক আধ টুকরো গানের সুর ভাঁজছি। মোটামুটি নিঃসঙ্গতার ভারটুকু কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি। এমন সময় ঘনিয়ে উঠল মেঘের ছায়া। সূর্য ঢলে পড়লেও অস্ত যায়নি। খপ করে তাকে গিলে ফেলল একখণ্ড মেঘ। অমনি চারদিকে আঁধার নেমে এল। পাহাড়ের মাথায় মেঘ ডাকল। সে ডাক বাজতে লাগল আশপাশের সব পাহাড়ে। যেন কয়েক গন্ডা বাঘ এক সঙ্গে গলা ফাটিয়ে গর্জন করছে।

বৃষ্টি তখনও পড়েনি। বনের গাছগুলোকে দেখলাম, দারুণ তৃষ্ণায় উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। আমি সেই আবছায়ায় কম্পাউন্ডের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কী রকম যেন মোহগ্রস্ত হয়ে গেলাম আমি। এক এক ঝলক বাতাস বয়ে আসতে লাগল। কত বিচিত্র শব্দ উঠতে লাগল

বন থেকে। গাছে গাছে ঘর্ষণের শব্দ, বিভিন্ন আকারের পাতার বিভিন্ন রকমের ধ্বনি। সেই শব্দকে ডুবিয়ে দিয়ে নামল বর্ষা। সারা বন জুড়ে বর্ষার সে কী শব্দ সমারোহ। কিছুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজে যখন মনে হল কাজটা ভাল করিনি, তখন দৌড়ে ঢুকে পড়লাম বাংলোর ভেতর। মাথা মুছে পোশাক পালটে পড়ার ঘরে বসে বই পড়তে লাগলাম। বিদ্যুৎ ঘন ঘন চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে। বৃষ্টির বিরামহীন শব্দ নদী, পাহাড়, অরণ্যে একটানা বেজে চলেছে।

বইতে মন বসাতে পারলাম না। আমার সাহস কিন্তু কম ছিল না। অকারণে ভয় পাওয়া একটা লজ্জার ব্যাপার ছিল। কিন্তু এই নতুন পরিস্থিতি আমাকে কেমন যেন অস্বস্তির ভেতর ফেলতে লাগল। জানালা দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করলাম কম্পাউন্ডের এক প্রান্তে দরোয়ানের কুঠির দিকে, কিন্তু বৃষ্টির ভেতর দিয়ে এককুচি আলোও চোখে পড়ল না। হঠাৎ মনে হল, এতদিন যে সাহসের দীপটা জ্বলছিল ভেতরে সেটা কেমন যেন এলোমেলো হাওয়ায় নিভু নিভু করছে। যে মেয়েটা সকাল সন্ধে আমার কাজ করে দিয়ে যায় সে একবেলা কাজ করে কী এক জরুরি দরকারে ছুটি নিয়ে চলে গেছে। মনে মনে ভাবলাম, ওকে আজ রাতে কাছে রাখলেই হত। কিন্তু যখন এ বুদ্ধি এল মগজে তখন আর তাকে ভ্যালি থেকে ডেকে আনার উপায় নেই। কেবল মনে বল পেলাম এই ভেবে যে আমার কম্পাউন্ডের ভেতর অন্তত একজন পুরুষমানুষ আছে। কিন্তু তখন কি জানতাম, রাম সিংও ভেগেছে। ঝড়ো হাওয়ার গর্জন বাইরে। আধখোলা জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে ঢুকে আসছিল হাওয়ার ঝলক। ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো ভয়-পাওয়া পাখির মতো পাখা ঝাপটে উড়ছে। মাঝে মাঝে স্থির হয়ে থর থর করে কাঁপছে আবার নতুন আক্রমণের মোকাবিলার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ৭ই জুলাই তারিখটা বার বার চোখে এসে পড়ছিল। হয়ত তার একটা কারণ ছিল, আপনার বন্ধু চলে যাবার পর আমি লাল কালিতে কালো তারিখটা গোল করে চিহ্নিত করেছিলাম।

ন'টার কাছাকাছি আমি কিছু খেয়ে নিলাম। বিছানায় বসে এরপর তারস্বরে গান জুড়ে দিলাম। হা হা করে নিজে অনেকক্ষণ হাসলাম। জোরে জোরে বন্ধুবান্ধবের মজলিশে যেন কথা বলছি, এমনিভাবে বক্‌বক্ করে যেতে লাগলাম।

শেষে গান ধরলাম—

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার'!

'হুঁশিয়ার' শব্দটা শেষ হতে না হতেই মনে হল পাশের পাহাড়ে পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি উঠছে।

আমি চুপ করে কান পেতে রইলাম। কিন্তু এ কী রকম প্রতিধ্বনি! ক্রমে দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে যাওয়াটাই সাধারণভাবে প্রতিধ্বনির কাজ, কিন্তু এ যেন অন্যকিছু। হঠাৎ একটি পুরুষকণ্ঠ 'হুঁশিয়ার' কথাটা উচ্চারণ করছে আর পাহাড়ে পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি তরঙ্গিত হচ্ছে, হুঁশিয়ার .... হুঁশিয়ার .... হুঁশিয়ার।

সত্যি, আমার বুকের ভেতর কেমন যেন ডাঁউ ডাউ, একটা শব্দ হতে লাগল। মনে হল, কে যেন বুকের খাঁচায় ধাক্কা মারছে।

ধাক্কা তখন সত্যিই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি খেয়াল করিনি তাই প্রথমে শুনতে পাইনি। হঠাৎ সচেতন হলাম! বাইরের দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে। আমি পড়ার ঘর থেকে করিডোরে

উঠে গেলাম। দরজাটা না খুলে জানালাটা খুললাম। টর্চের আলো বাইরে ফেলে বললাম, কে ? সামনে আসুন।

আলোর বৃত্তের ভেতর এসে দাঁড়ালেন সাদা পোশাক পরা এক বৃদ্ধ। হাতে বর্ষাতি আর টর্চ। দেখে অবাক হলাম, বৃদ্ধ সম্ভবতঃ ইংরেজ।

বললাম, আমার স্বামী বাইরে গেছেন। ঘরে আমি একা। বলুন আপনার কী উপকার করতে পারি ?

বৃদ্ধ বললেন, বড় দুর্যোগ তাই হুঁশিয়ারি দিতে বেরিয়েছিলাম। ভাবলাম, নতুন রেঞ্জারের সঙ্গে একটু গল্প করে যাই।

ইংরেজি ভাষাতেই কথা হচ্ছিল আমাদের। বৃদ্ধ বললেন, তোমরা তো বাঙালি আছ। আমি বাংলাভাষায় অনেক ভাল আলাপ করতে পারি।

একে বৃদ্ধ তায় বিদেশি তাই দ্বিধা না করে দরজাটা খুলে ফেললাম। বৃদ্ধের চেহারায় বেশ সম্ভ্রান্ত ভাবটি ফুটে উঠেছে।

আমার সঙ্গে উনি বসার ঘরের দিকে আসতে লাগলেন। বললাম, আপনি বাথরুমে যেতে পারেন। ওখানে সাবান আর তোয়ালে আছে। জলকাদা ধুয়েমুছে আসতে পারেন।

আমি ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে স্নানের ঘরের পথটা দেখিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ উনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, এসব আমার চেনা, আমি একাই যেতে পারব। যখন ডি. এফ. ও ছিলাম তখন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এ বাংলো তৈরি করিয়েছি।

আমি মনে মনে সাহস পেলাম। তাহলে নিশ্চয়ই উনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কোনও রিটায়ার্ড অফিসার। হঠাৎ দুর্যোগে এসে পড়েছেন।

প্রবল বৃষ্টির জন্য বেশ একটু শীতও পড়েছিল। উনি স্নানের ঘরে ঢুকলে আমি আগুন জ্বেলে দু'কাপ চা বানাতে লেগে গেলাম।

বসার ঘরে ওঁকে বসিয়ে চা সার্ভ করলাম।

উনি হাতে চায়ের কাপটি ধরে নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন কিন্তু চা না খেয়ে কতক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার মুখেব দিকে। আমার হাতেও তখন আমার কাপটি ধরা। অতিথি না চুমুক দিলে আমি দিতে পারছি না।

উনি এবার একটু একটু করে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে বললেন, তোমার চা খেয়ে বড় আরাম পেলাম। ছোটনাগরা থেকে হেঁটে আসছি। বড় অন্ধকার আর পিচ্ছিল পথ। এ রাতে আমাকে বেরুতেই হয়। আর একটা না সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

শেষের কথাগুলো উনি যেন আপন মনেই বলে গেলেন। আমি তাঁর মাথামুন্ডু কিছুই বুঝলাম না।

হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, কেমন লাগছে তোমার এই বনের সংসার ?

বললাম, প্রথম প্রথম এই অসম্ভব নির্জনতা আমি সহ্য করতে পারতাম না, এখন আস্তে আস্তে সব কিছু সয়ে গেছে।

বৃদ্ধ মানুষটির চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। আমার মুখের ওপর চোখ রেখে বললেন, বনে নির্জনতা, কী বলছ তুমি! সকাল থেকে সন্ধে হাজারো পাখির গান আর কলরব শোনোনি ? রাতে বাঘের ডাক, হরিণের ডাক, বাইসনের দৌড়ে যাবার শব্দ শোননি? ওই নদীর ওপারে

হাতি জল খেতে নামে, দেখেছ নিশ্চয়? রাতে কোটি কোটি জোনাকি আলোর ঘাঘরা পরে নেচে বেড়াচ্ছে, কনসার্ট বাজাচ্ছে ঝিঁ ঝিঁ কীটপতঙ্গ। এর পরেও নির্জনতা! একবার মেঘ ডেকে উঠলে কয়েকবার সে শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে ডাক দিয়ে ফিরতে থাকে। বর্ষাকালে অসংখ্য ঝোরা, ঝরনার শব্দ তোমাকে তাদের কথা শোনাবে বলে আকুল হয়ে ওঠে না?

একটু দম নিয়ে বললেন, সব ঋতুতেই বনে পাতা আর ফুলের উৎসব। তবু বসন্তে দেখো, গাছেদের কী সাজের ঘটা। দু'পা যেতে না যেতেই দেখবে একটি করে সুন্দরী মহিলা লাল পোশাকে সেজে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঝোরার ধারে সাংকারলা লতায় সাদা সাদা ফুল ফুটে হলুদ রঙের কেশর দুলিয়ে তোমাকে ডাকছে। শালের বনে যাও। সবুজ পাতার মাথায় মাখন রঙের ফুলের মুকুট। হাজার হাজার টিয়ে পাখি গাছ ভরে জটলা করছে। মহুয়ার ফুল কুড়োতে দেখোনি হো মেয়েদের? গান শোননি তাদের? হাটে গিয়ে হো মেয়েদের নাচ আর মুরগির লড়াই দেখোনি?

তোমাদের কোয়ার্টার থেকে ডাইনে একটুখানি এগিয়ে যাও। গুচ্ছ গুচ্ছ বেগুনি ফুলে ভরে আছে জনাপা লতা। তুমি পাশ দিয়ে গেলেই দুলে দুলে তোমাকে ফুল নিতে ডাকবে। তোমরা এদেশি মেয়েরা তো খোঁপায় ফুল গুঁজতে ভালবাস। কত ফুল চাই। রাশি রাশি ফুল ফুটে আছে চারদিকে। হাসছে, দুলছে, ঝরছে।

কোথাও নির্জনতা নেই। একটা আশ্চর্য সহনীয় কলরবে বন ভরে আছে।

অনেকক্ষণ কথা বলে চুপচাপ বসে রইলেন। আমি এক সময় নীরবতা ভেঙে বললাম, মানুষের কোলাহল শুনতেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম তাই বনের মধ্যে এসে সে কোলাহল না পেয়ে বেশ খানিকটা নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। এখন বনেরও যে একটা ভাষা আছে তা বুঝতে পারছি।

বৃদ্ধকে সেই মুহূর্তে বড় উজ্জ্বল দেখাল। তিনি হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাঁর চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বললেন, বনের ভাষার কথা বললে না? শনিচারি ঠিক ওই রকম কথাই বলত।

প্রশ্ন করলাম, শনিচারি কে ?

বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তার পরিচয় এক কথায় হয় না।

মাথা নিচু করে কতক্ষণ কী ভাবলেন। এক সময় মাথা তুলে বললেন, যে কথা বলছিলাম, সেটাই বলি। শনিচারি বনের ভাষা বুঝত। আমি তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু শিখেছিলাম। কোন কোন গাছ ফুলের গন্ধ হাওয়ায় ভাসিয়ে পথিককে তার কাছে যাবার আমন্ত্রণ জানায়। পথিক গিয়ে সেই গাছের তলায় বসলে সে পাতার মিষ্টি আওয়াজ তুলে বলে, দুদণ্ড ব'সে যাও। বড় খুশি হয়েছি তোমাকে কাছে পেয়ে। এক সময় টুপটুপ করে ফুল ঝরিয়ে দেয় পথিকের কোলে। বলে, নিয়ে যাও আমার প্রীতি-উপহার।

এক জ্যোৎস্না রাতে শনিচারি আমাকে নিয়ে গেল বনের ভেতর। কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম! ও আমার দিকে চেয়ে মুখে আঙুল দিয়ে বসে আছে। এক সময় ফিসফিস করে বলল, শোনো, গাছেরা গান করছে।

আমি কান পাতলাম। কী আশ্চর্য মিহি সুরের কম্পন! জ্যোৎস্না ঝরছে, তিরতির করে বায়ু বইছে আর অতি মিষ্টি মোলায়েম সুর কানে এসে বাজছে।

শুধু আনন্দের গান নয়, হৃদয় বিদারক কোনও অঘটনের কথা ও গাছেদের কাছ থেকেই জানতে পারত। এক দিনের একটি ঘটনায় ও আমাকে অবাক করে দিল। গরমের দিন। ঝোরাগুলো প্রায় শুকিয়ে গেছে। আমি একটা শাল গাছের ছায়ায় বসে অদূরে চিহড় লতায় জড়ানো পলাশ গাছের ছবি আঁকছি। ওই গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল শনিচারি। তার কপালে কড়া রোদ এসে পড়েছিল। সে হাতের পাতা দিয়ে রোদ ঠেকাবার চেষ্টা করছিল। আমি শনিচারির ওই উত্তাপ-ক্লান্ত মুখখানা ক্যানভাসে ধরে রাখবার চেষ্টা করছিলাম। পলাশের রাঙা ফুলে রঙ ছড়িয়ে দিতে গিয়ে মনে হল যেন ছোট ছোট আগুনের শিখা জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার তুলে শনিচারি আমার কাছে ছুটে এল। আমি চকিতে উঠে দাঁড়ালাম। কোনও বন্য জন্তু নাকি! কিন্তু শনিচারি তখন আমার হাত ধরে টানতে শুরু করে দিয়েছে। তার চোখে মুখে আতঙ্ক।

বললাম, কী হয়েছে শনিচারি?

ও ভয়ার্ত চোখে পলাশ গাছটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

কী ওখানে?

শনিচারি বলল, ধিক্‌ধিক্ করে ফুলের মধ্যে আগুন জ্বলছে দেখছ না। পাশেই বনে কোথাও আগুন লেগেছে। এখানে মুহূর্তে এসে যাবে সে আগুন। চলো, পালাই চলো।

শনিচারিকে কোনওদিনই আমি ভুল বুঝিনি, তাই আঁকার সরঞ্জামগুলো তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিয়ে কারো নদীর দিকে ছুটলাম। খানিক পথ যেতে না যেতেই আমাদের মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক পাখিকে ত্রস্তে ভ্যালির দিকে উড়ে যেতে দেখলাম। এরপর আমাদের ভয়ংকর আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যেতে হল। পেছন থেকে শুনতে পেলাম শত শত পায়ের শব্দ। ক্রমশ সে শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। বন্য প্রাণীরা লেলিহান দাবাগ্নি থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ভ্যালির দিকে দৌড়ে আসছে।

আমরা প্রমাদ গুণলাম। কোনও গাছের আড়ালে থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তাহলে দ্রুতধাবমান জানোয়ারদের খুর আর শিংয়ের আঘাত থেকে হয়তো বাঁচা যাবে কিন্তু বাঁচতে পারব না সর্বধ্বংসী আগুনের হাত থেকে।

দু'জনে ছুটতে লাগলাম। কোথাও পাকদণ্ডীর পথ সংক্ষেপ করব বলে গাছের শেকড় আর লতা ধরে ঝুলে ঝুলে নামতে লাগলাম।

শনিচারি ছুটতে ছুটতেই বলল, গাছের শেকড়গুলোয় হাত দিয়ে দেখলে না ওরা থরথর করে কাঁপছে।

আমি শুধু বললাম, উঃ, ওদের অসহায়ের মতো মরতে হবে।

হঠাৎ নীচের রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ পেলাম। তাড়াতাড়ি নামতে লাগলাম সেদিকে। আমারই ড্রাইভার, জিপ নিয়ে আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।

জিপে উঠে পেছনে তাকালাম। আগুন একটা সোনালি ড্রাগনের মতো এগিয়ে আসছে। নাক দিয়ে বেরুচ্ছে লাল অগ্নিশিখা।

বৃদ্ধ হঠাৎ থামলে আমি বললাম, আশ্চর্য তো! শনিচারি আগুন না দেখতে পেলেও পলাশ গাছটার ফুলের দিকে চেয়ে সব খবর পেয়ে গিয়েছিল!

বৃদ্ধ ইংরাজ বললেন, তাইতো বলছিলাম, ও বনের ভাষা বুঝতে পারত।

একটু থেমে আবার বললেন, একদিন আমি বাইরের লনে চেয়ার পেতে বসে আছি আর শনিচারি ঝাড়ু দিয়ে বাগানের শুকনো পাতা পরিষ্কার করছে, এমন সময় কয়েকটা পাখি কলরব করতে করতে উড়ে গেল। ও ঝাড়ু ফেলে কম্পাউন্ডের বাইরে যাচ্ছে দেখে বললাম, কোথায় চললে?

ও বলল, নদীর ধারে দক্ষিণের বনে ফল পেকেছে পেড়ে আনি।

কী করে বুঝলে তুমি?

ওই তো পাকা ফলের কথা বলতে বলতে পাখিরা উড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলে দেখলাম ও কোঁচড় ভরে অনেক পাকা ফল পেড়ে এনেছে। শুধু গাছ কিংবা পাখি নয়, মৌমাছি, প্রজাপতি, নানা ধরনের কীটপতঙ্গের কাছ থেকেও শনিচারি নির্ভুল খবর সংগ্রহ করতে পারত।

বললাম, এ অসাধারণ এক ধরনের ক্ষমতা।

বৃদ্ধ বললেন, বনকে ভালবাসত ও তাই এটা সম্ভব হয়েছিল।

খুব কৌতূহলী হয়ে বললাম, কাছেপিঠেই বুঝি ওর বাড়ি?

তোমাদের সামনের পাহাড়টায় উঠলে ভ্যালির ভেতর যে ডুংরিটা দেখা যায় তার তলায় ছিল ওর বাড়ি। ও বাপের কাছে থাকত। মা ছিল না। ওর পুরো নাম ছিল শনিচারি কুই। কুই মানে কুমারী। কাজ করত ও আমার এখানে। ওকে আমি খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষা দিয়ে দিয়েছিলাম।

বললাম, অনেক আদিবাসী মেয়ে খৃষ্টান ধর্ম নিয়েছে।

বৃদ্ধ বললেন, আজ থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ঘটনা। তখন বললেই কেউ অমনি ধর্মান্তরিত হত না। অনেক সুযোগ সুবিধে দিলে তবেই মানুষ ধর্ম পরিবর্তন করত।

শনিচারি আপনার কাছে কাজ করত, তাই ও খৃষ্টান ধর্ম সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল।

ঠিক তা নয়, কাজের সঙ্গে পয়সার সম্পর্ক, ওর সঙ্গে আমার অতিরিক্ত একটা সম্পর্ক ছিল। বলতে পারো গভীর হৃদয়ের সম্পর্ক।

এবার শনিচারির প্রতি আমাকে সম্মান জানাতে হল। বললাম, তিনি এখন কোথায়?

বৃদ্ধ হাতখানা ওপরের দিকে তুললেন। স্পষ্ট দেখলাম ওঁর হাতটা কেঁপে উঠল। আমি আর কোনও প্রশ্ন করলাম না।

বেশ কিছু সময় আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। বাইরে আরও ঝড় আরও বৃষ্টি। সত্যি এমন দুর্যোগ বহুদিন আসেনি। আমি অন্ধকার দুর্যোগময়ী রাত্রিতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই বৃদ্ধকে কাছে পেয়ে বেশ খানিকটা স্বস্তি বোধ করছিলাম।

কড় কড় শব্দে যেন পাহাড় ফাটিয়ে একটা বাজ পড়ল। আমি চমকে উঠলাম। সেই মুহূর্তে ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো ঝড়ের ঝাপটায় ফর্‌ফর্‌ করে উড়ে আবার স্থির হল। বৃদ্ধের চোখ গিয়ে পড়ল সাতই জুলাই তারিখটার ওপর।

বৃদ্ধ উঠে গেলেন দেয়াল সংলগ্ন ক্যালেন্ডারটার পাশে। লাল কালিতে গোল বৃত্ত দেওয়া সাতই জুলাই তারিখটা ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন। এক সময় ফিরে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, ওই তারিখটাকে লাল কালিতে চিহ্নিত করেছে কে?

বললাম, আমি।

আশ্চর্য!

উত্তর করলাম, আশ্চর্যের কিছু নেই। আজ প্রথম আমার স্বামী আমাকে রাতে একা কোয়ার্টারে রেখে হেডকোয়ার্টারে গেছেন। তাই তারিখটা চিহ্নিত করেছি।

ওই তারিখটা আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিনা, তাই বলছিলাম।

কী রকম? অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকলে বলুন!

বৃদ্ধকে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। এক কাপ কফি এনে দেব? ঠান্ডায় মনে হয় ভালই লাগবে।

বৃদ্ধ নিজের আসনে বসে মাথা নাড়তে লাগলেন। আমি যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব দু'কাপ কফি তৈরি করে আনলাম।

দু'জনে দু'জনের আসনে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছি। বৃদ্ধের মুখ নীচের দিকে। ঘরের ম্লান হলুদ আলোয় বৃদ্ধকে সেই মুহূর্তে চিন্তাক্লিষ্ট মনে হচ্ছিল।

কফি শেষ করে কাপটা টিপয়ের ওপর রেখে বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

এই বিশেষ তারিখটিতে শনিচারি আমাকে ছেড়ে চলে যায়।

বললাম, আপনার কাজ ছেড়ে চলে যান বুঝি?

হতাশ চোখে আমার দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বললেন, না, এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়।

আমি চুপ করে রইলাম। বৃদ্ধও অনেকক্ষণ কোনও কথা বললেন না। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, ঝড় শুধু বাইরেই চলছে না বৃদ্ধের মনের মধ্যেও চলছে ঝড়ের তোলপাড়।

এক সময় বৃদ্ধ বললেন, সে আজ কতদিনের কথা তবু ঠিক আজকের তারিখটিতে সেই স্মৃতি নতুন হয়ে ফিরে ফিরে আসে। আমি আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশটি বছর ধরে দেখছি, জুলাই-এর এই তারিখটিতে রাতের বেলা ঝড়বৃষ্টি নেমে আসে।

বললাম, এ সময়টা ঘোরতর বর্ষাকাল তাই ঝড়বৃষ্টি স্বাভাবিক।

বৃদ্ধ বললেন, পঁয়তাল্লিশ বছর আগের সেই দিনটিতেও এমনি দুর্যোগ ছিল। পরের দিন আমি এ কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাব। বদলি ও প্রমোশনের অর্ডার একসঙ্গেই এসেছে। শনিচারি তার আগের দিন থেকেই চলে গেছে ভ্যালির ডুংরিতে তার ডেরায়। কথা দিয়ে গেছে এই সাতই জুলাই সে সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন করেই হোক বাংলোতে চলে আসবে। তার বাবা, আত্মীয় স্বজন বাধা দিলেও সে মানবে না। অবশ্য সে বলে গেছে, আত্মীয়দের বুঝিয়ে মত নিয়ে আমার কাছে চলে আসার চেষ্টা করবে।

বললাম, আপনি কি নতুন জায়গায় ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন?

হ্যাঁ, শুধু সঙ্গে নিয়ে যেতে নয়, সেখানে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করব কথা দিয়েছিলাম। ওর দিক থেকে শুধু একটি অনুরোধ ছিল। আমি যেন এ দেশের বনভূমি ছেড়ে ওকে অন্য কোথাও নিয়ে না যাই। ওকে আমি সে কথাও দিয়েছিলাম। আর সে প্রতিশ্রুতি আজও আমি রক্ষা করে চলেছি।

আমার কৌতূহল তখন সীমাহীন। বললাম, সাতই জুলাই নিশ্চয়ই তিনি আপনার কাছে এসেছিলেন?

বৃদ্ধের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। জানালা দিয়ে প্রবাহিত ঝড়ের হাওয়ায় তা মিশে গেল।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন, শনিচারি তার কথা রেখেছিল। কিন্তু আত্মীয়স্বজন তাকে অনুমতি দিলেও যে বনকে সে তার সবচেয়ে বড় আত্মীয় বলে ভাবত সেই বন তাকে কাছ-ছাড়া করতে চাইল না।

কী রকম?

সেই ভয়ংকর সাতই জুলাই সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে একাই আসছিল ভ্যালি থেকে। সন্ধ্যার মুখে সে বেরিয়েছিল। এ পথ তার একান্ত পরিচিত। কিন্তু আজকের মতো সেই সাতই জুলাইতেও চলছিল প্রবল বর্ষণ। শুধু বর্ষণ নয়, সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছিল এমনি প্রচণ্ড ঝড়। বুঝতেই পারছ আমার মনের উদ্বেগ তখন কতখানি। আমি ভাবছিলাম, ও কি পেয়েছে ওর আত্মীয়দের সম্মতি। কেন এত দেরি করছে ও। এ অন্ধকার ঝড়ের তাণ্ডবে ও কী করে পথে একা আসছে।

এই সব ভাবতে ভাবতে আমি অধীর হয়ে উঠলাম। ঘড়িতে যখন রাত ন'টা বাজল তখন আমার অবস্থা উন্মাদের মতো। আমি এই প্রবল বর্ষণ, বিদ্যুতের চমক আর ঝড়ের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ভ্যালির পথে। টর্চ ফেলে পথ দেখছিলাম। কিন্তু বৃষ্টির ভেতর সামনের পথ চেনা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। গাছগুলো ঝড়ের ঝাপটায় হাহাকার করছিল। পথে ছড়িয়ে পড়েছিল অজস্র ডালপালা। হতাহত যোদ্ধাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন। এক সময় আমি এসে পৌঁছোলাম ভ্যালির সংলগ্ন পাহাড়টার কাছাকাছি। এখানে ভ্যালি থেকে পথটা অনেক খাড়াই উঠে এসেছে। এই পথের ডাইনে একটা নিভৃত জায়গা আছে। লতাপাতায় ঘেরা সে জায়গাটায় অনেককালের পুরনো একটা গাছ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে ছিল। সারা বছর গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা ফুল ফুটত ওই গাছে। ওর তলায় আমি আর শনিচারি প্রায়ই বসতাম। বাইরে থেকে কেউ আমাদের দেখতে পেত না। কিন্তু আমরা লতাপাতার আড়াল দিয়ে সারা ভ্যালির ছবিটা দেখতে পেতাম। আমি গাছ থেকে ফুল পেড়ে দিতাম। ও তার কালো চুলে সেই ফুল গুঁজে আমার গা ঘেঁষে বসত। আমি ওকে দেখে অবাক হতাম। মনে হত, ও বনের কোনও দেবীর কন্যা।

কী মনে হল, আমি পথ ছেড়ে ডান দিকে কয়েক পা এগিয়ে ওই জায়গাটার কাছে গেলাম। টর্চ ফেললাম গাছটার দিকে। প্রবল ঝড়ের ঝাপটায় যেন পাগল হয়ে গেছে গাছটা। একী! লতাপাতা ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়ে একটা মোটা ডাল ভেঙে পড়ে আছে। কে যেন আমাকে ওখানে টেনে নিয়ে গেল। আমি টর্চ ফেললাম গাছের তলায়। তারপর একটা চিৎকার দিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লাম মাটিতে।

বৃদ্ধ কতক্ষণ আর কোনও কথা বলতে পারলেন না। দু'হাতে মাথা চেপে নীচের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

একসময় মাথা তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। নিশ্চয় শনিচারি ঝড়ের মধ্যে ওই গাছতলায় শেষ বিদায় নিতে এসেছিল। কিন্তু ওই গাছ তাকে এ বন ছেড়ে কিছুতেই বাইরে যেতে দিতে চায়নি। তাই ডালটা ভেঙে পড়েছিল তার মাথায়।

আমি সংবিত ফিরে পেয়ে কাছে গিয়ে দেখলাম, শনিচারি যেন ঘুমিয়ে আছে। দেহে প্রাণের কোনও লক্ষণই আব নেই। ভাঙা ডালের একগুচ্ছ সাদা ফুল ঠিক তার ঘন চুলের পাশে জেগে আছে।

তারপর এ বন ছেড়ে আমি আর কোথাও যেতে পারিনি। ছোটনাগরার উপত্যকায় ওকে

যেখানে কবর দিই সেই জায়গাটা ঘিরে আমি একটা বাগিচা গড়ে তুলেছি। সেখানেই একটা কুঠি তৈরি করে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলাম।

বললাম, এখনও আপনি এই সাতই জুলাই তারিখটিতে ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়েন কেন?

এ দিনে আমি ঘরে থাকতে পারি না। কে যেন আমাকে টেনে এই বনের পথে নিয়ে আসে। আমি হুঁশিয়ারি দিই। মনে হয়, শনিচারির আসার দিনটিতে আমি যদি আরও আগে বেরিয়ে আসতাম পথে তাহলে হয়তো এমন একটা অঘটন রোধ করতে পারতাম। তাই সাতই জুলাই আজও আমি এই বনে হুঁশিয়ারি দিয়ে ফিরি!

বললাম, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, এ অবস্থায় অন্তত কোনও লোককে সঙ্গে নিয়ে বেরুতে পারেন।

বৃদ্ধ মৃদু হেসে বললেন, এই তারিখটিতে বনের ভেতর কেউ আসবে না আমার সঙ্গে। এই বনের চারদিকের মানুষের ধারণা, সাতই জুলাই ঝড়ের মধ্যে শনিচারির আত্মা তার কবর ছেড়ে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

ভোররাতের দিকে ঝড় থেমে গেল। বৃদ্ধ ইংরাজ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় আমাকে তাঁর কুঠিতে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন।

কাল রাতে আমার ঝি কেন কাজে আসবে না বলেছিল, আর দরোয়ান কেন গা ঢাকা দিয়েছিল তা এখন বেশ বুঝতে পারছি। আমার মনে হচ্ছে দাদা আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি। হয়তো ওই বৃদ্ধ ইংরাজের আসাটাসা আমার আচ্ছন্ন ভয়ার্ত মনের দৃষ্টি বিভ্রম।

বললাম, নিমন্ত্রণ তো তোমার হাতেই রয়েছে। চলো না একদিন সত্যাসত্য যাচাই করে আসি।

যাব যাব বলে নানা কাজে প্রায় মাস ছয়েক কেটে গেল কিন্তু সাহেবের ডেরায় যাবার সময় হয়ে উঠল না। একদিন আমরা সব কাজ ফেলে তিনজন গেলাম ছোট নাগরায় বৃদ্ধ সাহেবের কোঠিতে। বনের বাইরে সুন্দর উপত্যকা। মোটামুটি সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর সাহেবের আস্তানার সন্ধান পাওয়া গেল। ওডেন সাহেব নামেই ওখানকার হো-সম্প্রদায়ের কাছে তিনি পরিচিত। দেখলাম প্রতিটি মানুষ ওডেন সাহেবকে তাদের নিজেদের লোক বলেই মনে করে। সাহেব নাকি তাদের বেমারিতে এমন দাওয়াই দেন যা কঠিন রোগের রোগীকেও দু'-একদিনের ভেতর চাঙ্গা করে তোলে।

তিন-চারটে হো-দের ছেলে আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেল সাহেবের আস্তানায়। তখন বিকেল চারটে। দেখলাম, ছবির মতো ইউক্যালিপ্টাসের লম্বা গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। তার তলায় নানারকম ফুলের কেয়ারি। বৃদ্ধ নিজের হাতে ফুল গাছের পরিচর্যা করছিলেন। কম্পাউন্ডের পশ্চিমে সাহেবের ছবির মত বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি।

পায়ের সাড়া পেয়ে কাজ ফেলে তাকালেন বৃদ্ধ ওডেন সাহেব। শুক্তি এগিয়ে গিয়ে একমুখ হেসে নিজের পরিচয় দিল। সাহেব দেখলাম, দারুণ খুশি হয়েছেন। তিনি শুক্তির দুটো হাত ধরে ছেলেমানুষের মতো নাড়া দিলেন। পরে শুক্তির মুখ থেকে আমাদের পরিচয় পেয়ে এগিয়ে এসে হ্যান্ডসেক করলেন।

সেদিন বৃদ্ধ তাঁর ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট কোয়ার্টারে বসিয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁর জীবনের অনেক গল্প করলেন। রিটায়ার্ড করার পর হোমে ফিরে যাবার জন্যে অনেক শুভানুধ্যায়ী তাঁকে

উপদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি শনিচারিকে কথা দেবার জন্যে এ বন ছেড়ে বাইরে যেতে চাইলেন না। এখানেই হো-দের মাঝে জীবনের শেষ আশ্রয় রচনা করলেন।

ওডেন আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর শোবার ঘরে। নিজের হাতে আঁকা একটি ছবি দেখিয়ে শুক্তিকে বললেন, অনুমান করতে পারো কার ছবি?

শুক্তি একটুখানি হেসে বলল, খুব সহজ। এ ছবি অবশ্যই শনিচারির।

ওডেন বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে।

শুক্তি বলল, এতে বুদ্ধির একটুও দরকার হয় না। কিন্তু আপনি যে এত ভাল ছবি আঁকতে পারেন তা জানতাম না।

আমরা সেদিন ওডেন সাহেবের আঁকা ছবি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একটি সুন্দরী আদিবাসী তরুণী মেয়ে যে এমন জীবন্ত রূপ নিয়ে চিত্রিত হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

ছবিটি শোবার ঘরের দেয়ালে ঝোলান ছিল। বৃদ্ধ শয্যায় শুয়েও যাতে ছবিটি দেখতে পান সেজন্যে পায়ের দিকের দেয়ালেই সংলগ্ন ছিল ছবিটি।

বৃদ্ধ আমাদের কফি খাওয়ালেন। একটি কিশোর আদিবাসী ছেলে ওডেন সাহেবকে সাহায্য করছিল। আমরা সেদিন ওডেন সাহেবের কোয়ার্টার থেকে অনেক আনন্দ নিয়ে ফিরেছিলাম। কিন্তু এর কয়েক মাস পরে যখন আবার ওঁর কোয়ার্টারে গেলাম তখন আমাদের অন্য আর একটি করুণ চিত্রের মুখোমুখি হতে হল। সেদিনটি ছিল বিস্ময়কর এক যোগাযোগের দিন। আমরা কয়েকদিন থেকেই প্ল্যান করছিলাম ওডেন সাহেবের কোয়ার্টারে যাবার কিন্তু সোমের কাজের চাপের জন্যে তা হয়ে উঠছিল না। এক সময় শুক্তি আমাদের জোর করেই সাহেবের কুঠির দিকে টেনে নিয়ে চলল। মাঝপথে হঠাৎ ওর কী যেন মনে পড়ে গেল। গাড়ি চালাচ্ছিল সোম। শুক্তি গাড়ি থামাতে বলে হঠাৎ বলে উঠল, আজ সাতই জুলাই না?

কারওই ঠিক খেয়াল ছিল না এই বিশেষ তারিখটির ব্যাপারে। আর আশ্চর্য, ক'দিন মেঘভাঙা বৃষ্টির পর সেদিনটিতেই আকাশ ভরে রোদ উঠেছিল। সারাদিন রোদ্দুর পেয়ে খুশিতে ঝলমল করছিল সারান্দা বন। আমরা বেলা তিনটের সময় গাড়ি নিয়ে পৌঁছোলাম। সাহেবের কুঠির খানিকটা দূরে গাড়ি রেখে আমরা এগোতে লাগলাম। সাতই সন্ধ্যায় তো ওঁর সারান্দা বনে হুঁশিয়ারি দিয়ে বেড়াবার দিন। ফেরার পথে বৃদ্ধ মানুষটিকে না হয় গাড়িতেই তুলে আনা যাবে ফরেস্ট বাংলোতে। পরের দিন ভোরবেলা আবার পৌঁছে দেওয়া যাবে ওঁর কুঠিতে।

শুক্তি হঠাৎ বলে উঠল, দেখো, দেখো, কত মানুষ জড়ো হয়েছে সাহেবের কুঠির কম্পাউন্ডে। আজ সাত তারিখে নিশ্চয়ই ওডেন সাহেব কোনও অনুষ্ঠান করে মানুষজনকে আপ্যায়ন করে থাকেন।

আমরা কম্পাউন্ডে এসে পৌঁছোলাম। কিন্তু একী দৃশ্য দেখছি! লাইন-বন্দি হয়ে হো মেয়ে-পুরুষ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে একগুচ্ছ করে ফুল লতাপাতা। মুখগুলি ম্রিয়মান। আমরা ওই লাইনের শুরু যেখানে সেখানে চোখ ফেলতেই দেখলাম, চার্চের এক পাদরি সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

শুক্তি ফিসফিস করে বলল, গাছের তলায় যেখানে পাদরি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার পাশেই তো শনিচারির কবর। আর ওই যে বেতের আর্মচেয়ারে কে যেন এলিয়ে বসে রয়েছেন

আমরা পাশের গেট দিয়ে একেবারে কোয়ার্টারের সামনে চলে গেলাম। একটি আদিবাসী খৃষ্টান মেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। সোম নিজের পরিচয় দিয়ে ব্যাপার কী জানতে চাইলে মেয়েটি বলল, আজ ভোরবেলা ওই গাছের তলায় সাহেবের ইচ্ছা অনুযায়ী আমি চেয়ারটি পেতে দিই। অনেকদিন পর পরিষ্কার রোদটুকু উনি উপভোগ করছিলেন। এক সময় এই কুঠির জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, উনি সামনের বেদির দিকে চেয়ে কথা বলছেন। ওটি একটি এদেশীয় মেয়ের কবর। অবশ্য ওঁর সামনে তখন কোনও দেহধারী মানুষই ছিল না। ব্যাপারটা ওঁর খেয়াল মনে করে আমি বাংলোর কাজে মন দিয়েছিলাম। পরে জলযোগের জন্যে ওঁকে ডাকতে গিয়ে দেখি, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। সামান্য সময় দাঁড়িয়ে থেকে ওঁকে ডাকলাম। কিন্তু সাড়া নেই। এমনটি তো কখনও উনি করেন না। ভীষণ সতর্ক, সজাগ মানুষ উনি। বার বার ডাকলাম, সাড়া নেই। এবার হাত ধরে নাড়া দিতেই ওঁর মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়ল। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম দেহে ওঁর প্রাণ নেই।

সব শুনে বিষণ্ণ মনে আমরা ওঁরই বাগানের ফুল সংগ্রহ করে লাইনে দাঁড়ালাম। এক সময় ওডেন সাহেবের কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা তিনজন। সেই বেতের চেয়ারেই গা এলিয়ে শুয়ে আছেন। মাথার ওপর ঝুঁকে-পড়া গাছের ডাল থেকে কয়েকটা সাদা ফুল ঝরে পড়েছে তাঁর বুকের ওপর। মৃত্যুর পরেও যে মানুষের মুখ এত প্রশান্ত সুন্দর হতে পারে তা ওডেন সাহেবকে না দেখলে কখনও জানতে পারতাম না।

একদিন প্রশ্ন করলাম বনবাবুকে, আপনি ভারতের বাইরে কখনও কোনও বন দেখেছেন?

দেখেছি মানে? ষোল সতের বছর বয়সে আমি বার্মার জঙ্গলে যাই কাকার সঙ্গে। ওখানে আমাদের কাঠের কারবার ছিল। ওখানেই তো আমার রসিদ আলির সঙ্গে দেখা। শুধু দেখা নয়, কয়েকটা বছর একসঙ্গে থাকা।

রসিদ আলিটি কে?

সে এক তাজ্জব মানুষ। রসিদকে না দেখলে, তার কথা না শুনলে জগত সংসারে এমন একটা যে মানুষ আছে তা ধারণা করা যাবে না।

একটু থেমে বনবাবু বলতে লাগলেন, বার্মার অ্যাঠারান ডিভিসনের হেড কোয়ার্টার ছিল 'মোলরিন' শহর। মস্ত বড় কাঠের ব্যবসা কেন্দ্র। পাশেই সালুইন নদী। ওই সালুইন গিয়ে মিশেছে চাইন নদীতে। চাইন বেয়ে কিছু পথ গেলে চাইন শেগ্‌জি বন্দর। চাইনের দক্ষিণ তীরে থ্যাচাং ফরেস্ট ডিভিসান। ওই থ্যাচাং-এর পূর্ব দক্ষিণ কোণে বার্মা থাইল্যান্ডের বর্ডারে রেগং ফরেস্ট। ওখানেই ছিল আমাদের কাঠের ইজারা। সেগুন আর গর্জন কাঠের জঙ্গল ইজারা নেওয়া হয়েছিল।

বললাম, কাঠ কি মোলরিন শহরেই আনা হত?

হ্যাঁ। তবে সেখান থেকে কলকাতায় চালান দেওয়া হত।

মোলরিন থেকে ডাঙা আর নদীপথে আপনাদের রেগং ফরেস্ট প্রায় কতখানি পথ ছিল?

বনবাবু বললেন, থ্যাচাং ফরেস্ট ডিভিসানের ভেতরেই ছিল আমাদের ইজারা নেওয়া রেগং ফরেস্ট। মনে হয় সব মিলিয়ে মোলরিন শহর থেকে এর দূরত্ব তিনশো মাইল মতো হবে।

ওখানে আপনারা জঙ্গলে কাঠ কাটাতেন কাদের দিয়ে? মোলরিন থেকে কি কুলিকামিন সঙ্গে নিয়ে যেতেন?

পাগল হয়েছেন। এতসব কুলি কি নিয়ে যাওয়া সম্ভব এতদূর থেকে। ওখানকার আদিবাসী 'কোরিন'-রাই কাঠ কাটত। জংলি কিন্তু বড় উদার মন। সর্বভুক ওরা। সাপ, ব্যাঙ, বাঘ কিছুই বাদ যেত না।

বললাম, ভারী মজার মানুষ তো ওরা।

গরিব কিন্তু চোর ছ্যাঁচোড় ছিল না। বনের গাছপালার মতোই সবুজ, সতেজ আর বিশাল হৃদয় ওদের। ওরা কাঠ কাটত আর হাতিও চালাত।

হাতি নিয়ে ওরা কী করত?

বড় বড় কাঠের লগ বন থেকে নদীর ধার অব্দি টেনে নিয়ে যেত হাতি।

এবার কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বনবাবু। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, তিনি আর তখন আমার পাশে বসে নেই। স্মৃতির পথ বেয়ে এখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন রেগং ফরেস্টে।

ঠিক তাই। অনেক দূর থেকে স্মৃতির অরণ্যের ভেতর দাঁড়িয়ে বনবাবু বলতে লাগলেন, সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে। বনের গভীরে লতাপাতা গাছকে জড়িয়ে জমে উঠছে চাপ চাপ অন্ধকার। পশ্চিম আকাশ জুড়ে তখনও অস্ত সূর্যের রঙিন সমারোহ। হাতির পিঠে চড়ে বন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কেরিন যুবক। কাঠের লগ টেনে আনছে হাতি। পশ্চিম আকাশের বুকে চোখ পেতে গান গাইছে কেরিন যুবকটি ঃ

'অ্যামা নিশা অ্যামেয়া
সাংগা উইটা ঢং
সাংগা উইটা অ্যামেয়া
ইসা ব্যলে লবেমিয়া।'

জানেন মশাই এখনও আমার কানে বাজছে সেই গানের সুর। আমি ছবিটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

বললাম, সত্যি লোকসংগীতের সুর একেবারে প্রাণের মধ্যে ছোঁয়া লাগিয়ে উধাও করে নিয়ে যায়।

আবার উদাস হলেন বনবাবু, মেপিলের গলায় কত গান শুনেছি।

মেপিল কে?

বছর কুড়ি বয়সের একটি ভুটানি মেয়ে। গ্রাম ছিল ওর ভুটানের পেহাল বলে একটি জায়গায়। বাবামা-মরা কিশোরী মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল আসামের চা বাগানে। এক সময় খাদে পড়ে বাবার অপঘাত মৃত্যু হলে মেয়েটি সহায় সম্বলহীন অকূল সংসারে একা ভাসতে লাগল। আমি তখন আসামের দরং ফরেস্টে একটা এরিয়া ইজারা নিয়েছি। বিশাল বিশাল বনসাম গাছের জঙ্গল। গাছ কাটা হচ্ছে। কুলিরা কাজের শেষে গাঁয়ে চলে যাচ্ছে। আমি সন্ধ্যায় একা বসে থাকি ছোট্ট কাঠের ঘরখানার ভেতর। সবে গেছি, রান্নার লোক জোগাড় হয়নি। নিজে দু'-চারদিন হাত পুড়িয়ে ফুটিয়ে খাচ্ছি। একদিন একটি কুলি তরুণী মেপিলকে সঙ্গে করে নিয়ে এল আমার ডেরায়। নাকের দু'পাশে চাকতিওলা নাকচাবি। কানে পাঁচ-ছটা করে রিং।

কুলিটি বলল, বনের শেষে রোহিং নদীর ধারে পিবং গাঁয়ের মোড়লের আশ্রয়ে ও থাকে।

শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু আছে। নিজের খাওয়া পরার ব্যবস্থা ওকে নিজেকেই করে নিতে হয়। আপনার রান্নাবান্না ও করে দেবে। খুব কাজের মেয়ে, দেখে নেবেন।

আমি বললাম, সব তো বুঝেছি কিন্তু একখানা ঘর, ও থাকবে কোথায়?

জলতরঙ্গের মতো হাসিতে বেজে উঠল মেয়েটি। পরক্ষণেই চুপ। আমি তো অবাক। হাসির আবার কী হল?

কুলিটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, ও এখানে থাকবে না কত্তা। ভোরবেলা এলে সাঁঝবেলা চলে যাবে। সারাদিন আপনার সব কাজ করে দেবে। রাতের রান্না সেরে সাঁঝে ও ফিরে যাবে পিবং গাঁয়ে।

মেপিল কাজে বহাল হয়ে গেল। আসামের চা বাগানে কাজ করার সময় ও বাঙালিদের সঙ্গে মিশে বাংলা শিখে গিয়েছিল। আমার কুলিরা বাংলা ভাষা বুঝতে পারলেও বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারত না, কিন্তু মেপিল আমার সঙ্গে সমানে বাংলা ভাষায় আলাপ করত।

প্রথমদিন ভোরে কাক কোয়েল ডাকেনি, মেপিলের ছোট্ট আঁটসাট দেহখানা বনসাম জঙ্গলের ফাঁকে দেখা গেল। রোহিং নদীর দিক থেকে মিঠে হাওয়া বইছিল। বনসাম গাছের ডাল পাতার ফাঁকে ফাঁকে নীলাভ ঊষার সঙ্গে হালকা লালের আভা ফুটে উঠছিল। আমি আমার বিছানায় বসে ছোট্ট জানালাটা খুলে রেখে প্রকৃতির দরজা খোলার আয়োজন দেখছিলাম। মেপিল বনের মধ্যে একবার হারিয়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। হঠাৎ আমার কানে এক ঝলক ভোরের হাওয়ার সঙ্গে ভেসে এল এক কলি গান : "পোয়েল পোয়েল ইয়াং ইং ইং ইং'—সূর্য ওঠো, সূর্য ওঠো।

সেই প্রভাতী মুহূর্তটি ওই একটিমাত্র গানের সুরে যেন আলোর দেবতার কাছে স্তব বলে মনে হল।

এমনি কত গান আমি শুনেছি মেপিলের গলায়। আসামের কত লোকসংগীত। আবর জাতির একটানা সুরের সেই গান 'মিয় জিনি উইং ওয়াসিং ওয়াং গাং গাং'। এখনও কানে বাজছে সেইসব সংগীতের সহজ কথা আর সুর।

মেপিলকে আমি কখনও গান গাইবার জন্য ফরমাস করতাম না। ও কাজের ফাঁকে যখন আপনমনে টুকরো টুকরো গান গাইত তখন আমি আড়ালে আবডালে থেকে শুনতাম ওই প্রাণ মাতানো সব সুর। মেপিলের গলায় লোকসংগীত শোনা যেন এক অভিজ্ঞতা। আমার গান শুনতে শুনতে মনে হত কোথায় যেন উদাসী একটা নদী বিবাগী হয়ে বয়ে চলেছে। আমি যেন বনজ্যোৎস্নায় মখমলের মতো সবুজ গোল গোল বনসাম গাছের পাতাগুলোকে ডুবে ডুবে স্নান করতে দেখছি। একটা পাখি বনের বুক চিরে হাহাকার করে একবার ডেকে উঠে থেমে গেল। সেই বার্মার জঙ্গলে কেরিন যুবকটি হাতির পিঠে চেপে চলেছে অস্ত সূর্যের আভাটুকু গায়ে মেখে।

এমনি টুকরো টুকরো কল্পনা আর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত আমার মন।

প্রথম দিন মেপিল সকালের জলখাবার দিয়েছিল মুড়িকে তেলে ভেজে। মুড়ির সঙ্গে ছিল জিরে, আদা, ধনেপাতা আর টাসি। টাসি হল এক জাতীয় গাছের শেকড়। মুড়িটি ভারী উপাদেয় হয়েছিল খেতে। এরপর থেকে প্রায়ই আমি সকালের জলখাবারে মেপিলকে মুড়ি দিতে বলতাম।

মেপিল সারাদিন যেহেতু আমার কাজে নিযুক্ত থাকত তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল আমার ডেরাতেই। বিকেল চারটের পর ছায়া ঘনাত বনে। লোকজন কাজকর্ম সেরে চলে যেত। রান্নাবান্না শেষ করে ও আমার বিছানাপত্র ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে উঠোনে মহুয়া গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়াত। কখনও মহুয়ার ফুল কুড়িয়ে আঁচল ভরত। কখনও বা শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকত। বেলা শেষের একফালি কনকচাঁপা রোদ তার গাল আর নাকচাবির ওপর পড়ে চমক দিত।

আমি একটা মোড়ায় বসে গল্প শুরু করলে ও মহুয়াগাছের তলায় হেলান দিয়ে বসে আমার কথা শুনত আর দরকার মতো উত্তর দিত। তাড়া করত না গাঁয়ে ফেরার জন্যে। আমি বরং সন্ধ্যা ঘন হয়ে নামলে ওর পথের কথা ভেবে ব্যস্ত হয়ে উঠতাম কিন্তু ও তাতে কান দেবার বড় বেশি দরকার আছে বলে মনে করত না। কোনওদিন বা ওকে টর্চ নিয়ে বনের সীমানা পার করে দিয়ে আসতাম। ও নদীর ধারের রাস্তা ধরে চলে যেত গাঁয়ের দিকে। ও বলত, এসব পথঘাট খানাখন্দ ওর মুখস্থ।

মেপিল তখন অনেকখানি সহজ আর ঘনিষ্ঠ হয়েছে। একদিন ওকে বললাম, তুমি যখন হাস তখন হয় মুখে হাত চাপা দাও নয়তো অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নাও, এর কারণ কী?

ও অমনি হেসে কুটিপাটি। এবার আর ও মুখে হাত চাপা দিল না কিংবা মুখখানা ঘুরিয়েও নিল না। আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে হাসল। দেখলাম ওর দাঁতগুলো একটু অসমান। আমার কিন্তু খুব ভাল লেগে গেল। মিষ্টি মুখখানার সঙ্গে অসমান দাঁতগুলো বেশ খোলতাই হয়েছে। বললাম, মেপিল, এতদিন মুখের ভেতর এমন সুন্দর একটা জিনিস লুকিয়ে রেখেছিলে! আমি কি তোমার ওই সুন্দর দাঁতের হাসিটুকু চুরি করে নিতাম?

আবার উপচে পড়া হাসি মেপিলের। এবার কিন্তু অভ্যেস বসে ও তেমনি মুখে হাত চাপা দিল। আমি অমনি বলে উঠলাম, সরাও হাত।

ও তখুনি হাত সরিয়ে হাসতে হাসতে কুঠির পেছনের দিকে পালিয়ে গেল।

এমনি টুকরো টুকরো আলাপচারী চলত আমাদের। কতদিন কলকাতা ছাড়া। তেজপুর থেকে এই দুনিয়াছাড়া জায়গাটায় এসে পৌঁছোতে হাতির পিঠে পুরো দু'দিন সময় লেগেছে। দামি বনসাম কাঠের লোভেই এখানে আসা। দূর বলে ডাকটাও ধরেছি সস্তায়।

দুপুরে কাজের জায়গা থেকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে খেতে আসতাম। সে সময় মেপিল খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ত। আমার চানের জল সে তুলে রাখত কুঠির পেছনে একটা হলং গাছের তলায়। আমার গামছা আর কাপড় পাট করে রেখে দিত গাছের নীচে ডালের একটা ফ্যাকড়ায়। বড় বড় দুটো বালতিতে জল টলটল করত। একদিন স্নান করতে গিয়ে তাজ্জব বনে গেলাম। মগে জল নিয়ে মাথায় ঢালতেই এক ধরণের ভারী মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগল। আবার ঢাললাম, আবার গন্ধ ভুরভুর করছে।

স্নান সেরে এসে দেখি আসন বিছিয়ে খাবার ঢাকা দিয়ে একটু তফাতে হাঁটুতে মুখ গুঁজে মেপিল রোজকার মতো আমার প্রতীক্ষা করছে।

আসনে বসে বললাম, তুমি কি জাদু জানো মেপিল?

ছোট ছোট ভুটিয়া চোখ মেলে ও আমার দিকে তাকাল।

বললাম, জলে হাত দিলেই সুবাস উঠছে!

ও হাসি হাসি মুখে বলল, তাই বুঝি ?

এবার চেপে ধরলাম, রহস্যটা কী বলতো?

ও মাথা নেড়ে কানের রিং দুলিয়ে বলল, সে আমি জানি না। আপনি খান।

হাত গুটিয়ে বসে রইলাম দেখে ও বলল, কী হল, আপনি খাচ্ছেন না যে?

না বললে আজ আর খাবই না।

ও অমনি বলল, আপনি খান, আমি কথা দিচ্ছি আজ গাঁয়ে ফেরার আগে জাদুটা আপনাকে বলে যাব।

অপরাহ্নের আলো ম্লান হয়ে আসতেই একে একে কুলিকামিনরা চলে গেল।

সাঁঝের মুখে একমুখ টেপা হাসি নিয়ে মেপিল বলল, এবার আমি যাই।

অমনি উঠোনে নেমে ওর পথ আটকে বললাম, কই যাও তো দেখি। কী কথা দিয়েছিলে খাবার সময়, মনে নেই?

মেপিল মহুয়া গাছটায় হেলান দিয়ে হাসি হাসি মুখে অন্যদিকে চেয়ে রইল।

এক সময় আমার দিকে ফিরে বলল, জাদুকর যদি তার সব জাদুর খেলা সবাইকে শিখিয়ে বেড়ায় তাহলে তার রোজগারটাই যে বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি কথা দিচ্ছি যতদিন এখানে থাকব ততদিন তোমার রোজগারের পথ বন্ধ হবে না।

মেপিল বেশ মজা করে বলল, বাঁচলাম।

তারপর মহুয়াগাছের তলায় বসে পড়ে বলল, তাহলে খানিকসময় বসে যেতে হবে। জাদু শেখাবার একটা বিশেষ সময় আছে।

আমি এই জনমানবহীন অরণ্যের এক নিভৃত প্রচ্ছায়ে বসে দু'দিনের পরিচয় সূত্রে বাঁধা এক তরুণীর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম।

আচ্ছা মেপিল, ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে ?

ও ঘাড় কাত করে জানাল, খুব।

তোমার মায়ের মুখ?

সঙ্গে সঙ্গে অপরাহ্নের ম্লান ছায়ার মতো বিষণ্ণ একটা ছায়া পড়ল মেপিলের মুখে।

বললাম, থাক, মায়ের কথা আর বলতে হবে না। তুমি কোনও কারণে কষ্ট পাও এটা আমি চাই না। অন্য কথা বলো।

মেপিল কয়েকবার মাথা নেড়ে বলল, দুঃখের কথা তো বেশি করে বলতে হয় বাবুজি। ওতে প্রাণটা হালকা হয়। নইলে সারাক্ষণ মনে হয় বুকের ওপর পাথরের ভার।

আমি চুপ করে ওর দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

ও কিছু সময় আপন মনে কীসব ভেবে নিয়ে আবার বলল, তবে সব দুঃখ তো সবার কাছে বলা যায় না বাবুজি, বুকের মাঝে যত কষ্টই হোক চেপে রাখতে হয়।

আমি এবার কথার মোড় অন্যদিকে ফেরাবার জন্যে বললাম, আজ কী তিথি বলতে পার?

একমুখ হাসি ফুটিয়ে মেপিল বলল, যে তিথি হলে আপনি খুশি হন সেই তিথি।

অমাবস্যে?

ও অমনি সোচ্ছ্বাসে বলল, দুষ্টুমি করবেন না যেন, ঠিক করে বলুন।

চাঁদটা যেদিন ঠিক তোমার মুখের আকার পাবে সেই তিথি আমার প্রিয়।

ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি যেরকম হেঁয়ালি শুরু করেছেন, আর এখানে থাকা যাবে না।

বসো বসো, আর তোমাকে খ্যাপাবনা। আমি তোমার মতো পূর্ণিমা তিথিটাই ভালবাসি।

ও আর বসল না, মহুয়া গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় আমার দিকে ফিরে বলল, মায়ের কথা জানতে চেয়েছিলেন না?

মাথা নাড়লাম।

ও বলল, আমাদের গ্রামটা ছিল ছবির মতো। দূরে ঝকঝক করছে বরফের পাহাড়। সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বরফগলা জলের নদী কাউ। সেই নদীর ধারে পড়শী মেয়েদের সঙ্গে মা আমার হাত ধরে নিয়ে যেত । একটা সোনাখারি গাছের তলায় আমাকে বসিয়ে রেখে মা মেয়েদের সঙ্গে কোরা গাছের ক্ষার দিয়ে কাপড় কাচত। আমি চেয়ে চেয়ে তাই দেখতাম। এই আমার মাকে নিয়ে প্রথম স্মৃতি বাবুজি।

তোমার দেশের আর কোন ছবি মনে পড়ে ?

একবার বাবা মা আর গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে কোথায় যেন গিয়েছিলাম। অনেক উঁচু পাহাড়ে এক একজন করে সারি বেঁধে উঠেছিলাম। সেখানে একটা গুম্ফার সামনে মস্ত বড় মাঠের মতো ছিল। গুম্ফার পেছনে ঝলমল করছিল বরফের পাহাড়। অনেক লোক জড়ো হয়েছিল সেই মাঠে। আমরা সকলেই খুব রংচঙে পোশাক পরে গিয়েছিলাম। সাদা ঘোড়ায় চড়ে লাল পোশাক ঝুলিয়ে ঘুরতে লাগলেন এক লামা। পেছনে চলতে লাগল ওই গুম্ফার অন্যসব লামারা। একজনের হাতে দেখেছিলাম মস্ত লম্বা একখানা বাঁশ। তার মাথায় জড়ানো পতাকা। ঘোড়ায় যে লামাটি চড়েছিলেন তাঁর কপালের ওপর ঝুলছিল একটা সোনার চাকতি। রোদ্দুর পড়ে মাঝে মাঝে সেটা চমক দিচ্ছিল।

এরপর তিরের খেলা হল। দূরে একটা কাঠ পুঁতে তার গায়ে ছোট্ট সাদা একটা গোল চিহ্ন দেওয়া ছিল। তিরন্দাজরা তির ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল। যাদের তির ওই চিহ্নে গিয়ে লাগছিল তারা আনন্দে শূন্যে লাফ দিয়ে উঠছিল। আমার বাবাও একখানা ধনুক নিয়ে তির ছুঁড়ল। আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল ভয়ে। আমি বাবার তির ছোঁড়ার সময় চোখ বন্ধ করে রইলাম। হঠাৎ একটা আনন্দের আওয়াজ শুনে আমি চোখ খুলেই দেখি বাবা শূন্যে লাফ দিয়েছে।

বললাম, নিশ্চয়ই কোনও একটা উৎসব ছিল।

মেপিল বলল, নিশ্চয়ই। তবে কী উৎসব তা এখন আর বলতে পারব না। শেষে মুখোশ নাচ হল। এখনও মনে আছে, কালো টুপি পরে একটা লোক বোঁ বোঁ করে পায়ের ওপর ভর রেখে ঘুরতে লাগল। একসময় তার পোশাকখানা গোল হয়ে হাওয়ায় ফুলে উঠল। মনে আছে আমি তার কসরতি দেখে কতক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে চেয়েছিলাম। পরে যখন লোকটি চলে গেল তখন পাশে ফিরে দেখি মা নেই। আমি খুব অসহায়ের মতো চারদিকে তাকাতে লাগলাম। ভীড়ের থেকে বাবা এগিয়ে এসে বলল, ভয় নেই, সামনে তাকিয়ে থাকো, মাকে এখুনি দেখতে পাবে।

কিছুক্ষণের ভেতর দেখি গুম্‌ফার পাশ থেকে হাত ধরাধরি করে একদল মেয়ে এগিয়ে আসছে। তারা মাঠের মাঝখানে এসে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। আমি আনন্দে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম, ওই তো আমার মা।

এবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ আঁচল দিয়ে চোখটা মুছল মেপিল। বুঝলাম, এ অশ্রু হারানো মায়ের কথা ভেবে। আমি আর ওকে সেই প্রসঙ্গের ভেতর রাখতে চাইলাম না। গাছের ফাঁকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, ওই যে পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠেছে। তোমার ঘরে ফেরার সময় পেরিয়ে গেল।

মেপিল চঞ্চল হয়ে উঠল কিন্তু মুখে বলল, যাকগে। এখন চলুন জাদুর রহস্যটা আপনাকে জানিয়ে দিই।

আমি কৌতূহলী হয়ে মেপিলের পেছন পেছন বনের ভেতর ঢুকলাম। একটা সরু স্রোতধারা বনের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। সেখানে বন তত নিবিড় নয়। পূর্ণ চাঁদের আলো জায়গাটাকে বড় মায়াময় করে তুলেছিল। মেপিল সেখানে এসে দাঁড়াল। স্রোতধারার কাছেই ছোট ছোট লতান ঝোপ। মেপিল ঐ ঝোপগুলোর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমি দেখলাম সবুজ পাতার ভেতর অজস্র সাদা ফুল ফুটে আছে। ঠিক বনমল্লির ফুলের মতো। নিচু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারী মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগছিল।

মেপিল বলল, এবার যাদুর সন্ধান পেলেন তো?

বললাম, ফুল চিরদিনই সুন্দর কিন্তু তোমার পরিকল্পনাটা কম সুন্দর নয়। স্নান করলে শরীর জুড়ায় কিন্তু আজ স্নান করে শরীর মন দুটোই জুড়িয়েছে।

আমি ফুল সমেত সরু এক টুকরো ডাল ভেঙে মেপিলকে বললাম, এটুকু তোমার পুরস্কার। যদি কিছু মনে না কর তাহলে এই ফুলের গুচ্ছ তোমার মাথায় পরিয়ে দিতে চাই।

ও কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি কথাটা বলে ফেলে উত্তেজনায় কাঁপছিলাম। সেই অবস্থায় ওর বিনুনীর মধ্যে ফুলটা গুঁজে দিলাম। আশ্চর্য, ও মুহূর্তকাল আর দাঁড়াল না। সেই অবস্থায় বনের ভেতরের পথ ধরে দ্রুত পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বনের বাইরে এসে ওকে আর দেখতে পেলাম না।

রাতে ঘুম আসতে অনেক দেরী হলো। কেবল ফিরে ফিরে মনে বাজতে লাগল, কাজটা আমি ভাল করিনি। যে ভালবাসাকে মনের গভীরে ধরে রাখতে পারব না, তাকে হঠাৎ খেয়ালের খেলায় ছুঁয়ে দিয়ে লাভ কি? একটি তরুণী মনকে শুধু শুধু চঞ্চল, বিক্ষত করে দেবার কোন অধিকার আমার নেই।

অনেক রাত জেগে তবে ঘুমিয়েছিলাম, তাই বিছানা থেকে উঠলাম অনেক বেলায়। উঠে দেখি দরজার বাইরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে মেপিল। দরজা খুলে দিয়ে বললাম, কিছু মনে করনি তো মেপিল?

ও স্থির চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললাম, কাল সন্ধ্যার ব্যবহারের জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত, অনুতপ্ত।

ওর চোখের কোণ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। মেপিল আর এক মুহূর্তও আমার সামনে দাঁড়াল না। রান্না ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

একটু সময় থেমে বনবাবু বললেন, একদিন দরং ফরেস্টের কাজ শেষ হয়ে গেল। টাকা মিটিয়ে কুলিদের ছুটি দিয়ে দিলাম। কাঠ চালানের ব্যবস্থা আগেই হয়ে গিয়েছিল। এবার পিবং থেকে হাতি আসবে আর আমি তাতে চড়ে তেজপুরের পথে পাড়ি দেব।

সকাল থেকে মুখ নিচু করে আমার পথের খাবার তৈরি করছিল মেপিল। একশো টাকার

দু'খানা নোট ওকে দিতে গিয়ে বললাম, এই সামান্য দুশোটা টাকা রেখে দাও মেপিল। তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার দাম টাকা দিয়ে শোধ হবার নয়।

ও প্রবলভাবে মাথা নেড়ে টাকা নিতে চাইল না। আমার খাবার তৈরি করে চলল। আমি দেখলাম ওর দুগাল বেয়ে সমানে জল গড়িয়ে চলেছে।

আমাকে খাইয়ে, পথের খাবার প্যাক করে ও সামনে এসে দাঁড়াল। আমি এরই ভেতর গোছগাছ সেরে তৈরি হয়ে নিয়েছি।

বললাম, এমনি আমাদের জীবন মেপিল। আমরা খুনীর চেয়ে একটুও ওপরের লোক নয়। বনের পর বন কেটে উজাড় করে চলেছি।

মেপিল বলল, বাবুজী, আর কিছু কারবার করে টাকা রোজগার করা যায় না?

বললাম, যাবে না কেন।

তবে আপনি এ ব্যবসাটা ছেড়ে দিন বাবুজী। আমি দেখেছি, এক-একটা গাছ কাটার পর আপনার মন কাঁদে।

তোমার কথা মনে রইল মেপিল। অনেকদিন থেকে ব্যবসাটা ছাড়ব ছাড়ব ভাবছি।

আপনি চলে যাবেন বাবুজী আর এ শূন্য বনটা খাঁ খাঁ করবে। বনের আড়ালে নিজের দুঃখকে লুকিয়ে রাখব তার একটা জায়গা রইল না।

হঠাৎ কি মনে হলো, ঐ দুদিনের পরিচিত ভুটিয়া মেয়েটির হাত ধরে বললাম, তোমার ভালবাসার জায়গায় আমি আর আঘাত করব না মেপিল। কথা দিচ্ছি, বনের গাছ কাটার কারবার এখানেই আমার শেষ।

মাহুত তার হাতি নিয়ে এল। আমি হাতিতে চড়ে মেপিলকে পেছনে ফেলে তেজপুরের দিকে এগিয়ে চললাম।

বেশ কিছু পথ গিয়ে একবার শেষ দেখা দেখব বলে দরং ফরেস্টের দিকে তাকালাম। বনসাম গাছের নিবিড় জঙ্গল ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। মহুয়া গাছটা স্পষ্ট দেখা গেল। ঐ তো মহুয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে মেপিল। একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর বাবুজীর চলে যাওয়া পথের দিকে।

একসময় বললাম, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটা কথা জানতে চাইব।

বলুন, স্বচ্ছন্দে।

মেপিলকে যে কথা দিয়ে এসেছিলেন তা কি রক্ষা করেছিলেন?

অবশ্য করেছিলাম। সে জন্যে আমার ঠাকুর্দার আমলের ব্যবসার অনেক ক্ষতি হয়।

বনবাবুকে মুডে পেয়ে বললাম, এবার কিন্তু আপনার বার্মা জংগলের গল্প শুনতে চাই।

ভদ্রলোক বার্মার গল্প শুরু করলেন।

চলেছি আমরা ক'জন মোলমিন শহর থেকে রেগং ফরেস্টের দিকে। রেগং-এ কাঠের ইজারা নেওয়া আছে। আমার কাকা আছেন সেখানে। আমি শুধু তরুণ নয়, একেবারে অনভিজ্ঞ। বন দেখার কৌতূহল নিয়ে কলকাতা থেকে গিয়েছি। মোলমিনে তখন কাঠ নিয়ে

এসেছিল আমাদের লস্কর রসিদ আলি মোল্লা। সে-ই তার সঙ্গীসাথী লস্করদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে চলেছিল রেগং-এ। সালুইন নদীতে স্টিমারে চলেছি। ভারী ভাল লাগছে। স্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক পাখি কতদূর অব্দি উড়ে এল। দুই তীরে প্রকৃতির সবুজ সমারোহ। চোখ জুড়িয়ে যায়। সালুইন থেকে এক সময় ঢুকলাম চাইন নদীতে। কিছুদূর এসেই পেলাম চিয়াং শেংগজি বন্দর। ওখানেই আমাদের নামতে হল।

বন্দরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিয়ে বাস ধরলাম। রসিদই গাইড। তখন রসিদ সত্তর বছরের পাঠ্‌ঠা যোয়ান। চাটগাঁয়ের মাল্লা। আমাদের কাঠের ব্যবসায়ে কাজ করছিল তখন। বনে গাছ কাটা হলে লগ তৈরি হতো। ফরেস্ট অফিসার হ্যামার করে দিয়ে যেতেন। তারপর র‍্যাফট বেঁধে খরস্রোতা নদীতে ভাসান হতো। ঐ কাঠের বাণ্ডিলে চেপে তাকে চালিয়ে নিয়ে আসত তিন চারজন লস্কর। ঐ লস্করদের হেড ছিল রসিদ আলি মোল্লা। দারুণ খরস্রোতা নদীতে র‍্যাফট চালান রীতিমত বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। নিপুণ হাতে লগি ঠেলে ঠেলে ধাক্কা সামলাতে হতো। তাছাড়া ঘূর্ণির পাকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। শুকনো চিঁড়ে চিবুতে চিবুতে পাঁচ ছ'দিন এমন করে র‍্যাফট চালিয়ে আসতে হতো। একটু বেসামাল হলেই ধাক্কা লেগে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না।

বাসের থেকে অপরাহ্নে নামলাম একটা গাঁয়ে। রসিদের সব জায়গাতেই জানাশোনা। ঘণ্টাখানেকের ভেতর দুটো গরুর গাড়ি যোগাড় হয়ে গেল। আমরা দু'দলে ভাগ হয়ে গাড়ির ভেতর উঠে বসলাম। বেশ ভাল বলদে গাড়ি টানছিল। মাঝে মাঝে ধুলো উড়িয়ে ছুটছিল বলদগুলো। ল্যাজমোড়া, ছড়ির ঘা ছাড়াও মুখে অদ্ভুত সব শব্দ করছিল গাড়োয়ানরা। চাঁদের হিসেব করেই বেরিয়েছিল রসিদ আলি। সঙ্গে মোলমিন থেকে আনা হয়েছিল আমাদের বন্দুকখানা। দূরের পথে জন্তু জানোয়ার, মানুষজনের বিপদ আছে। তাই বন্দুক একটা সঙ্গে দেওয়া হতো রসিদ আলির।

দু-তিন দিনের পথ পেরিয়ে একটা ছোট নদীর ধারে এসে সকাল আটটা নাগাদ ছেড়ে দেওয়া হলো গরুর গাড়ি। লোকগুলো নদীর তীর ধরে দু'তিন ক্রোশ মালপত্র বয়ে নিয়ে চলল। তারপর এক সময় নদী পেরিয়ে ওপারে যাওয়া হল। উঁচু নিচু পাহাড়ী পথের ধার দিয়ে চলতে চলতে বেলা এগারোটা নাগাদ একটা গাছের তলায় এসে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

আশ্চর্য মানুষ এই রসিদ আলি। সত্তর বছরেও তিরিশ পঁয়তিরিশ বছর বয়েসের সঙ্গীদের সঙ্গে সমানে মাল বয়ে এনেছে। লোকটা যেন শক্ত পাথরে তৈরি হারকিউলিসের মূর্তি। সবাই যখন ক্লান্ত হয়ে গাছের ছায়ার তলায় ছড়িয়ে বসেছে তখন রসিদ আলি কিন্তু ক্লান্তিহীন। সে হাতে একটা টাঙি নিয়ে পাহাড়ী বনটার ভেতর ঢুকে গেল। কিছু পরে গাছকাটার ঠকাঠক একটা শব্দ শুনতে পেলাম। সর্দার বনে ঢুকেছে দেখে আর একজন লস্কর তাকে সাহায্য করবার জন্য উঠে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে এক গোছা মুলি বাঁশ টানতে টানতে নিয়ে এল দুজনে। রসিদ বাঁশগুলো একটা সমতল জায়গায় রেখে খণ্ড খণ্ড করে কেটে এক একটা পাব বের করে নিল। আমরা ছিলাম জনা ছয়েক। রসিদ ভাল দেখে ছ'খানা বাঁশের পাব তার অ্যাসিস্ট্যান্ট মগংকে ধুয়ে ফেলতে বলল। তারপর পাত্রে পরিমাণ মতো চাল নিয়ে তাতে পলসন বাটারের কৌটো খুলে ঢেলে চবচবে করে মাখিয়ে ফেলল। তাতে মিশিয়ে দিল নুন, কিসমিস আর বাদাম। তারপর

ব্যাগ থেকে বের করল পরিষ্কার ধোয়া কয়েকখানা সাদা ন্যাকড়া। ওগুলোকে মাখনে ভিজিয়ে নিয়ে ঐ বাঁশের গ্লাশের ভেতর ভরে দেওয়া হলো। তারপর তার ভেতর মাখানো চাল ভরে জল দেওয়া হলো কিছু পরিমাণে। আবার মুখে একখানা কাপড় বেঁধে কাদা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। এমনি করে ছ'খানা গ্লাশ তৈরি হলো।

এবার রসিদ আলির নির্দেশে একটা চৌকোণা গর্ত খোঁড়া হলো। বাঁশের পাবগুলোকে তার ভেতর শুইয়ে দিয়ে ডাল পাতা বেশ করে চাপিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল রসিদ আলি।

বললাম, চিতার মতো কি সাজালে ওটা?

রসিদ সঙ্গে সঙ্গে বলল, প্যাটের চিতা নিভানোর লাইগা ঐ চিতাটা জ্বাললাম কত্তা।

অসাধারণ কথা বলতে পারত রসিদ। দার্শনিকের মতো সব কথা। পরে জঙ্গলে কিছুকাল রসিদের সঙ্গে কাটিয়ে আমি তার ভাব ভাবনার অদ্ভুত সব পরিচয় পেয়েছিলাম।

এখন আগের কথাতে ফিরে যাই। আগুন নিভলে আধপোড়া বাঁশের পাবগুলোকে বের করে আনল রসিদ আলি। তারপর রসিদ বাঁশের ঐ পাবগুলোর মাথায় এমন ধাক্কা লাগাল যে ওগুলো দু'ফাঁক হয়ে গিয়ে বেরিয়ে এল ভাতের তৈরি এক-একটা পাব। ঠিক যেন লম্বা এক-একখানা কেক। একটু ঠাণ্ডা হলে ঝোলাগুড় আর ভিনিগার মেশানো চাটনি দিয়ে ঐ বস্তুটি খেতে লাগলাম। অপূর্ব স্বাদ। ক্ষিদের সময় খেয়েছিলাম বলে হোক অথবা রসিদের বিচিত্র রান্নার জন্যেই হোক, সেই রেগং ফরেস্টে যাত্রার পথে ঐ খাবারের তার আজও মুখের মধ্যে লেগে আছে।

খানিক বিশ্রামের পর আবার শুরু হলো হাঁটা। বিকেল নাগাদ একটা টিলার ওপরে উঠলাম। তা শ' আটেক ফুট উঁচু হবে। টিলার ওপারে চেয়ে দেখি সমতল জায়গা। দূরে দূরে বন। ঐ সমতলের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারটে হাটমেন্ট। প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু কাঠের কতকগুলো খুঁটির ওপর তৈরি হয়েছে ছোট ছোট কাঠের ঘর। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। জন্তুজানোয়ারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই এই ব্যবস্থা। এখানেই আমাদের রেগং ফরেস্টের এলাকা শুরু। আমরা টিলা থেকে নেমে আমাদের বনবাসের আস্তানায় ঢুকলাম। কাকা নেমে এসেছিলেন নিচে। আমাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন।

পাশাপাশি চারখানা ঘর। একটাতে কাকা থাকেন। সেখানে তাঁর হিসেবনিকেশের অফিসও। আর একটাতে থাকে রসিদের সাগরেদ তিনচারজন লস্কর। তাদের পাশে ছোট্ট ঘরটাই রসুইখানা। পশ্চিমের একখানা ঘরে ব্যবস্থা হয়েছে আমার থাকার। সেটা রসিদ আলির আস্তানা। নতুন জায়গা, যদি ভয়টয় পাই, তাই রসিদের সঙ্গে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

ভ্যাপসা গরমের জায়গা। রাতে বাতাস বইলে আরাম লাগে। আমি শুয়েছি খাটিয়ার ওপর। রসিদ নিচে। প্রথম রাতে ঘুম আসছে না। অন্ধকার চরাচর। ছোট্ট জানালার ভেতর দিয়ে আকাশের তারাগুলো চোখে পড়ছে। স্থির দৃষ্টিতে কারা যেন চেয়ে আছে রাতের পৃথিবীর দিকে। ঝিঁঝির একটানা ডাক হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বার্কিং ডিয়ারের জোরাল আওয়াজে। ঘুম আসছে না। সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা গা ছমছমে ভাব।

অন্ধকারের ভেতর থেকে কথা বলে উঠল রসিদ আলি, কত্তা জঙ্গলে হাইছেন ভাল। তবে অয় জঙ্গলে বেশি দিন থাইকেন না। দু'দশদিন হায়েন। দেইখা চইলা যান। এর মহব্বতে পইড়েন না। এর ভয়াল রূপটা দেহেন, ভালবাসায় পইড়েন না।

দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল রসিদ আলির হাপরের মতো বুকখানার ভেতর থেকে।

বলল, অ্যার সব কালটা এর ফেরে কাইটা গেল দাদা।

বললাম, ধেৎ, জঙ্গল আবার ভালবাসতে পারে নাকি।

অভিজ্ঞ রসিদ বলল, বোকা দাদা, কইলকাত্তা যেমন তুমারে ভালবাসে তেমন।

একটু থেমে বলল, তার থেইকাও গভীর রে দাদা।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রসিদ, কই রইল সংসার, কই রইলাম আমি। দ্যাশে তো একদিনও মন টেহে না। খালি জঙ্গলডা মোরে টানে।

একদিন বলেছিলাম, বিবির কাছে যেতে মন টানে না তোমার?

হা হা করে হেসে রসিদ আলি বলেছিল, বিবির টান স্বার্থে আর গাছের টান প্রেমে। গাছ মরে তবু উপকার করে। এরে ছাইড়া কোথা যামু দাদা।

যখন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল রসিদের সঙ্গে তখন ওর কাছ থেকেই শুনেছিলাম, যৌবনকালেও রসিদ বন ছেড়ে দু'বছরে একবার ঘরে যেত কিনা সন্দেহ। তবে নিয়মিত বিবির কাছে টাকা পাঠিয়ে যেত। একবার ঘরে গিয়ে কাণাঘুষোয় জানতে পারল বিবির চরিত্র খারাপ হয়েছে। অমনি রাতের বিছানায় বিবিকে বুঝিয়ে বলল, তার পক্ষে বন ছেড়ে আসা অসম্ভব। আর এ কথাও সে বোঝে, মরদকে অনেকদিন কাছে না পেলে কোন মেয়ের পক্ষে চরিত্র ঠিক রাখা বড় একটা সম্ভব নয়। তাই সে বিবিকে তালাক দিতে চায় আর তারপরই বিবি তার মনের মানুষকে সাদি করুক, কোন বাধা কোন দিক থেকে থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত তার কথায় বিবি নাকি সম্মত হয়েছিল। রসিদ আলি অমানুষ নয়, সে তার বিবিকে তালাক দেবার আগে অনেক গয়নাগাটি আর টাকা-পয়সা দিয়েছিল।

রসিদ আলির গল্প শুরু হতো খাওয়া-দাওয়া চুকে গিয়ে বিছানা নেবার পর। সারাদিন বনের ভেতর রসিদ এক মানুষ আর বিছানা নেবার পর অন্যমানুষ। দিনের আলোয় রসিদ আশমানের সূর্যের মতই দৃশ্যমান। কুলিকামিনদের ওপর প্রখর তার খবরদারী। হাঁক ডাক। যোয়ান মরদের মতো দরকারে কুঠার চালনা। কিন্তু রাত নামলে ঐ শক্ত সমর্থ মানুষটা কেমন যেন শিশুর মত হয়ে যেত। তখন মনের সুখ-দুঃখের কথা বেরিয়ে আসত পাথরের বাধা সরানো ফোয়ারার মুখের মতো!

রসিদের খাওয়ার একটা বাঁধা তালিকা ছিল। মাঝেমধ্যে বনের পশুপাখির মাংস পেলে অবশ্য বদলে যেত রসিদের মেনু। না হলে ঐ একই খাবার খাবে সে প্রতিদিন। তার মেনুতে থাকত একসের লাল চালের ভাত। কিছু নুন, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা আর মরিয়াম ফলের চাটনি। এর সঙ্গে থাকত 'ব্যালেছাও'-এর গুঁড়ো ছড়ান মসুরীর ডাল। ব্যালেছাও তৈরি হতো চিংড়ি শুটকি, লঙ্কা ভাজা আর পেঁয়াজ ভাজা শিলে বেটে। ওটিকে পাউডার করে রেখে দেওয়া হতো। রসিদ আলির অতি প্রিয় খাদ্য এটি।

লুঙ্গি আর কুর্তা পরে বেলা বারটা নাগাদ একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখলাম। তখন আস্তানা ছেড়ে সবাই চলে গেছে বনের দিকে। আমি একা ডেরা আগলাচ্ছি। ওপরের ছোট্ট ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম লোকটার হাতে একটা টাঙি। ও আমাদের হাটমেন্টের সামনে এগিয়ে আসতে আসতে চোখের ওপর হাত রেখে আমার দিকে তাকাল। কাছাকাছি এসে টাঙিটা ওপরের দিকে তুলে বলল, নিনামে বালে?

আমি ঐ বার্মিজ লোকটার ব্যাপার স্যাপার দেখে সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

ও আবার একটুখানি গলা চড়িয়ে বলল, ওয়ানছি থেমেনা থো।

আমি এবার ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলাম, লোকটা নিশ্চিত খুনী। বনবাদাড়ে লুকিয়ে থাকে। ও লোকজন নেই দেখে সুলুক সন্ধান বুঝে-আমার ওপর চড়াও হতে এসেছে। হয়ত কেটে ফেলে রেখে সব নিয়ে পালাবে।

হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। তাড়াতাড়ি কাকার ঘরের মধ্যে ঢুকে বন্দুকটা বের করে আনলাম। সত্যি কথা বলতে কি আমি বন্দুক চালাইনি কোনদিন। তবু ভয় দেখাবার জন্য ওর দিকে বন্দুকটা তাক করলুম।

আর যায় কোথা, কুঁই কুঁই করতে করতে টাঙি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দে দৌড়।

বিকেল পাঁচটায় ডেরায় ফিরে এল সবাই। দেখি কি সেই লোকটা কাকার সঙ্গে রয়েছে।

রসিদ লোকটার দিকে আঙুল তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ছাইড়া দিলেন কত্তা, মাথার খুলিটারে ফাটাইয়া দিলেন না?

কাকা হেসে বললেন, ভাগ্যিস বন্দুক চালাস নি। ও তো আমার হেলপার বা-সাঁও। তুই একা আছিস বলে তোর কাছে ওকে পাঠিয়েছিলাম।

আমি বললাম, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ও যখন টাঙিটাকে ওপরের দিকে তুলে কথা বলছিল। আমি ওর ভাষাই বুঝি না।

কাকা বললেন, ও তোর নাম আর ভাত খেয়েছিস কিনা তাই জিজ্ঞেস করছিল।

সবাই হো হো করে হাসতে লাগল। আমি বুদ্ধু বনে গিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলাম।

এই বা-সাঁও এর সঙ্গে পরে খুব ভাব হয়ে যায়। বনের অন্ধি-সন্ধি লতাপাতার খোঁজ খবর ওর মতো কেউ রাখত না।

রাতে বিছানায় শুয়েছি। রসিদ বলল, বা-সাঁওকে ভয় পাইলা ক্যান বোকা দাদা?

বললাম, ওর ভাষা বুঝি না যে।

হাসল রসিদ। বলল, আরে দাদা গালাগাইলের ভাষা আর ভয়ের ভাষা দুনিয়ায় এক। আর সব ভাষা আলাইদা।

জঙ্গলে চলেছি একদিন। আমি, বংগী আর বা-সাঁও। যে বা-সাঁও একদিন আমার হাতে বন্দুক দেখে ভয় পেয়েছিল, সে সেদিন নিজেই বন্দুক ঘাড়ে চলেছে। ওস্তাদ শিকারী বা-সাঁও। কাকা আমার সঙ্গে ওকে পাঠিয়েছেন ভাল করে আমাকে বনবাদাড় চেনাতে। বংগী পরেছে কুর্তা আর বাম্বী। কোমরের এক পাশে কুডুল ঝুলছে। বাঁশের পাইপ থেকে চুড়চুড় করে আওয়াজ বেরোচ্ছে। চণ্ডু খাচ্ছে বংগী।

আমরা একটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগিয়ে চলেছি। শেওলা জাতীয় গাছপালায় পাহাড়ের তলাটা ভর্তি হয়ে আছে। সামান্য একটু ওপরে সেগুন আর গর্জনের বন। মাঝে লোহাকাঠের গাছ দেখা যাচ্ছে। বার্মিজরা লোহাকাঠের গাছকে বলে পিংকা ডা।

পাহাড়ের ওপর ধীরে ধীরে উঠছি। বংগী লতাপাতা ছাঁটাই করছে হাতের ছোট্ট কুডুলখানা দিয়ে। একটা লতার কাছে গিয়ে পড়তেই বা-সাঁও আমার একটা হাত ধরে কাছে টেনে নিল।

বললাম, কি হলো?

বা-সাঁও বলল, লতাটা ভাল নয়। দেখছ না লতাটার ডগায় হাতির শুঁড়ের তলায় নাকের

ফোকরের মত ফোকর রয়েছে। গায়ে ঐ অংশটা কিছুক্ষণ লেগে থাকলে শরীরের রক্ত বেরিয়ে আসবে।

কচু পাতার চেয়েও বড় বড় পাতা ঐ লতার গায়ে। পাতাগুলো গোল গোল। বললাম, কি লতা এটা বা-সাঁও?

ও বলল, রেগংগী লতা।

আমরা বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছি, হঠাৎ একটা সুগন্ধ নাকে এসে লাগল।

দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, কিসের একটা ভাল গন্ধ নাকে এসে লাগছে বলত?

বংগী বলল, বনের ভেতর কোন ফুল ফুটেছে বোধ হয়।

বা-সাঁও কিন্তু এদিক ওদিক চোখ চালাচ্ছিল। হঠাৎ বন্দুকটা রেখে উবু হয়ে বসে কি যেন দেখতে লাগল।

এই যে দেখে যাও, বুড়িং পোকা গন্ধ ছড়াচ্ছে।

দেখলাম, পোকাটা কাচ পোকার মতো নীলাভ। ভারী মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে চলেছে চারপাশে।

বা-সাঁও বলল, দেখলে তো সামান্য একটা পোকা, বনে থাকে কিন্তু সে তার সাধ্যমত চারদিকে আনন্দ ছড়িয়ে চলেছে।

বললাম, বিধাতা পুরুষের খেলার যেন শেষ নেই। কখনো সুন্দর কখনো ভয়ঙ্কর।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই বংগী হাঁই করে একটা চীৎকার করল। মুহূর্তে ডানদিকে বন্দুক হাতে ঘুরে দাঁড়াল বা-সাঁও। আমি তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখলাম, খানিক দূরে সেগুন গাছের তলায় একটা ভালুক। গা-টা কালো আর মুখখানা বাদামী। দুটো হাতে যেন নাক বাঁচিয়ে সে থপ থপ করে এগিয়ে আসছে। গুম গুম করে দুবার ফাঁকা আওয়াজ করতেই মুখ থেকে হাত নামিয়ে চার পায়ে পাঁই পাঁই করে ছুট লাগাল।

বংগী বলল, ভাগ্যিস বন্দুক ছিল, নইলে থাবা চালিয়ে নাকটাই হয়ত তুলে নিত।

এরা বাংলা আর হিন্দি ভাষাটা কাজের ভেতর থাকতে থাকতে দিব্যি শিখে নিয়েছিল।

এক সময় চলতে চলতে বললাম, বা-সাঁও তুমি এত ভাল বন্দুক চালাতে পার তবু সেদিন আমার হাতে বন্দুক দেখে ছুটে পালিয়েছিলে কেন?

বাঃ পালাব না। যার হাতে যখন বন্দুক তার হাতেই তো তখন ক্ষমতা।

বললাম, তুমি তো আমাদের ভাষা জানতে তাহলে তোমাদের ভাষায় কথা বললে কেন?

আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়ত তোমার কাকার মত আমাদের ভাষাও কিছু কিছু জান। সেদিন আমি ভাবতে পারিনি যে হঠাৎ করে তুমি বন্দুকখানা বের করে আনবে। তাই ভয় পেয়ে কোনদিকে না তাকিয়েই দৌড় লাগিয়েছিলাম।

একটা পাখি গাছের আড়াল থেকে অপূর্ব শিস্ দিয়ে উঠল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পাখিটাকে খুঁজতে লাগলাম। বংগী হাত ইশারায় পাখিটাকে দেখিয়ে দিলে। ধূসর রঙের ছোট্ট পাখি। রূপ নেই তার কিন্তু কণ্ঠ ভরে গুণ যেন আর ধরেই না।

বললাম, কি পাখি ওটা?

বংগী উত্তর করল, প্যামং।

কিছুদিনের ভেতর বনবাদাড়ে ঘুরতে ঘুরতে অনেক রকম পাখির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। টিয়ার মতো সবুজ অথচ আকারে বড় হরিয়াল পাখি। কর্কশ গলার লম্বা ঠোঁটওয়ালা

ধনেশ পাখি। গ্রুহল পাখির রঙটা দেখার মতো। বকের আকার হলে কি হবে, সাদা, হলুদ আর নীল ডোরায় শরীরের কি বাহার! একদিন গঙ্গাফড়িং-এর মতো একটা কি পতঙ্গ আমার মাথার ওপর উড়ছিল, রাধুনী ইয়ংগাঁও তাকে দেখতে পেয়ে গেনং গেনং বলে ছুটে এল। হাঁতে একটা ঝাড়ু নিয়ে শূন্য থেকে সে পতঙ্গটাকে আঘাত করে মাটিতে ফেলল।

আমি অমনি বললাম, আহা নিরীহ পতঙ্গ, ওকে এমন করে মারলে কেন?

ইয়ংগাঁও বলল, গেনং-এর কামড়ে বিষ আছে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে আমি কাছে পিঠের টিলায় বেড়াতে যাই। এখন অনেক লতাপাতা গাছপালা আমি চিনে ফেলেছি। টিলার দিকে যেতে এক জায়গায় প্যামেসু ঘাসের বেড চোখে পড়ে। বড় বড় ঘাস, চোর কাঁটায় ভর্তি। কিন্তু ডগায় অদ্ভুত ধরনের খুব ছোট কালো তারা ফুল ফুটে আছে।

টিলার একটুখানি ওপরে একটা জারুল গাছ। এ দেশীয় নাম তার কায়েন। আমি ঐ গাছের তলায় একটা মসৃণ শিলাখণ্ডের ওপর বসি। প্রান্তরের পশ্চিমে পাহাড়ী বনের আড়ালে ধীরে ধীরে লাল সূর্যটা আত্মগোপন করে। গাছপালার ওপরের আকাশটাকে অদ্ভুত মনে হয়। নীল আকাশের গায়ে হলুদ লালের ব্রাশ দিয়ে কোন চিত্রকর যেন ছবি এঁকে রেখেছেন। এক ঝাঁক কালো কালো পাখি হুস হুস পাখা টানতে টানতে সূর্যাস্তের বনের দিকে উড়ে যায়। সারাদিনের জীবন সংগ্রামের পর নিশ্চিত বিশ্রাম। মনে মনে ভাবি এই পাহাড় অরণ্যে ঘেরা প্রকৃতি কত দিনের পুরাতন। কত পাখি এই অরণ্য বৃক্ষের শাখায় শাখায় নীড় রচনা করে বংশবৃদ্ধি করতে করতে জীবনকাল শেষ করেছে ওরই কোন নিভৃত নির্জনে। আবার পক্ষীকূলের নতুন বংশধরেরা পাখা মেলে এসেছে নতুন নীড় রচনা করতে। দুটি পাখি ছোট্ট নীড়ের উত্তপ্ত আশ্রয়ে স্বপ্ন দেখেছে অনাগত বংশধরের নিশ্চিত আবির্ভাবের। সে স্বপ্ন তাদের একদিন সত্য হয়েছে। নীড়ের মাঝখানে এসেছে গুটিকয় ডিম। আশ্চর্য আবরণের ভেতর প্রাণসৃষ্টির তরল সঞ্চয়। তারপর একদিন মাতৃমমতার উত্তাপে সে ডিম বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসেছে নতুন জন্মের বিহগকুল।

ঝড় এসেছে সংসারে। ক্রুর সর্পের অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ দিতে হয়েছে তাদের। ঝড়ের আঘাতে ভেঙে পড়েছে বহু শ্রমে বহু ভালবাসায় গড়া নীড়। আবার নতুন প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে অরণ্য-আবাস। বৃক্ষও চিরজীবী নয়, কালের আঘাতে একদিন শুষ্ক রিক্ত পত্র হয়ে জীর্ণতার মাঝে অবলুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের সীমাহীন প্রয়োজন তাকে ধ্বংস করে। কিন্তু কি অসীম প্রাণের প্রবাহ এই ভূলোকে, দ্যুলোকে। অদৃশ্য জীবনরসে অঙ্কুরিত হচ্ছে মহীরুহ। বৃষ্টির প্রসাদে, আলোর বন্যায় সে স্নান করে লাভ করছে শ্যামল শ্রী। আবার শূন্যে শাখাবাহু মেলে সে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে নব বিহঙ্গ দম্পতিকে।

ভাবতে ভাবতে সেই তরুণ বয়সেও আমার রোমাঞ্চ হতো। আমি টিলা থেকে নেমে আসার সময় কোন কোনদিন দেখতাম আমার পাশ দিয়ে ছোট ছোট চুবড়িতে ক্যামসুয়ে ফল পেড়ে নিয়ে ওপারে চলেছে অরণ্যবাসী অতি দরিদ্র বার্মিজ মেয়েরা। এ ফল সাধারণত কেউ খায় না। কিন্তু অনন্যোপায় দরিদ্রদের জন্য এই অরণ্যভূমি জীবনধারণের কিছু সঞ্চয়ও রেখে দিয়েছে।

ক্যামসুয়ে এক ধরনের বুনো ঝোপ। বাঁশপাতার মতো সরু সরু পাতা। ভারী সুগন্ধ আছে এই পাতার। এর ফলে আছে মহুয়ার মতো এক ধরণের মাদকতা।

আমাদের ইজারা নেওয়া বনে বা-সাঁওকে নিয়ে একদিন ঘুরছি। স্ক্রিনিং হয়ে গেছে। কাটা কাঠের কাণ্ডগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আছে। কেরিন সম্প্রদায়ের লোকেরা হাতি এনে কাঠের লগগুলোকে টেনে নিয়ে যাবে নদীর ধারে। এখন পাহাড়ী বনে মৃত যোদ্ধাদের মতো পড়ে আছে সুপুষ্ট সারবান গাছের শবদেহগুলি। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে একটা বড় পাথরের পাশে পড়ে থাকা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে পড়লাম। হঠাৎ এক সময় বা-সাঁও চেঁচিয়ে উঠেই আমার দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে, 'গেছি' বলে মেরেছি এক লাফ। বা-সাঁও ছুটে গেল আমার পাশ দিয়ে। তাহলে ও আমাকে তাক করে গুলি ছোঁড়েনি। যদিও গুলিটা আমার পায়ের একেবারে পাশের কোন বস্তুতে এসে লেগেছে।

আমি বা-সাঁওকে অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি বিরাট গোসাপের আকৃতির একটা জীব গুলি খেয়ে পড়ে আছে। তার জিভটা বেরিয়ে আছে মুখের বাইরে। সারা শরীরটা তখনও কাঁপছে। ওটা পড়ে আছে আমার কাঠের গুঁড়ির আসন আর পাথরের চাঁইটার মাঝখানে। জীবটা কয়েক ফুট লম্বা, কিন্তু আশ্চর্য, একটা মাত্র গুলি খেয়েই জীবটা কাত।

বা-সাঁও আমাকে ঐ মৃতদেহটির পাশে ফেলে রেখে কোথায় উধাও হয়ে গেল। বেশ কিছু সময় পরে কয়েকজন বার্মিজ মেয়ে-পুরুষ এল বা-সাঁও-এর সঙ্গে। দেখলাম, তারা একটা বলদ এনেছে। দড়ি দিয়ে ঐ ডাইনোসরের মতো প্রাণীটাকে বাঁধা হলো। তারপর বলদে আমাদের আস্তানার দিকে টেনে নিয়ে গেল মৃত জীবটাকে। সেখানে তার ছাল ছাড়িয়ে মাংস কেটে সবাই ভাগ করে নিলে। কি আনন্দ ঐ বার্মিজদের।

রাতে সব শুনে রসিদ বলল, মাইনসের থাইকা বড় জানোয়ার আর নাই কত্তা। প্যাটের মধ্যি খানে বাঘ ভালুক বনমানুষ সব চালান দিয়া বইসা আছি।

রসিদের উৎসাহে আমরা একদিন চললাম তারা লেকের (স্টার লেক) দিকে। সঙ্গে ছোট একটি তাঁবু। কয়েক মাইল হাঁটার পর পড়ল গভীর এক জঙ্গল। রোপসাল, ধূপ, মজাইল গাছে বনটি ঠাসা। পরগাছা প্রেকার লতায় মিষ্টি মিষ্টি বেগুনী ফুল ফুটেছে। গন্ধ নেই কিন্তু চোখের উৎসব। বংগী এক জায়গায় একটা লতা দেখিয়ে বলল, বড় ভাগ্যে এর দর্শন মেলে কত্তা। এ লতার নাম ম্যাব্বার। আমাদের আশেপাশে কোথাও এ লতা বড় একটা দেখা যায় না।

দেখলাম লতার গায়ে বড় বড় ঘিয়ে রঙের ফুল ফুটেছে। শরতকালে ম্যাব্বার লতায় ফুল আসে। নাকের কাছে ফুল নিয়ে গন্ধ শুঁকতে হয় না। সুতীব্র গন্ধে অনেকখানি বাতাস এই ফুলগুলি আমোদিত করে রাখে।

আমরা এগোচ্ছি। বংগী ধারাল টাঙির কোপে জঙ্গলের জট কেটে পথ করছে। মাথার ওপর গাছে গাছে বাঁদরের দাপাদাপি, বাঁদরামি। ছোট ছোট পাতাসমেত ডাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলচে আমাদের গায়ে মাথায়। আমাদের বীরদর্পে যাত্রা দেখে বন মোরগ চীৎকার করে সামনে দিয়ে ঝটপট শব্দে উড়ে পালাচ্ছে। একটা ধনেশ পাখি কর্কশ গলায় ডাক দিয়ে উঠল। যেন বলতে চাইছে, বনের শান্তি কে ভাঙে? কে ভাঙে?

ভোর রাতে জ্যোৎস্নায় পথ চিনে যাত্রা শুরু করেছিলাম। তিথি ছিল পূর্ণিমা। এখন বেলা ন'টা। মাইল দুয়েক দূরে তারা লেক। কিছুটা সমতল কিছুটা পাহাড়ী পথ ধরে ওঠা-নামা করতে করতে চলেছি। অনেকখানি পথ ঘাস পেরিয়ে যাবার সময় নুন আর আয়োডিন মেখে নিলাম পায়ে। এই সিকি মাইল ঘেসো পথ নাকি জোঁক-রাজ্যের এলাকা। অতিথি আপ্যায়নের জন্যে

দেখলাম হাতির শুঁড়ের মতো শুঁড় বাড়িয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বেগতিক বুঝে শুঁড় নামিয়ে নিচ্ছে। আমি তো ছেলেবেলা থেকেই জোঁকের নামে জব্দ। গাঁয়ে থাকতে পায়ে জোঁক বসলে তুলকালাম কাণ্ড। কিন্তু নতুন জায়গা দেখার আগ্রহে সব সয়ে যাচ্ছি।

অল্প সময়ের ভেতরেই তারা লেকের তীরে এসে পৌঁছলাম। আশপাশের পাহাড় থেকে দু-তিনটে ঝর্ণা এসে পড়েছে তারা লেকে। এতখানি স্বচ্ছ টলটলে জল দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। লেকের তীর ঘেঁষে সবুজ জলজ উদ্ভিদ অনেকখানি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকালয় থেকে বহু দূরে পাহাড় আর জঙ্গল বেষ্টিত জায়গায় অবস্থানের জন্য একে ঘিরে লোক কথা জন্ম নিয়েছে। এই লেকের জলে নাকি একটা দানব আছে। সে বছরের কোন একটা সময় লেকের জল দু'ফাঁক করে জেগে ওঠে। তারপর লেকের তীরে অথবা পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী বনে যে প্রাণী পায় তাই সংগ্রহ করে নিয়ে আবার লেকের জল তোলপাড় করে ডুব দেয়। হাতি, বাঘ, হরিণ, খরগোশ, মানুষ কোন কিছু বাদবিচার নেই। লেকের তলার প্রাসাদে সে বাস করে। সারা বছর ঘুমোয়। একদিন জেগে উঠে দারুণ ক্ষিদের জ্বালায় এইসব প্রাণী সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। তারপর ভোজপর্ব সমাধা করে টেনে ঘুম লাগায় তিনশো চৌষট্টি দিন।

মনে হয় এই লোক কথাটির মূলে আছে রামায়ণের নিদ্রা ও ভোজনবিলাসী কুম্ভকর্ণ।

সে যাক্, তারা লেকের তীরে তাঁবু খাটিয়ে আমাদের রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। আমরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম মাছ ধরার সবরকম সরঞ্জাম। দেখলাম, দুটি জায়গায় মাছ ধরার বেশ জুৎসই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক, খোদ তারা লেকে, অন্যটি দক্ষিণের এক ঝর্ণায়। ঝর্ণাটি এঁকে বেঁকে এসে একটা ছোট্ট ডোবায় পড়েছে। তারপর ঐ ডোবা থেকে বেরিয়েই মিশেছে তারা লেকে। বৃষ্টিকালে ছোট ছোট উজানী মাছ তারা লেক থেকে উঠে ঐ ঝর্ণার বিরুদ্ধ স্রোত ঠেলে গিয়ে পড়ে ডোবার মতো জায়গাটায়। তাই ওটাতে নাকি সারাবছর ছোটমাছ কিলবিল করে।

আমরা ছিপ নিয়ে বসতে না বসতেই তারা লেক থেকে উঠে এল প্রমাণ সাইজের তিন তিনটে মহাশোল। আমি একটাকে গেঁথে তুলতে পেরে আনন্দে অধীর। বাকী দুটো রসিদের শিকার। মনে হলো লেকের দানব মহারাজ মাংসাশী হলেও মৎস্যাশী নন। তাহলে কি আর আমাদের জন্য লেকটি মাছে পূর্ণ করে রাখতেন? রান্নার আয়োজন চলছিল। তারা লেকের এই মনোহরণ পরিবেশের মধ্যে বনভোজনের ব্যবস্থা সত্যিকারের বনভোজন। কতকগুলো গাছের জটলার নিচে রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা।

আমি কিন্তু এই আয়োজনের ফাঁকে ছোট্ট বঁড়শী নিয়ে ছুটলাম ঐ ডোবার ধারে। ঝর্ণাটা পাহাড় থেকে নিচে পড়ে, খানিক পথ এঁকে বেঁকে এসে দুটো মঞ্জাইল গাছের ফাঁক দিয়ে ডোবায় পড়েছে। কিন্তু মাছ ধরব কি, জায়গাটার শ্রীসম্পদ দেখে আমি তো হতবাক। পাহাড় থেকে তারা লেক অব্দি ঝর্ণার দুই তীরে শুধু কাশের বন। শরতের নীলাকাশের বুকে সাদা নধর মেঘ-শিশুগুলিকে সেই দুধসাদা কাশেরা হাতছানি দিয়ে খেলতে ডাকছে। এইসব নির্জন প্রকৃতির রাজ্যে যেখানে কালেভদ্রে সাধারণ মানুষের পদচিহ্ন পড়ে সেখানেও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয় অদৃশ্য মহাশিল্পীর নিরলস হাতের নিখুঁত শিল্পকর্মগুলি দেখে। নগরীর এগ্‌জিবিশান হলে আমরা যাই ছবি দেখবার জন্যে কিন্তু প্রকৃতির তৈরি প্রতিদিনের ছবি আমরা চোখ মেলে দেখি না। একটি দিন যদি সব ভুলে তাঁর যে কোন সৃষ্টি কর্মের দিকে তাকাই তাহলে রূপ দর্শনের

জন্য আর কোথাও যেতে হবে না। আমাদের চোখের, স্পর্শের, বিস্ময়ের, মননের সব কিছুই তিনি অক্লান্ত সাজিয়ে চলেছেন মহা প্রকৃতির সজীব সচল শিল্পশালায়।

আমি ছোট ছোট অনেকগুলো পিকারী মাছ ধরলাম। আমার পেছনে কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল রসিদ আমি জানতে পারি নি। হঠাৎ আমাকে পেছন ফিরতে দেখে বলল, ছোটকত্তা, গাছপালা আর আশমানরে প্রাণ ভইরা দেহ, তাইলে আর কোন খেদ রইবে না এ জীবনটায়।

খাওয়া দাওয়ার ভেতরেই মস্ত বড় একটা প্ল্যান নেওয়া হল। রসিদ আলিই কথাটা পেড়েছিল। আমি আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

তারা লেক থেকে আট দশ মাইল পথ রুইলি ভ্যালি। ওর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মেকং নদী। ঐ ভ্যালির কয়েক মাইল জায়গা জুড়ে একটিও গাছ নেই। আছে শুধু চোখ জুড়ানো চিকন দুর্বা ঘাস। একখানা সবুজ মখমলী কার্পেট কারা যেন যত্ন করে বিছিয়ে দিয়ে গেছে ভ্যালির ঐ অংশে। একপাশে দু'একর আদিবাসীতে ঝুম চাষ করে। বাকী পুরো জায়গাটাই অমনি সবুজ কার্পেটে ঢাকা। কেউ ওখানে চাষবাস করে না। ভ্যালির লোকের বংশ পরম্পরায় ধারণা, ঐ সবুজ ঘাসের জমিনে বুদ্ধ সাদা হাতির রূপ ধরে নেমে আসেন। আজও নাকি সে হাতি নেমে আসে। প্রতি কৃষ্ণা তিথিতে পূণ্যবানেরা তাকে দেখতে পায়। কেউ দেখুক আর না দেখুক প্রতিপদ তিথিতে ভ্যালির বহু মানুষ ঐ প্রান্তরে জড়ো হয়। তারা আকাশের দিকে শ্রদ্ধা ভরে ঐ হাতির উদ্দেশ্যে ফুল ছুঁড়ে দেয়।

জায়গাটির পরিবেশ এবং তাকে জড়িয়ে এই লৌকিক বিশ্বাস আমাকে মন্ত্রের মত আকর্ষণ করল।

আমরা যখন তারা লেক থেকে রুইলি ভ্যালিতে এসে পৌঁছলাম তখন পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের আয়োজন চলেছে। অবর্ণনীয় সে দৃশ্য। মুহূর্তে ভুলে গেলাম এতখানি পথ পেরিয়ে আসার ক্লান্তি। শরতের বিদায়ী সূর্য গোলাপী আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে মেকং নদীর জলে। দিগন্ত বিস্তৃত রুইলি ভ্যালির সবুজ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারলাম না। সারা দেহ এক অভাবিত আনন্দে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

আমার লোকজনেরা ঐ ভ্যালিতেই তাঁবু টাঙিয়ে বিশ্রামের আয়োজন করতে লাগল। আমি কিন্তু দু'চোখের মণির ওপর অন্ধকারের পর্দা নেমে না আসা পর্যন্ত ঐ সবুজ সমুদ্রের ওপর চোখ পেতে রইলাম। ঘাসের যে এমন রূপ আছে, সে যে চিত্তকে এমন রোমাঞ্চিত প্লাবিত করে দিয়ে যেতে পারে তা রুইলি ভ্যালির ঐ দিগন্ত ছোঁয়া ঘাসের চোখ জুড়ানো সবুজ বিস্তার না দেখলে অনুভব করা যাবে না।

একসময় সন্ধ্যায় ছায়া নামল। ঘন হল সে ছায়া। চোখের ওপর থেকে মুছে গেল সবুজের সেই লাবণ্যভরা সমুদ্র।

এখন তরঙ্গিত অন্ধকার। তার মাঝে টিম টিম করে জ্বলতে লাগল একটি আলোর দীপ। আমাদের তাঁবুর থেকে বেরিয়ে আসা একমাত্র আলোক শিখা।

এবার তাঁবুর মাঝে ঢুকে বসলাম। রান্নার আয়োজন চলেছে। বংগী বলল, কত্তা, সঙ্গে আমিষ থাকলেও এখানে বসে আর আমিষ খেতে মন চাইছে না।

বললাম, খুব ভাল ব্যবস্থা করেছ বংগী। আজ রাতে শুধু ভাতে ভাত হলেই চলে যাবে।

চিড় চিড় করে কাঠ পুড়তে লাগল তাঁবুর বাইরে। রান্না চাপান হয়েছে। আমি একা তাঁবুর ভেতর একটা সতরঞ্চির ওপর বসে আছি। এখন বেশ শ্রান্ত মনে হচ্ছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ গায়ে কার ছোঁয়া লাগতেই উঠে বসলাম। রসিদ চাপা গলায় বলল, বাইরে আইসন কত্তা, সাদা হাতি নামতাছে।

আমি প্রায় লাফ দিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। যদিও তিথিটা অমাবস্যা নয়, কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তবু দেখলাম করুণাময় বুদ্ধ আমাদের একেবারে বঞ্চিত করেন নি। কৃষ্ণা প্রতিপদের প্রায় পূর্ণ চাঁদটি আকাশের বুক থেকে দুধের ঝর্ণার মতো আলো ছড়িয়ে চলেছে। আর তারই একটুখানি দূরে শরতের নধর একটা সাদা মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি বিভ্রান্তি জাগে একটি শ্বেত হস্তী বলে। মনে হয় সারাটি রাতের কোন এক সময়ে সে এই দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমিতে নেমে আসবে। বংগী বনের পথে আসতে কিছু ফুল আমাদের অগোচরেই সংগ্রহ করে এনেছিল। সে তার কয়েকটি তাঁবু থেকে এনে আমার হাতে দিল। আমরা দু'জনে আকাশের দিকে সেই ফুল ছুঁড়ে দিলাম। মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে বললাম, হে করুণাময় বুদ্ধ এই লৌকিক বিশ্বাস সত্য কি মিথ্যা তা আমি জানি না, তবে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার পৃথিবীতে তোমার আবির্ভাব ঘটুক, এই আমার অন্তরের কামনা। প্রভু তুমি ভালবাসায়, ক্ষমায়, করুণায় ভরিয়ে দিয়ে যাও আমাদের হিংসা, বিদ্বেষ আর পাপে পূর্ণ হৃদয়।

আমি তাকালাম সামনের দিকে। এখন সবুজ প্রান্তর মায়াময়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে নীরব প্রার্থনা জানিয়ে চলেছে করুণাময়ের আবির্ভাবের প্রত্যাশায়।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখন এক আশ্চর্য ছবি চোখে পড়ল। রাতে কখন শরতের মেঘখণ্ড এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে সরে গেছে। আমাদের তাঁবু আর সামনের দূর্বা-প্রান্তরে এখনও স্পষ্ট হয়ে আছে সেই জলকণার চিহ্ন। প্রভাত সূর্যের সোনালী আলো এসে পড়েছে দুর্বার গায়ে জেগে থাকা জলবিন্দুর ওপর। কোথাও মুক্তা, কোথাও রামধনুর বিস্ময়! আমার সমস্ত মন বলে উঠল, কাল জ্যোৎস্না প্লাবিত প্রান্তরের বুকে নিশ্চয়ই তিনি নেমে এসে তাঁর করুণাধারা বর্ষণ করে গেছেন।

কিছুকাল রেগং ফরেস্টে কাটিয়ে একসময় ঘরে ফেরার জন্যে তৈরি হলাম। রসিদ আলিকে ছেড়ে আসতে সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। রসিদ আর বনকে আমি অভিন্ন দেখেছিলাম। রসিদ একটি সত্য কথা প্রায়ই তার অন্তর থেকে উচ্চারণ করত, বনকে যে ভালবাইসবে তার আর সংসার করা হইব না।

পরদিন রসিদদের ছেড়ে কাকার সঙ্গে মোলমিন হয়ে কলকাতা চলে আসব। ঘুম আসছে না বিছানায় শুয়ে। আমি বেশ অনুভব করছি রসিদও জেগে আছে।

একসময় বললাম, রসিদ জেগে নাকি ?

হঁ কত্তা, নিদ আইতাছে না।

বললাম, আজ রাতে তোমার জীবনের, তোমার বিশেষ অভিজ্ঞতার কোন একটা গল্প বল, যা আমার চিরদিন মনে থাকবে। আর ঐ গল্পের সঙ্গে তুমিও থাকবে আমার স্মৃতির মধ্যে অমর হয়ে।

রসিদ তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বলল, বোকা দাদা, মাইনসে কি অমর হইতে পারে! তবে গল্প হুনতে যখন চাইছ তখন বলি একটা গল্প।

তখন দাদা বয়স হইব বাইশ কি তেইশ বচ্ছর। যুয়ান মরদ। পাল কোম্পানিতে কাম করি। আমরা চাইর পাঁচজনে নদীতে র‍্যাপ্ট ভাসাইয়া লইয়া আইতেসিম। তখন সামনে একটা ঘূর্ণি পড়ল। আমরা লগি ফ্যালাইয়া র‍্যাপ্টটারে আটকাইলাম। চার-চারটা মাইনসে হারারাত র‍্যাপ্টটার উপরে খাড়াইয়া রইলাম। পরের দিন যখন জোয়ার আসল তখন ঘূর্ণিটার থাইন হইল। আমরা অর পাশ দিয়া বাইর হইয়া আইলাম।

আমি বললাম, সারারাত তোমরা ঐ কাঠের লগের বান্ডিলের ওপর দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলে! কি করে কাটালে রসিদ?

রসিদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নদীর কাছে গাছ তার মরণের কথা শোনায় কত্তা। হারারাত গাছের দুঃখের কথা কান পাইতা হুনলাম।

আচ্ছা এখন তোমার র‍্যাপ্ট নিয়ে যাবার কাহিনীটা শোনাও।

রসিদ আবার তার গল্প শুরু করল, র‍্যাপ্ট ভাসাইয়া কিছুপথ আইসা দ্যাখলামনি ডানহাতি নদীর পারে উঁচা ছেতং (ছাতিম) গাছের ডাইলে একটা মাইনসে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলতাছে। ইয়া আল্লা, এ যে কাঠের ব্যাপারী ফাগুলালজীর মুনিম মগনলাল। আমরা তখন র‍্যাপ্টটারে কাছি দিয়া পিংকাডো গাছে মুড়িং করলাম। মুড়িং কইর‍্যা নদীর ধারে আউগাইয়া দেহি লোকটা তখনও মরে নাই। ছাতিম গাছের ডালটা ত নরম, একটা দুলুনি আছে। এর লাইগা ফাঁসটা ভাল লাগতে পারে নাই। ঘটনাটা যে বেশীক্ষণ আগের না হেইটা বুঝতে পারলাম। তাড়াহুড়া কইর‍্যা মগনলালরে নামাইলাম। জলের ঝাপটায় হুঁস ফিরল। একটু সুস্থ হইলে জিগাইলাম, বাবু তুমি আত্মহত্যা করতে আসছিলা?

মগনলাল অমনি তার দুর্বল হাতটারে তুইলা কইল, ম্যায় তো মরণে নেহি আয়া। হামরা শির পর ডাণ্ডা মারকে ফাগুলাল হামকো পেড় পর ঝুলা দিয়া। ম্যায় তো ঐ বখত বেহুঁস হো গিয়া। তুমনে হামকো বাঁচায়া রসিদভাই।

ওর সঙ্গে কথা বইল্যা যা বুঝলাম, ও মৌ ফরেস্ট ডিভিসানের টেগাং গ্রাম থেইকা মার্গুয়ে টাউনে যাইতেছিল। পথে এই ব্যাপারটা ঘটাইল ফাগুলালজী।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আচ্ছা রসিদ তুমি তো বললে মগনলাল ফাগুলালজীর কর্মচারী, তাহলে সে এতবড় একটা অন্যায় কাজ করতে গেল কেন?

আরে দাদা, যার ঘরে সুন্দরী বউ তার সোয়ামী যদি সেয়ানা না হয় তাহিলে তার কপাল ভাঙছে। ফাগুলাল একটা লোচ্চা। হালায় গোবেচারা মগনলালের বউটারে হাতাইবার লাইগা এই কাম করছে।

প্রশ্ন করলাম, মগনলালের বউটাও কি খারাপ ছিল?

একদন সাচ্চা সতী। ফাগুলালের মতলব ছিল বিধবা বউটারে সাহায্যের অছিলায় দরদ দেখাইয়া নিজের ঘরে রাখব।

তারপর তোমার গল্পের কি হলো তাই বল?

তখন প্রচণ্ড বর্ষা শুরু হইয়া গেছে। আধমরা লোকটারে র‍্যাপ্টে শুয়াইয়া মার্গুয়ে শহরের দিকে র‍্যাপ্ট চালাইলাম। তারপর কত্তা, মগনলাল একটু সুস্থ হইয়া বলে কি সে মার্গুয়ে যাইব

না। অমনি জিগাইলাম, ক্যান? বলে কি কত্তা, মগনলাল মরছে বইলা ফাগুলাল শহরে চাউর কইর‍্যা দিছে। অখন সেখানে যাইলে আর রক্ষা পাইবার আশা নাই।·

কি আর করি একটা ছোট্ট গ্রামে র‍্যাপ্ট টারে বাঁধলাম। গ্রামের ফায়াতে (বৌদ্ধ স্তূপ) লইয়া গ্যালাম অরে। ফুংগিচাউকে (হেড প্রিস্ট) ডাইকা মগনলালের সব কথা কইলাম। মগনলালের লগে আশ্রয় চাইলাম তার ফায়াতে। অমা, দেহি ফাগুলালের নাম হুইন্যা ফুংগিচাউ কেন্নোর মতন কুঁকড়াইয়া গেল। বলল কি, মগনলাল আত্মহত্যা করছে বইলা ফাগুলাল মিউকের কাছে এরই মধ্যে রিপোর্ট করছে। মিউক পুলিস লইয়া আগামী কাইল স্পটে যাইব। ফাগুলালের অনেক টাহা আছে, অরে চটাই ক্যামনে।

ফুংগির কথা হুইনা আমার মনে হইল, মাইনসে টাহারে ডরায়, তারে হম্মান করে কিন্তু মাইনসে মাইনসের হম্মান করে না, আসলে ঘিন্না করে।

আমি হালার ফুংগিরে কইলাম, ধম্মো বইলা একটা জিনিস আছে। তুমি না বুদ্ধাই, তোমার বিবেক নাই। টাহাবালার ভয়ে তুমি কুঁচকাইয়া গ্যালা। তুমি বুদ্ধরে মান, আমি আল্লারে মানি। এ সংসারে ডরাই ইমানরে আর আল্লারে।

লাঠি ঠুইকা ফুংগিরে কইলাম, মগনলালকে তুমি রাখবা। অর যদি কোনরকম 'ই' হয় তাহিলে জাইনো তোমার ন্যাড়া মাথা খোপরার মতো ফাটাইয়া দিয়া যামু।

মার্গুয়েতে র‍্যাপ্ট নামাইতে গিয়া মিউক মুখার্জিবাবুর সঙ্গে দেখা।

মিউক কইলেন, কিরে পথে একটা লাস দেখছস?

মাথা নাইড়া চোখ কপালে তুইলা কইলাম, কই দেহি নাই ত সাহাব।

মার্গুয়েতে মগনলালের ডেরায় গিয়া দেহি অর বউটা হাপুস নয়নে কাঁদছে। অরে সব কথা কইয়া কিছু টালা দিলাম। বারণ করলাম ফাগুলালের বাড়ি যাইতে।

দুপুর বেলা গ্যালাম ফাগুলালের শ'মিলে। কইলাম, নমস্তেজী, মগনলালজী নাকি আত্মহত্যা করছেন।

ফাগুলাল আমার কথাটা হুইনা চমকাইয়া উঠল। তারপর কইল, হাঁ।

তখন আমার মুখ দিয়া বাইর হইল একটা শব্দ, হুম্।

ভূত দেখার মতো আবার চমকাইয়া উঠল ফাগুলাল। আমাকে তোয়াজ কইরা বসতে বলল। কাঁপা কাঁপা গলায় দুশমনটা কইল, কাম করবি রসিদ হামার কাছে? অনেক বেশি টাকা মাহিনা পাবি।

আমি চোখ তুইলা কইলাম, ইমানরে ডরাই আমি। বেইমানরে ডরাই না। আমি টাহার লোভে কাম করি না বেইমানের।

চোখ রাঙা কইর‍্যা ফাগুলাল আমার দিকে তাকাইয়া কইল, আভি তুম হট যাও, বাদমে হাম দেখলেঙ্গে।

আমার পিরাণে একটা কাগজ ছিল। মগনলালকে গাছ থেইকা নামাইলে অর পকেটের মধ্যে চিরকুটখানা পাই। ভাবলাম কাগজখানা দেখাই ফাগুলালকে। কিন্তু তখন কি মনে কইরা অরে আর দেখাইলাম না।

কি লেখা ছিল ঐ চিরকুটে?

মগনলালের নাম কইর‍্যা ফাগুলাল তার আর এক মুনিমকে দিয়া লিখাইছিল, আমার মরণের লাইগ্যা অপরে দায়ী হইব না।

বললাম, তারপর কি হলো রসিদ?

সে এক তাজ্জব ব্যাপার ছোট কত্তা। আবার আমরা কাম করতাছি। একদিন নদীতে র‍্যাপ্ট ভাসাইয়া আইতেছিলাম, দূরে হঠাৎ নজর পড়ল একখানা শাম্পান চলতাছে। দূরবীণের মতন আমার চোখ। শাম্পানের মধ্যিখানে দ্যাখলাম ফাগুলাল বইসা আছে। আমি দূরে থাইকা শাম্পানটারে ফলো করতে লাগলাম। শাম্পান যখন সেই ছাতিম গাছটার কাছ বরাবর হইল আমি জোর র‍্যাপ্ট চালাইয়া তার সামনে গিয়া পথ আটকাইলাম।

আমারে দেইখ্যা ফাগুলাল তখন কাঁপতে লাগছে।

আমি লাঠি উঁচাইয়া বললাম, বাঁধো শাম্পান।

মাল্লাদের ধমকাইয়া কইলাম, খবরদার, আউগাইছ কি মরছ।

শাম্পান থাইকা ফাগুলালকে টাইনা নামাইলাম। হ্যাঁচড়াইতে হ্যাঁচড়াইতে লইয়া গ্যালাম ছাতিম গাছটার কাছে। পিরাণ থেইকা চিরকুটখানা বাইর কইরা অর হাতে দিয়া কইলাম, পড় হালা। এ লেখাটা কার? এ চিরকুট তোর পিরাণে ভইরা তোকে ঐ ছাতিম গাছের পাশে পিংকাডো গাছে ঝুলাইমু।

ও তখন পা আঁকড়াইয়া ধরছে আমার। খালি বলতাছে, জানে বাঁচা রসিদভাই। তোর পায়ে টাহার বস্তা ঢাইলা দিমু।

কইলাম, বেইমানের টাহা রসিদ খায় না। টাহা তোর সঙ্গে যাইব হালা।

বদরকে বললাম, জাপ্টাইয়া ধর হালারে।

ওর গলায় দড়ির ফাঁসটা পরাইয়া বললাম, বাঘরে মাইরতে কষ্ট হয় কিন্তু তোদের মতো জানোয়ারদের মাইরতে এতটুকু কষ্ট হয় না।

অর গলায় ফাঁস পরাইয়া দড়ি টাইনবার লাইগা খাড়া হইছি হঠাৎ পিছন থেইকা কে যেন দু'বার আমার কাঁধটারে ছুঁইয়া দিল। পিছু ফিইরা দেহি, সেই ছাতিম গাছের ডালটা। যেটায় মগনলালকে ঝুলান হইছিল। নদীর হাওয়ায় ডালটা তখন উঠছে নামছে। ও যেন বলতাছে, ক্ষমা কর। রসিদ, ক্ষমা কর, আল্লা অর বিচার করবে।

তখন মাল্লারা শাম্পান লইয়া ভাগছে। আমি ফাগুলালের গলার দড়ি খুইলা দিলাম। পাছায় একটা লাথি কষাইয়া কইলাম, ভাগ হালা, বাইচা গেলি এ যাত্রায়।

লাথি খাওয়া একটা কুত্তার মতো কুঁই কুঁই কইর‍্যা চারপায়ে হুমড়ি খাইতে খাইতে বনের ভিতরে সিঁধাইল। আমি র‍্যাপ্ট লইয়া চইলা আইলাম।

ক্যান যে আমার সেদিনটায় এমন হইল আজও ঠিক বুঝি নাই কত্তা। তবে গাছরে বড় ভালবাসি। সেদিন গাছের কথাটা ফ্যালাইতে পারি নাই।

বললাম, এ কাহিনীর শেষটা কি হলো রসিদ?

কেস চলতেছিল অনেকদিন। শেষে টাহার খেলা দেখাইয়া পার পাইয়া গেল ফাগুলাল। বউ লইয়া মগনলাল গ্যাল আপনার মুল্লুকে। লোকে কয়, অনেক টাহা খাওয়ান হইছিল মগনলালকে।

বললাম তোমাকে সাক্ষী ডাকেনি রসিদ?

হু কত্তা। আমি সব কথা জজসাহেবের কাছে কইরা গেলাম। যখন কইলাম, ঐ ছাতিম গাছটা আমারে রুইখ্যা দিল তখন কোর্ট ভর্তি জজ, ব্যারিস্টর, লোকজনের সে কি হাসি।

আমি তখন মনে মনে বললাম, পণ্ডিত মুখ্যুদের বুঝাই অমন শক্তি আমার নাই। কোর্টের মাঝে আল্লার দিকে হাত তুইলা কইলাম—

'অবোধারে বোঝায় বোধায়
আর বোধারে বোঝায় খোদায়।'

অন্ধকারে ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছিল। আমরা কেউ তখন আর কথা বলছিলাম না। একটি সত্তর বছরের বটবৃক্ষের মতো বিশাল আর মহৎ মানুষের সান্নিধ্যে আমি রয়েছি, এই অনুভূতিটুকু সেই মুহূর্তে আমাকে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

পরের দিন অনেক ভোরে কাকার সঙ্গে মোলমিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। রসিদ আমাদের অনেকখানি দূর অব্দি এগিয়ে দিতে এল।

বিদায় নেবার সময় একটা জঙ্গলের ধারে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রসিদ বলল, হোনেন কত্তা, মাইনসেরে বিশ্বাস কইরেন না। মাইনসে বেইমান। গাছ বেইমানী করে না। ও ভালবাইসা সব দ্যায়! সবকিছু উজাড় কইর‍্যা দ্যায়।

তোমার ভিতরে কান্না আছে কত্তা। যে কাঁদতে পারে সে ভালবাইসতে পারে। গাছরে ভালবাইসো, বনরে ভালবাইসো, তা অইলে আল্লারে ভালবাইসতে পারবা।

সেই থেকে লেখক মশাই বনে বনে আমি ঘুরে বেড়াই। মানুষের সংসারে মন বসাতে পারলাম না।

কালের রাখাল

'হে হে কেরি কেরি কেরিগা...কেরিগা...কেরিগা'...

ঘাটির দিকে কচি হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে অম্‌রু ডাক পাড়ছে। পথের ধারে মস্ত এক টোহ্‌লের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে ছাল্লুটা। তার তরতাজা মুখখানার ওপর এসে পড়েছে সরশোন ফুলের মতো ভোরবেলাকার নরম হলুদ আলো। কে শোনে কার কথা। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বক্‌রির সাদা নধর বাচ্চাটা উপভোগ করছে টিলার ওপর আরোহণের কৃতিত্বটুকু।

শতরুন্ডীর ল্যাসে ভেড় আর বক্‌রির পাল নিয়ে গত সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছে হরিচন্দ্‌। সঙ্গে দশ বছরের ছেলে অম্‌রু। এই প্রথম অম্‌রু বাবার সঙ্গে ভেড় বক্‌রি তাড়িয়ে নিয়ে পাঙ্গি চলেছে। সামনেই সাচ জোৎ (পাশ)। বেলা বেড়ে ওঠার আগেই ওদের জোৎ পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে।

ছিলমের ভেতর এক টুকরো চুগল ফেলে নেড়ে নিল হরিচন্দ্‌। কঙ্কের গায়ে টুকুর টুকুর শব্দ তুলল পাথরের নুড়িটা। ডোরে ঝোলান বগ্‌লির ভেতর থেকে এক ডেলা তামাকু বের করে ঠেসে ভরল ছিলমে। এবার পাথরের টুকরোর ওপর রুন্‌কা ঘষে ভুজ্জ গাছের শুকনো ছালে আগুন ধরাল। বাঁ হাতে হুঁকোখানা টেনে এনে তার ওপর ছিলম বসিয়ে জুত করে টানতে লাগল। ভুড়ুক ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ উঠছে। শেষরাতে, মক্‌কির রুটি পাকিয়ে খাওয়ার কাজ চুকিয়েছে বাপ বেটায়। এখন একটু নেশা করে নিয়েই উঠে পড়বে হরিচন্দ্‌। তামাকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চোখ গিয়ে পড়ল অম্‌রুর দিকে। দশ বছরের ছেলে কে বলবে! তাড়সে বেড়ে উঠেছে চিকন বাঁশের মতো। অবিকল মায়ের মুখখানা বসানো। গম্ভীর মুখটা মনে পড়তেই হুঁকোর টান থেমে গেল। বুকখানা মুচড়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

প্রভুর পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে শুয়েছিল রুক্‌কা। কালো লোমওয়ালা কুত্তর বা কুকুর। অম্‌রুর ডাক কানে যেতেই ঘাড় কাত করে একবার দেখে নিল দৃশ্যটা। ভাবখানা এই. রোসো, টোহলের ওপর চড়ে কারদানি মারা তোমার বের করছি।

উঠল হরিচন্দ্‌। খাড়াই পাহাড় বেয়ে বরফের ওপর দিয়ে জোতের দিকে এগোতে হবে।

'হ্যালা হুই, হ্যালা হুই'—রব উঠল। ভেড় আর বক্‌রির পাল সারি দিয়ে পথ চলেছে। সামনে চলেছে গা গতরে যারা পটু। মাঝে চলেছে সেইসব ভেড় বক্‌রি, যারা অল্প দিনের ভেতরেই বাচ্চা বিয়োবে। সব শেষে ভেড়ের বাচ্চা উর্ণু উর্ণী আর বক্‌রির বাচ্চা ছাল্লু ছাল্লির দল। গদ্দী কুত্তর ঢুঁ মেরে মেরে ওদের সারি সিধে রাখছে।

ঠিক জায়গায় এসে হরিচন্দের কুত্তর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠল টোহলের ওপর। ঘ্যাঁক করে ধমকাতেই গলা কাঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিল ছাল্লুটা। ঢুঁ মারতে মারতে রুক্‌কা তাকে পথ দেখিয়ে দলে এনে ভেড়াল। এখন দুশো ভেড় আর বক্‌রির একটা দল প্রায় নিঃশব্দে খাড়াই পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চলল।

সামনে রুক্‌কা চলেছে কান খাড়া করে। প্রভুর মুখের রকমারি সিদ্ধ্‌ বা শিস্‌ শুনে সে বুঝে

নিয়েছে ডাইনে বাঁয়ে, কোন দিকে সে চালিয়ে নিয়ে যাবে তার দলটাকে। একটু বেচাল হলেই ভেড় বক্‌রিদের শুনতে হবে কড়া ধাতানি। রুক্‌কার কাছে পার পাবার জো নেই। মাঝে চলেছে অম্‌রু। উৎসাহটা তারই বেশি। কতদিন বলে বলে তবে সে এ বছর বাবার সঙ্গে আসবার অনুমতি পেয়েছে। জন্ম দিয়েই মা মরেছে। তারপর থেকে এই দশ বছরের বেশির ভাগ সময় কেটেছে মামার বাড়ি কাংড়ায়। মামা আর মামির ছেলেপুলে কেউ নেই, তাই অম্‌রুই তাদের মাথার ঠাকুর। তাছাড়া গদ্দীদের ভেতর ভাগ্‌নে যত ছোটই হোক, মামার চোখে সে দেওতা। তাকে সবচেয়ে বেশি খাতির যত্ন করতে হয়।

বসন্ত আর গ্রীষ্ম ঋতু শেষ হলে হরিচন্দ্‌ কুলু কাংড়ায় শীতের চারণ শেষ করে ভেড় নিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। আসার সময় প্রতিবারই মামার বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে আসে ছেলেকে। আবার ঝার্‌রি শুরু হবার আগেই মামা এসে ভাগ্নেকে নিজের কাছে নিয়ে চলে যায়। শূন্য ঘরে তখন একা হরিচন্দের মন হু হু করে। সে অমনি ভেড় বক্‌রি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পাঙ্গীর উদ্দেশ্যে। পাক্‌কা তিনটি মাস চারণ শেষ করে ওপরের পাহাড়ে হাইউন্দ বা শীতের বরফ পড়ার আগেই দল নিয়ে নেমে আসে নীচে।

সবার শেষে বাচ্চাগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে হরিচন্দ্‌। এবার পাহাড়ি পথ, বড্ড খাড়াই। গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। নেড়া পাহাড়ের এদিক-ওদিক ফাঁক-ফোকরে উঁকি দিচ্ছে হরেক রঙের তারাফুল। গিরিপথের মুখ-বরাবর তাও আবার ফুরিয়ে এল। শেষ পথটুকু হামা দিয়ে উঠতে হবে। অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে অম্‌রু। হরিচন্দ্‌ ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে আর একবার ছেলেকে মনে করিয়ে দিলে, জোৎ পার হবার সময় কথা বলতে নেই। পাহাড়ের আঁকে বাঁকে পথ চলার সময় হরিচন্দ্‌ কতবার আউড়েছে কেহ্‌লু বীরের নাম। পাহাড়ের ঢালে বাস করেন কেহ্‌লু বীর। রাগলে রক্ষে নেই। বড় বড় পাথরের চাঁই ওপর থেকে গড়িয়ে ফেলে সারা পথ ভেঙে চুরমার করে দিতে পারেন তিনি। পথচারী পহাল পহালনিদের তাই পথের দেবতাদের তুষ্ট করে রাখতে হয়। এবার আসছেন জোতের দেওতা। গিরিপথের একপাশে ত্রিকোণ পাথরের একটা স্তূপ। ওরই ভেতর দেওতার বাস। নানান রঙের নিশান উড়ছে তাঁর ঘরের মাথায়।

নিঃশব্দে চলেছে দলটি। দেওতাদের থানে এসে হরিচন্দ্‌ লাল কাপড়ের একটা টুকরো অম্‌রুর হাতে ধরিয়ে দিল। ইঙ্গিত করল পাথরের স্তূপের কাছাকাছি একটা অনুচ্চ বাঁশের মাথায় বেঁধে দিতে। অম্‌রু তাই করল। ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মনে মনে কিছুক্ষণ প্রার্থনা জানাল দেবতার কাছে। রক্ষা করো প্রভু আমাদের ভেড় বক্‌রিদের। আমাদের এই গিরিপথ পার হবার সময় যেন ঝড় না ওঠে। যেন বরফের চাঁই ভেঙে না পড়ে মাথার ওপর।

আগে আগে পথ দেখিয়ে ভেড় বক্‌রির পাল নিয়ে চলেছে রুক্‌কা। পেছনে হরিচন্দ্‌ আর অম্‌রু।

জোতের শেষ প্রান্তে এখন এসে দাঁড়িয়েছে পুরো দলটা। সামনে পাঙ্গী। দশ বছরের অম্‌রুর গায়ে উলের গরম চোল। কোমরে বক্‌রির লোম দিয়ে তৈরি কালো লম্বা ডোর, পাকে পাকে জড়ানো। হাঁটু অব্দি নেমে এসেছে চোল। তারপর অনাবৃত পায়ের শেষপ্রান্তে চম্বা থেকে কেনা নাগ্‌রা। কোমরে জড়ানো ডোর থেকে ঝুলছে পয়সা রাখার বজ্‌লু আর কুল্‌হারা বা কুঠার। বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে তারের একটা বাদ্যযন্ত্র- —রুবানা। মামার কাছে সে শিখেছে রুবানা বাজাতে।

এই যন্ত্রটি তার নিত্যসঙ্গী। অম্‌রুর মাথায় কৈলাস পর্বতের চূড়ার আকারে টোপি, বনাল পাখির ঝুঁটি লাগানো। সে চেয়ে আছে নতুন উপত্যকার দিকে। নীল আকাশের বুকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সারি সারি সাদা কাপড়ের বোরখা পরা পাহাড়। স্থির, শান্ত শীতল। নিচে উতরাইয়ের পথ। রোদ্দুরে রুপোর অসির মতো ঝলমল করছে চেনাব—নদী চন্দ্রভাগা।

উতরাইয়ের পথে সাবধানে পা ফেলে নামছে ওরা। বরফের চাদর পাতা পথ। সাদা সাদা ভেড়ার পালকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় পাহাড়ের গা ঘেয়ে গড়িয়ে আসছে হিমবাহ। ওরা এসে থামল ল্যাস দুনেইতে। একটুখানি বরফ-ছাওয়া সমতল। তার আশেপাশে অনেকগুলো চোরা নালা। ওপরে বরফ, নীচে দুরন্ত স্রোতের টান। সব স্রোত গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে চন্দ্রভাগায়। ঠোঁট সরু করে শিস্ দিল হরিচন্দ্। রুক্কা ভেড় বক্‌রিগুলোকে একপাক চক্কর দিয়ে ঘুরে এসে প্রভুর পায়ের কাছে দাঁড়াল।

হরিচন্দ্ ছেলের হাত ধরে বরফের ওপর দিয়ে সাবধানে নালা পেরুতে লাগল। নরম বরফে হঠাৎ পা পড়লেই খপ্ করে ধরে নেবে খরস্রোতা নাগিনী। তারপর বরফঢাকা গোপন সুড়ঙ্গ পথে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে কোন অতলে চন্দ্রভাগায়। হুঁশিয়ার মানুষ হরিচন্দ্। নালার অবস্থান আর বরফের চরিত্র তার নখদর্পণে।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল হরিচন্দ্। বরফের চাদরে হাঁটু গেড়ে বসে মুখ নিচু করে কান পাতল। হাঁ, এই সেই নালা, যার ভেতরে সে তার গংগীকে জলদেবতা বীর বাতালের নাম করে বিসর্জন দিয়েছিল।

মুখ তুলে ছেলেকে কাছে ডাকল হরিচন্দ্। অম্‌রু কাছে এসে তার ডোর থেকে কুল্‌হারাখানা (কুঠার) খুলে নিয়ে নালার ওপরে বরফ কুপিয়ে তুলতে লাগল। অম্‌রু বাপকে বরফ সরাবার কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে হরিচন্দ্ তাকে বাঁ হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলে। পা পিছলে গেলে আর দেখতে হবে না। অজস্র বরফ এক পাশে ডাঁই করে রেখে একসময় উঠে দাঁড়াল হরিচন্দ্। পাশে রাখা ভেড়ার চামড়ার থলে থেকে মেয়েদের মাথায় বাঁধা রঙিন একখণ্ড ঘুণ্ডি বের করে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল সেটাকে। বছর দশেক আগে সুলতানপুরে দশেরার মেলায় উল বেচতে গিয়েছিল সে। সঙ্গে ছিল গংগী। সদ্য বিয়ে করা বউ। মনে খুশির তুফান। দোকানে হরেক রকমের ঘুণ্ডি ঝুলছিল। অবাক হয়ে সেগুলো দেখছিল গংগী। এক সময় টুকটুকে লাল একখানা ঘুণ্ডিতে আঙুল ঠেকিয়ে পাশে হরিচন্দের দিকে তাকাল। মুখে চোখে মিষ্টি হাসির ঝিলিক। সঙ্গে সঙ্গে হরিচন্দের বাদশাই মেজাজ এসে গেল। দামি ঘুণ্ডিখানা এক কথায় কিনে ফেলল সে। গংগী হরিচন্দকে মেলায় দাঁড় করিয়ে রেখে ছুটল মেলার বাইরে। বিপাশার ধারে একটা ক্ল্যাঁ গাছের আড়ালে ওই সদ্য কেনা লাল ঘুণ্ডিখানা মাথায় বেঁধে মিঠি হাসি ছড়াতে ছড়াতে ফিরে এল মেলায়। হরিচন্দ্ যেন বউকে প্রথম দেখছে। ফাগুন মাসে চিঁউ গাছে ফোটা লাল ফুলের মতো বাহার। সারা দিন, সারা রাত ওরা হাত ধরাধরি করে মেলায় পাক খেয়ে বেড়িয়েছিল। সবার সঙ্গে নেচেছিল কুলুর মেলার আসরে। পরের দিন বেরিয়ে দুটি চিত্রিত মুনাল পাখির মতো ওরা ভুবু জোৎ পেরিয়ে যেন উড়ে এসেছিল কাংড়ায়। তারপর দু'চার দিন গংগীর এক সখীর বাড়ি কাটিয়ে আবার গজপাশ পেরিয়ে ফিরেছিল চম্বায়। সে বছর ওরা শীতটা কাটিয়েছিল সরল উপত্যকায়। বুদ্‌লির উলাংসা গ্রাঁ ছেড়েছিল বিয়ের পরেই। ঝিঁদ্ ফুঁক্ করে বিয়ে। মহাজন গন্দীর মেয়ের সঙ্গে ভাব করে ঘর ছেড়েছিল দু'জনে। পালিয়ে

এসে ইরাবতীর চরে বাগ্‌গার ঘাসের ঝোপে আগুন জ্বালিয়ে কয়েক পাক ঘুরে বিয়েটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছিল। গংগী তার রুপোর কোমরবন্ধনী গোজ্‌রা থেকে একটুকরো লাল্ ফিতে বের করে হরিচন্দের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, নাও, বেঁধে দাও আমার মাথায়। এই ফিতেটা বেঁধে না দিলে তোমার বউ হব কেমন করে গো?

বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হরিচন্দের। এই দুনেইতে মরবার সময় গংগীর বিনুনিতে বাঁধা ছিল সেই বিয়ের দেওয়া লাল ফিতে আর মাথায় জড়ানো ছিল দশেরার মেলা থেকে কিনে আনা সেই লাল ঘুণ্ডি।

হরিচন্দ্ বাঁ হাতে চোখ মুছে স্মৃতির দরজা বন্ধ করে দিল। হাতে ধরা ঘুণ্ডির এক কোনায় গত রাতের তৈরি মক্‌কির রুটি বক্‌রির দুধে ভিজিয়ে বেঁধে দিয়ে অম্‌রুকে বললে, এই নে, ধর। এখানে তোর জন্ম হয়েছিল দশ বরষ আগে আর তোকে জন্ম দিয়েই চোখ বুজেছিল তোর মা। আমি তার শরীরটা এই নালা খুঁড়ে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। আজ তোরই হাত দিয়ে তোর মায়ের শেষ চিহ্নটুকু ভাসিয়ে দিতে চাই। বেটার হাতের প্রথম খানা খাবে তার মা। এবার থেকে তুই ফি বরষ এখানে এসে মায়ের সেবা করে যাবি। ভুলবি না বেটা।

দশ বছরের অম্‌রু কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। সে বাবার হাত ধরে সাবধানে নালার গহ্বরে মায়ের ভুজ্যিটা ভাসিয়ে দিল।

চরাচর নিস্তব্ধ। অম্‌রু শুনতে পেল, ওই গহ্বরের ভেতর থেকে কে যেন কল্‌কল্ শব্দে কথা বলে উঠল। অম্‌রু ঠিক ঠিক বুঝতে পারল না সে ভাষা কিন্তু তার শিশু মন স্পষ্ট বুঝল, এ তার মায়ের ভাষা। মা তার হাত থেকে খাবার পেয়ে খুশি হয়েছে।

আবার মুখে আঙুল পুরে সিদ্ধ তুলল হরিচন্দ্। রুক্‌কা এগিয়ে নিয়ে চলল তার বাহিনী। পেছন থেকে 'হ্যালা হুই, হ্যালা হুই, কেরি কেরি কেরিগা'—আওয়াজ তুলে বাচ্চাকাচ্চা সমেত পুরো দলটাকে ঠেলে নিয়ে চলল বাপবেটায়।

পর পর তেজি নালা পার হয়ে চলল ওরা। সব নালাই বরফের চাদরের আড়ালে বয়ে চলেছে। কোনওটার ওপরে কঠিন বরফ, কোনওটা বা নরম তুলোর মতো বরফে ঢাকা। নরম বরফে পা পড়লে আর দেখতে হবে না। সবাই সজাগ, সবাই সাবধান, তবু পড়ে। প্রতি যাত্রায় দু'-চারটে করে ভেড় বক্‌রি খোয়া যায়। খাদে পড়ে মরে, চোরা নালার টানে ভেসে যায়। আবার যখন বিশাল বরফের চাঁই বা হেন্ ভেঙে পড়ে তখন সমস্ত দলটা অথবা দলের কিছু অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বরফের তলায়।

কিলাড় এগিয়ে আসছে। পাঙ্গী তহশীলের প্রধান আড্ডা। পাহাড়ের গায়ে দেখা যাচ্ছে দু'-চার ঘর বসতি। একটা তেজি নালা লাট খেতে খেতে ছুটে চলেছে। বরফের চাদর গা থেকে খুলে ফেলে দিয়ে দৌড়ের কসরত দেখাচ্ছে নালাটা। পারাপারের জন্য আশেপাশের গ্রাঁ এর লোকেরা গাছ ফেলে টাংড়ি (সাঁকো) তৈরি করেছে তার ওপর।

পুরো দলটা সাবধানে পার হতে লাগল গাছের তৈরি সাঁকো। একেবারে নাবালক দু'-তিনটে বক্‌রি আর ভেড়ের বাচ্চা গলা কাঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিল। হরিচন্দ্ দুটোকে চোলের লম্বা দু' পকেটে ঢোকালে। বাকি একটাকে বুকে চেপে দলের পেছন পেছন পেরিয়ে এল টাংড়ি। পারাপারের সময় পেছন ফিরে ভেড়ার পালকে দেখে নিচ্ছিল অম্‌রু। নালা পেরিয়ে এসে থামল হরিচন্দ্। ছেলেকে বলল, পাহাড়ি পথে পিছু তাকাতে নেই বেটা। জোৎ, নালা পার হয়ে

যাবি, পিছু তাকাবি না। যে পড়বে তাকে পড়তে দিবি। আপশোস করবি না। বাকি দল নিয়ে ফুর্তিসে চলবি। এ হল পহালদের কানুন।

কিলাড় এসে গেল। সামনেই বনবিভাগের বাংলো। জংলাৎ ম্যাকমা। বেরিয়ে এল বন-রক্ষক। হরিচন্দ্ সিঙ্ঘ্ ফুঁকল। রুক্কা টুঁ মেরে মেরে সিধে করল পুরো দলটা। এখন আবার সেই মন্ত্রপড়া পাথর। নড়া নেই চড়া নেই, স্থির নিস্পন্দ।

শুরু হয়ে গেল গুণতি। দু'-তিনশো ভেড় গুণতে আর সময় লাগে কত? কোনও কোনও দলে থাকে আটশো, হাজারেরও ওপর ভেড়। তখন পহালরা বনের কর আদায়কারীকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে। তারা ভান করে যেন ভেড় বক্‌রি সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। গুঁতোগুঁতি করে তাদের এলোপাথাড়ি দৌড় করায়। গুণতিতে ভুল হয়ে যায়। হাজার ভেড় আট-ন'শো বলে সাব্যস্ত হয়। তিরনির টাকা কমে কিছু পরিমাণে। ভেড় পিছু পাঁচ পয়সা আর বক্‌রি পিছু দশ পয়সা তির্‌নি। ভেড়াগুলো একটার পিছে আর একটা ঠিক যেন নদীর স্রোতের মতো ঢেউ তুলে তুলে চলে। কিন্তু বক্‌রিগুলো চলতে চলতে এদিক-ওদিক ছিটকে বেড়ায়। বনের কচি চারাগাছ মুখ দিয়ে মুড়িয়ে দেয়। গৃহস্থের তরিতরকারি মুহূর্তে সাবাড়। তাই করের বোঝা ওদের ওপরই বনবিভাগ চাপায় বেশি।

হরিচন্দের এত বেশি ভেড় বক্‌রি নেই, আর সে ফাঁকিও দিতে চায় না। সে যে উপত্যকায় বাস করে তার নাম সরল। সংসারে সে চলে সোজা পথে।

হরিচন্দ্ বজলু থেকে তির্‌নি বের করে আদায়কারীর হাতে দিল। বন-রক্ষক মানুষটাকে চেনে। বছর দশেক আগে থেকেই সে এই কিলাড়ের পথে হরিচন্দকে যাওয়া আসা করতে দেখছে। ফাঁকি নেই তার চালচলনে। গুণতির সময় লোকটা সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে মুখে কোনও উদ্বেগ বা ভয়ের ছাপ নেই। আর যারা ফাঁকিবাজ তাদের চোখমুখ দেখলেই চেনা যায়। পিট্‌পিট্ করছে চোখ, চমকে তাকাচ্ছে এদিক সেদিক।

বনবাবু হেসে বলল, এবার সঙ্গে ওটি কে? বেটা নাকি?

জি হাঁ।

বিলকুল তোমার মতো লম্বা।

মুখখানা ঈষৎ কাত করে বিনীত হাসি হাসল হরিচন্দ্।

আজ তো কিলাড়েই থাকছ?

হাঁ জি, আজ, কাল দুটো দিন থাকব।

ফেরার পথে দেখা করে যেয়ো, বলে বনবাবু চলে গেল তার ডেরায়।

হরিচন্দ্ দল নিয়ে এগিয়ে চলল। এখন বসত এলাকা শুরু হয়ে গেছে। ছোট ছোট খেতি। এখনও চাষের কাজ শুরু হয়নি। আর কিছুকাল পরেই শুরু হবে খেত চষা। কয়েকটা দল ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে। ভেড় বক্‌রির দল চরছে পাহাড়ের গায়ে। পাঙ্গীওলারা এসময় বড় ব্যস্ত। তারা গদ্দীদের আমন্ত্রণ করে আনছে নিজের নিজের খেতে। পয়সাকড়ি দিয়ে রফা করছে। আবার কেউ কেউ পহালদের খেতে দেবার কড়ারে নিজেদের খেতের মধ্যে ভেড় চরিয়ে নিচ্ছে। এতে লাভের শেষ নেই। মক্‌কি চাষের সময় এসে গেল। খেত চষার আগে এমন সার পাওয়া যাবে না। ভেড় বক্‌রির নাদি এ সময়ে কিষাণদের খেত ভরে দেবে। তাই পাঙ্গীওলাদের কাছে গদ্দী পহালদের খাতিরের শেষ নেই।

হরিচন্দ্ দু' চারখানা খেত পেরিয়ে কয়েক ধাপ নীচে নেমে এল। ছেনছেল্লার উঠোনের সামনে এসে দাঁড়াল সে। পাথরের চাঁই সাজিয়ে তৈরি দেয়াল। মাথায় কালো চ্যাপ্টা পাথরের চাল। ছেনছেল্লার কোঠির বাহার ছিল এককালে। এখন অনেকটা শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। আশেপাশের ঝোপঝাড়গুলো অযত্নে এদিক সেদিক বেড়ে উঠেছে। একমাত্র ছেলে নিয়ে বিধবা ছেনছেল্লা। আজ পাঁচ বছর ছেলে পাঙ্গীর বাইরে! কাংড়া জেলায় জ্বালামুখীতে দেবীর মন্দির। সেখানে নাকি দিন নেই রাত নেই পাথর ফুঁড়ে আগুনের শিখা উঠছে। ছেনছেল্লার ছেলে ভগৎ। ভারী কৌতূহল তার। সে একাই গেছে দেবীর মন্দিরের সেই শিখা দেখতে। আজও ফেরেনি। ছেলের ফেরার পথের দিকে চেয়ে বুড়ির চোখের জল শুকিয়ে গেল। ওপার থেকে আসা কত মানুষকে জিজ্ঞেস করল কিন্তু কেউ দিতে পারল না হদিস। বুড়ির ছেলে ভগতরামের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ হয়েছিল হরিচন্দের, যেবার গংগী এসেছিল উড়াদ্ধারে। হরিচন্দের থেকে দু'-চার বছরের ছোট হলে কী হবে, ভগৎ তার দোস্ত বনে গিয়েছিল। যে হরিচন্দ্‌কে খাতির করে ডেকে এনেছিল তার কোঠিতে। ছেনছেল্লা গংগীকে পেয়ে আর ছাড়তেই চায় না। একদিনের জায়গায় পুরো চার চারটে দিন থেকে গেল। সে কী আদর যত্ন, সে কী খাতির! চলে যাবার দিন বুড়ি তার ভাবী পুত্রবধূর জন্যে রেখে দেওয়া কাপুর মালাখানা গংগীর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল।

ছেনছেল্লা এখন চোখে কম দেখে। হরিচন্দের ডাকে ঘরের বাইরে এসে বাঁ হাতখানা ভুরুর ওপর রেখে আকুল হয়ে বলল, এলি বেটা?

হরিচন্দ্ বলল, এবার আমার সঙ্গে নতুন লোক এসেছে। দেখো, চিনতে পার কিনা?

ছেনছেল্লা আরও কাছে সরে এল। মুখ নিচু করে দেখে বলল, হরিচন্দ্ অ্যাদ্দিন পর বেটাকে সঙ্গে নিয়ে এলি বাপ?

গংগীর কথা মনে করে চোখের জল ঝরল। অমরুকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আদর করল বুড়ি। তারপর সম্ভবত ছেলের কথা মনে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ঘরের ভেতরে ওদের টেনে নিয়ে গেল বুড়ি।

বয়েস এমন কিছু বেশি নয়, ছেনছেল্লার তবু ভাবনা চিন্তায় বয়েসের ছাপ পড়েছে মুখে। ছেলের জন্যে কেঁদেকেটে অসুখ বাঁধিয়েছে চোখের।

দুটো গাইগোরু আছে ঘোরালে (গোয়াল)। বাসার নীচেই ঘোরাল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওরা ওপরে উঠল। ওপরতলায় দুটো ঘর। একখানা একটু বড়, অন্যটি অপেক্ষাকৃত ছোট। বড় ঘরখানার এককোণে রান্নার ব্যবস্থা। বাকি সবটুকু অংশ জুড়ে শোয়াবসার জায়গা। কাঠের মেঝেতে মোটা করে বিছানা পাতা। হরিচন্দ্ আর অমরুকে ছেনছেল্লা বিছানার ওপর বসতে বলল। হরিচন্দ্ পিঠে বাঁধা রসদ মেঝেতে নামিয়ে রাখল। ভেড়ার চামড়ার তৈরি থলেতে আটা নুন আর লঙ্কা বয়ে এনেছে সে। জনমানবহীন উড়াদ্ধারে কাটাতে হবে তাদের অনেকগুলো দিন। তাই রসদ বেঁধে নিয়ে চলেছে সঙ্গে। রুটি বানিয়ে ভেড় বক্‌রির দুধে ভিজিয়ে খাবে। চাখ্‌না দেবে নুন আর লঙ্কা। বেশখানিক দূরে বাউড়ি (ঝরনা)। সব সময় ভেড়া চরানো ছেড়ে এতদূর যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই দরকার হলে দুধ খেয়েই ওরা জল তেষ্টা মেটাতে পারে।

ছেনছেল্লা ওদের বসিয়ে রেখে পাশের ঘরে ঢুকল। এটা সারা বছরের ফসল সঞ্চয়ের ঘর, আবার ভাঁড়ার ঘরও বটে। বুড়ি মক্‌কির আটা বের করে আনল। তাড়াতাড়ি খানকতক রুটি বানিয়ে দিতে হবে। খানিকটা সবজিও তৈরি করে দেবে সে।

বুড়ি উনুন ধরিয়ে খাবার তৈরি করতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গল্প চলল অতিথিদের সঙ্গে। ছেনছেল্লা মানুষটি বড় ভাল আর বিবেচক। সে এই মুহূর্তে ক্লান্ত অতিথিদের কাছে ছেলের কথা তুলে কান্নাকাটি করল না। এখন খিধে তেষ্টায় মানুষগুলো কাতর। আগে কিছু পড়ুক পেটে, তারপর সময় হলে সুখ দুঃখের কথা তোলা যাবে।

চিড় চিড় করে উনুনে কাঠ পোড়ার শব্দ হচ্ছে। বুড়ি সব্‌জি চাপিয়ে আটা মাখতে মাখতে কথা বলে চলেছে।

গত বছর এক রোজ আগে এসেছিলি বেটা।

তোমার এত হিসেবও মনে আছে!

থাকবে না? সেবার তউন্দি গিয়ে বরসাত শুরু হয়েছে, তুই এলি। বললি, জোতের ওপারে ঝার্‌রি চলছে। আমি হিসেব করে বললাম, আজ শাওনের শুরু, ওপারে ঝার্‌রি তো চলবে। আর আজ? শাওনের দু' রোজ হয়ে গেল।

ছেনছেল্লা একটা শ্বাস ফেলে বলল, সব হিসেব আছে রে বেটা। তোর বুড়ি মা সাঁঝ সকাল বসে বসে খালি হিসেব কষছে।

হরিচন্দ্‌ ছেনছেল্লার শেষ কথাটার অর্থ বুঝল। কিন্তু ওই সন্তানহারা মাকে কী প্রবোধ দেবে সে। আজও হয়তো বুড়ি ভগতরামের ফিরে আসার দিন গুণছে। কিন্তু হরিচন্দের দৃঢ় বিশ্বাস, সে আর কোনওদিন ফিরে আসবে না। প্রথম প্রথম দু'-এক বছর হরিচন্দের কাছে কেঁদে পড়েছিল বুড়ি, একবার হরিচন্দ্‌ তাকে জ্বালামুখে নিয়ে যাক, সে ছেলের খোঁজ করে আসবে। কিন্তু হরিচন্দ্‌ তাকে বুঝিয়ে বলেছিল দুর্গম পথের কষ্টের কথা। তা ছাড়া আশ্বাস দিয়েছিল, হাইউন্দে সে যখন ভেড়া নিয়ে কাংড়া যাবে তখন ভগতরামের খোঁজ নেবে সম্ভাব্য সব জায়গায়। খোঁজ করেছিলও সে। মন্দির, দোকানপাট, আড্ডা, ডেরায়। চেহারার বর্ণনা দিয়ে বোঝাবারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সব বৃথা। হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর ভেতর কে কাকে চিনে রাখে। ফিরে এসে বুড়িকে সব বুঝিয়ে বলেছিল হরিচন্দ্‌! সব বুঝেও বোঝেনি ছেনছেল্লা। কোন্‌ মা প্রাণ ধরে মেনে নেবে, ছেলে আর কোনদিনও ফিরবে না।

হরিচন্দের ছেলেটাকে ছাড়তেই চায় না বুড়ি। সারাটা দিন সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। হরিচন্দ্‌ একা একা ছেনছেল্লার খেতে ভেড়া চরায়। সে ছেলেকে একবারও কাছে ডাকে না। আহা, অম্‌রুকে নিয়ে দুটো দিন যদি বুড়ি শান্তি পায় পাক।

সেই চার দিনের আগে কিলাড় থেকে হরিচন্দ্‌ আর অম্‌রুকে ছাড়ল না বুড়ি। খাওয়া-দাওয়া আদর আপ্যায়নে অস্থির করে তুলল বাপ-বেটাকে।

বুড়িকে বড় ভাল লেগে গিয়েছিল অম্‌রুর। বাপের কাছে না শুয়ে এ ক'টা দিন সে ভাঁড়ার ঘরে ছেনছেল্লার কাছেই শুত। বুড়ি, গল্প করত লক্কর বাঘা আর ভাল্লুকের। পাঙ্গী উপত্যকায় প্রচলিত সব গল্প। রাতগুলো জমে যেত গল্পে গল্পে। জাদু ছিল বুড়ির গলায়।

কিলাড় ছেড়ে যাবার দিন শেষ রাতে ছেনছেল্লার বুকের ভেতর মুখ রেখে অম্‌রু বলল, আমি বড় হলে তোমার ছেলেকে ঠিক খুঁজে এনে দেব তোমার কাছে। তুমি ছেলের জন্যে একবারও কাঁদবে না, বুড়িমা।

এবার বুড়ি অম্‌রুকে জড়িয়ে ধরে তার শেষ কান্নাটুকু ঝরাল। গভীর আশা আর আনন্দের কান্না। একটি শিশু-হৃদয়ের বিশ্বাস, ভরসা ছেনছেল্লাকে নতুন করে বেঁচে থাকবার প্রেরণা দিয়ে গেল।

সবে তড়কা বা ঊষার আলো ফুটে উঠেছে। আবার সেই পরিচিত রব উঠল কিলাড়ে ছেনছেল্লার খেতি থেকে। 'হ্যালা হুই হ্যালা হুই কেরি কেরি কেরিগা'। উড়ান্ধারের পথে বাহিনী তৈরি। রুক্কা সামনে থেকে পেছনে দৌড়ে দৌড়ে তার অভিযাত্রী দলটিকে সিধে করে নিচ্ছে। এবার পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলল ভেড় বক্রির পুরো দলটা। সামনে পরিচালকের ভূমিকায় রুক্কা। গলায় নতুন একটা বর্ম উঠেছে তার। মোটা ধাতুর পাতের ওপর কাঁটা তোলা পাট্টা। কিলাড় থেকে চোদ্দো মাইল পথ উড়ান্ধার। এ পথের বাঁকে বাঁকে পাহাড় গুহাগহ্বর আর টিলার আড়ালে লক্কর বাঘার রাজত্ব। এ পথে একমাত্র ভরসা গদ্দী কুত্তর। বাঘের মুখ থেকে ভেড় বক্রি রক্ষার পুরোপুরি দায়িত্ব তার।

এই প্রথম একটা লড়াই দেখল অম্রু। শেষবেলায় ওরা এসে পৌঁছেছিল উড়ান্ধারে। সূর্যের শেষ সোনা তখন মুকুট হয়ে শোভা পাচ্ছিল উত্তর হিমগিরির শিখরে শিখরে। উড়ান্ধারের মখমল সবুজ নিরু-ঘাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ক্ষুধার্ত ভেড় বক্রির দল। পাহাড়ের কোলে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজের বন্যা। চারণভূমি বা কাণ্ডার চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তুষার পর্বতগুলি। জঙ্গল বিভাগ থেকে ভাগ করে দেওয়া আছে প্রত্যেক গদ্দীর জন্যে একটি চারণক্ষেত্র। সে তার সীমারেখার ভেতরেই ভেড় বক্রি চরাবে, অন্য কারও সীমায় ঢুকতে পাবে না তার বাহিনী। হরিচন্দ্ তার নিজের সওয়ানার (নির্দিষ্ট সীমারেখা) ভেতর পৌঁছে গেল অপরাহ্ন বেলায়। উড়ান্ধারের শেষ প্রান্তটি জংলাৎ ম্যাক্মার লোকেরা হরিচন্দের বাবার আমল থেকেই চিহ্নিত করে দিয়েছে। যদিও অনেকখানি পথ পেরিয়ে পৌঁছোতে হয় তার চিহ্নিত কান্ডায় তবু একবার দলবল নিয়ে এসে পড়তে পারলে নিশ্চিন্ত। তিনদিকে পাহাড়ের ঢাল খাদে গিয়ে পড়েছে, একদিকে কেবল প্রতিবেশী পহালের সঙ্গে সীমানার বখরা। তাই অন্য পহালদের মতো মাঝে মাঝে তুলকালামে জড়িয়ে পড়তে হয় না তাকে।

সবদিক থেকেই তার চারণক্ষেত্রটি লোভনীয়, শুধু একটি বিপত্তি ছাড়া। উড়ান্ধারের যে প্রান্তটি জাসকার পর্বতমালার দিকে সূচল আকার নিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে খাদের দিকে কতকগুলো গুহাগহ্বর আছে। আর ওই কুদ্ বা গুহাগুলোর ভেতরেই থাকে লক্কর বাঘা। হরিচন্দ্‌কে কেবল এই দিকটাতেই সজাগ থাকতে হয়।

কলেল (সন্ধ্যা) ঘনিয়ে ওঠার আগেই ওরা খানকতক রুটি বানিয়ে খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিল। ভরপেট খেয়ে ভেড় বক্রিগুলো শুয়ে পড়েছে ঘাসের গদিতে। এক এক জায়গায় বিশ-পঁচিশটা করে একসঙ্গে জটলা পাকিয়ে শুয়ে আছে। রুক্কা শেষ চক্কর মেরে দেখে নিল সব ঠিক আছে কিনা। তারপর দলের থেকে একটু তফাতে ঘাসের জমিতে থেব্ড়ে শুয়ে রইল।

হরিচন্দ্ আর অম্রু তিরিশ-চল্লিশটা ভেড়ার একটা দলের ভেতর শুয়ে পড়েছে। ওদের লোমের কিছুটা উত্তাপ ওরা পেতে পারবে। চারদিক উন্মুক্ত। প্রকৃতির খেয়ালে কখনও বা খ্যাপা হাওয়া উড়ান্ধারকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। শীতের করাত হাড়মাস কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়। কিন্তু অসীম সহ্যশক্তি এই গদ্দী পহালদের। একখানা গাড়ু (কম্বল) নীচে পেতে আর একখানায় সর্বাঙ্গ ঢেকে ওরা পড়ে থাকে এই অন্ধকারের সমুদ্রে। শীতের হাওয়া ঢেউ তোলে। তুষার পর্বত দিনরাত্রি ওদের জানায় শীতল অভ্যর্থনা। রাতের নীলাকাশ অগণিত নক্ষত্রের চোখ মেলে মায়ের মমতায় ওদের দিকে চেয়ে থাকে।

কত রাত ঠাওর নেই। রুক্কার একটা ডাক শুনে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল হরিচন্দ্।

পাশে পড়ে থাকা রামদা বা দ্রাট্‌খানা তুলে নিল হাতে। সাপের রাজা কেইলাংরূপে এই তীক্ষ্ণ দা'খানা সঙ্গে বয়ে নিয়ে যায় পহালরা। প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় হাতিয়ার হিসেবে।

ব্যাপারটা মুহূর্তে আঁচ করে নিয়েছে হরিচন্দ্। লক্কর বাঘা রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভেড়ের ওপর। টেনে নিয়ে যাচ্ছিল একটাকে ক্ষিপ্র পায়ে, পথ রুখে দাঁড়িয়েছে রুক্কা।

ঘুম ভেঙে গেছে অম্‌রুর। সে অন্ধকারে ঘুম-চোখে দিশাহারা। হাত বাড়িয়ে দেখল বাবা পাশে নেই, সে অমনি উঠে বসল। অন্ধকার চিরে একটা শব্দ তিরের মত ছুটে গেল।

অম্‌রুর বুঝতে বাকি রইল না, এ তার বাবার গলার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। একটা কিছু বিপদ সামনের অন্ধকারকে আলোড়িত করছে, এবং সে বিপদের সঙ্গে তার বাবাও জড়িত, এটুকু বোঝামাত্রই সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। কুলহারাটা (কুঠার) কোমরের ডোর থেকে খুলে নিয়ে সেও ছুটল অন্ধকারে শব্দ লক্ষ্য করে।

যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গেছে অমরু। দুটি পশু ও একটি মানুষের সবিক্রম সম্মিলিত আওয়াজে তখন রণক্ষেত্র ঘন ঘন কম্পিত হচ্ছে। কিন্তু বিপদ দেখা দিয়েছে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথির জন্য। চানানির দেখা নেই তাই অন্ধকারে আততায়ীকে চিহ্নিত করে আঘাত হানার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। কুঠার আর কাস্তে উঁচিয়েও কেবলমাত্র হুংকার, আস্ফালন ছাড়া কিছুই করার নেই। এলোপাথাড়ি অস্ত্র চালালে লক্কর বাঘার সঙ্গে যুদ্ধরত রুক্কা আহত হতে পারে। তাই গলার স্বর চড়িয়ে রণহুংকার চালিয়ে যাচ্ছিল বাপবেটায়। রুক্কা কখনও শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছিল আততায়ীর পেছনে, আবার কখনও লক্কর বাঘা তার শিকারকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে তেড়ে আসছিল রুক্কার দিকে।

হঠাৎ তুষার পাহাড়ের আড়াল থেকে সপ্তমী তিথির ভাঙা চাঁদটা বেরিয়ে এল। তরল হয়ে গলে যেতে লাগল উড়ান্ধারের গাঢ় অন্ধকার।

হরিচন্দ্ দেখতে পেল লক্কর বাঘা আর রুক্কা একটা মাদি ভেড়ের দু'দিকের দুটো পা ধরে টানাটানি করছে। মুহূর্তে লক্কর বাঘা শিকার ছেড়ে দিয়ে একটা থাবা বসালে রুক্কার গায়ে। কিন্তু রুক্কার গায়ের ঘন গভীর লোমে সে আঘাত অকেজো হয়ে গেল। আবার একটা থাবা এসে পড়ল তার ঘাড়ে। ধাতুর সূচল পাট্টায় প্রতিহত হল সে আঘাত। রুক্কা এবার বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে গিয়ে কামড়ে ধরল বাঘটার পেছনের পা। দু'জনেই ঘাসের জমিনে পাক খাচ্ছে। বাঘটা পেছন ফিরছে, গড়াচ্ছে, বেঁকেচুরে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে থেকে রুক্কা বাঘের পাখানা কামড়ে ধরে আছে। তাকে স্পর্শ করে কার সাধ্য।

হরিচন্দ্ দ্রাট্‌খানা তুলে ধরে ছুটে চলল। অমরুও বাপের পেছন পেছন ছুটছে কুলহারাখানা উঁচিয়ে ধরে। মুহূর্তে লক্কর বাঘা দেখে নিল তার চারদিকে শত্রু সমাবেশ। সে ভুলে গেল তার শিকারের কথা। প্রাণ রক্ষার তাগিদে দেহের সবটুকু শক্তি উজাড় করে দিয়ে সে এক ঝটকায় নিজেকে রুক্কার বাঁধন থেকে মুক্ত করে নিল। তারপর একটা ধূর্ত শৃগালের মতো আঁকাবাঁকা ক্ষিপ্রতায় কান্ডার প্রান্তে তার আত্মগোপনের জায়গা লক্ষ্য করে ছুটল। কিছু পথ তাকে তাড়া করে নিয়ে গেল রুক্কা। পেছন থেকে প্রভুর সিন্ধ্ শোনা গেল, অমনি থেমে গেল রুক্কার গতি। লক্কর বাঘা তার চোখের সামনে পাহাড়ের গহ্বরে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার হরিচন্দের সিন্ধ্ শুনে ফিরে এল সে।

ততক্ষণে বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে শুরু হয়ে গেছে জ্যোৎস্নার প্লাবন। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চরাচর। মাদি ভেড়াটা শুয়ে পড়ে আছে জমিনে। প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই।

রুক্কা মৃত পশুটার পাশে ছুটে গিয়ে একটা আওয়াজ তুলল। হরিচন্দ্ আর অম্‌রু দৌড়ে এল সেখানে। ঘাসের বিছানায় রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে সদ্যপ্রসূত একটা বাচ্চা, উর্নু।

হরিচন্দ্ হাঁটু গেড়ে বসে পরীক্ষা করে দেখল, উর্নুটা তখনও বেঁচে আছে। মৃত মায়ের পাশে পড়ে থেকে সে একটু হাওয়া বুকের ভেতর টেনে নেবার জন্য ছটফট করছে।

গায়ের রক্ত আর পিচ্ছিল পদার্থগুলো মুছে ফেলে উর্নুটাকে মুক্ত করল হরিচন্দ্। অম্‌রুর হাতে বাচ্চাটাকে তুলে দিয়ে ভেড়াটাকে বয়ে নিয়ে গেল পশ্চিম দিকে। এই পশ্চিম প্রান্তের খাদ অনেক খাড়াই। বহু নীচে পাহাড়ের তলায় একটা খরস্রোতা নালাকে বয়ে যেতে দেখা যায়। হরিচন্দ্ মৃত পশুটাকে জলদেবতা বাতালের নাম করে ছুঁড়ে দিল নীচের নালা লক্ষ্য করে।

ভেড়ের বাচ্চা উর্নুটা এক হপ্তা পেরুতে না পেরুতেই বেশ বড়সড় আর তালেবর হয়ে উঠল। অম্‌রু তাকে বড় একটা কাছছাড়া করে না। ফাঁক পেলেই বাচ্চাটা ছুটে গিয়ে কোনও মাদি ভেড়ের বাঁটে খোঁচা মেরে দুধ টেনে খায়। দেখতে পেলেই রুক্কা ঘ্যাগ করে ধমকে ওঠে। ভাবখানা এই, যখন তখন এসব কী কাণ্ড?

রুক্কার কাছে বে-আইনি কিছু চলবে না। উর্নুটা এ কদিনেই কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বেশ করুণ গলায় ডাকতে শিখেছে। রুক্কার কাছে ধমক খেয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল তার বালক-প্রভুর আশ্রয়ে। অম্‌রু অমনি তাকে পিঠে চাপিয়ে তার সামনের দুটো পা গলার দু-পাশ দিয়ে বুকের কাছে টেনে ধরে পাক মেরে মেরে ঘুরতে লাগল। কান্না থামল উর্নুটার।

বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরে সাদা বরফের শত শত তাল যেন সারা দিনভোর গড়িয়ে বেড়ায়। ভেড় বক্‌রির পাল তো নয়, গদ্দীরা ওদের বলে ধন। যথার্থই ঐশ্বর্য। ওদের ভরণপোষণ, সংসারযাত্রি নির্বাহের সবসেরা অবলম্বন।

পাল পাল ভেড় বক্‌রি চরছে। প্রাণভরে চুরচুর করে ছিঁড়ে খাচ্ছে লম্বা নিরু ঘাস।

এখানে পহালদের বিশেষ কিছু ভাবনা নেই ভেড় বক্‌রি নিয়ে। কেবল সামলে রাখা, যাতে অন্যের সীমানায় গিয়ে না পড়ে। অবশ্য গদ্দী কুত্তরগুলো এ বিষয়ে ভীষণ সজাগ। তার সীমানা ভেঙে লোভীদের মুখ বাড়াতে দেবে না কোনও মতে। যদি মালিকের দুর্মতি হয়, সুলুক সন্ধান বুঝে পাশের জমিতে এগিয়ে দেয় তার দল, তাহলে করার কিছু নেই। ধরা পড়লেই চেঁচামেচি, তুলকালাম। শেষে অপরাধীর সওয়ানায় ভেড়া চরিয়ে শোধ তোলা হয় এই চোরাই কর্মের।

হরিচন্দ্ কখনও এ কাজ করে না। সে অল্পে তুষ্ট। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সে মেশে কম, কিন্তু সারাক্ষণ সদ্ভাব রেখে চলার চেষ্টা করে।

বাঁ হাতের মুঠোয় এক গোছা ভেড়ার লোম ধরে ডান উরোতে কোক্‌ড়ির (তক্‌লি) কাঠি চেপে পাক দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছিল হরিচন্দ্। ফরফর করে পাক খেতে খেতে বেরিয়ে আসছিল কাত্‌না (সুতো, উল)। নিজের সুতো নিজে কাটে, নিজের পোশাক নিজেই তৈরি করে নেয় হরিচন্দ্। এবার থেকে দুটো পোশাক তৈরি করতে হবে তাকে। অম্‌রু বড় হয়েছে। এখন থেকে তার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরবে তার ছেলে। ভেড় বক্‌রি চরাবে, পথঘাট চিনবে, পাহাড় পর্বতের মেজাজ মর্জি জানবে।

গংগীর বাপ বেঁচে থাকতে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না। নিজের জাতের লোক হলে কী হবে, ব্যবসা করে বড় হয়েছিল হরিচন্দের শ্বশুর। জাতে মহাজন বৈশ্য না হয়েও মহাজনী কারবার করে অনেক টাকা পয়সা করেছিল মানুষটা। মেয়ে তার বাপের অমতে

পালিয়ে গিয়ে একটা চালচুলোহীন গদ্দীকে সাদি করেছিল বলে বুড়ো বয়সে খেপে গিয়েছিল লোকটা। কিন্তু বুড়ো যেই মরল, তার মাস তিনেকের ভেতর ছেলের জন্ম দিয়ে গংগীও মরল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অম্‌রুর মামা মা-মরা ভাগনের খবর পেয়েই অনেক সাধ্যসাধনা করে হরিচন্দের কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখল ভাগনেকে। ছেলেপুলে নেই। ভাগনেই হল মামা মামির চোখের আলো। কিন্তু হলে হবে কী বাপের রক্ত বইছে দেহে। ভেড় চরাবার জন্য ডাক দিতেই এক পায়ে খাড়া।

কোক্‌ড়িতে পশমি সুতো পাকাচ্ছিল হরিচন্দ্ আর খানিক দূরে ঘাসের জমিনে জুত করে বসে রুবানা বাজাচ্ছিল অম্‌রু। তারের উপর দিয়ে কচি কচি আঙুলগুলো খেলা করে যাচ্ছিল। ভারী মিষ্টি একটা সুর রুবানা থেকে বেরিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল। সবুজ ঘাস, নীল আকাশ, সাদা সাদা বরফের চূড়োর কথা বেজে বেজে উঠছিল রুবানার সুরে! হরিচন্দ্ কাজের ফাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল ছেলেকে। একেবারে গংগীর মুখখানা বসানো। শেষ বেলার কোমল আলোটুকু অম্‌রুর মুখে অদৃশ্যলোক থেকে কে যেন মাখিয়ে দিচ্ছিল। অম্‌রু বাজিয়ে চলেছে। থেমে গেছে হরিচন্দের হাতের কোক্‌ড়ি। সে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। সূর্যাস্তের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে ধীরে ধীরে সাদা তুষার পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। হঠাৎ হরিচন্দের চোখের সামনে ফুটে উঠল দশ বছর আগেকার একটা ছবি। গংগীর হাত ধরে সে চলেছে সাচ জোতের দিকে। ভারধূপের (মধ্যাহ্ন) অনেক আগেই পেরিয়ে যেতে হবে জোৎ। না হলে শুরু হয়ে যাবে বিয়ানা (ঝড়)। সে ঝড় সহজে থামবে না। কিন্তু গংগীর ভারী কষ্ট হচ্ছিল জোর কদমে হাঁটতে। তিন মাস আগে সে যখন এই পথে গিয়েছিল তখন অম্‌রু ছিল পেটে। কষ্ট হয়নি তার পথ চলায়। গদ্দী মেয়েরা ভারী কষ্টসহিষ্ণু। তাদের প্রসব বেদনার বালাই নেই। হরিচন্দ্ সেদিন বউয়ের হাত ধরে চলতে চলতে ভাবছিল তার ঠাকুমার কথা। বনে কাঠ কুড়োতে গিয়ে তার বাপকে প্রসব করেছিল। তারপর ছেলের নাড়ি কেটে, কাঠের বোঝা আর ছেলে বেঁধে নিয়ে ঘরে ফিরেছিল।

হরিচন্দ্ ভাবছিল, জোতটা ঠিক সময়ে পেরিয়ে গিয়ে ওপারে যা হয় হোক। হয়তো ঘরে ফিরে গিয়েই বাচ্চা হবে গংগীর। কিন্তু ওপরওয়ালার মনে কী আছে কে জানে। হরিচন্দ্ সেদিন পথ চলতে চলতে মণিমহেশ আর ছোড়্‌নেবালীর নাম ঘন ঘন জপ করছিল। কিন্তু পা চালাতে চাইলেই কি আর পা চলে। প্রসবের সময় তখন ঘনিয়ে এসেছে গংগীর। সাচ জোৎ আর পার হওয়া গেল না। ভারধূপ কখন পেরিয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে বিয়ানা। প্রচণ্ড আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়েছিল পাহাড় থেকে পাহাড়ে। মাঝে মাঝে সে আর্তনাদ থেমে গিয়ে একটা গোঙানির শব্দ থেকে থেকে উঠে আসছিল। বরফ ছাওয়া ল্যাসে (মেষ চারকদের চড়াই উৎরাইয়ের আগে-পরের আস্তানা) তখন হরিচন্দ্ ভেড় বক্‌রির পাল আর বউ নিয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। অসুজের (আশ্বিন) শেষ হতে চলল, হাইউন্দ্ বা শীত শুরু হয়ে গেছে ওপরের পাহাড়ে। হরিচন্দের মনে হল, আরও আগে উড়ান্ধার ছেড়ে চলে এলে ভাল হত। কিলাড়ে ছেনছেল্লা মাও তাই বলেছিল। কেবল গংগীর জায়গাটা ভাল লেগে যাওয়ার জন্য সে থেকে গিয়েছিল সবার পেছনে। পহালরা যে যার ভেড় বক্‌রি নিয়ে উড়ান্ধারের কাণ্ডা খালি করে চলে গেল। হরিচন্দ্ ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলে গংগী তার হাতখানা টেনে ধরে বলেছিল, পাঙ্গী ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না গো।

ব্যস, গংগীর ওই একটা আবদারই যথেষ্ট। হরিচন্দ্ শূন্য উড়ান্ধারে বউকে নিয়ে আরও

পনেরো রোজ কাটিয়ে দিয়েছিল। গংগীর হাত ধরে সারা কাণ্ডা চষে বেড়াতে গিয়ে তার মনে হত, চম্বার রাজাবাহাদুরের সঙ্গে তার কোনও তফাত নেই। সারা উড়াঙ্কার তার রাজ্য।

সেদিন বিয়ানার সঙ্গে সঙ্গে হেন্ট্ (তুষারপাত) শুরু হয়ে গিয়েছিল। বায়ু-তাড়িত তুষার ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছিল। সারা ল্যাস বরফের পুরু আস্তরণে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। গংগীর পা দু'খানা গাড়রুতে ঢেকে তাকে জড়িয়ে বসেছিল হরিচন্দ্। ভেতর থেকে কেমন যেন একরকম শ্বাস টানছিল গংগী। মহাজন বাড়ির আদুরে মেয়ে পথের এত কষ্ট সইতে পারবে কেন। সারা আকাশ, বরফের চূড়া, চন্দ্রভাগা আর অগুনতি নদীনালা ফিকে রক্তের রঙে রাঙিয়ে সূর্য ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল কলেল। সেই ভয়াল সন্ধ্যার কথা মনে হোলে হরিচন্দের বুকের খুন থেমে যায়। থমথমে অন্ধকার। তার ভেতর থেমে আসা হাওয়ার গোঙানি একটা আহত দৈত্যের দীর্ঘশ্বাসের মতো মনে হচ্ছিল। ভয়ংকরভাবে আহত রাক্ষসটা তার কালো দেহখানা চরাচরের ওপর ফেলে দিয়ে যেন মরণকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য জোরে জোরে কয়েকটা শ্বাস টানছিল। মাঝ রাতের দিকে সে শ্বাস একেবারে থেমে গেল।

চরাচর নিস্তব্ধ। শবের মতো প্রচণ্ড এক শীতলতায় রাতটা মূক হয়ে আছে। গংগীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে বসে থাকতে থাকতে ঢুলুনি এসে গিয়েছিল হরিচন্দের। কত রাত পর্যন্ত বসেছিল মনে নেই। হঠাৎ বুকের মাঝখানে একটা আলোড়ন। গংগী ছটফট করছে। কিছু সময়ের ভেতরেই গংগীর দেহের আক্ষেপ থেমে গেল! ক্ষীণ একটা কান্নার শব্দ বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে। হরিচন্দ্ হাতড়ে দেখল গংগীর দেহটা অবশ হয়ে এলিয়ে পড়েছে। এ কী! একটা মাংসের পিণ্ডের মত কি যেন হাতে ঠেকল। পাথরের টুকরোয় রুনকা ঘষে ভুর্জ পাতায় আগুন ধরিয়ে কাঠ জ্বালল হরিচন্দ্। তুষার ছাওয়া অন্ধকার রাতে ধিক ধিক করে আগুন জ্বলছে। দেখা গেল জনমানবহীন প্রান্তরে ভূমিষ্ঠ হয়েছে একটি মানবশিশু। বরফের চাদরের ওপর প্রাণহীন মায়ের দেহটাকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিয়ে শিশুটিকে নিজের বুকে চেপে ধরে আগুনের তাপ দিতে লাগল হরিচন্দ্। উত্তর আকাশের দিকে হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল। বিহানু তারা জাস্কারের চূড়ায় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ঘোর বিপদেও গদ্দীকে উতলা হতে নেই। সে শিশুটিকে শূন্যে দু'-হাতে তুলে ধরে ধ্রুব নক্ষত্রকে নমস্কার জানাল।

রুবানা ফেলে এখন বাঁশুরি বাজাচ্ছে অমরু। মিষ্টি সুর ভেসে চলেছে সন্ধ্যার প্রান্তরে। পাশের পাহাড়ে সে সুরের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উঠছে।

ঘোর কেটে গেছে হরিচন্দের। এই মুহূর্তে ছেলের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, বাঁশুরিতে অমরু তার হারানো মাকে ডেকে চলেছে। আর ওই পাহাড়ের আড়াল থেকে গংগী বলছে, এই যে বেটা, এই তো আমি।

দুই

শ্যারি উৎসবের ধুম পড়ে গেছে উলাংসা গ্রাঁতে। অসুজ মাস, শ্যার ঋতু। লাহুল, স্পিতি, পাঙ্গীর চারণ শেষ করে সবে ঘরে ফিরেছে গদ্দীরা। মক্কি তোলার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন গাঢ় সোনালি রঙের মক্কি শুকোচ্ছে গৃহস্থের ঘরের ছাদে। সৈরী (শরতের ফসল) তোলা হয়ে গেলেও কানক বা গমের বীজ বোনার জন্যে খেতি তৈরির কাজ শুরু হয়নি কিষাণদের ভেতর।

ভারধূপ পার করে উলাংসার যুবক-যুবতীরা সার বেঁধে চলেছে বনের দিকে। ওরা ওদের গাদেরানে প্রচলিত বহু পুরাতন প্রেমের গান ধরেছে। গানটি আজকের শ্যারির সঙ্গে খাপ খায় না। কারণ শ্যারি শরৎকালের আনন্দ উৎসব, আর এ গানটি বড় দুঃখের। তবু গদ্দী তরুণ-তরুণীরা একসঙ্গে মিলিত হলে এ গান গায়। তাদের মনের না পাওয়ার দুঃখ এই গানের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়। গরিব আর বড়ঘরের চিরদিনের বিভেদ নিয়ে এ গান। ফুল্‌মু ভারী মিষ্টি মেয়ে, কোমল তার মন। সে ভালবেসেছিল বড় ঘরের একটি ছেলেকে। ওদের গোপন ভালবাসার খবর পেয়ে জোর করে ছেলের অভিভাবকেরা অন্যত্র ছেলেটির বিয়ের ব্যবস্থা করল। নিরুপায় দুঃখী মেয়েটি আত্মহত্যা করে বসল।

বিয়ের শোভাযাত্রা যখন এসে পৌছোল একটা খরস্রোতা নালার ধারে তখন সেই হতভাগ্য মেয়েটির শবযাত্রাও এসে পৌছোল সেখানে। ছেলেটি যখন শুনল এ তার আনটন (প্রেমিকা) ফুল্‌মুর মৃতদেহ তখন সে তার সামনের খরস্রোতা নালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করল।

ছেলেরা গান ধরেছে, মেয়েরাও যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে।

গাড়ুয়ে বিছাড়ুয়ে ফুল্‌মু
কিযো ঝাক্‌দি
ঝাকা কিযো মার্‌দি
দো হাথ বুটনে দে লানে জানি
গলাঁ হুয়ে বেতিয়াঁ।

বনের চড়াই পথে ছেলেরা উঠে গিয়েছে আগেভাগে। তারা ক্যায়ল বনের তলায় পৌছে ফিরে দাঁড়িয়ে গান ধরেছে। মেয়েরা নীচে দাঁড়িয়ে ছেলেদের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছে।

ওয়ারে ওয়ারে রঞ্জদি
যাননি চলে পারে পারে
ফুল্‌মুদি লাস যানি
গলা হুয়ে বেতিয়াঁ।

এই গান গাইতে গাইতেই ওরা পরস্পরের হৃদয় সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠছে। এখানে ছেলেমেয়েরা মনে মনে নির্বাচন করে নিচ্ছে তাদের আনটি, আনটন বা প্রেমিক প্রেমিকাকে।

একটা সোজা সবুজ ক্যায়ল (চীর পাইন) গাছের তলায় বাইশ বছরের যুবক অম্‌রু ঠিক যেন তরুণ একটা গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সবার গলার আওয়াজ ছাপিয়ে উঠেছে তার গলা। বাঁশুরির সুর সাধা হচ্ছে তার গলায়।

দলের কয়েকটি মেয়ে উৎসুক হয়ে উঠেছে এই নবীন যুবা পুরুষটি সম্পর্কে।

বাবার শ্রাদ্ধের কাজ শেষ করে মাস দুয়েক হল সে সরল উপত্যকা থেকে এসেছে উলাংসায়। এখানে একসময় তার পিতৃপুরুষের ভিটে ছিল। হরিচন্দ্‌ মরার আগে অম্‌রুকে একবার এই ভিটের দখল নিতে আসার জন্য বলেছিল। তাই বাপ মারা যাবার পর সে এসেছে তিরিশ মাইল পথ পেরিয়ে সরল থেকে উলাংসায়। জীবনের শেষ ক'টা দিন ভাগ্য বিপর্যয়ে কেটেছিল হরিচন্দের। হেন্‌ (তুষার স্তূপ) চাপা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তার ভেড় বক্‌রির পুরো দলটা। বৃদ্ধ, বহু যুদ্ধের সেনাপতি রুক্‌কা তার বাহিনীর সঙ্গে হাজার হাজার মন বরফের স্তূপের তলায় সমাধিস্থ হয়েছিল। অর্ধপ্রোথিত হরিচন্দ্‌কে বরফের তলা থেকে টেনে বের করে

এনেছিল অম্‌রু। দুর্ঘটনার হাত থেকে আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল সে। বাপকে সারা পথ কাঁধে করে বয়ে আনতে হয়েছিল তাকে। পঙ্গু হরিচন্দকে নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় প্রায় দুটো বছর লড়াই চালিয়েছিল অম্‌রু। ভেড় বক্‌রির ধন নেই। নেই অন্য কোনও সম্বল। হরিচন্দ্ ভবিষ্যতের জন্যে কাঁচা টাকা কখনও সঞ্চয় করে রাখেনি। যখনই পশম বেচে টাকা এসেছে হাতে তখনই কিনে ফেলেছে নতুন ভেড় আর বক্‌রি।

বনে ঠিকাদারের কাঠ কেটে রোজগার করেছে অম্‌রু। ভাঙা রাস্তা মেরামতির কাজ করে মজুরি নিয়ে এসেছে সে। বাপকে সেবা করেছে প্রাণপণ। অভাব কী তা বুঝতে দেয়নি হরিচন্দ্‌কে। কিন্তু বিছানায় পড়ে থেকেও সব বুঝতে পারত হরিচন্দ্। অম্‌রুর দুর্দশার কথা ভেবে তার চোখ উপচে আঁসু গড়াত। অম্‌রু দেখতে পেলেই মুছিয়ে দিত বাপের চোখের জল। বলত, তুমি কাঁদছ কেন বাপুজি, আমি আবার ভেড় বক্‌রির দল গড়ব।

ছেলের কথা শুনে কান্না থেমে যেত হরিচন্দের। অম্‌রুর হাতখানা চেপে ধরে বলত, ভেড় বক্‌রি গদ্দীর কাছে সব সে বড় ধন বেটা। অন্য ধনের লালচে একে ভুলবি না কখনও। আমার রাস্তা যেখানটায় ভেঙে গেল, ঠিক সেখান থেকে তৈয়ার কর তোর রাস্তা। কেহ্‌লু বীরের (পাহাড়ের দেবতা) গুস্‌সা হয়েছিল তাই হেন্ গিরল। কেহ্‌লু বীরের পূজা করতে ভুলবি না।

উৎসবের অঙ্গ হিসেবে কাটা হল একটা লম্বা ক্যায়ল গাছ। মসৃণ করে ছাঁটা হল তার ডালপালা। এবার গাছটাকে যুবকরা ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এল একটা ফাঁকা জায়গায়। মেয়েরা জায়গাটার তিন দিকে ঘিরে দাঁড়াল। আর ছেলেরা ভাগ হয়ে গেল দু' দলে। এবার গাছটাকে শূন্যে তুলে দু'দিকে টানতে লাগল প্রতিযোগীরা। শেষের যুবকটিই প্রধান খুঁটির কাজ করছে। একপক্ষে গাছের শেষ প্রান্ত ধরে দলপতির দায়িত্ব নিয়েছে অম্‌রু। টানাটানি চলেছে দু' দলের। ওই ভারী গাছখানা যেন মাটিতে না পড়ে। মেয়েরা দেখছে আর হই হুল্লোড় করে হাসি ছড়াচ্ছে। কিছুক্ষণের ভেতরেই অম্‌রুর দল হিড়্ হিড়্ করে প্রতিযোগী দলটিকে টেনে নিয়ে পেছন দিকে চলতে লাগল। সীমারেখা না পেরুলে জয়ী হওয়া যাবে না, তাই সবেগে টানতে লাগল অম্‌রুর দল। সীমা পেরিয়ে গেছে। পরাজিতদের মুখ বিজয়ীদের সীমারেখার দিকে, তাই তারা বুঝতে পারছে সীমানার চিহ্ন। কিন্তু অম্‌রুর দল পিছু হটতে গিয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তাই টেনে চলেছে প্রাণপণ।

অম্‌রু যখন মেয়েদের গলায় আর্ত হুঁশিয়ারির আওয়াজ শুনল তখন তার করার কিছুই নেই। সবাই বনের এই জায়গাটার অবস্থান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেও অম্‌রু নবাগত বলে তার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। সে উৎসাহে প্রবল বিক্রমে গাছটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে পড়ল একটা ঢালু জায়গায়। সবাই ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে গাছটা। হইহই করে একটা গাছে ডোর (গদ্দীদের কোমরে জড়ানো ছাগলোমের দড়ি) বেঁধে কয়েকজন নেমে পড়ল নীচে। দুটো গাছের ফাঁকে আটকে যাওয়ায় বড় বাঁচান বেঁচে গেছে অম্‌রু। খালি কপালের খানিকটা অংশে চোট লেগে রক্ত ঝরে পড়ছে।

ধান্‌নি দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। উলাংসার পাশে হোলি গ্রাঁতে তার বাড়ি। সে বাউড়ি (পাহাড়ের ফাটল থেকে চুঁইয়ে পড়া জলধারা) থেকে জল নিয়ে যেতে এসেছিল। শ্যারির হল্লা শুনে ওপারের বন পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল উৎসবের জায়গায়। হাতে ছিল তার খালি ঘড়েলুখানা (ঘড়া)। অম্‌রুকে খাদ থেকে ওপরে তুলে আনার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঢালার জন্য

জলের দরকার হয়ে পড়ল। কিন্তু কাছে পিঠে নালা নেই আর কারু হাতে জল আনার পাত্রও নেই। গ্রাঁয়ের বসত এলাকা ছাড়িয়ে ওরা উঠে এসেছে অনেকখানি পথ।

চক্ষের নিমেষে ধান্‌নি খড়েলু কাঁখে বন চিরে ছুটল বাউড়ির দিকে। জল ভরে নিয়ে উৎসবের জায়গায় ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে।

ফাঁকা জায়গায় শুইয়ে রাখা হয়েছে অম্‌রুকে। সে সব ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিল কিন্তু জোরে তাকে চেপে ধরে রেখেছে দোস্ত্‌রা।

ঘড়েলু থেকে একটি ছেলে জল ঢেলে ঢেলে দিতে লাগল আর ধান্‌নি তার ঘুন্‌ডি ভিজিয়ে মোছাতে লাগল অম্‌রুর কপালের রক্ত।

উঠে বসে আঁজলা ভরে জল খেল অম্‌রু। কতক্ষণ পরে বেশ খানিকটা সুস্থ হয়ে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল সে।

ছেলেমেয়েরা অম্‌রুকে ঘিরে হইহই করে নাচ জুড়ে দিলে। বিজয়ী দলপতি উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার আসল উৎসবের শুরু।

মেয়েরা পাত্র ভরে এনেছে পানীয়। লুগ্‌রি মদ। বাটি ভরতি করে সে দারু পরিবেশন করা হচ্ছে যুবকদের। তারা মাঝে মাঝে হাত থেকে বাটিটা নামিয়ে রেখে প্রবল বেগে একটা লাফ মেরে ঘুরে ঘুরে ঘূর্ণির মতো নাচছে। মেয়েরা হাততালি দিচ্ছে আর গান গাইছে। সন্ধ্যায় আকাশে চাননি দেখা দিলেই ওরা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে ফিরে যাবে গ্রাঁতে (গাঁ)।

ধান্‌নি ওদের পানোৎসব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সবার চোখ এড়িয়ে গা ঢাকা দিলে বনের মধ্যে। কলেল ঘনিয়ে ওঠার আগেই তাকে ফিরতে হবে হোলিতে। বাউড়ি থেকে জল ভরে নিয়ে ফিরবে সে। ক'দিন আগেও ওপরের পাহাড় থেকে মক্‌কি খেতে নেমে এসেছিল রীচ (ভালুক)। বনের মধ্যে রাতে দু'-চারজন পথচারীকে আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে। পালাতে হবে তাড়াতাড়ি। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

বনের ভেতর ঝোপঝাড়, গাছপালার জটলায় শেষ বেলাতেই কলেল ঘনিয়ে উঠেছিল। ধান্‌নি ঘন ঝোপের ভেতর শুনতে পাচ্ছিল শীতু পোকার ডাক। ঠিক যেন বলছে, 'শ্যার আই, শ্যার আই'—শীত এল, শীত এল।

পরের দিন পড়ন্ত বেলায় বাউড়িতে জল আনতে এসে দূর থেকে একটা সুর শুনতে পেল ধান্‌নি। সে থমকে দাঁড়াল। বাঁশুরি বাজাচ্ছে কেউ। তার মনে হল, এমন মিঠে সুর সে শোনেনি কখনও।

ধীরে ধীরে বাউড়ির ধারে এসে হঠাৎ আবিষ্কার করল বাঁশুরিয়াকে। একটা প্রি গাছের তলায় হেলান দিয়ে বসে কালকের উৎসবের সেই আহত ছেলেটি বাঁশুরি বাজাচ্ছে।

ধান্‌নিকে দেখে অম্‌রু বাঁশুরি থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। হেঁকে বলল, বেশ মেয়ে তো তুমি! কাল শ্যার থেকে গা ঢাকা দিলে!

মিষ্টি করে হাসল ধান্‌নি, বলল, অন্যের লুগ্‌রিতে আমি ভাগ বসাই না।

তবে অন্য পুরুষ জেনে তুমি তার সেবা করতে গেলে কেন?

সেবা জেনানার ধরম।

হাতছানি দিয়ে অম্‌রু প্রি গাছের কাছে ডাকল ধান্‌নিকে। ধান্‌নি মাথা নেড়ে জানাল সে অম্‌রুর ডাকে সাড়া দেবে না। পিঠের ওপর পড়ে থাকা বিনুনিটা মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নড়ে

উঠল। ধান্‌নি ঘড়েলু ভরে জল তুলতে লাগল বাউড়ি থেকে, আর আড়চোখে সুঠাম যুবা পুরুষটির দিকে তাকাতে লাগল।

অম্‌রু আবার বলল, ভয় নেই, রীচ (ভালুক) কিংবা লক্কর বাঘা নই আমি।

ধান্‌নি চেঁচিয়ে বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

তবে?

তবে আবার কী?

তুমি কাল একটা চোটলাগা মানুষের সেবা করলে তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে এলাম।

ধান্‌নি বলল, ওটুকু যে কেউ করত।

কী নাম তোমার?

ধান্‌নি।

আমি অম্‌রু। কোন গ্রাঁয়ের মেয়ে তুমি?

কী দরকার মশাই? আমার কোঠিতে চড়াও হবে নাকি?

সে ভয় নেই। আমি তো চম্বার রাজার সেপাই নই যে তোমার ঘরে গিয়ে হামলা করব।

ধান্‌নি মনে মনে বলল, তুমি কারু ঘরে গিয়ে দাঁড়ালে সে মেয়ে কৃতার্থ হয়ে যাবে। মুখে বলল, হোলি। আঙুল তুলে দেখিয়েও দিলে গ্রাঁটা।

পেছনের ডোরে গুঁজে রাখা একখানা ঘুন্‌ডি ডান হাতে সট করে টেনে নিয়ে হাওয়ায় ওড়াতে ওড়াতে অম্‌রু বলল, এই ঘুন্‌ডিখানা কুড়িয়ে পেয়েছি। যার ঘুন্‌ডি সে এখানে এসে নিয়ে যেতে পারে।

বাউড়ির ধারে ঘড়েলুখানা ঠক করে বসিয়ে রেখে পাথরের চাঁইয়ের ওপর পা ফেলতে ফেলতে একটা উড়ুক্কু কাঠবেড়ালির মতো হইহই করে চড়াই ভেঙে উঠতে লাগল ধান্‌নি। ঘড়েলুখানা ততক্ষণে গড়িয়ে পড়েছে। বক্ বক্ আওয়াজ তুলে সে গাল পাড়তে লাগল ধান্‌নিকে।

অম্‌রুর কাছে পৌঁছে ধান্‌নি তার কালকের ফেলে আসা ঘুন্‌ডিটা ছিনিয়ে নেবার জন্যে হাত বাড়াল। প্রি গাছের একটা ডালে অম্‌রু ঘুন্‌ডিখানা ঝুলিয়ে দিলে। দু'-তিনবার লাফিয়ে নাগাল না পেয়ে স্থির হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল ধান্‌নি। যা আশা করেছিল ঠিক তাই হল। অম্‌রু ঘুন্‌ডিখানা জড়িয়ে দিলে ধান্‌নির মাথায়। অমনি দু' চোখের অবাক করা দৃষ্টি অম্‌রুর মুখের ওপর ফেলে ধান্‌নি বলল, উলাংসায় থাকো তুমি? ওখানে তো রথীদের বাস।

আমি সবে উলাংসায় এসেছি। আমার দু' পুরুষ আগের মানুষরা উলাংসাতেই থাকত। আমি জাতিতে রথী।

আশ্বস্ত হল ধান্‌নি, হোলিগ্রাঁয়ের অধিকাংশই রথী। কেবল দূরের একটা শৈলশিরায় কিছু হোলিয়া জাতের লোক বাস করে।

ধান্‌নি বলল, উলাংসায় এসেছ কেন?

আমার পুরোনো বসতবাটির দখল নিতে। আর—।

আর কী?

অম্‌রু আমতা আমতা করে বলল, কী জাতের লোক হোলিতে বাস করে?

মুখ টিপে হাসি চেপে ধান্‌নি বলল, তা জেনে তোমার লাভ?

অম্‌রু অমনি বলল, নিজের জাতের মানুষ হলে শাদি টাদি করা যেত।

ধান্‌নি বলল, অনেক রথী আছে হোলিতে, বলো তো ঘটকালি করি।

তোমার কি শাদি হয়ে গেছে?

খিলখিল করে হাসি ছড়িয়ে ঘুন্‌ডি উড়িয়ে বাউড়ির তলায় নেমে গেল ধান্‌নি। নীচে পৌঁছে নাক উঁচিয়ে আঙুল তুলে দেখালে। নাকে কোনও গয়না নেই তার। বিয়ে হলে তো নাকে সে সোনার বালাং ঝোলাবে। মাথায় বাঁধবে লাল ফিতে।

পরের দিন আবার দেখা। কথা হয়, হাসি হয়, তবু ধরা দেয় না ধান্‌নি। শেষে সাত দিনের দিন ধরা পড়ল রঙে ঝলমল নেল্ পাখিটা। চিঁউ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কথা দিয়ে গেল ধান্‌নি, সে অম্‌রুকে ছাড়া আর কাউকে শাদি করবে না। দুনিয়া জাহান্নামে গেলেও না।

অম্‌রু বলল, তোমাকে শাদি করতে গেলে তো কড়ি লাগবে এক কাঁড়ি। তোমার মাতাজি কি জামাইয়ের কাছে অল্প কড়ি পেয়ে তুষ্ট হবেন?

ধান্‌নি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, চার চারটে বাওয়াল পিতাজির সাতশো ভেড় কুগ্‌তি জোৎ পেরিয়ে লাহুল নিয়ে যায়। সে বাড়ির মেয়ে আনতে গেলে কড়ি ঢালতে হবে না?

ভারী ভাবনায় পড়লাম ধান্‌নি। কী উপায় করি? জাতের বাধা দূর হয়েছে, এখন কড়ির পাহাড় তুলি কী করে?

ধান্‌নি ঘড়েলু মাথায় তুলে নিয়ে পা চালাতে চালাতে বলল, তা আমি কী জানি। শাদির সাধ হয়েছে কড়ি জোগাতে হবে বইকী।

আরে শোনো, শোনো—অম্‌রু ফেরাল ধান্‌নিকে। বলল, তোমার পিতাজির তো একপাল ভেড় বক্‌রি, তাই না?

কথার সমর্থনে ধান্‌নি মাথা ঝাঁকাল।

আচ্ছা, এতগুলো বাওয়ালের পেছনে খরচ হচ্ছে কত? ভেড় চরাতে এক একজন কত পায়?

ধান্‌নি মাথা থেকে ঘড়েলু নামিয়ে রেখে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসল। আঙুলের রেখায় আঙুল ঠেকিয়ে হিসেব দেবার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, মক্‌কির আটা পাক্‌কা তিরিশ পাথ (আশি কিলো)। সাথে আছে নিমক আর মর্‌চা। পাহাড় থেকে অম্‌লুর পাতা তুলে ও চাটনি বানাবে নিজে। ভেড় বক্‌রির দুধ যত খুশি পিয়ো, মানা নেই।

অম্‌রু জানতে চাইল, মাসে মজুরি কত?

ছে রূপিয়া। আর তিন মাহিনা বাদ ঘর ফিরলে এক ভেড়।

পোশাক?

পুরা উলের চোল, ডোর, টোপি। এক জোড়া জুটা। একখানা সুতি কুর্তা। দো গাড়রু (কম্বল)। তুমি কি পহালদের এসব কানুন জানো না নাকি?

অম্‌রু বলল, আমি যদি পাঁচ বরষ তোমার পিতাজির কোঠিতে ঘরজোয়াস্ত্রি থেকে ভেড় বক্‌রি চরাই আর শাদির টাকা শোধ দিই?

ধান্‌নি বলল, সে কানুন তো আছে। তবে ওতে বহুত ঝামেলা। কখন শ্বশুর জামাই হাতাহাতি হয়ে যায়। হোলি গ্রাঁতে তিন ঘর এমনি হয়েছে। জামাইকে তাড়িয়েছে মেয়ের বাপ। এক পহাল তো টাকা শুধতে শুধতে বুড়ঢা হয়ে গেল। পাত্রীর সাদি হল ভিন জায়গায়।

অম্রু বলল, কথাটা তুললাম তবে আমারও ওতে দিল সায় দেয় না।

ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ধান্নি কী ভাবল। একসময় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। যেন সমস্যার সমাধান হয়েছে, এমনি ভাব দেখিয়ে বলল, বির্তন (বিশেষ প্রয়োজনে বন্ধু পাতানো) করে টাকা ধার নাও, ফি বরষ শোধ দিয়ো।

অম্রু হাসল। কপালে হাত চাপড়ে বলল, আমি তো নতুন এসেছি উলাংসায়। বির্তন করতে গেলে সব জাতের, সব রকমের লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। বহুত রোজ একসাথে থাকলে তবে তো বির্তন হবে। আমার উলাংসায় খালি কোঠির জমিনটুকু ছাড়া এক বিশোয়া খেতি নেই। কে ভরসা করে আমার বির্তন বন্ধু বলে বিয়েতে রুপিয়া হাতে তুলে দেবে?

ধান্নি বলল, অল্প অল্প করে বির্তন-বন্ধুরা টাকাটা জোগালে কারও গায়ে লাগবে না। ওই তো দেখলাম, শ্যার উৎসবে সবাই তোমাকে কত খাতির করছে।

অম্রুর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে অমনি বলল, কাংড়ায় একবার মামার বাড়ি ঘুরে আসি, দেখি কিছু ব্যবস্থা করে উঠতে পারি কিনা।

ধান্নি ভীষণভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, সে তো বহুত দূর। তুমি একবার পালালে আর আসবে না।

অম্রু বলল, ধান্নি, আন্টন্ আন্টির দিল যে ডোরে বাঁধা সে ডোর আশমান জমিন লম্বা। দুনিয়ার যে কিনারে যাও ডোরে টান পড়লেই ফিরতে হবে।

তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলে গজ-কা-জোৎ পেরিয়ে কাংড়া যাওয়া স্থির করল অম্রু। উলাংসা থেকে নেমে এল খাড়ামুখ। রাতটা কাটিয়ে দিলে এক বন-রক্ষকের ঘর ভাগাভাগি করে নিয়ে। যেখানে যায় সেখানেই তার খাতির। গান বাজনা জানে, খাতির তার সর্বত্র। ভোর হতে না হতেই আবার যাত্রা। কোড়্লায় দু'-চারখানা দোকান। একটা দোকানে নোহারি (ভোরের জলযোগ) সেরে গদ্দী পহালদের মতো পাথরের চাঁইয়ের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলল অম্রু। উরেই আর ঘাটোর গ্রাঁ ডাইনে বাঁয়ে রেখে ঢুকে পড়ল সে চৌলাধারে। ক'দিন একটানা পথ চলার পর ভেড় বক্‌রির একটা পালের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। শেষ দলটি শীতের চারণের জন্য নেমে চলেছে নীচে কাংড়া উপত্যকায়। পহালটির বয়স হয়েছে। ওরা তুন্দা থেকে আসছে। বেশ কয়েক দিন ধরে হাঁটছে ওরা। সম্ভবত বুড়ো মানুষ বলে চলার গতি হিসেবের বাইরে। ভাল লেগে গেল মানুষটিকে অম্রুব। একটা তোষ গাছের মোটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে গুড়ুক টানছিল। হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে বলল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে বেটা?

ধরমশালা।

আরে আমিও তো ওই পথেই চলেছি।

অম্রু জানতে চাইল, গজ-কা-জোৎ পেরিয়ে যাবেন তো?

চৌলাধারে পৌঁছে আর কোন পথে পাহাড় ডিঙাব বেটা?

অম্রু দেখল, দূর থেকে মানুষটাকে যত বুড়ো ভেবেছিল, তার চেয়েও অনেকখানি বেশি বয়েস তার। এ বয়েসে এতখানি পথ ঘোরাঘুরি করা বড় একটা চোখে পড়ে না।

অম্রু বলল, অবাক কথা! আপনি এ বয়সেও এতখানি পথ পার হয়ে চলেছেন?

বুড়োর হুঁকো টানা থেমে গেল। আকাশের দিকে বাঁ হাতের তর্জনীটা তুলে ধরে বলল, ওই যে উনি, উমর কত? ওই যে দেহারা (সূর্য) গো। আকাশে যিনি সৃষ্টিকাল থেকে জ্বলছেন আর চলছেন।

অম্‌রু বলল, সে কথা ঠিক।

বুড়ো উত্তেজিত হয়ে উঠল, ঠিক মানে? আলবত ঠিক। চলছে বলেই জিন্দা আছে, থামলেই মরবে। যে চলবে সে জিন্দা থাকবে।

বড় দামি কথা বললেন বুড়ো বাবা।

বুড়ো খুশি হয়ে অম্‌রুর পিঠে হাত রেখে বলল, গদ্দী পহাল জন্মেছে চলার জন্যে। চলা থামলে তার আর কী রইল বেটা? এই যে এতখানি পথ পার হয়ে এলি, কতগুলো খদ, নালা, নালু, ছুই, কুহল পেরিয়ে এলি বল তো? কখনও চেয়ে দেখেছিস বেটা ওদের চলা? দৌড়ে পাহাড় কেটে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে—

বুড়ো থামল দেখে অম্‌রু বলল, তবে কী, বুড়ো বাবা?

ওদের চলা স্রেফ তলার দিকে, আর গদ্দীর চলা নিচু-উপর দু' দিক। আমরা নীচে যেমন নামছি, পাহাড়ে তেমনি চড়ছি।

আবার ভুড়ুক ভুড়ুক নারেলি টানতে লাগল বুড়ো।

সন্ধ্যার ছায়া নামছে। পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। অম্‌রু উঠে দাঁড়াতেই বুড়ো বলল, যাচ্ছ কোথা?

একটা আস্তানার খোঁজে। কাল তড়্‌কাতে (ভোর) জোৎ পার হয়ে যাব।

বুড়ো হেসে বলল, আজ রাতে এর চেয়ে ভাল আস্তানা এ তল্লাটে মিলবে না।

অম্‌রুর চোখ গিয়ে পড়ল পাশের পাহাড়টার বাঁকে। কতকগুলো ভেড় বক্‌রি পুটুর পুটুর করে ত্রোড়ঝোপের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

বুড়ো ঘাড় ঘুরিয়ে ডাক পাড়লে, ঘুঙরী...ঘুঙরী...ঈ...।

অম্‌রু একটি মেয়ের গলার আওয়াজ পেল পাহাড়ের আড়াল থেকে। একটু পরেই ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি সামনে এগিয়ে আসতে লাগল। কুত্তরটা আগেভাগে দৌড়ে এসে অপরিচিত অম্‌রুকে বুড়োর সামনে দেখে শুঁকে শুঁকে পাক খেতে লাগল। অম্‌রু দেখল, মেয়েটি তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। ভেড় বক্‌রির ছোট্ট দলটা এগিয়ে আসছে। বুড়ো আবার হাঁক পাড়ল। সম্ভবত মেয়েটির সঙ্গে অম্‌রুর আলাপ করিয়ে দিতে চায়।

এবার মেয়েটি এগিয়ে আসছে। ধান্‌নির চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট হবে। বুড়োর মেয়ে নিশ্চয়ই। কিন্তু এ কী এ যে খোঁড়া। একটা পা টেনে টেনে চলেছে।

সেই ছায়া নেমে আসা দিনান্তে মেয়েটির জন্যে বুকের ভেতর কষ্ট অনুভব করে অম্‌রু।

খাওয়ার পাট চুকল একসময়। অম্‌রুর মনে হল, অনেকদিন পরে সে এমন তৃপ্তিদায়ক একটা ভোজ খেল। কী যত্ন করে তাদের খাওয়ালে ওই খোঁড়া মেয়েটি। কানকের (গম) চাপাটির সঙ্গে দাল। তার ওপর ভ্যানঠু আর গুন্‌ঢাউলি (বেগুন ও কুমড়ো) মিশিয়ে একটা বড় মুখরোচক সবজি বানিয়েছে। আহা, সংসারে মেয়ে না থাকলে কি হয়? বাপ বেটায় হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়েছি এতদিন। এখন নিজেকেই চাপড় মেরে চাপাটি বানিয়ে খেতে হচ্ছে। সবজি দাল কে বানায়। ভেড় বক্‌রির দুধে চুবিয়েই খাচ্ছে।

খাওয়ার শেষে অম্রু বুড়োর সামনে অনেক তারিফ করল মেয়েটির রান্নার।

বুড়ো বলল, ঘুঙরী আমার খোঁড়া হলে কী হয়, ওই তো আমাকে পাহাড় পর্বত, নদী নালা চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

অম্রু দেখল মেয়েটি ভারী সুন্দর। হাসির কথা উঠলে হাসে, তবে সে হাসিতে শেষবেলার করুণ আলো মাখানো থাকে। ধান্নি চিড়ু পাখির মতো চঞ্চল। উড়ে এসে টুঁই টুঁই টিক্, টুঁই টুঁই টিক আওয়াজ তুলে চড়বড়িয়ে কথা বলে যায়। একসময় সাঁঝের আকাশের দিকে চোখ তুলে বাউড়ি থেকে হোলি গ্রাঁয়ের দিকে ফুড়ুত করে উড়ে পালায়।

চিড়চিড় শব্দে আগুন জ্বলছে। আকাশে ফুটফুটে চাঁদের আলো। ধৌলাধারের সাদা চুড়োটার মাথায় একখণ্ড মেঘ শিবের জটার মতো আটকে আছে। ওই তো আকাশে জ্বলজ্বল করছে কিরগিটি (সপ্তর্ষি)। সাতটি তারা সাতটি ঋষি। ধ্যান করছেন আকাশে বসে। হরিচন্দ্ কাণ্ডায় ঘাসের জমিতে চিত হয়ে শুয়ে অম্রুকে তারা চেনাত। বলত, তারা হল দেওতাদের আঁখ।

ঘুঙরী হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে আছে। আগুন নিভু নিভু হয়ে এলে পাশে রাখা কাঠের টুকরো ফেলে দিচ্ছে। বুড়ো নারেলি হাতে নিয়ে পাট্টুখানা গায়ে জড়িয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক টানছে। একসময় হুঁকো টানা থামিয়ে অম্রুর দিকে চেয়ে ছড়া কাটল—

গদ্দী চরদা ভেদন
গদ্দান দিন্দি ধূপ,
গদ্দী জো দিন্দা ভেদন
গদ্দান জো দিন্দা রূপ।

গদ্দী ভেড়া চরায় তাই শিব দিলেন তাদের একপাল ভেড়া। আর গদ্দান জ্বালায় শিবের উদ্দেশ্য ধূপ তাই শিব দিলেন তাদের রূপ।

এই ছড়াটি জানা নেই অম্রুর। কত ছড়া, কত কাহিনী, কত গান ছড়িয়ে আছে গদ্দীদের ভেতর। পথ চলতে এমনি ছড়া তারা ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়। অম্রু কাংড়ায় তার মামারবাড়িতে যে গান শিখেছে, যে ছড়া শুনেছে, চম্বায় তার অনেক কিছুই নেই। আবার নতুন অনেক কিছুই আছে চম্বায়, যা নেই কাংড়ায়। যে মেয়ের বাপের বাড়ি কাংড়ায়, শ্বশুরবাড়ি চম্বা থেকে সে ধৌলাধারকে বলছে, হে পর্বতরাজ দয়া করে একটিবার তোমার মাথাটি নিচু করো আমি আমার বাপেরবাড়িখানা এক পলকে দেখে নিই।

রাত বাড়ছে। শীতের দাপটও বাড়ছে। চাঁদ আকাশের সীমাহীন নীল জলে সমানে রুপোর তৈরি নৌকোখানা বেয়ে চলেছে।

অম্রু তার চোলের ভেতর থেকে বাঁশুরিখানা বের করে ফুঁ দিলে। মেয়েটি একবার তাকিয়ে নড়েচড়ে বসল। বুড়ো আপাদমস্তক পাট্টু চাপিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ আপন মনে বাঁশুরি বাজাল অম্রু। ধান্নির কথা মনে করে খুশির সুর সাধল। আবার দুঃখী ঘুঙরীর কথা ভেবে বাঁশুরিতে কান্না ঝরাল। তার বাঁশুরি শুনে ঘুঙরীর মনে হল, সে পাহাড়ি নালা, কুহলের খলখল খুশিতে ছুটে পালানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছে। আবার তার মনে হল, শোয়ানের (শ্রাবণ) সারা আকাশ অঝোরে কাঁদছে তার সঙ্গে সঙ্গে।

জুস্মুসার (ঊষা) হাল্কা নীলাভ একটা আলো ফুটে উঠেছে পুব দিকে পাহাড়টার মাথায়। দক্ষিণে ধৌলাধার তখনও ধূসর। অম্রু গাড়রুর ঢাকা সরিয়ে মুখখানা বের করল। বুড়ো কখন জেগে উঠে নারেলি টানতে লেগে গেছে। ওদিকে ঘুঙরী আগুন ধরিয়ে কী যেন তৈরি করছে।

অম্রুকে জেগে উঠতে দেখে বুড়ো হাত থেকে হুঁকোটা নামিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। বড্ড হিত পড়েছে।

অম্রু বলল, হাঁ জি, এখন তো হিত পড়ারই কথা। আর তা ছাড়া অনেক ওপরে আমরা উঠে এসেছি। জোতের কাছে শ্যার ঋতুর শেষ দিকে হিত তো হবেই। তিন-চার রোজ বাদ হাইউন্দ্ শুরু হবে।

বুড়ো বলল, হাঁ ঠিক, হিত ঋতুটা পড়বার আগেই নীচের পাহাড়ে নেমে যেতে হবে।

ধরমশালায় হাইউন্দ্টা কাটাবেন, না আরও নীচে নেমে যাবেন?

ওখানেই একটা ডেরা আছে আমার, তার সঙ্গে একটা ওরি (ভেড়-বক্রির আস্তানা)। হাইউন্দে ওই ওরিতেই রেখে দিই ভেড় বক্রিগুলো। মেয়েটাও একটু জিরোয়।

ধরমশালার কোথায় বাসা?

বানোই খাদের ধারে। সেপাই চৌকির ডাইনে।

অম্রু বলল, অবাক কাণ্ড! ওখানেই তো আমার মামারবাড়ি, চৌকির বাঁয়ে।

বুড়ো ঝেড়ে ঝুড়ে বসে বলল, কী নাম মামার?

পারষোত্তম।

আরে পারযোত্তমজির ভাগনে তুমি? উনি তল্লাটের জমিনদার আছেন। আমাদের লম্বরদার।

—হাঁ জি, উনি টিকার মুখিয়া আছেন!

বুড়ো হাঁকডাক জুড়ে দিলে, ঘুঙরী, ও বেটি, এ লেড়কা লম্বরদার পারযোত্তমজির ভাগনে আছে।

ঘুঙরী একবার বাপের দিকে তাকিয়ে আবার খানা পাকাবার কাজে মন দিল।

বুড়ো আবেগের সঙ্গে বলল, আমার জাতের একজন মস্ত বড় আদমি। এত বড় আদমি তবু দেখা হলেই খোঁজখবর নেয়।

ভোরেই জোৎ পেরিয়ে ওপারে যাবার জন্যে উঠে পড়ল অম্রু। বুড়ো বলল, সে কি হয়, যা হোক দুটি খেয়ে যেতে হবে। রাত থেকে ঘুঙরী রেঁধেছে।

অম্রু বলল, বেশ, দিন, বেঁধে নিয়ে যাই। এখন খিদে নেই। রাতে খুব বেশি খাওয়া হয়ে গেছে।

ঘুঙরী নিঃশব্দে রুটি আর সবজি গোছগাছ করে ভরে দিলে অম্রুর থলেতে।

অম্রু যাবার সময় এক কাণ্ড করে বসল। সে তার দামি গরম কম্বলখানা বুড়োর গায়ে চাপিয়ে দিয়ে তার ছেঁড়া পাট্টুখানা নিজের কাঁধে তুলে নিল। বুড়ো হাঁ হাঁ করে উঠল, আরে কর কী, কর কী!

কে শোনে কার কথা। অম্রুরও তো কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস আছে। রাতে আশ্রয় দিয়েছে, কত যত্ন করে খাইয়েছে, আবার খাবার বেঁধেও দিলে, এরপর কিছু একটা না দিলে কি চলে।

অম্রু বুড়ো মানুষটির কাছে আশীর্বাদ চেয়ে মাথা নোয়াল। অমনি বুড়ো অম্রুর পিঠে চাপড় মেরে বলল, দাই জুগুতি রহ্ না (জয় হোক) বেটা। বেঁচে থাকো বাবা।

অম্রুর চলতে চলতে মনে হল, সে আজ এমন একটি মানুষের ছোঁয়া পেল, যে চলার তাগিদে বার্ধক্যকে অস্বীকার করতে পারে। আশ্চর্য এক প্রেরণায় মনটা তার ভরে উঠল।

সামনের পাহাড়ের বাঁক পেরুলেই গজ জোৎ। অম্রু জোতের দেওতাকে মনে মনে স্মরণ

করে পথ চলছিল, হঠাৎ পেছন থেকে একটা আওয়াজ শুনে চমকে ফিরে তাকাল। এ কী! ঘুঙরী একটা টোহলের (পাথরের স্তূপ) ওপর উঠে দাঁড়িয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মেয়েটা জাদু জানে নাকি! কী করে এতখানি উঁচুতে উঠল!

অম্‌রু লাফিয়ে উঠল টোহলের ওপর। ঘুঙরী বেশি কোনও কথা না বলে শুধু বলল, এই সামান্য জিনিসটা আপনি নিলে বাবা খুশি হবেন।

অম্‌রু দেখল, সোনার একজোড়া নান্‌তি। গদ্দী পুরুষরা উৎসবের সময় এই রিং কানে পরে!

না না, এ আমি কিছুতেই নিতে পারব না। এ তো সোনার, অনেক দামি জিনিস।

বাবা তো আপনার দেওয়া গাড়্‌রু নিয়েছেন।

অম্‌রু বলল, একখানা গাড়্‌রু আর নান্‌তি এক হল?

—উপহারের কি দাম কষে হিসেব হয়। তা ছাড়া বাবা এখন আর উৎসবে নান্‌তি পরেন না।

এই দামি জিনিসটা হাত পেতে নেওয়ার ব্যাপারে অম্‌রু ইতস্তত করছে দেখে ঘুঙরী বলল, বেশ আপত্তি থাকলে নেবেন না। তবে আপনি দাঁড়ান, আপনার গাড়্‌রুখানা বাবার কাছ থেকে এনে দিচ্ছি।

মেয়েটিকে যতখানি দুঃখী দুঃখী ভেবেছিল অম্‌রু এ মেয়ে কিন্তু আদপেই তা নয়। আত্মসম্মান বজায় রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে জানে।

অম্‌রু হেসে দু' হাত পেতে বলল, দিন, ওঁর নান্‌তি কানে থাকলে কোনওদিনই পথ চলতে ক্লান্তি আসবে না।

ঘুঙরীর মুখখানা এতক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে নান্‌তিজোড়া অম্‌রুর হাতে দিয়ে বলল, আপনার দেরি করিয়ে দিলাম, কিছু মনে করবেন না।

অম্‌রু বলল, আপনার পিতাজির সঙ্গে থেকে কাংড়া যেতে পারলে হয়তো তিন-চার দিন বেশি সময় লাগত কিন্তু জানতে পারতাম অনেক কিছু। জরুরি কাজ হাতে নিয়ে যাচ্ছি বলে ছুটে চলে যেতে হচ্ছে।

ঘুঙরী মুখে ম্লান একটুকরো হাসি টেনে বলল, পথ চলতে এমনি আবার কোনওদিন দেখা হয়ে যেতে পারে।

অম্‌রু বলল, তাই যেন হয়।

কথা ক'টি বলে সে ঘুঙরীকে নামতে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়াল। ঘুঙরী একটুখানি হেসে বলল, আপনি আসুন। আমি একাই উঠেছি, একাই নামতে পারব।

অম্‌রু এই আত্মনির্ভরশীল মেয়েটিকে মনে মনে তারিফ করতে করতে টোহল থেকে লাফ দিয়ে নেমে জোৎ লক্ষ্য করে পা চালাল।

এক সন্ধ্যায় মামারবাড়ি এসে পৌঁছোল অম্‌রু। মামি অনেক আগেই গত হয়েছে। পুরনো চাকর দুম্‌সারাম ছুটে এল অম্‌রুকে দেখে। বুড়ো হয়ে গেছে দুম্‌সা। এখন সারা বাড়ির ভার তার ওপর দিয়ে পারষোত্তম ঘুরে বেড়ায় মন্দিরে মন্দিরে। স্ত্রী মারা যাবার পর সংসারের টান শিথিল হয়ে গেছে। ছেলেপুলে নেই। ভাগনেটাও কাছে রইল না। আর কার জন্যে হাঁকডাক, কার জন্যে খেতখামার।

দুম্‌সারাম অনেক খাতির করে ঘরে বসাল অম্‌রুকে। দুম্‌সার কাছেই শুনল, পারষোত্তম কাংড়ায় বজ্রেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গেছে। কী আর করা যায়, চার-পাঁচ দিন বসে রইল মামারবাড়ি। কখন আসে, কখন আসে, এই ভরসায় চেয়ে রইল পথের দিকে।

এক রাতে স্বপ্নে হাজির হল ধান্‌নি। বাউড়ির ধারে বসে সে আপন মনে গান করছে। প্রি গাছের গোল গোল পাতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে গান শুনছে অম্‌রু। একটা ভারী দুঃখের চেনা গান বাজছে তার গলায়। মনের ব্যথা ঝরিয়ে যাচ্ছে বাউড়ির জলে।

আসা ওয়ারে ওয়ারে
তোসাঁ পারে পারে
তেরি চলন্দি চাল বিছানি,
সজ্জন মিলন লাগে
গুটকে যাফিয়াঁ পাইয়াঁ,
খিগুদে খিগুদে সজ্জন
খিগুন লাগে,
জিঁয়া তলোয়ারি দে
ফাট্‌ সেইয়োঁ।

হে আমার প্রিয়, তোমার আমার মাঝখানে আজ দুস্তর বাধা। মনে হচ্ছে বুকের মাঝে কেউ যেন একখানা তীক্ষ্ণ তলোয়ার গেঁথে দিয়েছে।

ঘুম ভেঙে যেতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। আজ সে মামার খোঁজে বজ্রেশ্বরী মন্দিরের দিকে যাবে।

কাংড়ায় বজ্রেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে পারষোত্তমের সঙ্গে দেখা হল না অম্‌রুর কিন্তু অভাবিত একটি ঘটনা ঘটে গেল।

রাতে একটু আশ্রয়ের জন্য মন্দিরের পুরোহিতকে বলেছিল অম্‌রু। প্রধান পুরোহিত তার ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে মন্দির সংলগ্ন একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। রাতে দেবীর প্রসাদ পাবার পর তার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরখানিতে গিয়ে দেখে একটু দূরে আর একটি শয্যা পাতা। ওই শয্যার ওপর বসে একটি মানুষ ধ্যান করছে। চোখ দুটি আধবোজা। অম্‌রু যে ঘরে ঢুকল, সেজন্যে তার ভেতর কোনওরকম চাঞ্চল্য দেখা গেল না। অম্‌রু নিজের বিছানায় বসে লোকটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সামনে একটা প্রদীপ জ্বলছে। ঘরের অন্ধকার পুরোপুরি দূর করতে পারেনি সেই ক্ষুদ্র দীপের শিখা। কিন্তু ওই স্বল্প আলোতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ধ্যানরত মানুষটির মুখ। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের বেশি হবে না মানুষটির বয়স। যেমন রং তেমনি গড়ন তার। আজ দশ বছর ধরে অম্‌রু এই আকৃতির একটি মানুষের কথা শুনে আসছে। যদিও বয়সে বদলে গেছে চেহারা। তবু বর্ণনার সেই আদলটা মুছে যায়নি।

মানুষটি এবার তাকাল অম্‌রুর দিকে। আশ্চর্য! বাঁ দিকের গালে বহু শোনা সেই বড় কালো জড়ুলটা জ্বলজ্বল করছে।

মানুষটিই প্রথম প্রশ্ন করল অম্‌রুকে, কোথা থেকে আসা হয়েছে?

এখন এসেছি ধরমশালা থেকে। তার আগে ছিলাম উলাংসায়।

ওই উলাংসাতেই তোমার বাসা?

ইচ্ছে আছে, ওখানেই ডেরা বাঁধি। কিন্তু আমার আসল আস্তানা সরল উপত্যকায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল মানুষটি। একসময় স্মৃতির গভীর থেকে কথাগুলো উচ্চারণ করে বলল, সে প্রায় পনেরো বছর আগেকার কথা আমি সরল উপত্যকায় একটি রাত কাটিয়েছিলাম আমার এক দোস্তের ডেরায়। সে তখন তার বছর পাঁচেকের এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে থাকত।

অম্রু বলল, ছেলেটির মা ছিল না, তাই না?

অবাক হয়ে মানুষটি প্রশ্ন করল, ঠিক, কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

অম্রু দারুণ উত্তেজিত। একটা বিরাট রহস্যের সমাধান তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। সে আবার প্রশ্ন করল, দোস্তের ডেরায় এক রাত কাটিয়ে পরের দিনই কাংড়ার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল মানুষটি?

তুমি কি সরলের বাসিন্দা হরিচন্দ্‌কে চেনো? তার কাছে আমার সম্বন্ধে কিছু শুনেছ?

এতক্ষণে অম্রু রুদ্ধ আবেগ মুক্ত করে দিয়ে বলল, আমি হরিচন্দ্‌জির পাঁচ বরষের সেই মা-হারা লেড়্‌কা। অম্রু আমার নাম।

লোকটি নিজের বিছানা ছেড়ে এসে প্রায় জড়িয়ে ধরল অম্রুকে। আরে বেটা, তুমি হরিচন্দের লেড়্‌কা। কেমন আছে আমার দোস্ত?

তিনি আর জিন্দা নেই। কিন্তু আর একজন আজও জিন্দা আছেন চাচাজি। তিনি বেঁচেও মরে আছেন।

কে বেটা? কার কথা বলছিস?

আপনার মা।

প্রায় চিৎকার করে উঠল লোকটি, আমার মা! তাঁর তো বহুত বরষ আগে গতি হয়ে গেছে।

অম্রু গলার স্বর উঁচিয়ে বলল, ঝুটা বাত, আমি ফি বরষ বুড়িমার সঙ্গে দেখা করে আসি। আঁখ থেকে আঁসু গিরছে। বিলকুল অন্ধ হয়ে গেছে। কোঠির সামনে খাড়া হয়ে থাকে আর বাট দিয়ে চলনেওয়ালার পায়ের আওয়াজ পেলে হাঁক দিয়ে ওঠে, কে? ভগৎ? এলি বাপ?

অম্রুকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না ভগতরামের। আমার মা জিন্দা আছে আর আমি এখানে রসুইখানার কাম করছি।

অম্রু এবার প্রশ্ন করল, কী করে জানলেন চাচা যে আপনার মা মারা গেছেন?

ভগতরাম এবার শুরু করল তার কাহিনী! কী করে সে জড়িয়ে পড়ল একটা মস্ত বড় ভুলের ফাঁদে।

জ্বালামুখী এসেছিল প্রায় পনেরো বরষ আগে। মন্দিরের ভেতর বেদির মুখ থেকে পাথর ফুঁড়ে আগ বেরুতে দেখে সে যখন অভিভূত, তখন এক জটাধারী সাধু তার পাশে এসে দাঁড়াল। সে সাধুর দিকে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল, সাধু তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মনে হল, সাধুর চোখেও আগ জ্বলছে। কিন্তু মুখে অদ্ভুত এক হাসি। আও বেটা, বলেই সাধু চলতে লাগল। আর ভগতরাম, পহালের পিছু বাধ্য ভেড়ের মতো চলতে লাগল সাধুর পিছে পিছে। বেশ কয়েকদিন সাধুর চেলাগিরি করবার পর সাধু ওকে এক সন্ধ্যায় এনে হাজির করল এই বজ্রেশ্বরী মন্দিরে।

ভগতরামকে মন্দিরের সামনে মস্ত বড় পেড়ের তলায় বসিয়ে রেখে সাধু ঢুকল মন্দিরে।

একসময় মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে ভগতরামের চোখে চোখ রেখে সাধু কী যেন দেখে নিল। তারপর হঠাৎ একটা দুঃসংবাদ জানিয়ে দিল, ভগতরামের মা গত হয়েছে। তার চোখের ওপরে নাকি সে ছবি সাধুজি দেখতে পাচ্ছে।

ভগতরাম কেঁদে আকুল হতেই সাধু তাকে প্রবোধ দিয়ে বজ্রেশ্বরী মায়ের সেবক হয়ে থাকার জন্যে আদেশ করল। শেষে তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সেবাইতের জিম্মায় দিয়ে দিলে।

মায়ের মৃত্যুর পর দেশে ফেরার কোনও ইচ্ছাই রইল না ভগতরামের।

সব শুনে অম্‌রু বলল, সব ভাঁওতা চাচাজি, মামার নোকর দুম্‌সারাম বলে, নিচু জায়গার আদমির দিল আচ্ছা নেই, স্রেফ ধান্দাবাজ। চল চাচাজি, আমি তোমাকে পাঙ্গী নিয়ে যাই।

অম্‌রু ভুলে গেল তার শাদির কথা। এখন বুড়ি মা ছেনছেল্লার কাছে ভগতরামকে পৌঁছে দিতে পারলেই যেন তার জীবন ধন্য হয়ে যায়।

তড়্‌কার আলো ফুটতে না ফুটতেই কাউকে কোনও কিছু না বলে অম্‌রু আর ভগতরাম বেরিয়ে পড়ল। দ্রুত পায়ে ওরা চম্বা উপত্যকার পথ ধরল। চলতে চলতে অম্‌রুর মনে হল, তার হারানো মাকেই যেন সে ফিরে পেতে চলেছে।

কাতি মাসে দুর্গম হয়ে উঠেছে জোৎ। হেন্ট্ বা তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে সাদা চাদর বিছিয়ে শীতের রাজাকে অভ্যর্থনার আয়োজন চলেছে। দুটি অভিযাত্রী কয়েকদিন হিংস্র প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এক সন্ধ্যায় এসে পৌঁছল কিলাড়ে। ছেনছেল্লা খবরটা পেয়ে বুক ফাটিয়ে মনের ভেতর জমে থাকা কান্নাগুলো বের করে দিলে। তারপর সে আওয়াজ শুনে হাতড়াতে হাতড়াতে গিয়ে ধরল অম্‌রুকে। বুকে তার মাথাটা চেপে ধরে বলল, মা'র বুকে, তার লেড়কাকে ফিরিয়ে দিলি বেটা. আমি আশীর্বাদ করছি. তুই কোনও কাজে হারবি না। জীবন ভোর তোর শির উঁচা থাকবে আশমানের মতো।

প্রচণ্ড শীতে দীর্ঘ চার-পাঁচ মাস কিলাড়ে কাটিয়ে অম্‌রু তউন্দি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটল উলাংসার দিকে। এখন আর কাংড়ায় মামারবাড়ি গিয়ে অর্থ সংগ্রহের চিন্তা নেই। সব শুনে বুড়ি ছেনছেল্লাই জোর করে তাকে তার সঞ্চিত বেশ কিছু টাকা দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, তুই আমার বড় লেড়কার বেটা। তার ভাগ তোকে দিতে হবে না?

ভগৎ এতে ভারী খুশি। পই পই করে সে অম্‌রুকে বলে দিল, পাঙ্গীতে যেন সে নতুন বউকে নিয়ে আসে।

অম্‌রু বলল, আলবত আসব, তবে কথা দাও চাচা. তুমি আর সাচ্ জোৎ পেরিয়ে ওপারে যাবে না?

ভগতরাম হেসে মাথা দুলিয়ে জানাল, সে আর মাকে ফেলে কোথাও নড়বে না!

সাচ্ পেরিয়ে যাবার আগে দুনেইতে সেই বিশেষ নালাটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসল অম্‌রু। কিছু খাবার সেই খরস্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বসে রইল কতক্ষণ। এমনি করেই তো প্রতিবার সে বসে থাকে মায়ের কথা শুনবে বলে।

অম্‌রু ঠিক শুনতে পেল মায়ের গলার স্বর! মা তাকে বলছে, দুখ্ গায়ে মাখবি না বেটা। সব দুখ্ পায়ে গুঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাবি।

তিন

পাঁচ মাস পরে উলাংসায় সেই বাউড়ির ধারে প্রি গাছের তলায় অম্‌রুর অধীর প্রতীক্ষা। হাতে বাঁশুরি কিন্তু ফুঁ দেবার মতো বাতাসটুকুও বুকে নেই তার। বিশাল বুকখানা অজানা আশঙ্কায় ধুকপুক করছে। সেই ভারধূপ (মধ্যাহ্ন) থেকে বসে আছে সে। যদি ধান্‌নি সময় পরিবর্তন করে জল নিয়ে আগেভাগে চলে যায়। নীচে বাউড়ির জল বয়ে চলেছে। অবিকল পাঁচ মাস আগে যেমন বয়ে যেত। বাউড়ির ওপারের টিলায় একটা চিঁউ গাছ দাঁড়িয়ে। ফাগুনে আগুন জ্বেলেছে ডালে ডালে। গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে ধান্‌নির কথা ভেবে অম্‌রুর মনটাও পুড়ছে।

ওপারের পাহাড়ে সূর্য নামছে। ধান্‌নি কই! উদ্‌ভ্রান্ত অম্‌রু উঠে দাঁড়িয়ে হোলি গ্রাঁয়ের পথের দিকে পলকহীন চেয়ে রইল।

দেহারা ডুবে গেল পাহাড়ের আড়ালে। বুকের খানিকটা রক্ত ঝরিয়ে দিয়ে গেল পশ্চিম আকাশের গায়ে। অম্‌রু আর দাঁড়াল না। সে টিলার ওপর থেকে নেমে দৌড়ে চলল হোলি গ্রাঁয়ের দিকে।

বেশ সমৃদ্ধ আর সম্পন্ন গ্রাঁ হোলি। ক্যায়ল আর ক্ল্যা গাছের সারির ভেতর দু'-তিনতলা বারান্দাওলা কাঠের বাড়ি। সূর্যের আলো পায় অথচ ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা না লাগে তেমনি হিসেব করে বাড়িগুলো তৈরি। প্রায় বাড়ির মুখই রাস্তার বিপরীত দিকে। মেয়েদের আবরু রাখার ব্যবস্থা।

শুকনো কাঠের বোঝা পিঠে বেঁধে একটি মেয়ে পথ চলতে চলতে গান গাইছিল। বসন্ত ঋতুর গান। কান পাতল অম্‌রু। সে জানে, এ সময় মেয়েরা বাপেরবাড়ি যাবার জন্য আকুল হয়ে পড়ে। ভাই কখন তাদের আনতে আসবে সেজন্যে বার বার তাকাতে থাকে পথের দিকে।

বসন্ত্ আয়া বসোয়া আয়া
মেরে ভাইয়ে জো সাদা ভেজে

অম্‌রু পা চালিয়ে চড়াই ভেঙে উঠে মুখোমুখি হল মেয়েটির।

আচ্ছা, বহিনজি তুমি কি হোলি গ্রাঁয়ের বউ?

মেয়েটি হেসে মাথা নেড়ে জানাল, সে এই গ্রাঁয়েরই বউ বটে।

একটা কথা বলবে বহিনজি?

বলো।

তুমি ধান্‌নিকে চেনো?

চিনব না কেন, ও তো তিন রোজ এসেছে বাপেরবাড়ি।

অম্‌রুর সারা শরীরটা হিম হয়ে গেল। ঝিমঝিম করতে লাগল মাথাটা। বাপেরবাড়ি এসেছে! তবে কি ধান্‌নি আর তার নেই! অম্‌রু মরিয়া হয়ে শেষবারের মতো প্রশ্ন করে, ও কোথায় গিয়েছিল?

বউটি হেসে ফেলল, ধান্‌নি তোমার চেনা, তবু তুমি বলছ সে কোথায় গিয়েছিল? এই তো লাল গ্রাঁয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে আসছে।

মেয়েটিকে আর কোনও প্রশ্ন করল না অম্‌রু। অভিবাদন জানিয়ে যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথেই ফিরে চলল।

একটা ঘোরের ভেতর দিয়ে সে এসে পৌঁছোল বাউড়ির পাশে। এই মুহূর্তে টিলার ওপর উঠে ক্যায়লের বন পেরিয়ে উলাংসায় নেমে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে বাউড়ির ধারে তারায়ভরা আকাশের দিকে মুখ করে একটা মসৃণ পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল। কিন্তু স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে পারল না সে। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে উঠে বসল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো আবছা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াল এদিক ওদিক। একসময় বাউড়ির হিম শীতল জলে ভিজিয়ে নিল মাথাটা।

রাত গভীর হল। চাঁদ উঠল আকাশে। একখণ্ড পাথরের ওপর বসে থাকতে থাকতে অম্‌রুর মনে হল, সে যেন এতক্ষণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল এইমাত্র। অম্‌রু উঠে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় পথ চিনে উঠল টিলার ওপর। বন পেরিয়ে উলাংসার দিকে রওনা হল। রাতের ইরাবতী বয়ে চলেছে। চাঁদের আলো পড়ে এক এক জায়গায় কুচি কুচি ভাঙা কাচের মতো ঝিলিক দিচ্ছে। একটি জায়গা পেরিয়ে আসার সময় পা পড়ল ঘাসের জমিনে। পায়ের চাপে কত ঘাস আহত হল। অন্য দিন হলে অম্‌রু এসব নিয়ে মাথাই ঘামাত না। আজ সে জমিনের প্রান্তে পৌঁছে উবু হয়ে বসে ঘাসের ওপর হাত বোলাতে লাগল। এ তো ঘাস নয়। ভারী মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। ঘাসের মতো ছ্যামছুল সবুজ রঙের ফুল ফুটিয়েছে ফাগুনে। পায়ে পিষ্ট হয়েও আঘাতকারীর কাছে তার গন্ধটুকু পাঠিয়ে দিচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল অম্‌রু। মুহূর্তে তার মনের রূপান্তর ঘটল। একটু আগে তার মনে হয়েছিল, ভালবাসার ক্ষত নিরাময় করতে পারে এমন দাওয়াই এ দুনিয়ায় নেই, কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হল, যার কাছ থেকে সে আঘাত পেয়েছে তাকে মনে মনে ক্ষমা করা, তার জন্যে শিবজির কাছে প্রার্থনা করাই দুঃখ ভোলার একমাত্র পথ। ছোট ছোট ছ্যামছুল যা পারে সে কেন তা পারবে না। চোখ বুজে ধান্‌নির জন্য সে প্রার্থনা জানাল, ধান্‌নি তার নতুন সংসারে সুখী হোক। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে সে দায়িত্ব ধান্‌নির নয়, তারই। দীর্ঘ পাঁচ মাস সে উলাংসা থেকে উধাও। নিশ্চয় ধান্‌নি বহু দিন বাউড়ির ধারে এসে তার জন্য প্রতীক্ষা করেছে। তাকে না দেখতে পেয়ে বাউড়ির জলে মিশিয়েছে তার চোখের জল! তারপর আহত ধান্‌নি একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে!

এতগুলো কথা মনে মনে আউড়ে অম্‌রু কিছুটা সুস্থ বোধ করল। সে এখন ধীরে ধীরে চলল তার আস্তানার দিকে। তবে চলতি পথে সে স্থির করে নিল, উলাংসাতে তার আর থাকা হবে না। সরলেই সে ফিরে যাবে। যাবার আগে উলাংসার জায়গা জমির একটা কিছু বিলি ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

কয়েক দিনের ভেতর এক দোস্তের ওপর তার সামান্য জমিটুকুর তদারকির ভার দিয়ে অম্‌রু আবার পথে নামল। সে এখন যাবে সরল উপত্যকায়। সেখান থেকে কোনও বড় মানুষ গদ্দীর ভেড় বক্‌রির বাওয়ালের কাজ নিয়ে পাঙ্গী যাবে সে। কাজ না পেলেও তাকে যেতে হবে। শাদি যখন তার হল না তখন ছেনছেল্লার টাকা নিজের কাছে রাখার কোনও মানেই হয় না। ফিরিয়ে দিয়ে আসবে সে ভগতরামের মায়ের টাকা। বলে আসবে, শাদি করলে টাকাটা ফের চেয়ে নেবে।

ক্লান্ত পায়ে অবসন্ন মনে পথ চলতে চলতে এক সময় থমকে দাঁড়াল অম্‌রু। তুন্দা গ্রাঁ না? এখানেই তো বুড়ো বাপের সঙ্গে ঘুঙরী থাকত। কাংড়াতেও ওদের সামান্য একটুকরো খেতি আর কাঠের বাড়ি আছে। চেত্ মাসে এখানেই তো ভেড় বক্‌রি নিয়ে ওদের থাকার কথা। অম্‌রু ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে লাগল গ্রাঁয়ের বসত এলাকার দিকে।

একটি ঘির্‌থ চাষি মাটির আল দেওয়া জমির সীমানা বা বীরের ওপর বসে নারেলি টানছে আর কানক বা গমের খেত পর্যবেক্ষণ করছে। সবে সোনা রং ধরেছে কানকের শিষে। মাঝে মাঝে লোকটি নারেলি টানতে ভুলে যাচ্ছিল।

অম্‌রু অনেকক্ষণ লোকটিকে দেখল। এক সময় তাকে একটু অন্যমনস্ক হতে দেখে কাছে গিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

আচ্ছা, এখানে এক বুড়ো গদ্দী থাকে যে তার মেয়েকে নিয়ে ভেড় চরাতে যায়; জানো তুমি সেই বুড়োকে?

জানব না কেন। আমরা ঘির্‌থ চাষিরা থাকি পাহাড়ের বাঁ দিকের শিরায়। আর হুই হোথায় থাকে গদ্দীরা।

বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে অম্‌রু একটি বুড়িকে পান্‌চাক্‌কিতে মক্‌কি পিষতে দেখল। চাক্‌কির পাশে গিয়ে অম্‌রু তেমনি বুড়োর খোঁজ করল।

বুড়ি চাক্‌কি থামিয়ে কয়েক লহমা অম্‌রুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি কি জানো না ছাজুবুড়ো গত হিতে কাংড়ায় মারা গেছে।

আমি জানতাম না, বুড়িমা।

এবার বুড়ি চাক্‌কি-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাত তুলে ছাজুবুড়োর আস্তানাটা দেখিয়ে দিলে।

অম্‌রু কেন জানি না বুড়োর জন্য মনে মনে কষ্ট অনুভব করল। কোমরে গোঁজা বজ্‌লুতে হাত চেপে দেখল বুড়োর দেওয়া সোনার নান্‌তিজোড়া তার ভেতর রয়েছে।

কাঠের ছোট্ট দোতলা ঘর। সামনের উঠোনে বসে ঘুঙরী ভেড়ার লোম আঁচড়ে কাটনা কাটার জন্য তৈরি করছিল। এ কাজটা ঘরে বসে শীতকালেই করে মেয়েরা কিন্তু ঘুঙরী এই গরমকালে অবসর পেয়ে হাতের কাজটা সেরে রাখছিল।

উঠোনের চারদিকে ব্যাঠ্‌ঠ্‌র গাছের বেড়া। এক কোণে তিন-চারটে হারংগড় গাছ চওড়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে হলুদ-লাল ফুল ফুটিয়েছে। পেছন দিকে এক টুক্‌রো খেতিতে কোনও চাষ দেওয়া হয়নি। বেশ কিছু ঘাস গজিয়েছে আর তাই ছিঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে কয়েকটা ভেড় বক্‌রি।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অম্‌রু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ঘুঙরীর দিকে। আপন মনে উঠোনে হাঁটু মুড়ে বসে বসে ঘুঙরী কাজ করে চলেছে। পিঠের ওপর ঝুলে আছে মস্ত এক বিনুনি। মুখের একটি পাশ দেখা যাচ্ছিল ঘুঙরীর। ভারী সুন্দর মুখের আদল। হেঁটে চলে না বেড়ালে কোনও খুঁতই ধরার উপায় নেই মেয়েটির।

অম্‌রু উঠোনের বেড়া ঠেলে ঘুঙরীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চমকে মুখ তুলে তাকাল ঘুঙরী। এমন অবাক সে কোনও দিনই হয়নি। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে উঠতে পারল না সে। বাঁ হাতখানা মেঝেতে চেপে আধবসা অবস্থায় মুখখানা কাত করে বলল, আপনি!

অম্‌রু ম্লান হেসে বলল, তোমার গ্রাঁয়ের ওপর দিয়ে সরলে যাচ্ছিলাম, খবরটা পেয়ে তোমার সঙ্গে একবার দেখা না করে যেতে পারলাম না।

ঘুঙরী এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যখন এসেছেন কষ্ট করে তখন আর একটু কষ্ট করে ঘরের ভেতর আসুন।

ঘুঙরীর পেছনে অম্‌রু গিয়ে ঘরে ঢুকল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দু'জনে উঠল ওপরে। অম্‌রু সান্ত্বনার কথা বলতে চাইছিল কিন্তু ঘুঙরী তাকে বাধা দিয়ে বলল, আগে কিছু সেবা করুন, পরে কথা হবে।

অম্‌রু ঘরের মেঝেতে পাতা খিন্দের (ছেঁড়া কাপড়ে তৈরি কাঁথা) ওপর আরাম করে বসল আর সারা ঘর ওপর-নীচ করতে করতে ঘুঙরী অতিথি পরিচর্যার আয়োজনে ব্যস্ত রইল।

তিন দিন পরে উভয়ের পরামর্শ মতো একটি লোককে পাঠানো হল কাংড়ায়। অম্‌রুর শাদির সব আয়োজনই পাকা। মামা পারষোত্তম যেন খবর পাওয়ামাত্র লোকটির সঙ্গে তুন্দা গ্রাঁয়ে চলে আসেন।

অম্‌রু বিয়ের প্রস্তাব করলে ঘুঙরী শুধু একটি কথা বলেছিল, খোঁড়া মানুষকে শাদি করে শেষে দুঃখ পাবে না তো?

অম্‌রু উত্তর দিয়েছিল, পা খোঁড়া হলে দুঃখ পাব না কোনও দিন, কিন্তু দিলটা খোঁড়া হলে সইতে পারব না।

অম্‌রুর কথা শুনে হাসিতে সম্মতি জানিয়েছিল ঘুঙরী।

সাত দিনের মাথায় হন্তদন্ত হয়ে মামা পারষোত্তম এসে হাজির। ভাগনেকে জড়িয়ে ধরে একরাশ চোখের জল ঝরাল। তারপর হাঁকডাক করে জড়ো করল তুন্দা গ্রাঁয়ের রথী সম্প্রদায়কে।

বিয়ের আয়োজনের প্রধান ভারই তো মামার। বিয়ের বেদি তাকেই তো তৈরি করতে হবে। ছেলেমেয়ে শাদিতে বসবে লাল রঙের পোশাক পরে। মামাকে দিতে হবে সে পোশাক। বিয়ের আগে মামা ভোজ দেবে ভাগনে ভাগনিকে, নইলে কি আর বিয়ের আসরে বসা যায়।

রথী সম্প্রদায়ের গদ্দী, তাই বিয়ে দিতে বামুন এল এক ধাপ নীচের। যারা চাষের কাজে যোগ দেয় না, তারা হল বিশুদ্ধ বামুন আর যে বামুন চাষ আর যজমানী দু' কাজই করে তারা কিছুটা নিম্ন শ্রেণীর।

গদেরানের বাসিন্দাই গদ্দী। বামুনরা নিম্ন শ্রেণীর মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনতে পারে কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর ঘরে মেয়ের বিয়ে কদাচ দেবে না। রাজপুত, ক্ষেত্রী আর ঠাকুর সম্প্রদায়ের লোকেরা, নিজেদের বলে আসল গদ্দী। বামুনের মতো তারাও পইতে নেয় গলায়। তাদের নিজেদের ভেতর বিয়ে শাদি হয়। পাহাড়ের এক প্রান্তে, যেখানে লোকজনের যাতয়াত খুব কম সেখানেই কোঠি তৈরি হয় ওদের। ঘরের মুখ থাকে পথের বিপরীত দিকে। মেয়েরা পরদানশীন।

এদের পরে সিপি, রথী, বাদী, লোহার। সব শেষে হোলিয়া। বাক্স, ঝুড়ি আর জুতো তৈরির কাজ করে হোলিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা।

নিজের গোত্রে বিয়ে নেই, বিয়ে আছে স্বজাতির ভেতর। এক গ্রাঁতে সাধারণত একই

সম্প্রদায়ের লোকে ভীড় করে থাকে। ভিন্ন জাতির লোক একই গ্রাঁতে থাকলে তারা থাকবে পাহাড়ের ভিন্ন শৈল শিরায় কোঠি বানিয়ে। একই পানিহার থেকে বিভিন্ন জাতির লোকেরা জল নিতে চাইবে না।

অম্‌রুর মুক্ত মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কেন এমন হয়। এক আকাশের তলায়, এক পর্বতের ওপর মানুষে মানুষে এত তফাত কেন? ছোটবেলা ধরমশালায় মামারবাড়িতে থাকার সময় একটা ঘটনা তার শিশু মনকে আহত করেছিল। নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে একদিন সে দেখল ওপারে ঠাকুর সম্প্রদায়ের একদল লোক একটি ঘির্‌থ চাষিকে ধরে বেধড়ক ঠ্যাঙাচ্ছে। পরে চাষিটি নদী পেরিয়ে এপারে এলে অম্‌রু তার মুখ থেকে জানতে পারল আসল ঘটনা। সে রাজপুত এলাকার সামনে দিয়ে মনের খুশিতে ঢোলকে বোল বাজাতে বাজাতে যাচ্ছিল। ওরা তাকে ঘিরে ধরে মেরেছে আর বলেছে, নিচু জাতের এত বড় আস্পর্ধা, ঠাকুরদের মহল্লার সামনে দিয়ে ঢোল পিটিয়ে যায়।

অম্‌রু লোকটির কাছ থেকে তার ফেঁসে যাওয়া ঢোলটা চেয়ে নিয়ে ভাল করে সারিয়ে ওই ঠাকুর মহল্লার সামনে দিয়ে বাজাতে বাজাতে ঘিরথ্ চাষিটির বাড়ি গিয়ে দিয়ে এসেছিল। পারষোত্তমের ভাগনে আর ছেলেমানুষ বলে নাকি তাকে কেউ কিছু বলেনি।

আজ বিয়ের আসরে বসতে গিয়ে মামাকে ধরে পড়ল অম্‌রু, এ গ্রাঁয়ে তিন ঘর ঘির্‌থ চাষির বাস। এ বিয়ে উপলক্ষে ওদের ডেকে খাওয়াতে চাই।

তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা উঠে চলে যাবে বেটা। এক ঠাঁই বসে খাবে না।

কিন্তু মামা, যখন কোঠি তৈরির সময় কেওয়ার প্রথা অনুযায়ী লোক ডাকা হয় তখন তো প্রতিটি চুল্লার থেকে এক একজন করে লোক আসে সাহায্য করতে। সারাদিন কাজ করে তারা তো সাঁঝবেলা এক ঠাঁই বসে সুরা আর সিড্ডিয়াল্‌ খায়। তখন তো তাদের জাত যায় না?

মামা আদর করে বলল, পাগলা, সারা জীবন তো বাপের সঙ্গে পহালগিরি করে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালি, সমাজের দেখলি কতটুকু? এক গ্রাঁয়ে এমনিতে একজাতের লোকই বাস করে, তাই কেওয়ার থেকে লোক এলে সবাই এক ঠাঁই বসে মিলে মিশে খায়।

অম্‌রু বলল, সে না হয় মানলাম, কিন্তু বির্তনের সময় কী হয়? তখন তো পাশাপাশি দু'-তিন গ্রাঁয়ের নানা জাতের লোকের সঙ্গে বির্তন বন্ধু পাতানো হয়। তারা তো দরকার হলে টাকাপয়সা নিয়ে বিয়ে শাদিতে সাহায্য করতে আসে। কোঠি বানানো, খেতির কাজ, সব কিছুতেই বির্তনবন্ধুর সাহায্য পাওয়া যায়। তারা কি কাজের বাড়িতে এসে না খেয়ে চলে যায়?

তা কেন হবে, এক পঙক্তিতে না বসলেই হল।

অম্‌রু রাগ করে বলল, এ ব্যাপারটাই আমার ভাল লাগে না মামা। তার চেয়ে শাদিতে ভোজ বাদ দাও।

লোকে ছি ছি করবে। সমাজে বাস করতে পারবি না।

অম্‌রু বলল, শাদি হয়ে গেলে ঘুঙরীকে নিয়ে চলে যাব সরলে। তুন্দা আর উলাংসার পাট তুলে দেব।

মামা পারষোত্তম অভিমানের গলায় বলল. ছোটবেলা থেকে মামারবাড়ি মানুষ হলি, এখন বুড়ো বয়সে মামাকে একটু দেখবি না? ধরমশালায় আমার এত বড় খেত খামার তোকে ছাড়া আর কাকে দিয়ে যাব বল?

মামার গলার ভেজা সুরটা যুবক অম্‌রুর বুকে এসে বাজল। সে বলল, ঠিক আছে মামা, ভেবো না, ঘুঙরীকে আমি বিয়ের পর তোমার কাছেই রেখে দেব। ওই খোঁড়া মানুষকে আমি আর তউন্দির চারণের সময় পাহাড় ডিঙিয়ে পাঙ্গী নিয়ে যাব না। শীতের সময় আমি গিয়ে তোমার ওখানে থাকব।

ভাগনের কথা শুনে পারষোত্তম ভারী খুশি হল। সে ধুমধাম করে ভাগনের বিয়ের জোগাড়যন্ত্রে লেগে গেল।

ঘুঙরীকে সবাই ভালবাসে। তাই খোঁড়া ঘুঙরীর এমন ভাল বিয়ে হচ্ছে জেনে গ্রাঁ ভেঙে এল বিয়ের আসরে। সবাই একবাক্যে তারিফ করল পারষোত্তমের। এমন বিয়ের বেদি সাজানোর ঘটা তুন্দা গ্রাঁয়ে এর আগে আর কখনও হয়নি।

খানাপিনার ব্যবস্থাও ছিল উঁচু জাতের ক্ষেত্রী মহাজনদের মতো। ববরু, দাল, খিচুড়ি, সিংখা বা মাংস—পর্যাপ্ত ব্যবস্থা।

মেয়ে পুরুষে মিলে প্রায় সারা রাত নাচ গান করল। মেয়েরা বাসরে অস্থির করে তুলল বরকে। তারা গান গেয়ে বলতে লাগল, ওহে কন্‌হা (কানু) আর লাগামছাড়া প্রেমের খেলা খেলো না। এখন চারদিকে চোখ না দিয়ে একটির দিকেই নজর দাও। মন দিয়ে সংসার করতে শেখো।

ভোরবেলা ছাজুবুড়োর খেতির মাঝখানে চিঁউগাছের তলায় শুরু হল হোলি খেলা। ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে আবির ছুড়ে ছুড়ে মারল। ফুলে ফুলে লালে লাল চিঁউ গাছ। কোনও প্রেমিক যেন মুঠো মুঠো আবির ছুড়ে তার শরীর রাঙা করে দিয়ে গেছে।

হোলি খেলার শেষে যে যার ঘরে ফিরে গেল। চিঁউ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তাদের বিদায় জানাল বরবধূ।

এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘুঙরী আর অম্‌রু। ঘরের পেছনে খেতি, তাই সবার চোখের আড়ালে থেকে দু'জন দেখছে দু'জনকে। পারষোত্তম সাজিয়ে দিয়েছে ভাগনে বউকে সবরকম গয়না দিয়ে।

ভারী মিষ্টি মুখখানা ঘুঙরীর। সোনার চাউঙ্ক্ পরেছে মাথায়। রূপোর জিঞ্জিরি ঝুলছে কপালের ওপর। নাকে পরেছে সোনার বালাং। গলাতে রুপোর দদ্‌মালা। রঙিন পুঁতি আর বন থেকে কুড়িয়ে আনা রঙিন ফলের বীজের তিন-চার রকম মালায় বুকখানা জমজমাট। কোমর ঘিরে কাজকরা রুপোর গোজ্‌রো।

অবাক চোখে নতুন বউকে দেখছে অম্‌রু। আধবোজা চোখ, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়া তৃপ্তি নিয়ে স্বামীকে দেখছে ঘুঙরী। মনে হচ্ছে আজকের এই ভালবাসা কোনও দিনই ফুরোবে না তাদের জীবনে।

হঠাৎ কী হল অম্‌রুর। সদ্য শুকিয়ে আসা একটা ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করল। ঘুঙরী প্রথামতো বিয়ের পর সদ্য পরেছে বালাং। নাকের সেই সোনার নাথ্‌লিতে আঙুল ছুঁইয়ে সে তাকাচ্ছিল অম্‌রুর দিকে। অম্‌রুর হঠাৎ মনে হল, ও ঘুঙরী নয় ধান্‌নি। বাউড়ির কাছে দাঁড়িয়ে নাকে আঙুল রেখে বলছে, নাকে বালাং থাকলে তবেই তো বুঝবে শাদি হয়েছে। কুমারী মেয়ে কি বালাং পরে?

পরমুহূর্তে নিজেকে ধিক্কার দিল অম্‌রু। ছিঃ ছিঃ, কী ভাবছে সে। ঘুঙরী আজ তার কাছে

সবচেয়ে সত্য। পেছনের সব দুঃখকে আড়াল করে ঘুঙরী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মণিমহেশের পবিত্র চূড়ার মতো।

ভাবনার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুঙরীর হাত ধরে অম্‌রু বলল, এ দুনিয়ায় তোমার চেয়ে প্রিয় জিনিস আমার কাছে আর কিছুই নেই।

ঘুঙরী অমনি বলল, ও কথা বোলো না। তুমি গদ্দী, ভেড় বক্‌রি নিয়ে পথ চলাই তোমার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় কাজ।

মানি ঘুঙরী, কিন্তু এখন তো ও ধন আমার নেই।

ও কথা কেন বলছ তুমি? আমার যে সামান্য ধন আছে সে কি তোমার নয়? আজ থেকে তুমি আমি কি আলাদা?

অম্‌রু আবেগে ঘুঙরীর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, ওটা তোমারই ধন, কেবল গচ্ছিত থাকবে আমার কাছে। আমি তোমার বাওয়াল হয়ে বাড়িয়ে যাব তোমার ধন।

ঘুঙরীর চোখে জল। সে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ও কথা বোলো না। তুমি পহাল আর আমি পহালনি। এ ধন আমাদের দু'জনের। আমরা এ ধন দিনে দিনে বাড়িয়ে যাব। আমাদের ছেলেমেয়েরাও ভবিষ্যতে এ ধন বাড়িয়ে তোলবার ভার নেবে।

একটু থেমে ঘুঙরী আবার বলল, আজ আমার একটা কথা রাখবে?

বলো, নিশ্চয়ই রাখব।

না শুনেই বলছ?

আজ সব কিছুই তোমাকে উজাড় করে দিতে চাই ঘুঙরী। তোমার কথা রেখে যে আনন্দ পাব তার তুলনা নেই।

ঘুঙরী একে একে সোনা রুপোর গয়না খুলে জড়ো করল। অম্‌রু অবাক হয়ে দেখতে লাগল ঘুঙরীর কাণ্ড।

নিজের ঘুন্‌ডিতে গয়নাগুলো বেঁধে অম্‌রুর হাতে তুলে দিয়ে বলল, এগুলো তোমাকে দিলাম। তুমি বেচে দিয়ে যা পাবে তাই দিয়ে ভেড় আর বক্‌রি কেন। আমাদের ধনের সংখ্যা বেড়ে যাক।

অম্‌রু প্রথমে কোনও কথা বলতে পারল না। সে অবাক চোখে চেয়ে রইল ঘুঙরীর দিকে। একসময় বলল, দু'জন মানুষের সংসার একদিন বড় হয়ে ওঠে, আমাদের এই ছোট্ট ভেড় বক্‌রির দলও একদিন বড় হয়ে উঠবে। তুমি কেন তোমার শখের গয়নাগুলো বেচে দিতে চাইছ ঘুঙরী?

গদ্দীর জীবনে ভেড় বক্‌রি ছাড়া অন্য কোন শ্রেষ্ঠ ধন নেই। আমাদের দলটা তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠুক এই আমি চাই।

অম্‌রু বলল, বেশ, তোমার কথাই থাকবে, তবে আমার একটি কথা তোমাকেও রাখতে হবে।

বল?

শুধু সোনার বালাংখানা তুমি পরবে। গলায় পুতি আর কুঁচের মালা থাকলেই চলবে।

পরব।

চিউ গাছের ডালে দুটো নেল পাখি উড়ে এসে বসল। নানা রঙের পালকে চিত্রিত। দুটো ডাল থেকেই ওরা শিস দিতে লাগল। ওদের মিলনের লগ্ন ঋতু-বসন্ত।

অম্‌রু আর ঘুঙরী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পাখি দেখতে লাগল।

কথামতো মামা পারষোত্তম বর্ষালায় ভাগনে বউকে রেখে দিল তার ধরমশালার ঘরে। ঘুঙরীর প্রথম বাচ্চা হবে। পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে খোঁড়া মেয়েটি পেটে বাচ্চা নিয়ে কেমন করেই বা যাবে উড়ান্ধার। একা অম্‌রুই তার ভেড় বক্‌রির দল তাড়িয়ে নিয়ে চলল উড়ান্ধারের পথে। মামার কথাটা মনে ধরল তার। তোর মাও তো একদিন তোকে পেটে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাঙ্গী। তারপর আর নিজের আস্তানায় ফিরে আসতে পারেনি। থাক ঘুঙরী আমার কাছে।

উড়ান্ধারের কাণ্ডায় সবুজ ঘাসের গদিতে শুয়ে যত ঘুমোয় অম্‌রু তার চেয়ে জেগে স্বপ্ন দেখে বেশি। অনেক সময় মনে হয় তার পাশেই শুয়ে আছে ঘুঙরী। সে তার ঈষৎ স্ফীত উদরের ওপর কান চেপে অনাগত শিশুটির স্পন্দন শোনার চেষ্টা করে। এমনি ভাবনার ভেতর আবার কখন চোখ বুজে আসে তার ঘুমে। ভোরবেলা জেগে উঠে মন খারাপ হয়ে যায় তার।

আসার সময় ঘুঙরী তাকে বলেছিল, মন খারাপ কোরো না যেন। আমি যেখানেই থাকি, তোমার কাছেই থাকব।

উড়ান্ধারে প্রায় সারাক্ষণই হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুঙরীর সেই কথাটি ভেসে বেড়ায়। অম্‌রুর কানে প্রায়ই গুনগুনিয়ে ওঠে সে কথা। অম্‌রু রুবানা বাজায় রাতে। তার মনের নিঃসঙ্গতার কান্না রুবানার সুরে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। হঠাৎ বাজনা থামিয়ে সে তুষার পর্বতের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলে, বাবা কৈলাশপতি আমার ঘুঙরীকে দেখো প্রভু।

এদিকে ধরমশালায় শুরু হয়ে গেছে অঝোর বর্‌খা। তাল তাল মেঘ পাহাড় পর্বত থেকে বেরিয়ে ছেয়ে ফেলেছে আকাশ। চিক্কুর হানার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় গুড়কানা বা বাজের ডাক। সে ডাক আর যেন থামতেই চায় না। সারা উপত্যকার পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে সে ডাক কতক্ষণ ধরে বাজতে থাকে।

একা বাপের ছোট্ট কাঠের বাড়িতে ঘুঙরী যেদিন কাটায় সেদিন তার কেমন যেন কান্না পায়। সে ঝার্‌রির সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল ঝরিয়ে গান ধরে—

ঘানি ঘানি ধোরি পেইও
আয়া জিন্দে
আবে বর্ষালা।

ঝর ঝর করে বর্ষার ধারা ঝরে পড়ছে। এমন দিনে তুমি আমার কাছে এসো প্রিয়।

এদিকে আষাঢ়ের শেষ দিনটিতে পারষোত্তমের বাড়িতে শুরু হয়ে যায় হরিয়ালি উৎসব। দিন দশেক আগে ঘুঙরী পাঁচ-ছ' রকম বীজ একটা মাটিভরা বাক্সে ছড়িয়ে রেখেছিল। প্রতিদিন তাতে জল ছিটিয়ে দিত সে। এখন অঙ্কুরিত হয়েছে সে বীজ। তার মাঝখানে বসানো হয়েছে শিব-পার্বতীর মূর্তি। আজ হর-পার্বতীর বিয়ের দিন। মেয়েরা জড়ো হয়েছে ঘরের মধ্যে। তারা গানে গানে বলছে, হে হরিয়ালি, তুমি চিরদিন আমাদের সবুজ শস্যের খেত রক্ষা করো। যারা তোমার পুজো করে তাদের সব দুঃখ দূর করো দয়াময়। খেত চষার সময় ক্ষেত্রপালকে প্রসন্ন করা হয়। মহল্লা থেকে নিয়ে আসা হয় কুমারী মেয়ে। পারষোত্তম সেই কিশোরী মেয়েটির বন্দনা করে। থালা ভরে খাবার দেওয়া হয় তাকে। সঙ্গে উপযুক্ত দক্ষিণার কড়ি।

ঘুঙরী এই বাদলের দিনে ঘরের দাওয়ায় বসে দেখল, চেলা চলেছে আগে আগে, তার

পেছনে ঘাই বা ছাতা ফুটিয়ে চলেছে কয়েকজন। দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছে তারা। ও তো ছাতা নয়, ছাতার রূপ ধরে গুগা দেওতা। সাপে কাটা রোগীকে ভাল করতে ভক্তের বাড়িতে চলেছেন তিনি।

হঠাৎ মনটা কেমন হু হু করে ওঠে ঘুঙরীর। দু'দুটো বরফের পাহাড়ের ওপারে আছে মানুষটা। উড়ান্ধারে ঘাসের জমিনে ঘুরছে একা একা। চোখের জল মুছে ঘুঙরী প্রার্থনা জানায়, হে গুগা বাবা, তুমি আমার মুখ রেখো। ওর যেন কোনও রকম বিপদ না ঘটে প্রভু।

চার

কাতি (কার্তিক) মাস। পূর্ণগর্ভা ঘুঙরী এখন অম্‌রুর পথ চেয়ে বসে আছে। ধৌলাধার পেরিয়ে মানুষটা নিশ্চয়ই তার ভেড় বক্‌রির দল নিয়ে অনেকখানি নীচে নেমে এসেছে।

প্রতি বছরের মতো এবারও নবরাত্রে পারষোত্তমের সারা ঘরের দেয়ালে গেরি মাটির প্রলেপ পড়েছে। এই বিশেষ সময়ে সবার বাড়িরই চেহারা ফেরানো হয়। বাড়ির মেয়েরাই মাটি দিয়ে প্রলেপের কাজটা সারে। কেবল বামুন আর ক্ষেত্রী বাড়ির মেয়েরা এ কাজ করে না। ঘুঙরী কিন্তু সারাদিন ধরে দেয়াল-প্রলেপের কাজ করছে। পারষোত্তম শুরুতেই হাঁ হাঁ করে বাধা দিতে ছুটে এসেছিল, কিন্তু ঘুঙরীকে নিরস্ত করা যায়নি। সে বলেছিল, মামাজি, কাম করলে আমি ভাল থাকি, কাম ছাড়া আমি বাঁচব না।

তা বলে এ সময়!

ঘুঙরী পারষোত্তমকে হাত নেড়ে বলেছে, আপনি এখন নোহরি (ভোরের হালকা জলযোগ) সেরে বাহার যান তো মামাজি।

পারষোত্তম আর কথা না বাড়িয়ে বাধ্য ছেলের মতো মাথাটা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেছে।

খেতির কাজ সেরে ফিরে আসতে দেরি হয়েছিল পারষোত্তমের। এসে ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে আর চোখ ফেরাতে পারেনি। এ কী দেখছে সে! গেরুয়া রঙের দেয়ালের ওপর খড়ি মাটির রং দিয়ে সারি সারি লতাপাতা ফুল এঁকেছে ঘুঙরী। মাঝখানে শিব-পার্বতীর যুগল মূর্তি।

পারষোত্তম ডাক দেয়, কোথা গেলিরে বেটি?

মিষ্টি একটুকরো হাসি মুখে ফুটিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় ঘুঙরী।

উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে পারষোত্তম, বুক ফুলিয়ে বলুক, এ মহল্লায় কে কবে পেরেছে এমনটা আঁকতে! এত গুণ তোর বেটি?

লজ্জা পেয়ে ঘুঙরী অন্য কথা পাড়ে, বেলা কত দেখেছেন? দাতিয়ালুর (দিবা ভোজ) সময় কখন পেরিয়ে গেছে। আপনি হাতমুখ ধুয়ে আগে খেতে আসুন মামাজি। আমার বুঝি খিদে পায় না?

ঘরে ঢুকে যায় ঘুঙরী। মনে মনে খোঁড়া মেয়েটিকে শতবার আশীর্বাদ জানায় পারষোত্তম। নাঃ, নজর আছে বটে বেটা অম্‌রুর।

কাজের ভেতর ডুবে থাকতে জানে ঘুঙরী। পানিতে মচ্ছির মতো। ওতেই ওর চলাফেরা, ওতেই ওর প্রাণ।

কদিন থেকেই ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখতে দেখতে চমকে উঠেছিল ঘুঙরী। সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে পারষোত্তমের নজর এড়িয়ে ও চলে যাচ্ছিল ওরির (ভেড়া, ছাগলের আস্তানা) দিকে। ওখান থেকে চোখ রাখছিল গদ্দী পহালদের নেমে আসা পথের ওপর। এক একটা ভেড়ার দল নেমে আসছে, ঠিক যেন সাদা গারেন্ট্ (হিমবাহ) পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গড়িয়ে নেমে আসছে।

তার মানুষটা কই! নিজের মানুষটার জন্যেই তো একরাশ ভাবনা নিয়ে বসে থাকা। এত প্রতীক্ষা, পারষোত্তমের চোখ এড়িয়ে এত লুকোচুরি খেলার পর ঘুঙরী যখন অম্রুকে নেমে আসতে দেখল তখন এক দৌড়ে সে ঢুকে পড়ল কোঠির ভেতর। সেই যে সিঁধোল, পারষোত্তম গলা ফাটিয়ে ডেকে ডেকে তবে তাকে রসুইঘর থেকে বের করতে পারল।

যেন কিছুই জানে না ঘুঙরী। হাতে একখানা ডোই (খুন্তি)। এইমাত্র যেন কাড়ুচিতে (কড়ায়) ডোই নাড়তে নাড়তে চলে এসেছে।

ডাকছেন মামাজি? কপট জিজ্ঞাসা চোখে-মুখে মাখানো।

পারষোত্তমের চোখে ধুলো দেওয়া এত সোজা? সে বেশ ক'দিন ধরে আড়চোখে লক্ষ করেছে ঘুঙরীর ক্রিয়াকলাপ। ভারী মজা লেগেছে তার। ঘুঙরী যখন তাকে আড়াল করে ওরির দিকে যাবার চেষ্টা করে তখন পারষোত্তমের হঠাৎ কাজ পড়ে যায়। সে কাজের অছিলায় বাইরে বেরিয়ে পড়ে তাড়াহুড়ো করে। মনে মনে তখন হাসি চাপতে পারে না পারষোত্তম। আবার ভাবে, আহা, মেয়েটার কত কষ্ট। কতদিন ঘরের মানুষটা দূরে রয়েছে, ভাববে না তার কথা!

পারষোত্তম ঘুঙরীর দিকে কৌতুকের চোখ তুলে বলে, ক'জনের জন্যে খানা পাকাচ্ছিস বেটি?

কেন, আপনার আর আমার।

তবে তোকে ভুখা থাকতে হবে আজ।

এখন আর ছলনা নয়, ঘুঙরীর আনন্দ উপচে পড়ল। সে কোনও কথা না বলে মুখখানা নিচু করে উপচে পড়া খুশিটুকু চাপতে চাপতে আবার রসুইখানায় গিয়ে ঢুকল।

বাইরে খাটিয়ার ওপর বসে মামা ভাগনেতে রাজ্যের কথা হচ্ছিল। রসুইঘরে খানা পাকাতে পাকাতে কান খাড়া করে অম্রুর কথাগুলো গিলছিল ঘুঙরী। সাধারণ টুকরো টুকরো পথের কথা, তবু কী অসাধারণ আস্বাদ তার।

বুড়ো চাকর দুম্‌সারাম অম্রুর ভেড় বক্‌রিগুলো ওরিতে ঢোকাতে হিমসিম খাচ্ছিল। বুড়ো মানুষ, ভেড়াগুলোকে বাগে আনে তো বক্‌রিগুলো ভেগে যায়। এমন পেটুক জানোয়ার ভূ-ভারতে নেই। যা দেখে তাতেই মুখ দিয়ে পরখ করতে ছোটে। শুধু চেনে একটি গাছ, বিছুটি। ভুলেও তার ছায়া মাড়াবে না।

অম্রু ছুটল দুম্‌সারামকে সাহায্য করতে। পারষোত্তম খেপে গিয়ে গাল পাড়তে লাগল, খানায় কমতি নেই, খালি কাম করতে গেলে বুখার এসে যায়। দেব ভাগিয়ে এবার।

মালিকের মন্তব্যে দুম্‌সারাম দ্বিগুণ তৎপর হয়ে ওঠে। যত তৎপর তত কাজে ভণ্ডুল। জিভে আওয়াজ তুলে দু'হাত দু'দিকে বাড়িয়ে যত ঘিরে রাখতে চায় ততই এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে বক্‌রিগুলো। যেন বুড়ো মানুষটার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। দু'-একটা লহরীতে (বাড়ির সংলগ্ন বাগান) ঢুকে পড়ে বুলবুল করে নরম পাতা ছিঁড়ে চিবুতে থাকে। অম্রু দলটাকে ওরিতে ঢোকাতে দুম্‌সারামকে সাহায্য করে।

পারযোত্তম যত হম্বিতম্বিই করুক না কেন, বুড়ো দুম্‌সারাম ছাড়া তার একদণ্ডও চলে না। বাপের আমলের লোক। ছোটবেলা তার দৌরাত্ম্য দুম্‌সারাম অনেক সামলেছে। ভাগিয়ে দেবার কথা দিনে বিশবার মুখে আনলেও ভগবান না কেড়ে নিলে দুমসাকে তাড়ায় কে?

রাতে প্রথম কথা বলল ঘুঙরী, আবার ভুবু জোৎ পেরুচ্ছ কবে?

মামাজি বলছে এখানে বিশ-পঁচিশ রোজ কাটিয়ে যেতে।

না আসলে তো পারতে।

অম্‌রু বুঝতে পারে তার এই স্বল্পকাল অবস্থিতির জন্য ঘুঙরী ক্ষুব্ধ। সে প্রবোধ দেবার গলায় বলল, আবার শিবরাত্রির এক মাহিনা আগে এসে হাজির হব। চেত্ মাহিনার আগে আর ধরমশালা থেকে নড়ছি না, দেখো।

ঘুঙরী এবার অন্ধকার বিছানায় অম্‌রুর একখানা হাত নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

চাপা গলায় অম্‌রুর উদ্বেগ, কী হ'ল, কাঁদছ কেন? আমি তো এসে পড়েছি।

তবু কান্না থামে না ঘুঙরীর। এত দিনের জমে থাকা অদর্শনের মেঘ অনেকখানি জল ঝরিয়ে তবে শান্ত হল।

আমি তোমার সঙ্গে যাব।

অম্‌রু প্রবোধ দিয়ে বলে, বাচ্চা পেটে না এলে ঠিকই নিয়ে যেতাম।

শীতের চারণে যখন ওরা নীচের ভ্যালিতে ঘোরে তখন অনেকেই বউ বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে যায় কিন্তু গ্রীষ্ম বা বর্ষায় উঁচু পাহাড়ে ভেড় বক্‌রি নিয়ে যাবার সময় সাধারণত মেয়েদের সঙ্গে নেয় না।

ঘুঙরী বলল, তোমার ওপরের পাহাড়ে ভেড় নিয়ে যাবার আগেই বাচ্চাটা কোলে এসে যাবে। আমি ওকে নিয়ে যাব, তুমি কথা দাও।

দো-এক মাহিনার বাচ্চা, ওকে নিয়ে যাওয়া, মামাজিকে পুছতে হবে।

পারযোত্তমের নামে দমে যায় ঘুঙরী। যতই প্রাণ চাক মামাজির কথা ঠেলবার উপায় নেই। সব কিছুতে পারযোত্তম তাদের দুটো হাত দিয়ে আগলে রেখেছে।

আবার কান্না, এটা অক্ষমতার হাহাকার।

অনেক বোঝাল তাকে অম্‌রু। বলল, তারও কি ঘুঙরীকে ছেড়ে একা একা ঘুরতে দিল চায়। উড়ান্ধারের কাণ্ডায় শুয়ে হররোজ সে তো ঘুঙরীরই স্বপ্ন দেখে। পহাল হয়ে না জন্মালে সে ঘুঙরীকে নিয়ে কাংড়ায় খেতির কাম করে জীবনটা কাটিয়ে দিত। যদি ঘুঙরী চায় তাহলে এখন থেকে সে মামাজির খেতি আগলাবে।

ঘুঙরী সঙ্গে সঙ্গে অম্‌রুর মুখে তার হাতখানা চাপা দেয়।

ও কথা বলতে নেই। আমার যত কষ্টই হ'ক, মামাজির খেতি আগলে এখানে তুমি পড়ে থাকবে সে আমি বরদাস্ত করতে পারব না। পিতাজি জিন্দা থাকতে বলত, চলার জন্যেই জন্মেছে গদ্দী পহাল। তার পায়ের তলায় পথ আর মাথার ওপর আসমান।

একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আচ্ছা এ সাল তুমি একাই যাও, আসছে সাল থেকে আমি তোমার সাথ চলব। আমি আর মন খারাপ করব না।

অম্‌রু ভাবে কত নরম মন ঘুঙরীর, আবার কত বুঝদার। সে ঘুঙরীকে বুকের মধ্যে টেনে

নিয়ে আদরে সোহাগে ভরে দেয়। তার নরম মসৃণ পেটের ওপর হাত বুলিয়ে অনাগতকে আদর জানায়। কানটা পেটের ওপর চেপে ধরে বলে, সাড়া পাচ্ছি। হাই তুলে পাশ ফিরল বেটা বাহাদুর।

ঘুঙরী দু'হাতে অম্‌রুর মুখখানা তুলে ধরে কান্না ভেজা গলায় বলে, কী করে মালুম হ'ল তোমার, ও বেটা আছে? আমার বেটি বহুত পসন্দ্‌।

অম্‌রু অমনি মাথা দোলাতে দোলাতে বলে, মালুম নেই, মালুম নেই, ঝুট্‌মুট্‌ বলছি।

এবার ঘুঙরী যেন অম্‌রুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চায়, বেটা-বেটি সবকুছ আচ্ছা। সব দেওতার দান।

অম্‌রু ঘুঙরীকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, খুব ঠিক। যে আসবে সে আমাদের দিল্‌ খুশিতে ভরিয়ে দিতে আসবে।

পঁচিশটা দিন দেখতে দেখতে হাইউন্দের (শীত) হাওয়া লাগা প্রিগাছের পাতার মতো উড়ে চলে গেল। পহাল অম্‌রু তার ভেড় বক্‌রির দল নিয়ে ভুবু জোতের পথে কুলু উপত্যকার দিকে রওনা দিল।

ঘুঙরী চায় না অম্‌রু তার মামারবাড়িতে খেতির কাম নিয়ে বসে থাকুক। যে পহাল, সে জন্মেছে চলার জন্য। সব জানে, সব বোঝে ঘুঙরী। তবু একেবারে আপনার জন দূরে চলে গেলে মন কাঁদে। মনে হয় কতকিছু বলার ছিল মানুষটার কাছে, কিছুই তো বলা হ'ল না। এখন সে কোথায় চলেছে? পাহাড়ের কোলে বয়ে চলা নদী পেরিয়ে সে হয়তো চলেছে তার ভেড়ার পাল নিয়ে।

গুনগুন করে গান আসে ঘুঙরীর গলায়—

ও গয়ে সজন ও গয়ে
লংগি গয়ে দরায়া
বজ্জি নি কীত্যাঁ গলন্‌গুড়িয়াঁ
সদে দিলে দা চুকেয়া নি চা।

নদী পেরিয়ে আমার প্রিয় তার কাণ্ডার দিকে চলে গেছে। হায়, মন ভরে দুজনে দু'টো কথা বলব, কী শুনব, তার সুযোগ পেলাম না।

শীত পাহাড় পর্বতের গায়ে তুষারের সাদা সাদা চাদর জড়িয়ে দিচ্ছে। এ সময় যত নীচে নামা যায় ততই মঙ্গল। মাঝে মাঝে শীতের দিনগুলোতেও পশলা পশলা বৃষ্টি নেমে আসে। তখন ভেড়-বক্‌রির দল নিয়ে কুদে (গুহা) আশ্রয় নিতে হয়।

ভুবু জোৎ পেরিয়ে অম্‌রু উপত্যকায় নামবার সময় তেমনি এক ঝড়ের মুখে পড়ল। ক্যায়ল (চীর পাইন) বনের ভেতর দিয়ে চলছিল। তখন কলেল (সন্ধ্যা) দ্রুত ছেয়ে ফেলছে চারদিক। বনের ভেতর ছায়া গভীর হয়ে উঠছে। হঠাৎ ঝড়ের শাসানি, সঙ্গে চড়বড়িয়ে বৃষ্টি। অম্‌রু হুঁশিয়ার। গদ্দীমাত্রেই চলার পথে হুঁশিয়ার। তবু ভুল হয়ে যায়। রাস্তা কমাতে গিয়ে বনের ভেতর ঢুকে এই বিপত্তি। ঘুঙরীর কথা ভাবতে ভাবতে চলছিল অম্‌রু। ঘন বন। আকাশের চেহারা স্বচ্ছ ছিল না। হঠাৎ হইচই পড়ে গেল ক্যায়ল বনে। ছোট ছোট ডালপালা ছিঁড়েখুঁড়ে সে এক লন্ডভন্ড কাণ্ড। বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। চিল্লাতে লেগে গেছে ভেড় বক্‌রির বাচ্চাগুলো। থেমে গেছে পুরো দলটা। গদ্দী কুত্তর (কুকুর) সামনে বিপদ বুঝে

তাদের আগলে রেখেছে। এখন প্রভুর সিন্ধের (চলার নির্দেশজ্ঞাপক শিস) জন্য কান খাড়া করে অপেক্ষা।

অম্রু এই মুহূর্তে নিরুপায়। বনের বাইরে বেরুতে গেলেই তীব্র ঝড়ের ঝাপটার মুখে পড়তে হবে। বন পেরিয়ে খানিকটা পাহাড়ি পথ ভাঙলে তবে পরিচিত কুদ। সেখানে আশ্রয় মিলবে।

অম্রু দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। সামনে ভেড়ার পাল আর কুত্তর। অসহায় জীবগুলো অতর্কিত আক্রমণে নিজেদের গুটিয়ে এক বস্তা তুলোর তালের মতো সিঁটিয়ে আছে। বিয়ানার (ঝড়ের) দাপটের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ গুড়কানা (বাজ)। দু'-একটা বক্‌রি তরাসে আর্তনাদ করে উঠল। গুড়কানার আওয়াজটা ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল পাহাড়ে পাহাড়ে।

অসময়ের বৃষ্টি, আসাও যেমন আচমকা, যাওয়াও তেমনি। কিন্তু মেঘ উড়ে গেলেও আঁধার কাটল না। কলেল (সন্ধ্যা) তখন আর পাতলা নেই, রাতের কালো চাদরে গা ঢেকেছে।

হঠাৎ অম্রুর চোখে পড়ল এক টুকরো আলো। বনের ভেতর দপ্‌দপ্ করছে। এখন কুদের দিকে যাবার কোনও প্রশ্নই নেই। ওই আলোটুকুই এখন তার কাছে একমাত্র ভরসা। সে তার বাহিনীকে কুত্তরের জিম্মায় রেখে আলোটা লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

একটু তফাত থেকেই অম্রু দেখল, একটা লোক বনের ভেতর লক্‌ড়ি জড়ো করে আগ লাগিয়েছে। লোকটার পাশে শুয়ে আছে একটা ভঁইষ। ক্যায়ল গাছের পাতাগুলো আগুনে ফেলে দিতেই চিড়চিড় শব্দ উঠল।

আগুনটা জোরে জ্বলে উঠতেই অম্রু দেখতে পেল তিন-চারটে ক্লাঁ (পাইন) গাছের কাণ্ড ঘিরে একটা মাচান বাঁধা। মাচানটা জমিন থেকে হাত আট-দশ ওপরে।

অম্রু আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা চমকে তাকাল। সে প্রথমটা ভাবতেই পারেনি যে এখানে এ সময় কোনও আদমি এসে দাঁড়াতে পারে। বড় জোর ভাবা যায় একটা রিচ (পাহাড়ি ভালুক) ঝড়বাদলে আস্তানার পথ ছেড়ে বিপথে চলে এসেছে।

লোকটি তার দিকে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে আছে দেখে অম্রু বলল, বুঝতেই পারছ ভাইসাব, আমি পহাল। পুরো দল নিয়ে ঝড়ে আটকে পড়ে গেছি বনের ভেতর। নীচের কুদ (গুহা) অব্দি যাবার মতো আলো নেই। এখানে আলো জ্বলতে দেখে চলে এলাম।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই আস্তানার পাশেই এক চিলতে বিয়াল (সমতল তৃণভূমি) আছে। ওখানে আজ রাতের মতো তোমার ভেড় বক্‌রির গোঠ (যেখানে ভেড় বক্‌রি রাতের বিশ্রাম নেয়) বানাতে পারো।

বাঁচলাম ভাই। পুরো দলটাকে তাহলে এখানে নিয়ে আসি।

এখন কলেল ঘনিয়ে উঠেছে। একটু সবুর করো। এক পর (প্রহর) যেতে দাও, চানানি (চাঁদ) উঠবে, তখন নিয়ে এসো।

লোকটি অম্রুকে আগুনের পাশে বসতে ইঙ্গিত করে নিজেও বসে পড়ল।

আমি তোমাকে নারেলি (হুঁকো) ছিলম (কলকে) কিছুই দিতে পারব না। ওসব আমার কাছে নেই। আর থাকলেও পারতাম না।

অম্রু অমনি বলল, সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না।

নিজের কোমরে ঝোলানো বগ্‌লি (চামড়ায় ব্যাগ) থেকে ছিলম (কলকে) আর তামাকু বের

করে সামনের আংরা তুলে জুত করে সাজাল। দু'-এক টান টানতেই বুলবুলিয়ে ধুয়োঁ বেরিয়ে এল। অমনি সে ছিলমটা এগিয়ে ধরল লোকটির দিকে।

মানুষটা মুহূর্তে যেন কুঁকড়ে গেল। অস্পষ্ট গলায় বলল, আমি দাগি (অচ্ছুৎ)।

প্রথমটা অম্‌রু কিছু না বলে আবার টানতে লাগল। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। সামনের আগুনের ঝলকে শীতের হায়েনাগুলো সরে সরে পালাচ্ছে। ছিলমে কয়েকটা সুখ-টান দিয়েই অম্‌রু মৌজ হয়ে বসল। দিলটা এখন তার রোদেভরা আসমানের মতো খুশিতে ভরে উঠেছে। সে বুঁদ হয়ে বসে ছিলম সমেত ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরল লোকটার দিকে।

মানুষটার দুটো চোখের দৃষ্টি এখন অম্‌রুর মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। সে কিন্তু ছিলমের দিকে হাত বাড়াল না।

এবার অম্‌রু গা ঝাড়া দিয়ে লোকটার দিকে ঝুঁকে বলল, পিয়ো দোস্ত্।

অম্‌রুর উদারতা তার চোখে মুখে উপচে পড়ছে।

লোকটি সংকোচের সঙ্গে দুটো হাত বাড়িয়ে অম্‌রুর ছিলমটা ধরে নিল। তারপর অম্‌রুর দিকে পেছন ফিরে বসে দু'হাতের মাঝখানে ছিলম ধরে টানতে লাগল।

এক বড় জাতের মানুষ কৃপা করে তার হাতে ছিলম দিয়েছে, তা বলে তার মুখোমুখি বসে তো তামাক খাওয়া যায় না।

সেদিন ওই আগুনের তাতে মককির রুটি পাকাল অম্‌রু। মাটির তলা থেকে একটা বুনো আলু খুঁড়ে এনে দিল লোকটি। তাই পুড়িয়ে একটা সবজি বানানো হল। ভঁইষের দুধে রুটি ছুপিয়ে দু'জনে পরমানন্দে খেল।

আচমকা বৃষ্টিতে ভিজে সদ্য লোমছাঁটা ভেড় বক্‌রিগুলো বেশ জবুথবু হয়ে পড়েছিল। চাঁদ উঠলে তাদের নিয়ে আসা হ'ল আগুনের ধারে। তারা তাত (তাপ) পেয়ে শুয়ে পড়ল থাবড়ে থুবড়ে। কুত্তর দুটো কিন্তু আগুনের ধারে কাছে ভিড়ল না। বনের দু'দিকে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনায় সজাগ হয়ে রইল।

খাওয়াদাওয়ার শেষে আর একবার ছিলম টেনে দুজনে ক্ল্যা গাছের একটা খাঁজকাটা কাণ্ড বেয়ে ওপরের মাচানে উঠে গেল।

রাতে বুনো জানোয়ারদের ডাকহাঁক উঠল। কুত্তর দুটোও সমানে চেঁচিয়ে বিক্রম প্রকাশ করতে লাগল। অম্‌রু ঘুম ভেঙে জেগে উঠল মাঝে মাঝে। মাচানে চাপানো পারালের (ধানের খড়) চালার ছোট্ট একটা ফুটো দিয়ে কখনও সে বৃষ্টির চিহ্নহীন নির্মল আকাশটা দেখল। নীচে উঁকি মেরে দেখল ঘুমন্ত ভেড়গুলোকে। শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে দেখতে লাগল ঘরে ফেলে আসা ঘুঙরীকে। পেটে বাচ্চা নিয়ে সেও কি এখন ভাবছে তার মানুষটার কথা? সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ঘুঙরীর চোখ খোলা, আর সে চোখের দৃষ্টি ঘরের দরজা চৌকাঠ পেরিয়ে, গ্রাঁ (গ্রাম) আর টিকার (কয়েকটি গ্রাম যখন একসঙ্গে মিলিত হয়) পাশ কাটিয়ে অনেক পাহাড় উপত্যকা পেরিয়ে এই জঙ্গলে এসে ঠেকেছে।

পাশের লোকটা কিন্তু নির্বিকার শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। অম্‌রুর মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। আপদের সময় যে দু'হাত বাড়িয়ে আগলায় সে তো সত্যিকারের দোস্ত্।

আচ্ছা, মানুষটা একা একটা ভঁইষ নিয়ে বনের ভেতর কাটাচ্ছে কী করে! ওর বাড়িঘর আছে তো, না নেই?

এইসব ভাবনার ভেতর অম্রু একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

জুসমুসার (ভোর) আবছা কেটে বিহাগের (সূর্যোদয়) আলো ফুটল। বনের ভেতর সে আলোর ডালপাতা ফুঁড়ে ঢুকে পড়তে বেশ খানিকটা সময় লাগল।

অম্রুর উঠে বসার আগেই লোকটি নীচে নেমে গিয়েছিল। সে এরই ভেতর আগুন জ্বেলে, দুধ দুইয়ে কাজ হাসিল করেছে। ভঁইষের ছোট্ট বাছুরটার সঙ্গে খেলায় মেতেছে বক্‌রির দুটো বাচ্চা।

অম্রু নীচে নেমে আসতেই লোকটি বলল, ওই যে দোস্ত্, তোমার দুধ আমি আলাদা করে রেখেছি। তোমার পাত্রে ঢেলে ওটুকু গরম করে নাও।

অম্রু এসে আগুনের ধারে বসল। শীতের হাওয়ায় এরই ভেতর কামড় শুরু হয়ে গেছে। তবে অম্রুদের শীতবোধ অনেক কম। তারা যখন ওপরের পাহাড়ে চারণের জন্যে যায় তখন কড়া শীতের ভেতরেই তাদের কাটাতে হয় মাসের পর মাস। তবু আগুনের পাশে বসলেই একটা আমেজ আসে। বেশ মৌজ করে তামাকু খাবার একটা ইচ্ছা জেগে ওঠে।

অম্রু ছিলম আর তামাকু বের করে সাজল। নিজে দমভোর টেনে নিয়ে লোকটির দিকে এগিয়ে ধরল। ঠিক গত রাতের মতো অম্রুর চোখ আড়াল করে সে ছিলম টানতে লাগল।

কী নাম তোমার ভাই?

লোকটি তেমনি পেছন ফিরেই বলল, দুলিরাম।

তা বেশ নাম। খাস ডেরা কোথায়?

এই আমার খাস ডেরা। সাবেক আস্তানা জানতে চাও?

অম্রু অল্প হেসে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল।

দুলিরাম বলল, কুলু জিলার ঢোল ময়দানের লাগাও।

যেখানে দশেরায় মেলা বসে?

বিলকুল ঠিক।

আরে দোস্ত্, ও আস্তানা তো সবসে আচ্ছা। বিপাশা নদীর কিনারে। তা এমন জায়গা ছেড়ে এখানে বনবাদাড়ে এলে কী করে?

লোকটা নিজের কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, বরাত।

কী রকম? হাঁ, তবে সংকোচ থাকলে বলে কাজ নেই।

আরে ভাই, সব ছেড়ে চলে এসেছি। বিমারি হয়ে বহু মারা গেল, আমি তখন জঙ্গলে ঠিকাদারের গাছ কাটছি। বন উজাড় হল আব আমি ঘরে গিয়ে শুনলাম জোয়ান বহুটা মরেছে। আমার মনে হল, গাছ কাটার পাপে আমার এমনটা হল। কত ফুল, কত ফলের গাছ কেটে আমি মাটিতে ফেলে দিয়েছি। কত পঞ্ছীকে আমি বাসা ছাড়া করেছি। ডালে ডালে কাঠবেড়ালির নাচ আমি একদম বন্ধ করে দিয়েছি। এদের অভিশাপ ঠেকাব কী দিয়ে দোস্ত্।

অম্রু বলল, তোমার তো এতে কোনও দোষ নেই ভাই। তুমি জংলাৎ ম্যাকমায় কাজ নিয়েছ। ঠিকাদারের হুকুমে কামকাজ করেছ। দোষ হলে তার, তোমার কী?

অন্যমনস্ক বিষণ্ণ গলায় দুলিরাম বলল, বহু মরল, মানুষজনের সঙ্গে থাকতে আর দিল চাইল না। বনেই পালিয়ে এলাম।

এখন ঠিকাদারের কাছে কাম করো না?

না। বহুৎ পাপ করেছি, আর না। এক টুকরো খেতি আর এই ভঁইষ। গাছের ডালে পঞ্ছীর মতো বাসা বানিয়েছি। খাসা আছি দোস্ত্।

লোকটিকে দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল অম্‌রুর।

এবার অম্‌রুর আর এক প্রশ্ন, বালবাচ্চা নেই?

দুলিরাম মাথা নেড়ে জানাল তার কোনও বাচ্চাকাচ্চা নেই। দো বরষ শাদি হয়েছিল, দো মাহিনাও বহুর সঙ্গে সে কাটাতে পারেনি।

অম্‌রু বলল, বহু তোমাকে তার কষ্টের কথা জানাত না?

দুলিরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলল! স্মৃতি হাতড়ে বলল, আমি যখন তার কাছ থেকে চলে আসতাম, তার আঁখ থেকে আঁসু ঝরত। সে একবার একটা দুঃখের গান গেয়ে তার মনের কথা জানিয়েছিল।

আপুন ভি নই আউন্দা ও
লিখি ভি নই ভেজ্‌দা
কীয়াঁ তন্ কাট্‌নি ও
বলারি বরেষ।

তুমি ঘরে আস না, কোনও খবরও পাঠাও না। বলো, আমি আমার এই যৌবনের দিনগুলো কেমন করে কাটাই।

খানিক সময় গভীর একটা দুঃখকে বুকে চেপে ধরে দুলিরাম আবার বলল, মানুষের দুনিয়ায় বাঁধা থেকে কী হবে দোস্ত্, যদি বহু বেটার কাছে থাকতে না পারলাম।

সাচ্ বাত, বলে অম্‌রু দোস্তের দুঃখে সান্ত্বনা জানাল।

বড় কষ্টে পুরুষদের রুজি রোজগারের ধান্দায় বেরুতে হয়। তখন সঙ্গীহারা মেয়েরা কান্নায় বুক ভাসায়। বিদায়ের সময় মেয়েরা একান্তে তার পুরুষকে হাতের বাঁধনে জড়িয়ে ধরে বলে,

খেতিয়া কানক কুপাহ্
মেঁ কাত্‌তন তু খা
পরদেশ ন যা
পরদেশন্ দি মম্‌লে জি তোলা মন্দ্‌রে।

খেতিতে গম আর তুলো ফলবে। আমি তোমার খানা বানিয়ে দেব, কাপড় বুনে দেব। ওগো আমার মনের মানুষ, তুমি পরদেশে যেও না, যেও না, যেও না।

এসব দুঃখের গান পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়েদের মুখে মুখে ফেরে। তাদের বুকের মোচড় থেকে এ গানের জন্ম। চোখের জলে এর বেড়ে ওঠা।

তবু চলে যেতে হয়। গরিব মানুষের সাধ আহ্লাদের সময় কই। জান বাঁচানোর তাগিদে ভালবাসার কথা ভুলতে হয়।

অম্‌রু দুধ গরম করল। দুলিরাম তার ছোট্ট খেতি থেকে তোলা দু' দুটো মকাই এনে দিল। অম্‌রু তাই পুড়িয়ে নিমকে ছুপিয়ে খেতে লাগল।

তুমি যে এখানে ডেরা বেঁধে, খেতি করে রয়েছ, জংলাৎ ম্যাকমার (বনবিভাগ) কোনও লোক কিছু বলে না?

ওরা এলে বলি, ভঁইষের দুধ পিয়ো। মকাই দিয়ে খাতির করি। ওরা আর তাড়া লাগাবার ফুরসত পায় না।

অম্রু বলল, তোমার জীবনটা ভাই মন্দ না, বেশ কেটে যাচ্ছে একা একা।

দুলিরাম উৎসাহিত হয়ে উঠল, একা নই দোস্ত, সারাদিন অতিথির কমতি নেই। জুস্‌মুসা (ভোর) থেকে কলেল (সন্ধ্যা) শয়ে শয়ে পঞ্ছী উড়ে আসে গাছের ডালে। আমার চারপাশে নেমে এসে ঘুরে বেড়ায়। চিড়ি (চড়াই), ঘাটারী (শালিক জাতীয় পাখি) নেচে নেচে খাবার চায়। আমি ওদের মক্‌কির দানা খাওয়াই। আর দু'জন গাছ থেকে আদ্দেকটা নেমে এসে ওদের খাওয়া দেখে। একেবারে নেমে আসতে সাহসে কুলোয় না।

অম্রু কৌতূহলী হয়ে উঠল, কাদের কথা বলছ?

কাঠবেড়ালি দুটো। এই গাছেই বাসা বেঁধেছে। পাখিগুলো চলে গেলে ওরা আমার কোলে লাফিয়ে উঠে আসবে। হাতে খাবার তুলে ধরতে হবে। ওরা কুটকুট করে খাবে। ল্যাজ তুলে ছুট লাগাবে। আবার এসে খেয়ে যাবে।

ওদিকে ঝাঁক ঝাঁক তোতা (টিয়া) গাছের ডাল ছেয়ে ফেলবে। মালুম হবে, গাছ ভরে গেছে সবুজ পাতায়। আবার উড়ে চলে যাবে ঝাঁক বেঁধে। কখনও ঝুঁটি দুলিয়ে চটি পিন্‌ঝা (বুলবুলের মতো পাখি) আসবে। ঘুঘি (ঘুঘু) ডাকবে ভারধূপে (মধ্যাহ্নে)।

একটু থেমে দুলিরাম বলল, আমার সঙ্গীসাথি বলতে এরাই আছে দোস্ত্‌।

অম্রু বলল, এদের মতো আপনার জন আর কে-ই বা হবে।

আপন মনে বলে চলে দুলিরাম, একদিন যে হাতে পেড় (গাছ) কেটে মাটিতে ফেলেছি, সেই হাত পেড়ের গায়ে বুলোই। আঁখ মেলে দেখি, পাতা ঝরল, ফিরে পাতা এল। ফুল ফুটল, ফল ফলল। আগ লাগাবার জন্যে শুখা ডাল জোগাড় করে আনি। কাঁচা ডাল আর কাটিনা দোস্ত্‌।

একসঙ্গে অনেক কথা বলে চুপ করে গেল দুলিরাম। খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল অম্রুর। সে বলল, এখন উঠি দোস্ত্‌। ফিরে এ পথে যাবার সময় আবার কোনওদিন তোমার ডেরায় হাজির হব।

দুলিরাম উঠে দাঁড়িয়ে তার হঠাৎ-পাওয়া অতিথির হাত ধরল।

দু' দণ্ড তোমাকে কাছে পেয়ে দিল খুশ হয়ে গেল দোস্ত্‌। আপনা মনে করে ফের চলে আসবে।

অম্রু তার ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলল নীচের পাহাড় লক্ষ্য করে। পিঠে বাঁধা রুবানা (বাদ্যযন্ত্র), হাতে কুলহার (কুঠার)। সংকীর্ণ পাহাড়ি পথে ভেড়্‌-বক্‌রিগুলো ছইয়ের (পাহাড়ি স্রোতধারা) মতো তরতরিয়ে নেমে যাচ্ছে। অম্রু তাদের পাশে পাশে একটার পর একটা টোহলে (পাথরের চাঁই) লাফ দিতে দিতে চলেছে। হাতের কুলহারখানা হাওয়ায় চালিয়ে শরীরের ভার সামলাচ্ছে। সামান্য এক চিলতে ফাঁকা জায়গায় ঘাস গজিয়েছে, অমনি নিমেষে তাকে মুড়িয়ে ফাঁকা করে দিচ্ছে অম্রুর বাহিনী।

নীচের কাণ্ডায় সেদিনের মতো যাত্রা-বিরতি। বেলাশেষের রোদ্দুরে তেজ নেই। মরা সোনার মতো আলোটুকু গাছের ডালপালা থেকে গড়িয়ে ভেড়বক্‌রিগুলোর গা ধুইয়ে দিয়ে

একটা কুহলের (চাষের জন্য প্রবাহিত জলধারা) স্রোতে মিশে নীচের উপত্যকার দিকে তরতরিয়ে নেমে গেল।

অম্রু সবুজ ঘাসের গাল্‌চেতে বসে রুবানা বাজাতে লাগল। আজ কেন জানি না, কাংড়ার রাজা সংসারচাঁদের কাহিনীটা ফিরে বাজাতে লাগল তার রুবানায়। ডানদিকে মাথার ওপরে বন। বন চিরে একটা পাহাড়ি ছুই (জলধারা) নেমে যাচ্ছে নীচে। আর খানিক সন্ধ্যা নামলে বনের প্রাণীগুলো আসবে ওই ছুইয়ের জলে গলা ভেজাতে।

রুবানায় ঝম্‌ঝম্ করে বেজে উঠল ভয় মেশানো একটা সুর। বাতাস কাঁপিয়ে সে সুর ফিরতে লাগল চারদিকে। সুরের ঢেউগুলো নীচে থেকে উঠে চলল ওপরে বনের দিকে।

অম্রু রুবানায় হাত চালাচ্ছে আর ছবি দেখছে। কাংড়ার রাজা সংসারচাঁদ বনে এসেছেন মৃগয়ায়। লোক-লশকর হাঁকার ছেড়ে কাঁপিয়ে তুলছে বন। পশুপাখি পালাচ্ছে ডর লেগে। কিন্তু পালাবে কোথায়? সংসারচাঁদের লক্ষ্য কখনও ফসকায় না। যেদিকে হাতিয়ার চালাচ্ছে, সেদিকেই বিঁধে যাচ্ছে শিকারের গায়ে।

বনের ভেতর এত ঢাকবাদ্যির আওয়াজ শুনে কৌতূহলী হয়ে ছুটে এল এক গদ্দান (গদ্দীদের মেয়ে)। যুবতী, সবে শাদি করে তার আদমির সঙ্গে এসেছে ভেড়্‌বক্‌রি চরাতে।

রাজার চোখ পড়ল তরুণীটির ওপর। এত রূপ। এত সুন্দর নজর! রাজা সংসারচাঁদ মুগ্ধ। তরুণী গদ্দানটি রাজার চোখে দেখল ভালবাসার আলো। তারও দিল টলল। রাজাকে তার ভাল লেগেছে, কিন্তু তার আদমি! সে যে মিশে আছে তার প্রতিদিনের জীবনে। এই দোটানায় পড়ে ভেঙে গেল তরুণী গদ্দানের বুকখানা।

কোনও একদিনের এই সত্য ইতিহাসটুকু গদ্দীদের লোকসংগীতে আশ্রয় নিয়েছে। এখন মুখে মুখে গান হয়ে ফিরছে সেই রাজা সংসারচাঁদের কাহিনী।

রুবানার সঙ্গে এবার গলা ছেড়ে গাইতে লাগল অম্রু—

রাজা সংসারচাঁদ হেরে যো চলায়া
গদ্দন তামাসে যো আয়ি
মেরি বাঁকিয়ে গদনী
থোরি থোরি বেদন্ রাজে দি লগদি
গদিয়ে দি লাগি যন্দি চুড়ি
মেরিয়া বাঁকিয়ে গদিয়া।

একসময় রুবানা থামিয়ে ঘুঙরীর কথা ভাবতে লাগল অম্রু। না, তার ঘুঙরী কাউকে দিল দেবে না। আর কোনও আদমি তার খোঁড়া বন্থুর দিলও চুরি করবে না।

কদিন চলার পর একটা ছুইয়ের (পাহাড়ি স্রোতধারা) সামনে এসে দাঁড়াল পুরো দলটা। পাথরের চাঁইগুলোর ওপর আছড়ে পড়ছে জল। গর্জন করতে করতে ফেনা ওগরাচ্ছে ছুইটা।

এখানে সাবধানে নীচের দিকে নামতে হবে। তারপর উপত্যকায় পৌঁছে কোনও একটা টাংড়ির (সাঁকো) ওপর দিয়ে পেরিয়ে যেতে হবে ওপারে।

দলবল নিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে নামছিল অম্রু। এমন সময় একটা ছাল্লির (শিশু ছাগী) মিহি গলার আওয়াজ তার কানে এসে পৌঁছোল। চমকে নিজের বাহিনীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখল সে। নাঃ, তার দলের কেউ পিছলে পড়ে যায়নি। এসব জায়গায় চলার একটু ভুল হলেই

মাশুল দিতে হয়। ফি বরষ নদীর জলে পড়েও যায় দু'-দশটা ভেড়্-বক্‌রি। তবু এই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েই এ পথ চলতে হয়।

অম্‌রু এখন ওপারের দিকে কৌতূহলী চোখ মেলে চেয়ে আছে। ওপার থেকে একটা দল নামছিল। সে দল থেকে একটা ছাল্লি (শিশু ছাগী) একটুখানি নীচে গড়িয়ে পড়েছে। পড়বি তো পড়্‌, একটা পুরু ঘাসের জমিনে। তাই বরাতে বেঁচে গিয়ে এখন চিল্লাতে শুরু করেছে।

একটা পাথরে কোমরের ডোরের (গদ্দীদের কোমরে জড়ানো ছাগ-লোমের লম্বা মোটা দড়ি) খানিকটা জড়িয়ে পহালটা বাকি দড়িটা ধরে নেমে গেল নীচে। তারপর চোলের (ফ্রকের মতো উলের তৈরি জামা) পকেটে ছাল্লিটাকে পুরে ডোর ধরে পাথরে পায়ের গুঁতো মারতে মারতে উঠে গেল ওপরে।

এবার এপার থেকে হাঁক পাড়ল অম্‌রু, সাবাস ডেঞ্জু, সাবাস।

ডেঞ্জু নামের পহালটি চমকে তাকাল। অম্‌রুকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, আরে দোস্ত্‌, তুম?

দু'জনে এবার সাবধানে ছইয়ের দুই তীর ধরে নীচের দিকে নামতে লাগল।

নিচেই টাংড়ি। অম্‌রু টাংড়ি পেরিয়ে ওপারে গেল। ওপারেই চারণভূমি। দুই দোস্তে প্রথমে ঘুষোঘুষি, তারপর কোলাকুলি হল। বছরে একবার এমনি চারণের ভেতর ওদের দেখা হয়ে যায়।

ডেঞ্জু তার ভেড়্-বক্‌রি নিয়ে লাহুল থেকে আসছিল রোটাংপাশ পেরিয়ে। সেদিন আর বেশি নীচে নামা হল না। সামনের একটা কাণ্ডায় দু'জনে তাদের ভেড়্-বক্‌রি ছেড়ে দিয়ে গল্পে মেতে উঠল।

অম্‌রু দোস্তের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, কীরে, এ বরষও শাদি হল না?

না দোস্ত্‌। দিল-পসন্দ লেড়কি না মিললে জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে। যে জেনানা মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে চলতে পারবে তাকেই তো চাই জীবনে। নদীর ধারে, পাহাড়ের ওপর, খোলা কাণ্ডায় ঠান্ডী-গরমিতে যে সাথ সাথ থাকবে সেই তো হবে জীবন-সাথী।

দু' বন্ধুতে দিনভর খোসগল্পে কাটিয়ে দিল। রসুই পাকাল।

ডেঞ্জু বলল, দাতিয়ালু (দিনের খাবার) আমার। রোটি, ডাল আর সবজি।

অম্‌রু অমনি বলল, সাঞ্জিয়ালু (সান্ধ্য-ভোজ) আমার।

ঠিক আছে।

গল্পের ভেতর আসল কথাটি এসে পড়ল। অম্‌রুর আসন্ন পিতৃত্ব লাভের খবর। ডেঞ্জু অম্‌রুর হাতে ঝাঁকি দিতে দিতে বলল, ভাবী দোস্তের হাতে আশ্‌মান টুঁড়ে এক চানানি (চাঁদ) এনে দেবে। জব্বর খুশ খবর।

অম্‌রু দোস্তের কাছে কথাটা বলতে পেরে মনে মনে ভারী খুশি হয়ে উঠল। তার ঘুঙরী মা হবে। সে হবে বাবা। এ যে অবাক যাদু কি খেল্‌। কেউ কোথাও নেই, হঠাৎ আমদানি হল একটা খেলনা। হাত-পা ছুঁড়ে, খেলকুদ করে বাড়ি মাতিয়ে দিল।

দু'দিন ওরা রইল কাণ্ডায়। এর ভেতর আরও দুটো দল নেমে এল। বেশ বড় চারণভূমি। ভেড়-বক্‌রিতে ঠাসা। চুরুক্ চুরুক্ ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে চরকির মতো।

পহালরা নিজেদের ভেতর মজাদার কথা চালাচ্ছে। বিহানে বক্‌রিদের নিয়ে একটা বাজির লড়াই হল। যে যার দল থেকে মদ্দা এক-একটা বক্‌রি নিয়ে এল। চার দল থেকে এল চারটে বক্‌রি। ইয়া বাঁকা শিংজোড়া।

কাণ্ডার একদিক খালি করে পহালরা ঘিরে দাঁড়াল। কুত্তরগুলো পাহারায় রইল, যেন ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে ভেড়-বক্‌রিগুলো ঢুকে না পড়ে। লড়াই শুরু হল দুটো দুটো দলে। মুখে বিচিত্র শব্দ তুলে পহালরা নিজের নিজের বক্‌রিকে মাতিয়ে তুলল।

দুটো পহেলবান ছুটে আসছে পরস্পরের দিকে। মুখোমুখি এসেই সামনের দুটো পা শূন্যে তুলে মুখ কাত করছে। পরক্ষণেই দু'জোড়া শিঙে লাগছে টুঁ। আবার পা নামিয়ে কিছুটা হটে এসে সেই শব্দ তুলে শিঙে শিঙে টুঁ। নিজের নিজের বক্‌রিকে উৎসাহের তোড়ে এগিয়ে দিচ্ছে মালিক।

লড়াইয়ে এঁটে উঠতে না পেরে এক একটা বক্‌রি আস্তে আস্তে পিছু হটছে। নির্দিষ্ট রেখার বাইরে হটে গেলেই তার হার।

লড়াইয়ে দুটো জিতল। এখন ওই দুটোর ভেতর আবার শুরু হল শেষ লড়াই। ডেঞ্জু হেরেছে টাসুর কাছে। অন্যদিকে অম্‌রু জিতেছে রৌন্‌কিকে হারিয়ে।

টাসু আর অম্‌রুর দুটো বক্‌রি এবার লড়াইয়ে মাতল। ঘামে দুটো জানোয়ারেরই লোম চুপচুপ, চোখ লাল। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ছে। লড়াই চলছে এগিয়ে পিছিয়ে। টুঁয়ের আওয়াজ উঠছে ঠাঁই, ঠাঁই।

পিছু হটছে টাসুর বক্‌রি। নিজের হারের দুঃখ ভুলে অম্‌রুর বক্‌রিকে গলা ফাটিয়ে মদত দিচ্ছে ডেঞ্জু।

শেষ বাজিমাত করল অম্‌রুর বক্‌রি। ডেঞ্জু যেন পুরো লড়াইটাই জিতে গেছে। দোস্তের জয়ে সে ভুলে গেছে তার নিজের হার। অম্‌রুর বক্‌রিটাকে শূন্যে তুলে খুশিতে ফেটে পড়ছে।

যারা হারল লড়াইতে তারা একবেলা করে খাওয়াবে বিজয়ীকে। আর শেষ বিজয়ী অম্‌রু তিনবেলা খাবে তিন হেরোর রান্নায়।

নাচ শুরু হয়েছে জোছনা রাতে। দারুণ বেগে ঘুরে ঘুরে পহালদের নাচ। প্রভুদের দেখাদেখি কুত্তরগুলোও উল্লাসে ছুটোছুটির খেলায় মেতে উঠেছে। ভেড় বক্‌রিগুলোর কেউ বা শুয়ে কেউ বা দাঁড়িয়ে। দিনভর খাবার পর ঝিমুনি এসেছে তাদের।

ওপরের পাহাড়ে পাহাড়ে তোষগাছের (ফার) বন। একটা কাঠখুরু (কাঠঠোকরা) পাখি ফিনিক ফোটা জোছনাকে দিন ভেবে ঠুক্ ঠুক্ কাঠ ঠুকে চলেছে।

নাচের পর বাজনা। অম্‌রুর হাতের টানে রুবানা স্বপ্ন ছড়ায়। ওরা কেউ ঘাসের বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় কেউ বা হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে বাজনা শোনে। জোয়ান পহালদের মন সুরের ছোঁয়ায় উদাস হয়ে যায়। ঘরে ফেলে আসা আপনজনদের জন্যে হু হু করে ওঠে মনটা।

দু'-চারদিনের ভেতরেই ঘাস ফুরোয়, সুখের হাট ভাঙে। ডেঞ্জু আর অম্‌রু একপথে চলে, অন্যেরা যায় তাদের নির্দিষ্ট কাণ্ডায়।

এখন সৈরী (শরতের ফসল) তোলা হয়ে গেছে। মকাই শুকোচ্ছে ঘরের ছাদে। সোনার দানায় গাঁথা মকাই ছাদে ছাদে ঝলসাচ্ছে। যে কেউ কোনও মোকামের পাশ দিয়ে যাচ্ছে তার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে ওই মকাইয়ের সোনালি রং।

কে যায়, অমরু? আরে, খেতি পার হয়ে যাচ্ছ কোথা? এসো আমার খেতে। দো-চার রোজ তো থাক এখানে।

অম্‌রু উত্তর দেয়, আসছি চাচা, সামনের নালুতে (সংকীর্ণ জলধারা) ভেড়্‌-বক্‌রিগুলোর তেষ্টা মিটিয়ে আসছি।

অম্‌রুর সঙ্গে ডেঞ্জুও এসে জোটে মালুচাচার খেতিতে। মালুচাচা দারুণ খুশি। এসময় ধান তোলা হয়ে গেছে। সরসোন বুনতে হবে। তার আগে ভেড়্‌-বক্‌রির নাদিতে জবর সার জমে যাবে খেতিতে।

উঁচু পাহাড় ঘুরতে ঘুরতে মাগ্‌গর (অগ্রহায়ণ) মাসে অম্‌রু নেমে এল একেবারে নীচের পাহাড়ে। এসব পাহাড়কে গদ্দীরা বলে, ব্যান। এই ব্যান অঞ্চলগুলোতে যেন তাদের চারণের মৌরসিপাট্টা রয়েছে।

বিপাশা বইছে। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে যেন ঝঞ্ঝার (ঘুঙুর) বাজিয়ে চলেছে। পাশে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ক্যায়ল (চীর পাইন) গাছের সারি। দূরে কাছে রুপোর কুচির মতো বরফ সূর্যের আলোয় ঝলকাচ্ছে। সারা কুলু উপত্যকার ব্যান অঞ্চল জুড়ে চরে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার ভেড়-বকরি। গাছের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ তাদের দেখা যাচ্ছে, আবার আড়ালে চলে যাচ্ছে। অলস মধ্যাহ্নে একটা ক্ল্যাঁ (পাইন) গাছে হেলান দিয়ে বসে অম্‌রু বাঁশুরি বাজাচ্ছে।

মাগগ্‌র মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়ে গেল শীতের হাওয়া। বরফ ঝরতে লাগল ঝির ঝির করে। মাঝে মাঝে আকাশে জমে ওঠে মেঘ। কোনও কোনওদিন জোর বাতাস বইলে ক্ল্যাঁ গাছের বনে শুরু হয়ে যায় কান্না। অম্‌রু শীতের শুরুতেই একটা খবর পেল। কাংড়া থেকে গোপী কুলুতে এসেছে তার ভেড় নিয়ে। সে বেরিয়েছিল অম্‌রুর অনেক পরে। ঢাল ময়দানের কাছে দেখা হয়ে গেল গোপীর সঙ্গে অম্‌রুর।

উৎসুক হয়ে উঠল অম্‌রু, গোপী ভেইয়া, আমার ঘরের খবর আচ্ছা তো?

গোপীকে বিষণ্ণ দেখাল।

উদ্বেগে গলা কেঁপে উঠল অম্‌রুর, ঘুঙরীর তবিয়ৎ ক্যায়সে?

গোপী যা বলল তাতে বোঝা গেল, সে আসার সময় তার বউয়ের মুখে শুনেছিল, ঘুঙরী নাকি প্রসব-বেদনায় বেশ কষ্ট পাচ্ছে। চলে আসতে হল, তাই সে জেনে আসতে পারেনি শেষমেশ কী হল।

অম্‌রুর মাথার ওপর তখন আকাশভাঙা মেঘ জমে উঠেছে। মুহূর্তে সে তার কর্তব্য ঠিক করে ফেলল। গোপীকে কিছু না বলে অম্‌রু হ্যালা হুঁই, হ্যালা হুঁই করতে করতে তার ভেড়-বক্‌রির দল চালিয়ে নিয়ে চলল কাংড়ার পথে।

পাঁচদিনে ভুবু জোৎ পেরিয়ে প্রায় উড়ে চলে গেল অম্‌রু। সারাক্ষণ মনের ভেতর দুশ্চিন্তা, ঘুঙরী ভাল আছে তো।

পথ চলতে প্রার্থনা করে, হে বাবা মহাদেও, রক্ষা করো আমার ঘুঙরীকে। তার যেন কোনও বিপদ না ঘটে।

একেবারে সন্ধ্যার মুখে ভেড়্‌-বক্‌রির পাল নিয়ে মাতুল পারষোত্তমের ডেরার বাইরে এসে দাঁড়াল অম্‌রু। শীতের কামড় শুরু হয়েছে, তাই সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে ওঠার আগেই যে যার ডেরায় আগুনের ধারে এসে সিঁধিয়েছে।

বুকের ভেতর গুর্‌গুর্‌ করে উঠল অম্‌রুর। শ্মশানের মতো শূন্য মনে হচ্ছে চারদিক। অম্‌রু দুম্‌সারামকে ডাকার চেষ্টা করল কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ একটা কান্নার শব্দ শীতের হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গলার আদরের স্বর। অম্‌রু চিৎকার করে দুম্‌সারামের নাম ধরে ডাকতে লাগল। একসময় মণিমহেশের (পবিত্র পর্বত ও দেবতা) উদ্দেশ্যে দুটো হাত জোড় করে বলল, প্রভু তোমার কৃপায় আমি আজ আমার ঘুঙরীকে ফিরে পেলাম।

আলো হাতে পারযোত্তমের সঙ্গে দুম্‌সারাম বেরিয়ে এল। বাইরের আগল খুলে যেতেই পারযোত্তমকে প্রণাম করল অম্‌রু।

অবাক হয়ে গেছে পারযোত্তম।

অম্‌রু, তুই!

হাঁ মামাজি।

পারযোত্তম অমনি অম্‌রুকে জড়িয়ে ধরে বলল, বেটা হয়েছে রে, বেটা। চল বেটা, অন্দর চল।

অম্‌রু হঠাৎ কেমন লজ্জা পেয়ে গেল। সে বলল আমি ওরিতে (ভেড়-বক্‌রিদের থাকার জায়গা) ভেড়-বক্‌রিগুলোকে ঢোকাবার ব্যবস্থা করি। দুম্‌সা আমার সঙ্গে আয়।

পারযোত্তম অম্‌রুর আসার খবরটা চড়া গলায় হাঁকতে হাঁকতে অন্দরে পৌঁছে দিল।

রাতে অম্‌রুকে কাছে পেয়ে ঘুঙরী বলল, বহুত কষ্ট পেয়েছিলাম, মালুম হয়েছিল আর তোমাকে দেখতে পাব না। দিনভর কষ্ট দিয়ে শেষমেশ রাতে বেটা জনম নিল।

গোপীর মুখ থেকে তোমার কষ্টের কথা শুনে আমার মাথাটা বেঠিক হয়ে গেল। আমি ছুট লাগালাম। পথে পাঁচরোজ কেমন করে কাটল তা মহাদেও জানেন।

অম্‌রুর একখানা হাত বুকের ভেতর টেনে নিয়ে ঘুঙরী চেপে ধরল। তার আপনার জনকে সে কাছে পেয়েছে এই আশ্বাসে তার দিলটা ভরে উঠল।

একসময় ঘুঙরী অন্ধকারে অম্‌রুর মুখখানা হাত দিয়ে ছুঁয়ে বলল, সত্যি বলো, কেমন হয়েছে বেটা?

বহুত সুন্দর। একদম মা য্যায়সা।

না, বিলকুল তোমার মুখড়া।

মনে মনে ভারী খুশি হল অম্‌রু। তবু মুখে বলল, আদল তো ভাঙবে গড়বে। শেষমেশ কী দাঁড়াবে, এখন বলা মুশকিল।

তুমি পুরা হাইউন্দ্‌ (শীতকাল) এখানে থাকবে তো?

অম্‌রু অমনি বলল, তুমি না তাড়ালে যাব না।

অভিমান করে কতক্ষণ মুখ ফিরিয়ে রইল ঘুঙরী। অম্‌রু সাধ্য-সাধনা করতে লাগল।

আমি বুঝি তোমাকে শুধু তাড়িয়ে দি?

কথার কথা, তাই বলেছি।

এবার থেকে এখানে থাকো, না হয় সরলে (সরল উপত্যকায়)। খেতির কামকাজ চালাও। সহজে খানাপিনার জোগাড় হয়ে যাবে।

অম্রু জানে এটা ঘুঙরীর ইচ্ছার বিপরীত কথা। সে শুধু অম্রুকে আঘাত দেবার জন্যেই কথাগুলো বলছে। ঘুঙরী খোঁড়া। দুনিয়া তার চলার পথে হাজারটা বাধা ছড়িয়ে রেখেছে। তবু ঘুঙরী চলবেই চলবে। সে বিধাতার দেওয়া বাধাকে মানবে না। পথে পথে সে যত বাধা ডিঙোবে, তত তার আনন্দ উপচে উঠবে। তার বুড়ো বাবা পথ চলাকেই ধর্ম বলে মেনেছে। তার মেয়েও বাপের ধর্মকেই পালন করে চলেছে।

ঘুঙরীর কথার উত্তরে অম্রু কপট রাগ দেখিয়ে বলে, আমি যদি সুখের লালচে (লোভ) পড়ে থাকতাম—তাহলে সাত-আট মাহিনা পাহাড় ঢুঁড়ে ফিরতাম না।

ঘুঙরী আর কথার পিঠে কথা বাড়ায় না। মানুষটাকে সে ভাল করেই চেনে। কত কষ্ট করে জোৎ (পাশ) পেরিয়ে লোকটা আপদের কথা শুনে ছুটে এসেছে। গভীর মমতায় সে অম্রুর পায়ে হাত ঘষতে ঘষতে বলে, তড়িঘড়ি আসতে গিয়ে পায়ে বহুত দরদ হয়েছে, নাগো?

অম্রু অমনি বলে, ও কিছু না। তোমার তবিয়ৎ বিলকুল ঠিক আছে দেখে আমি খুশি।

তবুও ঘুঙরী বিছানা ছেড়ে উঠে যায়।

কোথায় যাচ্ছ?

কোনও উত্তর না দিয়েই ঘুঙরী রসুইখানার দিকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলে যায়। বাতি জ্বালার আওয়াজ ওঠে। মিটমিটে একটা আলো রসুইঘর থেকে শোবার ঘরের চৌকাঠে উঁকি মারে। জড়িবুটি মেশানো একটা তেল ঘুঙরী তৈরি করে রেখেছে। চলার পথে পায়ে দরদ হলে ওই তেল মালিশ করলেই ব্যথার উপশম। ঘুঙরীর বাবাই এটা তাকে তৈরি করতে শিখিয়েছিল।

তেলটা গরম করে শোবার ঘরে নিয়ে এল ঘুঙরী।

বাতিটা ঘরের এককোণে রেখে বিছানার কাছে এগিয়ে এল।

ততক্ষণে অম্রু বিছানার ওপর উঠে বসেছে।

বলেছি তো পায়ে কিছু দরদ নেই।

ঘুঙরী শুধু বলল, কৃপা করে শুয়ে পড়ো।

ঘুঙরীর এই নরম অনুরোধটুকুর ভেতর এমন একটা জোর ছিল যা অম্রু এড়াতে পারল না। বাধ্য ছেলের মতো বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কতক্ষণ তেলটুকু অম্রুর দুটো পায়ে মালিশ করে দিতে লাগল ঘুঙরী। মালিশের সঙ্গে সঙ্গে মিশে যেতে লাগল ঘুঙরীর মনের মমতা। এ মমতাটুকু মেয়েদের মনের অদ্ভুত এক মধু। ঘুঙরী তার বুড়ো বাবাকে, তার সদ্যজাত শিশুকে এই মমতার মধু খাইয়ে তৃপ্তি দিয়েছে। এখন স্বামীর সেবাতেও মমতার সেই মধু ঢেলে দিচ্ছে।

অম্রু কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুঙরী ইতিমধ্যে উঠে বসে ছেলেকে বুকে টেনে নিয়েছে। চুক্ চুক্ করে মায়ের ভরা দুধ টেনে টেনে খেতে লেগেছে শিশুটি।

অমরু বলল, বেটার ভুখ্ লেগেছে বুঝি?

ঘুঙরী বলল, কেঁদে তোমাকে ওঠাল তো?

অন্ধকারে হাত বাড়ায় অম্রু। ছেলের গায়ে, মায়ের খোলা বুকে হাত লাগে।

ঘুঙরীর গলায় চাপা প্রতিবাদ, কী হচ্ছে ওটা?

হাত সরিয়ে নেয় অম্‌রু।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। শিশুর পিঠে মায়ের ঘুম পাড়ানি চাপড়ের শব্দ। তারপর অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকা অম্‌রুর কোলে এসে পড়ল একটা আটার তাল।

ঘুঙরী কি অন্ধকারে দেখতে পায়! ঠিক ছেলেটাকে তাক্ করে ফেলে দিয়েছে বাপের কোলে।

অম্‌রু কোল নাচিয়ে ছেলেকে আদর জানায়। নরম উলের পাট্টুতে (কম্বল) ছেলের গা মোড়া। টুস্‌টুসে আপেলের মতো মুখখানা খোলা।

অম্‌রু সাবধানে ছেলের গালে হাতের ছোঁয়া লাগাল। কচি মাথায় হাত বুলিয়ে দেখল উর্ন্নুর (পুরুষ মেষশাবক) মতো নরম লোম গজিয়েছে।

মায়ের সাড়া নেই। বাচ্চা ঠিক বোঝে। উত্তাপের হেরফের হলেই বোঝে, ঠিক জায়গাটিতে নেই। অমনি নড়ন চড়ন শুরু হল। তার সঙ্গে সশব্দে প্রতিবাদ।

ঘুঙরী ছেলেকে বাপের কোল থেকে তুলে নিতে নিতে বলে, বাপ হয়েছ, লেড়কা সামলাতে পারো না?

অম্‌রু বলে, তোমরা সব জাদু জানো। হাত ছোঁয়ালেই লেড়কা চুপ।

ঘুঙরী মন্তব্য করে, তোমার তেমন লেড়কা কিনা! ওসব আদরফাদর বোঝে না। একটু অসুবিধে হলেই গলা ফাটিয়ে বাড়ি মাথায় করবে।

অম্‌রু বলে, বড় হলে দেখো, বেটা একদম ঠান্ডা হয়ে যাবে।

ঘুঙরী অমনি বলে ওঠে, ওই আশা নিয়ে থাকো। বড় হয়ে কে যে কী চেহারা নেবে, সে কেবল ছোড়্‌লেবালাই (কালী) জানতে পারবে।

জন্মের পনেরো রোজ বাদ অম্‌রুর লেড়কাকে নিয়ে ববরু (পুরীর মতো খাবার) খাওয়ানোর উৎসব হয়ে গিয়েছিল। পারযোত্তম পরের দিন সকালে ভাগনেকে পাশে বসিয়ে সবিস্তারে শোনাচ্ছিল সেই উৎসবের সমারোহের কথা। ঘুঙরী কিন্তু সারারাত আপন মানুষটিকে কাছে পেয়েও উৎসবের ঘটাপটার কোনও কথাই বলেনি। চিরদিনই সে একটু চাপা স্বভাবের মেয়ে। দরিদ্র বাবার কাছে থেকে দারিদ্র্য আর সম্মান দুটোকে পাশাপাশি রেখেই সে চলতে শিখেছিল। তাই কোনও কিছুতেই উচ্ছ্বসিত হবার স্বভাব ছিল না তার।

পারযোত্তম পয়সাওলা মানুষ। সে পাটোয়ারি (মৌজার সরকারি খাজনা আদায়কারী)। তাকে খাতির করে না, তল্লাটে এমন কেউ নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষেত্রি, ঠাকুর—সব্বাই তার কোঠিতে এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে গেছে।

মহাজন উধম সিং একটা সোনেকা মোহর দিয়ে গেছে নবজাতককে।

পারযোত্তম খালি ববরু খাওয়ায়নি নিমন্ত্রিতদের। ভাত, দাল, সবজি, লাড্ডু, জিলাবি—সবকিছু খাইয়েছে পেটভরে। সব্বাই খুশি হয়ে আর্শীবাদ করে গেছে অম্‌রুর লেড়কাকে।

খালি আসেনি একটা লোক। রাগে গর্‌গর্ করতে করতে বলল পারযোত্তম, ওই পুরনো জমিন্‌দারের রাখোরাব (রক্ষিতা) চৌকাভুটা (বিধবার অবৈধ সন্তান)। জমিনদার মরার আগে ওই চৌকাণ্ডুটাকে বহুত রুপেয়া দিয়ে গিয়েছিল। বেটা সব খুইয়ে বসে আছে। ওর মা বেটি

তোর মামি জিন্দা থাকতে বহুত দফে এ বাড়ি এসেছে। তাই শালেকো চৌকান্ডু জেনেও ডাকলাম। মালুম, মাথা কাটা যাবে বলে শালে আসল না।

অম্রু বলল, ঠিক আছে মামা, যার খুশি আসবে, যার খুশি আসবে না। এতে ভাবনার কিছু নেই।

পারযোত্তম অম্রুর সমাধানের ধারকাছ দিয়েও গেল না। সে তখন রাগে ফুঁসছে।

চার-চার বরষ খাজনা বাকি পড়েছে। ও বেটাকে ভিটা থেকে তুলব, তবে আমার নাম পারযোত্তম, হাঁ।

অম্রু কথাটা ঘোরাতে চাইল, মামা, তুমি ধনসুদের (ঢাকি) ডেকেছিলে?

ডাকব না? ওরাই তো বাজনা বাজালরে।

ভাল করে খাইয়েছ তো ওদের?

পারযোত্তম হা হা করে হেসে হাতদুটো ফাঁক করে দেখালেন, এই এ্যাতো। খালি চাউল (ভাত) আর ডাল উড়িয়ে গেল। ভাগ্যিস রুরা ধানের (তৃতীয় শ্রেণীর মোটা ধান) চাউল তৈয়ার ছিল। ফুটিয়ে দেওয়া হল। বললাম, পেট ভর খা।

অম্রু উঠোনে ধানের গাদার দিকে হাত দেখিয়ে বলল, কী ধান মামা?

ওটা হল পরদেশি (উৎকৃষ্ট ধান)। ডাইনে যে গাদা দেখছিস, ওটা মন্থরি (দ্বিতীয় শ্রেণীর ধান)। বাঁয়ে সত্তু, কটারী (মোটা ধান)।

অম্রু বলে, পরদেশি তো সবচেয়ে সেরা জাতের ধান, তাহলে অন্য সব ধানের চাষ না করে খালি পরদেশির চাষ করলেই হয়।

হাসল পারযোত্তম, তুই হলি পহালের (ভেড়-বক্রি চরায় যারা) বেটা পহাল। তুই চাষের কী বুঝবি?

একটু থেমে বলল, ওই মোটা ধানগুলোর ফলন বেশি। ওগুলো ওজনে ভারী। কাজের লোকেরা ওই চাউল খেলে বহুত সময় পেটভরা থাকবে। আর ওই ভাল চাউল রান্না করে খাওয়াও, হালকা পেটে বেটাদের খালি ভুখ্ লাগবে। কামকাজে একদম মন লাগবে না।

অম্রু সব শুনে বলল, আমার পহালগিরিই ভাল মামা। এতসব ভাবনার কিছু নেই।

পারযোত্তম উদাসীন গলায় বলল, এতসব তাহলে কার জন্য করছি বেটা। শেষমেষ তোকেই তো এসব বুঝে নিতে হবে।

মামার কথায় দুঃখের আঁচ পেয়ে অম্রু ওই প্রসঙ্গে ইতি টেনে দেবার জন্য বলল, যতদিন জিন্দা আছ ততদিন তো দেখো। তারপর একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

সকালে নোহরি (হালকা প্রাতঃরাশ) সেরে পথে ঘুরতে বেরুল অম্রু। আজ দুমসারামই তার ভেড়-বর্করি আগলাবে, সে শুধু ঘুরে বেড়াবে তার পরিচিত পথে।

কোঠি থেকে বেরিয়েই সে পা চালাল অনন্তরামের ডেরার দিকে। মামা যতই গালমন্দ করুক, অনন্তরামকে সে ছেলেবেলা থেকেই চেনে। কত খেলকুদ করেছে একসঙ্গে। রোজ মহল্লার ছেলেদের নিয়ে ওরা লুকলুকানি (লুকোচুরি) খেলত। ছোটবেলা ওই খেলাটা একেবারে মাতিয়ে তুলত ওদের।

অনন্তরাম ঘরে আছ?

দু'-চারবার হাঁকডাকের পর বেরিয়ে এল অনন্তরাম।

এতখানি জীর্ণ হয়ে পড়েছে অনন্তরাম তা জানতে পারেনি অম্‌রু। কতদিন পরে দেখা। ভারী কষ্ট হল অম্‌রুর।

মালিকের মতো শীর্ণ আর শ্রীহীন হয়ে গেছে কোঠিখানা। একপাশের দেয়াল ধসে পড়ার দাখিল।

কাকে চাই?

আরে দোস্ত্, আমাকে চিনতে পারলে না।

অনন্তরামের কোটরে ঢোকা চোখদুটো নিবিষ্ট হল।

অম্‌রু! আও দোস্ত্, আও।

অনন্তরাম নিজেই নেমে এসে অম্‌রুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল তার ঘরের ভেতর।

চারপাইয়ের ওপর বিস্তারা পাতা। অনন্তরাম বিছানার ওপরে খিন্দখানা (পুরনো কাপড়ে তৈরি কাঁথা) একটু টেনেটুনে ঠিকঠাক করে অম্‌রুকে বসাল। পাশেই কাঠের একটা জলচৌকিতে খলনুড়ি, মধুর শিশি আর কবরেজি দাওয়াই রাখা।

অম্‌রু চারপাইয়ের ওপর বসে। তাকে দেখতে লাগল অনন্তরাম।

কী দেখছ দোস্ত?

এক চিলতে হাসির রেখা ফুটে উঠল অনন্তরামের মুখে।

দেখছি চৌদ্দ বরষ আগের দোস্ত অম্‌রুকে।

অম্‌রু অনন্তরামের হাত ধরে টেনে নিজের পাশটিতে বসাল। বলল, পিতাজির সঙ্গে সেই যে চলে গিয়েছিলাম চম্বায় তারপর দু'-এক রোজ এসেছি এখানে। তাই ছেলেবেলার দোস্ত্দের সঙ্গে দেখাই হয়নি।

অনন্তরাম বলল, তোমার পিতাজি জিন্দা নেই শুনেছি।

ঠিকই শুনেছ। তোমার পিতাজির দেহান্ত হয়েছিল শুনেছি, কিন্তু মাতাজি কি জিন্দা আছেন?

হাঁ, তবে এ কোঠিতে নেই। বজ্রেশ্বরী মন্দিরের কাছে পিতাজির একটা কোঠি ছিল। আমার বহিন পিনঝিকে ওটা শাদিতে যৌতুক দিয়েছিল। সেখানে মা আছে। রোজ মন্দিরে বজ্রেশ্বরী দর্শন হচ্ছে।

একটা বছর পাঁচেকের ছোট্ট মেয়ে ভেতরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অনন্তরামকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল।

অম্‌রু বলল, তোমার লেড়কি?

হেসে মাথা নাড়ল অনন্তরাম।

অম্‌রু উঠে গিয়ে অনন্তরামের মেয়েটিকে ধরতে যেতেই সে খিলখিল শব্দে হাসি ছড়িয়ে ছুটে পালাল।

অনন্তরাম বলল, বসো, আসছি।

কিছুক্ষণ পরে একটা ছোট মাজা থালায় অনন্তরামের মেয়েটি চারখানা পুরী আর একটা মেঠাই নিয়ে টুক্‌টুক্ করে পা ফেলে ফেলে এল। পেছনে অনন্তরামের হাতে জলের গেলাস।

হাত কাঁপছে দেখো, তবু চাচাজির জন্যে নিজের হাতে খাবার আনবে।

অম্‌রু হাত থেকে থালাখানা ধরে নিয়ে মেঠাইটা ভেঙে অনন্তরামের মেয়ের মুখে পুরে দিতে গেল। ঠিক তেমনি হাসি ছড়িয়ে অন্দরের দিকে ছুট লাগাল মেয়েটি।

আবার গুটি গুটি পায়ে ঘরে ঢুকল আর একখানা থালা নিয়ে। এ থালাখানা অনন্তরামের।

এবার মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করল অম্‌রু। অনেক সাধ্য সাধনা করে মেঠাইয়ের ভাঙা অংশটুকু খাওয়াতে পারল।

মেয়েটিকে কোলে নেওয়ামাত্র অম্‌রুর বুকের ভেতর স্নেহ উথলে উঠল।

দু' বন্ধুতে গল্প হল অনেক। বেশিটা ছেলেবেলার গল্প। হারানো দিনগুলোকে যেন তারা ফিরে ফিরে পেতে লাগল।

দাতিয়ালুর (মধ্যাহ্ন ভোজ) সময় না হওয়া অব্দি দু'দোস্ত্ বসে বসে খালি গল্পই করে গেল। মাঝে মাঝে নতুন অতিথিকে পাক দিয়ে আপন মনে ঘুরে যেতে লাগল অনন্তরামের কচি মেয়েটি।

ফিরে আসার সময় অম্‌রুকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে কোঠির ভেতর ঢুকে গেল অনন্তরাম। কিছু পরে বেরিয়ে এসে বলল, চলো, তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিই।

কিছু পথ এসে একটা পাঙাড় গাছের নীচে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অনন্তরাম। অম্‌রুর হাতখানা ধরে বলল, তোমার বেটার মঙ্গল অনুষ্ঠানে যেতে পারিনি, দোস্ত্। তুমি তার চাচির এই সামান্য আশীর্বাদটুকু নিয়ে গেলে বহুত খুশি হব।

একটা রঙিন কাপড়ের টুকরায় বাঁধা কোনও একটা জিনিস অম্‌রুর হাতে ধরিয়ে দিল অনন্তরাম।

অম্‌রু বলল, কিন্তু তুমি আপনা হাতে দিলে পারতে দোস্ত।

ম্লান হাসি অনন্তরামের মুখে। বলল, দিন ফিরলে নিশ্চয়ই একদিন যাব তোমার বাহাদুর লেড়কাকে দেখতে।

অম্‌রু অনন্তরামের সাংসারিক দুঃখ দুর্দশাকে আর খুঁচিয়ে জানতে চাইল না।

কোঠিতে ফিরে পারষোত্তমকে কিছু বলল না অম্‌রু। মামাজী বেরিয়ে গেলে ঘুঙরীকে ডেকে বলল, আমি অনন্তরামের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

মামাজি জানলে বহুৎ গুস্‌সা কববে।

মামজি জানে না, জানবেও না। আরে এই নাও, তোমার লেড়কার জন্যে অনন্তরামের বহু কী একটা বেঁধে দিয়েছে।

ঘুঙরী অম্‌রুর সামনে রঙিন কাপড়ের গিঁটটা খুলে ফেলতেই একজোড়া পাঞ্জেব (মল) বেরিয়ে পড়ল। কচি পায়ের চাঁদির পাঞ্জেব।

ঘুঙরীর চোখে বিস্ময়। বলল, বহুত দামি চিজ তোমার ভাবী পাঠিয়েছে।

অম্‌রুর মুখে তখন কথা সরছিল না। তার মনের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। এইমাত্র সে এই পাঞ্জেব জোড়াটি অনন্তরামের কচি মেয়েটিকে পরে ঘুরতে দেখেছিল। সে ঘুঙরীকে কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়ল।

দিনভর অম্‌রু কেবল ওই পাঞ্জেব জোড়ার কথাই ভেবেছে। আহা, কচি মেয়েটার পা থেকে খুলে নিয়ে তার হাতে সেটা তুলে দিতে অনন্তরামের হাত একটুও কাঁপল না। অনন্তরামের বহুরও নিশ্চয় যোগ ছিল সে ব্যাপারে।

একবার অম্রুর মনে হল, সে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে ওই পাঞ্জেব। আবার ভাবল, ওটা ফিরিয়ে না দিয়ে দামি কোনও জিনিস ওর মেয়েকে দিয়ে আসবে। কিন্তু শেষ অব্দি দুটোর কোনওটা করতেই তার মন চাইল না। অনন্তরামের এত বড় দান তাহলে ছোট হয়ে যাবে।

অমরু পরে অনেকের মুখেই শুনেছে, অনন্তরাম সবার বিপদে বুক দিয়ে পড়তে গিয়েই নিজের সবকিছু খুইয়েছে। তবে জমিদারের রক্ত আছে গায়ে, তাই কষ্টের ভেতরেও কারু কাছে শির ঝোঁকায়নি।

সারা শীত ভেড় বক্‌রিগুলো ঘাস পায় না। বিল, কাংগু কেম্বল, খইর গাছের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। দুম্‌সারাম কখনও পাতাপত্র সমেত গাছের ডাল ভেঙে আনে। ওরির (ভেড় বক্‌রির আস্তানা) সামনে ফেলে দিলে ভেড় বক্‌রিগুলো হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসে খেতে। বক্‌রিগুলো ঠেলেঠুলে হাঁই হাঁই করে খায়। দুম্‌সারাম ভেড় আর বক্‌রিকে দু'দলে ভাগ করে দেয়। বুড়ো মানুষ গোদাগুলোকে ঠেলে সরাতে হিমসিম খেয়ে যায়।

দূরে কাছে পাহাড়ে বরফ পড়ে। হিম শীতল হাওয়া তেড়ে তেড়ে আসে। কোঠির ভেতর চিড় চিড় শব্দে কাঠ পোড়ে। ঘুঙরী আগুনে হাতটা সেঁকে নিয়ে বাচ্চার গায়ে গরম হাতখানা বুলোতে থাকে। পারষোত্তম খাজনা আদায়ের অথবা জমি জায়গা তদারকির কাজে বেরুলে অম্‌রু রসুইখানাতে ঘুঙরীর পাশে এসে বসে। বাচ্চার গালে আলতো করে টুস্‌কি দেয়। মেরা লাল, মেরা লাল বলে আদর জানায়।

ঘুঙরী বলে, তোমার বেটা ভেড়কে বহুত পেয়ার করবে।

কী করে বুঝলে?

দুম্‌সারামের ঠেলা খেয়ে একটা ভেড় শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। অমনি গর্দান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটাকে বহুত সময় দেখল।

অম্‌রু খুশি হয়ে বলল, সাবাস, সাবাস, বাপকা বেটা।

সারা শীতকাল কাংড়াতে রইল অম্‌রু। মামাজির গমের খেত শীতের বৃষ্টিতে ঝলমল করে উঠল। সরশোনের হলুদ ক্ষেত পথচারীর চোখ কেড়ে নিল।

এ সময় পারষোত্তম নিজের খেত তদারকি করে বেড়াল। অম্‌রুকে মাঝেমাঝে টেনে নিয়ে গেল সঙ্গে।

দেখ বেটা, গেঁহু কি রকম ফলেছে।

হাঁ মামাজি।

হঠাৎ পারষোত্তম হয়তো হেঁকে উঠল, হাঁরে হাণ্ডু, সকাল থেকে খালি ছিলম (কলকে) টেনে যাচ্ছিস? সারা খেতে আলু বসিয়ে তবে খানা খেতে আসবি।

হাণ্ডুর হাত থেকে ছিলমটা খেতের মাঝেই ছিটকে পড়ল। সে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, জি হুজুর।

হাণ্ডু শীতের কামড়ে না পারষোত্তমের ধমক খেয়ে কেঁপে উঠল তা বোঝা গেল না।

অম্‌রুর বড় কষ্ট হয় এদের জন্য। এরা বাপ ঠাকুদ্দার আমল থেকে মালিকের জমিতে বেগার খাটে পেট ভাতায়। বিয়ে করে এরা নতুন বউকে ঝাঁপানে চড়িয়ে আনতে পারবে না। পায়ে হাঁটিয়ে আনতে হবে। সোনার কোনও গয়না আদপেই পরা চলবে না। বড় জাতের ব্যবহার করা পানিহার থেকে কখনও ভুলে জল তুলতে গেলে কঠিন সাজা পেতে হবে।

মামার খেতির কাজকাম দেখে একাই ফিরে এল অম্‌রু। উঠোনে একরাশ ভেড়ার লোম টাঁই করা। কোক্‌ড়িতে (তক্‌লি) পশমি কাত্‌না (সুতো, উল) পাকাচ্ছে ঘুঙরী।

অম্‌রু পাশে এসে দাঁড়াল। ঘুঙরীর কোক্‌ড়ি সমানে ঘুরে চলেছে।

অম্‌রু বলল, মনে হচ্ছে চম্বিয়াল (চম্বার ব্যবসায়ী) এসে পড়ল বলে। আরও কত পশম পাকিয়ে তুলতে এখনও বাকি?

ঘুঙরী মুখ তুলে বলল, ফাগুনের মাঝামাঝি যে পশম ছাঁটা হয়েছিল, সেটার প্রায় সবটা কাটা হয়ে গেছে। এখন কাতি মাহিনার পশম পাকাচ্ছি। ওপরের পাহাড় থেকে ফিরে এসে ভেড়গুলো প্রচুর লোম দেয় ঠিক, তবে এ সময়ের লোমে ফাগুনের সেই নরম ভাবটা একেবারে নেই। যতটা খাটছি ততটা দাম পাব না।

অম্‌রু অমনি ঘুঙরীকে জড়িয়ে ধরে বলল, কেউ না দিক আমি দেব। দামের সঙ্গে সোনার একখানা দদমালা। মানাবে খাসা।

হঠাৎ ভেতরে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা। অম্‌রুর বাঁধন ছাড়িয়ে পড়ি কি মরি করে অন্দরে ছুটল ঘুঙরী।

ফি বরষ পারযোত্তমের কোঠিতে জমজমাট লোড়ির (শীতে দারুন পানের উৎসব) আসর বসে। শীতের এই লোড়ি উৎসবে মহল্লার প্রায় সবাইয়ের ডাক পড়ে। মেয়েরাও বাদ যায় না।

ঘুঙরী এবার লোড়ির জন্যে দারু তৈরি করে রেখেছে। কোদোর (জংলি ধান) রুটিতে ঢালি (একরকম তরল পদার্থ) ঢেলে মাটির বড় কয়েকটা পাত্রে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল সে। এখন সেই তৈরি মদের নিমন্ত্রণে ভিড় করে এসেছে সবাই। পুরুষরা বসেছে বাইরের দালানে। মেয়েরা অন্দরে ঘুঙরীর ঘরে। দারু আর খাবার বাইরে দিয়ে আসছে দুম্‌সারাম।

গণ্যমান্যদের সঙ্গে পারযোত্তম পানের আসর জমিয়ে বসেছে। গলা ফাটিয়ে হাসি আর পুরনো দিনের ঠাট্টা-মশকরা চলছে মুরুব্বিদের মধ্যে। অম্‌রু বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড়ালে বসে পানে মেতেছে। বন্ধুরা তারিফ করছে তার বউয়ের হাতের তৈরি মদের। খাচ্ছে আর একটানা তারিফ করেই চলেছে।

ভেতরে মেয়েরা খাচ্ছে। নিজের হাতে ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে ঘুঙরী। মেয়েরা গান জুড়েছে। বড় দুঃখের গান। আপনা আদমি কাছ ছাড়া হলে তার জন্য প্রাণের আকুল কান্না।

নদী রে কট্‌লা মন্‌রো তত্‌রু চীযে
জীনা রে রুখো সজনো
তীনে গি জীব্‌না বোলো কিসে।

নদীর ধারে থেকেও তিতির পাখি পিপাসায় কাতর হয়ে থাকে। বলো, একজন নারী তার প্রিয়তমের কাছ থেকে এত দূরে থাকলে তার অবস্থাটা কী রকম হয়।

এবার একদল প্রশ্নের ভঙ্গিতে গেয়ে উঠল ঃ

কুথুঁ তে উম্‌দি কালি বাদ্‌লি
কুথুঁ তে বরষিয়া থাণ্ডা নীর।

বলো, বলো, কোথা থেকে আসে কালো মেঘ, আর কোথা থেকেই বা নামে বৃষ্টি?

অন্যদল উত্তর দিল গানে ঃ

দিলাঁ তে উম্‌দি কালি বাদ্‌লি
নৈনা তে বর্‌ষিয়া থাণ্ডা নীর।

হে আমার প্রিয়, ওই কালো মেঘ উঠে আসে আমার বুকের ভেতর থেকে। আর বর্ষার ধারা নেমে আসে আমার এই দুটি চোখ বেয়ে।

অনেক রাত অব্দি লোড়ির হইহল্লা চলল। এবার আর অনন্তরামকে নিমন্ত্রণ করেনি পারষোত্তম। খাওয়াদাওয়া চুকলে মহল্লার সবাই বিদায় নিল। পরস্পর হাত ধরাধরি করে নিজেদের সামলে সুমলে বাড়ির পথে রওনা দিল।

অম্‌রু বহুকে বলল, তোমার হাতে তৈরি দারু আর খাবার আমাকে দিলে আমি চুপি চুপি অনন্তরামের কোঠিতে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।

ঘুঙরী অমনি বাধা দিয়ে বলল, তুমি খেপেছ। অনন্তরামজি জানে তাকে লোড়িতে ডাকা হয়নি, এখন দারু নিয়ে গেলে মানী লোকের মানে লাগবে না?

অম্‌রু নিরস্ত হল। সে মনে মনে স্বীকার করল, তার চেয়ে ঘুঙরীর বিবেচনাবোধ অনেক বেশি।

এদিকে পেছনের দরজা খুলে কোথায় যেন বেরুল ঘুঙরী। অম্‌রু উঁকি দিল। আরে, এ যে খিড়কিতে কটা আদমি হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে আছে। ছেঁড়া পাট্‌টুতে (কম্বল) গা আর মাথাগুলো ঢাকা।

ঘুঙরীর হাতের আলোতে অম্‌রু চিনতে পারল ওদের। অচ্ছুৎদের পাড়ার ক'টা লোক লোড়ির খবর পেয়ে মামাজির চোখ এড়িয়ে ওরির (ভেড়বক্‌রির আস্তানা) ধারে সিঁধিয়ে বসেছে।

গোপন জায়গাটা নিশ্চয়ই ঘুঙরী ওদের এক সময় দেখিয়ে দিয়ে গেছে।

মাটির হাঁড়িতে মদ আর খাবার এনে লোকগুলোর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল ঘুঙরী।

আড়াল থেরে অম্‌রু দেখল, কৃতজ্ঞতায় ভেঙে পড়েছে লোকগুলো।

বসন্ত এল ফুলের বাহার নিয়ে। গাছের ডালগুলো ভরে গেল সাদা আর গোলাপি রঙের ফুলে। হাওয়ায় শীতের ধার নেই, শুধু আমেজ। কোয়েল, তোতা (টিয়ে) চটিপিন্‌ঝা (বুলবুলের মতো ঝুঁটিওয়ালা পাখি) গাছের ডালে ডালে আসর জমাল।

পারষোত্তমের পাঁচিলের ধারে তগ্‌গর ফুলের (সুগন্ধ সাদা ফুল) গাছ থেকে ভুরভুরিয়ে গন্ধ ভেসে আসে। খাটনালুর (চায়ের মতো ঝুপড়ি গাছ, বেলফুলের আকারে সুগন্ধ ফুল) গাছ কুঁড়িতে ভরে যায়। ঘরে পোষা মৌমাছিরা সারাদিন মধু সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যত কাজ তত গুনগুনিয়ে গান। ফুলের গাছগুলো সাদা ফুলের থোকায় সাজিয়ে তোলে নিজেদের।

গমের খেত এখন তৈরি। পাকা ফসল ঘরে তোলার জন্য খেতে নেমে পড়েছে কৃষকরা।

সারা শীতকাল বুন্‌নায় (তাঁত) গরম দু'খানা পাট্‌টু (কম্বল) তৈরি করেছে ঘুঙরী। পাঙ্গীর চারণে যাবার সময় সে অম্‌রুকে ওই দু'খানা দিতে চায়।

ক'দিন মুখের কথা কমে এসেছে। এতটুকু বাচ্চাকে নিয়ে মামাজি ঘুঙরীকে চারণে কিছুতেই যেতে দেবে না। অম্‌রুরও মনের কথা তাই। তবে নিজের মনের ভাবটি মুখ ফুটে বলেনি ঘুঙরীকে। তাহলে তার ওপর মান করে ফুলে ফুলে কাঁদবে ঘুঙরী।

শিবরাত্রির পুজো শেষ হল। এখন গদ্দীরা ভেড়বক্‌রি নিয়ে ধৌলাধারের ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে উঠবে। তারপর এক সময় গাছপালার সীমারেখা ছাড়িয়ে জোৎ (পাশ) পেরিয়ে চলে যাবে পাঙ্গী, লাহুল, স্পিতি উপত্যকার দিকে।

ঘুঙরী আর বাচ্চাটাকে ছেড়ে যেতে মন কেমন করছিল অম্‌রুর। তউন্দি (গ্রীষ্ম) আর বরসাত্ (বর্ষা) কাটিয়ে সেই ভাদোনে (ভাদ্র) ফেরা। এদিকে চারণে যাবার জন্য ছটফট করছিল দুটো পা। গদ্দী পহাল বন চিরে, নদীনালা পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে চলতে পারলেই খুশি।

হেলা হুঁই, হেলা হুঁই, কেরি, কেরি, কেরিগা। চল, চল এগিয়ে চল। সিঙ্ঘ্ (চলার সংকেত বাঁশি) বেজে উঠল। কুত্তরের পাহারায় এগিয়ে চলল বাহিনী। একটি দুটি নয়, দলের পর দল।

পারষোত্তম অম্‌রুকে তার দলে বাওয়াল (ভাড়া করা মেষচারক) নিতে বলেছিল। অম্‌রু মামার কথা শোনেনি। শ'খানেক ভেড় বক্‌রি, এতে আবার বাওয়ালের কী দরকার। সে নিজেই মালিক, নিজেই পহাল আবার নিজেই বাওয়াল।

বনের পথে চলতে গাছের কাঁটা ফুটে যায় ভেড়-বক্‌রির পায়ে। খুঁড়িয়ে চললেই ধরা পড়ে যায় অম্‌রুর চোখে। তখন কোলের ওপর শুইয়ে কাঁটা তোলার পর্ব। ভ্যা ভ্যা, ব্যা ব্যা করে কান্না জুড়ে দেবে। ছটফট করতে গেলেই চাপড় খেতে হবে অম্‌রুর হাতের। তখন আর ছটফটানি নয় শুধু গলা ফাটিয়ে কান্না।

কাঁটা বের করে দিয়ে অম্‌রু জানোয়ারটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলবে, হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলবি তো। আচ্ছা, তুই যে এমন করে চেঁচালি, ঠিক বল তো লেগেছে তোর?

কোল থেকে ঠেলে দিয়ে বলবে, এখন চলে দেখ, কত আরাম।

আরে কী হল তোর গলায়!

অম্‌রু ছুটে যায় একটা মাদি ভেড়ার দিকে। কিন্তু সহজে কি সে দেখাবে তার গলা। এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। শেষে ধরা পড়ে চেঁচিয়ে মাত করতে চায়। এদিকে গলা ফোটে না।

অম্‌রু গলা টিপে টুপে দেখে। না, এ তো গলঘটু (গলা ফুলে যায় যে রোগে) নয়। আরে এই তো পায়ে ঘা হয়েছে।

মুখখানা ফাঁক করে দেখে বলে, এই তো মুখেও ঘা। লাল লাল, ছড়া ছড়া। খড়েরু (মুখে পায়ে ঘা) বাঁধিয়ে বসে আছিস, তাই ঘাসপাতায় রুচি নেই।

ঠেলতে ঠেলতে তাকে দল থেকে নিজের জায়গায় নিয়ে আসে অম্‌রু। দড়ি দিয়ে একডেলা পাথরের সঙ্গে বেঁধে রেখে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

নানান গাছ টুঁড়ে টুঁড়ে শেষ পর্যন্ত বর্ণঁ (ত্রিপত্রের গাছ। বেলপাতার মত পাতা) গাছটি পাওয়া যায়। বেশ কয়েকটা পাতা তুলতে তুলতে চলতি একটা লোক-বচন আউড়ায় ঃ

জিত্ বর্ণঁ, বসুঁটি, বরেঁ
তিত্ মানু্ কিআঁ মরে।

যেখানে বর্ণঁ, বসুঁটি আর বরঁগাছ রয়েছে, সেখানে মানুষ আবার মরে কেন?

এখন ফিরে এসে পাথরের ওপর পাতাগুলো রেখে আর একখানা পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে থেঁতো করে নেয়। তারপর বেটে নেয় মশলার মতো নরম করে। কিছুটা জলের সঙ্গে খাইয়ে দিয়ে, বাকিটা থক্‌থকে করে পায়ের ঘায়ে লাগিয়ে দিয়ে রোদ্দুরে চেপে ধরে থাকে। ওই

ক্ষতস্থানটা শুকিয়ে গেলে তবে ছেড়ে দেয়। দু'-তিন রোজ এমনি পর পর পরিচর্যায় ঘা শুকিয়ে যায়।

অম্‌রু এবার কী মনে করে তার চারণের পথটা বদলে নিয়েছে। সে সাচ জোৎ পেরিয়ে পাঙ্গী না গিয়ে ভারমৌর হয়ে কুগ্‌তি গিরিপথে যাবে নতুন চারণভূমির দিকে। নতুন জায়গা আর নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে তার।

অম্‌রু তউন্দিতে (গ্রীষ্মে) ধরমশালা থেকে গজ জোৎ পেরিয়ে চৌলাধারে এল। এখানে ভেড় বক্‌রির দলটি ব্রোড় গাছের পাতা খেল পেটভরে। এরপর ঘাটোর, উরেই গ্রাঁ পেরিয়ে খাড়ামুখ ছুঁয়ে এল ভারমৌর গ্রাঁতে। পুরনো দিনের একটি মন্দির ঘিরে ভেড়বক্‌রি নিয়ে রাতের মতো গোঠ বানাল।

আঁধার রাত। মণিমহেশের দিক থেকে বয়ে আসছে ঠান্ডা হাওয়া। কাঠের আগুনে গা-হাত সেঁকে নিচ্ছে অম্‌রু। চিড়্‌চিড়্‌ করে কাঠ পুড়ছে। আগুন জ্বলছে ধিক্‌ ধিক্‌ করে।

সামনে একটি পহাল এসে দাঁড়াল। অম্‌রু খাতির করে পাশে বসাল তাকে।

তামাক সেজে ছিলমটা (কলকে) নারেলির (হুঁকো) ওপর বসিয়ে নতুন অতিথির দিকে বাড়িয়ে দিল। এটাই এদের রীতি।

অম্‌রু বলল, গোঠ করেছ কোথায়?

তোমার ডানদিকে খাসরু গাছের তলায়। দেখলাম, আগুন জ্বেলেছ তুমি, আলাপ করতে এলাম।

এ পথে ভেড়বক্‌রি নিয়ে এই প্রথম আসছি। তবে ভারমৌর আমার অচেনা নয়। তুমি কোথাকার বাসিন্দে?

কিছু দূরে লাল গ্রাঁ। ওখানেই আমার বাপকেলে কোঠি। চারণের পথে মণিমহেশের মন্দিরে পুজো দিয়ে যাব, এই ইচ্ছে।

হু হু করে উঠল অম্‌রুর বুকখানা। যে ক্ষত শুকিয়ে গিয়েছিল, সেটা হঠাৎ খোঁচা লেগে দগ্‌দগে হয়ে উঠল।

হোলি গ্রাঁতে ছিল ধান্‌নির বাপেরবাড়ি আর লাল গ্রাঁতে তার বিয়ে হবার খবর পেয়েছিল সে। আজ তাই মানুষটার মুখে লাল গ্রাঁয়ের নাম শুনে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

মুখে বলল, তা বেশ। কী নাম ভাই তোমার?

দয়াল আমার পোশাকি নাম। সবাই ডাকে ঘাটারি বলে।

ঘাটারি, সে তো শালিক পাখি!

দয়াল মানুষটি হাসিখুশি আর বেশ সরল। বলল, ছেলেবেলা ওই ঘাটারি পাখির মতো বড় কিচির মিচির করতাম। তাই ওই ঘাটারি নামটা কেউ সেঁটে দিল গায়ে। সেটা আর ঘষে তোলা যায়নি।

ধান্‌নি ফিরে এল অম্‌রুর মনে। লাল গ্রাঁয়ের এই সহজ সরল মানুষটিকে বোধ করি কিছু জিজ্ঞেস করা যায়। হয়তো ভাববে না কিছুই।

এক সময় মনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলে সে বলল, আচ্ছা ধান্‌নি বলে কোনও মেয়েকে তুমি চেনো?

ঘাটারি বেশ জোরের সঙ্গে বলল, চিনব না! সে যে আমাদের ভাবীজি। আমাদের জ্ঞাতি ভাই নরসিংয়ের সঙ্গে শাদি হয়েছিল।

'শাদি হয়েছিল!' কথাটায় খটকা লাগল অম্‌রুর। বলল, কেমন আছে ওরা সবাই? আচ্ছা খবর তো?

আর থাকা। কেন, তুমি কি কিছু জান না?

আমি ওর বাপের বাড়ির কাছেপিঠে এক সময় থাকতাম। বহুত রোজ ও তল্লাট ছেড়েছি।

আরে কী দুঃখের কথা, অমন পার্বতীর মতন রূপ, তার কিনা এক বরষও কাটল না, বিধবা হয়ে গেল।

সে কী! কী হল ওর আদমির?

কী আবার হবে, তোমার আমার কপালে দোস্ত্ যে মরণ লিখা আছে তাই হল তার। হেন্ট্ (তুষারপিণ্ড) নেমে এল হঠাৎ পুরো দলটার ওপর। চাপা পড়ে গেল সব।

গভীর দুঃখে কতক্ষণ কথা বলতে পারল না অম্‌রু। একসময় কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, ধান্‌নি এখন কোথায়?

ভাবীজি এখন হোলি গ্রাঁয়ে তার পিতাজির কোঠিতে রয়েছে। সাচ্ বাত বলব, এমন বহুর সাথে বনল না তার শাসের (শাশুড়ি)।

আর কোনও কথা জিজ্ঞেস করার মতো মনের অবস্থা ছিল না অম্‌রুর। সে আগুনের ধারে বসে কতক্ষণ শুধু অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল।

নারেলি টেনে উঠে দাঁড়াল ঘাটারি। বলল, যাচ্ছি দোস্ত্। তুমি খানাপিনা সেরে নিদ যাও। কাল তড়কায় (ঊষাকালে) একসাথ যাওয়া যাবে।

অম্‌রুর ঘোর কাটল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে তুমি অম্‌রু বলে ডাকবে, আমিও তোমার নাম ধরে ডাকব। এ যাত্রায় আমরা দোস্ত্।

ঘাটারি মজার মানুষ। সে মন্তব্য করল, ঠিক আছে। এ যাত্রায় দোস্ত্, ফিরতি যাত্রায় দুশমন।

পরক্ষণেই অম্‌রুকে জড়িয়ে ধরে হা হা করে হেসে উঠল।

পরের দিন ভোরবেলায় ভেড় বক্‌রি তাড়িয়ে নিয়ে ঘাটারির সঙ্গে চড়াই পথে চলল অম্‌রু। এ সময় বর্ষার ধারার মতো বহু ধারা এসে এক নদীতে মেশে। দলের পর দল চলতে থাকে একই সঙ্গে। প্রবল পাহাড়ি ঝোরার ফেনার মতো সাদা ভেড় বক্‌রির দল স্রোতের মতো চলছে তো চলছেই।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার সময় গগ্‌গল (পাথর ভরতি) রাস্তায় পড়লে পহালরা কেহলুবীরের (যে দেবতা পাহাড়ের ঢালে থাকেন) নাম করছে। বনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় বিশেষ বিশেষ গাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে। অরণ্যের আত্মা বানবীর, রক্ষা করবেন তাদের। গভীর ভক্তিতে দ্রাট্‌খানা (কাস্তে) নিয়ে চলেছে সঙ্গে। ও তো দ্রাট্ নয়, দ্রাটের মূর্তি ধরে সাথ সাথ চলেছেন সাপের রাজা কৈলাং।

গাছের ডালপাতা থেকে ঝরে গেছে বরফ। পথের ওপর থেকেও সরে গেছে। শুধু দূরে কাছে পাহাড়ের ঢালে সাদা ছেঁড়া চাদরের মতো বিছিয়ে আছে। আর বরফ জমে আছে চিরতুষার পর্বতের চূড়ায় চূড়ায়।

অম্‌রুরা কত ঝরনা ডিঙিয়ে, বন পেরিয়ে হাডসার, কুগ্‌তি গ্রাঁ ছুঁয়ে এগিয়ে চলল। ঘাসের জমিনে গোঠ বানাতে বানাতে উঠে গেল অনেক উঁচু বরফে ছাওয়া কুগ্‌তি লাতে (কুগ্‌তি গিরিপথ)। অম্‌রু দেখল সাচ্‌ জোতের চেয়েও এ গিরিপথ অনেক উঁচু। লা পেরিয়ে ল্যাসে (চড়াই, উতরাইয়ের আগে পরের আস্তানা) বিশ্রাম। তারপর একেবারে গিয়ে পৌঁছোল চারণভূমিতে।

নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ তবু চরিত্রে এক। সেই চোখ জুড়োনো ঘাসের জমিন। সেই তুষার পাহাড়। বৃষ্টি নেই। ঝকঝকে দিন। এখন নীচের উপত্যকায় অঝোরে নেমেছে বৃষ্টি। রুহনী চাষে (বীজ থেকে চারা বড় করে, পরে প্লাবিত জমিতে রোপণ করতে হয়) মেতেছে ঘির্‌থ (চাষি) সম্প্রদায়ের মেয়েরা। তারা সমস্বরে গান গাইতে গাইতে রোপণ করছে ধানের চারা। পাশ দিয়ে কেউ গেলেই খিলখিল হাসির সঙ্গে ছিটিয়ে দিচ্ছে ঘোলা জল। গাঁওকি আদমি ছুড়ে দিচ্ছে দু'-চারটে সরল মন্তব্য।

নালা, কুহল, ছুই উপছে উঠল জলে। একবার মেঘের ডাক, গুড়কানার (বাজ) আওয়াজ উঠলে পাহাড়ে কতক্ষণ সেটা ঘুরে ঘুরে বাজছে।

ছোটবেলায় মামার কাছে যখন ছিল তখন ধরমশালায় এই বারিষের দিনগুলো অম্‌রুর কী যে ভাল লাগত! এখন তউন্দি (গ্রীষ্ম) আর বরসাতে (বর্ষাকাল) তাকে চলে আসতে হয় ভেড়বক্‌রি নিয়ে অনেক উঁচু পাহাড়ে। যেখানে বরসাতে বৃষ্টির ঘনঘটা নেই। আবার ওপরে শীতের তাড়া খেয়ে নামতে হয় নীচে সেই ভাদোন (ভাদ্র), আসুজে (আশ্বিন)। তখন নীচের পাহাড় আর উপত্যকাই ডেকে নেয় তাদের মতো শত শত পহালকে।

আসার মাসের পূর্ণিমায় মেঘশূন্য আকাশের তলায় উৎসবের রং লাগে। নিজের হাতে কাণ্ডা থেকে ঘাস তুলে নিয়ে পহালরা ভেড়-বক্‌রিদের খাওয়ায়। পুজো করে কৃতজ্ঞতা জানায়।

কাঠ পুড়ছে। রান্নার ধোঁয়া উঠছে। কেউ রুটি সেঁকছে, কেউ বা শুধু বার্লি জলে গুলে ভোজন সমাধা করছে। ভেড়-বক্‌রির অঢেল দুধ। চুঁই চুঁই করে দুইয়ে নিচ্ছে, ঢক্‌ঢক্‌ করে খেয়ে ফেলছে।

অম্‌রু খাবার পরে রুবানাতে (বীণার মতো তারযন্ত্র) সুর তুলেছে। খঞ্জরু (বাঁয়ার মতো) বাজাচ্ছে খুরশি গ্রাঁয়ের একটা পহাল। ভারী ভাল তালের হাত ওর। ওস্তাদ অম্‌রুর সঙ্গে সমানে ও বাজিয়ে গেল। রুবানা রেখে বাঁশুরিতে ফুঁ দিল অম্‌রু। অমনি যারা এতক্ষণ আধ শুয়ে অম্‌রুর রুবানা শুনছিল, তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল।

রাতে কখনও অন্ধকার গাঢ় হয়ে নামে, কখনও বা চানানির (চাঁদ) ফিন্‌কি ফোটা আলোয় ভেসে যায়। হু হু করে কনকনে বাতাস বয়ে আসে হিমালয়ের তুষার ছুঁয়ে। ঘাসের বিশাল প্রান্তর শিউরে ওঠে। দু'খানা পাট্টুতে মাথা অব্দি মুড়ে শুয়ে থাকে পহালরা। বেশি ঠান্ডা জাঁকালে ভেড়গুলোর ভেতর ঢুকে পড়ে ঠান্ডাকে ঠেকিয়ে রাখে।

ভোরের সূর্য প্রথমে সিঁদুর পরিয়ে দেয় তুষার পাহাড়ের মাথায়। মুখ থেকে পাট্টু সরিয়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে সিঁদুরের খেলা দেখে পহালরা।

একটু পরেই সোনার চাউঙ্ক (মাথার গয়না) মাথায় পরে, দদমালা (গলার হার) গলায় দুলিয়ে ঝলমল করে ওঠে তুষার পর্বত। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে শির ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানায়। কৈলাস, মণিমহেশ আর মহাদেওকে মনে মনে স্মরণ করে। এর পর শুরু হয় হররোজের কামকাজ।

আসার, শোয়ান, ভাদোন (আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র) উঁচু পাহাড়ে কাটিয়ে পহালরা নামতে থাকে নীচে।

অম্‌রু বলে, ঘাটারি থেকে গেলে হয় না আরও কটা রোজ?

তোমার খুশি আমারও খুশি দোস্ত।

ওরা দু'জনে এত বড় চারণক্ষেত্রে থেকে গেল আরও কয়েকটা দিন।

অম্‌রুর মনে হল সে যেন তামাম এই ভূখণ্ডের বাদশা।

উঁচু পাহাড়ে শীতের হাওয়া বইতে শুরু করল, অমনি ওরা নামতে লাগল নীচে।

ঘাটারিকে বড় ভাল লেগে গিয়েছিল অম্‌রুর। যেমন সহজ তেমনি সরস।

অম্‌রু একদিন বলল, শাদি করনি কেন ঘাটারি?

কী করে মালুম হল আমার শাদি হয়নি? জেনানা শাদি করলে তার চিহ্ন থাকে, মরদানার (পুরুষ) তো কোনও চিহ্ন থাকে না।

অম্‌রু বলে, শাদি আর হাঁচি চেপে রাখা যায় না দোস্ত্। সাড়ে তিন মাহিনার কাছাকাছি আছি, এক রোজও তোমার মুখে তোমার বহুর কথা শুনলাম না।

আরে ভাই আছে?

কোথা?

ঘাটারি বলল, শাদি হয়নি বলে কি আমায় বহু থাকবে না! নিশ্চয় সে কোই না কোই শ্বশুরের কোঠিতে আছে।

এবার অম্‌রু হেসে ঘাটারির পিঠে চাপড় মেরে বলল, আমি তাকে এনে দেব। বাদশাজাদিকে দুনিয়া ঢুঁড়ে আনব।

ঘাটারী কপাল দেখিয়ে বলল, কি ভাগ্য, পহালের কপালে বেহেস্তের হুরি?

নামতে নামতে দু'বন্ধুতে কথা হয়। ক্লান্ত হলেও কোনও পাহাড়ি কুদে (গুহা) পিঠ ঠেকিয়ে বসে দু'জনের দিকে দু'জনে চেয়ে চেয়ে হাসে।

অম্‌রু বলে, একবার ভেড় বক্‌রি নিয়ে স্পিতি যেতে হবে।

ঘাটারি বলে, আমি যেন বাদ না পড়ি দোস্ত্।

আলবাত তুমি যাবে। আমার বহুও যাবে।

ভাবীজি! এত উঁচু পাহাড়ে জেনানার যাবার তো রীতি নেই দোস্ত্।

আমার বহু ওসব কানুন থোড়াই মানে। ও জোয়ান পহালদের পিছু ফেলে পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যায়।

তুমি না বলেছিলে, ভাবীজি খোঁড়া!

অম্‌রু বলে, খোঁড়া তো কী আছে, ও তো শুধু পায়ে হাঁটে না. মনের জোর ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়।

আবার কুগ্‌তি গ্রাঁ। হাড়সার। শেষে ভারমৌরে সেই ভাঙা মন্দির ঘিরে আস্তানা।

পরের দিন দু'জনে আলাদা হয়ে যায়। আবার কোনওদিন দেখা হওয়ার. একসঙ্গে চলার ইচ্ছা প্রকাশ করে তারা।

ঘাটারি চলে গেলে অম্‌রু তার দলবল নিয়ে চলতে শুরু করে। প্রথমে সে সরল উপত্যকায়

যাবে, তারপর নামবে কাংড়ায়। না, সবার আগে সে একবার ঘুরে আসবে হোলি গ্রাঁ থেকে। একপলক ধান্‌নিকে চোখের দেখা দেখে আসবে সে।

যে বাউড়ির (পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসা জলধারা) ধারে একদিন ধান্‌নির সঙ্গে তার দিল নিয়ে খেলা শুরু হয়েছিল, যেখানে সে তার আঁখ থেকে আঁসু ফেলে গিয়েছিল, সেখানে এক সাঁঝবেলা ভেড়বক্‌রি নিয়ে এসে পৌছোল অম্‌রু।

বাউড়ির গায়েই কুদ (গুহা)। রাতের মতো সেখানে ডেরা বানাল সে। টিলার ওপরে সেদিনের সেই প্রি গাছটি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। তার একখানা ডালে আটকে পড়েছে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ। কুদের ভেতর থেকেই দেখা যাচ্ছিল সে দৃশ্য। অম্‌রুর সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, চাঁদটা যেন ধান্‌নির মুখ, আর তার জোছনা ধান্‌নির ঘুন্‌ডি। যে ঘুন্‌ডি একদিন সে ওই প্রি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিল, আর ধান্‌নি বাউড়ির নীচ থেকে ওই চাঁদের মতো মুখখানা তুলে ছুটে এসেছিল তার ঘুন্‌ডিখানা নিতে।

যতক্ষণ চাঁদটা চোখের ভেতর ছিল ততক্ষণ তাকে শুধু দেখে গেল অম্‌রু, আর ফুঁ দিয়ে সুর তুলল তার বাঁশুরিতে। চাঁদ আড়াল হতেই ঠোঁট থেকে বাঁশুরি নামিয়ে আঁখ বুজল সে।

ভোরবেলা উঠে ভেড়বক্‌রি চরিয়ে বেড়াল অম্‌রু। এখানে বাউড়ির জল পেয়ে মলমল করছে সবুজ ঘাস। পুরো দলটা পেটভরে ঘাস, ঝোপঝাড়ের পাতাপত্তর আর বাউড়ির ঠান্ডা জল খেল। অম্‌রু টিলার ওপর উঠে প্রি গাছের তলায় বসে রুবানা বাজাল। গ্রাঁ (গাঁ) থেকে দল বেঁধে এল মেয়েরা। অম্‌রু সরে গেল একটা টোহলের (শিলাখণ্ড) আড়ালে। বন্ধ রইল বাজনা। মেয়েরা পোশাক সাফ করে ঘড়েলুতে (ঘড়া) জল ভরে আবার গ্রাঁয়ের দিকে ফিরে গেল। তাদের মাথায় বসানো পেতলের মাজা ঘড়েলুতে সূর্যের আলো ঝিলিক দিতে লাগল।

অম্‌রু আড়াল থেকে দেখে নিল, মেয়েদের ভেতর ধান্‌নি নেই। মনটা তার ভেঙে গেল। একবার মনে হল হোলি গ্রাঁয়ে ধান্‌নির বাপের বাড়ি ছুটে যায়। দেখা করে আসে ধান্‌নির সঙ্গে । ফের মনে হল, ঠিক হবে না এ কাজ। তার চলে যাবার পরে পাঁচজন হয়তো পাঁচটা কথা বলবে। একজন বিধবার চরিত্রে দোষ লাগবে অকারণে।

ভারধূপ (মধ্যাহ্ন) গড়িয়ে বিকেল এল মরা সোনার আলো মেখে। অম্‌রুর ভেড়বক্‌রির পাল বাউড়ির ধার থেকে এখন সরে গেছে একটা টিলার আড়ালে। অম্‌রু ক্যায়ল (চীর পাইন) বনের ভেতর ঘুরছে আর ভাবছে, এই বনের ও প্রান্তে সেবার শ্যারি উৎসব হয়েছিল। ক্যায়ল গাছের কাণ্ডখানা নিয়ে দু'দলে টানাটানির সময় সে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছিল। অমনি কোথা থেকে সেদিন ছুটে এসেছিল ধান্‌নি। একেবারে অপরিচিত মানুষটাকে নিয়ে কত সেবাই না সে করেছিল।

একটা ক্যায়ল গাছে পাক দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল অম্‌রু। ওই তো টিলার নীচে চরে বেড়াচ্ছে তার ভেড়বক্‌রির পাল। আরে ওখানে কে! বনের বাইরে এসে দাঁড়াল অম্‌রু। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। একটা তিন-চার বছরের ছেলে তার গাভীন ভেড়ের গলা জড়িয়ে আদর করছে। তাদের দু'জনের ওপরেই পশ্চিমের আকাশ থেকে গলে ঝরে পড়ছে সোনার ঝরনার জল।

অম্‌রুর কেন যেন মনে হল, ছেলেটি কোনও মানুষের ঘরের নয়। হিমালয়ের অন্দরে

কন্দরে যেসব দেবতাদের আস্তানা রয়েছে সেখান থেকে কোনও দেবশিশু খেলতে খেলতে চলে এসেছে এখানে।

আশ্চর্য, ওই ভেড়টি কিন্তু শিশুটিকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে না। তার একরাশ কোঁকড়ানো সাদা চুলে গাল ঠেকিয়ে গলা জড়িয়ে খেলছে সেই দেবশিশু। যেন মন্ত্র পড়ে দিয়েছে কোনও জাদুকর। অম্‌রুর চোখে পলক পড়ছে না। সে পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটি মেয়ের গলা বাউড়ির ধার থেকে শোনা গেল। মেয়েটি যেন উৎকণ্ঠায় কাউকে ডাকছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না কথাগুলো।

একসময় মেয়েটি গলা চড়িয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটে এল টিলার এপারে। এখন অম্‌রু দেখতে পাচ্ছে তাকে। মেয়েটি ভেড়টার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিল ছেলেটিকে। ওই ঘাসের জমিনে হাঁটু মুড়ে বসে শিশুটিকে ধমকাতে লাগল। কেঁদে উঠল ছেলেটি। অমনি মেয়েটি তাকে জড়িয়ে ধরে আদরে সোহাগে ভরে দিল। কোলে তুলে নিয়ে ফিরে চলল বাউড়ির দিকে।

এখন মুখোমুখি এগিয়ে আসছে মেয়েটি। টিলার ওপরে একটি পুরুষকে দেখে সে মুখখানা নিচু করে ফেলেছে।

অম্‌রুকে হঠাৎ কে যেন একটা জীয়ন-কাঠি ছুঁইয়ে দিল। সে বরফ থেকে ছাড়া পাওয়া ঝরনার মতো পাথরের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে গেল। একেবারে বাউড়ির ধারে, একেবারে মেয়েটির কাছে।

দু'জনে এবার দু'জনের দিকে চেয়ে রইল, কেউ কোনও কথা বলতে পারল না।

কতক্ষণ পরে ধান্‌নির আঁখ ছাপিয়ে আঁসু গড়াল। সে মাথার ওপর জড়ানো সাদা ঘুন্‌ডিখানা টেনে নিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল।

অম্‌রু এবার কথা বলল, বহুত বহুত রোজ বাদ তোমার সাথে দেখা হল ধান্‌নি, তুমি কথা বলবে না?

ধান্‌নি মাথা নেড়ে জানাল সে কোনও কথাই বলতে পারবে না।

পরক্ষণে স্থির চোখে অম্‌রুর দিকে চেয়ে বলল, এতদিন বাদে তুমি এখানে আসতে পারলে?

অম্‌রু বলল, এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে না ধান্‌নি। তুমি কি দু দণ্ড ওই প্রি গাছের তলায় বসতে পারবে?

এবার ধান্‌নি কোনও উত্তর না দিয়ে টিলার দিকে পা বাড়াল। ধান্‌নির কাছ থেকে শিশুটিকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে পাথর ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে লাগল অম্‌রু।

সেই প্রি গাছ। তার ডালে সেদিনের মতো ধান্‌নির সেই ঘুন্‌ডিখানা ঝুলছিল না। দু'জনে পাশাপাশি বসল। পুরনো দিনের কথা ভেবে আচ্ছন্ন হয়ে রইল কতক্ষণ। শিশুটি অম্‌রুর বাঁশুরি নিয়ে খেলা করতে করতে এক সময় ফেলে দিল। অম্‌রু সেটি কুড়িয়ে নিয়ে ফুঁ দিতেই শিশুটি আবার হাত বাড়িয়ে সেটি নিয়ে নিল। মুখ ঠেকিয়ে বাজাতে চেষ্টা করল। বাজল না।

অম্‌রু বলল, বহুত সুন্দর লেড়্‌কা। তোমার?

ধান্‌নি শুধু মাথা নেড়ে জানাল, ছেলেটি তার।

অম্‌রু বলল, ঘাটারী তোমার কথা সবই বলেছে, কেবল তোমার বেটার কথা বলেনি।

ধান্‌নি চমকে তাকাল অম্‌রুর দিকে। ঘাটারীর মুখে তাহলে তার জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা সব শোনা হয়ে গেছে।

না, আমার বেটার কথা লাল গ্রাঁয়ের কেউ জানে না। আমার আদমির দেহান্ত হবার খবর পেয়ে আমি হোলি গ্রাঁয়ে চলে আসি।

কেন?

ওখানে আমাকে অপয়া বলল। তাই বহুত গুস্সা হল। চলে এলাম। যখন চলে আসি তখন বাচ্চা এসে গেছে।

দু'জনের অনেক আলাপ হল। ধান্নি তার আদমির কথা বার বার বলতে লাগল। শেষে বরফের চাঙড়ের তলায় চাপা পড়ার কথা বলতে গিয়ে আঁখ থেকে আঁসু গড়াল। বুক ভাসল জলে।

এক সময় ঘুন্ডিতে আঁখ মুছে ধান্নি বলল, তুমি শাদি করোনি?

করেছি ধান্নি। একটা খোঁড়া মেয়েকে নিয়ে সংসার পেতেছি। সে খোঁড়া, কিন্তু তুরন্ত কাজ করতে তার জুড়ি নেই।

আর কিছু জানতে চাইল না ধান্নি। উদাস হয়ে গেল।

অম্রু বলল, তুমি কি পিতাজির কোঠিতে জনমভোর কাটিয়ে দেবে, না ফের শাদি করবে?

ধান্নি বলল, শাদির সখ মিটে গেছে আমার। এখন এই লেড়কাই আমার ভরসা। ওকে নিয়ে বাকি জীবনটা পার করে দিতে চাই।

অম্রু ছেলেটির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, একে তুমি নিশ্চয় পহাল বানিয়ে আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরাবে না?

ধান্নি যেন আশমান থেকে পড়ল, কেন! ও পহালের বেটা, পহালের কামকাজ করবে না তো কী করবে! জরুর ভেড়বক্রি চরাবে।

অম্রু ধান্নির মনের জোর দেখে ভারী খুশি হল। সে অমনি বলল, আমি যদি সে সময় জিন্দা থাকি তাহলে তোমার বেটাকে সাথ সাথ নিয়ে ঘুরব।

হঠাৎ অম্রুর হাতখানা টেনে নিয়ে বাচ্চার মাথায় ঠেকিয়ে ধান্নি বলল, এ আমার বেটার বহুত ভাগ্য।

আরও দু'দিন বাউড়ির ধারে ভেড়বক্রি নিয়ে রইল অম্রু। রোজ বেটাকে নিয়ে সেখানে এল ধান্নি। নিজের হাতে রুটি পাকিয়ে, সবজি বানিয়ে খাওয়াল।

ধান্নি সেই বিশেষ হাসিটি হেসে বলল, তোমার বউয়ের রান্নার হাত তো আমি পাব না। তবু খাও। দু'দিন তোমাকে খাইয়ে আর একজন না হয় কিছু তৃপ্তি পেল।

ঘাস ফুরাল, এবার দলবল নিয়ে যেতে হবে অন্য কান্ডায় (চারণ ক্ষেত্র)।

যাবার দিন নিজের সোনার বালাংখানা (বিবাহিতা মেয়েদের নাকের গহনা) অম্রুর হাতে তুলে দিয়ে ধান্নি বলল, এ বালাং তোমার বহুকে মানাবে ভাল। তাকে বলবে, তার এক বহিন বহুত পেয়ার করে এটা দিয়েছে।

অম্রু হাত পেতে বালাংখানা নিয়ে তার বগ্লির (মনিব্যাগ) ভেতর যত্ন করে রেখে দিল। পরে বলল, খেয়াল আছে ধান্নি, পহেলে যে রোজ তোমার শাদি হয়েছে কিনা জানতে চাই, তুমি হেসে নাকের খালি পাটা উঁচিয়ে দেখিয়েছিলে।

ধান্নি মাথা নেড়ে জানাল, সব মনে আছে তার। মুখে বলল, শাদি হলে তবে তো নাকে বালাং উঠবে।

কলেল (সন্ধ্যা) ঘনিয়ে উঠেছিল। ধান্‌নি অম্‌রুর দুটো হাত ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এখুনি গ্রাঁতে ফিরতে হবে। কাল আবার তড়কার (ঊষা) আগেই দল নিয়ে বেরিয়ে যাবে অম্‌রু।

আমি তোমার বেটাকে কিছু দিয়ে যেতে চাই ধান্‌নি।

যো খুশ।

অম্‌রু আসন্ন-প্রসবা ভেড়টাকে নিয়ে এল। বলল, শিগ্‌গির এর বাচ্চা হবে। বাচ্চা নিয়ে দিন ভর খেলকুদ করবে তোমার বেটা। খেলা করতে করতে ভেড়বক্‌রিকে পেয়ার করতে শিখবে। তখন ধীরে ধীরে সাচ্চা পহাল বনে যাবে।

সরল উপত্যকায় নিজের ডেরায় পৌঁছে অম্‌রু হঠাৎ একটা ধাক্কা খেল। তার মনে হল, এই প্রথম সে জীবনে বড় রকমের একটা অন্যায় করল। এ বছর সাচ্‌ জোৎ পেরিয়ে নীচে নেমে চন্দ্রভাগায় সে তার মায়ের ভুজ্যি ভাসাতে পারল না।

দু'দিন সরলে কাটাল সে। কিন্তু এই দু'দিন তার কানের ভেতর মৌমাছির মতো একটি কথা গুনগুন করে ফিরতে লাগল, তুই আমাকে ভুখা রাখলি অম্‌রু, তুই আমার ভুজ্যি ভাসালি না।

তৃতীয় দিনেই অম্‌রু স্থির করে ফেলল, সে তার মায়ের ভুজ্যি চন্দ্রভাগায় ভাসিয়ে আসবে। পথ আর জোৎ বরফে ছেয়ে গেলেও সে তার ভুল শুধরে আসবে। তার মনে গভীর বিশ্বাস, আসা যাওয়ার পথে তাকে রক্ষা করবে তার মা।

সরল থেকে কটি দল নেমে যাচ্ছিল নীচে, কাংড়ায়। তাদের ভেতর পরিচিত একজন যাচ্ছিল ধরমশালায়। অম্‌রু তার সঙ্গে ব্যবস্থা করে পুরো ভেড়বক্‌রির দলটাকে পাঠিয়ে দিল মামা পারষোত্তমের কোঠিতে। বলে দিল, সে পিছু আসছে।

এরপর সাচ্‌ জোতের দিকে পা চালিয়ে চলল অম্‌রু। হাজার হাজার ভেড়বক্‌রি নিয়ে পহালদের সঙ্গে মিলে মিশে যাওয়া আর এই বরফ-ছাওয়া পথ পেরিয়ে একা যাওয়ায় ফারাক আছে বই কী। তবু চলেছে অম্‌রু। মনে তার বল, মায়ের ভুজ্যি সে দিয়ে আসবেই।

ভেড়বক্‌রি সঙ্গে নেই, তার চাররোজের পথ একরোজ লাগল পার হতে। তুষার ঝড় বইল, পর্বতের কুদে (গুহা) সে আশ্রয় পেল। মুখে শুধু প্রার্থনা, মা তোমার খানা নিয়ে চলেছি, তুমি রক্ষা করো।

চন্দ্রভাগার স্রোত যেখানে অম্‌রুর মাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ঠিক সেখানটিতে এসে দাঁড়াল অম্‌রু। কুলহারা (কুঠার) দিয়ে বরফ কেটে সরিয়ে স্রোতের শব্দ শুনতে পেল। ওই তো তার মা কথা বলছে, কীরে বাপ এলি।

অম্‌রু মায়ের আত্মার শান্তির জন্য ভুজ্যি ভাসিয়ে নমস্কার করল। মুখে বলল, মা, আমি কোনওদিনও আর এরকম ভুল করব না।

এবার ফেরার পালা। ক'দিনেই বরফ পড়ে দুর্গম করে তুলেছে পথ। অম্‌রু মায়ের নাম জপ করতে করতে উৎরাইয়ের পথে নেমে চলল। সামনে পড়ল খরস্রোতা নালা। দু'খানা ক্ল্যাঁ গাছের কাণ্ড ফেলে টাংড়ি (সেতু) তৈরি করে রেখেছে জংলাৎ ম্যাক্‌মা (বনবিভাগ)। বরফ পড়ে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। অম্‌রুকে কে যেন বলে দিল, বহুত হুঁশিয়ার হয়ে চলবি বেটা। কোমর থেকে ডোরখানা (ছাগললোমে তৈরি গদ্দীদের ব্যবহারের দড়ি) খুলে নিয়ে আচ্ছা করে টাংড়ির সঙ্গে বেঁধে পার হয়ে যা।

তাই করল অম্রু। ডোরখানা যায় যাক্, প্রাণ তো বাঁচল।

গোয়ারি গ্রাঁতে এসে দেখল, তামাম আদমি নীচে কাংড়ার দিকে নেমে গেছে। প্রতিটি ঘরের দরজায় শেকল তোলা। কাদা দিয়ে লেপেপুছে রেখে গেছে। ফাঁক ফোকর দিয়ে যাতে ইঁদুর ভেতরে ঢুকে তামাম আসবাবপত্র কাটাকুটি না করতে পারে।

পর পর তিসা, নাকরোর, কালহেন পেরিয়ে এল অম্রু, ওই একই ছবি। ছোট ছোট গ্রাঁগুলো ছেড়ে সবাই নেমে গেছে নীচে। এরপর শুরু হয়ে যাবে বরফ পড়া। প্রচণ্ড শীতের কামড়ে নেমে আসবে হিমশীতল মৃত্যু।

সুরঙ্গানি গ্রাঁতে যখন এসে পৌছোল, কলেল (সন্ধ্যা) ঘনাতে তখন বেশি বাকি নেই। রাতের মতো এখানে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই কি পাওয়া যাবে!

অম্রু ঘুরতে লাগল। সব ক'টা কোঠির মালিক দরওয়াজায় শেকল তুলে নেমে গেছে। সে একটা ঘরের শেকল খুলে রাতের মতো ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু আজ্ঞা না পেলে কারু ঘরে ঢোকার নিয়ম নেই। বাইরে ঠান্ডায় মৃত্যু হলেও না।

হঠাৎ এক চিলতে আলো তার চোখে এসে পড়ল। আলো লক্ষ্য করে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। গ্রাঁয়ের শেষ সীমায় পাহাড়ের খাঁজে একটা কোঠি। তার ভেতর কেউ লকড়ি জ্বেলে আগুন ধরিয়েছে।

কোঠিতে কে আছে?—হাঁক পাড়ল অম্রু।

তুমি কে?—কোনও বৃদ্ধের ভাঙা গলা বলে মনে হল।

আমি পহাল, তবে ভেড়বক্রি সঙ্গে নেই। রাতের মতো আশ্রয় মিলবে?

দরওয়াজা ঠেলে অন্দরে চলে এসো। বহুত জায়গা, স্রেফ এক আদমি।

অম্রু ঢুকে পড়ল কোঠির মধ্যে।

মানুষটির গলা শুনে যতটা বয়েস আন্দাজ করা গিয়েছিল তার চেয়েও বেশি বয়েস লোকটির।

অম্রু আগুনের ধারে বসে পড়ল।

লোকটি মাকড়সার জালের মতো রেখা পড়া মুখখানা একটুখানি তুলে প্রশ্ন করল, এতো সময়ে কেউ তো এখানে থাকে না! তুমি হঠাৎ কোথা থেকে?

অম্রু একেবারে সংক্ষেপে তার সুরঙ্গানি গ্রাঁতে ঢুকে পড়ার কারণটা বলে গেল।

বুড়ো সব শুনে কতক্ষণ চেয়ে রইল অম্রুর দিকে। এক সময় বলল, তুমি মায়ের খানা নিয়ে এ সময় সাচ্ জোৎ পেরিয়ে গেলে!

হাঁ জি। ভুল তো আমার। তাই পেরাশ্চিত্তি করলাম।

এবার লোকটি কোনও কথা না বলে মাথা নিচু করে বসে রইল।

কতক্ষণ পরে মুখ তুলে বলল, আমার উমর কত বলতে পারো? চার কুড়ি আট (অষ্টআশি)। আমার এত বয়সে এমন কথা কখনও শুনিনি। মায়ের জন্য এমন অসাধ্যসাধন করতে কাউকে দেখিনি।

অম্রু বলল, অন্য সব গ্রাঁতে সবাই চলে যায়, নয়তো দু'-দশজন থেকে যায়। কিন্তু এখানে তো কাউকে দেখলাম না। একা আপনি কাটাবেন কী করে?

তোমাকে কে বলল আমি একা আছি, আমার সঙ্গে আছে মনের জোর, যা শরীরের তাগদের চেয়ে অনেক দামি।

বৃদ্ধ মানুষটির মনের জোর দেখে অবাক হয়ে গেল অম্‌রু।

লোকটি একটু থেমে আবার বলল, আমার খালি সাহস আছে, আর তোমার ভেতর সাহস, দরদ দুটোই আছে। এই এতটুকু বয়সে দুটো রাখতে পেরেছ, বড় তাজ্জব ব্যাপার। বেটা, কী নাম তোমার?

অম্‌রু।

খাসা নাম। শুদ্ধ কাম।

বৃদ্ধ মনে মনে কতক্ষণ বিড়বিড় করল।

অম্‌রু বলল, আপনার কোঠির সব আদমি কি নীচে নেমে গেছে?

হাঁ বেটা। লেড়কা, বহু, পুতা সব নেমে গেছে। বসন্ত্ আসলে তখন ফিরবে।

বৃদ্ধ চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তাকে কেমন যেন উদাসীন দেখাল।

আরাম করো বেটা। আধা রাতে আর আগ জ্বলবে না।

অম্‌রু জানে, বুড়োবুড়িদের এ সময় বহুত তকলিফ্ পোহাতে হয়। ঘরের জোয়ানগুলো নীচে নেমে যায়। বুড্ঢা বুড্‌ঢি থেকে যায় ওপরে। আড়াই-তিন মাহিনার মতো রসদ আর কিছু জ্বালানি লক্‌ড়ি রেখে যায়।

রাতে বিছানায় যাবার আগে বৃদ্ধ বলল, আমি বার্লি গরম পানিতে গুলে খাব বেটা। তুই রোটি বানিঁয়ে খা। আটা আছে ঘরের ওই কোনায়।

আমার থলেতে সব আছে চাচাজি, আপনাকে কোনও ভাবনা করতে হবে না।

না রে বেটা, তোকে মহাদেও এখানে পাঠিয়েছেন, তুই আমার কোঠিতে যা আছে তাই খাবি। তোকে খাওয়ালে আমার দিলটা ভরবে।

অম্‌রু বলল, আপনার যা আজ্ঞা।

অম্‌রু রুটি বানিয়ে খেল। বৃদ্ধ মানুষটি বার্লি গুলে খেল জলে।

খেতে খেতে অম্‌রু বলল, রোজ আপনি এই খানা খান চাচাজি?

এখনও লহ্‌রিতে (বাড়ির সংলগ্ন বাগান) দু'-চার রকম সবজি পাওয়া যাচ্ছে। কাল তুই তুলে এনে রোটির সঙ্গে সবজিও বানিয়ে নিস।

অম্‌রু বলল, চাচাজি, দালও কিছু রয়েছে আপনার ভাঁড়ারে।

বৃদ্ধ হাত নেড়ে বলল, ওসব আবার কে পাকাবে বল। তুই পাকিয়ে খাস।

অম্‌রু দেখেছে বুড্ঢা আদমির খানাপিনায় লালচ থাকে, কিন্তু এ মানুষটি একেবারে আলাদা। সে বলল, কাল আমার চলে যাবার কথা, তবু আর এক রোজ থাকব আমি আপনার পাশে। আপনা হাতে খানা বানিয়ে আপনাকে খাইয়ে যাব।

তুই থাকলে আমি খুশি হব বেটা, তবে খানাপিনায় আমার লালচ নেই। বড়িয়া খানা খাও আর মক্‌কির দানা খাও, দু-ই সমান। ভুখ্ লাগলে সব খানাই অমৃত। ভুখা আদমি পোড়া রুটি পেলে তার দিল্ ভরে ওঠে, আর রাজবাড়ির খানা খেয়েও রাজার মুখ ব্যাজার হয়ে যায়।

বৃদ্ধ লোকটির কথার ধরণ দেখে অম্‌রুর ভারী ভাল লেগে গেল।

রাতে দেখা গেল বৃদ্ধটি একখানা পাট্টু গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আগ জ্বলল না, সারা রাত ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া বইল।

বিহাগের (সূর্যোদয়) ছোঁয়া লাগল বাইরের উঠোনে। বৃদ্ধ উঠে লহ্‌রির (গৃহ-সংলগ্ন বাগান) দিকে চলে গেল। অম্‌রু দেখল, সামান্য একখানা খিন্দ্ (ছেঁড়া কাপড়ে তৈরি কাঁথা) গায়ে জড়িয়ে প্রায় নব্বুই বছরের মানুষটি সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হেঁটে বেড়াচ্ছে।

অম্‌রু ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। উঠোনে ভোরের রোদ হাসছে। বৃদ্ধ এসে অম্‌রুর পাশে দাঁড়াল।

অম্‌রু বলল, চাচাজি, হিত (শীত) বোধ আপনার বহুত কম।

বৃদ্ধটি ভোরের মিঠে রোদের মতো হেসে বলল, তাহলে এক কাহানি শোন। এক সময় হিমালয়ে তীর্থ করতে গিয়ে এক সাধুকে দেখেছিলাম। বরফের ওপর একদম নাঙ্গা হয়ে শুয়ে আছে। বললাম, সাধুবাবা একখান পাট্টু (কম্বল) দিতে দিল চাইছে।

সাধুবাবা হা হা করে হেসে উঠে বলল, খালি একঠো পাট্টু দিবি? হিমালয়ের মতো উঁচা পাট্টুর পর্বত বানিয়ে দে, তাহলে তার ভেতর ঢুকি।

এবার উঠে বসে বলল, বেটা, বাইরের কোনও জিনিস গরম বা ঠাণ্ডা করে না। দেহটাকে খুশি মতো ঠাণ্ডা গরম রাখে এই মনটা। আমার মনই হিত ঠেকিয়ে রেখেছে, ফালতু তোর পাট্টুখানা নিয়ে কী করব রে বেটা।

সেই থেকে আমিও হিত তাড়িয়ে চলেছি।

অম্‌রু দেখল মানুষটি খাওয়া পরা দুটো ব্যাপারেই নিজেকে শাসন করার হিম্মত রাখে।

এক সময় আগুন জ্বালাতে গিয়ে অম্‌রু দেখল রসুই ঘরে লক্‌ড়ি যা আছে তা দু' হপ্তাও চলবে না। সে এ নিয়ে বৃদ্ধ মানুষটিকে কোনও কথাই বলল না।

দো-পহরের (মধ্যাহ্ন) খানাপিনার পাট চুকলে সে বনের দিকে বেরিয়ে গেল তার কুল্‌হারাখানা নিয়ে।

বনের ডাল পাতায় তুষার পড়েছে। ঠিক যেন সাদা চাদর মুড়ি দিয়েছে গায়ে। এ সময় ওরা গা ঢেকে হাইউন্দের (শীত ঋতু) ঘুমের আয়োজন করে।

অম্‌রু হাঁটু গেড়ে বসল। বনের আত্মা বানবীরকে উদ্দেশ করে বলল, অসময়ে তোমার বিশ্রামের ব্যাখাত ঘটাচ্ছি প্রভু। এক বুড্‌ঢা আদমি, বহুত উমর তার, একা সুরঙ্গানি গ্রাঁ পাহারা দিচ্ছে। দোসরা কোই নেই তার দেখ্‌ভাল করবার। প্রভু, তার লক্‌ড়ির দরকার। কৃপা করে আজ্ঞা দাও, কিছু লক্‌ড়ি নিয়ে যাই।

কথাগুলো বলে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইল সে। কিছু পরে মনের মধ্যে বানবীরের অনুমতি পেয়ে উঠে দাঁড়াল অম্‌রু।

কতকগুলো ডাল কেটে তার থেকে জ্বালানি কাঠ তৈরি করে জড়ো করল। সে কাঠ বয়ে এনে রসুই ঘরের এক কোনায় সাজিয়ে সাজিয়ে রাখল। অম্‌রুর কাণ্ড দেখে হাসতে লাগল চাচাজি। সাবাস বলল না, আবার বারণও করল না।

দিনের পর দিন যায়, অম্‌রু বৃদ্ধের কথা শোনে। এ কথা রোজদিনের ঘরোয়া কথা নয়। এ কথায় বৃদ্ধের উপলব্ধির জাদু মিশে থাকে।

শুনতে শুনতে কতদিন পার হয়ে গেল। তুষার ঝরে উঠোন ভরে উঠল। ঝড়ের হাওয়ায় তামাম চরাচর কাঁপতে লাগল। ইঁদুরগুলো কোনও কোঠিতে ঠাঁই না পেয়ে বুড়োর ঘরে সিঁধোল। কটা চিড়ি পাখি (চড়াই) ঠিক সময়ে নীচের পাহাড়ে নেমে যেতে পারেনি, তারা রয়ে গেল বৃদ্ধ মহেশপ্রসাদের চালার ভেতর।

রোজ বিহাগে আর দো-পহরে মহেশপ্রসাদ সামনের উঠোনে দানা ছড়িয়ে দিতে দিতে পাখিদের ডাক দেয়। চিড়িগুলো কোঠির ভেতর থেকে উড়ে এসে উঠোনে নেচে নেচে দানা খুঁটে খায়।

মহেশপ্রসাদ যেন অতিথিকে পাত পেড়ে খাওয়াচ্ছে। বলে, আর দেব? পেট ভরল?

অম্রু বলে, চাচাজি বহুৎ ঠাণ্ডা, তুমি অন্দরে এসে বসো, ওরা আপনি খেয়ে নেবে।

হাসে মহেশপ্রসাদ। সেই দিল ভরানো হাসি। বলে, পঞ্ছী বলে তার মান নেই? আমি খানার জন্য ডাক যখন দিয়েছি, তখন সে আদমি হোক, জানোয়ার হোক আর পঞ্ছী হোক, সে আমার অতিথি। তাকে খাতির করতে হবে বই কী বেটা।

একদিন কথায় কথায় চাচাজির মুখ থেকে অম্রু শুনল, তার এক জোয়ান লেড়কি হেন্ (হিমশৈল) ভেঙে পড়ে খতম হয়ে গেছে।

অম্রু অমনি প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর আচরণ সম্বন্ধে দুঃখ করতে লাগল।

বুড়ো মহেশপ্রসাদের মুখে কিন্তু শোকের চিহ্ন নেই। সে সহজ গলায় বলল, যে মারে সেই তো বাঁচায় রে। যে বরফের চাঁই আমার লেড়কিকে মারল সে বরফ গলে জল হল। সেই জল, নদী-নালা-কুহল (চাষের জমিতে প্রবাহিত নালা) বয়ে আনল চাষের খেতে। ফসল ফলল, কত মানুষ বাঁচল।

অম্রু এই মহেশপ্রসাদের কাছে তার জানার বাইরে বহুত কথা শিখল।

একসময় হাইউন্দের দাপট কমল। বসন্ত এল হাওয়ায় হাওয়ায়। নীচের থেকে ঝাঁক ঝাঁক পঞ্ছী উড়ে এল সুরঙ্গানির বনে। সাদা, গোলাপি ফুলে ছেয়ে গেল ডাল। মহেশপ্রসাদের কোঠি থেকে চিড়িপাখি ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ে পালাল।

মহেশপ্রসাদ রোদ্দুরে ভরা উঠোনে দাঁড়িয়ে দু' হাত তুলে বলতে লাগল, ফির আসবি। আর কিছু না মিলে, শুখা মক্কির দানা মিলবে।

অম্রু বলল, চাচাজি আমাকে বিদায় দাও। ফির দেখা হবে।

মহেশপ্রসাদ বলল, জরুর দেখা হবে। উমর তো কম হল না। যদি দেহান্ত্ হয়ে যায় তাহলেও দেখা হবে।

অম্রু অবাক হয়ে মহেশপ্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সেই আলোর মতো অনাবিল হাসি।

কেউ মরে না রে বেটা, কেউ মরে না। পহালের এই দেহটা ভেঙে যায়, আর এক পহাল ভেড় চরায়। যে জিন্দা আছে তার ভিতর, যে নেই সে রয়ে গেল।

অম্রু নেমে চলল কাংড়ায়। দিল তার ভরে উঠেছে মহেশপ্রসাদের সঙ্গ পেয়ে। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, বহু বেটার ভাবনা সে উড়িয়ে দিল বসন্তের হাওয়ায়। পথ চলতে চলতে তার মনে হল, সে অম্রু বলে আলাদা কোনও আদমি নয়, সে একটা পহাল। রুবানা বাজিয়ে, বাঁশুরি

বাজিয়ে, হ্যালা হুঁই, হ্যালা হুঁই করতে করতে বনবাদাড় ফুঁড়ে, পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে সে চলেছে তো চলেছেই।

পাঁচ

এমনি করে কোথা দিয়ে পঞ্চাশটা বছর পার হয়ে গেল অম্‌রুর জীবনে। এখন সে বাহাত্তর বছরের বুড়ো। বিশাল এক ভেড়বক্‌রি দলের মালিক। সারাক্ষণ চারটে বাওয়াল আর পাঁচ পাঁচটা কুত্তর রয়েছে তদারকিতে। তবু অম্‌রু আজও শীত ও গ্রীষ্মের চারণে কাংড়া থেকে পাঙ্গী উপত্যকায় চষে বেড়ায়। ছাজু বুড়োর সেই কথাটা বার বার তার কানে বাজতে থাকে, 'ওই যে উনি উমর কত? ওই যে দেহারা (সূর্য) গো। আকাশে যিনি সৃষ্টিকাল থেকে জ্বলছেন আর চলছেন। চলছেন বলেই জিন্দা আছেন, থামলেই মরবেন। যে চলবে সে জিন্দা থাকবে। গদ্দী পহাল জন্মেছে চলার জন্যে।'

অম্‌রু আজও চলেছে। চলায় তার বিরাম নেই। নীল আকাশ, বরফের পাহাড়, সবুজ ঘাসের কাণ্ডা তাকে থামতে দেয় না। প্রতি মুহূর্তে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

কত পরিবর্তন ঘটে গেল তার চার পাশের জগতে। কত বিপর্যয় ঘটল তার সংসারে। কিন্তু অনন্তকাল ধরে ছুটে চলা ইরাবতীর মতো তার জীবনধারা অপরিবর্তনীয় রয়ে গেল।

কতবার ভয়ংকর প্রকৃতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। বিশাল হেন্‌ বা বরফের স্তূপ ধ্বসে পড়ে ধ্বংস করে দিয়েছে তার ভেড় বক্‌রির দল। খড়েরু আর গলঘট্টু রোগে মুখে পায়ে ঘা হয়েছে, গলা ফুলে গেছে। মড়কে মারা পড়েছে শত শত ভেড়বক্‌রি। উঁচু চারণভূমিতে লোভীর মতো অতি পুষ্টিকর নিরু ঘাস খেয়ে পেট ফুলে মরেছে কত। তবু তার এই স্রোতের মতো বয়ে চলা ভেড়বক্‌রির দল ছেড়ে অন্য কোনও ধন বা সম্পদের পেছনে ঘোরেনি অম্‌রু।

এই পঞ্চাশটি বছরে ক্রমাগত পরিবর্তনের ঢেউ তোলপাড় করে তুলেছে সুখী গাদেরানের সহজ জীবনযাত্রা। পাহাড়ের কঠিন দেহ কেটে ধূসর কালো অজগরের মতো নীচের সমতল থেকে পাকে পাকে উঠে এসেছে সরকারি রাস্তা। বিপাশা, ইরাবতীর খরস্রোতকে শাসন করে তৈরি হয়েছে সেতু। গর্জন করতে করতে বহু নীচের জনপদ থেকে সুউচ্চ গাদেরানে উঠে আসছে যন্ত্রযান। লাহুলী, চম্বিয়ালী, পাঙ্গীয়ালীর পিঠের থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে পণ্য-বোঝা। বহু যুগের পদচিহ্ন লাঞ্ছিত লাদাক, তিব্বত, চম্বার পথ মুছে যাচ্ছে নতুন পরিকল্পনায়, নতুন সম্প্রসারণে। নওরাতে, দশেরায় যে সব উল, কম্বলের ব্যবসা চলত তা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে সমতলবাসীদের হাতে। মাণ্ডি, অমৃতসর থেকে সুদ, ক্ষেত্রী ব্যবসায়ীরা সরল পাহাড়ি মানুষদের হাত থেকে কৌশলে হাতিয়ে নিয়েছে ব্যবসায়ের চাবিকাঠি।

শুক্‌রা পাথরের টুকরোয় রুনকা ঘষে যে গদ্দীরা আগুন জ্বালত তাদের হাতে এখন ব্যবসায়ীদের ধরিয়ে দেওয়া দেশলাই। দেহারা আর চানানির আলো যাদের ছিল দিন রাতের বাতি তাদের হাতে এসে পৌঁছেছে টর্চ। সমতলের বাজার গঞ্জের নকল সস্তার গহনায় ছেয়ে গেছে গাদেরান (গদ্দীদের বাসভূমি)। সেই চটকদারী গহনায় গা সাজাতে মেয়েদের আজ সে কী হুড়োহুড়ি!

এখন ভারধূপে দেহারার তেজ আর সহ্য হয় না। ব্যবসায়ীরা ছাতা ধরিয়ে দিয়ে গেছে হাতে। নারেলি আর ছিলমের ব্যবহার কমে আসছে। ছেলে ছোকরার দল ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে ঘুরে বেড়ায়। যে গদ্দীরা বনে পাহাড়ে খালি পায়ে চলতে অভ্যস্ত ছিল তারা এখন নীচের তলায় ব্যবসায়ীদের জোগান দেয়া জুতো পালটাচ্ছে ঘন ঘন।

অম্রু চোখ খোলা রেখে চারদিকের এই পরিবর্তন চেয়ে চেয়ে দেখে।

ছেলেদের জন্য স্কুল করে দিয়েছে সরকার। এখন ভেড়বক্‌রি চরাবার জন্য ছোট ছোট ছেলে পাওয়া মুশকিল। যে ভেড় বক্‌রির পাল লালনপালন করে গদ্দীদের সংসার চলত সুখে এখন সেই পহাল জীবন থেকে অনেকে সরে আসতে চাইছে। এখন সম্মানের কাজ মকাই, গম ফলানো নয়, ভেড়বক্‌রি পালন নয়, ফলের বাগান করা। সমতলের ব্যবসায়ীরা আগাম দাদন দিয়ে যায়। ফল উঠলে নিয়ে যায় গাড়ি বোঝাই করে।

অম্রুর তিন ছেলে এক মেয়ে। মেয়েটিকে সুন্দরী দেখে উঁচু সম্প্রদায়ের লোকেরা বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। অম্রু হাঁকিয়ে দিয়েছে তাদের। বলেছিল, আমার বাপ পহাল, আমিও পহাল। পহালের বেটি পহালনি। পহালের সঙ্গেই সাদি হবে ওর।

মেয়ে টাসি বাপকে বড় ভালবাসে। উজলকে সাদি করে সে ভারী সুখে আছে। উজল বড় একটা সুপুরুষ নয়, তবে বিশ বছরের শরীরটা তার বলিষ্ঠ, সুগঠিত। খুব ছোট একটা ভেড়বক্‌রির পাল রয়েছে তার। তাই নিয়ে টাসি আর উজল বেরিয়ে পড়ে চারণে। তারা কালিছো জোৎ পার হয়ে লাহুল চলে যায়। উজল পথে কোনও কুদে যখন বিশ্রামের জন্য থামে তখন তাকে কোনও কাজ করতে দেয় না টাসি। সে নিজেই পাহাড়ি পথ ধরে চলে যায় বাউড়ির দিকে। জল ভরে আনে চামড়ার থলেতে। আগুন জ্বালে, রুটি আর সবজি বানায়। এ সময় তার খোঁড়া মায়ের মুখখানা বড় বেশি মনে পড়ে। বছর দুয়েক আগে মা মারা গেছে তার। মারা যাবার দিনও বাবাকে রেঁধে খাইয়ে গেছে। শেষ রাতে নীচের পাহাড়ের এক কাণ্ডায় ঘুমের ভেতরেই মারা যায় ঘুঙরী। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অম্রুর কাছ-ছাড়া হয়নি সে।

তিন ছেলেকে নিয়ে কোনও দিনই সুখী হতে পারেনি ঘুঙরী আর অম্রু। সব থেকে ছোট মহান্ত্ বাপ মায়ের আদরের ধন। কিন্তু যন্ত্রণার কারণ ছিল সেইই সবচেয়ে বেশি। একখানা পা তার ছেলেবেলায় গড়িয়ে পড়া পাথরের আঘাতে থেতলে পঙ্গু হয়ে যায় চিরদিনের মতো। অতি সৎ ছেলে মহান্ত্। ধরমশালায় মামা পারষোত্তমের কাছ থেকে পাওয়া বাড়ি আর খেতি এই খোঁড়া ছেলেটিকেই দিয়েছে অম্রু। ছোটবেলায় মহান্ত্ চোখের জল ফেলে বলত, পিতাজি আমি তোমাদের সঙ্গে ভেড়বক্‌রি নিয়ে উড়াান্ধারে যাব। নিরু ঘাসের কাণ্ডায় ভেড় চরাব।

কতভাবে সে সময় প্রবোধ দিতে হত মহান্ত্‌কে। আজ সে বড় হয়েছে। সবকিছু বুঝতে শিখেছে। এমন সুদর্শন ছেলে বড় একটা চোখে পড়ে না। মহল্লার ভারী মিষ্টি মেয়ে কুড়ি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছে মহান্ত্‌কে। রাত দিন সংসারের কাজ আর পঙ্গু স্বামীর সেবা করে তার দিন কাটে।

বেশ লম্বা খেতির এক প্রান্তে একটা তাপ্রি। কাঠের তৈরি, খড়ের ছাউনি দেওয়া। তার ওপর বসে বসে বাবার শেখানো রুবানা আর বাঁশুরি বাজায় মোহান্ত্। আসুজ মাসে যখন মক্‌কির লোভে রীচ বা ভালুক ঢুকে পড়ে খেতে তখন বেদম জোরে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে ভালুক

আর বুনো জন্তু তাড়ায়। ওদের বছর দশেকের একটি ছেলে। ইস্কুলে যায় না। দাদু কবে হাইউন্দের চারণে নীচে নেমে আসবে, রাত দিন বাপ মায়ের কাছে সেই খোঁজ তার। বাপ-মা ছেলের নাম রেখেছে সুখিয়া। অম্‌রু ওকে ডাকে দাব্‌বু বলে। শীতের দিনে ভেড়া নিয়ে নীচে ফেরার সময় অম্‌রু ছোট ছেলের কাছে মাস তিনেক কাটিয়ে যায়। এবারও সে এসেছে। কোঠির পেছনের ওরিতে ভেড়বক্‌রির থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। দাদুর পেছন পেছন জোঁকের মতো লেগে আছে দাব্‌বু। খালি তার একটি কথা, দাদাজি বলো না, তুমি আমাকে কবে তোমার সঙ্গে কাগুায় নিয়ে যাবে।

একটা ছোট্ট কুলহারা তুলে ধরে বলে, আর এই যে কুল্‌হারা দেখছ, লক্কর বাঘাকে কেটে দু'খান করে দেব।

অম্‌রু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার বংশধরকে। মহান্ত্‌ আর কুড়ি পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের কাণ্ড দেখে হাসে।

কুড়ি বলে, পিতাজি, বড্‌ড দুষ্টু হয়েছে আপনার নাতি। ইস্কুল থেকে আবার সেই মাস্টারজি এসেছিলেন ওকে ভরতি করে দেবার কথা বলতে।

অম্‌রু কিছুক্ষণ ছেলে বউয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, আবার এসেছে লোকটা। নিশ্চয় বদ মতলব আছে, ওকে এবার থেকে কোঠিতে ঢুকতে দিয়ো না।

এক বছর আগে যখন এ বাড়ির সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছিল লোকটি তখন অম্‌রু ছেলে বউয়ের কাছেই ছিল। নাতির পড়ার ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছিল অম্‌রুর সঙ্গে।

আপনাদের ছেলেটি ভারী বুদ্ধিমান, ওকে পাঠিয়ে দিন আমার ইস্কুলে।

অম্‌রু বলেছিল ও গদ্দীর ছেলে। ওকে যখন পড়াবেন তখন ভেড়-বক্‌রিদের পড়াবেন তো? নইলে সে বেচারারা যাবে কোথায়?

হো হো করে হেসে উঠেছিল মাস্টারজি।

অম্‌রু আবার বলেছিল, মাস্টারজি বিহানুতারা (ধ্রুবতারা) যে স্থির হয়ে চেয়ে থাকে, সে কি শেখায় বলতে পারেন? জুসমুসা থেকে কলেল অব্দি সারা আকাশটা পেরিয়ে যাবার সময় দেহারা বা সূর্য আমাদের কী কী শিখিয়ে দিয়ে যায়? নালা, কুহল, যখন ছোটে তখন কী বলতে বলতে ছোটে?

মাস্টারজি চুপ করে গিয়েছিল। অম্‌রু ছাড়েনি। আবার প্রশ্ন করেছিল, ভেড়ের তির্‌নি (ট্যাক্স) এখন পাঁচ পয়সা আর বক্‌রির দশ। একই সঙ্গে দুটি প্রাণী চলেছে তবু দু'জনের তির্‌নির এত তফাত কেন? নিরু ঘাস কত লম্বা হয়? তউন্দি আর হাইউন্দের শুরুতে যে দু'বার লোমছাঁটাই হয় সে লোমের পরিমাণ এত কম বেশি হয় কেন? চৌকাণ্ডু বা জারজ ছেলে যদি জন্মায় বিধবার গর্ভে আর সে বিধবা যদি স্বামীর চুল্লা আর কুল্‌হারা তখনও ব্যবহার করে তাহলে সেই ছেলেকে সম্পত্তির একটা ভাগ দেওয়া হয় কেন? গির্‌ড পাখির স্বভাবের সঙ্গে কাঠখুরের স্বভাবের তফাতটা লক্ষ করেছেন কি?

এতগুলো প্রশ্নের ভেতর একটিরও জবাব বেরুল না মাস্টারজির মুখ দিয়ে।

এবার অম্‌রু বলল, আমার শেষ প্রশ্ন করবার আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি। আমার বউ ছিল জন্ম খোঁড়া। সে কিন্তু আমার সঙ্গে মরবার আগে অব্দি পাহাড় ডিঙিয়ে বেড়িয়েছে।

একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটা যাত্রীবোঝাই গাড়ি যাচ্ছিল। ড্রাইভার আমার বুড়ি বউটিকে খুঁড়িয়ে চলতে দেখে গাড়ি থামিয়ে বলল, চলো, খানিক রাস্তা এগিয়ে দিই।

বুড়ি বলল, তারপর?

তারপর আবার কী?

ফের গাড়ি পাব কোথায়?

ড্রাইভার কড়া মেজাজে বলল, কানা খোঁড়ার ভাল করতে নেই।

বাসের লোকেরা বলল, খোঁড়া মানুষের গুমর দেখো। খুঁড়িয়ে চলবে তবু গাড়িতে উঠবে না।

বাসটা ফুঃ ফুঃ করে ধোঁয়া ছেড়ে রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে ওপরে উঠে গেল।

এবার অম্‌রু কথা থামিয়ে মাস্টারজির মুখের দিকে চেয়ে তার শেষ প্রশ্ন তুলল, এ দুনিয়ায় খোঁড়া আর চক্ষুষ্মান কে? যে জন্মেছে খোঁড়া হয়ে অথচ পথের কষ্টকে কষ্ট বলে মানে না, সে খোঁড়া না দুটো পা থাকতেও যারা এক পা গাড়ি ছাড়া চলতে পারে না তারা খোঁড়া? আর চোখওয়ালা কে? যারা গাড়ি চড়ে দেশ বিদেশ দেখে বেড়ায় তারা না যারা পায়ে হেঁটে কষ্ট করে নালা, কাণ্ডা, বন, পর্বতে ঘুরে বেড়ায় তারা?

এ প্রশ্নের উত্তর অভিজ্ঞতা থেকে না হলেও কেতাব পড়ুয়ার চালাকি বুদ্ধি থেকে দিতে পারত, কিন্তু লজ্জা পেয়ে মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। তাই মাস্টারজি সেদিন চুপচাপ বসেছিল।

মহান্ত্‌ বলে, আমি না হয় একেবারে পঙ্গু বলে তুমি আমাকে তোমার সঙ্গী করনি পিতাজি কিন্তু তোমার নাতি তো আমার মতো খোঁড়া নয়, তাকে কেন নিয়ে যাচ্ছ না?

কুড়ির দিকে তাকিয়ে অম্‌রু বলে, তোমারও কি মনের ইচ্ছা তাই?

কুড়ি বলে, আপনি সুখিয়াকে ইস্কুলে পাঠাতে চাননি, আমরা তাই করেছি পিতাজি। আপনি যদি ওকে সঙ্গে নিয়ে যান তাহলে আমরা খুশিই হব। ও আপনার কাছে থেকে পথ চিনবে, কাজ শিখবে।

অম্‌রু ছেলে বউয়ের কথায় বড় তৃপ্তি পেল। সে বলল, তোমাদের মনের কথাটা জানলাম। এখন আর আমার ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে কোনও বাধা নেই।

একটু থেমে মহান্তর দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে তোমার মেজভাই হির্‌দুর বেটা গব্‌রু, তাকেও তো এক সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কী অপমানটা করল তার বাপ। বলল, ফরেস্টের গার্ড হয়েছি। সাহেব বলে সেলাম করে সবাই। আমার ছেলে হবে পহাল! তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে পিতাজি? ও এখন ইস্কুলে পড়ছে, ওকে মিলিটারিতে ঢোকাব।—সেই থেকে আমি কারু ব্যাপারে নাক গলাই না।

আরও শোনো তোমার মেজভাইয়ের কীর্তির কথা। গতবার ভেড়-বক্‌রি নিয়ে কাংড়ায় জংলাৎ ম্যাকমা পার হচ্ছিলাম। আমি পিছু পড়ে গেছি। বাওয়ালরা এগিয়েছে দল নিয়ে। আমার কাছে হঠাৎ একটা বাওয়াল দৌড়ে এসে তির্‌নি চাইল। আমি হিসেব করে তির্‌নি দিলাম। ও আমাকে বেশ কয়েকটা আধ্‌লি ফিরিয়ে দিলে। বললাম, কী হল, তির্‌নির টাকা

ফিরিয়ে দিলি যে? ও বলল, ফরেস্টের সাহেবের সঙ্গে রফা হয়ে গেছে। সামান্য কিছু তির্‌নি ধরে নিয়ে বাকি আধাআধি বখরা। তাই এতগুলো পয়সা আর দিতে হবে না।

চটে গিয়ে বললাম, চলতো দেখি সে কেমন সাহেব?

বাওয়ালটা ভয় পেয়ে পালাল। আমি অফিস ঘরের সামনে গিয়ে দেখি হির্‌দু বসে তির্‌নি গুনছে।

এক ধমক দিয়ে বললাম, হারামজাদা বেইমান, বাপের কাছ থেকে ঘুষ খাচ্ছিস?

উঠে দাঁড়িয়ে আমার বাওয়ালগুলোর ওপর চোটপাট চালিয়ে বলে কী, পিতাজির ভেড় বলবি তো বেহেড়রা।

আবার এক ধমক লাগিয়ে বললাম, ফের যদি হারামজাদা আমাকে পিতাজি বলে ডেকেছিস তো মুখ ভেঙে দেব। অম্‌রু পহাল বেইমানি করেনি জীবনভর, সে কোনও বেইমান চোট্টার বাপও নয়।

মহান্ত্ বলল, বড়ভাইয়ের জন্য বড় দুঃখ হয় পিতাজি। ভাবীজিকে ওর সেই ব্যবসাদার দোস্ত ভাগিয়ে নিয়ে যাবার পর থেকে ও যেন কেমন হয়ে গেছে।

অম্‌রু বলল, তিন তিনখানা ফলের বাগান করেছে। উলাংসায় একখানা আর ভারমৌরে দু'খানা। এদিকে কোঠিও বানিয়েছে দু'খানা। বউকে খুইয়ে বহুত রূপেয়া কামাচ্ছে।

মহান্ত্ বলল, গেল বছর এদিকে ব্যবসার ব্যাপারে এসেছিল, দেখা করে গেছে। কথা হল অনেক। বাগান বাগিচার কথাও বলল। ভাবীজির কথা হল। সে নাকি এখন পাঠানকোটে ওই লোকটার ঘর করছে। দোস্তি পাতিয়ে শুধু বউ নয়, অনেক টাকাও হাতিয়ে নিয়ে গেছে লোকটা।

অম্‌রু বলল, মহান্ত্ একটা কথা মনে রাখবি, যে মরদ নিজের বউকে কাছে রাখতে পারে না সে টাকাপয়সা খেতখামারও রাখতে পারবে না। আমি আর তোর মা পথ চলতে কত দিন দেখেছি, আপেল বোঝাই লরিতে হস্তিরামের বউ জুগ্‌নীকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার দোস্তটা। তোর মা বলত, মুখ্যু হস্তিরামটার কপাল ভাঙল বলে।

একটু থেমে আবার বলল অম্‌রু, জরু আর জমিন হাতছাড়া করতে নেই। একবার হাতের থেকে বেরিয়ে গেছে কি ও আর ফিরে আসবে না।

মহান্ত্ বলল, ভাবীজি ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর বড়ভাই পাগলের মতো টাকা রোজগার করে যাচ্ছে। আমার মনে হয় টাকার নেশায় মেতেও দুঃখ ভোলার চেষ্টা করছে।

হাসল অম্‌রু। বলল, সুখ তো ধনে নাই বাপ, মনে। ওর মন পুড়ছে। ধন দিয়ে কি মনের আগুন ঢাকা যায় রে।

ছোট ছেলে মহান্তের কোঠি থেকে চলে আসার আগের দিন বুড়ো অম্‌রু চারদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। লম্বা খেতি। এক প্রান্তে তাপ্রি (খড়ে ছাওয়া কুঁড়েঘর)। রবি ফসল উঠে গেছে। এখন খেতে কোনও চাষ পড়েনি। অম্‌রু গাছপালার ভেতর দিয়ে এসে দাঁড়াল তাপ্রির কাছে। মহান্ত্ রুবানা বাজাচ্ছে। তার পাশেই সোয়ারু বা সবজির খেত থেকে ভ্যানঠু বা বেগুন তুলে তাপ্রির তলায় জড়ো করে রাখছে কুড়ি। অনেকআগেই দতিয়ালু বা মধ্যাহ্ন ভোজের পাট চুকে গেছে। এ সময় খেতে কোনও ফসল নেই, তাই তাপ্রিতে বসে পাহারা দেবার দরকারও

নেই। তবু এই নির্জন নিস্তব্ধ দুপুরগুলোতে কুড়ি তার স্বামীকে ধরে এনে তাপ্রিতে বসিয়ে দেয়। কখনও সে তরকারি তোলে সবজির খেত থেকে, আবার কখনও একখানা থালি পেতে তার ওপর মেশানো মটর আর ছোলার দানা ফেলে পৃথক করে নেয়। গোল মটরগুলো থালার একদিকে গড়িয়ে চলে যায় আর কোণওলা ছোলাগুলো এক জায়গায় পড়ে থাকে।

অম্রু গাছের আড়াল থেকে দেখল, কাজ শেষ করে তার খোঁড়া ছেলের পাশটিতে গিয়ে বসল কুড়ি। রুবানায় দুপুরের একটা রাগিণী বাজছে আর কুড়ি বাজনা শুনতে শুনতে মহান্তের খোঁড়া পা-খানার ওপর অসীম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

অম্রুর চোখ সে দৃশ্য দেখছিল আর বার বার ঝাপসা হয়ে উঠছিল। অম্রু মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে বলতে লাগল, বাবা মহাদেও, তোমার আর্শীবাদ থেকে এরা যেন কোনওদিন বঞ্চিত না হয় প্রভু।

যেমন নিঃসাড়ে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে কোঠির দিকে ফিরে গেল অম্রু। কোঠির পেছনে ওরি অর্থাৎ ভেড়বক্‌রির আস্তানা। অম্রু পায়ে পায়ে সেদিকে চলল। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ভুরুর ওপর হাতের পাতা ছুঁইয়ে দেখতে লাগল। একটা বক্‌রির বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ টেনে খাচ্ছে দাব্‌বু।

এক পলকে উঠে দাঁড়াল সে। একটা গাছের তলায় আহারে তৃপ্ত কয়েকটা ভেড় আধবোজা চোখে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছিল। দাব্‌বু চুপি চুপি গিয়ে একটার পেটের ওপর কান পেতে গুড়গুড়ি শুনতে লাগল। ভেড়টি অলস গলায় সামান্য আপত্তি জানিয়ে যেন বলতে লাগল, কী হচ্ছে, ও কী হচ্ছে? একটুখানি ঝিমুতেও দেবে না নাকি?

অম্রু মনে মনে ভারী খুশি হয়ে উঠল। হাঁ, এবার সত্যিই দাব্‌বুকে সঙ্গে নেবার সময় হয়েছে।

পরের দিন গদ্দীর সেই বিশেষ পোশাকগুলি পরে বুড়ো অম্রুর সঙ্গে উড়ান্ধারের পথে এই প্রথম যাত্রা করল দাব্‌বু। হাঁটু অব্দি ঝোলা চোল। কোমরে ইয়া লম্বা ডোর পেঁচিয়ে জড়ানো। পায়ে নাগরা জুটা আর মাথায় কৈলাস পর্বতের চূড়ার আকারে টোপি। হাতে কুল্‌হারা নিয়ে সবার আগে এগিয়ে চলেছে সে মহা উৎসাহে। কোমরের ডোরে ঝোলানো বাঁশুরিখানা চলার ছন্দে দোল খাচ্ছে।

দাদাজির কাছ থেকে ইতিমধ্যেই সে শিখে নিয়েছে ভেড়বক্‌রি চালনা করবার জন্য কয়েক রকমের সিন্ধ্‌ বা শিস্‌। সেই সিন্ধ্‌ শুনে গদ্দী কুত্তর ডাইনে বাঁয়ে চালিয়ে নিয়ে যাবে পুরো দলটাকে।

দাব্‌বু তার নতুন শেখা সিন্ধের এলোপাথাড়ি পরীক্ষা চালাতে লাগল। ভুল হতে লাগল মাঝে মাঝে। ডাইনে ঘুরতে বাঁয়ে ঘুরে গেল দল। আবার বাওয়ালরা ফেরাল তাদের।

অম্রু নাতির কাণ্ড দেখছে। সেও এমনি ভুল করত প্রথম প্রথম। ভুল না করলে ঠিক হবে কী করে। যত ভুল, তত শেখা, নতুনের সঙ্গে তত পরিচয়। অম্রুর মনে উজানের স্রোত বইছে আজ। সে গদ্দী পহালের ঘরে জন্মেছে। তার পূর্ব পিতামহরা ভেড়বক্‌রি নিয়ে সারা জীবন ঘুরে বেড়িয়েছে পাহাড়ে পর্বতে, পথে প্রান্তরে। সেও ওই একই পথে ঘুরেছে শিশুকাল থেকে। কিন্তু হঠাৎ একটা পাথর যেন গড়িয়ে এসে আটকে দিল ওই জীবনের ধারা। বন্ধ হয়ে গেল আনন্দের

স্রোত। বংশধরেরা ছুটেছে নতুন জীবনের খোঁজে। ভেসে যাচ্ছে চোরা স্রোতের টানে। সে শুধু দেখছে। ওই স্রোত থেকে টেনে ফেরানোর শক্তি তার নেই। অম্‌রু কাউকে টেনে তুলতেও চায় না।

হঠাৎ অম্‌রুর আনন্দের উৎস মুখে চাপাপড়া সেই পাথরটাকে দুটো কচি হাত আর পায়ের শক্তি দিয়ে সরিয়ে দিল দাব্‌বু। অমনি উচ্ছ্বাসে বুক ছাপিয়ে উথলে উঠল আনন্দের ঢেউ। অম্‌রুর সারা মন সেই খুশির স্রোতে স্নান করতে লাগল। গদ্দী পহালের বংশে আর একটা পহাল জন্ম নিল।

খর নালা একটা পার হয়ে যেতে হবে। গভীরতা নেই কিন্তু বেগ আছে স্রোতের। একটা ধাড়ি ভেড়কে নামিয়ে দেওয়া হল জলে। বরফ গলা জল পায়ের চামড়া ভেদ করে হাড়ে ঢুকছে। তবু বাঁকা শিং উঁচিয়ে মুখখানা ঈষৎ কাত করে দাঁড়িয়ে আছে সে। দলের সর্দারকে বিপদের ঝুঁকি আগে নিতে হয়, নইলে সে এত বড় দল চালনা করবে কী করে।

সর্দারের দেখাদেখি আরও কয়েকটি নেমে এসে সর্দারের পাশে ভিড় করল। তাদের অনুসরণ করল আরেক দল। ভয়ে এদিকওদিক পালাবার ফিকির খুঁজছিল কয়েকটা। বাওয়ালরা তাদের ফিরিয়ে আনল কানে ধরে। ঠেলে দিল স্রোতের ভেতর। চেঁচিয়ে কাঁদছিল একটা ঊর্নী, দাব্‌বু তাকে বুকে তুলে চেপে রাখল। ভয় কী, চুপচুপ।

সমস্ত দলটা এবার সর্দারের পিছু পিছু চলতে শুরু করেছে। মুক্তোর দানার মতো জল ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ভিজে সপসপে হয়ে গেছে দেহের লোম। ওপারে উঠে ঝটাঝট্ গায়ের জল ঝাড়া শুরু হল। তারপর আবার চলা।

নীর (চারণক্ষেত্র) অথবা ধৌলুতে (চারণক্ষেত্র) এসে পৌঁছোলেই ঘাসের জমিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পুরো দলটা। প্রাণভরে খেয়ে নাও, সামনে আছে কঠিন দুর্গম পথ।

রাতে খানাপিনা শেষ করে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে পড়ে ওরা। সারাদিন চড়াই উতরাই ভাঙার পরিশ্রমে ক্লান্ত বাওয়ালদের চোখে ঘুম নামে। পর্বতের বরফ ছুঁয়ে ঠান্ডা কনকনে হাওয়া বয়ে আসে। একখানা পাট্টু নীচে পেতে আর একখানা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে সবাই। দাদাজির গা ঘেঁষে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে দাব্‌বু। আকাশে তারারা দেওয়ালির দ্বীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। অম্‌রুর চোখে ঘুম নেই। নাতির মুখখানা সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। দাব্‌বুর বুকে হাতখানা ছুঁইয়ে রেখে সে অনুভব করছে একই রক্তের উত্তাপ।

কখন তন্দ্রা এসে গিয়েছিল অম্‌রুর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। সামনের পাহাড় থেকে কে যেন উঁকি দিয়ে দেখছে। উঠে বসে চোখ মুছে আবার তাকাল অম্‌রু। চাঁদ। মাঝ রাতে পাহাড়ের আড়াল থেকে মাজা পেতলের থালার মতো ভাঙা চাঁদটা উঁকি দিচ্ছে। যেন ঘোমটা দেওয়া বউ আধ ফালি মুখ বার করে অম্‌রুকে জিজ্ঞেস করছে, ছেলেটা কে গা?

অম্‌রুর সেই মুহূর্তে আনন্দে পাহাড় ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, দাব্‌বু, দাব্‌বু পহাল, আমার নাতি গো নাতি।

কাংড়া থেকে সরল উপত্যকা ওরা পেরিয়ে এল দু' সপ্তাহে। এই প্রথম সরলে এসে দাব্‌বু দেখল তার দাদাজির বাপের তৈরি কোঠি। দুটো দিন ওখানে কাটিয়ে ওরা উঠতে লাগল ওপরে।

পথে পড়ল কিয়ানি পুখরী, কোটি গ্রাঁ। দাব্‌বু দেখল গ্রাঁয়ের মানুষজন প্রায় সবাই তার দাদাজির চেনা। দাব্‌বুকে তারা সবাই আদর করল। কেউ কেউ মক্‌কি আর মেঠাই খেতে দিল।

পর পর পাহাড়ের গায়ে গায়ে সুরঙ্গানি, কালহেন, নাকরোর পেরিয়ে ওরা ঢুকল তিসায়। এক বাউড়ির ধারে ওরা শেষ বেলায় ডেরা ফেলেছিল। ক'টি মেয়ে জল নিয়ে চলে গেল। একটি বউ দাব্‌বুকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল। দাব্‌বু কাছে গেলে তাকে সামনে একটা কোঠি দেখিয়ে বলল, একবার এসো তো আমার সঙ্গে। দাব্‌বু ভারী খুশি। বউটির সঙ্গে সে তার কোঠিতে গেল। অম্‌রু বাধা দিল না। ফিরে যখন এল, হাতে একরাশ খাবার। মেয়েটির বাচ্চা হয়েছে। পনেরো দিনে উৎসব। বব্‌রু (পুরী) বানিয়ে লোকজন খাওয়ানো চলছে। ঘরের কাছে মানুষগুলো ডেরা ফেলেছে, তাই তাদেরও আনন্দের কিছু অংশ দেওয়া। দাব্‌বুর আনা বব্‌রু খেয়ে সবাই শিশুটির মঙ্গল কামনা করল।

এরপর এল গোয়ারি গ্রাঁ। একটু দূরে খরস্রোতা নালার ওপর পুরাতন কাঠের পুল মেরামত হচ্ছে। পুলের ধারে ঠিকাদারের কাঠের তক্তা সাজিয়ে তৈরি হয়েছে সাময়িক চায়ের দোকান। ঠিকাদারের লোকেরা বসে তারিয়ে তারিয়ে চা খাচ্ছে। কাজ শেষ হলেই ভেঙে যাবে দোকান।

যা পথে পড়ছে অবাক হয়ে তাই দেখছে দাব্‌বু। তারেলা গ্রাঁ ছাড়াতেই শুরু হল বনের পথ। কী একটা পাখি গাছের কাণ্ডে ঠোকর মারছে। নির্জন বনে ঠক ঠক আওয়াজটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে।

কে আওয়াজ করছে দাদাজি?

কাঠখুর পাখি।

কী রকম দেখতে?

ছোট পাখি, ধূসর রং।

দাব্‌বু নিচু হয়ে ঘাড় কাত করে পাখির খোঁজ করতে লাগল, কিন্তু বনের গভীর ডালপালার ভেতর তাকে আবিষ্কার করতে পারল না। অম্‌রুর দিকে ফিরে বলল, দাদাজি, তুমি কী করে জানলে পাখিটা ছোট। তার নাম কাঠখুর?

আমি দেখেছি ভাই। শুনেছি তার নাম।

আমি কেন দেখতে পাচ্ছি না?

এমনি দিন রাত পথ চলতে চলতে তুমিও কত গাছ, ফুল, লতাপাতা পাখি চিনতে পারবে। কত নাম শুনবে।

বান আর খাসরুর বন পেরিয়ে যেতে যেতে অম্‌রু হঠাৎ কয়েকটা বক্‌রিকে হেই হেই করে তাড়া করল।

ওদের অমন করে তাড়াচ্ছ কেন দাদাজি?

ওরা দলছাড়া হয়ে সরকারের লাগানো চারাগাছ মুড়িয়ে খাচ্ছে।

খেলে কী হয়?

গাছ মরে যায়। বড় হতে পারে না।

গাছ মরে গেলে কী হয়?

কোঠি তৈরির কাঠ মিলবে না। রান্নার জন্যে ডালপাতা মিলবে না।

এবার বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল দাব্‌বু।

অনেক ওপরে উঠে এল ওরা। দশ-বারো হাজার ফুট ওপরে ভূর্জপাতার বন। লম্বা লম্বা গাছ। গায়ে বাদামি রঙের দাগ। উড়ুক্কু কাঠবেড়ালি একটাকে ছুটতে দেখে তার পিছু নিল দাব্‌বু। তির্‌তির্‌ করে লেজফোলা কাঠবেড়ালিটা উঠে গেল গাছে। দাব্‌বু গাছটা জড়িয়ে ধরে হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে।

বন শেষ। গাছপালার চিহ্ন নেই। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে নানা রঙের ছোট ছোট ফুল। শতরুণ্ডীতে এসে এপারের শেষ ডেরা পাতল অম্‌রুর বিপুল বাহিনী। অদূরে বেলা শেষের আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠেছে সাচ গিরিপথ।

দাব্‌বু আঙুল তুলে বলল, দাদাজি ওই জোৎ আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে?

হাঁ ভাই। ওই জোৎ পেরুলেই আমরা নামব পাঙ্গী উপত্যকায়। ওখানে তুষার পর্বতের মাঝখানে আছে সবুজ নিরু ঘাসের কাণ্ডা।

তুমি কী করে ওই কাণ্ডার খবর পেলে দাদাজি?

আমার পিতাজির কাছে।

তোমার পিতাজি কার কাছ থেকে পেল?

তার পিতাজির কাছে।

তার পিতাজি কোথা থেকে পেল?

গদ্দীর কাছে।

গদ্দী কোথায় পেল?

মহাকালের কাছে।

মহাকাল কে?

যিনি কখনও থামতে জানেন না, গদ্দীদের সিদ্ধ্‌ দিতে দিতে চালিয়ে নিয়ে যান।

আমাকে সেই আদমিকে চিনিয়ে দেবে দাদাজি? আমি তার কাছ থেকে অনেক অনেক রকম সিদ্ধ্‌ শিখে নেব।

তাঁকে কেউ চিনিয়ে দিতে পারে না, নিজেকে চিনে নিতে হয় ভাই।

আমি চিনতে পারব?

আলবত পারবে। যে গদ্দী-পহালদের মতো কেবলই চলে, সে তাঁকে একদিন দেখতে পায়। চিনতে পারে।

বড় উৎসাহে নবীন এক প্রাণের টানে কাংড়া থেকে শতরুণ্ডীর ল্যাসে প্রায় উড়ে চলে এসেছে অম্‌রু। দেহের কষ্টকে মনের আনন্দ দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এবার বুঝি দেহ বিদ্রোহ করে। অম্‌রুর মনে হয় কেমন যেন শিথিল হয়ে আসছে তার দেহ। রাত্রিতে বিশ্রাম চাই, পুরো বিশ্রাম। কিন্তু বিশ্রাম চাইলেই কি পাওয়া যায়। অবিশ্রাম চলার শোধ তুলতে চায় দেহ। সবাই ঘুমোয়। কেবল ঘুম আসে না অম্‌রুর চোখে। কখনও তন্দ্রা, কখনও জাগরণ। তন্দ্রার ভেতরে পিতাজি হরিচন্দ্‌ পাশে এসে বসে। হাত বুলিয়ে দেয় গায়ে মাথায়। অম্‌রু যেন দাব্‌বুর মতো দশ বছরের বালকটি। তার মনে হয়, সে বুড়ো অম্‌রুর পোশাকখানা খুলে ফেলে বালক অম্‌রুর পোশাকটা পরেছে। ছেনছেল্লা বুড়ি বলছে, অম্‌রু, কখন এলি দাদা? একটা

খরস্রোতা নালা বয়ে চলেছে। ওপরে বরফের আস্তরণ। অম্রু বরফ সরিয়ে কান পাতছে। একটা ক্ষীণ শব্দ বহু দূরের থেকে ভেসে আসছে—অমরু, আয় বেটা, আমার কোলে আয়।

জুস্মুসার আলো ফুটছে। সবাই তৈরি। কঠিন চড়াই সামনে।

কারু মুখে কথা নেই। নিঃশব্দে পুরো দলটা এগিয়ে চলেছে জোতের দিকে। দাব্বু তার দাদাজির কাছ থেকে জেনেছে জোতের দিকে এগিয়ে চলার সময় পেছন ফিরে তাকাতে নেই। শুধু সামনে চোখ রেখে চলা।

অম্রু সবার পেছনে। টলছে আর চলছে। সামনের প্রবাহ তাকে টেনে নিয়ে এসেছে জোতের মুখ অব্দি।

এই তো সেই গিরিপথ, যাকে বার বার অতিক্রম করে গেছে সে। আজ মনে হচ্ছে গিরিপথের দু'দিকের দুটি শৃঙ্গ মহাদেবের ত্রিশূলের মতো নীল আকাশকে স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাঝ দিয়ে প্রসারিত পথ। অম্রু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, দাব্বু বাওয়ালদের সঙ্গে উঠে যাচ্ছে গিরিপথে। তরঙ্গিত ভেড়ার পাল ঠিক যেন তুষার-নদীর স্রোত। বিপরীত মুখে উৎসের দিকে উঠে চলেছে।

অম্রুর চোখের উপর ফুটে উঠল আর একটা দৃশ্য। অগণিত ভেড়ার পাল চলেছে। সঙ্গে সারি সারি গদ্দী-পহাল। এ অশেষ। নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা। সিন্ধ্ উঠেছে। আকাশে বাতাসে, পর্বতে প্রান্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সে সিন্ধ্। 'হ্যালা হুই, হ্যালা হুই'—চলো চলো এগিয়ে চলো।

পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে অম্রুর দেহ। ডান হাতখানা গিরিপথের দিকে প্রসারিত।

বনপর্ব

সূর্যটা সুদর্শন চক্রের মতো ঘুরছে। এমন দাপটে ঘুরছে যে মনে হচ্ছে এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

ঠা ঠা রোদে খাঁ খাঁ করছে চারদিক! একটা কাক গাছের ডালে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো ঠোঁট হাঁ করে বসে আছে। শুধু নিরলস একটা কাঠ্‌হনা (কাঠঠোকরা) ঠক্ ঠক্ আওয়াজ তুলে পোড়া লোহার মত দুপুরটাকে ক্রমাগত পিটিয়ে চলেছে।

জঙ্গল ফুঁড়ে প্রথম বেরিয়ে এল দুর্যোধন মির্‌ধা। গাঁট্টাগোট্টা তামাটে শরীর। বাঁ কাঁধে বাঁকা বাঁশের একটা লাঠি। ওই লাঠিতে ঝুলানো পেল্লাই এক পোঁটলা বাচ্চা ছেলের মতো মির্‌ধার পিঠে ঝুলে আছে। দুর্যোধন মির্‌ধার পরনে নেংটির মতো বাঁধা একখণ্ড টেনা। মাথায় পুরোপুরি টাক। দু'-এক গাছা অনাদৃত কাঁচাপাকা চুল দগ্ধ পোড়ো মাঠের প্রান্তে শুকনো দু'-এক গাছা ঘাসের মতো জেগে আছে।

মির্‌ধার পেছনে ছায়ার মতো লেপ্‌টে বেরিয়ে এল বার-তের বছরের একটা ছেলে। লম্বা, কালো, হাড়ে মাংসে এক হয়ে আছে। লেংটি একটা বেঁধেছে যতটুকু না হলে নয়। তামার রঙের একমাথা ঝাঁকড়া চুল। তার ওপর একটা কলসি বসানো। ডান হাত কলসির মুখে, বাঁ হাত ঝুলে লটরপটর করছে।

থমকে দাঁড়িয়েছে মির্‌ধা, ছেলেটাও। সামনের ধূ ধূ পড়িয়াটা (অনাবাদী জায়গা) পার হতে হবে। পুরনো খড়ে আগুন লাগার মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে চামড়া।

তা জ্বলক, পুড়ুক, তবুও বেলা থাকতে থাকতে দিকদিশাহীন প্রান্তরটা পেরিয়ে যেতে হবে তাদের। এই পোড়ো মাঠটার প্রায় চারদিক ঘিরে জঙ্গল। পশ্চিমে হাত দশেক ফাঁকা জায়গা দিয়ে প্রকৃতি বেরুবার একটা পথ করে দিয়েছে। ওই ফাঁকেই বেরিয়ে পড়তে হবে। রাত-ভিতে এই ফাঁকা জায়গায় আটকা পড়লে অব্যখ মরণ।

পা চালিয়ে দিয়েছে দুর্যোধন। পেছন পেছন ছেলেটাও হনহনিয়ে চলেছে। সরা চাপা কলসির জল ছলাক্ ছলাক্ শব্দে বাজছে। মাঝে মধ্যে চলার গতি বাড়লেই চলকে পড়ছে দু'-চার ফোঁটা জল। জুলপি গড়িয়ে গাল বেয়ে একটা শিরশিরে ঠান্ডা অনুভূতি দেহটাকে চমকে দিচ্ছে।

ক্রোশ দুয়েক হাঁটার পর মনে হল একটা অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে ওরা এসে দাঁড়িয়েছে।

দুর্যোধন প্রথম কথা বলল, কীরে, থকি (কাহিল হয়ে পড়া) গেলু?

কলসি সমেত মাথা নেড়ে হারু পাইক জানাল, সে থকে যায়নি।

অবশ্য পাইকের পোর গলা তখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। আওয়াজ বেরুবার কোনও পথই ছিল না।

দুর্যোধন কিন্তু অবিবেচক নয়। সে অসহায় হারুর অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারছিল। চলতে চলতেই সে বলল, তাড়াতাড়ি চালি আয়, বর (বট) গাছের ছায়ায় বসিবা।

প্রান্তরের প্রায় আধাআধি এসে মিলল সে বটগাছ। একশো একখানা হাত চারদিকে বাড়িয়ে দিয়ে সবাইকে আয় আয় বলে কাছে ডাকছে। এত খরার দাপটেও পাতাগুলো সবুজ মলমল করছে। বটগাছের ছায়ায় ঢুকে পড়ে হারুর মনে হল পুকুরের ঠান্ডা জলে সে যেন এইমাত্র ডুব দিল।

কলসি নামিয়ে গাছটার গুঁড়ি ঘেঁষে বসল সে। দুর্যোধন পোঁটলার গিঁট খুলে চিঁড়ে বের করতে করতে বলল, কেন্তে বেলে পখাল (পান্তা ভাত) খাইছু, ভোক (খিদে) পাইছি, খা বাপ খা।

চিঁড়ে আর হুড়ুম এগিয়ে দিল দুর্যোধন। নিজেও খানিকটা নিল। শুকনো চিঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগল দু'জনে। রস আসে না জিভে! চিঁড়ে ভিজবে কী করে। কলসি থেকে জল গড়ানো হল। হারু আগেভাগে ঘটিটা এগিয়ে দিল দুর্যোধনের দিকে।

দুর্যোধন মনে মনে খুশি হয়ে ভাবল, না ছেলেটা ভাল, বোধবুদ্ধি অন্তঃকরণ আছে। একেবারে হাঘরে ভিখিরি নয়। মুখে বলল, তুই আগুর খা, কচি গলা শুকি যাইছি। আমি পরে খাইবি।

হারু কিন্তু ঘটিটা নিজের কাছে টেনে নিল না। শুকনো গলায় ফ্যাসফ্যাস করে বলল, তুমি আগুর খাও।

আর বাক্যব্যয় না করে মুখের মধ্যে শীতল পানীয় বেশ খানিকটা ঢকঢক করে ঢেলে নিল দুর্যোধন। ঘটিটা এগিয়ে ধরল হারুর দিকে।

হারাধন আবার জল গড়িয়ে ভরতি করল ঘটি। তারপর অগস্ত্যের মতো এক নিঃশ্বাসে পুরো এক ঘটি জল শুষে নিল।

জ্বলুনি থেমে গিয়ে এখন ঠান্ডা হয়েছে গা। হুড়ুম ভেঙে খাওয়ার কুড়ুরমুড়ুর শব্দ উঠছে। মাঝে মাঝে গাছের পাতা কাঁপিয়ে ফুরফুরে হাওয়া গায়ে এসে লাগছে।

অনেক ক্রোশ পথ হেঁটেছে সকাল থেকে। আরাম পেয়ে চোখ দুটো যেন জড়িয়ে আসতে চাইছে হারুর।

মা বাপ মরা হারাধন পাইক। ভূসম্পত্তির বালাই নেই। পড়শিদের ঘরে ঘুরে ঘুরে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটা আর পেট ভাতায় পড়ে থাকা। কাজ থেকে চোখ একদণ্ড সরেছে কি ব্রহ্মতালু ফাটিয়ে মাথায় পড়বে চাঁটি।

পড়শিরা পাইকান লাচের (নাচ) দল গড়েছে। বাবুদের বাড়ি লাচ হবে। সেও ভিড়ে গেল দলে। খাওয়া, তার ওপর এক আনা করে বকশিশ পাওয়া, এ কি কম কথা!

সারারাত লেচে লেচে বকশিশ মিলল, কিন্তু সে বকশিশ সে হাতে রাখতে পারল না। অধিকারী ফেরার পথেই সেটা চেয়ে বসল। যখের ধনের মতো হাতের মুঠোয় রেখেছিল বকশিশটা। বের করে দিতে প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল তাই বোধহয় দেরি হয়ে গিয়েছিল দু'দণ্ড। অমনি চিলের মতো ছোঁ মেরে বকশিশের আনিটা কেড়ে তো নিলেই সঙ্গে সঙ্গে ওই একটুখানি দেরির জন্য পেটে কোঁত করে মারলে লাথি।

ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার হয়ে গেল। পথে গড়িয়ে পড়ল হারাধন। কিন্তু ভিখিরি ছেলেটার জন্য থামল না কেউ। কতক্ষণ পরে চোখ মেলে চেয়ে দেখে মাঠের রাস্তায় সে একা পড়ে আছে। উঠে দাঁড়িয়ে সেই যে সে উলটো দিকে হাঁটা দিলে আর একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

কতদিন ভিক্ষে করে পথে পথে ঘুরে বেড়াল। শেষে কটকের এক চটির দাওয়ায় গত রাতে ঘুমিয়েছিল, ভোরবেলা মুখোমুখি হল দুর্যোধনের। দুর্যোধন চটিতে রাত কাটিয়ে ফিরছিল কুজং। ছেলেটাকে দেখে আর তার কথা শুনে ভারী পছন্দ হয়ে গেল।

যিবু (যাবি) মোর সঙ্গে?

হারু যেন হাতে স্বর্গ পেল। সে অমনি উত্তর দিল, তুমি যউঠিকি (যেখানে) যিবু, মু যিবি। খালি মারিব নাই।

দুর্যোধন তার পিঠ চাপড়ে বড় আবেগের গলায় বলল, মোর কেই নাই। তু মোর ছেলে, তু মোর বাপ। তোকে মারিলে মোর দেহর লাগিব হারু।

এরপর আর কথা নেই। পেট পুরে দু'জনে পান্তা খেল চটিতে। তারপর কেনা কলসিতে জল ভরে নিয়ে হারুর মাথায় চাপিয়ে হন্টন দিল কুজংয়ের পথে।

দুর্যোধনের ডাকে চমক ভাঙল হারাধনের।

কী রে বাপো শুই পইলু?

হারু একটা হাই তুলে বলল, না মো শুইনি।

এবার আপন মনে বলতে লাগল দুর্যোধন, পঁচিশ বছর পরে এ গাছতলায় আসিকিরি বসিলি, মনে করুছি দু'চার দিন আগে আসি বসিছি।

হারু কোনও মন্তব্য না করে চেয়ে রইল।

দুর্যোধনের পঁচিশ বছর আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে যেতেই সে সিধে হয়ে বসল। বসেই গল্পটা শুরু করে দিল। যেন এইমাত্র ঘটেছে ঘটনাটা। হারু উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু বেশ খানিকটা উত্তেজক।

সেবার এমন গরমের দিন ছিল না। পুরোপুরি শীতকাল। জঙ্গল পেরিয়ে এই ফাঁকা পড়িয়ার উপর দিয়ে হন্‌হন্ করে হেঁটে যাচ্ছিল দুর্যোধন। শীতের বেলা, হু হু করে উড়ে যাচ্ছিল কোপ্পুরের গন্ধের মতো। ভারী চিন্তায় পড়েছিল সে। গায়ে একখানা লাল চাদর, পিঠে লাঠির মাথায় সামান্য বোঁচকা। খাঁ খাঁ মাঠখানা পেরিয়ে গিয়ে কোনও লোকালয়ে সাঁঝের আগে পৌঁছোতে হবে, নইলে বুনো জানোয়ারের পেটে যেতে হবে অব্যথ্থ।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল এই বটগাছটা। ঠিক আজ যেমনটি ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে সেদিনও তেমনি দাঁড়িয়েছিল। দুর্যোধনের সেদিন দরকার ছিল না গাছের তলায় যাবার। সে হনহন করে হেঁটে চলেছিল দিগন্তের গাছগাছালি লক্ষ্য করে।

হঠাৎ তার মনে হল, কারা যেন তার পিছু নিয়েছে। দূর থেকে কাছে এগিয়ে আসার সাড়া পাচ্ছে সে।

ছেলেবেলা থেকেই অসম্ভব সাহস দুর্যোধনের। রাতভিত, বর্ষাবাদল, সাপখোপ, চোরডাকাত কোনও কিছুই তার সাহসকে টলাতে পারেনি, কিন্তু পেছনে দ্রুত ধেয়ে আসা কতকগুলো শব্দ তার এতদিনের সাহসে চিড় ধরিয়ে দিল।

দুর্যোধন থমকে থেমে পেছনে ফিরল। কালো কালো বন বরার (বন্য শূকর) মতো কতকগুলো জীব তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে দাঁড়াতে দেখে ওরাও চলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আবার সামনে চলতে লাগল দুর্যোধন, এবার আরও দ্রুত পায়ে। কী আশ্চর্য! পেছনের পায়ের সাড়া আরও স্পষ্ট আরও দ্রুত হয়ে উঠল।

দুর্যোধন এবার দৌড়োতে লাগল সামনে বটগাছটা লক্ষ্য করে। পেছনের জীবগুলো দৌড়োচ্ছে। তারা চার পায়ে অনেক দ্রুত এগিয়ে আসছে।

দূরত্ব দেখে নেবার জন্য দুর্যোধন একবার দৌড়োতে দৌড়োতেই পেছনে ফিরল।

চিৎকার করে উঠল সে, রক্ষা করো প্রভু জগন্নাথ, এ যে অরণা মহিষ (অরণ্য মহিষ)।

বাঁকা আর তীক্ষ্ণ একজোড়া শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে বিশ-পঁচিশটা মৃত্যুদূত।

মুহূর্তে প্রভু জগন্নাথ বুদ্ধি জুগিয়ে দিলেন দুর্যোধনের মগজে। কে যেন তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে দিয়ে গেল, মূর্খ, গায়ে চাদরটা জড়িয়ে রেখেছিস কেন, ওটা খুলে ফেলে ছুড়ে দে মোষগুলোর দিকে।

চোখের পলকে তাই করল দুর্যোধন। সামনেই গাছটা। প্রায় লাফ দিয়েই উঠে গেল গাছে।

হাঁফাচ্ছে সে। লাঠি আর পোঁটলাটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে গাছের একটা খাঁজে ঝুলিয়ে দিল।

লাল চাদরখানার ওপর সে কী বিক্রম! এক একটা জানোয়ার গায়ের সবটুকু গতর উজাড় করে দিয়ে নিরীহ চাদরখানার ওপর কষে গুঁতো লাগাচ্ছে।

লাল চাদরখানা দেখতে দেখতে ফার্দাফাঁই হয়ে গেল।

এবার চাদরের মালিকের ওপর নজর পড়ল তাদের। অমনি দশ-বিশটা মিলে ফোঁসফোঁস করতে করতে তেড়ে এল। গাছের সঙ্গে শিংয়ের গুঁতোর পরীক্ষা চলল কতক্ষণ। তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল গাছের তলায়। লালচে চোখগুলো ক্রুদ্ধ আক্রোশে বিদ্ধ করতে লাগল দুর্যোধনকে। নিশ্চিত নির্বিকার দুর্যোধন শুধু উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

শীতের সূর্য তাড়াতাড়ি আলো দেবার কাজটুকু সেরে নিয়ে দিগন্তের আড়ালে লুকিয়ে গেল। হাড় কাঁপিয়ে হাওয়া ছুটে এল উন্মুক্ত প্রান্তরের ওপর দিয়ে।

বন্দিকে পাহারা দেবার জায়গাটা সুখের নয় ভেবে একে একে উঠে পড়ল বুনো মোষের দল। শেষবার পা ঠুকে কেউ কেউ ক্রোধ প্রকাশ করল। তারপর সদলবলে চলে গেল জঙ্গলের দিকে।

শুক্লা দশমীর চাঁদ লণ্ঠন জ্বালিয়ে আগেভাগেই আকাশের আঙিনায় হাজির। দুর্যোধন মির্ধা আর দেরি করল না। সেখান থেকে নেমে যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই চলতে লাগল। তাকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে। রাজা ভূপেন্দ্র ভঞ্জের সীমানা ছেড়ে সেই রাতের ভেতরই যে কোনও জায়গায় পালাতে হবে তাকে। না হলে হন্যে কুকুরের মতো রাজার নিযুক্ত লোকগুলো তাকে খুঁজে বের করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

দুর্যোধনের শরীরে সেদিন কেউ যেন দুটি ডানা লাগিয়ে দিয়েছিল। সে ওই ডানার ঝাপটে পার হয়ে গিয়েছিল পথ প্রান্তর, জল জঙ্গল।

এখানেই তার গল্পে ছেদ ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল দুর্যোধন। বলল, উঠি পড়ো, অনেক রাস্তা যিবাকু পড়িব।

হারু পাইক কলসিটা মাথায় তুলে নিয়ে বলল, কিন্তু বোড়ো বাবা. রাজার লোক তুমাকে ধরবে বলিকি (বলে) খুঁজিথিলা কেনি?

দুর্যোধন তপ্ত মাটিতে পা ফেলে বলল, সে অনেক কথা বাপধন, আর একদিন ধীরে-সুস্থে বুসিকিরি কইবা। আয়, বাপো চালি আয়।

তিরিশ-চল্লিশ ক্রোশ পথের এই শেষ একটা ক্রোশই প্রকৃতির আশ্চর্য এক খেয়াল খুশির সৃষ্টি। চিত্রতোয়া নদীটি এখানে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে তার সঞ্চিত জল ঢেলে দিতে ছুটে চলেছে। কিন্তু আশ্চর্য, ওপর থেকে নদীর দুটো ধারা বোঝার কোনও উপায় নেই। মূল ভূখণ্ডের পরই সীমাহীন সমুদ্রের ডাক। কেবল মূল ভূখণ্ডের জঙ্গল-মহালে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালে একটি অরণ্যলোকের অস্পষ্ট ছবি চোখে এসে পড়ে। সেখানে যেতে গেলে চাই বুকের মধ্যে দুরন্ত সাহস। কারণ চিত্রতোয়ার দুটি ধারার মাঝখানে জলের মধ্যেই পলির একটা শক্ত বাঁধ যেন কী করে সৃষ্টি হয়েছে। ওই বাঁধের ওপর কোথাও হাঁটু জল, কোথাও কোমর, কোথাও বা বুক সমান। নৌকো যাবার চেষ্টা করলে চড়াতে আটকাবে। তাই কেউ কোনওদিন ওই দ্বীপটায় যাবার কথা ভাবেনি। প্রাণের ভয়ে পঁচিশ বছর আগে এই চিত্রতোয়ার নতুন দ্বীপে পলাতক এক আসামি আত্মগোপন করেছিল। কেবল আত্মগোপনই করেনি, সেখানে নিজের নতুন একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

এ পথের একমাত্র অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক দুর্যোধন আগে আগে, তার পেছনে বিস্মিত হারাধন পাইক।

দুর্যোধনের বার বার হুঁশিয়ারি, সামলি (সামলে) বাপ, সামলি, আমার কাছা ধরিকি আয়।

থই থই জলরাশির অকূল পাথারে হারাধন দিশেহারা। সে বাঁ হাতে দুর্যোধনের নেংটির পেছন জাপটে ধরে চলেছে। একবার গভীরে পড়ছে, পরক্ষণে ডাঙায় উঠছে।

পিচ্ছল কী একটা হারাধনের শরীর স্পর্শ করে চলে যেতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, বোড়ো বাবা, কী গুটে (একটা) গা ছুঁইকি চালি গেলা।

দুর্যোধনের উত্তর, ও কিছু নয় বাপ, কেঁচুয়া (কেঁচো)।

সূর্যাস্তের রঙে তখন আকাশ আর সমুদ্র একাকার। ঝড়ো হাওয়া বয়ে আসছে বাহার গাঙ থেকে।

হারাধন পাইক দেখল কচ্ছপের পিঠের মতো একটা ঢিবি। তার ওপর খড়ে ছাওয়া একটা টঙ্ (ছোট্ট আকারের একটা ঘর)। টঙের প্রবেশ মুখে সিড়িঙ্গে একটা তালগাছ। ঘাড় কাত করে দেখতে লাগল সে!

দুর্যোধন পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে উঠে গেছে ততক্ষণে। পেছন ফিরে সে ডাক দিল, খাড়াহি (দাঁড়িয়ে) রইলু কেনিরে বাপ, উঠি আয়।

ওপরে উঠে হারাধন আর একটা ছবি দেখতে পেল। চিত্রতোয়া এখানে স্পষ্ট দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। কচ্ছপের মতো বিরাট ঢিবিটার পশ্চিমে সরু খালের মতো একটি জলধারা। তার পরই ঘন গাছগাছালির একটা নাতিদীর্ঘ জঙ্গল। জঙ্গলের শেষ প্রান্তই সমুদ্রের সীমানা।

ঢিবিটার পশ্চিম গা ঘেঁষে আরও দুটো চালাঘর দুর্যোধনের। একটাতে গোরু থাকে, অন্য চালায় সংবৎসরের খোরাকি ধান বোঝাই।

শীতকালে সমুদ্রপথে মাল বোঝাই একখানা নৌকো এই চড়ায় এসে লাগে। দুর্যোধন কোমর জলে নেমে ওই নৌকোয় ধান বোঝাই দেয়। টাকাপয়সা নেয় না, চিড়েগুড়, নারকোল, কাস্তে, কোদাল, দড়ি, বাঁশ, নুন তেল মশলা, কাপড়চোপড় সংগ্রহ করে নেয়।

নৌকোর এ তল্লাটে আসার কথা নয়। ক্রোশ খানেক দূরে চিত্রতোয়ার প্রধান স্রোত ধরে সব কটা নৌকো যাতায়াত করে। এই বিপদসংকুল চড়ার দিকে অকারণে আসার তাগিদ বোধ করে না কেউ।

কিন্তু একটি নৌকো ঘন কুয়াশায় পথ হারিয়ে এক সময় এসে পড়েছিল দুর্যোধনের ডাঙায়। কুয়াশা কেটে গেলে নৌকোর মালিক আর মাঝিদের নিজের টঙে ডেকে নিয়ে এসে খুব খাতির যত্ন করেছিল দুর্যোধন। সেই থেকে লেনদেনের সূত্রপাত। উভয় পক্ষেরই লাভ। তাই বছরে একবার করে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নৌকোটা এসে দুর্যোধনের ডাঙায় লাগে। এই একটিমাত্র নৌকোর মাধ্যমে বাইরের জগতের সঙ্গে দুর্যোধনের যা যোগাযোগ।

পূবদিকে টিবির নীচে খানিকটা জমি জুড়ে দুর্যোধনের চাষআবাদ। আর পশ্চিমে সবুজ ঘাসে ভরা গোরু চরানোর ছোট মাঠ। গরুবাছুরের যোগান আসে ওই নৌকোতেই। মালিক ত্রৈলোক্য সাউ বড় সাচ্চা লোক। দুর্যোধনের বয়সি হবে মানুষটা! শীতকালে যখন আসে তখন দুটো দিন দুর্যোধনের অনুরোধে কাটিয়ে যায় তার ডেরায়। মহাজন বলে অহংকার নেই ত্রৈলোক্য সাউর।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। একটা হিসহিস শব্দ চারদিকে। হারাধন পাশে শুয়ে-থাকা দুর্যোধনের গায়ে ঠেলা দেয়। গলা ফুটে তার আওয়াজ বেরোয় না। ভয়ে শিরশির করে ওঠে হারাধনের শরীর।

দুর্যোধন জেগে উঠেছে। হারাধনকে আশ্বস্ত করে সে বলে, ও কিছু না, ময়ালটা। বননু (বন থেকে) বারি (বেরিয়ে) আসছি। হাঁস-মুরগি খুঁজুছি। তুই শুই যা বাপো, কুন ভয় নাই।

কিছু পরেই নাক ডাকতে শুরু করে দুর্যোধনের। পরম নিশ্চিন্ত সে। জলে-জঙ্গলে বাস করলে জীবজন্তু, পাখপাখালি, সাপখোপই তো হবে প্রতিবেশী! যেখানে আর কোনও মানুষের মুখ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেখানে ওরা শুধু প্রতিবেশী নয়, তার চেয়েও কিছু বেশি, অন্তরঙ্গ সহচর।

এই সহজ বোধটুকু জন্মায়নি বলে সে রাতে হারাধন জেগে থাকে। কতক্ষণ সাপের ফোঁসফোঁসানি, পাখিদের ঝটাপটি, কুক বাঘের ডাক শুনে চমকে উঠে বসেছে বিছানায়। চোখ উপচে জল গড়িয়েছে। ভয়ে সিঁটিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

ক'দিন যেতে না যেতেই সয়ে গেছে সব। শুধু সয়ে যাওয়া নয়, অনেক সাহসী হয়ে উঠেছে সে। এখন আর রাতে ঘুম ভেঙে যায় না।

ভোরবেলা উঠেই বৈতালপখিরা ধানের লাল মোটা চালের পান্তা খায় দু'জনে পেট পুরে। গুজরি লঙ্কা একটাতেই দশটার কাজ। পাকা সূর্যমুখী লঙ্কারও ভারী তেজ। গুলে নিলে পুরো থালার পান্তাই গর্গর্ করে। তরিবত আছে দুর্যোধনের খাবার। আগের রাতে কাঁকড়া, চুঙুর (চিংড়ি) যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে তেঁতুলের একটা টক বানিয়ে রাখে। পান্তার সঙ্গে সেই লুদলুদে (ঘন থকথকে) টক, অমৃত।

এরপর সারাদিন কাজে ডুবে থাকা। কখন খেতের কাজ, কখন মাছ ধরা, আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে গোরু বলদের পরিচর্যা।

রান্নার কাজ এক ফাঁকে সেরে রাখে দুর্যোধন। হারু তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে সে আমল দেয় না। নিজের হাতে পঁচিশটা বছর রান্না করে এখন আর কারু হাতে ছেড়ে দিতে মন চায় না দুর্যোধনের।

দিনগুলো যে কোথা দিয়ে কেটে যায় তা বুঝতে পারে না হারাধন পাইক।

কাজ করতে করতে দুর্যোধন বলে, নিজের ইচ্ছার তু কাম করিবু, ইচ্ছা নইলে করিবু নাই। এতে কাম ভাল হব।

কাজের মাঝেই কোনও কোনওদিন বলে, যা বুলি (ঘুরেফিরে) আয়।

হারু বলে, কাম বাকি রোখি যিবি নাই।

দুর্যোধন মনে মনে খুশি হয়। হারুর অবস্থা এখন আঠালিয়া (এঁটেল) মাটির মতো। জায়গাটাকে আঠার মতো জড়িয়ে ধরেছে।

রাগ আছে হারুর। খালে নেমে থির জালের দু'প্রান্ত ধরে টানছে দু'জনে। দু'বারে তেমন কিছু উঠল না। অমনি জলে জাল ফেলে দিয়ে উঠে পড়বে ডাঙায়। দুর্যোধনের শত অনুরোধেও আর খালে নামবে না।

রাগ নেই দুর্যোধনের শরীরে। হারুর এই রাগ আর অবাধ্যতাটুকু সে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। কিন্তু এটুকু সে বুঝেছে বোড়ো বাবার ওপর হারুর টান আছে। পোটেই (ভেটকি) বা পথরমুড়ি (ভোলা) মাছের মাথা হারুর পাতে দিলে সে জোর করে সেটি বোড়ো বাবার পাতে ফেলে দেবেই। শেষে দুর্যোধনেব অনেক অনুরোধ ও মধ্যস্থতায় ভাগাভাগি হবে মুড়ো।

হারাধন খেতে খেতে হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে দুর্যোধনের পাতে দিয়ে দেবে। দুর্যোধন তার অক্ষমতা জানালে হারাধন বিজ্ঞের মতো বলবে, খাও ত, পেটে পড়ি রইলে উবগার (উপকার) হব।

ইচ্ছে না থাকলেও ও'ক'টি ভাত খেতে হয় দুর্যোধনকে। আচ্ছা, পঁচিশ বছরে একমুঠো বেশি ভাত কেউ কি তাকে আদর করে খেতে বলেছে?

দুপুরবেলা প্রচণ্ড রোদের তাপে মাটিতে লাঙল দিচ্ছিল দুর্যোধন। পাশে সবজি বাগানে ভেড়ি জনি ঝিঙা ছচিনা (চিচিঙ্গা) আর বাইগুন (বেগুন) গাছের পরিচর্যা করছিল হারু। সে কাজের ফাঁকে লক্ষ করছিল দুর্যোধনের অবস্থা। মাঝে মাঝে তেড়েফুড়ে চেঁচাচ্ছিল, বোড়ো বাবা উঠি পড়ো, ঘামে যে গা ভাসি গেলা।

দুর্যোধন হেঁকে জবাব দেয়, শলা কিটনা (অবাধ্য জ্বালাতনকারী) হালিয়া (বলদ) দুটাকে জব্দ করিকি উঠিব।

আবার কিছুক্ষণ যায়। হারু কাজের ফাঁকে আড়চোখে দেখে, বলদ দুটোর ল্যাজ মুড়ছে দুর্যোধন। ল্যাজে মোড়া খেয়ে কিছু সময় বলদ দুটো তেজি ভাব দেখায়, তারপর যে-কে-সেই। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে যেন জাবর কাটছে।

হুংকার তোলে দুর্যোধন। খেজুর ডাঁটির ছড়ি চালায় পিঠে। বলদ দুটো নড়ে না, ঠিট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা যেন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে ল্যাজে পাক না পড়লে নড়বে না।

সবজি খেত থেকে উঠে আসে হারু। দুর্যোধনের হাত থেকে ছড়ি কেড়ে নেয়। বলে, কী দশা হিছে তুমার, নিজের মুখ তো নিজে দেখিতে পাওনি। গোরুগুলা যে মরি যাবে খরায়। উঠো তো।

নিজের ময়লা গামছাখানা কোমর থেকে খুলে নিয়ে দুর্যোধনের ঘাম জবজবে গাটা হারু রগড়ে মুছে দেয়। দুর্যোধন কী যেন একটা অনুযোগ তোলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেটা তার মুখেই থেকে যায়। একটা তৃপ্তির ঢেউ তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

সন্ধের আগের মুহূর্তটা হারাধনের কবিত্ব লাভের সময়। এ সময় কোনও কাজেই দুর্যোধন তাকে ডাকে না। নিজে শেষবেলায় রাতের রান্না সেরে নিতে টঙের ভেতরে ঢোকে। কুলুঙ্গি থেকে রান্নার জিনিসপত্র পাড়ে। উনুন ধরিয়ে হাঁড়িতে ভাত চাপায়। কতক্ষণ পরে টগবগ করে ভাত ফোটার শব্দ হয়। দুর্যোধন হাঁটুতে দাড়ি ঠেকিয়ে ঝোরকার ফাঁকে বাইরে তাকায়। উদ্দেশ্য হারুকে দেখা। পড়ন্ত বেলায় চরাচর জলস্থল রাঙা হয়ে ওঠে। হারু দু'খানা হাত পাখার মতো সমুদ্রের হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে চরের পাখিদের সঙ্গে ওড়ার খেলায় মাতে। কখনও বা ধীরে ধীরে হেঁটে যায় চিত্রতোয়ার মোহনার দিকে। চিন্তিত হয় দুর্যোধন। যেমন খ্যাপাটে ছেলে, রাত ঘনিয়ে ওঠার আগে ফিরলে হয়। জঙ্গলের পাশ দিয়ে সিধে রাস্তা। যাবার সময় চর ঘুরে যায়, ফেরার সময় সিধে রাস্তা ধরে আসে। নদীর মোহনায় বগ (বক) আর বলদিয়ার (লালচে রঙের পাখি, বকের চেয়ে ছোট আকারের) সারি বসে থাকে। এত পাখি তবু একটুও কলরব নেই। যেন ধ্যানস্থ হয়ে আছে। হারু ওদের ধ্যান ভাঙায় না। ও মোহনার কাছে পৌঁছে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অবাক হয়ে জলের বিস্তার আর সূর্যাস্তের খেলা দেখে! সে সময় হারুর চোখ অন্য কোনও দিকেই যায় না। কোনও শব্দও সহসা তার কানে পৌঁছোয় না।

হারুর এই নিজের মধ্যে হারিয়ে যাবার অবস্থাটা একাধিক দিন চোখে পড়েছে দুর্যোধনের। সে ধ্যান ভাঙেনি হারুর। পূর্বজন্মে সৎকুলে হয়তো ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ছেলেটা।

কোনও কোনওদিন হারুর ফিরে আসতে সন্ধে বেশ গাঢ় হয়ে ওঠে। ভাবনায় পড়ে যায় দুর্যোধন। বনের ধার দিয়ে ও নির্ঘাত ফিরবে। অবশ্য বাঘ ভালুক নেই এ জঙ্গলে কিন্তু লতা তো আছে। সন্ধ্যা নামলে আর সাপ নামটা উচ্চারণ করে না দুর্যোধন, তখন সাপ হয়ে যায় লতা। মণিচূড়, শঙ্খচূড়, অহিরাজ কত রকম সাপ যে বাসা বেঁধেছে ওই জঙ্গলটায় তার লেখাজোখা নেই। পঁচিশ বছরে দুর্যোধন অনেক দেখেছে। আগে দূর থেকে সাপ দেখলেই ডিগবাজি খেয়ে পড়ত, এখন ওসব গা-সওয়া হয়ে গেছে। তুমি না তাড়া করলে সে তোমাকে তাড়া করবে না। গাছের গুঁড়ির ওপর দিয়ে সাপ চলে যায়, কই ছোবল মারে না তো। তবে মানুষ যদি নড়াচড়া না করে পড়ে থাকে, তাহলে সাপ তাকেও বা ছোবল মারবে কেন।

কেবল অন্ধকারকে ভয়। জঙ্গলের পাশ দিয়ে আসতে গিয়ে যদি শঙ্খচূড়ের ল্যাজে পা পড়ে যায় তাহলে আর রক্ষে নেই। ছেলেটার জন্যে তাই ভাবনা দুর্যোধনের।

বর্ষায় ঘটনাটা ঘটল।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি বেশ ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। পুরোদমে চলছে চাষের কাজ। বেলা শেষ না হলেও মেঘ-বৃষ্টিতে কেমন ঝাপসা হয়ে এসেছে। কাজ করতে করতে হাতের ব্যান (ধানের চারা) দুর্যোধনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে হারু ছুটল জোরের (ঝিলের) দিকে। এই জোর (ঝিল) থেকেই ওরা খাবার জল নিয়ে আসে। স্বচ্ছ পরিষ্কার বৃষ্টির জল সারা বছরের জন্য ধরা থাকে

এই ঝিলটায়। খাবার জল কোনও রকমে কলসি ডুবিয়ে নেওয়া গেলেও স্নান করার সুবিধে নেই এই ঝিলে। চারদিক ঘিরে বেরছা ঘাসের জঙ্গল। শীতকালে ওই ঘাস কেটে এনে দুর্যোধন হেঁসের মাদুর তৈরি করে। জুন, রগড়া সব রকম ঘাসই আছে ঝিলের পাড়ে। বেশ কিছু জংলা গাছও আছে। শুকনোর দিনে ওইসব গাছের ডালপালা কেটে জ্বালন তৈরি করে রাখা হয়। ওই জঙ্গলের ধারেই ঝিল, মাঝখানে একটা খালের ব্যবধান।

বর্ষার জল গড়াচ্ছে ঝিলে। কালো মাছ উঠবে ওই পথে। বেশ ভাল করে নালা কাটিয়ে অন্ধুলি (বাঁকি) বসিয়ে দিয়ে এসেছে হারাধন। এখন মনে পড়তেই ছুটেছে ঝিলের ধারে।

অন্ধুলিটা আবছা আলো-আঁধারিতে তুলে ধরতেই দারুণভাবে নড়ে উঠল। কাঠিগুলো যেন ভেঙে ফেলবে মাছটা। ওপরে এনেই হারাধন ঝাড়তে লাগল অন্ধুলি। মাছটা কি বেরোয়। কালো একটুখানি ল্যাজের মতো দেখা গেল। মস্ত বড় একটা বান মাছ বলেই মনে হয়। ল্যাজটা ধরে হড়াস করে মাছটাকে টেনে আনল অন্ধুলি থেকে। ওরেব্বাস, ইয়া লম্বা একটা সাপ।

ততক্ষণে সাপটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে হারাধন। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচানি, বোড়ো বা-বা, মরি গেলি গো। সাপ, সাপ।

ব্যান বইবার বাঁকটা নিয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝিলের দিকে ছুটল দুর্যোধন। সাপ ততক্ষণে একটিমাত্র রাস্তা অবরোধ করে ফণা দোলাচ্ছে। সেদিক থেকে বেরিয়ে যাবার পথ নেই। সাক্ষাৎ যম দক্ষিণ দুয়ারে। সাপ এগিয়ে এলেই কালো ঝিলের অথৈ জলে পড়তে হবে। সে কম ভয়ংকর নয়।

দুর্যোধন ঝিলের পাড় ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে আসতে চেঁচাচ্ছে, লড়বুনি (নড়বিনা), দম বন্ধ করিকি খাড়া হি র (দাঁড়িয়ে থাক)। কুন (কোনও) ভয় নেই।

সাপ ততক্ষণে ফোঁস করে মাটিতে একটা ছোবল বসিয়েছে। অমনি বাপ্ বলে হারাধন ঝাঁপ দিয়েছে ঝিলে।

এসে গেছে দুর্যোধন অকুস্থলে। মহাবিক্রমে সে ঘা বসালে সাপের পিঠে। মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে বেঁকে দুমড়ে গেল এত বড় সাপটার। তারপর দু'-চারবার চিত-উপুড়ের চেষ্টা করে একেবারে কাত হয়ে পড়ল। ততক্ষণে দুর্যোধনের হাতের বাঁকের আরও দু'-চার ঘা পড়ে গেছে।

এবার হারাধনের উদ্ধারপর্ব। জুন ঘাস জাপটে ধরে ঝাঁপাই ঝুড়ছে হারাধন। সারা ঝিলে আর্ত কোলাহল তুলে পাখা ঝাপটে পালাচ্ছে বতক হাঁসের দল।

বাঁকটা দুর্যোধন এগিয়ে দিতে, সেটা ধরে অনেক কসরত করে ডাঙায় উঠে এল হারাধন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধন সজোরে গালে কশাল এক চড়। মাথা ঘুরে যায় আর কি।

আধাপুত্‌রিয়া, তোকে কেত্তেবার না বারণ করিলি জোরে (ঝিলে) অন্ধুলি বসিইতে যিবু নাই, তবু বেধা বাচ্চা (বেজন্মা) কথা শুনিল আমার।

মার খেয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল হারু পাইক! জুনের ঘাসে ঘষা লেগে তার হাত কেটে রক্ত দেখা দিয়েছে। কিন্তু শোক তার জন্যে নয়। এতবড় ভয়ংকর উত্তেজনা আর ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে উদ্ধার পাবার পরও তার এই পুরস্কার! সবচেয়ে আপনজনের কাছ থেকে এই আঘাত!

দুর্যোধন তার পিঠে ঠেলা দিতে দিতে নিয়ে গিয়ে তুলল একেবারে টঙে। গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে শুকনো কাপড় পরিয়ে হলুদ গরম করে হাতের পাতায় লাগিয়ে দিলে। দুধ গরম করে

ভাত মেখে নিজের হাতে খাওয়ালে। আঁচিয়ে দিয়ে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে।

এত পরিচর্যায় কান্না থেমে গেছে হারাধনের। উত্তেজনার শেষে যেমন মানুষ ঝিমিয়ে পড়ে, সেও তেমনি বিছানায় এলিয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে জড়িয়ে গেল চোখ।

খেয়ে এসে বিছানার একপাশে বসে রইল দুর্যোধন। মনে ভারী অনুতাপ, ছেলেটাকে মারল সে। কোনওদিন কারু গায়ে হাত তুলেছে বলে তো মনে পড়ে না। আর তুলবেই বা কার গায়ে। নিজের বলে তো কেউ নেই তার। সত্যভামা পাঁচটা বছর ঘর করেছিল তার সঙ্গে। সেও টিকল না।

ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঝকঝকে একটা বিদ্যুৎ চরাচর আলো করে দিল। ঝোরকা দিয়ে আলোর ঝলক এসে পড়ল, তাতে হারাধনের মুখখানা পলকে ফুটে উঠল দুর্যোধনের চোখের ওপর। মায়ায় বন্দি হয়ে গেল দুর্যোধন। গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে আপন মনে বলল, তুই আমার পো, তুই আমার সব। সব্বু (সবকিছু) তোর।

হঠাৎ চোখের ওপর ফুটে উঠল সত্যভামার মুখখানা। সে যেন বলছে, কী দেইছ (দিয়েছ) তুমি আমাকে? তুমার পাপে আইজ আমি আঁটকুড়ি।

দুর্যোধন চমকে ওঠে। তার মনে হয় সত্যি সত্যভামার মতো দুঃখী কে আছে। আজ পঁচিশ বছর পরে হলেও সে একটা ছেলেকে কুড়িয়ে পেয়েছে। তাকে লালন পালন করে, তাকে চোখের সামনে অহরহ দেখে সে কত সুখী। কিন্তু সত্যভামা কী পেয়েছে? শুধু সোয়ামির সোহাগ পেলে কি মেয়েমানুষের মন ভরে। দুধের দুটি কলস শূন্য করে দিয়ে ফোক্‌লা মুখে যে শিশুটি হাসবে, সে কই? না, তাকে সত্যভামার কোলে এনে দিতে পারেনি দুর্যোধন।

পঁচিশ বছর পরে সত্যভামাকে তার এই রাজ্যে পিতিষ্ঠে করবে বলে খুঁজতে গিয়েছিল দুর্যোধন। দেখাও পেয়েছিল তার। রাজার বাড়ি বাসন মেজে খায়। অনেক সেধেছিল, কিন্তু এল না। শেষে অদ্ভুত হাসি হেসে বলেছিল, তখন তবু টিকে (একটু) আশা থিলা (ছিল), অখন সে গুড়েও বালি। তুমি যাও, মু যিবানি।

হাসিতে শব্দ হয়নি, তবু হাহাকারের মতো শুনিয়েছিল সত্যভামার হাসি।

ফিরে আসার সময় গোপনে ঢুকেছিল একবার নিজের ভিটেতে। একী! একেবারে চেনাই যায় না। রাজা তার ভিটের ওপর কাঁঠালের বাগান তৈরি করেছে। কী আশ্চর্য! সব গাছগুলোই ফলন্ত। নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত ডাল ভরে কাঁঠাল। দুর্যোধনের সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়েছিল, ওগুলো একটাও কাঁঠাল নয়, সব ক'টাই কচি কচি ছেলে, গাছের ডালে ডালে হুটোপুটি করে খেলছে।

বাইরে গভীর অন্ধকার। বৃষ্টির চাপা শব্দে মনে হচ্ছে কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে। স্মৃতির পথে আরও অনেক দূর এগিয়ে গেল দুর্যোধন।

অতি ছোটবেলায় মা-বাপকে হারিয়ে নানির (দিদিমার) কাছে মানুষ সে। দিদিমাও একা। চাষবাসের জমি নেই তাদের, একখানা মাঝারি আকারের ভিটে। সেখানেই খেলাধূলায় শৈশব কেটেছে তার। জাত ব্যবসায়ে তারা কোরঙ্গা। পশুদের খাসি করাই তাদের কাজ। কিন্তু বাপ মরা ছেলে সে পথে গেল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা কাজের ভেতর সে জড়িয়ে পড়ল। কাজটা তার নানির, সে হল সাহায্যকারী। ধীরে ধীরে সে পদ্ধতিটা তার আয়ত্তে এসে গেল। নানি মারা গেলে পুরোপুরি কাজের ভারটা এসে পড়ল তার ওপর।

আইবুড়ো মেয়েরা যখন ভুল পথে পা বাড়িয়ে সন্তান পেটে ধরত, তখন তাদের গর্ভপাত করিয়ে অপবাদের হাত থেকে রক্ষা করত দুর্যোধন। অত্যন্ত গোপন গ্রাম্য একটা পদ্ধতি নানির কাছ থেকে রপ্ত করেছিল সে। পাতলা বাঁশের চোঁচ দিয়ে বানানো একটা অস্ত্র আর একটুকরো শেকড়। ব্যাস। অতি যন্ত্রণাদায়ক ভয়ংকর একটা অনুষ্ঠান, মরণও ওত পেতে থাকত, কিন্তু দুর্যোধনের হাত থেকে যম তার একটিও খদ্দেরকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

সকলে বলে গর্ভপাত করানো পাপ, সে কিন্তু একথা মনের থেকে মেনে নিতে পারেনি কোনওদিন। ভুল কে না করে? দেব্‌তা, মুনি-ঋষির পা ফসকে যায়, মানুষ তো কোন ছার। কত মান্যিগণ্যি লোক অন্ধকারে মুখ ঢেকে আসে তার কাছে। তার মতো একটা অতি সাধারণ জাতের লোকের হাত ধরে সে কী অনুনয়বিনয়। মেয়েটাকে রক্ষা করো, লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচাও দুর্যোধন। সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে, পয়সাকড়িও পাওনা মতো পায়। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় আনন্দ, মেয়েটা তো বাঁচল।

বাবুভায়াদের সঙ্গে তার একটা রাতের যোগাযোগ, তারপর যে-যার পথে চলে যায়। হাটে মাঠে ঘাটে দেখা হয়ে গেলেও, কেউ কাউকে ডেকে কথা বলে না। না-চেনার ভান করে হনহনিয়ে চলে যায়। দুর্যোধন আগে দুঃখ পেত তারপর সব গা-সওয়া হয়ে গেল।

বিয়ে করে দুর্যোধন বউ নিয়ে এল ঘরে। সত্যভামা ঘরের মানুষের হালচাল দেখল। তার ভাল লাগল না সোয়ামির কাজকারবার। কিন্তু কী আর করে, মুখ বুজে সইতে হল। দুর্যোধনের ওই তো একটিমাত্র পথই খোলা আছে রোজগারের।

কিন্তু বছরের চাকা যত ঘুরতে লাগল, সত্যভামার মন-মেজাজ তত ভারী হয়ে উঠতে লাগল। ছেলেপিলে এল না কোলে। এখন শুধু খাওয়াপরায় তার রুচি নেই; সে মা হতে চায়। কোন মেয়ে না তা চায়, কিন্তু সবার কপাল কি সমান। সত্যভামার মা হবার সম্ভাবনা যত কমতে লাগল, ততই তার মেজাজ গেল খিঁচড়ে। সে উঠতে-বসতে তার ভাগ্যের জন্যে দোষ দিতে লাগল দুর্যোধনকে।

তুমার তরে আমার আইজ (আজ) ওউ (এই) দশা।

দুর্যোধন বলে, কেনি, আমি তোর কী করলি?

সত্যভামা খেপে গিয়ে বলে, তুমি, তুমি যত নষ্টের গোড়া।

দুর্যোধনের মুখও কুঁচকে যায়, কেনি, কেনি ক ত ?

গভ্যপাত করিকি টকা (ছেলে) নষ্ট করিছ (কোরছ), সে পাপ লাগবেনি?

ক্রোধে অন্ধ হয়ে যায় দুর্যোধন, তুই থাম, নিজে বাঁঝা (বন্ধ্যা) হি কি (হোয়ে) জন্মিছ, অখন আমার কম্মে দোষ চাপাউঠু (চাপাচ্ছ)।

কতক্ষণ ধরে আস্ফালন, অভিযোগ, কান্নাকাটি চলে সত্যভামার। শেষে অনেক কষ্টে সত্যভামার ক্ষোভের আগুনে ছাই চাপা দেয় দুর্যোধন। কিছুদিন জোড়াতালি দিয়ে কাটে, তারপর ছাইচাপা আগুন আবার একদিন বেরিয়ে পড়ে।

পাঁচ বছর পরে এমন হল যে, সত্যভামা দুর্যোধনকে ফেলে পাশের গাঁয়ে বাপেরবাড়ি চলে গেল। শাসিয়ে গেল, এ পাপ ব্যবসা না ছাড়লে সে আর দুর্যোধনের ঘর করতে আসবে না। শুধু তাই নয়, দরকার হলে উপযুক্ত শিক্ষাও দিয়ে দেবে।

ভয় পায়নি দুর্যোধন, বউকে ফিরিয়ে আনতেও যায়নি। যে নিজের ইচ্ছায় ঘর ছেড়েছে, সে নিজের গরজে না ফিরলে তাকে সেধে আনতে যাবে না দুর্যোধন।

ক'মাস পরে একটা ঘটনা ঘটল আর সে ঘটনায় জড়িয়ে পড়ল স্বয়ং দুর্যোধন।

শ্রাবণ মাস। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। সাঁজ পহরে ভেজা ভাত ক'টা খেয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল দুর্যোধন। ভীষণ আওয়াজ করে একটা বাজ পড়ল কাছেপিঠে কোথাও। দরজার বাইরে শেকলটা ঝনঝন করে উঠল।

দুর্যোধন বাজের শব্দে তরাসে চমকে উঠে বসেছিল। বাজের আওয়াজ থামল কিন্তু বাইরের শেকলটা বার বার নড়ে নড়ে উঠতে লাগল।

দুর্যোধন ঝোরকায় মুখ রেখে হাঁকল, কে ?

দরজা খুল, কথা আছে, আমি রাজবাড়িনু (রাজার বাড়ি থেকে) আসুছি।

ধড়ফড় করে বিছানা থেকে নেমে টেমি জ্বেলে দরজা খুলল দুর্যোধন। এ কী দেখছে সে! নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। বড় বাড়ির বুড়ো দেওয়ানমশাই।

মাটিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল দুর্যোধন।

পড়ি কি মরি করে একটা মাদুর জোগাড় করে দাওয়ায় পেতে দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল। টেমির কাঁপা কাঁপা আলোয় দুর্যোধনের ছায়াটা কাঁপছিল।

আমার সঙ্গে ওক্‌খুনি (এখুনি) যাইতে হব।

দেওয়ানমশায়কে কোথায় যেতে হবে, সেকথা জিজ্ঞেস করার মতো বুকের পাটা নেই দুর্যোধনের। সে শুধু বাঁদিকে তার মাথাটা যদ্দুর সম্ভব কাত করে বলল, আজ্ঞা হঁ।

বুড়ো দেওয়ান বলল, অনেক টংকা (টাকা) পাইবু (পাবি), কাজটা সাবধানে করতে হবে।

সেই একই উত্তর দুর্যোধনের মুখে, আজ্ঞা হঁ।

চটপট, বার্‌হি (বেরিয়ে) পড়। সঙ্গে যা লিবার লি লে (নিয়ে নে)।

প্রস্তাবটা কী তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি দুর্যোধনের। সে একটা বড় বটুয়ার ভেতর তার সামান্য যা যন্ত্রপাতি তা ভরে নিল।

একখানা পাখিয়া (তালপাতার তৈরি, মাথা ও পিঠের আবরণী) মাথায় চাপিয়ে সে দেওয়ানমশায়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

বুড়ো মানুষটি কী করে যে এতখানি পথ একা এই দুর্যোগের রাতে এসেছে তা অনুমান করতে পারল না দুর্যোধন। কাদায় পিছল হয়ে গেছে পথ। দুর্যোধন নায়েবমশায়ের হাত শক্ত করে ধরে নিয়ে এগোতে লাগল।

দুর্যোধনের গলা দিয়ে প্রথম স্বর বেরুল, টিকে (একটুখানি) টুংকার (ইংগিত) দিলে আমিই আপনকার ঘরে যাইতি (যেতাম), আপনি আইলন (এলেন) অত (এত) কষ্ট করিকি।

বুড়ো দেওয়ান টাল সামলাতে সামলাতে বললেন, কাক পক্ষীর জানিবার কথা নয়, তাউ (তাই) নিজে আইলি। হাঁ আর গুটে (একটা) কথা মনে রাখব, এ কথা দু'কান হিলে তোর কণ্ঠায় রাজাবাহাদুর গরম সিসা ঢালি দিবে।

অন্ধকারেও জিভ কেটে দুর্যোধন বলল, আপনকার ঘরের কথা ছাড়ি দউন, হেঁজিপেঁজির (অতি সাধারণ মানুষের) ঘরের কথাও আমার পেট চিরিকি (চিরে) কো (কেউ) বার করিতে পারিবনি।

অন্ধকার খিড়কির সম্পূর্ণ অজানা পথে রাজবাড়িতে ঢুকল দু'জনে। অতি বৃদ্ধা একজন দাসী হাতে মোমের বাতি ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

অনেক গোলকধাঁধায় ঘুরে তারা শেষে একটা ঘরে এসে পৌঁছোল।

চোখ ঘুরে গেল দুর্যোধনের। সেজের বাতি জ্বলছে। সাদা পাথরের কাজ করা খাটের ওপরে ধবধবে উঁচু বিছানায় বসে আছে শালুক ফুলের মতো একটি মেয়ে। নতমুখে বসে আছে মেয়েটি।

মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ানমশাইকে দেখতে গেল দুর্যোধন। না, ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সেই বৃদ্ধা দাসী।

দুর্যোধন হাতছানি দিয়ে দাসীটিকে কাছে ডাকল। দাসী ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দুর্যোধনের কাছে এসে দাঁড়াল।

দাসীকে দুর্যোধন বলল, মাউসি (মাসি), টিকে (একটু) ধোরতে হবে।

দাসীটি মাথা নাড়লে মেয়েটিকে বিছানা থেকে নেমে আসতে বলল দুর্যোধন।

মেয়েটি নেমে দাঁড়াতেই দুর্যোধনের মাথা যেন ঘুরে গেল। এ অবস্থায় গর্ভপাত করতে গেলে মেয়েটিকে বাঁচানো যে দায় হবে! সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দাসীকে বলল, দেওয়ানমশাইকে একবার ডাকি দওত মাউসি।

দেওয়ানের সঙ্গে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নিভৃতে কথা হল দুর্যোধনের। দেওয়ানমশাইয়ের সাফ কথা, চেষ্টার কত্তা তুমি, ভাগ্যের মালিক তুমি আমি কো (কেউ) নয়।

দুর্যোধন কাঁপা গলায় উত্তর দিল, আপুনি সাহস দিলে কাজ্জ আরম্ভ করি।

দেওয়ানমশাই মাথা নেড়ে বললেন, রাজাবাহাদুরের মা-মরা ওউ গুটে (একটি) কইন্যা, তুই একে যদি সুস্থ করি তুলতে পারু, তাহিলে সারা জীবন তোর ভাবনা রইবেনি দুয্যা।

দুর্যোধন মাথা নিচু করে বলল, বাবুমশাই, টংকার মু চাই কাম করিলে হাত কাঁপি যিব, আগুর (আগে) আমাকে কাজ করিতে দউন আজ্ঞা।

কাজ শুরু হল, নির্বিঘ্নে শেষও হয়ে গেল। দুর্যোধন শুধু অবাক হয়ে লক্ষ করল, এত বড় যন্ত্রণাদায়ক একটি কাণ্ড ঘটল কিন্তু মেয়েটি টুঁ শব্দও করল না। তার ঘরে যারা আসে, পাছে চিৎকারে জানাজানি হয়ে যায় তাই আগেভাগে একটা ছোট গামছা মুখে পুরে দিতে হয়। কিন্তু এ-মেয়ে একেবারে আলাদা।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দুর্যোধন মেয়েটির চোখের পাতায় শুধু দু'ফোঁটা জল দেখেছিল।

নায়েবমশাই তাকে খিড়কির দরজা পার করে দিয়ে বলেছিলেন, কীরে সঙ্গে যাইতে হব নাকি?

দুর্যোধন বলল, টকাবালানু (ছেলেবেলা থেকে) কত খেলছি রাজবাড়ির চারুধারে, আমাকে পথ চিনিতে হবেনি বাবুমশয়।

দেওয়ানমশয় একটা টাকার তোড়া ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নে ধর।

কী?

তোর সারা জীবনের খোরপোষ।

দুর্যোধন হাত জোড় করে বলল, দুটা টংকা দিউন আজ্ঞা।

দেওয়ানমশাই বললেন, যেতে (যত) টংকা চাই পাই যিবু এর ভিত্‌রে।

খালি দুটি টংকা কৃপা করিকি দিউন।

দেওয়ানমশায় থলের থেকে দুটো টাকা বের করে দিয়ে বললেন, সেকী রে! দুই টংকা, বস?

নানি মরিবার কালে কই যাইছে, দুই টংকার কম লিবু কিন্তু বেশি লি পারিবুনি।

একটু থেমে দুর্যোধন আবার বলল, বাবু, লোভ বাড়ি (বেড়ে) গেলে গরিবের উবগার আর করি পারিবনি।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দেওয়ানমশাই। তাঁর এতখানি বয়েস আর অভিজ্ঞতার ভেতর দ্বিতীয় আর একটি এমন নির্লোভ মানুষের মুখ মনে পড়ল না।

কয়েক মাস পরেই আবার এলেন দেওয়ানমশাই। সেদিন অন্ধকার রাত। প্রচণ্ড শীতে কাঁপছিল চরাচর। ছেঁড়া একখানা কাঁথায় আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল দুর্যোধন। অনেক সময় দরজা ধাক্কানোর পর সে ধড়ফড় করে উঠে বসে জানতে চেয়েছিল, কে? চাপা গলায় একটা পরিচয় পেয়ে টেমি জ্বেলে শশব্যস্তে দরজা খুলেছিল।

দেওয়ানমশাই নিজেই ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়েছিলেন আলোটা।

প্রাণে বাঁচিবার সাধ থাকিলে পলা। দেশ ছাড়িকি যেদিকে দু'চক্ষু যায় পলা (পালিয়ে যা)।

দুর্যোধন কাতর গলায় বলল, কী অপরাধ আমার হইছে বাবুমশাই, ভিটা ছাড়িকি জন্মের মতন চালি যাইতে হবে?

দেওয়ানমশায় যা বললেন তার মর্মার্থ এই, যোগ্য ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সব ব্যবস্থাই পাকা। এখন রাজাবাহাদুরের মাথায় একটা ভয় ঢুকেছে। যদি কোনওরকমে মেয়ের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে সমূহ বিপদ। তাই দুর্যোধনকে লোক লাগিয়ে এ-দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা নিয়েছেন তিনি। এখন ঘরে তালা ঝুলিয়ে ঠিকানাবিহীন কোনও জায়গায় প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে দুর্যোধনকে। নইলে নিষ্কৃতি নেই। দেওয়ানমশায় যুবক দুর্যোধনের বড় অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন, তাই তাকে প্রাণে বাঁচাতে গভীর রাতে ছুটে এসেছেন।

সেই শীতের রাতে ঘর ছাড়ল দুর্যোধন। যাওয়ার আগে দেওয়ানমশায় তার হাতে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন। সে অমনি বুড়ো মানুষটির পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছিল, প্রাণের চাইতে বোড়ো আর তো কিছু নাই বাবামশায়। সেইটা যখন দিলন আপুনি তখন আর কুন (কোনও) ছোট জিনিস লিতে পারিবনি।

দেওয়ানমশায় তখন এই জায়গার একটা হদিস তাকে দিয়েছিলেন। চিত্রতোয়া নদীর বনসীমা পর্যন্ত ছিল রাজার অধিকারে, কিন্তু মোহনার নতুন চরের ওপর তার কোনও অধিকার ছিল না। অস্পষ্টভাবে হলেও অভিজ্ঞ দেওয়ানমশায় এ-চরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতেন। তাই দুর্যোধনকে তিনি এ-পথে আসবারই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

বৃষ্টি সাময়িকভাবে থেমে গেছে। মেঘের হাঁকডাকও কমে এসেছে। শূন্যগর্ভ বিদ্যুৎ আকাশের একটি প্রান্তে শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ধানের খেতের আল জুড়ে ব্যাঙগুলো গলা ফাটিয়ে বৃষ্টিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল, এখন বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় তাদের উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়েছে। দুর্যোধন হারুর গায়ে হাতখানা ঠেকিয়ে তার পাশে পিতার পরিতৃপ্তি নিয়ে শুয়ে পড়ল।

৩

বর্ষা শেষে আকাশ ঝকঝকে নীল। ধবধবে পাহাড়ের মতো দু'-একটা মেঘকে কখনও-সখনও সমুদ্রের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অন্তত দূর থেকে তাই মনে হয়। ভোরবেলা ওই পাহাড়ের ফাঁকে সূর্যের উদয় হলে সে এক অপার সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি করে।

হারাধন খালের ওপর বাঁশের চারে (সাঁকোতে) দাঁড়িয়ে আশ্বিনের ভোরের এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে যায়। সংবিৎ ফিরে এলে সে হাঁকতে থাকে, বোড়ো বাবা, দেখি যাও, দেখি যাও।

গোয়ালঘরের ভেতর থেকে কর্মব্যস্ত দুর্যোধনের উত্তর আসে, কী ক'না?

শুনি যাও না।

ক্যাচনা (অর্ধ তরল নোংরা বস্তু) পরিষ্কার করছিল দুর্যোধন। হারুর ডাকে তাকে বাইরে আসতে হল।

এইঠি (এখানে) আসো।

গজরাতে গজরাতে দুর্যোধন সাঁকোর দিকে যায়। কাজকামের সময় যত বাগড়া। তবু যেতে হয়। ওর ডাকে সাড়া না দিলে এখুনি মুখখানা ভার করে ঘুরে বেড়াবে। সে দুর্যোধনের বুকে সইবে না।

দুর্যোধন সাঁকোর কাছে গিয়ে বলে, তোর জ্বালায় কি কাজকাম করি পারিবনি।

হারু দুর্যোধনের কোমরটা ডান হাতে জড়িয়ে ধরে বাঁ হাত ওই সাদা মেঘের পাহাড়ের দিকে প্রসারিত করে বলে, দেখো বোড়ো বাবা, মেঘের চারুবাড়ে (চারদিকে) কিধ্‌রা (কী রকম) সোনার মতন ঝিলিক মারে।

দুর্যোধন একার জীবনে পঁচিশ বছর ধরে এসব ছবি বহুবার দেখেছে। তবু হারুর উৎসাহকে উসকে দেবার জন্য বলল, কী ছবি দেখিলুরে হারু, চোখ দুটা জুড়িই গেলা।

ছোট-বড় যে কোনও জিনিস হারুর মনকে নাড়া দিলেই সে দুর্যোধনকে তার কাছে টেনে আনবে। দুর্যোধন বাইরে কাজের অজুহাত দেখালেও মনে মনে খুশি। হারুর আকর্ষণটা সে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে।

পাশের জঙ্গলে কো, কো কো কো, শব্দ করে প্রতি প্রহরে একটা পাখি ডাকে।

দরকারি কাজ ফেলে হারু ছোটে পাখির খোঁজে। জঙ্গলের লতাপাতা সরিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে সে পাখিটাকে খুঁজে বের করবেই।

পাখি নজরে পড়লেই চেঁচানি, বোড়ো বাবা—।

তার চেঁচানিতেই পাখি হাওয়া। দুর্যোধন কাছে গিয়ে বিক্ষোভ জানাবে, তোর জ্বালায় কি টিকে কাজ করি পারিবনি? কী দেখিইবু দেখা।

হারু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, উড়ি পলিইলা। লাল রঙের পাখি, পহরে পহরে ডাকে। কী নাম বোড়ো বাবা?

কুস্তাটুয়া।

একটু থেমে আবার বলে, গেন্দালিয়া পাখি চিনি পারিবু?

কিধ্‌রা দেখতে বোড়ো বাবা?

গলা উঁচা করিকি জলার ধারে বুসি রয়। বগের মতো। রংটা মাটিয়া সাদা।

পাখি চেনা হয় এমনি করে। এখন বনিপাখিরা (শালিকপাখি) আসর জমিয়েছে দুর্যোধনের টঙের সামনের চাতালে। ওখানে হারুর আসার পর থেকে ওদের রোজ বরাদ্দ ভোগের ব্যবস্থা। মুঠো মুঠো ধান-চাল ছড়ায় হারু।

বোঁ করে আধ পাক ঘুরে দুর্যোধন টব্‌নায় (খুব ছোট্ট পুকুর) ভৌরি জাল ছুড়ে মারে। টব্‌নার সঙ্গে খালের যোগে নোনা জল উঠে আসে জোয়ারে। সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে আসে জগর মাছ (পারসে)। হারু বড় ভালবাসে জগর মাছের ভাজা খেতে।

মাছের পেটে ডিম বেরুলে হারু আধখানা ভেঙে ফেলে দেয় দুর্যোধনের পাতে।

হাঁ হাঁ করে ওঠে দুর্যোধন, আমার মাছে বি ডিম অছি, তুই এটা খা।

ফিরিয়ে দিতে এলেই হাতের আড়াল রচনা করে হারু। দুর্যোধনের পাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, কাই দেখি।

তোর কিরা (দিব্য) আছে বাপ। দেখ।

আস্ত একটা ডিম পাত থেকে তুলে ফেলে দেয় হারাধনের পাতে।

হারু প্রতিবাদ করে বলে, আমি তো তুমাকে আধখঁড় (আধখানা) দিছি, তুমি গুটে দি দিল।

অতি স্নেহের সঙ্গে আবেগ মিশিয়ে দুর্যোধন বলে, আমার কিরা, খা বাপ। তুই খাইলে আমার খাওয়া হিলা।

গভীর অন্ধকার রাতে ঘুম ভেঙে যায় হারুর। পাশের জঙ্গল থেকে বিলুয়ার (শেয়ালের) ডাক শোনা যায়। একটা নয় অনেক অনেক। এমন আঁতকে উঠে হুয়া হুয়া করে ডাকতে থাকে যে হারু বিছানায় শুয়ে ভয় পেয়ে যায়। সে দুর্যোধনের গায়ে হাত ঠেকিয়ে তবে সাহস ফিরে পায়। অনেক সময় সে কান খাড়া করে থাকে। জঙ্গলে জানোয়ারগুলো যেন হুড়দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়েছে। কে যে কাকে গুঁতোচ্ছে, কামড়াচ্ছে, কে জানে। মাঝে মাঝে দুর্বল কোনও জন্তু হিংস্র বলবানের খপ্পরে পড়ে করুণ আর্তনাদ তোলে।

অহিরাজ বাচ্চা বরাকে (শুয়োর) পায়ের থেকে গিলতে থাকলে কাতর কাঁপা কাঁপা কান্না কতক্ষণ ধরে জলেস্থলে ছড়াতে থাকে। ক্রমে আওয়াজটা ক্ষীণ হতে হতে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

জঙ্গলের তিনটি জিনিসের ওপর অসীম আকর্ষণ হারাধনের। কঁকি পোক (রামধনু রঙের শক্ত আবরণযুক্ত পোকা) ধরে এনে পায়ে সুতো বেঁধে ওড়ানো। পলাঙ গাছের লাল-হলুদ ফুলের দিকে গুনুচিমুষার (কাঠবেড়ালি) তিরতির করে উঠে যাওয়া। আর অন্ধকার রাতে আলোর ফুলকির নাচ দেখাতে দেখাতে জুলজুলিয়া পোকাদের (জোনাকি পোকা) সারা তল্লাট ঘুরে বেড়ানো।

কৈশোর আর তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে এসে হারু বেশ শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। এ-সময়

ছেলেরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বিক্রম প্রকাশ করে, কিন্তু হারাধনের সে-সুযোগ কোথায়। তাই সে গদি সাপকে (গোসাপকে) চলতে দেখলে তার পেছনে তাড়া করে কতদূরে দিয়ে আসে। ধোবনিচড়াইকে (মাছরাঙা) বালিয়া বাঁশের (একরকম বাঁশ) খুঁটির ওপর বসে তীক্ষ্ণ চোখে জলের দিকে তাকাতে দেখলেই সে অব্যর্থ লক্ষ্যে ঢিল ছুড়ে তাকে উড়িয়ে দেয়।

অর্থহীন চীৎকার করতে করতে সে হাত দুটো পাখির ডানার মতো উড়িয়ে দিয়ে ঢিবির ওপর থেকে নীচে লাফাতে লাফাতে নেমে যায়। কখনও বা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চারদিকে তীব্রবেগে মুক্তোর দানার মতো জল ছিটোতে ছিটোতে পানিকুয়ার (পানকৌড়ি) পিছু নেয়।

হারুর এ-পরিবর্তন লক্ষ করে দুর্যোধন। তার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে সে বুঝতে পারে এ হল বয়ঃসন্ধিকাল।

এ-কালও পার হয়। কয়েক বছর পরে হারুকে যেন আর চেনাই যায় না। সে হয়েছে পূর্ণ যুবক। অর্জুন গাছের কাণ্ডের মতো শক্তসমর্থ শরীর তার। চরের অনেকখানি জমি কুপিয়ে সে তার চাষের এলাকা বাড়িয়ে নিয়েছে।

দুর্যোধন বয়সের তুলনায় বড় অক্ষম হয়ে পড়েছে। মারাত্মক হাঁপানিতে সে প্রায় পঙ্গু। হারুকে ভারী কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলে হারু দুর্যোধনকে জোর করে টঙের সামনের একটা মাচানে বসিয়ে দেয়। বলে, অনেক করিছ, আর নয়। অখন বুসি কিরি চারুবাড়ে চাইকি দেখো। তুমি তো রাজা লোক।

ঢিবির ওপরে দাঁড়ালে চর আর জঙ্গলের অনেকখানি দেখা যায়। হারু কাজে গেলে দুর্যোধন চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, ধানের খেতে সবুজ ফসল। সবুজ ধানের বুকে এখন ক্ষীর জমেছে। অদূরে ঝিলের জল বর্ষা ঋতুর পর টলমল করছে। দু'বছর অসুরের মতো খেটে হারু আর সে ঝিলের ধারের জঙ্গল প্রায় সাফ করে ফেলেছে।

ওদিকে মোহনার রাস্তায় বড় জঙ্গলটাও ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে ফেলবে বলে হারাধন একদিন কুড়ুল কাঁধে দুর্যোধনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল।

দুর্যোধনের কাছে কথাটা পাড়তেই দুর্যোধন হারুর পিঠে চাপড় মেরে বলেছিল, গুটে কথা আমার মানিবু। লোভে পড়িকি কাম করিবুনি। যতটুকু দরকার তার বেশি চাহিলে দুঃখ পাইবু।

কাঁধ থেকে কুড়ুল নামিয়ে হারু বলেছিল, বোড়ো বাবা, জানুয়ারগুলার সঙ্গে সারা জীবন কি মু লড়াই করি বাঁচি রইব?

হারুর পিঠে হাত চাপড়ে দুর্যোধন বলেছিল, মানুষের চাইতে পাখপাখালি জন্তুজানোয়ার অনেক ভাল রে হারু। গায় পড়ি ভাব জমাইকি ওর মনে তোর কুন খেতি করবেনি।

হারু তার বোড়ো বাবার কথা মান্য করে নিরস্ত হয়েছিল।

ধীরে ধীরে পঙ্গু হয়ে শয্যা নিল দুর্যোধন। সারাদিন অসুরের মতো খেটে দু'জনের কাজ এক হাতে করলেও দুর্যোধনের সেবাযত্নের একটুও ত্রুটি করত না হারু।

দুর্যোধন বিছানায় বসে ঝোরকা দিয়ে চেয়ে থাকত। মাঝে মাঝে তার দৃষ্টিপথে এসে পড়ত হারু। গাভী যেমন লেহন করে তার বাছুরটিকে দুর্যোধনও তেমনি তার দৃষ্টি দিয়ে লেহন করত হারুকে।

একদিন দুর্যোধন একটি দৃশ্য দেখতে পেল আর সেইদিনেই সে একটি বিষয়ে মনস্থির করে ফেলল!

গোধূলির কিছু আগে চরাচর থেকে তখনও আলোর লাল আভাটা মুছে যায়নি। জঙ্গলের ধার দিয়ে নদীর যে শাখাটি বইছে, সেখানে হরিণেরা রোজকার মতো সেদিনও জল খেতে এসেছে। দুর্যোধন ঝোরকার ভেতর দিয়ে দেখছিল ছবিটা। হঠাৎ দেখল ওই জঙ্গলের ধার দিয়েই সন্ধ্যায় পায়চারি শেষ করে ফিরছে হারু। হরিণগুলোও জলপান পর্ব শেষ করে জঙ্গলের ভেতর একে একে ঢুকছে। হঠাৎ দুটো হরিণ ঘনিষ্ঠতায় মেতে উঠল। দুর্যোধন দেখল, হারু তার চলার পথে থমকে দাঁড়িয়েছে। যতক্ষণ জোড়া হরিণ ঘনিষ্ঠতায় মত্ত রইল, ততক্ষণ সেখান থেকে এক পাও নড়ল না হারাধন। সম্ভোগ শেষ হলে হরিণ দুটো ঢুকল জঙ্গলের ভেতর। হারু পা চালিয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে গাছগাছালির ফাঁকে উঁকি দিয়ে ওদের শেষবারের মতো দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

সেই শীতে ধান নিতে এল মহাজন ত্রৈলোক্য সাউ। অমনি তাকে হারুর আড়ালে নিয়ে গিয়ে কথাটা পাড়ল দুর্যোধন। একটা মেয়ে চাই তার, হারুকে সংসারী করতে হবে।

ত্রৈলোক্য সাউ বলল, খালি খাওয়াপরার লাগিকি কে ওই পড়া জায়গার আসিব কও? গরিব দুঃখী তিন দিনে একবার খাইব তবু মান্‌ষের মুখ ন দেখিকি রইতে পারিবনি। এ-আশা ছাড়ি দও ভাই।

দুর্যোধন নাছোড়। সে বলে, জানি ভাই জানি মুই একা রই পারিলি বলিকি, সববু লোকে পারিব। তুমি কৃপা করিকি গুটে কন্যা খুঁজি দও।

ত্রৈলোক্য সাউ অনেক ভেবেচিন্তে বলল, গুটে অছি, তাকে এইঠি আসিবাকু বলিতে পারি, তবে এ ব্যাপারে কথা অছি ভাই।

দুর্যোধন উদ্‌গ্রীব হয়ে বলল, কও কী কথা?

ত্রৈলোক্য সাউ ষোলো-সতেরো বছরের একটি মেয়ের কাহিনী একটুও না ঢেকে দুর্যোধনের কাছে বলে গেল। হিজলী-বন্দরে পতিতাদের একটি আস্তানা রয়েছে। সেই পতিতাদের ভেতর একজনের মেয়ে, এই বছর সতেরো হবে। নাম, সাবিত্রী। মেয়েটাকে নিজের ব্যবসায়ে না ঢুকিয়ে তার মা তাকে জাহাজঘাটায় চিঁড়ে-মুড়ির একটা দোকান করে দিয়েছে। সেখানেই মা-মেয়ের সঙ্গে ত্রৈলোক্যের আলাপ। ত্রৈলোক্য সাউকে সৎ মানুষ ভেবে পতিতাটি তার পায়ে ধরে বলেছিল, সাবিত্রীকে এ-পাপ জায়গাটা থেকে কোথাও উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। দাসীবৃত্তি করে খাক তবু এ-জায়গায় নয়।

ত্রৈলোক্য বলেছিল, মেয়েটি তো ও-ব্যবসা করে না, তবে ভয় কীসের?

সাবিত্রী উত্তরে বলেছিল, রাতেভিতে একা যায়। ঘরের চারদিকে যত বদলোক ঘুরঘুর করে। কোনওদিন মেয়েটার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ত্রৈলোক্য আবার বলেছিল, কিন্তু বুড়ো বয়সে ওই মেয়েটাই তো পতিতার ভরসা। তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছ কেন?

সাবিত্রীর মা কেঁদে উত্তর দিয়েছিল, বড় দুঃখে বাবু। নাহিলে কেউ কি তার শেষ সম্বলটুকুকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলেছিল, বড় কষ্ট এ ব্যবসায়ে, বড় ঘেন্না, বড় ময়লা। নিজের যা হোক মেয়েটাকে এ-দুঃখ দিতে চাই না।

ত্রৈলোক্য তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, ব্যবসা করে তোকে খেতে হয়। হঠাৎ কিছু একটা করা ঠিক হবে না। তবে মনে থাকবে সাবিত্রীর কথা।

কাহিনীতে ছেদ ফেলে ত্রৈলোক্য সাউ বলল, একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে তোমার হারুর সম্বন্ধ কী করিকি করব ভাই?

দুর্যোধন ত্রৈলোক্য সাউ-এর দু'খানা হাত ধরে বলল, ওই কন্যা আমার চাই। বোড়ো বোড়ো ঘরের অনেক কীর্তি দেখিছি ভাই। এই দুঃখীগুলার সঙ্গে তারু মনকের তফাৎটা হিলা, এই হতভাগীগুলা আপনার যা চরিত্র তা প্রকাশ করি দেয় আর ভদ্রলোকের ঘরে ছাপিই-ছুপিকি রোখতে জানে।

ত্রৈলোক্য সাউ বলল, মনে রইলা তুমার কথা। ফিরে বছরে সম্ভব হিলে লি আসবা।

পরের বছর ত্রৈলোক্য সাউ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল কিন্তু হারুর বউকে ঘরে তুলে নেবার জন্য দুর্যোধন বেঁচে ছিল না। প্রবল শীতে হাঁপানির প্রকোপে চরের রাজা দুর্যোধন মির্ধা রাজোচিত মহিমায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল। মরণ সামনে বুঝতে পেরে হারুকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকেছিল দুর্যোধন। তাকে ধরাধরি করে ঢিবির ওপর তৈরি মাচানে বসিয়ে দিতে বলেছিল।

হারু তাকে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর দুর্যোধনের ইঙ্গিতে চারদিকে একবার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল।

হারাধন চোখের জলে ভাসছিল তখন. না হলে দেখতে পেত হাঁপানির রুগি তার সমস্ত কষ্ট ভুলে কী আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে বসে তার সাম্রাজ্যকে দেখছে।

শেষবার সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসেছিল দুর্যোধন। কী প্রার্থনা করেছিল সে সমুদ্রের কাছে কে জানে। কিন্তু কিছু পরেই হাপরের শব্দের মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল দুর্যোধনের বুকের ভেতর থেকে। তার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এল। ভবিষ্যতের ভয়ংকর কোনও ছবি কি মুমূর্ষু মানুষটার চোখের ওপর ছায়া ফেলেছিল!

সে দুটো হাত বাড়িয়ে কী যেন ধরতে চাইল, ডুবন্ত মানুষ যেমন করে খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়। শেষ নিশ্বাসটুকু তার অনন্ত বায়ুসমুদ্রে মিশে গেল। দুর্যোধনের প্রাণহীন দেহটা তখন হারুর দুটো হাতের নিবিড় বাঁধনে বন্দি।

৪

প্রথম রাতে পাশাপাশি শুয়ে আছে সাবিত্রী আর হারাধন। ত্রৈলোক্য সাউ দুর্যোধনের জন্য অনেক আক্ষেপ জানিয়ে চলে গেছে। যাবার সময় হারুকে ধরে বলেছিল, জীবনে একটা কর্মী পুরুষকে দেখলি হারু। ফি বছর আমি যে আসতি সে শুধু ওই আশ্চর্য মানুষটাকে দেখবা বলিকি।

হারু কাতর গলায় বলেছিল, খুড়ামশায়, বোড়ো বাবা গেলা, আপুনি রইলন। কৃপা করিকি আমাকে ভুলিবনি।

প্রবোধ দিয়ে বলেছিল ত্রৈলোক্য সাউ, আসিবরে হারু আসিব। তোর দুজনে কিধ্‌রা (কী রকম) সংসার গড়ি তুলু তাউ দেখিতে আসিব।

হারাধন সাবিত্রীকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, আমার পাশে শুইকি বি তোর ভয় ভাঙলানি বউ!

সাবিত্রীকে সারাদিন সে দেখেছে। শ্যামলা রঙের মেয়েটি। মুখখানা ভারী মিষ্টি। কিন্তু ভাসা ভাসা চোখ দুটো তার ভাসছে যেন ভয়ের সমুদ্রে।

সাবিত্রী হারুর বুকে মুখ লুকোয়, কোনও কথা বলতে পারে না। সে যে পতিতার মেয়ে, মুখ ফুটে সে-কথা কী করে বলবে। এদিকে না বলেও শান্তি পাচ্ছে না।

হারু সাবিত্রীর মনের কথাটি ধরতে পেরেছে। সে অন্ধকারে সাবিত্রীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি সব্‌বু (সব) জানিরে বউ, সব্‌বু জানি। বোড়ো বাবা আমার কাছে কুন কথা ছাপিই রোখেনি। কম্মে (কর্মে) মানুষ চিনা যায়, জন্মে নয়।

হারুর বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে সাবিত্রী। তার ভাগ্যকে সে যেন বিশ্বাসই করতে পারে না।

হারু এবার সাবিত্রীর কান্নার অর্থকে ভুল বোঝে। সে বলে, কাঁদু কেনি বউ, মার কথা মনে পড়ছে?

এবারও কোনও উত্তর দেয় না সাবিত্রী। নিবিড় করে হারুকে জড়িয়ে ধরে রাখে। মায়ের প্রসঙ্গ হঠাৎ এসে পড়ায় তার চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে। এ-জন্মে আর কোনওদিন সে তার মায়ের মুখ দেখতে পাবে না, এই সত্য জেনেই সে এসেছে। জাহাজঘাটা থেকে মাঝ গাঙের দিকে যখন তাকে নিয়ে ত্রৈলোক্য সাউ-র নৌকো সরে সরে আসছিল, তখন তার মা ঠায় দাঁড়িয়েছিল জেটির ওপর। সে বার বার চোখ মেলে তার মাকে দেখার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বার বার চোখ দুটো তার ঝাপসা হয়ে মায়ের ছবিটাকে মুছে দিচ্ছিল। মায়ের শেষ কথাটা তার কানে বেজে উঠল, আমার কথা একদণ্ড ভাববুনি। মনে করবু আমি তোর মা নয়, শত্রু।

যতবার মনে পড়ল কথাটা, ততবার অব্যক্ত এক ধরনের ব্যথায় বুকখানা ভেঙে যেতে লাগল সাবিত্রীর।

সাবিত্রীকে সঙ্গী পেয়ে হারুর তৃপ্তির সীমা নেই। মেয়েটা যেমন কাজ করতে পারে, তেমনি ভালবাসতেও পারে। দুপুরে মাটি কুপিয়ে আসার পর হারু স্নান সেরে খেতে বসে। ইতিমধ্যে গোয়ালের কাজ সেরে, ঘরসংসারের নিত্যকর্ম গুছিয়ে সাবিত্রী রান্না করে রাখে। হারু খেতে বসলে পরিপাটি করে তার সামনে ভাতের থালা আর ব্যঞ্জন সাজিয়ে দেয়।

খেতে খেতে হারু বলে, কী রন্ধন করছু তুই বউ, জিভে স্বাদ রই গলা জন্মের মতন।

সাবিত্রী নিচু গলায় বলে, কী অমন রাঁধছি, সক্কলে অমন রান্না রাঁধতে পারে। খাইত আমার মার হাতের রান্না তাহিলে বুঝতে পারত।

হারু মাঝে মাঝে সাবিত্রীর ভাষার সঙ্গে তার নিজের ভাষার তফাতটুকু নিয়ে রসিকতা করে বলে, তোর কথা শুনিলে বনি পাখিগুলা (শালিখ) উড়ি পলায়। আর আমি যখন কথা কই তখন মিঠা কথার টানে আবার ফিরি আসে।

সাবিত্রী চুপ করে থাকে, কোনও জবাব দেয় না।

হারু আরও খেপিয়ে তোলে তাকে। সাবিত্রীর কথা নিজের কথার পাশাপাশি রেখে বিচারে বসে। মোর মনে কই, 'খাইকি শুই পড়ো', আহা কী ভাষা, কুইলা বি (কোকিল) শুনিকি ঘুমিই পড়ব। আর তোর মনে কউ 'খায়া করিয়া শুইয়া পড়ো', ভাষা শুনিলে কুইলা বাসা ছাড়িকি উড়ি পলিইব।

সাবিত্রী বলে, যে দেশেব যমন ভাবা। তুমার উড়িয়া ভাষার অনেক কথা আমি বুঝতে পারিনি। আমাম্নে (আমরা) 'ছয়া' ভাষায় কথা কই।

হারু আচমকা সাবিত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলে, তোর ভাষা শুনিলে আমার চক্ষুর দুটা পাতা বুজি যায় বউ।

সাবিত্রী হাত দিয়ে ঠেলে দেয় হারাধনকে, ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

হারাধন হাসতে হাসতে চলে যায়। সাবিত্রী কলসি কাঁখে জল আনতে যায় ঝিলের দিকে। তার পায়ে মোটা মোটা দুটো মল। মলের ভেতর দানাগুলো ঝুম ঝুম আওয়াজ তোলে। কাজ ভুলে সাবিত্রীর দিকে চেয়ে থাকে হারু। মনে মনে ভাবে সাবিত্রী না এলে এতদিনে তার জীবনটা সত্যিই শুকিয়ে যেত।

রাতে হারু সারাদিনের ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে বিছানায় ভেঙে পড়লে সাবিত্রী তার গা হাত পা টিপে দেয়। বাধা দিতে যায় হারু কিন্তু ফল হয় না কোনও। তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে সাবিত্রী চোখের জল ফেলে। তার মনের গভীর কৃতজ্ঞতা চোখের জলে উপচে পড়ে।

কোনও কোনও জ্যোৎস্না রাতে হারু উদ্দাম হয়ে ওঠে। সামনের তালগাছটার পাতা চুঁইয়ে জ্যোৎস্নার দুধ গলে গলে পড়ে। হারু সাবিত্রীর কোনও প্রতিবাদই গ্রাহ্য করে না। সে টঙের ভেতর থেকে তার হাত ধরে টেনে আনে। দু'হাতে শূন্যে তুলে ধরে বসিয়ে দেয় মাচানের ওপর। তারপর মাচান ঘুরে ঘুরে শুরু হয় পাইকান নাচ। নানা রকমের কসরত আর ডিগবাজির খেল। বলিষ্ঠ শরীরখানা ঘামে ভিজে গিয়ে চাঁদের আলোয় চকচক করে। সাবিত্রীর চোখ দুটো কে যেন আঠা দিয়ে আটকে দেয় হারুর দেহের সঙ্গে।

নাচ শেষ হলে সিধে দাঁড়িয়ে হারু বলে, কী লাচিবা (নাচব) বল, বাজনা-বাদ্যি না রহিলে লাচ জমে।

ততক্ষণে মানুষটার নাচ দেখে বিগলিত সাবিত্রী। সে বলে, এরকম লাচ কাই (কোথায়) শিখল গ তুমি? বোড়ো সুন্দোর লাচ।

হারু বলে, টকাবালা (ছেলেবেলা) কত লাচিছি রে বউ। বাদ্যিবাজনা আর লাচ শুরু হিলা। পা বিজোড় পড়িছে কি বেতের ঘা পড়লা পিঠের উপ্‌রে। তাল ভুল হবার জো নাই।

সাবিত্রী অবাক হয়ে হারুর কথা শোনে। তার বকশিশের কড়ি কেড়ে নিয়ে কীভাবে মার দিয়ে মাঠে ফেলে দিয়েছিল সে কথা বলতে ভোলে না হারু। সাবিত্রীর চোখের সামনে যেন ঘটনাটা ঘটছে, সে আঁতকে ওঠে।

কোনও কোনও বর্ষার রাতে গান শোনাবার জন্য হারু সাবিত্রীকে পীড়াপীড়ি করে।

সাবিত্রী বলে, গান তো শিখিনি কারও কাছে। উড়িয়া যাত্রা হইত মুণ্ডোলবাবুর (মণ্ডল) ঠাকুর দালানে। সউ (সেই) যাত্রা শুনিয়া গান গাইতি গোড়িয়াঘাটে বুসিয়া (পুকুরঘাটে বসে)।

হারুর অনুরোধে শুরু হয় সেই পালা গান। বেহুলার ভাসান। কী আশ্চর্য মনে রাখার ক্ষমতা সাবিত্রীর। পুরো লখিন্দর বেহুলার পালাটা সে কথায় আর গানে গেঁথে গেঁথে বলে গেল।

চাঁদবেনের বীরত্ব, হেঁতালের বাড়ি হাতে মনসাকে শায়েস্তা করবার জন্য আস্ফালন, লোহার বাসরঘর, সর্পদংশন, কলার মান্দাসে লখিন্দরের শব চাপিয়ে গাঙ্গুড়ের জলে ভাসা, স্বর্গে নাচ দেখিয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে মৃত পতির প্রাণ ফিরে পাওয়া, পুত্রবধূর অনুরোধে চাঁদবেনের বাম হাতে মনসা পূজা—মনসা ভাসানের এই সমস্ত কাহিনীই শুনিয়ে গেল সাবিত্রী।

বেহুলা কলার মান্দাসে ভেসে যেতে যেতে কাককে উড়ে আসতে দেখে বলল, কাক, তুমি যেদিকে উড়ে যাচ্ছ, সেদিকে আমার বাপেরবাড়ি। তুমি দয়া করে আমার বাবাকে বলো, এখনও তার মেয়ে বেঁচে আছে।

কাক বলল, কোথায় তোমার বাপেরবাড়ি গো মেয়ে? কী নামই বা তোমার বাবার?

বেহুলা গাইল,—

উজানি নগরে বাপো ঘর
বাপোর নাম সায় সদাগর।

কী গলা সাবিত্রীর। ঝিরঝির বৃষ্টির সঙ্গে মিশে সাবিত্রীর গলার কাঁপা কাঁপা সুর বাতাসকে মথিত করতে লাগল।

পালা শেষ হলে সাবিত্রীর চাঁদ মুখে চুমু খেয়ে হারু বলল, তুই অত গুণের গুণী বউ, আমি তোর গান শুনিকি, বচন শুনিকি অবাক হি যাউছি।

রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে হারু কিন্তু ঘুম নেই সাবিত্রীর চোখে। সে হারুর বুকের ওপর তার হাতখানা ঠেকিয়ে রেখেছে। হারুর বুকের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তার হাতখানাও ওঠানামা করছে! চোখের জল আর থামছে না সাবিত্রীর। সে তখন সাবিত্রী নেই, বেহুলা হয়ে মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে ভেসে চলেছে গাঙ্গুড়ের জলে। ঘুমন্ত হারু হয়ে গেছে লখিন্দর। আর বাঁশের চারপায়াখানা কলার মান্দাস। চিত্রতোয়া নদীটা শ্রাবণের ধারায় ভরে গিয়ে গাঙ্গুড়ের রূপ নিয়েছে। সারা আকাশের কান্না যেন শত শত বেহুলার চোখের জল হয়ে ঝরে পড়ছে!

৫

জৈষ্ঠ্যের মাঝামাঝি, অসহ্য গুমোট চলেছে। হারু তার জীবনে এমন খরতাপ কখনও দেখেনি। তরিতরকারি শুকিয়ে ঝলসে গেছে।

ক'দিন হল সাবিত্রী মা হয়েছে। মেয়েটা সদ্য ফোটা চোখ দুটো মেলে টঙের ভেতরেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখছে। সাবিত্রী মেয়েটার নাম রেখেছে—তানি।

হারু ঝিল থেকে স্নান সেরে জল ভরে আনল কলসিতে। ঝিলের জলও পড়েছে তলায়। পাঁক শুকিয়ে ফেটে গিয়ে অনেক জায়গায় চাকলা চাকলা হয়ে উঠে পড়েছে।

সাবিত্র বলল, অত দেরি হইল কেনি গো তুমার?

হারুর ক্রুদ্ধ গলা শোনা গেল, তিন স্যাঙাৎ জল পারিইকি আস্থলা। মোকে সামনে পাইকি হম্বিতম্বি।

সাবিত্রী আকাশ থেকে পড়ল; সে কী গো!

হারু বলে চলল, শলার পুত মনে বলে কি, এ রাজার চর, তুই এইঠি জুড়ি বসিছু কেনি?

মাথায় রক্ত চড়ি গেলা। কইলি (বললাম), কুন শলা রজা। মোর বাপ এ চর চাষ করছে আর লদীমাতা এ-চর মোর মনকে (আমাদের) দিছে। কুন রজাফজার বাপের জমি এইঠি নাই।

লোকগুলো আমার কথা শুনিকি খাপ্পা, কী! তুই রজাকে শলা কইলু, অত বোড়ো আস্পদ্দা।

হাতে কটা বাংশের (কাঁটা বাঁশের) লাঠি থিলা, ছুটি আইলা মারতে।

মু পাইক, ও ব্যাটা মোর কোতরে (কাছে) পাঁয়তারা কষব! এক প্যাঁচ কষি দিলি, অর হাতের লাঠি মোর হাতে চালি আইলা। সউ (সেই) লাঠি লিকি এমন ঘুরিইলি যে তিন ব্যাটা প্রাণ লিকি (নিয়ে) জলে যাই পড়লা, মু তার মনকের (তাদের) পাছু পাছু কেত্তে বাট (কত পথ) খেদিই লি গেলি।

এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল হারাধন। হাসি থামলে বলল, তুই যদি বউ তার মনকের অবস্থা দেখতু, তাহিলে হাসিকি তোর পেট ফাটি যাইত। জলে পড়ি সে কী হাবুডুবুরে।

সাবিত্রী কিন্তু ভয় পেয়ে যায়। সে বলে, নাগো হাসবার কথা নয়। এ কমন আমার ভাল ঠেকেঠেনি (ঠেকছে না)।

হারু সাবিত্রীর আশংকাটুকু উড়িয়ে দেবার জন্য বলে, তুই থাম বউ। খরায় জ্বলি যাউছি চারুবাড়, তাউ শলা মনে আসিবাকু পারিল, শ্রাবণ মাস আসিলে ভাসি যিব চারুধার, তখন দেখিব কুন্ হেটার বেটা (হেটা—ছোট আকারের বাঘজাতীয় প্রাণী) অসিবাকু পারে।

শ্রাবণ মাসের জন্য আর অপেক্ষা করতে হল না। দেশ জুড়ে উত্তপ্ত হাওয়া হু-হু করে ওপর দিকে উঠতে লাগল, আর প্রবল এক ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রের বিপুল জলোচ্ছ্বাস নিয়ে পুরাণকথার ভয়ংকর নাগিনীর মতো এগিয়ে আসতে লাগল।

সামনের জঙ্গলের ডালপালা ছিঁড়েখুঁড়ে পড়ছিল চরের জমিনে। দীর্ঘদেহী তালগাছটা অস্বাভাবিকভাবে দুলছিল।

এক-একটা দমকা হাওয়া আসছে আর মনে হচ্ছে সমস্ত দড়িদড়া ছিঁড়ে চালাগুলো উধাও হয়ে যাবে।

হারু টঙ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, গোরুগুলার দড়া খুলি দি আসি, নাহিলে কাঁখ (দেয়াল) চাপা পড়িকি মরি যিব।

হাওয়ার দাপটে হারু ঢিবি থেকে গড়াতে গড়াতে নেমে গেল নীচে। সে একটা একটা করে দশ-দশটা গোরুর বাঁধন খুলে গোয়াল থেকে বের করে দিল। গোরুগুলো দিশেহারা হয়ে আতঙ্কে হাম্বারব তুলে ইতস্তত ছুটে বেড়াতে লাগল।

হারুর মাথা ঘুরে গেল। দু'-দু'বার ঢিবির ওপর ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে সে গড়িয়ে পড়ল নীচে। তৃতীয়বার মাটি আঁচড়ে উঠে এল সে ওপরে। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে মেঘের অন্ধকার মিশে চরাচরের আলোটুকু প্রায় শুষে নিল।

হামা দিয়ে টঙের ভেতর ঢুকে এল হারাধন। বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরে কাঁপছে সাবিত্রী।

একটা ঢেউ তেড়ে এসে আছড়ে পড়ল গোয়ালঘরটার ওপর। ঝোরকা দিয়ে সন্ধ্যার আবছায়ায় যতটুকু দেখা গেল তাতে গোয়ালঘরের কোনও চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না। ঢিবির আদ্দেকটা অব্দি জল থই থই করছে।

মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলল হারু। সে কাটারি দিয়ে চালার বাঁধনগুলো কাটতে লেগে গেল। বাঁশ আর কাঠের বাঁধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে খড়ের চালাটা।

কাটার কাজ শেষ হবার আগেই সে সাবিত্রী আর বাচ্চাকে অনেক কষ্টে ধরাধরি করে চালার ওপর তুলল। কাপড় দিয়ে সাবিত্রীকে টুই-এর বাঁধনের সঙ্গে বেঁধে দিল, যাতে চালা ভেসে গেলেও হাওয়ার দাপটে কেউ না উড়ে যায়।

এখন চালা থেকে নেমে এসে শেষ কটা বাঁধন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কাটতে লাগল হারু।

ওপর থেকে প্রবল আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সাবিত্রী, উঠিয়া আ-ই-স...

বিশাল জলরাশি স্তম্ভের আকার নিয়ে এগিয়ে আসছে। তালগাছের প্রায় তিন ভাগ চলে গেছে জলের তলায়। পাক খেতে খেতে এগিয়ে আসছে হিংস্র কালনাগিনী। ফুঁসছে, উগরে দিচ্ছে গরল।

চালার শেষ বাঁধনটা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপুল জলস্তম্ভ আছড়ে পড়ল ঢিবির ওপর। চক্ষের নিমেষে মোচার খোলার মতো অনন্ত জলরাশি হারাধনের চালাখানা নিয়ে উধাও হয়ে গেল। হতভাগ্য হারাধন মুহূর্তে চলে গেল অতল জলের গভীরে।

পরদিন দেখা গেল আকাশে রোদ্দুর পেতলের মাজা থালার মতো ঝকঝক করছে। সমুদ্র সরে গেছে তার আপন জায়গায়। সাদা সাদা গাঙচিলেরা ঢেউয়ের মাথায় উড়ে ফিরছে।

মূল ভূখণ্ডের দুটি গাছের ফাঁকে আটকে রয়েছে হারাধন পাইকের নিজের হাতে ছাওয়া চালাখানা। একটু দূরে অর্ধ-উলঙ্গ একটি মেয়ে ছোট একটি বাচ্চাকে বুকে চেপে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেয়ে আছে। দূরে তালগাছে পাতাগুলো সমুদ্রের হাওয়া লেগে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। মনে হচ্ছে কারা যেন হাত নেড়ে নেড়ে বলছে, চলে আয়, হার মানলে চলবে কেন?

বাচ্চাটাকে বুকে চেপে সাবিত্রী জল ভেঙে এগোতে লাগল।

তানির ঘর

৬

তানিকে পিঠে নিয়ে দুধ্‌লি ফিরে আসছে। আক্‌রির জঙ্গলে গামার, হাব্‌লি আর কুচ্‌লা গাছের ডাল পাতার ফাঁকে পড়ন্ত রোদের আলো চুইয়ে পড়ছে। হেলেদুলে আসছে দুধ্‌লি। দো-শিঙার মাঠে দিনভর দুব্‌বা ঘাস খেয়ে ডগর হয়েছে পেট।

তানি তখন মহিষের পিঠে বসে মরা সোনার আলোয় গা ধুচ্ছে। তার হালকা বাদামি রঙের চুলগুলো ভারী চিকন দেখাচ্ছে। কাঁধের ওপর দিয়ে একপাক ঘুরিয়ে বুক পেঁচিয়ে ছেঁড়া ট্যানাখানা গুঁজেছে কোমরে। হাঁটু থেকে দুখানা উদোম পা দুধ্‌লির দু'দিকের পাঁজর ছুঁয়ে ঝুলছে। বাঁ-হাতে একগোছা বেথুয়া শাক, ডান হাতে মহিষ তাড়াবার ডাং।

তানি এখন ফিরছে ধাম্‌রার চরে। তেঁতুলগাছের তলায় তাদের খড়ের চালাখানা দেখা যাচ্ছে। জলে ভিজে রোদে পুড়ে ঘুঘুর রং ধরেছে চালার খড়ে।

এসময় গুণদা হাতের সব কাজ ফেলে বসে থাকে তেঁতুলগাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে। চোখে কেমন যেন বে-ঠাওর হয় আজকাল। তবু বুড়ি বসে থাকে লাতুনের (নাতনি) ফেরার রাস্তার দিকে চোখ পেতে।

কাছাকাছি আসে দুধ্‌লি। তার ওপর তানি যেন দুগ্‌গা ঠাকুরটি। গুণদা কালো কিষ্টি, কিন্তু তানির রং হয়েছে ঠিক তার আজা (মাতামহ) হিউম সাহেবের মতো। তানির মা সাবির (সাবিত্রী) রং মায়ের মতো কালো কিংবা বাপের মতো ধবধবে নয়। তেঁতুলে মাজা তামার মতো। তানির বাপের রংও আদপে ফরসা ছিল না। কিন্তু তানি সবার ওপর টেক্কা মেরে হিউম সাহেবের রং গায়ে মেখে বসে আছে।

গুণদার চোখের মণি সে। বুড়ি বোধহয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তানিকে দেখে। তানির দিকে চাইলেই তার চোখের ওপর হিউম সাহেবের ঘোড়ায় চড়া ধবধবে চেহারাখানা ভেসে ওঠে।

দুধ্‌লির ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়ায় তানি। পাগাটা (দড়ি) গুণদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, তুমি বাঁধো আই (দিদিমা), বোড়ো ভোক্‌ (ক্ষিদে) পাইছে।

তানি ছুটে ঘরের ভেতর চলে যায়। বুড়ি তেঁতুলগাছের একটা মোটা শেকড়ে দুধ্‌লিকে বেঁধে রাখে। বর্ষাকালের রাতগুলো ছাড়া সংবচ্ছর দুধ্‌লির সাকিন এই তেঁতুলতলা। গুণদা ঘরের দিকে এগোয়।

ততক্ষণে চুলার ধারে মায়ের গা ঘেষে থেবড়ে বসেছে তানি। মাটির হাঁড়িতে টগড়বগড় ভাত ফোটার আওয়াজ। বুলবুলিয়ে ধোঁয়া উড়ছে কালো ঝুলে ভরা টুই-এর দিকে।

সাবি খুন্তির পাতায় দু'চারটে ভাত টিপে দেখে বলল, আর টুকু বাকি, হয়া আস্‌সে (হয়ে এসেছে)।

কিছুক্ষণের ভেতরেই হাঁড়ির মুখে সরা চাপা পড়ল। হ্যাঁচকা টানে নামানো হল হাঁড়িটাকে। দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো হাঁড়ির মুখটাকে ঈষৎ ফাঁক করে ফ্যান গালা হল। ক'বার ঝিকিয়ে বিঁড়ের ওপর রাখা হল হাঁড়িটা।

সাবির রান্নার পাট আগেই চুকেছে। শাক, মাছ করে তো আজ রান্না হয়েছে পাঁচ পদ। বোড়ো বাবার শরাদের (শ্রাদ্ধ) দিন আজ। কাত্তিক মাসের অমাবস্যা রাত। ভুজ্যি দিয়ে আসতে হবে দুর্যোধনের টিপায় (ভিটে)।

ভোক পেলেও মায়ের অনুরোধে তানিকে বন্ধ রাখতে হয়েছে খাওয়া। ভুজ্যি দিয়ে ফিরে এসে সে মুখে কিছু তুলতে পারবে।

গুণদা বুড়ি টব্‌নায় (ডোবা) হাত পা ধুয়ে উঠে এল। ধোয়া কাপড় পরে তিনজনে তৈরি। কাঁসার থালার ওপর কলার পাতে ভাত তরকারি সাজানো। সাবি বাঁ হাতের তেলোয় ভুজ্যি বয়ে নিয়ে চলেছে। মাঝে তানি, পেছনে গুণদা। এখনও আড়ময়লা কাপড়ের মতো গোধূলির রং। পরিচিত পথে রশিখানিক গিয়েই ওরা উঠল দুর্যোধনের টিপায়। উঁচু মাটির টিপি। সামনে দাঁড়িয়ে একটা একঠেঙে তালগাছ। নদীর ধার থেকে একঝাঁক বক উড়ে এসে গাছটার ছাতার মতো পাতায় বসার জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে। কোঁক্‌ কোঁক্‌ শব্দ বাতাস কেটে বাজল কিছুক্ষণ। তারপর সব চুপচাপ।

টিবির ওপর একটা মনসা গাছ। গুণদার হাতের নুটি থেকে তানি পিদিম জ্বালল। মনসা গাছের তলায় ভুজ্যি রেখে হাঁটু গেড়ে বসল তিনজনে।

সাবি বিড়বিড় করে বলতে লাগল, বোড়ো বাবা, তুমাকে কুনদিন আমি চক্ষে দেখিনি। তানির বাপকে টকাবালানু (ছেলেবেলা থেকে) তুমি পালছ। সে তুমার ধম্ম বেটা থাইল। তার মুখে তুমার কত কথা শুনছি। বাবাগো, দুটা বছরও তার সঙ্গে ঘর করতে পারিনি, সমুদ্রের নুনা (লোনা) বানে তুমার বেটাকে ডুবিই মারল। আইজ এগারটা বছর সে পাশে নেই। সে অখন তুমার সঙ্গে সগ্‌গে আছে। তাকে দেখব বোড়ো বাবা। তুমান্নে (তোমরা) আমার তানিটার উপ্‌রে একটু চোখ রাখব। তার যন্‌ (যেন) ভাল হয়।

অদৃশ্য বোড়ো বাবার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর কার্তিকের অমাবস্যা তিথিতে এখানে এসে ভুজ্যি উচ্ছগ্‌গ করে যায়। প্রতিবার ওই একই কথা বলে। উঠে দাঁড়াবার আগে আঁচলে মুছে নেয় চোখের জল।

ফিরে আসতে আসতে গুণদা বলে, এবার খুম (খুব) মাছ পড়বে সাবি।

কী করিয়া জানল?

কাল গদাই মালুয়ার সঙ্গে দেখা, সে কইল।

সাবির মনে পড়ে যায়, সে বলে, শুক্কোরবার টাকা দিবার কথা থাইল না।

হাঁ সে আমার দিব্য করছে আগামী বুদুবার দিবে।

এখন আর কোনও কথা নেই। নুনমাটির মাড়ায় তিনজোড়া পায়ের দুপ্‌ দুপ্‌ শব্দ।

ভরপেট ভালমন্দ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তানি। গুণদার কোমরে একখানা পা কাঁধে একখানা হাত তুলে দিয়ে ঘুমোনো তার অভ্যেস। একই বিছানায় সাবিত্রী একটু তফাতে শোয়। এ ব্যবস্থা আজ প্রায় দশ বছর ধরে চলে আসছে।

আক্‌রী জঙ্গলে একদঙ্গল শেয়াল হুয়া হুয়া করে হাঁকার ছাড়ছে। গুণদা ঘুমোলেই নাক ডাকা শুরু হয়। সাবিত্রীর ঘুম আসেনি। সে ঝোরকা দিয়ে তাকিয়ে আছে। আকাশ সমুদ্র আর ধাম্‌রা নদী অন্ধকারে একাকার। এক ঝাঁক তারা যেন গাঙের মোহনায় গা-ধুতে নেমেছে। সাঁতার কেটে চলেছে এদিক থেকে ওদিক।

আজ অমাবস্যা। ভর কোটাল। নদী, নালা, সাগরে থই থই জোয়ার। এ তিথিতে মাছেদের উজাগর। সারা রাত স্রোতের টানে গা ছেড়ে ভেসে বেড়ানো, কখনও বা হুল্লোড়ে মেতে দল বেঁধে দৌড়।

টিমটিম করে টেমি জ্বলছে, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু একঝাঁক তারা যেন স্রোতের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে। নিশি জাগরণ জেলেদেরও। অমাবস্যায় নৌকো ভরে মাছ তুলছে তারা।

এ সব বিছানায় শুয়ে দেখছিল সাবিত্রী। ঠিক এই বিশেষ রাতটাতে সে চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারে না অনেকক্ষণ। একটা বিভীষিকার ছবি ফুটে ওঠে তার চোখের ওপর। আজ দশ বছর ধরে এই বিশেষ রাতটাতে সে ওই ছবিটা দেখে আসছে। কী আশ্চর্য মিল! শ্বশুর দুর্যোধন এমনি এক অমাবস্যায় নিজের হাতে গড়া জলজঙ্গলের এই আবাদে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সাবিত্রী তাকে চোখে দেখেনি। স্বামী হারাধনই তাকে শুনিয়েছিল তার ধর্মবাপ বা বোড়ো বাবার কাহিনী। মরার সময় নাকি তাকে ওই ঢিবির ওপর একটি মাচানে বসানো হয়েছিল। দুর্যোধন মির্‌ধার হাঁপানির টানে তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে দুটো চোখ। পাশে ছায়াসঙ্গী ধর্মপুত্তুর হারাধন। দুর্যোধন দেখছে তার সাম্রাজ্য। একদিন বুকজল

ভেঙে যে ডাঙায় এসে আবাদ পত্তন করেছিল, তাকে শেষবারের মতো দেখছিল দুর্যোধন। হঠাৎ নাকি সামনের সমুদ্রের দিকে চেয়ে দুর্যোধন আঁতকে উঠেছিল। ওই অবস্থায় কুঁকড়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল তার শরীর। যেন ভবিষ্যতের কোনও একটা বিভীষিকার ছবি তার চোখে ছায়া ফেলছিল।

দু'বছর পরে সেই বিভীষিকার ছবিটাই বোধকরি সত্য হয়ে উঠেছিল। সেদিন হারাধনের পাশে ছিল সাবিত্রী আর সাবিত্রীর কোলে ছিল এক বছরের তানি। সেদিনও ছিল অমাবস্যা। সারাদিন তাল তাল মেঘের তাণ্ডব। এলোমেলো পাগলের মতো ছুটছিল বাতাস। সন্ধ্যার মুখে এল সেই বান। পৃথিবী কাঁপিয়ে হাজার রাক্ষসের হুংকার তুলে আছড়ে পড়ল আস্ত একটা জলস্তম্ভ দুর্যোধনের ওই টিবির ওপর। ঘরের টঙে সাবিত্রীকে তুলে দিয়ে হারাধন নীচের বাঁধনগুলো কাটছিল। মুহূর্তে জলের ঘূর্ণিতে মা মেয়েকে নিয়ে কোথায় কলার মোচার মতো ভেসে গেল চালাখানা, আর কোটি কোটি মণ জলের তলায় তলিয়ে গেল হারাধন।

শেষবার সা-বি-ত্রী বলে সে চেঁচিয়েছিল। সারারাত ঝড়ের কান্নায় সেই ডাক ঘুরে ঘুরে বেজেছিল সাবিত্রীর কানে। আজও সে ডাক অন্ধকার সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠে আসে।

৭

কুচা চুঙুড়ের (ছোট চিংড়ি) বদ্‌বদে টক মেখে এক পালুয়ারি (কানা উঁচু থালা) পান্তা নিয়ে বসেছিল তানি! উবু হয়ে বসে লাতুনের (নাতনি) খাওয়া দেখছিল গুণদা।

পুটুশ করে একটা লঙ্কা ভেঙে জিভে ঠেকিয়ে তানি বলল, দূর, টুকু বলিয়া যদি রাগ (ঝাল) রয়। একটা গুজরি লঙ্কা আছে নেকি দেখত আই।

তড়িঘড়ি উঠতে গিয়ে দাপনায় টান ধরে। উ-হু-হু! ডানহাতে অবাধ্য জায়গাটাকে টিপতে টিপতে বুড়ি গুজরি লঙ্কার খোঁজে খিড়কির ওধারে নেমে যায়। সাবিত্রী ক'টা লঙ্কাগাছ পুঁতেছে সেখানে। শাক-সবজির অনটন হলে নুন ভাত আর লঙ্কা তেঁতুলে দিব্যি চলে যায়। খালি তানির জন্যে যা ভাবনা। মেয়েটা আঁশের গন্ধ ছাড়া ভাত গিলতে পারে না। পুঁটি বঁড়শি নিয়ে নিজেই মাছ ধরতে বসে যায় টব্‌নায় (ছোট পুকুরে)। তানি মাছের খুঁট চেনে। চেংগি (ফাতনা) কতখানি ডুবলে খিঁচ মারতে হবে তা সে সহজেই বুঝতে পারে।

চোখে ভাল ঠাওর হয় না বুড়ির তাই লঙ্কা গাছের আস্ত একটা ডালই ভেঙে এনেছে। সাবিত্রী দেখলে গালমন্দ করত। এখন সে গেছে ধানখেতের তদারকি করতে।

বুড়ি তানির হাতের কাছে ডালটা ফেলে দিয়ে বলে, বাছিয়া লে দিদি।

তানি দুটো লঙ্কা ছিঁড়ে নিয়ে ফুল সমেত বাকি ডালটা উঠোন পেরিয়ে টব্‌নায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে আসে। মায়ের চোখ থেকে তানি তার আয়িকে সব সময়েই আড়াল করে রাখার চেষ্টা করে।

ভাতের শেষ ক'টি দানা আঙুলে ছেঁকে নেবার পর টকে লঙ্কায় আর পান্তার ঘন জলে তৈরি গরগরে আধ কাঁসি তানু চোঁ চোঁ করে খেয়ে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল তানি। এবার পালুয়ারিখানা তুলে নিয়ে টব্‌না থেকে ধুয়ে আঁচিয়ে এলো।

দুধ্‌লি জাবর কাটছিল তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে। একবার ডাক দিয়ে কিশোরী প্রভুকে জানিয়ে দিল, আর দেরি কেন, চটপট চলে এসো এবার।

এখন কোনওদিকে তাকাবে না তানি। কোঁচড়ে ভুজা (মুড়ি) বেঁধে নিয়েছে সে। দুপুরের খাদ্য।

হেলেদুলে একটু জোরে পা চালিয়ে চলেছে দুধ্‌লি দো-শিঙার মাঠের দিকে। পুবে দো-শিঙার মাঠ আর পচ্ছিমে আক্‌রির জঙ্গল। ধাম্‌রার একটি নাশিখাল দো-শিঙার মাঠের বুক চিরে ঢুকে গেছে আক্‌রির জঙ্গলের ভেতর। জঙ্গলের জানোয়ার আর মাঠের গোরু মহিষ ওই খালেই প্রাণ বাঁচায়। স্নান আর পান দুটো কাজই চলে। গরমের দিনে মহিষগুলোকে আর মাঠে দেখা যায় না। খালের জলে শিং সমেত মাথাটুকু উঁচিয়ে ডুবে থাকে।

দো-শিঙার মাঠে দুব্‌বো নয়তো দুব্‌বোর আস্তরণ। কোশ তিনেক ঘেরের মাঠখানা! মান্ধাতার আমল থেকে গোরু মহিষ চরছে।

পচ্ছিমে আক্‌রির জঙ্গল প্রস্থে এক ক্রোশ আর লম্বায় কত তার ঠিক নেই। সূয্য ওঠা থেকে ডোবা অব্দি একটা জোয়ান মানুষ পা চালিয়ে চললে বনটাকে শেষ করতে পারে। জঙ্গলটা কিন্তু লম্বা না। কাস্তের মতো বাঁকা।

আক্‌রির জঙ্গল ফুঁড়ে পচ্ছিমে বেরুলে গৌঢ়দের (গোয়ালা) বসতি। পলেয়ী, আপট, এই দুটি পদবির গৌঢ় ওখানে বাস করে। কমসে কম দশ কোশ দূরে লোকালয়, গঞ্জ। শীতে ক্ষীরের খাবার তৈরি করে অনাল ভোরে (উষাকাল) উঠে হাঁড়ি ভরতি বেচে ফিরে আসে এক প্রহর রাতে। ঘিয়ের কারবার চলে। সারা বছর গৌঢ়দের পাল পাল ছেলে গোরু মহিষ নিয়ে ভোরবেলা বেরোয়। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে পথ, পাঁচ-সাত পুরুষ আগে গৌঢ়দের পত্তনির সময় থেকে।

তানি গৌঢ়দের ছেলেপুলের সঙ্গে তার দুধ্‌লিকে চরিয়ে বেড়ায়। ছেলেদের ভেতর সে একমাত্র মেয়ে। ছেলেরা গোরু মহিষের পাল ছেড়ে দিয়ে হুড়দাঙ্গায় মাতে। তানি দূর থেকে দেখে, কিন্তু কখনও ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মাতে না।

গৌঢ়দের ছেলেরাও জানে তানি তাদের জাতের লোক নয়। রোজ ধাম্‌রার চর থেকে ও আসে। আপন মনে মহিষ চরায়। একটু দূরে দূরেই থাকে। ওরা তানিকে একটু উঁচু নজরে দেখে। তানির রংটা ওদের কাছ থেকে খাতির আদায় করে নেয়।

মাঠের মাঝে মাঝে মানুষের গলা প্রমাণ উঁচু বলিয়া গাছের পাতার সমারোহ। বর্ষাকালে ওই বলিয়ার পাতা খেতে আক্‌রির জঙ্গল থেকে উড়ে আসে সোনালি পোকা। ভারী শক্ত দুটো পাখা, কী মসৃণ! সবুজে, লালে, নীলে মিলেমিশে সে এক চোখ জুড়ানো রংবাহার।

গুটি গুটি গাছের গোড়ায় গিয়ে পাতাসমেত খপ করে মুঠোয় চেপে ধরতে হয় পোকা। তারপর পায়ে সুতো বেঁধে ওড়াও। পোকা উড়ে যাচ্ছে জঙ্গলের দিকে আর সুতোর একটা খুঁট ধরে তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে ছেলের দল।

তানি সোনালি পোকা ধরতে পারে না। দু'-একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। ঠিক ধরার মুহূর্তটিতে উত্তেজনায় তার সারা শরীর কেঁপে ওঠে। পাতা খামচে ধরার আগেই পোকা তার রামধনুকের মতো ডানা মেলে উড়ে যায়।

দু'-একবার ছেলেরা ওকে পোকা ওড়াতে দিয়েছিল। দুধ্‌লির পিঠে চেপে আকাশে পোকা উড়িয়ে ও কী খুশি!

একবার শামুক খোলের ভেতর বলিয়া গাছের কচি পাতা দিয়ে তার ওপর একটা পোকা রেখেছিল সে। জন (জ্যোৎস্না) ওঠা রাতে চুপি চুপি বিছানায় উঠে বসে সে তার পালিত পোকাটিকে বার বার দেখছিল। পোকাটির খাবার জন্য দু'-চার ফোঁটা জলও সে ছিটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এত আদর-আত্তি খাবার অভ্যেস নেই বলে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছিল পোকাটার। এতে দুঃখ পেয়েছিল তানি কিন্তু আনন্দের কারণও একটা ঘটেছিল। সাবিত্রী ওই মরা সোনালি পোকাটির শক্ত পাখা থেকে দুটো টিপ তৈরি করে দিয়েছিল তানিকে। সেই টিপ বেবুর বা বাবলা গাছের আঠার সাহায্যে কপালে পরেছিল তানি।

দুধ্‌লির সামনে টিপ পরে দাঁড়িয়ে তানি বলেছিল, কীরকম দেখতে লাগছে রে দুধ্‌লি?

দুধ্‌লি স্থির দুটো তারিফের চোখ মেলে চেয়েছিল। সে যেন বলছিল, বাঃ, যত্তন (সুন্দর)।

কোনও কোনও দিন মাঠ থেকে ঘরে ফেরার সময় দুধ্‌লির পেটে কান চেপে দাঁড়িয়ে থাকে তানি। পেটের ভেতরের গুরগুর আওয়াজ শুনতে তার ভারী ভাল লাগে।

আসা যাওয়ার পথে তানির সঙ্গে দুধ্‌লির হরদম কথা চলে। বক্তা একমাত্র তানি আর নিবিষ্ট শ্রোতা দুধ্‌লি। মাঝে মাঝে দুধ্‌লির গলা দিয়ে দু'-একটা তারিফ বা সমর্থনসূচক আওয়াজ বেরোয়।

পিঠের ওপর বসে তানি আলতো করে পেটে খোঁচা লাগিয়ে বলে, আইজ (আজ) কীরকম খাওয়াটা হইল গো?

দুধ্‌লি চলতে চলতেই শিং নাড়ে। অর্থ—খুম (খুব) খাইছি।

মাঝে মাঝে খাবার ব্যাপারে মুখ বদল করে দুধ্‌লি। সাধারণত মাঠে আসার পথেই এ ব্যাপারটা ঘটে। নাশিখালের দু'-ধারে বেবুর আর সাঁই বেবুরের গাছ। দুধ্‌লি মুখ উঁচিয়ে বেবুর গাছের পাতা আর ফল ঝটকা মেরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। কাঁটা দু'-চারটে গালে মুখে বেঁধে, ভ্রূক্ষেপ নেই। খাবার লোভ সব যাতনা ভুলিয়ে দেয়।

তানি কিন্তু বারণ করে, বেশি লোভ ভাল না। দুধ্‌লি হইছে, আর না।

কখনও সাবধান করে দিয়ে বলে, অত উঁচায় মুখ যাবেনি দুধ্‌লি। নীচে অঠান (ঠাঁই নেই)। খালে পড়ি যাবি।

দড়ি ধরে বিপরীত দিকে খিঁচতে খিঁচতে বলে, আয়, চলি আয়, কত দুব্‌বা ঘাস খাইতে পারু দেখব।

দুধ্‌লি এবার চলতে শুরু করে। হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে তানি চেঁচাতে থাকে, দেখছ, দেখছ, গালে কতগুলা কাঁটা ফুটছে!

চোখ দিয়ে প্রায় জল বেরিয়ে আসে তানির। দু'তিনটে কাঁটা টেনে তুলে ফেলে সে দুধ্‌লিকে নিয়ে মাঠের দিকে চলতে থাকে। যেতে যেতে প্রবোধ দিয়ে বলে, অত লোভ ভাল নয় রে। আয়ি কয়, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আমি তোকে ভাল একটা জিনিস খাবিব রে খাবিব।

তারপর কেউ যেন না শোনে, এমনিভাবে দুধ্‌লির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলে, কী যত্তন ছনছনিয়া কম্‌লি (কলমি) শাক! মজা গেড়িয়ার (মজে গেছে যে পুকুর) পাড় ভত্তি শাক, কত খাইতে পার দেখব।

দুধ্‌লি কী বোঝে কী জানি। সে প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকায়।

তানি খেপে গিয়ে বলে, চ, ভাগাড়ে চ, কুত্তার পেটে কি ঘি সয়। মার খাবু আর বেবুর পাতা চিবিবু, নাইলে কি তোর পেট ভরে।

হ্যাঁচকা টান মারতেই দুধ্‌লি প্রভুর ক্রোধটুকু উপলব্ধি করল। সেও খেপে গেল। সামনের পথে ছুটতে শুরু করল। পেছন দিকে দড়ি ধরে প্রায় ঝুলে পড়ে তাকে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল তানি। পায়ের ঠেকা দিতে দিতে অবাধ্য দুধ্‌লির পেছনে কিছুটা ছুটে গিয়েই সে দড়ি ছেড়ে দিল। ভীষণ রাগে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল গালটা—পড়ামুয়ি (পোড়ারমুখী) মর।

বেশ কিছু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দুধ্‌লি। তার অন্যায়টা বোধহয় সে বুঝতে পেরেছে।

এখন দু'জনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। বেলা বাড়ছে, তানির রাগ পড়ে এল। সে এগিয়ে গিয়ে দড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, আর দাঁড়ি রইতে হবেনি, চল। দুধ্‌লিও সুটসুট করে বিনা প্রতিবাদে তানির পেছন পেছন চলতে লাগল।

ধামরার চরে ধান তোলার কাজ শেষ হয়েছে। সামান্য জমি, একাই চাষ করে সাবি। এখানে লোক পাওয়া দুষ্কর। হারাধনের কাছে যে দু'বছর ছিল তার ভেতর চাষের কাজে সে একেবারে রপ্ত হয়ে গেছে। সংবচ্ছর তিনটে প্রাণীর খোরাক সে একাই মাঠ থেকে ঘরে তুলে আনে। মেয়েমানুষ হলে কী হবে অসুরের মতো রাতদিন খাটতে পারে। আর তাছাড়া উপায়ই বা কী। সমুদ্রের ঝড় আর জলের টানে হারাধন ভেসে যাবার পর এক বছরের তানিকে বুকে নিয়ে ওই আক্‌রির জঙ্গল থেকে ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে এসে দাঁড়িয়েছিল দুর্যোধনের ঢিপায়। তিন-চারটে দিন শুধু কাঁচা মাছ ধরে খেয়েছে। কলার গাছগুলোকে কাদামাটি সরিয়ে বের করে তার ভেতরের থোড় চিবিয়ে খেয়েছে। চতুর্থ দিন সন্ধে হয় হয়, শতছিন্ন একখানা ট্যানা কোমরে জড়িয়ে সে বসেছিল স্বামীর ভিটেয়, এমন সময় গুণদা বহু টাকা কবুল করে খেজুরি থেকে একখানা নৌকো ভাড়া করে নিয়ে এল দুর্যোধনের ঢিপার কাছাকাছি চরে। দুর্যোধন বেঁচে থাকতে যে নৌকোখানা ফি বছর ফসল নিতে আসত, তার মালিক মরে যাওয়ায় সে নৌকোর আসা বন্ধ হয়ে যায়। গুণদা অনেক খোঁজ করে ওই নৌকোর এক মাঝিকে ধরে মেয়ের খবর নিতে এলো। সে নিজে মেয়েকে নৌকোয় তুলে চিরদিনের মতো বিদায় দিয়েছিল, মেয়ের কাছে এসে আবার মুখ দেখাতে হবে ভাবেনি। কিন্তু বিধাতাপুরুষের হিসেব নিকেশই আলাদা। আসতে হল তাকে অনেকখানি সাগর পেরিয়ে। এসে মেয়ের অবস্থা দেখে কেঁদে খুন। নৌকোয় করে খেজুরি নিয়ে গিয়ে রাখবে নিজের কাছে, কিন্তু সাবিকে এ জায়গার থেকে নড়ায় কার সাধ্যি। লোক নেই, জন নেই চারদিকে, তবু মেয়ে নড়বে না। শেষে মাকেই হার মানতে হল। অনেক খাবারদাবার রেখে ওই নৌকোয় গুণদা ফিরে গেল খেজুরি। ওখানে ক'দিন থেকে ভিটেমাটি বেচেবুচে, জমানো টাকাপয়সা গোছগাছ করে ফিরে এল আবার। সেই থেকে গুণদা মেয়ের কাছে।

এখন ওরা ডেরা বেঁধেছে ধাম্‌রার নদী-চরে। দুর্যোধনের ভিটার থেকে খানিক পথ দূরে। লোনা বানের পর দুর্যোধনের ভিটের চারদিকের জমি চাষবাসের অযোগ্য হয়ে যায়। তাই ওদের সরে আসতে হয় ধাম্‌রার চরে।

সাবি শুধু ধানই ফলায় না, শাকসবজির চাষ করে। দু'-চারটে পেঁপে আর কলার গাছও লাগিয়েছে।

এদিকে বানের পর জমিতে লোনা লাগলেও আর একদিক থেকে আয়ের পথ খুলে গেছে। চিত্রতোয়ার একটা শাখার পলি সরে গিয়ে স্রোত বইছে তরতর করে। এই স্রোত মিশেছে একেবারে সমুদ্রস্রোতের সঙ্গে। তাই ওই খালটি লোনা জলের মাছে ছয়লাপ।

টের পেয়ে খালে নৌকো বেয়ে নুলিয়ারা এসেছে। মোহনার মুখে জাল পেতেছে তারা।

কিন্তু দুর্যোধনের খাস এলাকাটাই তো মোহনার মুখ অব্দি। কোনও রাজার কাছ থেকে বন্দোবস্ত না নিয়েই সে আর হারাধন রক্ত জল করে এই জলা জায়গাটাকে আবাদি জমিতে পরিণত করেছিল। তাই একদিন এ জায়গার ন্যায্য মালিক ছিল তারা। এখন দু'জনেই মরে হেজে গেলেও তাদের সম্পত্তির দাবিদার রয়েছে দু'জন—সাবিত্রী আর তানি।

নুলিয়াদের কাছে গিয়ে সাবিত্রী জায়গাটার ওপর তার দাবির কথা জানাতেই তারা একবাক্যে তা মেনে নিয়েছে। বছরে বারোটি টাকার বিনিময়ে তারা বন্দোবস্তও নিয়ে নিয়েছে সাবিত্রীর কাছ থেকে। দফায় দফায় টাকা শোধ করে আর কিছু কিছু মাছও কখনও-সখনও তানির নাম করে খেতে দিয়ে যায় নুলিয়ারা।

এদিকে গুণদা বুড়ি যে এক পুঁটলি টাকা এনেছিল খেজুরি থেকে তা হিসেবি মেয়ের হাতেই তুলে দিয়েছিল। শুধু নাতনিকে দুধ খাওয়াবার জন্যে গৌড়দের আস্তানায় গিয়ে একটা গাইগোরু কিনে এনেছিল। শেষবারে কিনে এনেছে দুধ্‌লিকে। গাভীন হয়েছে মহিষটি।

শীত পড়েছে। ঢেঁকির পাড় দিয়ে ধান থেকে চাল তৈরি করে নেয় মা আর মেয়ে। গুণদা গড়ের ভেতর হাত ঢুকিয়ে উসকে দেয়। সে চক্ষে ভাল দেখে না কিন্তু ঢেঁকির ওঠা-নামার ভেতর একটা সময়-জ্ঞান তার জন্মে গেছে। তাই আন্দাজে কাজ চালিয়ে যায়, বড় একটা ভুল হয় না তার।

শীতে ধান সেদ্ধ আর গা হাত পা গরম রাখার জন্যে চাই শুকনো কিছু কাঠ। এ-কাঠের জোগান আসে আক্‌রির জঙ্গল থেকে।

কার্তিক অঘ্রান মাসগুলোতে মহিষ তাড়িয়ে ঘরে ফেরার সময় আক্‌রির জঙ্গলে ঢুকে কিছু শুকনো কাঠ প্রতিদিন সংগ্রহ করে আনে তানি। জমতে জমতে পৌষের মাঝামাঝি ঘরের পেছনে ডালপালার একটা পাহাড় তৈরি হয়ে যায়।

শীতে বড় গা হাত পা ফাটে তানির। ধবধবে সাদা গায়ে যখন ফাট ধরে তখন মনে হয় বুনো ভালুক যেন আঁচড়ে কামড়ে রক্ত বের করে দিয়েছে। হাসতে গেলে ঠোঁটের দু'পাশ চড়চড়িয়ে ওঠে। তার ওপর কোনও কোনও বছর বদ বা জাড়ি (জিভের ঘা) হয় এ সময়। শীতে মেয়েটা বড় কাবু হয়ে পড়ে। কেবল আরাম হয় বুড়িকে জড়িয়ে ধরে কাঁথার ভেতর ঘুমোয় যখন।

এই শীতকালেই বাচ্চা বিয়োলো দুধ্‌লি। তেঁতুলতলা থেকে মা আর বাচ্চাকে আনা হল উঠোনে। ঠর্‌ঠর্‌ করে উঠতে গিয়ে আবার পড়ে যায় বাচ্চাটা। অমনি ছুটে গিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে তানি। খড় চিবুতে চিবুতে আড়চোখে একবার দেখে নেয় দুধ্‌লি। তানিকে কিছু বলে না। এক একবার সামান্য ফোঁস ফোঁস আওয়াজ তুলে বলে দেয় বেশি চাপাচাপি কোরো না বাপু, কোথায় লেগেটেগে যাবে।

নুলিয়ারা বিশেষ কোনও দরকারে এসে উঁকিঝুঁকি মারলেই হল, ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস

ফেলতে ফেলতে তেড়ে যাবে শিং নেড়ে। দড়ির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যাবে, যতক্ষণ না টান পড়ছে।

কয়েক দিনের ভেতরেই বাচ্চাটা বেশ টরটরে হয়ে উঠল। মায়ের পানায় (পালান) খোঁদা মারতে শিখে গেছে। পা ছুরকুটে দাঁড়িয়ে চুকচুক করে দুধ খায়। কখনও ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরে যাবার তাল করে। খানিকটা ছুটে যায়, আবার দাঁড়ায়। দুধ্‌লি তখন খড় চিবুতে ব্যস্ত। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে দেখে ভোঁ-ভাঁ, কেউ কোথাও নেই। অমনি গলা ফাটিয়ে জোর তলব। দুধের বাচ্চা, পথঘাট চেনে না, উদ্বেগ তো স্বাভাবিক।

মায়ের ডাক শুনতে পায় বাচ্চা। থমকে দাঁড়ায়। কচি কচি কান দুটো খাড়া করে শোনে। কিন্তু শব্দের পথ ধরে এগোতে পারে না, ফেরার ইচ্ছে প্রবল হলেও। পথঘাট চেনার জ্ঞানবুদ্ধি নেই।

কোথা থেকে ছুটে আসে তানি। বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধরে তোলার চেষ্টা করে। সামান্য তুলেই ছেড়ে দেয়। মুখখানা নিজের মুখে ঠেকিয়ে কপট শাসনের সুরে বলে, খুম্‌ (খুব) দুষ্টু হইছ তুমি। এ্যাকলা বুলতে (বেড়াতে) শিখিইছ।

তারপর কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় দুধ্‌লির কাছে।

বাচ্চাটাকে কাছে পেয়ে দুধ্‌লি আশ্বস্ত হয়। চাটতে থাকে। দু'-একবার এদিক ওদিক পা নেড়ে ফোঁসফাঁস করে। নিরীহ একটা ঢুঁ মেরে দেয়। না জানিয়ে উঠোন ছেড়ে যাবার শাস্তি।

বাচ্চাটা এখন আর ট্যা-ফুঁ করে না, কুঁকড়ে সিঁটিয়ে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু একটা বেফাঁস কাজ করে যে সে মায়ের বিরাগভাজন হয়েছে, তা সে বুঝতে পারে, কিন্তু নিজের দোষটা যে কী সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি এখনও তার হয়নি।

বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায় দুধ্‌লি। সে এখন নিশ্চিন্ত। শীতের রোদ্দুরটুকু গায়ে মেখে আরামে আধবোজা চোখে খড় চিবোবার সুখটুকু উপভোগ করে।

৮

এই শীতেই অদ্ভুত স্বভাবের একটি ছেলের সঙ্গে তানির পরিচয় হল।

আক্‌রির জঙ্গলে নিঃঝুম দুপুরে শুকনো ডালপাতা কুড়োতে গিয়ে সে প্রথম আয়ানকে দেখে।

বাজে পোড়া ছালওঠা খত্‌না (ক্ষত বা খত্‌ হয়ে যাওয়া) একটা 'ধ'গাছ। তাকে সমানে ঠুকরে চলেছে একটা কাঠহনা (কাঠঠোকরা)। 'ধ'গাছটার তলায় পাতাওলা মানুষ প্রমাণ উঁচু একটা 'ক্যাড়া' গাছ। তার তলায় অজুর্নের লক্ষ্যভেদের মতো বা হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে দুটো হাতে কী যেন ধরে ওপর দিকে ঠায় চেয়ে আছে একটা ছেলে।

তানি একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিল ছেলেটাকে। 'বান্ধন' গাছের একটা শুকনো ডাল তার হাতে। কিছুক্ষণের ভেতরেই ঝটাপট একটা শব্দ শুনে তানি ওপরের দিকে তাকাল। কাঠঠোকরা পাখিটা দুটো পাখা মেলে উড়ে যাবার চেষ্টা করছে কিন্তু আশ্চর্য! উড়ে যাবার বদলে সড়সড় করে সে 'ধ'গাছ বেয়ে নীচের দিকেই নেমে আসছে। একসময় ক্যাড়া-গাছের পাতার ভেতর তার ঝটপটানি শব্দটা শোনা যেতে লাগল।

তানি হাতের ডালটা ফেলে রেখে ছুটল ‘ধ’গাছের দিকে। এখন ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার পাশে মোটা সরু কয়েকটা নল পড়ে। সে হাত তিনেক একটা সরু নল ক্যাড়া গাছের ফাঁক দিয়ে টেনে আনল। নলের মাথায় আটকে গিয়ে কাঠঠোকরাটা ছটফট করছে। এখন নল সমেত বসে পড়ল ছেলেটা। তানিকে সে দেখতেই পেল না।

তানি কিন্তু ছেলেটার পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। নলের মাথায় একটা শিক। ওই শিকের মাথায় গোঁজা আছে হাতখানেক বেতের একটা কাণ্ড। বেতের মাথার দিকটা শক্ত কোনও জিনিস দিয়ে ঘা মেরে থ্যাতলানো হয়েছে। ওরই ওপর পাখিটা বসে ওড়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু উড়তে পারছে না।

পাখিটার পা আর পেট আটকা পড়েছিল আঠায়। ছেলেটা খুব যত্ন করে আঠা থেকে কাঠহনা পাখিটাকে ছাড়িয়ে আনল। হাতের কাছে পড়ে থাকা একগাছা শেকড় দিয়ে ঠোঁট আর পা দুটো বাঁধল। তারপর এক এক টুকরো বাঁশের নল কুড়িয়ে ওই শেকড় দিয়েই বেঁধে নিল। নলের আঁটিটাকে বাঁ বগলে পুরে ডানহাতে পাখিটাকে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াতেই চোখাচুখি হল তানির সঙ্গে।

(বছর ষোলো বয়েসের একটা ছেলে বছর বারো বয়সের একটা মেয়ের মুখোমুখি। কাল ঃ নির্জন দুপুর, জনমনিষ্যি নেই। স্থান ঃ আক্‌রির বিস্তীর্ণ জঙ্গল)।

ছেলেটা প্রথমে কথা বলল, তুমি কি পরি?

তানি খিল খিল করে হাসল। হাসি থামলে বলল, আমাকে দেখি কি পরি বলি মনে হয়?

হুঁ, মনে তো হয়।

কেনি হয় কও তো?

তখনও বিস্ময়ের ঘোর ছেলেটার চোখে। বলল, আমার গৌড় জাতিরে অমন সুন্দর মেয়ে নাই।

আমি তুমার জাতের মেয়ে নয় গো।

ঘর কউঠি (কোথায়)?

ধাম্‌রার চরে।

নদী মুয়ে (মোহনায়)?

হুঁ।

ধূরনু (দূর থেকে) দেখিছি বটে। তেঁতুল গাছের পাশে।

ঠিক।

খালি একটা ঘর আছে ধাম্‌রার চরে।

ঠিক কইছ। সউ ঘরে মা, আমি আর আয়ি রই।

ঘরে মরদ নাই?

না।

ছেলেটা এবার জানতে চাইল, তুমার নাম কী?

তানি। তুমার নাম?

আয়ান আপট।

আবার হাসি তানির মুখে।

আরে হাসুছ কেনে?

আপট কী?

পদবি।

শুনিনি কুনদিন।

তুমার পদবি?

পাইক।

জাতি কী?

জানিনি।

আয়ান হেসে বলে, তবে কী জান?

জাতি জানিলে কি পাখা গজিইবে?

আয়ান এখন ঘরে যেতে চায়, বলল, আমি অখন ঘর যাই।

তানির প্রশ্ন, কে আছে তুমার ঘরে?

ঠাকুরবাপ্‌পা (ঠাকুরদা) আর কেউ নাই।

তুমি পাখি ধরো?

আমাকে নলুয়া কেলা (নল জোড়া দিয়ে যারা পাখি ধরে) মনে করছ নাকি?

এরপর আয়ান তার পাখি ধরার কারণটা ব্যাখ্যা করে গেল।

তার বুড়ো ঠাকুরদা হাঁপানিতে ভুগছে রাতে। ঘুম আসে না চোখে, বিছানায় বসে থাকে। দুপুরে খাবার পর একটু ঝিমুনি আসে আর ঠিক তখনই ওই কাঠঠোকরাটার ঠকঠক কাঠ ঠোকা শুরু হয়ে যায়। আয়ান তাই ধরেছে পাখিটাকে। ক'দিন ঘরে বেঁধে রেখে পরে ওটাকে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

আয়ান সংক্ষিপ্ত করে তার কথা, আইজ বোড়ো দেরি হই গেল, আর একদিন আসতে পারিবনি?

তানির বড় ভাল লেগে গিয়েছিল আয়ানের কাণ্ডকারখানা। সে বলল, দুধ্‌লির বাচ্চা হইছে, অখন দো-শিঙার মাঠে যাওয়া বন্ধ, তাউ শুকনা ডাল কুড়িতে ওই বনে আইলে দুফর (দুপুর) বেলা দেখা হবে।

আয়ান বনের পথ দিয়ে যেতে যেতে বলে, ঠাকুরবাপ্‌পা শুই পড়িলে আসিব।

আয়ানের সঙ্গে মিশে অদ্ভুত একটা জগৎ, ততোধিক অদ্ভুত একটা কিশোরের সঙ্গে পরিচিত হল তানি। সারা বনের অন্ধিসন্ধি আয়ানের নখদর্পণে। গাছ, পাখি, জন্তুজানোয়ার, বনচারী মানুষ, সকলের সন্ধান রাখে সে। ছেলেবেলা থেকে সে একা চলাফেরায় অভ্যস্ত। বাবা মা জ্ঞান হবার আগেই গত হয়েছে। বাঁধন বলতে শুধু ঠাকুরদাদা। গৌঢ় সমাজের সবচেয়ে উমরওয়ালা (বয়স্ক) লোক বলে সবাই তাকে খাতির করে। মুরুব্বির পরামর্শ নিতে আসে কোনও কিছু কাজ শুরু করার আগে।

সারা গৌঢ় সমাজ কিন্তু আয়ানের আশা ছেড়ে দিয়েছে। সে গৌঢ়দের পুরুষানুক্রমিক কোনও কাজই করে না। কেবল বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোই তার কাজ। দু'তিনদিন কোথায় যে উধাও হয়ে যায় কেউ তার হদিস পায় না। আবার হঠাৎ উদয় হয়।

ঠাকুরদাদা তার বাউন্ডুলে নাতির কোনও কাজেই বাধা দেয় না। একটা জোয়ান ছেলে

এতবড় একটা পিরথিবীতে যা হোক কিছু খুঁটে খেতে পারবে। আর তাহলেই হল। রাজাগজা হয়ে কাজ কী। বুড়ো একটা জিনিস সার বুঝেছে, আয়ানের বয়স এতটুকু, মনটা এতখানি। রাতে বুড়োকে যখন হাঁপানিতে ধরে তখন ছেলেটা সারা রাত জেগে বসে সেবা করে যায়। বার বার শুতে যেতে বললেও কথা শোনে না। আবার রাত জেগেছে বলে ভোরবেলা কিন্তু ব্যাজার নয়।

দুটো দুধেলা গাইগোরু আর দুটো মহিষ এখনও বুড়োর সম্পত্তির ভেতর। এই মূল্যবান সম্পত্তির তদারকির ভার দিতে হয়েছে অন্যের হাতে। আয়ানের ওপর নির্ভর করা যায় না। গাইবাছুর নিয়ে চরাতে বেরুল তো তিন-চারদিন তার দেখা নেই। এতবড় দো-শিঙার মাঠে তার মন আঁটে না। সে গোরু-মহিষের দলটি নিয়ে ক্রমাগত চলতে থাকে। বাঁটে মুখ লাগিয়ে বাছুরের মতো টেনে টেনে খায়, আর রাতের বেলায় নির্ভয়ে কোনও গাছতলায় পড়ে টানা ঘুম দেয়।

একবার পশুর দল নিয়ে চলে গিয়েছিল দশ ক্রোশ দূরের এক গঞ্জে। সেখানে বেদেদের দেখা পেল। একটা মাঠে দর্শকদের খেলা দেখাচ্ছিল। একটি কিশোরী মেয়ে মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। লম্বা একটা কাঠের তোরঙ্গ তার মাথায়। সে সেটাকে মাটিতে নামাল। পাশেই একটা গুঁড়ি-মোটা অশত্থ গাছ। তার তলায় কিছুক্ষণ বসেই শুয়ে পড়ল মেয়েটি। তিনটে ডাকাত চেহারার লোক হঠাৎ গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তারা নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করল। একজন সিন্দুকটা কাঁধে তুলে পালাতে গেল কিন্তু তখন হঠাৎ মেয়েটি ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুল। দুটো লোক এগিয়ে এসে মেয়েটাকে ঘিরে ফেলল। দর্শকদের চোখের আড়ালে তখন পড়ে গেছে মেয়েটা। শুধু খুনেদের হাতের একটা ছোরা শূন্যে আকাশের দিকে উঠল আবার নামল। প্রথমবার সূর্যের আলোয় ছোরাখানা ঝকঝক করে উঠল। দ্বিতীয়বার আঘাতের জন্য ছোরাখানা তুলতেই দেখা গেল রক্ত ঝরছে ছোরা থেকে।

হই হই পড়ে গেল দর্শকদের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দুটো লোক মৃতদেহটা তোরঙ্গের কাছে বয়ে আনছে। ছোরাটা বুকে এফোঁড় ওফোঁড় বিদ্ধ হয়ে আছে। রক্ত ঝরছে বুক থেকে। তৃতীয় লোকটা ইতিমধ্যে তোরঙ্গ খুলে ফেলেছে। দুটো সোনার বালা আর একখানা শাড়ি সে বের করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো লোক ওই মেয়েটাকে ভরে ফেলল তোরঙ্গের ভেতর। ডালা বন্ধ করে কাঁধে তুলে যেই না পালাতে গেছে অমনি লোকেরা মার মার শব্দে পেছু নিল। আয়ান লাফ দিয়ে ছুটেছে সবার আগে। শলামনকে আইজ মারি পেকিইব (ফেলব)।

তৃতীয় লোকটি অমনি সবার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। দু'হাত তুলে যা বলল তার অর্থ, সে এখুনি মরা মেয়েটিকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে।

তোরঙ্গ নামানো হল। ডালা একটুখানি ফাঁক করে লোকটা বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ল। তারপর পুরো ডালাটা খুলে ফেলতেই মেয়েটা চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এল।

দর্শকেরা বিস্ময়ে হতবাক। আয়ান ঠোঁট নেড়ে ফিসফিস করে বলতে লাগল, ভগমান, ভগমান।

মেয়েটা এখন একটা বাটি হাতে নিয়ে ঘুরছে দর্শকদের কাছে। ঠকঠক, ঠং ঠং কড়ি আর পয়সা পড়ছে বাটিতে।

খেলা শেষ হলে পয়সা কুড়িয়ে বেদের দল চলে গেল। আয়ান কিন্তু ওদের পেছু ছাড়ল না,

গঞ্জের পাশের মাঠে চরতে লাগল তার গোরু-বাছুর। সে যে করেই হোক মরামানুষ বাঁচাবার বিদ্যেটা ওদের কাছ থেকে শিখে নেবে।

পাঁচদিন ওদের সঙ্গে থেকে সমানে মোট বইল। এমন ভারবাহী জন্তুটিকে কি কেউ সহজে ছাড়ে ! মন্ত্র শেখাবার ধাপ্পা দিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে চলল তারা। শেষে কিশোরী মেয়েটির দয়া হল। সে দলের লোকজনের আড়ালে একদিন আয়ানের কাছে সব রহস্য ফাঁস করে দিল। খালি কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র সব বুজরুকি। ছোরাখানা ওর হাতে দিয়ে বলল, দেখো, ছোরার হাতল আর সামনের দিকটা সোজা, কিন্তু মাঝখানটায় আধখানা কোমর ঢোকার মতো বেড়। আমাকে আড়াল করে যে ছোরাখানা তোলা হয়, সেটা অন্য ছোরা। বয়ে আনবার সময় কোমরে আধপাক গুঁজে এই ছোরাখানা লাগিয়ে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে বুকে আর ছোরায় ঢালা হয় অনেকখানি আলতা।

রাতে আয়ানকে চুপি চুপি ঘুম থেকে তুলে মেয়েটি বলল, এই নাও ছোরা। এখন রাতের অন্ধকার। যেদিকে পারো পালাও, কেউ দেখতে পাবে না।

আয়ান পাঁচদিনের পথ তিনদিনে পেরিয়ে আগের গঞ্জে এল। এখন তার গোরুগুলোর কথা মনে পড়েছে। সে হন্যে হয়ে মাঠঘাট চুঁড়তে লাগল।

আয়ানের গোরু লুকিয়ে রাখে কার সাধ্যি। দো-শিঙার মাঠে যখন সে গোরুচরাতে যেত, তখন বটগাছের ডালে চড়ে গৌড়পল্লীর সবকটা গোরু-মহিষের নাম ধরে ডাকত। অমনি গাছের তলায় এসে ভিড় করত গোরু-মহিষের দল। জন্তুগুলোর গলকম্বলে তার মতো কেউ চুলকে দিতে পারত না। সে যখন নখের আঁচড় দিতে শুরু করত, প্রাণীগুলো গলা-মুখ উঁচিয়ে আরাম উপভোগ করত। সে যতক্ষণ হাত চালাত কেউ তার কাছছাড়া হতে চাইত না।

খালের জলে পশুগুলোকে স্নান করাতেও সে ছিল ওস্তাদ। বনে অনেক ধুঁধুল পেকে থাকত। সেগুলোর বিচি বের করে শুকিয়ে রাখত সে। স্নানের সময় ও শুকনো ধুঁধুলের খোসা দিয়ে প্রতিটি গোরুর পিঠ-পেট আচ্ছা করে রগড়ে দিত। কী আরাম জন্তুগুলোর। পিঠের কেঁউট (এঁটুলি) খসে পড়ত ঘসটানির দাপটে।

আয়ান মাঠে মাঠে ঘুরতে লাগল। নাম ধরে ডাকতে লাগল তার পশুগুলোর। বুধি-বুধিয়া, ও মংলী, গুরুবারী-ঈ।

শত শত গোরুর ভেতর ঠিক হাম্বারব উঠতে লাগল। ডাক ছাড়তে ছাড়তে ছুটে এল আয়ানের গোরুগুলো।

সেবার পনেরো দিন পরে ফিরল আয়ান। সবাই প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল তার আশা। হয় অহিরাজে গিলেছে, নয়তো বাঘের পেটে গেছে। দিনরাত বনবাদাড়ে ঘোরার ওই একমাত্র পরিণতি।

আয়ান গাঁয়ে ফিরেই সেই ছোরার খেলা শুরু করে দিলে। খেলা দেখে সবার তাক লেগে গেল।

কিন্তু বেশি দিন মন বসাতে পারে না ও একটা কিছুতে। সবার কাছে ছুরির কৌশল ফাঁস করে দিয়ে আবার ঘুরতে লাগল বনেবাদাড়ে।

আক্‌রির জঙ্গলে একটা শিমূল গাছ হরদম লাল ফুল ফুটিয়েছে। তার তলায় দাঁড়িয়ে আয়ান

দেখছিল একঝাঁক সবুজ টিয়াপাখির কাণ্ড। লাল শক্ত ঠোঁটে ঠোকর মেরে ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে নীচে ফেলছে। রাশি রাশি লাল ফুলে ঘাসেভরা জমি ঢাকা পড়েছে।

আয়ানের ব্যাপারটা ভাল লাগল না। সে আকাশে বাঁটুল চালিয়ে শব্দ করতে লাগল। পাখিগুলো ভয় পেয়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ে পালাল। ঠিক সেই সময় আয়ানের কাছে এসে দাঁড়াল তানি।

আয়ান খুশি হল। বলল, এ খরাবেলা তুমি কি কাঠ কুড়িতে আসছ?

তানি হাসল। সে কাঠ না কুড়িয়ে ফিরবে না ঠিক, তবে এই অদ্ভুত ছেলেটির আকর্ষণ তার কাছে কম নয়। সে কিছু না বলে চোখেমুখে হাসি ফুটিয়ে তাকাল আয়ানের দিকে। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল।

যত শুকনা ডাল বইতে পারব তত ভাঙি দিব।

তানি সেই মুহূর্তে আয়ানের কথায় কোনও উৎসাহ না দেখিয়ে সম্পূর্ণ অন্য কথা পাড়ল, তুমার কাঠঠক্‌রা কেমন আছে গো?

তুমি সউ কাঠহনার কথা কউছ কি? সে রাশ ছিঁড়ি পলিই যাইছে।

সে কী! আবার দুপ্‌রে তুমার ঠাকুরদাকে জ্বালাইবে।

আয়ান বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, অনেক ধূর পলিইছে, আর আসিবনি।

তানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচা গেল।

আয়ান বলল, তুমার তরে একটা জিনিস রোখছি।

কী?

আয়ান ট্যাঁকের থেকে পাক খুলে গোটাকয়েক কচি আম বের করে আনল। তানির হাতে আমগুলো দিয়ে বলল, কত বোড়ো কাঁচা আম দেখছ?

তানির চোখ দু'টো চকচক করে উঠল। সে মাথা নেড়ে জানাল, সে কখনও এত বড় কাঁচা আম দেখেনি।

আয়ান বলল, চারুবাড়ে খালি মৌল হেইছি, বনের ভিতরে একটা গাছে এ আম পাইছি।

নুন ছাড়াই দু'জনে মিলে আম ক'টার গতি করল। কিছু শিমূল ফুল কুড়িয়ে তানিকে উপহার দিল আয়ান। তানি ফুলগুলো কোঁচড়ে বেঁধে নিল।

এরপর ডালপালা ভাঙার পালা। আয়ান গাছের শুকনো ডাল ভাঙে আর তানি গাছের তলায় কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করে। এত ডাল জড়ো হল যে একা তানি বয়ে নিয়ে যায় সাধ্য কী।

তুমি চলো। আমি সঙ্গে যাব।

তানি বলল, না হয় দু'বার বইব। তুমি আবার কষ্ট করি যাব কেনি।

আয়ান কোনও কথা না বলে তানির মাথায় ছোট্ট বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বলল, তুমি চালি যাও।

তানি বোঝা মাথায় বলল, বেলা রইলে আর এক বোঝা লিয়া যাব। না হিলে কাল লিতে আইসব।

আয়ান কোনও কথা বলল না। তানি ঘরের দিকে চলতে লাগল। বড় ডালের একটা অংশ

মাটি আঁচড়ে অদ্ভুত সব শব্দ তুলে চলতে লাগল তার পেছন পেছন। তানি জানতেও পারল না বিরাট এক বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে আয়ান তার পেছন পেছন আসছে।

সাবিত্রী উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। সে তানিকে একটা ছেলের সঙ্গে আসতে দেখে তো অবাক। একসঙ্গে এতগুলো শুকনো ডাল দেখে মনে মনে খুশিও হল।

তানির সঙ্গে সঙ্গে আয়ান উঠোনে মাথার বোঝাটা ফেলে দিলে। তানি চমকে ফিরে দেখে আয়ান। দাওয়ায় মা দাঁড়িয়ে। তানি কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

আয়ান কিন্তু হাসছে। ভোরের ছড়িয়ে পড়া রোদের মতো হাসি।

সাবিত্রীর বড় ভাল লেগে গেল ছেলেটিকে। সে উঠোনে নেমে এসে বলল, কী নাম বাবা তুমার? ঘর কুন্‌ঠি (কোথায়)?

আক্‌রি জঙ্গলের পচ্ছিম দিকে আমার ঘর মাউসি (মাসি)। আমার নাম আয়ান।

ছেলেটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। টানা টানা চোখ, কালো রং। সাবিত্রীর মনে হল কেষ্টঠাকুরটি। সাবিত্রী বলল, দো-শিঙার মাঠে গরু চরাও বুঝি? আমার তানির সঙ্গে সউখানে চিনাজানা?

আয়ান অকপট। প্রথম দিন পাখি ধরতে গিয়ে তানির সঙ্গে তার কী করে পরিচয় হল, তারপর ডাল ভেঙে কীভাবে তানিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল, সোজাসুজি সেসব কথা বলে গেল আয়ান। শেষে বলল, আমি অখন গোরু চরানো ছাড়ি দিছি মাউসি।

সাবিত্রী জানতে চায়, ঘরে কে আছে তুমার?

ঠাকুরবাপ্‌পা (ঠাকুরদা) আছে আর কো নাই।

সাবিত্রীর বুকটা কেঁপে ওঠে, আহা মা নেই তুমার?

মা আর বাপ একা দিনে কলেরায় মরি যাইছে।

সাবিত্রী শোকপ্রকাশ করে, কী কপাল বাছার আমার, মা-বাপ কইতে কো রইলানি।

সাবিত্রীর চোখে জল এসে পড়েছিল। সে বলল, আইস বাবা, গরিব মাউসির ঘরে দু'টা ভুজা খায়া যাও।

আয়ানের 'লজ্জা' আর 'না' এ-দু'টোর কোনওটাই নেই। সে দাওয়ায় উঠে এল। সাবিত্রী একটা চাটাই পেতে তাকে বসতে দিল। মুড়ি, দুধ আর কলার ফলার হল পরিপাটি।

সন্ধ্যার একটু আগে আয়ান বেরুল সাবিত্রীর ঘর থেকে। অনেক গল্প হল। সবই আয়ানের অভিজ্ঞতার গল্প। সাবিত্রী বলল, মাউসিকে মনে করিয়া আবার আইস্‌ব বাবা।

আয়ান মাথা নেড়ে জানাল, সে নিশ্চয়ই আসবে।

আয়ানের বেরুবার সময় সাবিত্রী তানিকে অনেক ডাকহাঁক করল। কিন্তু তানির পাত্তাই পাওয়া গেল না।

তেঁতুলতলার পাশ দিয়ে নীচের রাস্তায় নেমে যাবার সময় আয়ান আচমকা পিঠে একটা ধাক্কা খেল। না, ধাক্কায় উলটে পড়ল না সে। শুধু নীচে হুড়মুড় করে নেমে গেল। নীচে নেমে পেছন ফিরে তাকাতেই শুধু একটা শব্দ তার কানে গেল—হুনমান (হনুমান)। মুহূর্তে আধখানা মুখ তেঁতুলগাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাবিত্রী শেষবেলার আলোটুকুর দিকে উদাস চোখে চেয়েছিল। ধাম্‌রা নদীর ওপারে ধাম্‌রা মায়ের মন্দিরের ধ্বজা দেখা যাচ্ছে। নুলিয়ারা অনেক উঁচু একখানা বাঁশ পুঁতে তার মাথায় লাল নিশান উড়িয়েছে। ওদের বিশ্বাস সমুদ্রের যতদূর অব্দি ওই নিশান দেখা যাবে, ততদূর পর্যন্ত

তারা নিরাপদ। তার বেশি গেলেই ধাম্‌রা-চণ্ডীর কোপ পড়বে। তখন লোভের শাস্তি, ঝড়ের মুখে পড়া অথবা হাঙরের কামড়ে মরণ।

সাবিত্রী দু'টো হাত জোড় করে বলল, মাগো, তিনটা মেয়ে চরে পড়ি আছি, আখা কুলে শাখা নেই (কোন কুলে কেউ নেই), ভাল হইল, একটা পুরুষ টকার (ছেলের) মুখ দ্যাখতে পাইলি তুমার কিরপায়।

নুলিয়াদের খটিতে (জেলেদের অস্থায়ী আবাস, যেখানে শুঁটকি মাছ ইত্যাদি তৈরি হয়) বুড়ি গুণদা গিয়েছিল টাকার তাগাদায়। ঘরে ফিরে এসে সাবিত্রীর মুখে আয়ানের কথা শুনে কী আফশোস। কপাল চাপড়ে বলতে লাগল, আমি টকাটাকে পড়া-চোখে একবার দেখতে পাইলিনি গা।

তানি অমনি বলল, ভাবছ কেনি আয়ি, ও আবার আইল বলিয়া।

ক'দিন আয়ান বেপাত্তা। যথা সময়ে তানি বনে যায়। চারদিকে তাকায়, কিন্তু আয়ান কই! মনে মনে লজ্জা পায়, তাড়াতাড়ি ডালপালা কুড়োতে লেগে যায়। যেমন বাঁদর, হয়তো কোনও গাছের ডালে বসে লক্ষ করছে তাকে, আর দাঁত খিঁচিয়ে হাসছে।

ফেরার সময় চোখে জল আসে তানির। ছোট্ট মনখানা তার হাত থেকে হঠাৎ খসে-পড়া আয়নার মতো টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

চতুর্থ দিনে হঠাৎ ধাম্‌রার চরে আয়ানের উদয়। তখন চাঁদেরও উদয় হয়েছে দো-শিঙার মাঠের ওপারে।

সাবিত্রী যেন হারানিধি ফিরে পেয়েছে। আকুল হয়ে বলল, কাই (কোথায়) থাইল বাপ্ অতদিন মাউসিকে ভুলিয়া?

আয়ান বলে, যাত্রা হবে বলি আমাকে কো ছাড়লানি মাউসি। আমি লুকিকি পলিই আসসি।

বেশ করছ বাপ। আমি ভাবিয়া মরি অদ্দিন টকাটা গেল কাই। হঁ বাপ, কীসের যাত্রার কথা বলছ?

অন্ধমুনির পুত্রবধ, রাধিকার মানভঞ্জন। এ দু' যাত্রায় আমি নামছি মাউসি। কাল খরাবেলা আইসা তুমারমনকে লিয়া যাব।

সাবিত্রীর গলা আবেগে বুজে আসে। আমারমনকে লিয়া যাব? সনার চাঁদকে ভগবান আমার ঘরে পাঠিইছে। কী সাজব বাপ তুমি?

একটা পালায় অন্ধমুনির পুত্র, আর একটায় কৃষ্ণ।

বুড়ির কানেও কথাগুলো পৌঁছেছে। বুড়ো মানুষের আবেগ একটু বেশি। সে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল। তানি বুড়ির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, আয়ি, চুপ, একদম চুপ, আর কাঁদব যেদি তাহিলে কাল তুমাকে একলা ঘরে রাখিয়া আমারমনে (আমরা) যাত্রা শুনতে যাব।

সামান্য কান্নার জন্য এতবড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে বুড়ি রাজি নয়। সে আবছা অন্ধকারে নাতনির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, না ভাই, আমি তো কাঁদিনি। আমার কিরা (দিব্য) দিদি আমাকে একলা ফেলি পালিইবুনি (পালিয়ে যাবি না)।

তানির ওপর যেন বুড়ির ভাগ্য ঝুলছে। সে কান খাড়া করে আছে নাতনির মুখের শেষ রায়টুকু শোনার আশায়।

তানি বুড়ির তোবড়া গালে একটা চুমু দিয়ে বলে, তুমাকে লিয়া যাব গো যাব। শুনছনি, তুমার বর কিষ্ট সাজবে। রাধাকে নেই লিয়া গেলে চলবে কী করি।

অমনি বুড়ির রসিকতা উথলে উঠল, তোর বররে তোর বর। অমন সুন্দর রাধারানী রইতে কিষ্টঠাকুরের চোখ কি আর কারও দিকে যায়রে দিদি।

গৌড়দের মেয়েরা বসেছে একদিকে অন্যদিকে পুরুষেরা। মেয়েদের মুখে ঘোমটা। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ওরা দিব্যি যাত্রা দেখে। ওদের মাঝে বসেছে তানিরা। গলা থেকে পা অব্দি গৌড় মেয়েরা ঠেসে পরেছে গয়না। হাতে পরেছে মুঠখড়ু, জড়ি ডম্‌রিয়া। গলায় রুদ্রাক্ষের মতো গাঁথা হার—কেঠল কণ্ঠি। কানে ত্রিকোণ লুড়কিওয়ালা ফির্‌ফিরা। নাকে—বসনি নথ। পায়ে অনেকখানি ঢেকে কৃষ্ণচূড়ার মতো ভগুা-কলস।

তানি গয়নাগুলোতে হাত বুলিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নাম জেনে নিচ্ছে।

হঠাৎ বংশী, মৃদঙ্গ, কাঁসর আর মন্দিরা বেজে উঠল। সবাই সোজা হয়ে বসে আসরের দিকে চেয়ে রইল।

বাজনা থামলে বাঁশি থেকে শুধু একটা করুণ রাগিণী ঝরতে লাগল।

একটি বাঁকের দু'প্রান্তে দু'টি ঝুড়ি। সেই দু'টি ঝুড়িতে হাড় জিরজিরে অন্ধমুনি আর তাঁর অন্ধ স্ত্রী বসে। বাঁকখানিকে কাঁধে নিয়ে আসরে ঢুকল অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধু। নদীতে জনক-জননীকে স্নান করিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরছে সে।

একটি পনেরো-ষোলো বছরের ছেলের কাঁধের জোর দেখেই হোক অথবা মা-বাবার ওপর ভক্তি দেখেই হোক, ঘন ঘন হরিধ্বনি উঠতে লাগল। মেয়েদের ভেতর থেকে দু'-তিনজন শঙ্খধ্বনিও করল।

কোনও গণ্যমান্য লোককে হাতি যেমন শুঁড় উঁচিয়ে অভিবাদন জানায়, ঠিক তেমনি বাঁ হাতে ঘোমটা উঁচিয়ে সিন্ধুর এই অভূতপূর্ব কাণ্ড দেখতে লাগল মেয়েরা।

মেয়েদের এই মাথা নাড়ানাড়িতে গুণদা বুড়ির দৃশ্যটি দেখতে বড়ই অসুবিধা হতে লাগল। তানি তার কানে কানে যতই বর্ণনা দেয়, বুড়ি না দেখতে পাবার জন্য ততই অধীর হয়ে ওঠে।

দেখার জন্য যখন একটু ফাঁক পেল বুড়ি, তখন হাত দিয়ে চোখ ফাঁক করেও স্পষ্ট দেখতে পেল না। অমনি মেয়েগুলোকে আর নিজের কপালকে বিড়বিড় করে গাল পাড়তে লাগল।

সিন্ধু পর পর চারটি দিকে ফিরে ফিরে গানের সুরে পিতামাতার বন্দনা করে চলল।

একসময় অন্ধমুনি আর তাঁর পত্নী ঝুড়ি থেকে মুক্তি পেলেন।

পিতামাতার সঙ্গে পুত্রের কথোপকথন থেকে বোঝা গেল তাঁরা কুটিরের মধ্যে বিশ্রামসুখ উপভোগ করছেন। কিছু পরেই দুটি থালিকাতে সিন্ধু ফল মিষ্টান্নাদি এনে হাজির করল।

অন্ধমুনি ও তাঁর পত্নী ফলাদি ভক্ষণের পর যা অবশিষ্ট রইল, তাই একান্তে বসে পরিতৃপ্তিসহ আহার করল সিন্ধু। আহারান্তে শুরু হল জনক-জননীর পদসেবা।

সন্ধ্যায় ফিরল বন থেকে কাষ্ঠ আহরণ করে। ঘরের সামনে প্রদীপ জ্বালা হল। প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করল তিনজনে মিলে।

রাত্রি ঘনিয়ে উঠলে অন্ধমুনি স-পত্নী শয্যা গ্রহণ করলেন। সিন্ধু শয়ন করল পিতামাতার পদতলে। অচিরেই তিনজনে নিদ্রাভিভূত হল।

হঠাৎ গ্রীষ্মের রাত্রিতে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে অন্ধমুনি পুত্রকে ডেকে বললেন, 'জল কিছি আছে কি বাপোধন? সিন্ধু শুখি গেল বিন্দু নাহি কুম্ভ শূন্য।' হায়, হায় একবিন্দু জল কোথাও নেই। পিতা তৃষ্ণায় কাতর। অমনি দ্রুত কলসি নিয়ে জলের সন্ধানে চলল সিন্ধু। পিতা বারণ করল, কিন্তু শুনল না।

'ধ্রুত উঠাই চলিলা
নাহি থাউ বোলন্তে বারণ ন মানিলা'
অন্ধমুনি তখন বলতে থাকেন,—
'রাত্রি পাহি নাহি
কিম্পা এড়ে উদ্বেগ
শুনি নাই কুম্ভাটুয়া
পাহান্তি কলরব'

রাত্রি প্রভাত হয়নি এখন। কুম্ভাটুয়া পাখির কলরবও শোনা যাচ্ছে না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। মন্দভাগ্য যাকে টেনেছে তার নিস্তার নেই। সে ছুটল বন চিরে জলের সন্ধানে।

মৃগভ্রমে দশরথ সিন্ধু হত্যা করে যখন তাকে কাঁধে বয়ে আসরে মুনির সামনে এনে শুইয়ে দিলেন, তখন চারদিকে উঠল হাহাকার ধ্বনি! মেয়েদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কী কান্না।

ছেলেরা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে আসরে পড়ে-থাকা সিন্ধুরূপী আয়ান সত্যই মৃত কিনা দেখতে লাগল।

যাত্রা ভাঙলে চাঁদের আলোয় সাবিত্রীরা ফিরে চলল ধাম্‌রার চরের দিকে। বুড়ি তার সামনে বসা বে-আক্‌কেলে মেয়েদের গাল পেড়ে চলেছে। তানি গম্ভীর। সাবিত্রীর ফোঁপানি তখনও থামেনি। নির্জন পথের ওপর কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ নিঃস্তব্ধতাকে ভেঙে চলেছে। হঠাৎ পেছনে থেকে সাবিত্রীকে এসে ধরল আয়ান।

তুমারমনে কখন চলি আইল মাউসি, আমি খালি খুঁজছি।

সাবিত্রী কোনও উত্তর না দিয়ে কেবল আয়ানের মাথায় আর কপালে চুমু খেতে লাগল। যেন মৃত্যুর মুখ থেকে দৈব কৃপায় হারানো পুত্রটি তার ফিরে এসেছে।

পরের যাত্রা—মাথুর। কৃষ্ণ বৃন্দাবন পেছনে ফেলে মথুরায় চলে গেছেন। রাধার বেশধারী একটি বালক করুণ সুরে গাইতে গাইতে দূতীকে বলছে—

'ভাঙ্গি পিঞ্জরীকি,
এ শুয়া শারীকি
চঞ্চলে উড়াই দিয়।
এ নীল শাড়ি নেই
যমুনা স্রোতে দিয়
ভসাই গো—'

কাঠ কুড়োতে কুড়োতে বহুদিন আপন মনে মাথুর পালার এই গানটি গেয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে তানি। প্রতিদিন একটিবার করে অন্তত আয়ানকে দেখতে না পেলে শূন্য মনে হয়েছে তার চারদিক।

বেশ কয়েকটা দুপুর আয়ানের দেখা নেই। অদ্ভুত এক ধরনের কষ্ট তানির বুকের মধ্যে পাক খাচ্ছে। এমন সময় এক দুপুরে আয়ান হন্তদন্ত হয়ে তানির সামনে এসে হাজির।

আমার সঙ্গে যিব তানি?

কোথায় যেতে হবে তা জিজ্ঞেস করতে গেলে পাছে আয়ানের দেরি হয়ে যায় তাই সে শুধু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। এই মুহূর্তে আয়ানকে দেখে কোথায় ভেসে গেল তার অভিমান।

খালের একটা ট্যাকের (বাঁক) মুখে আয়ানের পিছু পিছু এসে হাজির হল তানি। মাথার ওপর ভরদুপুর, নীচে খালে খর ভাটা। একটা ডংগা (ডিঙি) খুঁটার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। সেটা দূর গাঙের দিকে মুখ করে যেন লাফাচ্ছে।

কাদা ভেঙে-ভেঙে নেমে গেল আয়ান। তার পেছন পেছন তানিও নৌকোয় গিয়ে উঠল। গলুইতে বসে স্রোতে পা নামিয়ে চবর চবর শব্দ করে পা ধুল তানি। ততক্ষণে স্রোতের মুখে নৌকো ছেড়ে দিয়েছে আয়ান।

তানি এবার জানতে চায়, এ-ডিঙি কার? তুমাকে তো কুনওদিন ডিঙি চালিতে দেখিনি?

আমি সবু কাম পারি। এ ধুম্‌সা নুলিয়ার ডংগা।

তুমি তার ডিঙি লিছ যে বোড়ো? সে রাগ করবেনি?

সবাই বাটি বাটি আমার গুরুবারির (বৃহস্পতিবারে যে গাভীটি জন্মেছে) ক্ষীর খায়। আমি মাঙ্‌না কারু ডংগা লিইনি।

আয়ান ক্ষীর খাইয়ে নুলিয়াদের বশ করে রেখেছে আগেভাগে। তাই খালে দুপুরের দিকে ডিঙি বাঁধা থাকলেই সে নুলিয়াদের অনুমতি ছাড়াই নিয়ে চলে যায়।

মাথার ওপর দিয়ে ক'টা বতক (ছোট ছোট হাঁসজাতীয় পাখি) উড়ে গেল। তানি হই হই করে হাঁসেদের যাত্রার খবর ঘোষণা করল। আঙুলের রেখায় বুড়ো আঙুলের নখ ঠেকিয়ে এক-দুই করে গুণল—পাঁচ।

এখন থই থই জল। ঢেউয়ের উপর ডংগা উঠছে-নামছে। দক্ষ মাঝির মতো হাল ধরে বসে আছে আয়ান। অনেকখানি দূরে দেখা যাচ্ছে ধাম্‌রার চর। তানিদের বিশাল তেঁতুলগাছটাকে ছোট একটা বৈঁচি ঝোপের মতো মনে হচ্ছে, তাও বেশ ছায়া ছায়া।

এবার কিন্তু বাঁদিকে আক্‌রির জঙ্গলের একটা বেড় স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেদিকে নৌকো ঘোরাতে ঘোরাতে আয়ান বলল, ভয় লাগছে নাকি?

তানির যদিও জল জঙ্গলের ভেতরে বাস, তবু কোনওদিন সে নদীর ধূ ধূ মোহনায় নৌকো করে যায়নি। বেশ খানিকটা ভয়ে সে সিঁটিয়ে বসেছিল। আয়ানের কথার জবাবে শুধু মন্তব্য করল, তুমি একটা ডাকাইত।

কিছুক্ষণের ভেতরেই ওরা এল বনজঙ্গলে ভরা একটা ছোট্ট দ্বীপে। দ্বীপটার মাঝে জঙ্গল, চারদিকে প্রায় জলের খেলা। জল আর জঙ্গলের মাঝে হাঁসুলির মতো ঘিরে আছে ঘোলাটে সাদা বালির চর। খানিক দূরে আক্‌রির ঘন জঙ্গল। আক্‌রির বন থেকে এই ছোট্ট দ্বীপে আসার

জন্য আধ ক্রোশ পর্যন্ত আঁকাবাঁকা একটা পলির পথ জলের বুকে মৃত বাসুকীনাগের মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

একটা ঝুঁকে পড়া হাব্‌লি গাছের গোড়ায় ডংগা বেঁধে লাফ দিয়ে নামল আয়ান। তানিকে হাত ধরে নীচে নামাল।

কাছাকাছি আর একটা হাব্‌লি গাছ দেখিয়ে বলল, ওই হাব্‌লি গাছের মূলের উপর বসো। একটা নেউল কাছিম-ডিম খাইতে আসিব তুমি তাকে তাড়িই দিব। কতদিন আমি জাল বসিইছি, ধরি পারি নাই।

আয়ানের নির্দেশমতো তানি হাব্‌লি গাছের নিচু একটা মূলের ওপর সাবধানে চড়ে বসল। আয়ান বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

কেউ কোথাও নেই। হাব্‌লির পাতাগুলো গাঙের হাওয়ায় পটর পটর শব্দ করছে। হলুদ আর মেটে সিঁদুর রঙের ফুল ফুটেছে সরু সরু ডাল আর পাতার ফাঁকে।

তানি মাথার ওপর হাত বাড়িয়ে ফুল তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

এখন সে বালির চরের ওপর চোখ পেতে ঠায় বসে রইল। সূর্যের তীক্ষ্ণ ফলাগুলো চরের ওপর পড়ে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল।

ওই তো সে আসছে। হেলতে-দুলতে এগিয়ে আসছে মস্ত বড় একটা কচ্ছপ। ও এসে থামল হাব্‌লি গাছের ধারে এক চাব্‌ড়া রগড়া বুদার (লতার মতো ঘাসের ঝোপ) নীচে।

তানি দেখল, কচ্ছপটা চাকের মতো এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে তিন-চারবার ফরফর করে ঘুরল। নীচের বালিগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ওই তো থেবড়ে বসে ডিম পাড়তে দেখা যাচ্ছে। এমনি একটা-একটা করে তিনতিনটে কচ্ছপ জল থেকে উঠে এসে ডিম পাড়ল।

বেশ কিছু সময় কেটে যাবার পর ডিমের ওপর বালি চাপা দিয়ে গদাইলশকরি চালে হেলতে-দুলতে নেমে গেল জলে।

অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে থেকেও ডিম-চোর বেজির সন্ধান পেল না তানি।

পাশের গাছগাছালির ভেতর খসখস একটা আওয়াজ হতেই চমকে তাকাল সে। না, বেজি নয়, ডালপালা সরিয়ে তানির দিকে আসছে আয়ান। হাতের একটা দড়িতে ঝুলছে ফাঁসে আটকানো বেজিটা।

সাতদিন পরে ব্যাটা ধরা পড়ল। খালি ধঁকা দিয়া পালিইত।

এরপর তানির হাত ধরে ঝোপঝাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে আয়ান হাজির হল দ্বীপের উত্তরে।

চারদিক ঘুরে ঘুরে সে তানিকে অদ্ভুত সব জিনিস দেখাল।

জঙ্গলের ভেতর বরার (শূকর) চলার পথ। কচুবন তছনছ করে, শকরকন্দ খুঁড়ে ফেলে তারা দলবল নিয়ে চলে।

আয়ান জঙ্গলের পথে চলতে চলতে তানিকে দু'-তিনটে ডালপাতা চাপা দেওয়া. গর্ত দেখাল।

তানি কৌতূহলী হয়ে উঠল, এগুলা কী গা? ডালপাতা দিয়া গর্ত ঢাকি রাখছে কে?

এ বরা ধরার গর্ত। শবরমনে আইসা বরা চলার মাড়ায় (রাস্তায়) গর্ত খুঁড়ি ডালপতর

ঢাকিই রাখে। বরাগুলো যখন যায় তখন গর্তে পড়ি যায়। তারপর সে কী চেঁচানি। বরাগুলার কাঁদনা শুনলে তোর ছাতি ফাটি যিবে তানি।

তানি বড় দুঃখ পায়, আহারে বেচারাদের কী কষ্ট। আধঘাতে প্রাণটা যায়।

আয়ান বলে, আমি জঙ্গলের ভিতরে একটা পাটা লুকিই রোখছি। সেই পাটা গর্তে নামিই দিলে বরাগুলো আঁচড়ি কামড়ি উঠি পলিই যায়। পনরদিন ধরি আমি ওই কাম করিছি।

তানি বলে, এরকম আর ক'দ্দিন করব?

আয়ান যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বলে, আর করতে হবেনি রে তানি। লোকগুলা বকা বনছে। আমি লুকিই শুনছি, তারমন বলছে, বরাগুলা চালাক হইছে, গর্তে আর পড়েনি খালি খালি আসি কী হবে।

তানি বলে, আইজ গর্তে বরা পড়েনি?

একটা। ছাড়ি দিছি।

আয়ানের ওপর তানির টান বাড়ে। আয়ান তার বয়সে অন্যান্য ছেলেদের মতো নিষ্ঠুর নয়। বড় দয়ামায়ার শরীর তার।

তানি বলে, দেখব, ভগমান তুমার ভাল করবে।

দূরে ধাম্‌রাচণ্ডীর মন্দিরের ধ্বজা দেখা যাচ্ছিল। তানি সেদিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে প্রণাম করল। মনে মনে বলল, আয়ানের যেন কুনওদিন কুনও বিপদ না হয় মা।

এরপর তিন-তিনটে বর্ষার মেঘ ধাম্‌রার নদীতে ঘড়া উবুড় করে জল ঢালল। থই থই নদী দু'কূল ছাপিয়ে বান বইয়ে দিলে। বসন্তে আক্‌রির জঙ্গল ভরে এল ফুল। শিমুলের আগুন সারা বন রাঙিয়ে দিয়ে গেল। মহুল মাতাল করে তুলল তার ম-ম করা গন্ধে।

চতুর্দশী পার হয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল ধাম্‌রার চরে। তানির সারা অঙ্গে ছল্‌কে উঠল কোটালের জোয়ার।

এ তিন বছরে দু'-দুটো মরণ ঘটে গেছে দুই সংসারের। আয়ানের ঠাকুরদা গত হয়েছে দু'বছর হল। মারা যাবার পর গৌড় সমাজে আয়ানের আর কোনও বন্ধন ছিল না। সে গোরু-মোষ বেচে যে কটা টাকা পেয়েছিল, তার কিছু দিয়ে কিনে ফেলেছিল একটা ডংগা। বাকিটা সাবিত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, মাউসি আমি টাকা রাখব কাই? তুমি রাখি দিয়। দরকার হিলে চাই লিব।

সাবিত্রী বলেছিল, তুমার বাস্তুবাড়ি আর ঘরের কী ব্যবস্থা করল বাবা?

আমি দান করি দিছি মাউসি। ভিটা মানে বন্ধন।

অমন কথা কও কেন বাবা? একদিন তো সংসার করতে হবে। তখন জমি-জাইগার দরকার হবে।

বাতাস ফাটিয়ে হাসল আয়ান। হাসি থামলে বলল, মাউসি তুমি কি ভাবছ, অত বোড়ো আক্‌রির জঙ্গল পড়ি আছে, ভাবনা কী। আর ঘর তো আমার সব্‌বু ঠাঁই গো।

একটু থেমে বলল, মাউসি, তুমার ঘরে যদি আমি রইব বলি তাহিলে কি তুমি আমাকে না বলব?

সাবিত্রী বলল, অমন কথা মুখে আনতে নাই বাবা। তুমি যখন আমাকে মাউসি ডাকছ, তখন তানির সঙ্গে তুমার কুনও তফাত নাই।

নতুন কেনা ডংগায় তানিকে নিয়ে ক'দিন বেরিয়েছিল সেই বরা-মারার জঙ্গলে। জঙ্গলটার বরা-মারা নাম আয়ানই রেখেছিল। ওরা দেখেছিল সে জঙ্গলে শবরদের আসার আর কোনও চিহ্ন নেই। তাছাড়া প্রকৃতির নিয়মে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। পলি ফেলে একদিন সমুদ্র আক্‌রির জঙ্গল থেকে বরা-মরা অব্দি যে বাঁধটা বেঁধে দিয়েছিল, তা আবার স্রোতের তাড়নায় ডুবে গিয়েছিল গভীর জলের তলায়।

ঠাকুরদা মারা যাবার পর মাসখানেক মাত্র আয়ান ছিল জ্ঞাতিদের বাড়ি। নতুন ডংগা আর তানিকে নিয়ে সমুদ্র চষে বেড়িয়েছিল। তারপর অনেক দূরের একটা হাওয়া তার কাছে কী খবর বয়ে আনল কে জানে, সে সেই যে বেরুল ডংগা নিয়ে, বছর ঘুরল তার আর হদিস মিলল না।

তানির চোখের জল ঝরে ঝরে শুকিয়ে গেল। সাবিত্রীর ভাঙা বুকখানা কোনওরকমে আবার জোড়া লাগল। কিন্তু গুণদা বুড়ি এ-শোক সামলাতে পারল না।

রাতে যখন তানি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত, তখন বুড়ি তাকে বুকে জড়িয়ে রাখত। নাতনির শোকে পাঁজরখানা তার ধীরে ধীরে ঝাঁঝরা হয়ে আসছিল।

বুড়ি শেষবেলায় নদীর মোহনার ধারে গিয়ে বসে থাকত আর ছানি-পড়া চোখে চেয়ে থাকত দূর সমুদ্রের দিকে।

যে আসবে বলে তাকে কথা দিয়ে গিয়েছিল, সে তো কই ফিরে আসেনি।

হিজলির বন্দর ভেসে উঠত বুড়ির চোখের ওপর। কত জাহাজের আসা-যাওয়া চলেছে। বাঁশি বাজছে। জাহাজঘাটায় নামানো-উঠানো হচ্ছে মালপত্র। বালিয়াড়ি, জঙ্গল, গ্রাম পিছু হটছে। খেজুরিতে গড়ে উঠছে সাহেবনগর। অজ পাড়াগাঁয়ে সাহেবরা বাস করবে।

মুসলমান বাদশাদের নিমক মহল পত্তনের মতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লবণ তৈরির ব্যবস্থা করেছে। আগে জমিদারকে ইজারা দিত, এখন নিজেরাই দেখাশোনা করছে।

মলঙ্গীরা নুনের খালাড়িতে খাটছে রাতদিন। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল ঢুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে জমিতে, তারপর রোদ্দুরে সে জলকে শুকিয়ে নুনমাটি চেঁছে তোলা হচ্ছে। পাশেই আবার জালপাই-এর জঙ্গল। সে জঙ্গলের জ্বালন আসছে নুন তৈরির জন্য।

গুণদা তখন তানির মতো। জ্বালন ভেঙে আনে জালপাই-এর জঙ্গল থেকে। সে-জ্বালন লাগে নুন তৈরির কাজে। বাল্যে বিধবা। মা, বাপ, ভাই, বোন কেউ নেই মাথার ওপর। খেতে দেবার যেমন কেউ নেই, শাসন করারও নেই কেউ। পেটের জ্বালায় লেগে পড়েছে জ্বালন সংগ্রহের কাজে।

ভরসন্ধ্যায় ভারী একটা বোঝা নিয়ে একদিন আসছিল গুণদা। বোঝাটা মাথা থেকে নামিয়ে দু'দণ্ড জিরুতে গিয়ে আর তুলতে পারল না সেটা। কাছেপিঠে কেউ নেই যে ডেকে বোঝাটা মাথায় তুলে নেয়। অসহায় চোখে যখন চারদিকে তাকাচ্ছে, তখন বাহার ভেড়ির (গাঙের সংলগ্ন বাঁধ) ওপর ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল।

ভেড়ির নীচেই পায়ে চলা একটা মাড়া (পা মাড়িয়ে মাড়িয়ে লোকে যে পথচিহ্ন তৈরি করে)। মাড়াটা চলে গেছে নুনের খালাড়ি অব্দি। সেই মাড়াতেই বোঝা নামিয়ে দাঁড়িয়েছিল গুণদা। মলঙ্গীদের (নুনের খালাড়িতে যারা কাজ করে) যদি কেউ এ-পথে আসে।

ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়াল। নীচে গুণদা, ওপরে সাহেব।

কে তুমি?

গুণদার বাক্য বন্ধ।

এখানে কী করিতেছ?

সাহেবি জিভের জড়ানো কথা হলেও গুণদার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। সে স্পষ্ট কিছু না বলে অর্ধস্ফুট স্বরে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল।

এবার সাহেব ঘোড়া থেকে নেমে ভেড়ির নিচে গুণদার কাছে এল।

ও বুঝিয়াছি। আইস, আমি তুলিয়া দিতেছি। আগে এই ডাইকের (সি-ডাইক) উপর বোঝা উঠাও।

গুণদা আর সাহেব ধরাধরি করে ডালপালার বোঝাটি ভেড়ির উপর তুলল।

সেদিন চতুর্দশীর চাঁদ তড়িঘড়ি উঁকি মারছিল জালপাই-এর জঙ্গলের মাথায়। সাহেবের কী হল, সেই চাঁদের আলোয় কালোশশী গুণদাকে চোখে লেগে গেল।

সাহেব গুণদার মাথায় বোঝাটি তুলে দিয়ে বলল, তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস। পথে ডাকু থাকিতে পারে।

খালাড়ির কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল সাহেব। তখন খালাড়ি শূন্য। গুণদা যথাস্থানে বোঝাটি ফেলে ফিরে দাঁড়াতেই সাহেব বলল, এখন তুমি কোথায় যাইবে?

সাহেবের সহজ ব্যবহারে গুণদা সাহসী হয়ে উঠেছিল। সে বলল, কাউখালি সাহেব।

লাইটহাউসের সন্নিকটে? (সাহেব এক সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে বাংলা শিখেছিল)।

গুণদা মাথা নেড়ে জানাল, সাহেবের অনুমান ঠিক।

এই বলাই গুণদার কাল হল। সাহেব বলল, স্থানটি কিছু দূর আছে বটে। এই রাত্রিকালে তোমাকে একাকিনী ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি আমার ঘোড়াটার উপরে উঠো, আমি তোমার পিছনে বসিয়া চালাইয়া লইয়া যাইব।

গুণদা যতই অনুনয় করে যে সে ঘোড়ায় উঠবে না, সাহেবের জেদ ততই বাড়তে থাকে।

অগত্যা রফা হল। একই ঘোড়ার পিঠে দু'জনের আরোহণ স্থগিত রইল। গুণদা ঘোড়ার উপর বসল আর তার পাশে পাশে লাগাম ধরে ঘোড়ার সঙ্গে চলল সাহেব।

পরের দিন ঘটনাটি প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে পল্লবিত হয়ে সারা বন্দরে ছড়িয়ে পড়ল।

লজ্জায় খালাড়ির কাজে যেতে পারল না গুণদা। যে সদাশয় গৃহস্থটি কিছু কাজের বিনিময়ে গুণদাকে তাঁর বাড়ির এক কোণে একটু আশ্রয় দিয়েছিলেন, তিনি লোকাপবাদের ভয়ে বাড়ি থেকে তাড়ালেন গুণদাকে।

হিউম সাহেবের কানে পৌঁছোল গুণদার অসহায় অবস্থার কথা। সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে খুঁজতে খুঁজতে গুণদাকে আবিষ্কার করল একটা গাছের তলায়।

নতুন গড়ে-ওঠা বন্দর হিজলীতে একটা চার্চ তৈরি করা সম্ভব কিনা তাই খতিয়ে দেখার

জন্য লন্ডন থেকে পাঠানো হয়েছিল হিউম সাহেবকে। হিউমের এখানে কোনও আবাস ছিল না। এক বন্ধুর আস্তানায় উঠেছিল দু'-একমাসের জন্যে। কিন্তু গুণদার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হল হিউমকে।

গাছতলা থেকে বারবণিতা পাড়ার কাছাকাছি এক সস্তা কুঠি ভাড়া করে তাতে তোলা হল গুণদাকে। সাহেব কষ্টিপাথরে তৈরি গুণদার প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল।

ছ'মাস পরে হিউম সাহেব ফিরে গেল লন্ডনে। গুণদাকে কথা দিয়ে গেল, সে অবশ্যই ফিরে আসবে হিজলীতে। কারণ চার্চ তৈরির দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে।

কিন্তু সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে গুণদার চোখের জল শুকোল, হিউম সাহেব আর ফিরে এল না।

তখন গুণদা মা হতে চলেছে। কয়েকমাস পরেই সাবি এল কোলে। এখন উপায়! গাঁ-গঞ্জের লোকে তার নাম রেখেছে হিউম সাহেবের বিবি। সাহেবের উচ্ছিষ্ট বলে কোনও গৃহস্থ সাংসারিক কাজে তাকে ঘরে ঢুকতে দেয় না।

শেষে অভাবে স্বভাব নষ্ট হল। নিজেকে নিঃশেষ করে সাবিত্রীকে বড় করে তুলল। চারদিকে পাপ, প্রলোভন। সাবিত্রীকে অক্ষত রাখা যখন প্রায় দায় হয়ে উঠল, তখন এক নৌকোর মালিক ত্রৈলোক্য সাউর মধ্যস্থতায় এই জনহীন প্রান্তরে হারাধনের সঙ্গে সাবিত্রীর বিয়ে হয়ে গেল।

গুণদা সেই পাপপুরী থেকে চিরদিনের মতো মেয়েকে বিদায় দিয়েছিল। মেয়ের জন্য মনের ভেতর পাষাণভার থাকলেও ওই পতিতাপল্লী থেকে সাবিত্রীকে সরাতে পেরেছে ভেবে বড় শান্তি পেত মনে মনে।

শেষে ভাগ্যের খেলায় মা আর মেয়ের আবার দেখা হয়ে গেল। হারাধনের মৃত্যুর পর মা আর মেয়ের মিলন ঘটিয়ে দিয়ে গেল ত্রৈলোক্য সাউ। গুণদা নতুন একটা জীবনকে দেখতে পেল ধাম্‌রার চরে। অনেক দুঃখের সাগর পেরিয়ে মেয়ে আর নাতনির কাছে মৃত্যুকে তার বড় সুখের বলে মনে হতে লাগল।

কিন্তু একী হল তার! হিউম সাহেবের মতো আয়ানও যে ছেড়ে চলে গেল তার তানিকে।

হিউমকে বড় ভালবাসত গুণদা। সাহেব যে তাকে প্রতারণা করে পালিয়ে যায়নি, এ বিশ্বাস গুণদা তার বুকের মধ্যে আমৃত্যু পুষে রেখেছিল।

মৃত্যুর দিন সন্ধ্যায় বুড়ি তানিকে নিয়ে মোহনার কাছে বসেছিল। হঠাৎ বুড়ি তানির হাতখানা টেনে নিয়ে তার বহুদিনের লুকিয়ে রাখা একটি আংটি পরিয়ে দিয়ে বলল, দিদি, তোর আজা (দাদামশায়) ওউ সোনার আংটিটা আমার আঙুলে পরি দিয়া বলছিল, আমার আংটি যদ্দিন তুমার হাতে রইবে, আমি তদ্দিন তুমার মনের মধ্যে বাঁচিয়া রইব। আইজ সউ (সেই) আংটি তোকে দিয়া গেলি দিদি।

সেই রাতেই ঘুমের মধ্যে বুড়ি মারা গেল। নুলিয়াদের নিয়ে সাবিত্রী মায়ের সৎকার করল। নৌকায় করে মায়ের খানিকটা ভস্ম নিয়ে খানিক দূরে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এল। মনে মনে প্রার্থনা জানিয়ে বলল, হে ভগমান, আমার বাবা যদি অখনও বাঁচিয়া রয়, তাহিলে আমার অভাগী মার ভস্ম যেন তার দেশে গিয়া পৌঁছায়।

৯

পেছনে ধুলোর সাদা মেঘ। সামনে উড়ে আসছে হাজার হাজার হরিণ। তাদের পেছনে ছুটছে বুনো মোষের দল। হরিণ আর মোষ মিলে পাঁচ ক্রোশ ফাঁকামাঠ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পার হয়ে গত পরশু ঢুকেছিল শালভঞ্জিকার জঙ্গলে। কাল সে-জঙ্গল ছেড়ে কট্‌কির দিকদিশাহীন পড়িয়া (ফাঁকা পড়ো জায়গা) পেরিয়ে এসেছিল চাকুন্ডার বনে। আজ সে বনও ছেড়ে দো-শিঙার মাঠের দূর্বা খুরের টানে ছিঁড়েখুঁড়ে ঢুকছে আক্‌রির জঙ্গলে। মাঠের মাঝে আট-দশ হাত চওড়া খালটা যখন একসঙ্গে কয়েকশো হরিণ লাফ দিয়ে ডিঙোচ্ছিল, তখন সত্যিই ওদের মনে হচ্ছিল উড়ন্ত মৃগ। মোষগুলো অবশ্য জল সাঁতরে পেরিয়েছিল।

জন্তুগুলোর এই জঙ্গলে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াবার পেছনে যিনি রয়েছেন তিনি মহারাজ শ্যাম সিংহ দেও। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করে বসন্ত-মৃগয়ায় বেরিয়েছেন সিংহদেও। শ'খানেক অনুচর ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকড়া বাজিয়ে জঙ্গল হাঁকড়াচ্ছে। গত পনেরো বছর মৃগয়া হয়নি রাজগৃহ থেকে, তাই এবার লক্ষণীয় সমারোহ।

যুবক মহারাজ সম্প্রতি কয়েকটি বন্দুক কিনেছেন। সেগুলি নিয়ে জীবন্ত প্রাণীর ওপর চলছে লক্ষ্যভেদ।

আক্‌রির জঙ্গলই মহারাজের রাজ্যের শেষ সীমা। তারপর সমুদ্রের সীমা শুরু। মাঝের জঙ্গলগুলিতে নির্বিচারে মহারাজ পশু নিধন চালালেও, আক্‌রির জঙ্গলে জমিয়ে মৃগয়া করবেন এই অভিলাষ। বাদ্যধ্বনি শুনে ভয় পেয়ে জানোয়ারগুলো পালাতে চাইবে বন ছেড়ে। তারা দৌড়ে যাবে সমুদ্রের সীমারেখা অব্দি। কিন্তু থমকে দাঁড়াবে অগাধ জলরাশি দেখে। মুহূর্তকাল মাত্র। তারপর পেছনে ফেরার পালা। তখনই শুরু হবে আসল মৃগয়া।

ক'দিন ধরে রাজার লোক এসে শিকারিদের জন্য আক্‌রির জঙ্গলে বড় বড় গাছের ওপর মাচান বেঁধে রেখে গেছে। ওদিকে শবর, এদিকে গৌড়, মোহনার দিকে নুলিয়ারা জেনে গেছে সব খবর। তারা তটস্থ হয়ে আছে নতুন রাজা তাদের এলাকায় আসবে বলে।

হাতির ওপর চড়ে সপারিষদ রাজা এসে পৌঁছেছেন দো-শিঙার মাঠে। সারি সারি তাঁবু টাঙানো হয়েছে। পরের দিন এক প্রহর বেলায় মৃগয়া শুরু হবে।

হাতজোড় করে মহারাজ সিংহদেও-এর সামনে এসে দাঁড়াল গৌড় সমাজের লোকেরা। পেছন পেছন গৌড় বালিকারা এসেছে রাজার ভোগের জন্য দধি, ক্ষীর, নবনী ইত্যাদি নিয়ে।

মহারাজ খুশি হলেন। বসতে বললেন গৌড়দের।

গৌড়দের মুখিয়া হলধর ভূমিষ্ঠ একটা প্রণাম করে বলল, রজা মহাশয়, আপনার চরণে নিবেদন অছি।

রাজা সহাস্যে বললেন, বল কী আর্জি, আমি পূরণ করিব।

কালিকে ফাল্গুন দোল-পূর্ণিমা। গো-মাতার পূজা। কালিকের দিন বাদ মৃগয়ার আজ্ঞা হউক।

রাজা হেসে বললেন, তথাস্তু। আর কিছু?

আর কিছু নাই।

চতুর্দশীর দিনে ঘরে ঘরে নতুন হাঁড়ি চড়ছে উনুনে। নতুন কাপড় পরেছে সবাই। সের সের আবির আনা হয়েছে গঞ্জ থেকে। কলসে জল ভরে তাতে আম্রশাখা রাখা হয়েছে।

এটি গো-মা (গো-মাতা) পূর্ণিমা, গৌড়দের প্রধান উৎসব। জীববধ নিষেধ। ক'দিন নিরামিষ আহার। ঘি আর আতপ চালে ভোজনের পরিতৃপ্তি।

পূর্ণিমার দিনে গোয়াল শূন্য করে শত শত গোরু মোষ সারি দিয়ে এগিয়ে যায় দো-শিঙার মাঠে।

নবীন সূর্যের আলো মেখে তারা নামল খালের জলে। বাগালরা (রাখাল) ঘষেমেজে পশুদের গা ধুইয়ে দিল।

সপারিষদ মহারাজ তাঁবুর বাইরে বসে পশুদের স্নানপর্ব দেখছেন।

এর পরের অনুষ্ঠান শুরু হল। গোরু মোষের শিঙে মাখানো হল সরষের তেল। সধবা মেয়েরা বাঁ হাতের থালা থেকে সিঁদুর আর চন্দন নিয়ে পশুগুলোর মাথায় বড় বড় ফোঁটা পরিয়ে দিল।

সপারিষদ দেখছেন মহারাজ অনুষ্ঠানের তিলক পর্ব।

এরপর এগিয়ে এল গৌড়দের আইবুড়ো ছেলেমেয়েরা। তাদের ভেতর বালক-বালিকার সংখ্যাই বেশি। তাদের হাতে বসন্তের বন থেকে তুলে আনা লাল হলুদ ফুলের মালা।

তারা পশুদের কাছে গিয়ে শিঙে গলায় মালা পরিয়ে দিলে।

যুবক মহারাজ সাগ্রহে দেখছিলেন মাল্যদান পর্ব।

হঠাৎ মহারাজের চোখ ভোমরার মতো উড়ে গেল একটা ফুলেভরা শিমূল গাছের দিকে।

আশ্চর্য একটি ফুল ফুটে আছে শিমূল গাছের গায়ে।

পঞ্চদশী মেয়েটি গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গাছের ফাঁকে একটুকরো আলো এসে পড়েছিল মেয়েটির গায়ে। গোলাপি ডুরে একখানা শাড়িতে তার নবীন যৌবনকে কোনওরকমেই বেঁধে রাখা যাচ্ছিল না।

সেই মুহূর্তে মেয়েটিকে সবার চেয়ে আলাদা আর অলৌকিক বলে মনে হচ্ছিল। পাশে তার দাঁড়িয়েছিল একটি মহিষ। তার গলায় দুলছিল ফুলের মালা।

এরপর 'বলি' অনুষ্ঠান শুরু হল। একে 'ক্ষীরি' অনুষ্ঠানও বলে গৌড়রা। অনাল ভোর (উষা) থেকে বড় বড় হাঁড়িতে দুধ আর আতপ চাল ফুটেছে। এখন সেই ক্ষীরি ঠান্ডা হচ্ছে হাওয়ায়।

এবার হাতে হাতে খানিকটা ক্ষীরি নিয়ে গৌড়রা এগিয়ে গেল। প্রতিটি গোরু মহিষের মাথায় সে ক্ষীরি মাখিয়ে দেওয়া হল।

এখন গৌড়দের মুখিয়া বড় বড় কয়েকখানা পরাতে ক্ষীরি ভরে নিয়ে এগিয়ে গেল মহারাজ সিংহদেও-এর দিকে।

মহারাজের চোখের তারা তখন মধুতে আটকে-পড়া ভোমরার মতো পঞ্চদশী মেয়েটির শরীরে নিবদ্ধ।

বয়স্য বলল, মহারাজ, ভোগের ক্ষীরি আসুছি।

সিংহদেও তাকে কনুইয়ের একটা গোঁত্তা মেরে বললেন, মেড়া, উত্তরে কী দেখিছ, দক্ষিণে দেখো।

বয়স্য শিমুল গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, গুটে মহিষ।

মেড়া চক্ষুর মাথা খাইছ, মহিষ নয়, মহিষ নয়, মহিষী।

আজ্ঞা হঁ মহারাজ, দুধবালা মহিষী, কেত্তে বোড়ো পানা (পালান) ঝুলিছে দেখো!

মহারাজ বয়স্যের দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন, গুটে মাকড় (হনুমান)।

ক্ষীরি গ্রহণ করলেন মহারাজ। কিন্তু ক্ষীরির চেয়েও মিষ্টদ্রব্যে তখন তাঁর মন জড়িয়ে পড়েছে।

এরপর শেষ অনুষ্ঠান শুরু হল। আবির উৎসব।

এতক্ষণ কোনও অনুষ্ঠানেই পঞ্চদশী মেয়েটি যোগ দেয়নি। কারণ, গৌড় সমাজের বাইরে তার বাস। এখন আবির খেলা শুরু হতেই আইবুড়ো মেয়েরা শিমুল গাছের তলা থেকে পঞ্চদশী কন্যাটিকে টেনে নিয়ে এল।

শুরু হয়ে গেল খেলা। আকাশ ভুবন রাঙিয়ে ফাগ উড়ল। মহারাজ সদলবলে হোলি খেলায় যোগ দিলেন।

মহারাজ নামে শ্যাম। খেলছেন গৌড় সমাজে হোলি। আসর জমে উঠল মুহূর্তে।

আইবুড়ো মেয়েরা পঞ্চদশীকে মণ্ডল করে ঘিরে রং মাখাচ্ছে। সেও পালটা রং মাখাচ্ছে সমবয়সিদের মুখে মাথায়। ঘন ঘন বাতাসের বুকে তৈরি হচ্ছে আবিরের মেঘ।

খেলতে খেলতে রাজাবাহাদুর এসে গেলেন মেয়েদের সামনে।

মেয়েরা অমনি মহারাজের পায়ে আবির মাখিয়ে প্রণাম করল। সেই পঞ্চদশী মেয়েটি কিন্তু ঘাসের জমিনের ওপর চোখ পেতে দাঁড়িয়ে রইল।

মহারাজ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে হেসে বললেন, মানিনী কৃষ্ণ-ভামিনী। নাম কী তুমার রাধারানি?

খিলখিল করে অন্য মেয়েরা হেসে উঠল।

একজন বলল, তানি।

ঘর কাই তুমার?

অন্যজন বলল, ধাম্‌রার চরে, নদী মুয়ে।

রাজাবাহাদুর চলে যাবার আগে মেয়েদের লক্ষ্য করে কয়েক মুঠি ফাগ ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন। নিজে কিন্তু আইবুড়ো মেয়েদের কপালে কিংবা মাথায় আবির মাখালেন না, সেটা রীতিও নয়।

তাঁবুতে ফিরে এসে বয়স্যকে বললেন, লোক লাগিই দিয়। যউ লাল পদ্মটি ধাম্‌রার চরে ফুটি অছি, যত্ন করি তুলি আনো। এ রত্ন আমি সঙ্গে করি লি যিব।

এবার বয়স্যের ব্যাপারটা বুঝতে আর একটুও দেরি হল না।

রাতে মা-মেয়ে কারু চোখেই ঘুম নেই। একটা কদাকার লোক এসে পানখাওয়া কালো দাঁতে একমুখ হাসি বের করে রাজাবাহাদুরের ইচ্ছার কথা জানিয়ে গেছে। তানিকে আলাদা বাগানবাড়িতে নাকি রাখবেন রাজাবাহাদুর। রাজবাড়ির রানিদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না তার। মৃগয়া করে ফেরার পথেই নাকি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান তানিকে।

লোকটা উঠে যাবার সময় সাবিত্রীকে অনেক টাকার লোভও দেখিয়ে গেছে।

তানি বলল, মা রাজার লোক আইসবার আগু আমি ধাম্‌রার জলে ডুবিয়া মরব।

সাবিত্রী মেয়েকে জড়িয়ে ধরে শুধু ফুঁপিয়ে ওঠে, মুখে কোনও কথা নেই।

এবার দু'জনে চুপ। ভাবছে একই ভাবনা। যদি কোনওরকমে পালাতে পারত। কিন্তু পালাবে কোথায়? সামনে সমুদ্র, পেছনে শিকারি। আজ তাদের অবস্থা আক্‌রির জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা জন্তুদের মতো। পালাবার পথ নেই!

পূর্ণিমার চাঁদ দুধের বাটি যেন উবুড় করে দিয়েছে। সে দুধে ধুয়ে যাচ্ছে আক্‌রির জঙ্গল, দো-শিঙার মাঠ আর ধাম্‌রার চর। চাঁদের সোহাগে সারাটা সমুদ্র আথাল পাথাল।

শেষ রাতের দিকে হু হু করে সমুদ্র থেকে বয়ে আসতে লাগল হাওয়া। এ-সময় প্রতিদিন এমনি হয়। আক্‌রির জঙ্গলের গাছগাছালির ঝুঁটিতে নাড়া দিয়ে বয়ে যায় এই রাত-শেষের বাতাস।

কোথা থেকে একটা জয়ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। গৌড়দের কারু কারু ঘুম ভেঙে গেছে সে শব্দে। তারা কান খাড়া করে শুনছে। এ আওয়াজ তো দো-শিঙার মাঠ থেকে আসছে না। মনে হচ্ছে আক্‌রির জঙ্গলের দক্ষিণে সমুদ্রের তীর ধরে ঢাক বাজাতে বাজাতে কেউ ধাম্‌রার মোহনার দিকে চলেছে।

ভারী শব্দ উঠেছে ঢাকের। সমুদ্রের হু হু বাতাস আক্‌রির জঙ্গল ভেদ করে সে-শব্দ ছড়িয়ে দিচ্ছে চারিদিকে।

গৌড়রা ভাবছে, হয়তো এটা রাজাবাহাদুরের মৃগয়ার কোনওরকম একটা সংকেত।

ক'দিন মৃগয়ার মাঝে পড়ে চঞ্চল ত্রস্ত হয়ে উঠেছে হরিণ আর বুনো মোষগুলো। হঠাৎ ঢাকের শব্দ কানে যেতেই তারা খাড়া হয়ে দাঁড়াল। সামান্য আওয়াজেও ওরা এখন সজাগ।

একবার, দু'বার, তিনবার—আর নয়। সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বন থেকে উড়ে বেরুতে লাগল ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো। তারা ফিরে চলল তাদের পূর্ব বাসস্থানের দিকে।

দো-শিঙার মাঠ মুহূর্তে লন্ডভন্ড হয়ে গেল। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সারি সারি টাঙানো তাঁবুগুলো। রাজার লোকেরা ভোরের ঘুমের মাঝে হাত-পা ভেঙে জখম হল। বুনো মোষের শিঙের গুঁতোয়, হরিণের পায়ের চাটে প্রাণ যায় আর কি।

সিংহদেও আহত হয়েছিলেন। একটা মাদি হরিণের পায়ের চাট লেগেছিল তাঁর পাঁজরে। তাঁকে ধরাধরি করে তোলা হল হাতির পিঠে।

তিনি সেখান থেকে সমানে চেঁচাতে লাগলেন, টোটা ভরি বন্দুক দে, শলামনকে গুলি করি মারব।

মাউসি, অ মাউসি—বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় কে ডাকছে।

ধড়ফড় করে উঠে বসল সাবিত্রী। সঙ্গে সঙ্গে তানিও। অস্পষ্ট ডাকটা তাদের দু'জনের কানে গিয়ে পৌঁছেছে।

ওরা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না একেবারে।

সাবিত্রী চোখ রগড়ে দেখল, আয়ান, হ্যাঁ আয়ানই তো। বুকে বাঁধা রয়েছে মস্ত বড় একখানা জয়ঢাক।

ঢাকটা মাটিতে নামিয়ে আয়ান বলল, আমাকে চিনি পারিলনি মাউসি?

সাবিত্রী আয়ানকে বুকে জড়িয়ে ধরে হা হা করে কেঁদে উঠল। তানি পাথর-প্রতিমার মতো চেয়ে রইল—শব্দ নেই, চোখের পলক পড়ে না।

আয়ান আপন মনে বলে চলল, রজা না হাতি, ও একটা রাক্ষস।

সাবিত্রী তলিয়ে যেতে যেতে যেন একখণ্ড ভাসমান কাঠ হাতের সীমানার মধ্যে পেয়ে গেছে। সে আকুল হয়ে আয়ানের হাতখানা জড়িয়ে ধরে বলল, ওউ রাক্ষসটার হাতনু (হাত থেকে) তুমার তানিকে রক্ষা করো বাবা।

আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। পূর্ণিমার শেষ জোৎস্না গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঢেউয়ের গায়ে। দূরে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আক্‌রির জঙ্গল, ধাম্‌রার চর। অলৌকিক মনে হচ্ছে চরাচর। বরা-মারার দ্বীপের দিকে মুখ করে একখানা ডংগা এগিয়ে চলেছে। হাল ধরে বসে আছে এক রহস্যময় যুবক। ডংগার খোলে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে অঝোরে জল ঝরিয়ে চলেছে একটি পঞ্চদশী মেয়ে। কান্নায় যে এত সুখ সে এই প্রথম তার জীবনে অনুভব করছে।

●

অক্ষয়বটের কড়চা

খেয়াঘাটের কাছাকাছি এসে বন্দি আর একটি অপকর্ম করল। মানুবুড়ির শোননুড়ি চুল ভিজিয়ে ফোগলা গালের খোঁদলে নামল ধারা। বুড়ি যেই টের পেল, অমনি বন্দিসমেত মাথার বস্তাখানা পথের ধারে ধপাস করে ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল, মর মর নিছ্না, আধাপুত্‌রিয়া মর।

কুঁজো বুড়ি চোখে বেঠাওর। হাল্‌টে হাল্‌টে গেল একটা চৌকোর ধারে। চৈতের খরায় চকচক করছে চৌকোটা। আলো জ্বলছে জলে। পাড়ের লোনা মাটিও ঝকঝক করছে। এসব লোনামালের হালই এই। অনেক কসরতের পর চৌকোর জলের নাগাল পেল বুড়ি। কোটালে গাঙের জল তাড়সে ঢুকে পড়ে নাশিখালে। আবার ওই খাল উপচে ভরা কোটালের দৌলতে জল চলকে পড়ে চৌকোগুলোতে। কটকটে নুনে খার জল। কেউ মুখ ছোঁয়ায় না এতে।

বুড়ি মুখে মাথায় মেখে নিতে লাগল ওই লোনা জল। সাপের খোলসের মতো নরম চামড়া লোনা ক্ষার জলের ছোঁয়া লাগামাত্র জ্বলতে লাগল। গজগজ করছে বুড়ি আর জল মাখছে। বেড়ালের মুত মুখে মাথায় মেখে পথ চলার চেয়ে এ জ্বলুনি অনেক ভাল।

বুড়ি উঠল। বাঁ পা-টা হড়কাল কাদায়। এবার বুড়ি পা টেনে শুকনো ভুঁয়ে ঠুকতে ঠুকতে গাল পাড়তে লাগল কুমেদার বউকে। মর মর মাগি, বারভাতারি, ন্যামান্ হউ তোর। মন্দা গেল চষতে, মাগি যায় গস্তে।

মানুবুড়ি এখন নাতি কুমেদার আশ্রিত। কুমেদার বউ সোহাগি তার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দু'বেলা দুটো ভাত দেয় আর কিলিয়ে কাঁঠাল পাকায় উঠতে বসতে। চোখে ছানি পড়েছে, তাই কুমেদার বউ কথায় কথায় খোঁটা দেয় কানি বলে। কলায়ের থালা গেলাস হাত থেকে পড়ল কী খেঁকি কুত্তির মতো ঘাঘিয়ে উঠল সোহাগি। গায়ে হাত তুলতে যা বাকি। আঁচড়ে কামড়ে ঝুনে দিত, পারে না খালি কুমেদার ভয়ে। মানুষটা এমনিতে চুপচাপ কিন্তু বিগড়োলে জানোয়ার। তখন ধোপার পাটে কাপড় আছড়ান আছড়ে ন্যাতা করে দেয় সোহাগিকে। মানুবুড়িকে ভালবাসে তার নাতি। আর বাসবে নাই বা কেন! জ্ঞানচক্ষু মেলে ওই বুড়ির মুখখানাই তো দেখছে। বাপ-মা একদিনে ওলাওঠায় চোখ বুজলে এই বুড়ির দু'চোখের মণি হয়ে বেড়ে উঠেছে সে। কুমেদার ঠাকুদ্দা মানু দলুই দু'-দুটো বে করেছিল। মানুবুড়ি প্রথম পক্ষের। আঁটকুড়ি, বাঁজা। দ্বিতীয় বে থেকে জন্মেছিল কুমেদার বাপ। কিন্তু মানুবুড়ি সৎমা হয়েও কোলেপিঠে করে নাড়াচাড়া করেছে কুমেদার বাপকে। সে কতকালের কথা। কে মনে রাখে সেসব পুরনো দিনকে। কুমেদা বুড়িকে তাড়িয়ে দিতে পারত কিন্তু তা সে করেনি। এটা তার মহত্ব। কাঁড়রা পাড়ার বুড়োবুড়িরা ধন্যি ধন্যি করে কুমেদার দিকে চেয়ে। হয়তো তাদের বুড়োকালে যে লাঞ্ছনা সইতে হয় তার জন্যে কুমেদাকে এই সাধুবাদ। কিন্তু পাড়ার বউ-ঝিয়েদের মুখে অন্য বুলি। তারা পথেঘাটে কুমেদাকে দেখলেই মুখ টিপে হাসে। ফিসফিসিয়ে বলে, বুলা কুত্তা আঁইঠা (এঁটো) পাত চাটতে আসছে রে।

কুমেদার ডাগর বউটাকে এঁটো করেছে কাছারিবাড়ির গোমস্তা। লোকটা শেয়ালের মতো

ধূর্ত্তু। রাতেভিতে কাঁড়রা, বাগ্‌দি পাড়ার ঝাঁপের পাশে ঘুরঘুর করে। বউ-ঝিরা ভরসন্ধেয় যখন ঘাটে গিয়ে হাত-পা হেকলায় তখন মাদি হাঁসের গন্ধে ছোঁক ছোঁক করতে করতে আসে ওই গোমস্তা শেয়ালটা। অন্ধকারে চোখ দুটো ভাঁটার মতো জ্বলে। ঝটাপটি লাগার আগেই বউড়িগুলো পাখা টেনে উড়ে পালায়, না হলে জলের তলায় ডুব দিয়ে গা-গতর ঢাকে।

আধড়া মিনসেটার কী খাই খাই বাই! ডাঁশা, পাকা ফল দেখলেই উড়ে এসে ঠোকরাবে ড্যামরা কাকের মতো। গেরস্ত সজাগ না থাকলেই খাবলা মারবে। পাকা আম-কাঁঠালের গন্ধে নীল মাছির মতো জোয়ান মেয়ের গন্ধ পেলেই উড়ে এসে ভনভন করে বসতে চাইবে লোকটা।

কুমেদাকে ওই লোকটাই কৌশলে নাকে দড়ি পরিয়ে ঘোরাচ্ছে। তাকে কাজেকর্মে চিঠিচাপাটি দিয়ে পাঠাচ্ছে বাবুদের খাস মোকামে। পাঠাচ্ছে দূরে মাটিকাটার কাজে। কখনও বা পাঠিয়ে দিচ্ছে সোঁদরবনে বাবুদের লাটের জমি চষতে। কুমেদাকে বেশ দু'-পয়সা পাইয়ে দিচ্ছে গোমস্তা দীনু সাঁউত কিন্তু তার পাওনাটা পুষিয়ে নিচ্ছে সোহাগির ওপর ভোগদখলের স্বত্ব কায়েম করে।

বুড়ি সব জানে তবু নাতির কাছে চুক্‌লি কাটে না। জলে বাস করে কামোটের সঙ্গে বিবাদ ঠিক না। সোহাগিকে মনে মনে শাপ-শাপান্ত করলেও মুখ ফুটে কিছু বলে না তাই। ঝগড়াঝাটির সময়ে মাথা গরম করেও বেফাঁস বলে ফেলে না কিছু।

রাতে খোঁদা ঘরে মটকা মেরে পড়ে থাকে বুড়ি। মাঝরাতে গুটি গুটি এসে ঝাপটা টানে দীনু সাঁউত। ঢরর্‌ ঢরর্‌ একটা আওয়াজ হয়। বুড়ি সব টের পায়। ঢ্যামনাটা ঢুকেছে। চোখে ভাল দেখে না বুড়ি কিন্তু কান দুটো খাড়া। পাতাপত্তর, খড়কুটোর আওয়াজ ঠিক কানে এসে বাজে। খড়ের ওপর কেঁথা বিছিয়ে শোয় মাগিটা। নড়লে খসখসানির আওয়াজ ওঠে। লোকটা সারাক্ষণ বজর বজর পান চিবোয় আর পচর পচর পিক ফেলে। লম্ফ জ্বালে কুমেদার বউ। জাঁতিতে কুচুর কুচুর সুপারি কাটার শব্দ কানে আসে। লম্ফ আর তেলের জোগান দিয়ে যায় গোমস্তা দীনু সাঁউত।

ভোররাতে উঠে ছড়া দিতে হয় বুড়িকে। লোনামালের সাদা মাটির ওপর ছায়া ছায়া রং জলের ছড়া ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বুড়ি আধকানা হলেও সোহাগির ঘরের ঝোরকার সামনে থমকে দাঁড়ায়। রাতে দোক্তা-পান চিবিয়ে থুক্‌ ফেলেছে ঢ্যামনাটা। ঠিক দেখতে পায় বুড়ি। নুয়ে নুয়ে দেখে আর থু থু করে তার ওপর থুথু ছিটোয়। এ সময় সে গজরাতে থাকে নাতি কুমেদার ওপর। মেড়া, মেড়া। নিজের মাগকে রাখতে জানুনি তো বে করা কেনি! নিছনা, এক্কেবারে নিছনা।

বুড়ি আবার বস্তাটার কাছে যায়। কুমেদার মাগ ছেঁড়া বস্তার ভেতর দজ্জাল বেড়ালটাকে পুরে দিয়েছে। বোরোজ গাঙেব ওপারে তাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে, যাতে গাঙ সাঁতরে, পথ চিনে ওই উৎপাতটা আর ফিরে আসতে না পারে। বুড়ির ঘাড়ে চাপিয়েছে আপদ। না করে উপায় কী। পারাপারের দুটো পয়সা দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে। সেয়ানার চোখ সবদিকে।

মানুবুড়ি বস্তাটা মাথায় তোলে। কই, আগের মতো ধড়ফড়ানি কই। মরে গেল নাকি জীবটা! মোটা একটা কাঠের গড়িয়া ওর গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে ছেঁড়া থলেতে পুরেছে বউটা। মাথার থেকে ফেলে দেবার সময় অক্কা পেয়েছে নাকি? তাই ঠান্ডা, নড়চড় নেই। বুড়ি কথাটা ভাবতে গিয়েই দমে গেল। আহা, জীবটা এমনি করে মারা পড়ল! তাহলে পাপটা কার? চলতে চলতে

বিচার করে বুড়ি। যে ধরেছে, যে কাঠের সঙ্গে বেঁধে বস্তায় পুরেছে, যে তার মাথায় তুলে দিয়ে গাঙ পার করার হুকুম দিয়েছে, সে দোষী না বেড়ালটার আঁচড় খেয়ে, মুতে মাখামাখি হয়ে যে তাকে মাটিতে একবার ফেলে দিয়েছে, সে দোষী?

সমাধান হয় না। নিজের পক্ষে জোর যুক্তি খাড়া করে বউটাকে দোষী সাব্যস্ত করলেও মনের খুঁতখুঁতুনি যায় না। একসময় মনে করে, বেড়ালের জানটা কি অত সহজে যাবার! অমনি বলে, রাম ধাক্কুড়, পড়ি আছে মটকা মারি।

কিন্তু মাথার বোঝা নামিয়ে পরীক্ষা করার সাহস নেই বুড়ির। যদি খুলে দেখে সত্যি মরে কাঠ। তার চেয়ে সন্দেহে থাকা ভাল।

রোদের কী ঝামল (তেজ)। কুক্কুল্যা খরাবেলা (রোদে ভরা খর মধ্যাহ্ন) ঝাঁ ঝাঁ করে চারদিক। জনমনিষ্যি নেই। বুড়ি ঠুকুর ঠুকুর পথ হাঁটে। চাষের জমির হিড় পার হতে গেলেই হোঁচট খায়। তখন বসে বসে আল পার হয়। ডাঁই ডাঁই করে মাথাটা। গরমি কালের রোদে আগুনের ছ্যাঁকা। প্রতি লোমকূপ যেন লোনা জলের সোঁতা। অঙ্গ-উপাঙ্গ গড়িয়ে জলের ধারা নামে মাটিতে। কবে কুমেদা একখানা খদি (মোটা একখণ্ড কাপড়) এনে দিয়েছিল তেরপাখিয়ার হাট থেকে তাই এখনও পরছে বুড়ি। ফুটোয় গিঁট মারতে মারতে কাপড়খানা খাটো হয়ে গেছে। গা ধোয়ার সময় মহা ফাঁপরে পড়তে হয় বুড়িকে। বউ-ঝির ভিড় থাকলে উলঙ্গ হয়ে গা ধোয়া যায় না। আইবুড়ো মেয়েগুলো হাত ধরে টানে। বলে, দিদি গো দিদি, লইজ্জা কী, ট্যানা কি পরে কোড়ের ঝি।

মেয়েগুলো মানুবুড়িকে নিয়ে রঙ্গে মাতে। অমনি আদরের গালাগালি জুড়ে দেয় বুড়ি, কিষ্ট আইল বলি, তখন দেখব বস্তর হরণ কে করে!

কচিকাঁচা আর ডাঁশা মেয়েগুলো হেসে হেসে পাক খায়। তাড়া-খাওয়া হাঁসের মতো জলে ডানা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গরমকালে বুড়ি কাপড় পরেই স্নান সারে। এক প্রান্ত নিম্নাঙ্গে জড়িয়ে অন্য প্রান্ত খড় বা ঘাসে ফেলে শুকিয়ে নেয়। শীতকালটায় যত কষ্ট। তখন পুকুরধারে বসে রোদ পোহায়। আড়ে আড়ে চায় বউ-ঝিদের দিকে। স্পষ্ট করে দেখতে না পেলেও জলের হেকলানি আর চবর্ চবর্ শব্দ শুনে বুঝতে পারে স্নানপর্ব কতদূর সারা হল।

মেয়েরা চলে যেতে যেতে বলে, ও আয়িবুড়ি, গা ধুবনি?

তোরা ধুইচু, তাহিলে হল।

আমরা খাইলে তুমার খাওয়া হল নাকি গো?

আবার খিলখিল হাসি ছড়াতে ছড়াতে কাঁড়রা বাগদি পাড়ার মেয়েগুলো ঘরমুখে পা চালায়।

বুড়ি কান পেতে শোনে কেউ কোথাও নেই। অমনি গাছতলায় কাপড়খানা খুলে রেখে ঘাটে নামে। কোনওদিন আমড়াগাছে ড্যাম্‌রা কাকটা ডেকে উঠলে বুড়ি চমকে ওঠে। তারপর ভাঙা কাঁসির আওয়াজ তুলে বলে, মর মর ড্যাম্‌রা। চোখ কানা হউ তোর।

বুড়ির গালাগাল আর হাতনাড়া উপেক্ষা করে কাকটা মুখ বাড়িয়ে মজা দেখে। আবার ডাকে, কা কা। বুড়ি পুরো জলে নামে না। দু'-হাতের তেলো ভিজিয়ে গায়ে মুখে জল মেখে

নেয়। মাথার চুলে জল ছিটোয়। তাতেই হি হি কাঁপুনি। তর সয় না ওপরে উঠে আসার। উত্তুরে হাওয়া কেটে কেটে চাবুক কষায় হাড় থেকে ঝুলে পড়া মাংসে।

খোলাচাটির ট্যাক ঘুরতেই বোরোজ নদীটা ঝলকে উঠল। কে কবে অজস্র খোলামকুচি ফেলেছে জায়গাটার ওপর। আদিমকালে এই লোনামাল জুড়ে ছিল জঙ্গল। আর ছিল নদীর লোনা জলে প্রসূতি নারীর মতো পড়ে থাকা পিচ্ছল চর। তখন কোনও যাযাবর আদিবাসীর দল এসে আস্তানা গেড়েছিল এখানে। তারা হয়তো সঙ্গে এনেছিল পোড়ামাটির হাঁড়িকুড়ি। তারপর গ্রীষ্ম এলে যখন বর্ষার জমে ওঠা জলের সঞ্চয় ফুরোল তখন তারা হাঁড়িকুড়ি ভেঙে ছড়িয়ে পালাল নদী সাঁতরে অন্য কোথাও। যেখানে জল আছে, প্রাণরক্ষার উপাদানটি আছে।

তাদের চলে যাবার পর সাদা লোনামাটির চর কাঁপিয়ে কতবার বৃষ্টি নেমেছিল। টুকরো টুকরো লাল খোলামকুচি চরের সাদা আস্তরণে লেপটে একটা অদ্ভুত রঙের জগৎ সৃষ্টি করেছিল। এখনও সেই জগৎ অবিকৃত রয়েছে। চলতি পথের হাটুরেরা নাম রেখেছে খোলাচাটি।

বুড়ি নদীর দিকে যত এগোচ্ছে ততই বেড়ালটার জন্যে মনে মনে আপশোস হচ্ছে। একসময় মুখ ফুটে বলেই ফেলল, রইসই একটু খেতি হয় বাপ্। মুখ দিতে গেলি মাগির বাড়া ভাতে। ওকে ত চিননি। তুই কী চিনবুরে, তার ভাতার চিনতে পারলনি, আর তুই তো তুই।

খেয়াঘাটে তখন একটিমাত্র পারার্থী। ভাটায় জল নেমে গেছে নীচে। এ কাদায় পা পড়লেই হাঁটু অব্দি গেড়ে যাবে। তখন কাদায় দু'-হাত রেখে আবার পা তুলে পা ফেলতে হবে। বুড়ির সাধ্য কী কাদা হাঁটকে নৌকোয় ওঠে।

মাঝি উঠে এল বুড়োমানুষ দেখে। বুড়িকে পিঠে লাউ করে নৌকোয় তুলবে। কিন্তু বুড়ি যেতে চাইল না ওপারে। মাঝির হাতটা ধরে কাতর গলায় বলল, মালের পো, ওউ বজ্জাত বিল্লিটাকে একটু ওপার করি দিতে পারব? অমনি অমনি কষ্ট করতে হবেনি বাপ। দুটা পইসা আছে, দুব তুমাকে। সনার চাঁদ আমার।—বুড়ি দাড়ি ধরল মাঝির।

মাঝির নৌকো তখন স্রোতের টানে পাঁকে পোঁতা খোঁটার বাঁধন খোলার জন্য লাফঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে। মাঝি বুড়ির হাত থেকে পোঁটলাটা নিয়ে হাতে ঝুলিয়ে অভ্যস্ত সতর্কতায় নামতে লাগল।

বুড়ি হেঁকে বলল, পইসা লিবনি বাপ্?

মাঝি মুখ না ফিরিয়েই বলল, তুমি রাখি দও আয়, নন্দর হাটে ছলাভাজা কিনি খাব।

ফোগলা বুড়ি নাতির বয়সি মাঝির রসিকতাটা বুঝল না কিন্তু ছেলেটিকে সে মন খুলে আশীর্বাদ করতে লাগল।

আকাশে যত তারা তুমার তত পেরমায়ু হউ ভাই।

হঠাৎ কী মনে এল অমনি বলতে লাগল, আচ্ছা করি মাউগকে যন (যেন) ঠেঙিতে পারো। কুমেদাটার মতন বাসুয়া (স্ত্রৈণ) হয়োনি।

নৌকোটা একসময় ওপারে গিয়ে ঠেকল। বুড়ি চোখের ওপর আঙুল রেখে আবছা দেখতে পাচ্ছে, মাঝি ওপারে উঠছে। বুড়ির বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এই কৃষ্ণের জীবটিকে সে আর কোনওদিন দেখতে পাবে না। বাছার অপঘাতে হয়তো মরণ ঘটল।

বুড়ি ঘামে ভেজা ছেঁড়া কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে ঘরমুখো ফিরল। মুখে সেই নির্বাসিত

বিড়ালের জন্য প্রার্থনা, হে মা মনসা, অবোলা জীবটাকে কষ্ট দিয়োনি মা। তুমার দুটি পায়ে গড় করি মা।

সন্ধ্যা হয় হয় বুড়ি নুয়ে নুয়ে এসে দাঁড়াল বাইরের উঠোনে। ঘাড় তুলতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু তুলতে হল। কুমেদার বউ সোহাগি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে। যেন মানুবুড়ির ফেরার পথ চেয়ে।

সোহাগির বাজখাঁই গলাটা বেজে উঠল, চটের বস্তাটা কাই?

থতমত খেয়ে বুড়ি বলল, সেটা তো গাঙের সেধারে ফেলি আসছি বউ। তুমার কিরা। বিল্লি পড়ামুয়া ত তার ভিতরে বাঁধা আছে। অতক্ষণে মরি ঢোল।

সোহাগি সপ্তমে গলা চড়িয়ে বলল, মরি ঢোল, কে? তুই মাগি না সে বিল্লিটা? পেটভাতুয়াকে দিয়া যদি একটা কাজ হয়। দ্যাখ, তোর মুয়ে মুতবে বলি কাঁথড়ায় (ছাউনিহীন ভাঙা দেয়াল) দাঁড়ি আছে কে।

বুড়ি শেষ বেলার আলোয় অনেক কষ্টে ঘাড় তুলে দেখল, বিল্লিটা ভাঙা কাঁথড়ার ওপর গোঁফ ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চৌকোয় মুখ ধোবার সময় চটের ছেঁড়া বস্তা আর দড়ি কেটে পালিয়ে এসেছে হারামজাদা।

২

তিনটে চিল চক্কর দিচ্ছে মাথার ওপর। তিনটে ছায়া পরস্পরকে তাড়া করে চরের মাঠে ছুটছে। ওই ছায়াগুলোকে ধরার জন্যে কতক্ষণ চেষ্টা করছে ছেলেটা। কাছে এলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সরে গেলে হতাশ হয়ে দেখছে। আবার তাক করছে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। সে তার এই ছোট্ট জীবনকালে গোরু-বাছুর, কুকুর-বেড়াল, ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগি দেখেছে। পাখি দেখেছে গাছের ডালে, আনাচে-কানাচে। কিন্তু এ ধরনের জীব দেখেনি কোনওদিনও। যারা খেলা করছে, কাছে আসছে, কিন্তু হাত দিয়ে ধরলেই ফসকে পালিয়ে যাচ্ছে।

এমনি ছায়ার সঙ্গে খেলা কতক্ষণ চলে? ছেলেটা দৌড়ে, বসে, বড় বড় চোখে চেয়ে চেয়ে একেবারে থকে গেল। আরও কতক্ষণ এমনি খেলা চলত কে জানে, হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় একটা ডাক ভেসে এল, সুধ্না, সুধ্না কাই বো।

সুধ্না অমনি সব ফেলে ছুটল সেদিকে। ঘোড়ার মতো পা ফেলে তাল ঠুকতে ঠুকতে। দু'-পাশে দুটো কনুই মাকুর মতো চালাতে চালাতে।

মাঠের মাঝখানে একটা বড় পুকুর। চৈতের খরায় জল গিয়ে ঠেকেছে তলায়। এখন ওটা আর জল নয়, তলানি। কাঁড়রা আর বাগদি পাড়ার সব ক'টা মেয়ে-মরদ কাচ্চা-বাচ্চা বুড়ো-হাবড়া এখন ওই পুকুরটাকে নিয়ে পড়েছে। বুড়ো-বুড়িরা ঘিরে বসেছে পুকুরের পাড়। হাতে এক একটা খলুই। পুকুরের তলায় যারা জল গুলিয়ে পাঁক ঘেঁটে মাছ তুলছে তারা কোঁচড়ে মাছ ভরে রাখছে। মাঝে মাঝে পাঁক ঘেঁটে উঠে আসছে ওপরে। পাঁকে পা গেড়ে যাচ্ছে, ওঠাতে গেলেই কোঁক কোঁক করে অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে। ওরা কোঁচড়ভরতি মাছ খলুইতে খালাস করে দিয়ে ছুটছে আবার কাদা ঘেঁটে ঘেঁটে। সময় তো কারুর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে না। যে যত তাড়াতাড়ি হাত-পা চালাতে পারবে আখেরে তারই হবে তত লাভ। মাছ ধরা নয় তো, একটা উত্তেজনা। পরস্পরের সঙ্গে নিঃশব্দ এক প্রতিযোগিতা। কে কত খর হাত চালাতে পারে। কার

হাতের কৌশল কত বেশি। পাঁকের ওপর পা টিপে টিপে চলা। পায়ে ধড়ফড় একটা অনুভূতির ছোঁয়া লাগলেই হাত-মুখ ডুবিয়ে ওই জলের জীবটিকে তুলে আনা। এখানে ভাগ্যেরও কিছু খেলা আছে। জলের তলায় অদৃশ্য মাছগুলো কার পায়ে কখন এসে ঠেকবে তা কে জানে!

কেউ একজন ডুবলেই অন্য পাঁচজন তার দিকে চেয়ে থাকবে বড় বড় চোখে। কী রত্ন তার পড়শীটি তুলে আনে পাঁকের আঁধার থেকে, কে জানে!

সুধ্না তার বাপের গলার হাঁকার শুনছে। সে ছুটে এল পুকুরপাড়ে।

বাপ অর্জুনা রাগের গলায় বলল, তোকে খলুইর পাশে বুসতে বলি গেলি আর তুই চরতে গেলু। চিলগুলা ছঁ মারলে একটা মাছ রইবে? বুস, কোথাও যাবুনি। বাগুয়ানে (মার) হাড় ফাটি দিব। চক্কর মারি বুস।

বালক সুধ্না মাতৃহারা। সে এটুকু বয়সে বেশ বুঝে নিয়েছে বাবার তড়পানি মুখে। তাই বাবার কথায় তার ভয় করে না। সে খলুইর ধারে থেবড়ে বসে বলে, হুঁ, বুসছি। তুই যা, মাছ ধর যা।

অর্জুনা আবার পাঁকে সাঁতার কাটতে কাটতে মাছ ধরতে নামে। সুধ্না মুখ বাড়িয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে বাপের দিকে। বাপ মাছ ধরলেই কেন যেন তার মনে হয়, তার বাপের জুড়ি বীর পরিচিত পৃথিবীটার ভেতর কেউ নেই।

একটা বাণমাছ ধরে অর্জুনা সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে মহাবিক্রমে ছুড়ল পাড়ের দিকে। ঘুরতে ঘুরতে সেটা এসে পড়ল ডাঙায়। ঠিক যেন রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে শূন্য থেকে লাফিয়ে পড়ল একটা সাপ। অনেকগুলো হাত মাছটাকে ধরার ভঙ্গিতে আকাশের দিকে উঠেছিল, কিন্তু সেটা সবার হাতের নাগাল এড়িয়ে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

মাছটা কুড়োতে যাচ্ছিল কেউ কেউ কিন্তু ততক্ষণে সুধ্না মাটিতে পা কুটে কুটে চিল চেঁচান চেঁচাচ্ছে। এ মাছে সে কাউকে হাত দিতে দেবে না। এ তার বাপের ধরা মাছ।

সবাই তাকে বোঝাল, সে বাণ মাছটাকে কায়দা করে খলুইর ভেতর ঢোকাতে পারবে না, কিন্তু কে শোনে কার কথা। নেচেকুঁদে, কেঁদেকেটে সবাইকে ভাগাল, তারপর সাপের মতো মাছটার থেকে নিজেকে একটু তফাতে সরিয়ে রেখে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। সাহস হল না গায়ে হাত দেবার। পাশে পড়ে-থাকা একটা কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে মাছটার গায়ে একটুখানি খোঁচা লাগাল। অমনি এঁকেবেঁকে উলটেপালটে মাছটা দেহের আক্ষেপ জানাতে লাগল। ভয় পেয়ে ছিটকে দূরে সরে গেল সুধ্না। মাছের লাফানি থামলে আবার কাছে এসে হাঁটুতে হাত রেখে নুয়ে ভাল করে দেখতে লাগল তাকে। মনে মনে সাহস পেল হঠাৎ। ছটফটানি আছে ঠিক কিন্তু দৌড়োতে পারে না।

কতক্ষণ খোঁচাখুঁচি আর নিরীক্ষণের পরে যখন বাণমাছটা কাহিল হয়ে পড়ল তখন সে তার লেজের দিকটা ধরে ঢুকিয়ে দিলে খলুইয়ের ভেতর।

এবার খলুইটা ধরে শূন্যে তুলে বড় একটা বীরত্ব অনুভব করল সুধ্না।

মাছ ধরা শেষ হয়ে গেল। পুকুরপাড়ে গোল হয়ে বসল সকলে যে যার খলুই নিয়ে। মাঝে বসল গোমস্তা দীনু সাঁউতের শালা কেষ্টহরি বাগ। জমিদারের পুকুর। আধাআধি ভাগ-বখরা মাছের।

এক একজন খলুই উবুড় করে ঝাড়ে। ঝড়্ঝড়্ হড়হড় করে মাছ ছড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। ভাজাতালি, ভাতুয়া, গড়ি, কুন্কুনি, নয়না, সন্নাপুঁটি, চ্যাং, বালকুড়, বাইম, আরও কত কী! বড় ছোট মিলিয়ে দু'-ভাগ। পাশাপাশি দুটো উঁচু ঢিবি। কেষ্টহরির নাটার মতো চোখের দুটো তারা একবার এ ঢিবি একবার ও ঢিবির ওপর ঘুরতে থাকে। তারপর একটার দিকে আঙুল তুলে দেখায়। তখন ওটি রেখে অন্য ঢিবিটা খলুইতে ভরে নিয়ে সরে দাঁড়ায় লোকটি। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন তার জায়গা দখল করে খলুই ঝাড়ে।

এমনি চলছিল কাজ, কিন্তু গোল বাধল একটা জায়গায় এসে।

অর্জুনা খলুই ঝেড়ে যথারীতি তার মাছ দু'-ভাগ করল। বাণমাছটা যেদিকে পড়ল কেষ্টহরির আঙুল অবধারিত সেদিকে গেল। অর্জুনা তার ভাগ খলুইতে ভরে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই কানফাটা চিৎকার উঠল। সুধ্না বাণমাছটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে টেনে তুলল হাতে। প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল সকলে। কেষ্টহরিও হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর সামলে নিয়ে বাঁ হাতে দিলে মোক্ষম এক ঠ্যালা। সুধ্না ছিট্‌কে পড়ল মাটিতে।

কেষ্টহরির মুখে অশ্রাব্য বুলি, শালা বেধুয়া বাচ্চা, কুন্ শালার ব্যাটা রে?

ততক্ষণে সুধ্না উঠে দাঁড়িয়ে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে তাক করছে কেষ্টহরির চকচকে টাকে। তার শিশুমুখ তখন ক্রোধ আর কান্নায় ফেটে পড়েছে। সে কেবল ফুঁসছে।

হইহই করে উঠল সকলে। অর্জুনা ছুটে গিয়ে সুধ্নাকে টেনে নিল পাশে। বাঁ হাতে বাণমাছটা তুলে ছুড়ে দিল কেষ্টহরির দিকে।

অতঃপর এক হাতে খলুই ঝুলিয়ে অন্য হাতে ক্রন্দনরত ছেলের হাত ধরে মাঠের ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল অর্জুনা।

কিছুক্ষণ বড় বড় লাল দুটো চোখে সেদিকে চেয়ে থেকে অস্ফুট ভাষায় কী যেন বিড়বিড় করে বলল কেষ্টহরি। তারপর অকারণে এতটা সময় নষ্ট হয়ে গেল বলে হাঁক দিয়ে উঠল, আয় আয়, ঝাড় ঝাড়। শালা কুত্তাছ্যানার তেজ দেখলু তো!

ভিড়ের ভেতর একজন বলল, হবে নাই কেন! বাপটা কি রকম দ্যাখতে হবে তো। অর্জুনা যন্ তেজে ফাটছে। মাছটা ছুড়ে দিল। বাবুভায়া বলে খাতির নাই।

রোদে চাঁদি ফাটছে তাই সে প্রসঙ্গের ইতে টেনে কেষ্টহরি বলল, ঝটপট ঝাড়। খেলির ভিত্‌রে মাছ তো শুকা হই গেল। অর্জুনা গুটে লোক, আঁসলা গুটে পোক।

ওদিকে মাঠের শেষে বাঁধে উঠেছে অর্জুনা। সে ছেলেকে কোলে তুলে নিতে গেলে বেঁকে দাঁড়িয়ে আপত্তি জানাল সুধ্না। সে ছোট হ'তে পারে কিন্তু তার আত্মসম্মানবোধটা ছোট না। কেন তাকে সবাই মিলে হেনস্তা করল! কেন তার বাবার ধরা হকের মাছ লোকটা জোর করে কেড়ে নিল! এ প্রশ্নের সমাধান না হলে কোনওদিন আর শান্ত হবে না তার মন।

অনেক দূরে পড়ে গেছে পুকুর আর লোকজন। অর্জুনা ছেলের হাত ধরে সেদিকে একবার তাকাল। তারপর সক্ষোভে চেঁচিয়ে উঠল, ন্যামান হবে তোর টাকুয়া, অলাউঠায় মরবু শালা। কচিটকাকে খাইতে দিলুনি মাছটা। শালা খা খা, গু খা।

আগুনে জ্বলছে চারদিক। রোদের কী ঝামল। কালবোশেখীর ঝড় নেই। সারামাঠ ঠা ঠা করছে। পাঁক শুকিয়ে পুকুরের তলাগুলো ফেটে দাদরা। ওপরের মাঠের কোনও কোনও

জায়গায় সেই হাল। ফেটেফুটে চৌচির। মাঠের পথে পা বাড়ালেই গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস নীচ থেকে উঠে আসে। ওদের ধারণা, নাগ বাসুকীর গরল হাওয়াটা উঠে আসছে। খেপে গেছে বাসুকী। পৃথিবী টলে পড়বে।

বুড়ো বদী শামল এসব গল্প করে। কাঁড়রা পাড়ার সবচেয়ে বেশি উমোরের লোক। কত্তাবাবু যখন জঙ্গল কাটিয়ে চরে আবাদ শুরু করেছিল তখন বাবার সঙ্গে মুহাটির বাস তুলে এসেছিল বদী। সেই যে পত্তনি গাড়ল, আর কোথাও যায়নি মুলদা গাঁ ছেড়ে। তখন সবে বালক অবস্থা। তারপর ফুরফুরে গোঁফ উঠল। কুড়ুলের কোপ বসাতে শিখল জঙ্গলের গাছে। হাত ফস্‌কে কবার কুড়ুলের কোপ বসে গিয়েছিল পায়। অনেক শেকড়বাকড়ের বাটা লাগিয়ে মাস কয়েক পরে সেরে উঠেছিল। এখনও বাঁ পায়ের আধখানা কড়ে আঙুল কুড়ুলের সেই মোক্ষম ঘার চিহ্নটা বয়ে বেড়াচ্ছে। বদী শামলের উমোর হল প্রায় পাঁচ কুড়ি। চন্ডীপুকুর যখন প্রতিষ্ঠা হয় তখন বদী শামল মরদ। বছর দুয়েক বিয়ে করেছে। কাছারিবাড়ির লোকে বলে পুকুরটার বয়স হল চার কুড়ি বছর। সেই হিসাবে বদী শামলের বয়সের আন্দাজ পাঁচ কুড়ি।

চাঁদের পরশ দেখে বদী শামল বলে দিতে পারে বৃষ্টি নিকটে কি দূরে। চিতি কাঁকড়ার চলন দেখে বলে দিতে পারে গাঙের বান দেশ ভাসাবে কিনা। পিঁপড়ের চলনে-ফেরনে আবহাওয়ার পরিবর্তনও তার নখদর্পণে।

আজও তার পরামর্শ মেনে ঝড়ের দিনগুলোতে মাছ ধরতে বেরোয় না পাড়ার লোকে।

বদী শামলের ওপর মুলদা গাঁয়ের লোকের অটুট বিশ্বাস।

বদীবুড়ো বলে, বাসুকী সপ্‌পো গোটা পিথ্‌থিমটা (পৃথিবী) মাথায় ধরি রাখছে। মানুষের পাপ যখন ভর কোটালের বানের পারা (মতো) উপচি উঠে তখন বাসুকী মাথা নাড়ি দেয়। অমনি ভাঙি পড়ে ঘরদর। সমুন্দুরের বান ছুটি আইসে। পাপী মানুষগুলা সব্বোস্ব হারায়।

এ তল্লাটে একটি পুকুরেও জল নেই। পাখি দেখা যাচ্ছে না। কুকুর বেড়াল কতক মরেছে, কতক পালিয়েছে। নদীতে জল, জোয়ারে নাশিখালগুলো জলে টইটুম্বুর কিন্তু সবই ক্ষার। মাছ ছাড়া সে জলের এক ফোঁটা মুখে দেয় কার সাধ্যি।

প্রায় আধক্রোশটাক পথ হেঁটে গেলে ওলাচন্ডীর আস্তানা। নন্দের হাটে যেতে গেলে নদীর এপারে পড়বে জায়গাটা। নিত্যপুজো হয় না, তবে ওলাচন্ডীর মাহাত্ম্য মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। হাটযাত্রীরা যাবার পথে আজও ওলাচন্ডীর আস্তানার বটগাছটার ডালে দড়ি বেঁধে মাটির ঢেলা ঝুলিয়ে দেয়।

বর্তমান চকদার বিশ্বেশ্বর ভূঞার মা পুকুর প্রতিষ্ঠা করে বট অশ্বত্থ লাগিয়েছিলেন তার পাড়ে। এখন জায়গাটা অনেকগুলি গাছের ছায়ায় বড় শীতল। দূরের যাত্রীরা গাছের তলায় বিশ্রাম নেয়। পুকুরের জলে শালুকের পাতা ভাসে। সাদা, নীল, লাল ফুল ফোটে। ফরর্ ফরর্ পাখা কাঁপিয়ে শালুক ফুলের ওপর ফড়িং বসে। একবার হাওয়ায় নেচে এসে আবার বসে। এমনি ফিরে ফিরে খেলা চলে সারাবেলা।

এই একটিমাত্র পুকুরে যা কিছু জল আছে। কিন্তু এ বছরের অত্যধিক খরায় জল ঠেকেছে পুকুরের তলায়। সেই জলে জন্মেছে কোটি কোটি ব্যাঙাচি।

তবু এটুকু জলই সারা মুলদা গাঁ-টার প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছে। সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে কাড়রা বাগদি পাড়ার মেয়েরা সার বেঁধে ওই পুকুরে জল আনতে যায়। সকালে অবশ্য যায়

কেউ কেউ। যাদের গা ঢাকবার মতো বস্ত্র আছে তারা যায় দিনের আলোয় পথ চিনে। কিন্তু সারা গায়ের লজ্জা ঢাকবার মতো বস্ত্র ক'জনেরই বা আছে! তাই রাতের কালো কাপড়ে গা ঢেকে মেয়েরা বড় এক একটা হাঁড়ি মাথায় বসিয়ে নিয়ে যায়। চন্ডীপুকুরের পাড়ে হাঁড়ি রেখে ওরা জলে নামে। পুরো কোমর ডোবে না জলে। তাতেই উবু হয়ে বসে গায়ে মাথায় জল মাখে। সারাদিনের পোড়া গা জুড়োয়। কিন্তু শরীর ঠান্ডা হলে হবে কী, কোটি কোটি ব্যাঙাচির উৎপাত। গায়ে মাথায় হামলা করে বেড়ায়। মেয়েরা কতক্ষণ আর নাক-কানের ফুটো বন্ধ করে রাখতে পারে। তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়ে। তারপর হাঁড়িতে জল ভরে নিয়ে আসে। জলের সঙ্গে হাঁড়ির ভেতর ব্যাঙাচি ঢুকে পড়ে সাঁতার কাটতে থাকে। ঘরে এনে সেই ব্যাঙাচি বেছে ফেলতে হিমশিম হতে হয়। বাচ্চাকাচ্চা এক আঁজলা জলের জন্যে হাঁ হাঁ করে। ব্যাঙাচি সুদ্ধু জল ঢকঢক করে গিলে ফেলে।

জোছনা রাত এল। এখন পথঘাট গাছপালা আলোছায়ায় মাখামাখি। মেয়েরা তেমনি চলেছে মাঠ ভেঙে চন্ডীপুকুরে। রাতে দমকা হাওয়া বইলে গায়ের শতচ্ছিন্ন কাপড় উড়তে থাকে। তখন শরীর ঢাকা দায় হয়ে পড়ে। আবার ফিরে আসার সময় ময়লা ভেজা কাপড়গুলো লেপটে থাকে গায়ে। তখন মনে হয় মাটিলেপা উলঙ্গ মূর্তির সারি। এরা ভরপেট খেতে পায় না তবু দেহের কাঠামোগুলোর কী বাহার! বাগদি, কাঁড়রা মেয়ে-পুরুষমাত্রেই সুন্দর। লোনা মাটিতে গায়ের রং জ্বলে-পুড়ে গেছে কিন্তু রক্ত-মাংস-হাড়ে রয়ে গেছে এই আদিম জাতির পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া অদ্ভুত এক কাঠামো।

রাতে চন্ডীপুকুরে যেসব মেয়ে জল আনতে যায় তাদের ভেতর কিছুটা ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। না গিয়ে উপায় নেই তাই যেতে হয়। দল বেঁধে থাকে তাই ভয়টা ভাগ হয়ে গেছে।

ওরা সেদিন জোছনা রাতে পুকুরে নেমে ছেঁড়া কাপড় জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিল ধুয়ে নেবার জন্যে। হঠাৎ পুব পাড়ে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা থেকে অদ্ভুত আওয়াজ তুলে একটা প্যাঁচা থেমে থেমে ডেকে উঠল। প্যাঁচার ডাক ওরা শুনেছে, কিন্তু এ ডাক যেন অন্যরকমের। এ যেন পাখিও নয়, মানুষও নয় পাখি আর মানুষের মাঝামাঝি কোনও জীব।

ভয় পেয়ে ওরা কোনওরকমে জল থেকে কাপড় টেনে গায়ে জড়াতে না জড়াতেই ডাঙায় উঠে এসেছিল। একসঙ্গে জড়ো হয়ে খানিকটা সাহস সঞ্চয়ের জন্যে দাঁড়িয়েছিল ওরা। কান খাড়া করে চেয়েছিল পুব পাড়ের তেঁতুল গাছটার দিকে। শব্দটা কয়েকবার এসেছিল ওদিক থেকেই। কিন্তু আর কোনও শব্দ নেই। সব নিথর, নিশ্চুপ।

কথাটা কাঁড়রা, বাগদি পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। কোনও কোনও মরদ পাহারাদার হয়ে যেতে চেয়েছিল ওদের সঙ্গে, কিন্তু তাদের বউরা মুখঝামটা দিয়ে বলেছে, মুরোদ নেই কাপড় দিবার, পরের বউকে বেবস্তর দেখার শখ।

কোনও পুরুষ আর এগোয়নি এরপর। মেয়েরা প্রাণের দায়ে আবার গেছে দল বেঁধে জল আনতে।

শেষ একদিন ওরা শুনেছে একটানা শেয়ালের ডাক। সে ডাকটাও স্বাভাবিক নয়। মেয়েরা যখন জলে দেহ ডুবিয়ে কাপড় ভাসিয়ে দিয়েছে ধোয়ার জন্যে, ডাকটা উঠেছে ঠিক তখনই। কে যেন হুয়া হুয়া করে হাসছে। আলুথালু হয়ে ওরা এবারও উঠে এসেছে। তারপর আর কোথাও কিছু নেই।

ঘরে ফিরতে ফিরতে ওদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, ওলাচণ্ডী প্যাঁচা আর শেয়ালের মুখ দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন, মহামারী এগিয়ে আসছে মুলদা গাঁয়ে।

বদী শামল যার পায়ের সাড়া পায় তাকেই ডেকে বলে, অলাউঠা আইল বলি, তোরা মার থানে পূজা দে। মা রাগ করছ্‌ন, পূজা দিয়া ঠান্ডা কর।

আয়োজন চলতে থাকে মুলদা গাঁয়ে। খাওয়া-পরা নাই বা জুটল, তা বলে পূজা হবে না ঘটাপটা করে। মা কুপিতা হয়েছেন, তাঁকে উপযুক্ত পূজা দিয়ে তুষ্ট করতে হবে।

দিন নেই রাত নেই কাঁড়রা-বাগদি পাড়ার মেয়ে-মদ্দ খাল গুলিয়ে মাছ ধরে। সে মাছের বড় একটা অংশ বিক্রি করে আসে নন্দের হাটে। কিনে আনে ঠাকুরপূজার দরকারি জিনিসপত্র। নদী পেরিয়ে আরও ক্রোশ তিনেক উত্তরে হাঁটলে একতারপুর গাঁ। সেখানে ক'ঘর বামুনের বাস। তাদের একজনকার হাতে-পায়ে ধরে রাজি করিয়েছে কমেসমে পুজোটা সারবার। তাছাড়া কাঁড়রা-বাগদিদের পুজোয় যজন-যাজন করতে গেলেই ব্রাহ্মণসমাজে পতিত হতে হবে। তাই বামুন ঠাকুর চুপি চুপি গাঁয়ের মুখিয়ার সঙ্গে কথা সেরে নিয়েছেন। ঘুণাক্ষরে একতারপুরে যেন কথাটা ফাঁস হয়ে না পড়ে। তিনি কুটুমবাড়ি যাবার নাম করে পুজোর দিন বেরিয়ে আসবেন বাড়ি থেকে। সাঁঝের মুখোমুখি হাজির হবেন নন্দের হাটে। সেদিন ভাগ্যক্রমে হাটবার নয় তাই রক্ষে। ঠাকুরমশাইকে সেখান থেকে একেবারে নৌকো করে আনতে হবে ওলাচণ্ডীর থানে।

ঠাকুরমশাই আগেই পায়ে হাত দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছেন, কথাটা যেন রাষ্ট্র হয়ে না পড়ে। ঘরে একমাত্র ব্রাহ্মণীকে অতি সংগোপনে কথাটি বলে তাঁর মত নিয়েছেন। প্রথম কথাটা শুনেই ব্রাহ্মণী আকাশ থেকে পড়েছিলেন। ডুকরে কেঁদেও উঠেছিলেন। এমন সহায়সম্বলহীন বামুনের হাতে তুলে দেবার জন্যে বাপ-মায়ের নাম ধরে অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু শেষে সংসারটির দিকে তাকিয়ে রাজি হয়ে গেছেন। ক'ঘর যজমানের আয়ে এত বড় সংসারখানা কী করে চলে! সাত-আটটি সন্তান নিয়ে ব্রাহ্মণী এখন হিমশিম খাচ্ছেন। তিনি শেষটায় ভাল করেই বুঝেছেন, ক্ষুধার কাছে জাতকুল নেই।

শনিবার পুজোর দিন ধার্য হয়েছে। যতদূর সম্ভব সংস্কার করা হয়েছে থান। কোদাল দিয়ে চেঁছে নিকিয়ে দেওয়া হয়েছে উঠোন। কাঁড়রা-বাগদি পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে পুজোর উত্তেজনা। সাত-বছরের কোনও মেয়েরই পরনের কাপড় নেই। তার ওপরে বয়স যাদের তারা ছেঁড়া ট্যানা কোমরে জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। চৌদ্দ-পনেরো বছরের ওপর না হলে ছেলেদের কপালে নেঙটি জোটে না।

সারা গাঁয়ে সমস্যা, তিন ভাগ মেয়ের গা ঢেকে পুজোয় যাবার কাপড় নেই। তারা ঠিক করেছে রাতের অন্ধকারে গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে মায়ের পুজো দেখবে।

ঘটনাটা ঘটল। পুজোর তখন আর পুরো তিনটে দিনও বাকি নেই। মেয়েরা রোজকার মতো সেদিনও সন্ধ্যার পর গেছে চণ্ডী পুকুরে জল আনতে। গা ডুবিয়েছে জলে, এমন সময় ভয়ংকর একটা গর্জন। বাঘ-সিংহ কেউ কোনওদিন চোখে দেখেনি, শুধু গল্প শুনেছে কানে। এই চরের জঙ্গল কাটাবার সময় একটা বাঘ নাকি বদী বুড়োর বাপের গালে থাপ্পড় কষিয়েছিল। তার বেশ কয়েকটা দাঁত পড়ে গিয়েছিল আর চোয়াল গিয়েছিল বেঁকে। সেই বাঘের ডাক শুনলে নাকি পেটের পিলে ফেটে যায়।

এ গর্জনটা চাপা হলে কী হবে, ভারী গম্ভীর একটা হুংকার। মেয়েরা ভয়ে কেঁউ আর কূলে উঠতে পারল না। পরস্পর জড়াজড়ি করে জলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

এমন সময় ঠাস করে একটা হাঁড়ি ভাঙার শব্দ হল। কে যেন কাতরে উঠল, আরে বাবা, গেলিরে গেলিরে।

পরমুহূর্তে হুংকার শোনা গেল, নামি আয় শালা, আইজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

ধুপ করে গাছের একটা ডাল থেকে নীচে যেন কেউ লাফিয়ে পড়ল।

আবার হুংকার, পালিবার চেষ্টা করবু তো লাথে পেট ফাটি দিব।

কেউ যেন কাউকে ধরে নিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। মেয়েদের কাছাকাছি পাড়ের কাছে আসতেই আবছা চাঁদের আলোয় মূর্তিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সবাই এখন পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে। অর্জুনা কেষ্টহরিকে টেনে আনছিল। গোমস্তার শালা সেই টেকো কেষ্টহরির অবস্থা দেখে হাসি চাপা দায়। যে হাঁড়িখানার ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে কেষ্টহরি বাঘের ডাক ডাকছিল, অর্জুনার লাঠির ঘায়ে তা ফেটে যাওয়াতে হাঁড়ির মুখটা হাঁসুলির মতো আটকে গেছে গলায়। তাই নিয়ে কেষ্টহরি হাতজোড় করে বলছে, আমাকে ছাড়ি দে অর্জুনা, আমি আর কুনওদিন এ পুকুরধারে আসবনি। ওলাচণ্ডীর দিব্যি, মা মনসার কিরা।

অর্জুনা বাগদি পাড়ায় ক'দিন ধরেই ওলাচণ্ডীর পুকুরের ঘটনাগুলো শুনছিল। তার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল, এ মানুষ ছাড়া কারু কাজ নয়। তার স্থির বিশ্বাসের একটা কারণও ছিল। মেয়েরা যখন পুকুরের জলে গায়ের কাপড় খুলে নিয়ে ধোবার জন্য ভাসায় ঠিক তখনই আওয়াজটা ওঠে। মেয়েরা ভয় পেয়ে আলুথালু বেশে ওপরে উঠে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়। ওই আধউলঙ্গ শরীরগুলো চোখ দিয়ে গিলবার জন্যে নিশ্চয় কোনও বজ্জাত মানুষ গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে।

তার এই হিসেবের কথা সে কাউকে বলেনি। নিজের ধারণাটা ঠিক কি ভুল, সেই পরীক্ষা করার জন্যেই চলে এসেছে সে। লোকটাকে ধরে গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্না-ধোওয়া পুকুরপাড়ে টেনে আনার আগে পর্যন্ত সে ধারণাই করতে পারেনি যে, এ গোমস্তা দীনু সাঁউতের শালা কেষ্টহরি।

দেখামাত্র হাত ছেড়ে দিয়েছে অর্জুনা, কিন্তু ক্ষোভ যায়নি গলা থেকে, ছিঃ ছিঃ, শেষকালটা তুমি ওউ কাজ করল। ঘিন্নাপিত্তি নেই একটু ! গরিব অছুৎ ঘরের মায়াগুলো তো একেবারে মরা। কুত্তা শিয়াল ছাড়া অদের ছুঁবে কে? তুমি বোড়ো জাইতের মানুষ। শেষকালে সউ দলে ভিড়ল?

কেষ্টহরি পালাতে পারলেই বাঁচে। সে মুখ কাঁচুমাচু করে কী যেন বলল। তার কথাগুলো কিন্তু সে নিজে ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারল না।

পায়ে পায়ে পিছু হটতে হটতে একসময় সরে পড়ল কেষ্টহরি। অর্জুনার মনে হল, চুরি করে পুকুর-ধারে হাঁস ধরতে এসেছিল একটা শেয়াল। হঠাৎ তাড়া খেয়ে লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। অর্জুনা চেঁচিয়ে উঠল, শালা কুত্তা, দগদগা ঘা হবে তোর গায়। পকা পড়বে রে শালা, কিলবিল করবে পকা।

অর্জুনার অভিসম্পাত শুনতে তখন দাঁড়িয়েছিল না কেষ্টহরি। সে মাঠ ভেঙে ছুটছিল

আত্মরক্ষার তাগিদে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, যে রকম একগুঁয়ে ব্যাটা অর্জুনা, ওকে বিশ্বাস নেই একদম। পেছনে হয়তো তাড়া করে আসছে তাকে।

মাটিতে হোঁচট খেয়ে মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছিল সে। হাঁটু ছড়ে কাপড় ফেঁসে সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। তবু বাঁ হাতে আধখোলা কাপড়খানা চেপে ধরে সে ছুটছিল।

কাছারিবাড়ির সীমানায় পৌঁছে ধড়ে প্রাণ এল কেষ্টহরির। সে এতক্ষণ পরে ফিরে তাকাল পেছন দিকে। না, কেউ কোথাও নেই। সে এখন রীতিমতো হাঁফাচ্ছিল। মুখ দিয়ে কথা ভাল করে না বেরুলেও কেষ্টহরি মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগল, আয় শালা আয়, গর্ত খুঁড়ি পুঁতব তোকে, আয়। তোর মুয়ে ধাড়ু, বানচোত বেজন্মা।

গোমস্তা যখন জানতে পারল তার প্রেরিত দূত লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে এসেছে তখন তার সব ক্রোধ গিয়ে পড়ল অর্জুনার ওপর। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু করার নেই। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে পড়বেই। সে যে কাঁড়রা-বাগদি পাড়ার আধউলঙ্গ মেয়েগুলোর ভেতর দু'-একটিকে নির্বাচন করার জন্য কেষ্টহরিকে পাঠিয়ে ছিল তা নিশ্চয় কেউ জানবে না, কিন্তু বেচারা কেষ্টহরিকে রক্ষা করতে হবে এ যাত্রায়। সারারাত প্রায় দু'-চোখ বন্ধ করতে পারল না গোমস্তা দীনু সাঁউত।

কাছারিবাড়ির সামনের দাওয়ায় মাদুর পেতে গোমস্তা খাতা সারছিল। আসলে খাতা সারাটা ছিল ভান। সে আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছিল বাগদি পাড়ার পথের দিকে। কাঁড়রা পাড়াটা আরও একটু দূরে। ওরা তেমন সেয়ানা নয়, একটু গোবেচারা গোছের। কিন্তু ওই বাগদিগুলো রগচটা। একটুতে ওরা খেপে ওঠে। তখন দায় হয় ওদের সামলানো। ওদের সঙ্গে কাঁড়রাদের এক পঙ্‌ক্তি ভোজন না থাকলেও আর সব কাজ ওরা মিলেমিশে করে। ঝগড়াঝাটি হলে বেশিদূর গড়াবার আগেই দু'-পক্ষের মাতব্বররা মাঝে এসে পড়ে মিটিয়ে নেয়। ওরা জানে এক গাঁয়ের মানুষ ওরা। বিবাদ জিইয়ে রাখলে লাভ নেই কারও। তাছাড়া কাঁড়রা পাড়ার বুড়ো বদী শামলকে বাগদি পাড়ার লোকেরাও মান্য করে। এখন বিচার-আচারে সবার মাঝখানে এসে বসতে না পারলেও বিশেষ কোনও বুদ্ধি নেবার দরকার হলেই কাঁড়রা-বাগদি সবাই ছোটে বদী বুড়োর কাছে।

বদী বলে, সব এক। জল অচলদের আবার আলাদা আলাদা জাত কীরে?

গোমস্তা দীনু সাঁউত দু'-পাড়ার ভেতর ছলে-ছুতোয় দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করেছে কয়েকবার, কিন্তু পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। আগুন সামান্য লাগতে না লাগতেই সবাই মিলে নিভিয়ে ফেলেছে সে আগুন। এসব ক্ষেত্রে মধ্যস্থ বদী বুড়ো।

দীনু সাঁউত এবার চোখ বড় বড় করে দেখল, দুটি পাড়ার মাতব্বরসহ কিছু লোক কাছারিবাড়ির দিকে আসছে। যা অনুমান করছিল ঠিক তাই। ভাগ্যিস কর্তাদের কেউ নেই কাছারিতে। অবশ্য দেশের বাড়ি থেকে তাঁরা এই জঙ্গল মহলে আসেন কালেভদ্রে। গোমস্তা দীনু সাঁউতই এখানে সর্বেসর্বা। তবে আসার কথা আছে ছোট কর্তার বড় ছেলের। ভারী তেজি আর একরোখা। তার কানে কথাটা গেলে রক্ষে থাকবে না। কাঁচা রক্ত ইন্ধন পেলেই টগবগ করে ফুটে উঠবে। তখন তাকে বোঝানো দায় হবে।

লোকগুলো কাছাকাছি আসতেই দীনু মুখে হাসি টেনে বলল, আরে আইস, আইস সব। সক্কালবেলা কী মনে করি?

ঘরের ভেতর তাকিয়ে জোর একটা হাঁক পাড়ল, ম্যাদা, তামুক দিয়ে যা। শালা বেধা বাচ্চা, কাই গেলু রে?

পাড়ার লোকগুলি উঠোনে মাটির ওপরই ফুঁ দিয়ে বসে পড়ল। কাছারিবাড়িতে এলে বাগদি-কাঁড়রাদের বসার আসন দেবার নিয়ম নেই। ওরা এমনিভাবে বসতেই অভ্যস্ত। তবে ওদের জন্যে আলাদা দু-প্রস্ত কলকের ব্যবস্থা আছে। কলকেতে তামাক দিয়ে আগুন এগিয়ে দিলেই হল। ওরা ধরিয়ে নিয়ে টান দেবে। পরস্পরের হাতে হাতে ফিরবে কলকে।

কাঁড়রা-বাগদিদের অনেকেই এক ছিলিম তামাকের লোভে কাছারিবাড়িতে নানা অছিলায় হাজির হয়।

তামাক এল। কলকে হাতে হাতে ফিরল, কিন্তু এতগুলো লোকের মুখে ধোঁয়া বুলবুলিয়ে উঠলেও বাক্যি বেরুল না।

ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ করে নিজের হুঁকোটিতে বার কয়েক টান দিয়ে বাঁ হাতে হুঁকোর ফুটোর এঁটো পুঁছে নিয়ে দেয়ালে হুঁকোটা ঠেকিয়ে রাখলে দীনু সাঁউত।

একমুখ হাসি হেসে বলল, তুমরা কেন আসছ আমি কইব মুরব্বি?

সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারা গোমস্তার কাছে কাল রাতের ঘটনাটা কীভাবে তুলবে তাই ভেবে পাচ্ছিল না।

অর্জুনা একটু কড়া মেজাজেই হঠাৎ বলে উঠল, বিচার চাইতে আসছি আমরা। মায়ামানুষের লজ্জাসরমের বিচার।

গোমস্তা দীনু সাঁউত হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল, থাম থাম, বোড়ো বোড়ো কথা রাখ। মুরব্বিরা বুসি আছে, তাদেরকে কথা কইতে দে।

অর্জুনা গোঁজ হয়ে বসে রইল। দীনু গোমস্তা সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিল। আবার বলল, কীগো, ঠিক বলিনি দলুইর পো। দলে বোড়ো রইতে ছোট কথা কইবে কেন?

সবাই মাথা নেড়ে দীনু সাঁউতের কথায় সমর্থন জানাল। কথাটা ন্যায্য।

অর্জুনাকে লক্ষ্য করে এবার দীনু বলল, তোরও কথা কইবার দিন আসিবে অর্জুনা, তবে অক্ষুণি না, আরও মাথা পাকু। চুলের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি পাকু।

একজন মাতব্বর বলল, অখন তুমি বলো কত্তা, কেন তুমার কাছে আসছি?

কেষ্টহরির অন্যায়ের বিচার চাইতে। কি, ঠিক বলিনি?—বলেই হাসতে লাগল দীনু সাঁউত।

ঘোরতর অভিযোগ জানাতে এসে লোকগুলো যেন বেকুব বনে গেছে। এমন হালকা হাসির সঙ্গে গোমস্তা গুরুতর কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে যে কথার গুরুত্ব একেবারে কমে গেল।

অর্জুনা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল, আমি কি কুন কথা কইতে পারবনি? কেষ্টহরির বদমাইশিটা তো আমি ধরছি।

এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল গোমস্তা, তুই কথা কইতে জানু, হঁ রে? কেষ্টহরি তোর চাকর? তার নাম ধরি ডাকছু! এত বড় আস্পদ্দা হইছে তোর!

মাতব্বররা নিজেরাই স্বীকার করল যে কেষ্টহরিবাবু না বলে শুধু কেষ্টহরি বলাটা অর্জুনার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে।

গোমস্তা বলল, এখন তুমরা শুনো আসল কথাটা। দোষ কারু নয়। কেষ্টহরির তো নয়ই।

আচ্ছা, একটা কথা জিগাস করি, তুমাদের বাড়ির মেয়েরা আধউলঙ্গ রইলে তুমাদের কি মান বাড়ে?

সবাই মুখ নিচু করে বসে রইল।

গোমস্তা বলল, কও, চুপ মারি বুসি রইল কেন, জবাব দাও।

কেউ কেউ বলল, না, মান বাড়েনি।

আবার কেউ-বা বলল, উপায় কী গোমস্তাবাবু। পেটে খাইতে পাইনি, ট্যানা পাব কী করি!

গোমস্তা গলায় সবটুকু দরদ উজাড় করে দিয়ে বলল, তাহিলে অমন বে (বিয়ে) করা কেন? বউকে যে ভাতার কাপড় দিতে পারবেনি তার ভাতার হবার শখ কেন? মেয়ে নয়তো মায়ের জাইত, তাদের ছিঁড়া বস্তরে রাখতে লজ্জা করেনি?

সবাই নিজেদের অক্ষমতার কথা ভেবে মাথা নিচু করে রইল।

গোমস্তা এবার ওষুধ ধরেছে দেখে বলল, ক'দিন ধরি আমি কেষ্টহরিকে চণ্ডীপুকুরে ওউজন্য পাঠাইছি। সে কি যাইতে চায়। তাকে জোরজার করি পাঠাইতে হইছে। সত্যি করি ক'জনের কাপড় দরকার সউটা জানতে আমি তাকে পাঠাইছি। তুমাদের ঝি-বউর মান গেলে কি আমার মান রয়?

একটু থেমে আবার বলতে লাগল দীনু সাঁউত, পরশু রাতে পূজা, আইজ নন্দের হাটে খদি আর গামছা কিনি রাখব মাদের জন্যি, তোরা কাল আসি কাছারি থেকে লিয়ে যাবি। সক্কলকে কাপড় দিতে পারবনি। কেউ পাবি গামছা, কেউ পাবি খদি। অর্জুনা তো সব বানচাল করি দিল, নাহিলে কেষ্টহরি ঠিক বলি দিত, কার খদি আর কার গামছার দরকার।

যাবার সময় এমন হৃদয়বান গোমস্তার উদ্দেশে মাটিতে মাথা ঠেকাল অনেকে। অর্জুনা কেবল উঠে চলে গেল নিঃশব্দে। গোমস্তার চোখ তখন আর কারু ওপরেই ছিল না। সে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করতে লাগল অর্জুনার প্রতিটি পদক্ষেপ।

ওরা চলে গেলে দীনু সাঁউত চেঁচিয়ে উঠল, বারি আয় শালা, তোকে দিয়া যদি গটে (একটা) কাজও হয়।

কেষ্টহরি ঘরের ভেতর জানালার আড়ালে বসে ভগ্নীপতির কেরামতি লক্ষ করছিল। সে গোমস্তার ডাকে বাইরে বেরিয়ে এসে গড় হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, এমন নাহিলে জমিদারবাড়ির সব্বেসব্বা। ভগবান কি দিয়া যে তুমার মাথাটা তৈরি করছে আমার বোড়ো জানতে ইচ্ছা করে।

গোমস্তা দীনু সাঁউত আক্ষেপ করে শুধু বলতে লাগল, জাল পাতলি, সব জালটা টুক্‌রা টুক্‌রা করি ছিঁড়ি দিয়া মাছগুলো পালি গেল। একটাও ধরতে পারিলিনি র‍্যা। শালা অর্জুনা, দেখব তুই কত বোড়ো হিঁয়াদোড় (বাহাদুর) হইছু।

রাতের অন্ধকারে পরস্পরকে লুকিয়ে কাছারিতে আসতে লাগল কাঁড়রা-বাগদি পাড়ার লোকেরা। দীনু সাঁউতের পায়ে-হাতে ধরে বলতে লাগল, তার বাড়ির বউ-ঝি প্রায় উলঙ্গ, দয়া করে গোমস্তাবাবু যেন গামছার বদলে তার ভাগে একখানা খদির ব্যবস্থা করে দেন।

কেষ্টহরির সাহায্যে একটা ফর্দ তৈরি হল। মোটামুটি স্থির হল, কাপড় দেওয়া হবে তাকে যার কিছু রূপযৌবন আছে। ওই দানের ধুয়ো ধরে পরবর্তী টোপটা ফেলতে হবে।

অনেক বিবেচনা ও বিতর্কের পর শালা ভগ্নীপতি ফর্দটার চূড়ান্ত রূপ দিল।

দীনু সাঁউত ঘরে ঢোকার আগে বলে গেল, বোড়ো ঘা খাইলি রে কিষ্টা। অমনি অমনি

অতগুলা কাপড় গামছা বারি গেল। খালি মান বাঁচিতে অতগুলো গচ্চা গেল। শুনি রাখ কিষ্টা, যদি সুদে-আসলে এ অপমান আর টাকার একশ গুণ উসুল করতে নাই পারি, তাহলে আমি মুন্ডপাড়া গেরামের কুঞ্জ সাঁউতের ব্যাটাই নয়।

কেষ্টহরি ভগ্নীপতির কথায় ফোড়ন কেটে বলল, টুকু রয়াসয়া খাব দাদা, নাহিলে বদহজম হইতে পারে। আর সোহাগির কথাটাও মনে রাখব। পুন্না (পুরানো) বলি তাকে ছাইগাদায় ফেলি দুবনি।

গোমস্তা দীনু সাঁউত শোবার ঘরে ঢুকে গদগদ গলায় বলল, সোহাগি আমার খাজা কাঁঠাল, অমন সোয়াদ আর কাই (কোথা) পাব রে!

কাঠফাটা গরমের দিন এলেই অর্জুনা যেন কেমন হয়ে যায়। খালি কলসিখানা নিয়ে চন্ডীপুকুরের দিকে বেরিয়ে পড়ে। তেষ্টায় বুক ফেটে গেলেও যে একফোঁটা জল মুখে তুলতে পারেনি, তার কথা মনে পড়ে যায়। ঠা ঠা খরায় নদীর চরের দিকে বার বার চেয়ে দেখে সে। দেখতে দেখতে সুঁদ্রির ছবিটা তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সে চাঁদিফাটা খরায় দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য আগাগোড়া দেখে যায়। কতবার দেখেছে, তবু গরম এলে আবার সে ছবি দেখতে পায়।

ঘরে শুয়ে আছে দু'-বছরের সুধ্না। সুঁদ্রি তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে নাশিখালে মাছ ধরতে গেছে। সঙ্গে আছে তার পোষা কুকুরটা। মাছ ধরে ঘরে ফেরার সময় হঠাৎ কুকুরটা এক কাণ্ড করে বসল। সে তার মনিব সুঁদ্রির ডাকে সাড়া দিল না। একটা আলের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তার চাউনি আর আবভাব দেখে মনে হল, সে যেন সুঁদ্রিকে কোনওদিন চেনেই না।

সুঁদ্রি সমানে পেছন ফিরে তাকে ডাক পাড়তে লাগল, আতু আতু, আয় বাপ্ সনা। রোদে চাঁদি ফাটে, আর দিক্‌দারি করিসনি বাপ্।

কুকুরটি এবার উত্তর দিল। কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক অচেনা একটা স্বর বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে।

এবার সুঁদ্রি এগিয়ে তাকে ধরতে গেল কিন্তু হিতে বিপরীত হল, আল থেকে লাফ দিয়ে নেমে সে দৌড়োতে লাগল নদীর দিকে। সুঁদ্রি নাম ধরে ডাকতে ডাকতে যত ছোটে, কুকুর ছোটে তার চতুর্গুণ জোরে। একসময় নদীর তীরে পৌঁছেই কুকুরটা ভূত দেখার মতো কী যেন দেখতে পেয়ে পেছন ফিরে ডাক দিতে দিতে ছুটল। সে এখন সুঁদ্রির মুখোমুখি। সুঁদ্রি তীব্র রোদ্দুরে হাঁফাচ্ছিল। তার কোঁচড় থেকে ক'টা মাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে গিয়েছিল এদিক ওদিক। সে দুটো হাত বাড়িয়ে দিল তার আদরের কুকুরটার দিকে।

কুকুরটা ছুটে এল ঠিক কিন্তু অচেনা মানুষ উত্যক্ত করলে খেঁকি কুকুর যেমন কামড়ে দেয় তেমনি লাফ দিয়ে উঠে কামড়াল সুঁদ্রির ঠিক কপালে।

যন্ত্রণায় মাটিতে আছড়ে পড়ল সুঁদ্রি। সেই ফাঁকে আগুন-ঢালা রোদ্দুরের ভেতর দিয়ে দিগন্তের দিকে উধাও হয়ে গেল কুকুরটা।

সুঁদ্রি কপালে হাত চেপে একসময় উঠে দাঁড়াল। জ্বলছে কপালটা। কাটা-ছড়া জায়গাটার ওপর ঘামের নুন লেগে বেশ জ্বলুনি শুরু হয়ে গেছে। সে তবু চারদিকে চেয়ে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথাও কেউ নেই, কেবল ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে সারা মাঠ।

দু'-দিন পরের ঘটনা। শোনা গেল, একটা পাগলা কুকুরকে মুন্ডপাড়ার লোকেরা লাঠিপেটা করে মেরেছে। কুকুরটার রং নাকি কুচকুচে কালো।

কথাটা কানে গেল অর্জুনা আর সুঁদ্‌রির। তারা দু'জনে কত খুঁজেছে তাদের কুকুরটাকে। কত লোককে জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু কেউ সন্ধান দিতে পারেনি তার। কথাটা শুনে একটুও সন্দেহ রইল না যে তাদের হতভাগা কুকুরটারই ওই পরিণতি ঘটেছে।

ক'দিন খেতে শুতে পারল না সুঁদ্‌রি। সুধ্‌নার পাশেই শুয়ে থাকত কুকুরটা। তার জায়গাটা খালি পড়ে আছে। ঘুমের মাঝে হাত চলে যায় পাশে। চমকে জেগে উঠে বসে। না, সে নেই। বুকের মাঝে একটা ব্যথা গুমরে ওঠে। খাবার খেতে বসলে তার কথা মনে পড়ে। গলা দিয়ে যেন নামতে চায় না খাবারের দলা।

এমনি ক'দিন কাটার পর হঠাৎ গুম মেরে গেল সুঁদ্‌রিও। ক'জন মেয়ের সঙ্গে খালে মাছ ধরতে গিয়ে সে এক কাণ্ড করে বসল। জলের কাছে গিয়েই অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে উঠল। এ যেন কোনও মেয়ের গলার স্বর নয়। সে অদ্ভুত একটা গলার আওয়াজ তুলে খালের ধার থেকে দৌড়ে পালাতে লাগল।

সঙ্গী মেয়েরা কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়ে খালের জলে নেমে পড়েছিল। তারা খানিক পরে উঠে দেখতে পেল, চরের মাঠ পেরিয়ে দিগন্তের দিকে ছুটে চলেছে সুঁদ্‌রি। তার পরনের কাপড় ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হয়ে গেছে। সেটা সুঁদ্‌রির দৌড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে উড়ছে পত্‌পত্‌ করে।

বদীবুড়ো মেয়েদের মুখে ঘটনাটা শুনে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, খবরদার যাবিনি ও মেয়েটার কাছে! অর কুত্তা অকে পাইছে।

দু'-দিন ধরে রাতের আঁধারে একটি উলঙ্গ মেয়েকে ছুটতে দেখে পথচারীরা আঁতকে উঠেছিল। আবার কেউ কেউ ওকে শেষ দেখেছিল আগুনের হল্‌কাছোটা দুপুরে নদীর দিকে ছুটে গিয়ে জানোয়ারের মতো একটা চিৎকার তুলে পালিয়ে আসতে। ও তখন সবার কাছে একটা আতঙ্ক। একটা অশরীরী আত্মা যেন কয়েকদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে জলহীন পাণ্ডুর লোনামাল জুড়ে। তাকে ধরার জন্যে হন্যে হয়ে ফিরছে অর্জুনা, কিন্তু ধুলোর ঝড়ে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সে।

অবশেষে শান্তি এল। আকাশ মাটি কাঁপিয়ে ছুটল ঝড়ের হাওয়া। তাল তাল কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠল। শুরু হল অঝোর বর্ষা। সে বর্ষণে দেখা গেল, একটি মেয়ে কাদায় পেছল পথের ধারে আকাশমুখী হয়ে পড়ে আছে। তার সারা শরীরে ধুলোকাদা দিয়ে তৈরি একটা আস্তরণ। তার মুখখানা হাঁ করা। আকাশের অঝোর ধারা হুহু করে ঢুকে যাচ্ছে তার তৃষ্ণার্ত মুখের ভেতর।

৩

ধুমধাম করে ওলাচণ্ডীর পুজো শুরু হয়ে গেল। গোমস্তা দীনু সাঁউতের কৃপায় পাড়ার সব মেয়ে বস্ত্র পরে এল দেবীদর্শনে।

পুজোর থানের উঠোনে আসর জাঁকিয়ে বসেছে দীনু সাঁউত। খানিক তফাতে তাকে ঘিরে ভুঁয়ের ওপর বসেছে মাতব্বররা।

দীনুর জয়ধ্বনি এখন মুখে মুখে। মেয়েদের ইজ্জত রেখেছে গোমস্তাবাবু। চণ্ডীপুকুরে কেষ্টহরিকে পাঠানোর উদ্দেশ্য এখন সবার কাছে জলের মতো পরিষ্কার। অর্জুনার সব কাজে ওস্তাদি, সবকিছুতে বাগড়া।

এবার গোমস্তা দীনু সাঁউত একটা নিয়ম চালু করেছে। মেয়েরা মা চণ্ডীর থানে বসে ফল-পাকড় কাটবে। জল এনে নিকিয়ে পোষ্কার-ঝোষ্কার (পরিষ্কার) করবে। মেয়েরা নাকি মায়ের জাত। মায়ের পুজোয় তারা এগিয়ে আসবে বইকী!

তাই করছে মেয়েরা। বুক অব্দি ঘোমটা ঝুলে আছে। পিঠের কাপড় উঠে গেছে। চলাফেরায় দীনু ওদের দেখছে। কেষ্টহরি চারদিক ঘুরেফিরে মিথ্যে হম্বিতম্বি তদারকি চালাচ্ছে ছেলেছোকরাদের ওপর। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছে মায়ের থানের মেয়েগুলোকে।

কাছেপিঠে অর্জুনাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। খালি সুধ্না ঘুরছে কোমরে ফুটো পয়সা গাঁথা ঘুন্‌সি বেঁধে। তিন চাখর একটা ট্যানা জড়িয়ে রেখেছে অঙ্গে।

বহুদূর থেকে একটা ঢাকের বাদ্যি শোনা গেল। মুখ কাত করে কান উঁচিয়ে সে আওয়াজ শুনতে লাগল দীনু সাঁউত। উপস্থিত সকলের কানেও আওয়াজটা পৌঁছেছে।

ক্রমে বাজনার শব্দ জোর হতে হতে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। পুজোর থান ভেঙে তখন সবাই এসে দাঁড়িয়েছে মাঠের ধারে। এদের দু'-চারজন ছাড়া প্রায় কেউই বাজনা বাদ্যি শোনেনি কস্মিনকালে।

একটা লোক ঢাকে কাঠি পিটতে পিটতে এগিয়ে আসছিল, আর তার আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল অর্জুনা।

কাঁড়রা-বাগদি পাড়ার কচিকাঁচা আর জোয়ান ছেলেমেয়েগুলো মন্ত্রমুগ্ধ। বুড়োরা অর্জুনাকে মনে মনে তারিফ করলেও দীনু সাঁউতের ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিল না।

দীনুর পাশে দাঁড়িয়ে কেষ্টহরি ফুঁসছিল। চাপা গলায় বলছিল, শালা।

দীনু বাঁ হাতে একটা খাম্‌চি কেটে কেষ্টহরির মুখ বন্ধ করে দিলে। সবাই যখন মুগ্ধ তখন খামোকা বাগড়া দিতে গেলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

অর্জুনা মায়ের থানে এসে দাঁড়াতেই বাদ্যিকার তার বাদ্যি থামিয়ে দিলে।

দীনু বলে উঠল, সাবাস অর্জুনা, সাবাস। তুই কী করি আমার মনের কথাটা জানি পারলু বল্‌ তো? আইজ দু'-দিন ধরি ভাবছি, একটা বাজনা হিলে পূজাটা জমত। কিন্তু কাকে পাঠাই, সকলে তো কাজেকর্মে ব্যস্ত। হঁ, তুই একটা কাজের কাজ করলু বটে। কেষ্টহরি, ও কেষ্টহরি, কাছারি থিকে ঢাকির সিধার ব্যবস্থাটা করি দে। সেরেস্তা থিকে তার পাওনা বিদেয়ের ব্যবস্থা করি দে। আর অর্জুনা, কাজের কাজ করছে। ওকে সেরেস্তা থিকে একখান তিন হাতি গামছা দেয়া হবে।

সবাই হই হই করে উঠল গোমস্তাবাবুর বদান্যতায়। দীনু সাঁউতের ইচ্ছাটাকেই যেন রূপ দিয়েছে অর্জুনা। সে যা হোক, ঢাকে কাঠি পড়তেই আসর জমে গেল।

গামছা উপহারের কথা শুনে অর্জুনা উৎফুল্লও হল না, আবার প্রত্যাখ্যানও করল না। সে যেন তার কাজটুকু করেই খালাস। তোমরা পয়সা না দাও অর্জুনা দেবে, কুচ পরোয়া নেই।

বড়হাটে একবার নৌকোয় করে গিয়েছিল সে মেলা দেখতে। সেখানে প্রথম সে ঢাকের বাজনা শুনেছিল। ঢাকিদের পাড়াও ছিল বড়হাটের লাগাও গেরামে। পুজোর আয়োজন হতেই

তার মাথায় ঘুরছিল ওই ঢাকবাদ্যির কথাটা। সে কাউকে না জানিয়ে নিজে গিয়ে ডেকে এনেছে ঢাকিকে।

ঢাকের বাদ্যে, আনন্দ কলরবে, পূজা সরগরম হয়ে উঠল।

একদিনের পূজা তিন দিনে শেষ হল। উৎসাহ কি এত সহজে থামে৷ পুরুত ঠাকুর চলে গেলেন কড়ার মাফিক। কিন্তু ঢাকিকে রেখে দেওয়া হল। শেষে দীনু সাঁউতের ব্যবস্থায় বাগদি পাড়ার একজনকে নিত্য-পূজার অধিকার দেওয়া হল। আজ থেকে সে-ই হবে কাঁড়রা-বাগদিদের বামুন। জাত পুরুত যেমনভাবে পূজা করে গেলেন তার দু'-চারটে অং বং মন্ত্র আর ঘণ্টা নাড়া, আরতি করা, ফুল বেলপাতা দেওয়া ইত্যাদি কর্ম করবে সেই বামুন!

ঠিক হল, তাকে হাল ধরা আর মাছ ধরার কাজ করতে দেওয়া হবে না। সকলে মিলে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। জমিদারি সেরেস্তা থেকেও বাৎসরিক কিছু বরাদ্দ থাকবে তার জন্যে।

জয়জয়কার পড়ে গেল গোমস্তাবাবুর। এতদিনে কাঁড়রা-বাগদিদের পুরুতের একটা হিল্লে হল।

কেষ্টহরিকে কাছে ডেকে দীনু বলল, পূজায় আমাকে দিয়া খরচ তো করিলু এক কাঁড়ি, অখন কাজের কাজ কী করলু ক?

সে ব্যবস্থা করি রাখছি দাদা।

কী রকম?

পূজার থানে চৌকা দিল যে, সে তুমার চোখে পড়েনি?

হঁ, হঁ, বেশ আঁটোসাঁটো। বউটা কার র‍্যা?

বটুক বাড়ুইর। তুমি যে হাঁ হই রইল দাদা। বটুক গো বটুক। হারুয়ার ব্যাটা। হারুয়া মরি গেলে বটুক তার সৎকারের জন্যি একটা গাছ তুমার হাতে পায়ে ধরি লই গেল।

হঁ, হঁ, মনে পড়ছে বটে। তবে সে শালাকে পূজার থানে তো দেখিনি। কই, জমির ধান তুলতে তো আইসেনি খামারে?

কেষ্টহরি বলল, তাহিলে কই কী, সে তো মরাটা। কী রোগ ভগবান জানে। পুরা দেড়টা বছর ঘরে পড়ি আছে। খক্‌র খক্‌র কাশি আর হাঁপের টান। বউটা করি-কম্মি দু-এক মুঠোর জোগাড় করে। তাউতে খুঁড়ি খুঁড়ি সংসার চলে।

আহা হা হা হা, তা অতকাল আমার কানে তুলুনি কথাটা! আমি আবার কারও কষ্ট দেখতে পারিনি কেষ্ট।

কেষ্টহরি দীনু সাঁউতের দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসে। ভাবে, দাদার কির্‌পায় বটুকের বউয়ের হিল্লা হই গেল।

কেষ্ট মুখে বলে, দাদা পেসাদ-টেসাদ যন (যেন) পাই।

পূজা হলনি, পেসাদ। শালা, পাপ রাখবি কুথায় রে!

সেই রাতেই সোহাগির কাছে দীনু সাঁউত পাড়ল কথাটা।

বটুকের বউটার বড় কষ্ট, না রে?

সোহাগিও রসিক চূড়ামণি। সে অমনি দীনুর বুকখানাতে হাত ঘষে দিয়ে বলল, আহা, গোমস্তাবাবুর ছাতি ফাটি যায় রে।

দীনু বলল, কেষ্ট খবর দিল তাউ (তাই) তো জানলি। বটুক নাকি বচ্ছরভোর রোগে ধুঁকছে।

সোহাগি অমনি বলল, অতদিন পরে চোখ পড়ল কত্তার? তবু ভাল, মরা মানুষটার একটা হিল্লে হবে। কিন্তু কত্তা, বউটার উপরে আর নজর দিয়োনি। কাঁড়রা পাড়ায় অমন সতীলক্ষ্মী দুটা নেই।

লম্ফের আলোয় দীনু সাঁউতকে জিভ কাটতে দেখা গেল।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ, বটুকের কথা শুনি মনটা খারাপ হই গেল, তাউ (তাই) তোর কাছে পাক্কা খবর পাব বলি কথাটা পাড়লি।

সোহাগি সব বোঝে। সে তার ভাবনার সূত্র ধরে বলল, শাকপাতা সিদ্ধ করি, খুদকুঁড়া জোগাড় করি সারাদিনে একবার আহার জুটে কি জুটেনি। নন্দের হাটে যায়, কয়ালের ধান মাপা হই গেলে বস্তায় ভরী লৌকায় তুলি দেয়। বস্তা পিছু এক মুঠা করি ধান পায়। রাতে ফিরি সউ(সেই) ধান কুটে। পাড়ার সবু লোক ঢেঁকির পাড় শুনতে পায়। কারুকে কুনওদিন তার দুঃখের কথা জানায়নি।

দীনু সাঁউত দয়ার অবতার, তুই বটুকের বউটাকে পাঠিই দিবু, আমি সেরেস্তা থিকে দু'বস্তা ধান দিব। আহা রে।

সোহাগি হাত ধরে বলে, কত্তা, আমার যা হবার হইছে। আরও তিন-চারটা বউড়িকে পট্টি দি তুমার কাছে পাঠাইছি। তুমি সব ক'টার ধম্ম লিছ। মরদগুলোকে কাজের লোভ দেখি কুথা যে পাঠিছ সে মা ওলাচন্ডি জানে।

বাধা দিয়ে দীনু বলে, কেন, তারা টাকাপইসা ট্যাঁকে গুঁজি বছর গেলে ঘরে ফিরি আসেনি? পুরুষ মানুষে কামকাজ করলে তো ভাল থাকে। ইখানে থাকলে তো বউ ঠেংগাইবে। চেঁচানির জ্বালায় কাক-চিল উড়বে।

একটু থেমে আক্ষেপের সুরে দীনু বলে, কারও ভাল করতে নেই রে, কারও ভাল করতে নেই।

সোহাগি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলে, ঠিক আছে। শৈলকে পাঠাইব। দু'বস্তা ধান দিয়ো।

দীনু সাঁউত খুশি হয়ে বলল, তোকে কুনদিন অনাদর করছি সোহাগি? মুণ্ডপাড়ায় কচির মা নয়নতারা যমন, মুলদা গেরামে তুইও আমার তমন। আর সব তো ফালতু। কুলকুচির জল, মুখে পুচুর পুচুর করতে পারি, গিলা যায় না। পচ করি বাহারে ফেলি দিতে হয়।

সোহাগি ও কথার অন্ত টেনে বলল, আজ পানে দক্তা নাই, হাটে যাওয়া হয়নি। সাদা পান মুখে রুচবে?

হেসে দীনু বলে, সোহাগি যা হাতে তুলি দিবে তাউ (তাই) রুচবে।

অনিন্দ্য ভূঞ্যা চক পরিদর্শনে এলেন। নৌকা করে এসে পৌছোলেন একতারপুরের ট্যাঁকে, সেখান থেকে দাঁড়ির মাথায় মোট চাপিয়ে পায়ে হেঁটে আসছিলেন কাছারির দিকে। অনিন্দ্যবাবুর আসার খবর ছিল কিন্তু দিনক্ষণ স্থির ছিল না, তাই কাছারি থেকে লোক পাঠানো হয়নি নদীর ঘাটে।

পথে অর্জুনার সঙ্গে অনিন্দ্যবাবুর দেখা। অনিন্দসুন্দর দাঁড়িয়ে পড়লেন। সুদর্শন, পূর্ণ যুবাপুরুষ।

মুলদা গ্রামে থাকো তুমি?

অর্জুনা নমস্কার করে বলল, আজ্ঞা হঁ।

কোথায় যাচ্ছিলে?

আজ্ঞা, চণ্ডী পুকুরে জুলি দিছি, মাছ গাঁথল কিনা দেখতে চলছি।

কাছারির পথটা আমাকে একটু দেখিয়ে দেবে? এসেছিলাম অনেককাল আগে, মনে নেই।

এতক্ষণে অর্জুনা বুঝতে পারল, এই বাবুটি আর কেউ নয়, কত্তামশায়দের একজন। সে অমনি দাঁড়ির মাথা থেকে মোটটা নিজের মাথায় তুলে নিয়ে বলল, আসুন বাবু, আসুন।

অনিন্দ্যবাবু দাঁড়িকে নৌকোয় ফিরে যেতে বললেন। আবার কবে আসতে হবে তাও বলে দিলেন।

অর্জুনা অনিন্দ্যবাবুর মোট বয়ে যখন কাছারির চৌহদ্দিতে এসে দাঁড়াল তখন লাল সূয্যিটা গাছগাছালির আড়ালে অস্তে নামছিল।

কেষ্টহরি দূর থেকে ঠিক চিনতে পেরেছে। সে পড়ি কি মরি করে ছুটে এল। মাটিতে লুটিয়ে একটা পেন্নাম ঠুকে বলল, আজ্ঞা, খবর পাইনি।

বলতে বলতে সে অর্জুনার মাথা থেকে মোটটা টেনে নিয়ে কাছারি ঘরের দিকে হনহনিয়ে চলতে লাগল। অর্জুনাকে দেখে তার মেজাজটা খিঁচড়ে গিয়েছিল।

অর্জুনা দাঁড়িয়েছিল, অনিন্দ্যবাবু বললেন, তুমি মাছ ধরতে যাচ্ছিলে না?

আজ্ঞা হঁ।

তাহলে তোমার কাজে যাও এখন, কাল সকালের দিকে একবার এসো।

অর্জুনা মাথা নেড়ে জানাল সে আসবে। অনিন্দ্যবাবুর অর্জুনাকে ভাল লেগে গিয়েছিল।

দীনু সাঁউত কাছারির অন্দরমহলে তিনটে ধান-কুটুনির সঙ্গে ফস্টিনস্টি করছিল। কেষ্টহরি হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে কুটুনি তিনটেকে এক ধমক লাগিয়ে বলল, ভাগ।

তারা শুধু চমকাল না, চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকাল দীনুও। সে কেষ্টর অদ্ভুত আচরণ দেখে অবাক হয়ে গেছে।

মেয়ে তিনটে কিছু একটা বিপদের আঁচ পেয়ে উড়ে পালাল পেছনের আমবাগান চিরে।

দীনু বলল, হাঁপাচ্ছু কেনি?

কেষ্টহরি বলল, বাইরে মালিক দাঁড়াই আছে। ছুটি চলো।

দীনুর টনক নড়ল এতক্ষণে। সে রঙ্গশালা ছেড়ে কোমরের কাপড় আঁট করে গুঁজতে গুঁজতে ছুটল বাহির দালানে।

যাবার পথে কাঠের চেয়ারখানা নিজেই তুলে নিয়ে চলল। কাজের লোককে ডাকল না, এমনকী কেষ্টহরিকেও বয়ে নিয়ে যেতে বলল না। এসব ক্ষেত্রে প্রভুর প্রতি আনুগত্য দেখাবার সুযোগ নিজেকেই নিতে হয়।

বাইরে অনিন্দ্যসুন্দর দাঁড়িয়েছিলেন। দীনু সাঁউত তাঁর সামনে চেয়ারখানা রেখেই দু'হাত জোড় করে মাথা নিচু করল।

অনিন্দ্যসুন্দরও প্রতি-নমস্কার করে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কেমন আছেন গোমস্তাবাবু?

আপনাদের কৃপায় সব কুশল। কত্তাবাবুমশায়ের শরীর ভাল তো?

বাবা আর বাইরে বিশেষ বেরুতে পারেন না। তবে এমনিতে শরীর ভালই আছে।

আজ্ঞা আপুনি খবর দেন নাই, তাই লোকজন কারওকে ঘাটে পাঠাইতে পারি নাই।

ও কিছু না, ঠিক আছে সব। হাঁ, ওই যে অর্জুনা বলে লোকটি, ওকে আমি কাল এখানে আসতে বলেছি। ও এলে ওকে অপেক্ষা করতে বলবেন। আমি ওর সঙ্গে একটু বেরুব।

দীনু যেন আকাশ থেকে পড়ল, সে কী কথা ছোটবাবু। আমি থাকতি ওই অর্জুনা ছোঁড়াটার দরকার কী! ব্যাটা বড় বেহেড, ত্যাঁদড়।

অনিন্দ্যসুন্দর বললেন, আমার মালপত্র ওই তো বয়ে নিয়ে এল। কথা বলে বেশ ভালই লাগল। কোনও বেয়াড়াপনা দেখলাম না তো! তবে কথাবার্তা ওর স্পষ্ট। কোনওকিছু না রেখেঢেকে সিধে বলে ফেলে।

ওই তো ওর দোষ। উচাঁ-নিচা বোধবুদ্ধি নাই। বড়র মান্যি জানে নাই।

ঠিক আছে। ও এলে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।

যে আজ্ঞা কত্তা।

পরের দিন সকালেই অর্জুনা কাছারিবাড়ির উঠোনে এসে হাজির।

কেষ্টহরির গা জ্বলে গেল অর্জুনাকে দেখে। অকারণে খেঁকিয়ে উঠল, তুই কি মনে করছু বাবুরা তোর মতন মুটিয়া মজুর? কাক নেই ডাকতে বিছানা ছাড়বে। বুসি র বাহারে।

অর্জুনা খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। কোনও কথার জবাব দিল না। কেষ্টহরি আর দীনু সাঁউতকে দেখলে কেন জানি না তার মনে হয়, পচা গোবরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা গুব্‌রে পোকার মতো।

অনিন্দ্যসুন্দরের ভোরে ওঠারই অভ্যেস। তিনি সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অন্দর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অমনি চোখাচোখি হল অর্জুনার সঙ্গে।

হেসে হাত নেড়ে অনিন্দ্যসুন্দর অপেক্ষা করতে বললেন।

ছুটতে ছুটতে পাশে এসে দাঁড়াল কেষ্টহরি। খবর দিল, গোমস্তাবাবু আসছেন।

দীনু সাঁউত প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে বলল, চলুন ছোট কত্তা। কুথা যেতে চান বলুন।

হেসে বললেন অনিন্দ্যবাবু, না না, এত ব্যস্ত হতে হবে না আপনাকে। আপনি বরং সেরেস্তার কাজকর্ম ঠিক করে রাখুন, আমি এসে দেখব।

আজ্ঞা, তা ঠিক থাকবে। অন্তত কেষ্টহরি যাউক আপনার সঙ্গে। নাহিলে......

কিছু ভাববেন না আপনি। ওই অর্জুনাই যথেষ্ট। বরং কেষ্টহরিকে পাঠিয়ে ওবেলা প্রজা-পাটকদের কাছারিবাড়িতে একটা জমায়েতের ব্যবস্থা করুন। ওদের সঙ্গে আমি কথা বলব।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে দীনু সাঁউত মাথা নেড়ে জানাল, মনিবের কথামতোই কাজ হবে।

অনিন্দ্যসুন্দর বেরিয়ে গেলেন অর্জুনাকে সঙ্গে নিয়ে।

প্রথম কথা বললেন অনিন্দ্যবাবু, আচ্ছা অর্জুন, এখানে এমন কে বুড়ো রয়েছে যার সঙ্গে পুরনো দিনের কথা বলা যায়?

আজ্ঞা, বদী শামল। পাঁচ কুড়ি উমর তার।

একটু চিন্তা করে অনিন্দ্যসুন্দর বললেন, বছর পনেরো আগে যখন এসেছিলাম তখন বদীবুড়োকে দেখেছি। সে সময়ই তার অনেক বয়স হয়েছিল। এখনও বেঁচে?

হাঁ, আজ্ঞা।

এত বয়সের মানুষ, কথাবার্তা বলতে পারবে তো?

বদীবুড়ো অখনও বিচার-আচার করি পারে ছোটবাবু।

বটে! তবে তার কাছেই নিয়ে চলো।

বদী শামল কত্তাবাবুর নাতিকে দেখে ভারী খুশি হয়ে উঠল। তাকে কোথায় বসাবে ভেবে পেল না।

অনিন্দ্যসুন্দর পাশে পড়ে থাকা একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসলেন।

কিচ্ছু ভেবো না। আমি তোমার কাছে কয়েকটা কথা জানতে এসেছি মুরুব্বি।

বদী বলল, হুকুম কুরুন কত্তা।

আচ্ছা, আমাদের জমিদারির পশ্চিম সীমানার কোনও চিহ্ন তোমার জানা আছে?

একটু চুপ করে থেকে বুড়ো বলল, আজ্ঞা, জঙ্গল কাটাইয়ের সময় থিকেই আমাদের জানা আছে। পচ্ছিমের যে মস্তবড় একটা বটগাছ, সেটা থিকে বরাবর উত্তুরে তাকাইলে যে ঝিলটা পড়ে, সেটা ভূএ্যাবাবুদের পচ্ছিম ঠিকানা।

অনিন্দ্যসুন্দর বললেন, তোমার কাছে সঠিক খবর পাব জেনেই এসেছি মুরুব্বি।

পুরনো দিনের অনেক গল্প হল এরপর। একশো বছরের একটি মানুষ অটুট স্মৃতিশক্তি নিয়ে বসে আছে। অনিন্দ্যসুন্দরের বড় ভাল লাগল। বদীবুড়ো বলে চলেছে আর অনিন্দ্য শুনছে। ঠাকুরদার বাবার জঙ্গল কাটাই। তাঁর স্বভাব। বাঘের থাপ্পড় খাওয়া, পেছন থেকে আবার বাঘের ওপর কুড়ুলের কোপ, সব মিলিয়ে সে এক সমারোহ। জঙ্গল কাটাইয়ের পর, পাখিরা উড়ে যাচ্ছে দেখে বড়কত্তা বললেন, ওই পশ্চিমের বটগাছটা কেটো না, অনেক পাখপাখালির আশ্রয় মিলবে। আর ঝিলের জলে, ঝোপঝাড়ে জলচর পাখিরা ভেসে বেড়াবে, বাসা বাঁধবে।

তারপর চন্ডীপুকুর প্রতিষ্ঠার গল্প বলল বদী। মাঠাকরুন সাক্ষাৎ দুগ্‌গা। সেই একটিবার তেনাকে দেখেছিল বদী শামল। চোখে সে ছবি গাঁথা হয়ে আছে। যত উমর বাড়ছে, চোখে বে-ঠাওর হচ্ছে, ততই সে ছবি বুকের মধ্যে খোদাই হয়ে যাচ্ছে।

উঠলেন অনিন্দ্যসুন্দর। তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে মন। বললেন, তুমি অনেক করেছ মুরুব্বি, আমরা তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি।

অনিন্দ্যসুন্দরের কথা থামিয়ে দিয়ে বদী বলল, একী বলছেন ছোটবাবু, আপনাদিগের খেয়ে এখনও বাঁচিবত্তি আছি।

তা হোক, এখন থেকে জমিদারি সেরেস্তা তোমার মাসোহারা জোগাবে। আমি গোমস্তা বাবুকে বলে দিয়ে যাব। তুমি যতকাল বেঁচে থাকবে ততকালই এ গাঁয়ের মঙ্গল।

কপালে হাত ঠেকিয়ে অনিন্দ্যসুন্দরকে নমস্কার করল বদী শামল। অনিন্দ্যসুন্দর মাথা নুইয়ে প্রতিনমস্কার জানালেন। আপনিই মাথা নত হল অনিন্দ্যসুন্দরের। শতবর্ষের প্রতিনিধি। প্রণম্য।

অর্জুনাকে নিয়ে এবার অনিন্দ্যসুন্দর সরজমিনে পশ্চিম সীমানা দেখতে চললেন। তিনি একটি উড়ো চিঠি পেয়েই চলে এসেছেন। সম্ভবত পাশের চকদারের গোমস্তা-টোমস্তা কেউ লিখে থাকবে। দীনু সাঁউত নাকি জমিদারির পশ্চিম সীমানায় একদল ব্যবসায়ীকে ইটভাটার সুযোগ করে দিয়েছে।

হয়তো দীনুর সঙ্গে পাশের চকদারের জমিদারি সেরেস্তার মন কষাকষির ফল, এই উড়ো চিঠি। তবু জমিদারি রাখতে গেলে সব দিকে চোখ রাখা দরকার। সামান্য ধুলোও উড়িয়ে দেখতে হয়।

ঠিক যা জেনে এসেছিলেন তাই। সীমানার ভেতরেই ইঁটভাটার চিহ্ন। পাঁজা পুড়িয়েছে। ইঁটের মাটি কেটে তুলেছে হাজামজা ঝিলের থেকে।

বিকেলে নতুন জমিদারবাবুকে দর্শন করতে এল কাঁড়রা-বাগদি পাড়ার মানুষগুলো। তারা মাছ, মুরগি, শাকসব্জির ভেট এনেছে।

অনিন্দ্যসুন্দর তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনলেন। গোমস্তা দীনু সাঁউতকে সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের সূত্র বলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বললেন।

শেষে বললেন, একদিন আমার পূর্বপুরুষের সঙ্গে তোমাদের বাপ-ঠাকুরদারা জঙ্গল কাটিয়ে এই চকের প্রতিষ্ঠা করেছিল। তোমরা এই চক যতদিন রক্ষা করতে পারবে ততদিন ভোগ করবে। একে রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু তোমাদের।

মাতব্বররা মাথা নাড়ল। কথাটা যে খুবই যুক্তিসঙ্গত— সে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল।

এবার অনিন্দ্যসুন্দর বললেন, কিন্তু তোমাদের জায়গা যে বেদখল হয়ে যাচ্ছে, তা কি জানো?

কী রকম কত্তা?

কেন, তোমরা কি জানো না, তোমাদের চকের পশ্চিম এলাকায় ইঁটের ভাটা করেছে অন্য লোক।

চমকে থ মেরে বসে রইল দীনু সাঁউত।

একজন বলল, কত্তা, আমরা চোখে দেখিছি খালি। কার জাইগা কে দিল, সে সকল খবর তো রাখি নাই।

দীনু বলল, ছোটবাবু, আমার চোখেও পড়িছে। তবে এলাকাটা কার তা তো আমারও জানা নাই। পাশের মান্নাবাবুদেরও হইতি পারে।

অনিন্দ্যসুন্দর বললেন, আপনি আমার বাবার আমল থেকে কাজ করছেন, আপনার পুরো এলাকাটা জানার কথা।

দীনু আমতা আমতা করে চুপ হয়ে গেল।

অনিন্দ্যসুন্দর আবার বললেন, তোমরা এখন থেকে লক্ষ রাখবে। যদি আবার ইঁটভাটার কাজ করতে আসে তাহলে হটিয়ে দিয়ো।

একজন বলল, কিন্তু উরা অনেক লোকজন লিয়ে আসে কত্তা।

সেকী! তোমরা গ্রামে এতগুলো মানুষ আছ, তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না?

অর্জুনা বলল. আপনার হুকুম পেইলে পারব কত্তা।

কেষ্টহরি আর দীনু গোমস্তা আড়চোখে অর্জুনার দিকে কটমট করে তাকাল। ইঁটভাটার মালিকদের সঙ্গে তাদের গোপন যোগাযোগটা ভেস্তে যেতে বসেছে। কেন জানি না, শালা-ভগ্নীপোতের সব রাগটুকু গিয়ে পড়ল অর্জুনার ওপর।

অনিন্দ্যসুন্দর আবার হাঁকলেন, কি, পারবে তো?

সবাই একসুরে বলল, পারব কত্তা।

দীনু বলল, কিন্তু মারপিট হলে কোর্টকাছারি হইতি কতক্ষণ ছোটবাবু?

কোর্টকাছারি আমি সামলাব গোমস্তাবাবু। আমার বাঁশবাগানের গাছ কেটে তোমরা সব্বাই

লাঠি বানাও। দরকার পড়লে লাঠি নিয়ে চড়াও হবে। সে সময় আমাকে একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন গোমস্তাবাবু।

দীনু বলল, ঠিক আছে, আজ্ঞা।

অনিন্দ্যসুন্দর আবার বললেন, আগাছার গোড়া খুঁড়ে একেবারে মূল সমেত উপড়ে না ফেললে সে আবার গজাবে। পাপের, অন্যায়ের শেকড় একেবারে গোড়ায় কোপ বসিয়ে মুড়িয়ে দিতে হয়।

কথাটা অর্জুনার বুকে গেঁথে গেল। তার মনে হল, ছোটবাবুর মুখ দিয়ে মা ওলাচণ্ডী এসব কথা বলে যাচ্ছেন।

জমায়েত ভাঙার আগে অনিন্দ্যসুন্দর ঘোষণা করলেন, এবার এলে তোমরা ওই পাপগুলোকে ঠেঙিয়ে বিদেয় করবে। ওরা চলে গেলে আমি তোমাদের সব খরচ-খরচা দেব, তোমরা ওই ঝিল গভীর করে কাটবে। এ গাঁয়ে তাহলে জলকষ্ট থাকবে না।

সবাই অনিন্দ্যবাবুর কথায় হই হই করে উঠল।

দু'দিন পরে নৌকো এল দেশের বাড়ি থেকে। অনিন্দ্যবাবু আবার মাঠ পেরিয়ে নদীঘাটের দিকে চললেন। দীনু সাঁউত আর কেষ্টহরির সনির্বন্ধ অনুরোধ মিষ্টি হাসিতে পাশে ঠেলে রেখে কেবল অর্জুনাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

নৌকোয় মাল তুলে অনিন্দ্যবাবুকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই অনিন্দ্যবাবু অর্জুনার হাতে দশ টাকার একখানা নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, তোকে আমার খুব ভাল লেগেছে, অন্যায় দেখলেই তেড়ে যাবি, কোনও কিছুতে ডরাবি না, আমি আছি।

অর্জুনা বলল, আশীব্বাদ করুন ছোটবাবু যন (যেন) ভাল-মন্দ ঠিক ঠিক চিনি লিতে পারি।

ঠিক পারবি। ও তোর মন বলে দেবে। মন কখনও ভুল বলে না রে। সিধে জিজ্ঞেস করবি, ঠিক জবাব পেয়ে যাবি।

ডাঙায় উঠে এল অর্জুনা। নৌকো ভাটার টানে ছুটে চলল। বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হবার আগে পর্যন্ত অর্জুনা পলক ফেলতে পারল না।

ফিরে আসতে আসতে তার মনে হল, ঠিক ঠিক একটা মানুষের মতো মানুষ সে এতদিনে দেখতে পেয়েছে।

৪

দীনু সাঁউত রক্তারক্তি, হাঙ্গামা চায়নি, তাই গোপনে খবর দিয়ে ইঁটভাটার লোকদের সাবধান করে দিয়েছে। তারা ইঁট কাটার মরশুমে আর ভূঞ্যাবাবুদের এলাকা মাড়ায়নি।

অর্জুনাকে প্রায়ই দেখা যেত কাঁধে একখানা পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে ইঁটভাটার ধারে-কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একদিন সাঁঝবেলা কেষ্টহরির সঙ্গে ওই ইঁটভাটার কাছেই তার দেখা। অর্জুনাকে ওই অবস্থায় দেখে কেষ্টর গা জ্বলে গেল।

হাঁরে অর্জুনা, তোকে কি ছোটবাবু মুলদা গেরামের চৌকিদার বানাই দিছে?

কথা কোয়োনি কিষ্টবাবু। কুনও লোককে চিনতে আমার বাকি নাই।

ছোটলোকের রবরবা আইজকাল খুব বাড়ছে যে রে।

কেষ্টহরি কথাটা ছুড়ে দিয়েই আর দাঁড়াল না। রগচটা অর্জুনা কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। সে হনহন করে হেঁটে কাছারি লক্ষ্য করে চলে গেল।

অর্জুনা গ্রামের মধ্যে ফিরছিল। গ্রামের বসত এলাকার শেষ প্রান্তে বটুকের ভাঙা কুঁড়ে। সন্ধ্যা তখন ঘন হয়ে নেমেছে। মাঠ থেকে গাঁয়ের পথে উঠেই থমকে দাঁড়াল অর্জুনা। বাঁশঝাড়ের ওপাশে বটুকের ঘর থেকে তার বউয়ের গলা শোনা যাচ্ছিল। মিউ মিউ করে ক্ষীণ গলায় বটুক যেন কিছু বলছিল তাকে।

ছেলেবেলায় অর্জুনা বটুকের সঙ্গে কত খেলাধূলা করেছে। বড় হয়েও খাটাখাটনি করেছে একসঙ্গে। তারপর কী রোগে ধরল বটুককে, শরীর ভাঙতে লাগল। অর্জুনা তাকে নদী পার করে নিয়ে গেছে মনসাপোঁতায়। ঝাড়ফুঁকওলা একটা সিকি নিয়ে খুব ভাল করে ঝেড়ে দিয়েছে। প্রথম প্রথম একটু উপকার মালুম হল, কিন্তু মাস যেতে না যেতেই যে কে সেই। মানুষটা কেমন যেন শুকিয়ে যেতে লাগল। কাজকর্ম আর একদম করতে পারে না। গেঁটে বাঁশের মতো শুকিয়ে পাকিয়ে যেতে লাগল।

মুলদা গাঁয়ে সকলেই দিন আনে দিন খায়। কে কাকে সাহায্য করে! তবু অর্জুনা দু'একবার এগিয়ে গেছে বটুককে সাহায্য করতে, কিন্তু বটুক অন্য ধাতের মানুষ! সে কারও সাহায্য নেবে না। বউটা খাটাখাটনি করে যে দু'এক মুঠো আনে, তাতেই কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে নেয় দুজনে।

অর্জুনা বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনতে লাগল ওদের কথা।

বটুকের ক্ষীণ গলা, তুই যা ভাল বুঝ্ কর, আমি ভাল মনে করছিনি।

বটুকের বউয়ের গলা শোনা গেল, দু'বস্তা ধান দিল গোমস্তাবাবু, খাটি শোধ দিতে হবেনি?

সময় নেই অসময় নেই কাছারি থিকে কিষ্টবাবু আসি তোকে ডাকি লি যায়, আমি ভাল বুঝছিনি শৈল।

চার-পাঁচজন একসঙ্গে খাটাখাটনি করি। গোয়াল সাফ্, ধানকুটা, ঝাঁটচৌকা, বাসন মাজা, জল তুলা। কাজের কি শেষ আছে! কাজ শেষ হিলে কারও কথায় আমি একদণ্ড বুসিনি। সিধা ঘর চলি আসি। তবু তুমি আমাকে সন্দেহ করছ।

বটুক বলে, সোঁদরবনের বাঘ দেখুনি তো, দীনু সাঁউতের থাবা, বাঘের থাবা। একদিন তোর ঘাড় মটকাইবে, কই দিলি। আমি যন তদ্দিন বাঁচি নাই রই।

বটুকের বউ ডুকরে ডুকরে কাঁদে। অর্জুনা সরে যায়। বটুকের কথাগুলো তার মনে এসে বাজে।

তিনটে দিনও পেরুল না, বটুকের কুঁড়ে থেকে শৈলর কান্নার রোল শোনা গেল। পাড়া ভেঙে এল সবাই। আক্ষেপ, কপাল চাপড়ানো, দীর্ঘশ্বাস। শেষে কেষ্টহরির সঙ্গে গোমস্তাবাবুর আগমন।

হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। মড়ার গতি করতে হবে। সদাশয় দীনু সাঁউতের নির্দেশে বাবুদের বাগানের একটা গাছ কাটা হল।

অর্জুনা কুড়ুলের কোপ মারতে যাচ্ছিল গাছে, হাঁ হাঁ করে ছুটে এল দীনু সাঁউত।

তুই সর। লটা, প্যামা চলি আয়। দু'পাশ দিয়ে দু'জন কুড়াল চালা।

অর্জুনা বুঝতে পারল না, কী তার অপরাধ। তাকে নিরস্ত করবার কারণই বা কী! সে গাছতলায় কুড়ুলটা ফেলে রেখে বটুকের কুঁড়ের দিকে পা বাড়াল।

বটুকের বাড়ি তখন গাঁয়ের মুরুব্বি আর মেয়েমানুষে ভরে গেছে। রোগে কুঁকড়ে যাওয়া বটুককে দেখতে আসার সময় পায়নি যারা, তারা সকলেই বটুকের সহ্যশক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বটুকের সব ক'টি গুণ যেন তাদের মুখস্থ। যে গুণ কদাপি ছিল না, তাও আরোপিত হল।

মেয়েরা তখন বটুকের বউয়ের যৌবন নিয়ে হাহাকার করছে। এ ভরা যৌবন শৈল কোথায় রাখবে সে চিন্তায় তারা মুহ্যমান।

অর্জুনা এসে কাটারি নিয়ে বাঁশ কাটল। উঠোনে বসে একমনে মড়ার চালি তৈরি করল। এ সময় বটুকের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কত কথাই না মনে পড়তে লাগল। ছোটবেলা থেকেই বটুক ছিল একটু দুব্‌লা। গোরু চরাতে গিয়ে বাবুদের গাইয়ের গুঁতোয় প্রাণ যায় আর কি! অনেক কষ্টে মারকুটে গাইটার ল্যাজ ধরে টেনে-হিঁচড়ে সে যাত্রায় বটুককে বাঁচিয়েছিল সে।

অন্যদিকে অর্জুনার বউ সুঁদ্‌রি যখন জলাতঙ্ক রোগে নদীর চরে মরে পড়েছিল তখন বটুকই সে খবর এনে দিয়েছিল অর্জুনাকে।

কাজকর্ম চুকে যাবার পরে সম্ভাব্য ঘটনাটি ঘটল।

কেষ্টহরি এক সন্ধ্যায় এসে শৈলের দাওয়ায় বসল। চাটাই পেতে দিল শৈল। আধঘোমটা দিয়ে বাঁশের দরজাটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে।

কেষ্ট বলল, কাজকম্ম তো সব চুকল শৈল, অখন অউ (এই) ভাঙা ঘরে বসি কী করবি? খালি মন খারাপ করি কী হবে?

একটু থেমে আবার বলল, তোদের গোমস্তাবাবুর দয়ার শরীর রে শৈল। দেখলিনি, নিজের খচ্চায় কাঁড়্‌রা-বাগদি পাড়ার সব লোক ডাকি খাওয়াইল। তোর কপালে অত বোড় একটা মানুষ কী করি যে জুটল তা ভাবি পাইনি। এসব বরাত রে বরাত।

গুনগুন করে শৈল বলল, এ সকল আপনাদের কির্‌পা।

কেষ্ট বলল, আমার একটা সদ্‌বুদ্ধি শুনবি শৈল?

অনুচ্চে শৈল বলল, বলুন।

যে দিনকাল পড়ছে, একটা যৌবনবতী মেয়েছেলের একলা একলা ওউ (এই) ঘরে থাকা ঠিক না। এই শালা অর্জুন, প্যামা, ঝাড়ু কারওকে বিশ্বাস নাই। সুযোগ পাইলে ঝাঁপাইয়া পড়বে। তার চেয়ে তুই ভিটা ছাড়ি গোমস্তাবাবুর আশ্রয়ে যা। খাওয়া-পরার ভাবনা রইবেনি। অনেক ভালবাসা পাবি। নাম মাত্তর কাজ।

শৈল শুধু বলল, মানুষটা সবে চলি গেল। তার ঘর, দরজা, ঝোরকা সব অখনও আছে। তার বিছানা পড়ি আছে। ক'দিন আমাকে সময় দও। আমি ভাবি কইব।

কেষ্টহরি অমনি বলল, না না, তাড়া কিছু নাই। তোর পিছুটান যা ছিল তাও নাই। তুই ঝাড়া হাত-পা। ভাবি দেখ।

এবার টোপ ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কেষ্টহরি। চলে যেতে যেতে বার তিনেক তাকাল পেছন ফিরে।

অর্জুনা সারাদিনে একবার করে ভূঞ্যাবাবুদের চকের চৌহদ্দিটা ঘুরে আসে। অনিন্দ্যবাবুর চলে যাবার পর থেকেই এই হয়েছে তার কাজ। কেউ তাকে ভার দিয়ে যায়নি। কেবল সেদিন

কথাপ্রসঙ্গে সবার সামনে অনিন্দ্যবাবু বলেছিলেন, এ চক আমার পূর্বপুরুষ জঙ্গল কাটিয়ে পত্তন করেছিল, কিন্তু হাতেনাতে কাজটা করেছিল তোমাদের বাপঠাকুরদা। তাই এ চকে তোমাদের যে অধিকার আমাদেরও তাই। তোমরা ভাল করে খেয়ে-পরে বেঁচেবর্তে থাকলে আমরাও দু'মুঠো পাব।

অনিন্দ্যবাবু যখন কথা বলছিলেন তখন অর্জুনা তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। লোকটির মুখে ছলচাতুরীর চিহ্নমাত্র নেই। দীনু সাঁউত কেষ্টহরির সঙ্গে কত তফাত মানুষটার!

অর্জুনা সেদিন চকের পশ্চিম সীমানা পাক দিয়ে মাঠের পথে বসত এলাকায় ফিরছিল। কাঁধে পাকা বাঁশের লাঠি। কোমরের দড়িতে হাঁসুয়া। ডান হাতে ছাগলের জন্যে কাটা কচি পাতায় ছাওয়া কয়েকটা ডাল।

বন্যার ঘোলা জলের ঘূর্ণির মতো সন্ধ্যার অন্ধকার তখন সারা মাঠ ভরে তুলেছে। চেনা মাড়ায় পা ফেলে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আসছিল অর্জুনা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। একটা কাঁক্ (বক জাতীয় পাখি) কাছারির ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছে কাঁ কাঁ করছে। কোনও একটা সাপ নিশ্চয়ই অন্ধকারে নিঃশব্দে গাছে উঠে ধরেছে তাকে।

শব্দটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। অর্জুনা কাছারির পেছন দিয়েই উঠে এল। এবার সে সোজা গিয়ে উঠবে গাঁয়ের রাস্তায়।

কাছারিবাড়ির গোয়ালের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কাদের যেন ফিসফিসানি আর উত্তেজনার শব্দ সে শুনতে পেল।

সে পা টিপে টিপে গোয়ালের পাশে এসে দাঁড়াল। অর্জুনা শুনেছে, একবার নাকি একটা মুচির কারসাজিতে অনেকগুলো গোরু মারা পড়েছিল। সে সাঁতার কেটে রাতে নদী পেরিয়ে আসত। গোয়ালে ঢুকে গোরুকে বিষফল বাটা খাবারের সঙ্গে খাইয়ে দিয়ে যেত। তাই খেয়ে পেট ফুলে মরত গোরুগুলো। মরা গোরু ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসত গাঁয়ের লোক। অমনি মুচি তার যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে যেত চামড়া ছাড়াতে।

ধরা পড়ে নাকি প্রচণ্ড মার খেয়েছিল লোকটা। সব স্বীকারও করেছিল। শেষে নদীতে চোবানো হয়েছিল তাকে। গোরুর মতো চার পায়ে মাঠে ঘোরানোও হয়েছিল। শেষে ধুকপুকিটুকু রেখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

নির্ঘাত তেমনি কোনও গোরুচোর ঢুকেছে গোয়ালে। সব ফেলে হাঁসুয়াটা বাগিয়ে ধরে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল অর্জুনা।

সামান্য সময় যেতে না যেতেই তার মনে হল, চাপা গলায় কথা কইছে দীনু সাঁউত।

গলার স্বর চাপা কিন্তু উত্তেজনায় ভরা। কে যেন বোঝাচ্ছে কাকে। একটা মেয়ের ফোঁপানি শোনা গেল। সে বলছে, ছাড়ি দও, আমি রাঁড় হইছি, আমার সব্বনাশ হি যাবে। বাবু গো, তোমার দুটা পায়ে পড়ছি, আমাকে ছাড়ি দও। মরদটা আমার সাতটা দিনও চোখ বুজেনি গোমস্তাবাবু। তুমি আমার ধম্মের বাপ গো।

এবার হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল শৈল। দীনু সাঁউত কী যেন বলল, শোনা গেল না।

শৈলর কাতর গলা আর একবার বেজে উঠল, আমি গাঁ ছাড়ি দুটা চোখ যউদিকে যায় চলি যাব। তুমি আমার ঘরবাড়ি লও, আমি আর আইসবনি। আমাকে রক্ষা করো বাবু।

দীনু সাঁউত নামে দীনবন্ধু কিন্তু স্বভাবে আস্ত একটি দানব।

অর্জুনা এবার শুধু শুনতে পেল মেয়েলি গলার একটা আর্ত চাপা আওয়াজ। ঠিক কয়েক মুহূর্ত আগে সাপে ধরা কাঁকটা যেমন করে শেষ আর্ত আওয়াজ তুলেছিল।

হঠাৎ ছোটবাবুর মুখটা ভেসে উঠল অর্জুনার সামনে। তিনি সেদিন বলছিলেন, আগাছার শেষ রাখতে নেই, তাকে গোড়া থেকে কুপিয়ে তুলে ফেলতে হয়।

কাছারির গোয়ালের অন্ধিসন্ধি অর্জুনার অজানা ছিল না। ছোটবেলায় সে এই গোয়ালের কাজই করেছে কতদিন। নিঃশব্দে হাঁসুয়াটা বাগিয়ে ধরে ঢুকল সে গোয়ালে। তখন গোমস্তা আর শৈলতে ভাষাহীন শেষ ঝটাপটি চলেছে।

কঞ্চির ঝোরকা পথে প্রায় আলোহীন আলোতে অর্জুনা ঠিক চিনে নিল দীনু সাঁউতকে।

ঘাড়ে ধরে তুলল তাকে। ধেড়ে ইঁদুরকে বেড়ালে যেমন ঘাড় কামড়ে তুলে নিয়ে যায়। এক মুহূর্ত সে আস্ফালন করে সময় নষ্ট করল না। হাঁসুয়াটার কোপে আগাছার মূল কুপিয়ে দিল। দীনু সাঁউতের দুটো কামার্ত চোখ অব্যক্ত যন্ত্রণায় ঠিকরে বেরিয়ে এল। অন্ধকারে তা আর দেখা গেল না।

কাজ শেষ। পাপের মূল শেকড়টা অর্জুনা এতদিনে তুলে ফেলেছে।

সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। এখন তাকে মাঠঘাট ভেঙে ছুটতে হবে। নদী সাঁতরে, বন চিরে, ডাঙা আঁচড়ে সারারাত ধরে সে ছুটবে। তার সামনে শুধু একটা মুখ ভাসছে। সে মুখ ছোটকর্তার। তাঁর কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়েই সে থামবে।

পেছন থেকে চাপা গলায় কে ডাকল, অজ্জুনদা, অজ্জুনদা, আমাকে ফেলি যেয়োনি। আমি তুমার সঙ্গে যাব।

এক মুহূর্ত দাঁড়াল অর্জুনা, যাবি, ঠিক আছে, ছুটি চল।

পরের দিন ভগবানপুর থানা থেকে পুলিশ এল বিকেল তিনটে নাগাদ। কাছারিবাড়ির উঠোন ভরে গেল গাঁয়ের মানুষে। ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে ঘোমটার আড়ালে মেয়েরা দেখছে। টিপ্‌টিপ্ করছে বুক। তাদের জীবনে কেউ কখনও পুলিশ দেখেনি।

পুলিশের ছোটবাবু একটা হাতলভাঙা কাঠের চেয়ারে বসেছেন। তাঁর পাশে চার-পাঁচজন কনস্টেবল। পায়ের কাছে গড়ুরের মতো বসে আছে কেষ্টহরি। উসকোখুসকো, অনাথ।

দারোগাবাবু বললেন, তোমরা অর্জুনাকে চেনো?

সবাই সমস্বরে বলল, আজ্ঞা হাঁ।

ও যে খুনের আসামি, এ সম্বন্ধে তোমাদের কারও সন্দেহ আছে কি?

আজ্ঞা না।

অর্জুনা কেমন লোক? মানে তার স্বভাব-চরিত্র কেমন?

কেষ্টহরি বলে উঠল, আজ্ঞা, দারোগাবাবু, আপনি নিজেই বুঝুন। গেরামের বিধবা একটা মেয়েমানুষকে ফুসলে লিয়ে গেল। তার উপর খুন।

আপনি চুপ করুন। যা বলার এদের বলতে দিন। হাঁ, কেষ্টহরিবাবু যা বলছেন তা ঠিক?

আজ্ঞা।

আচ্ছা, গোমস্তাবাবু কেমন লোক ছিলেন?

লাটু বলল, সাক্ষাত দ্যাবতা।

লাটু সম্প্রতি সুন্দরবনের লাট থেকে গোমস্তাবাবুর কৃপায় কিছু কাঁচা পয়সা নিয়ে ফিরেছে। অবশ্য বউটাকে দীনু সাঁউতের কাছে বাঁধা রেখেই গিয়েছিল।

দারোগাবাবু আবার জানতে চাইলেন, কী রকম?

আমাদের কুনও (কোনো) অভাব রাখেনি বাবু। কষ্টে পড়লে আয় উপায়ের পথ বলি দিতেন।

তোমাদের সকলের কি এই ধারণা?

আজ্ঞা হাঁ।

দারোগাবাবু এবার বললেন, চরিত্র কেমন ছিল?

হারু সবার আগে চেঁচিয়ে উঠল, ধুয়া (ধোয়া) কাপ্ড়ের মতো পোষ্কার (পরিষ্কার)।

লাটু বলল, কী বলব হুজুর, তেনার ভরসায় মাগ, ব্যাটা ছাড়ি সোঁদরবনের লাটে কাজকাম করি।

হারু আর লাটু দু'জনের বউই কাছারিতে বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়ার ফাঁকে দীনু সাঁউতের সেবায় দেহপাত করেছে।

তোমরা সকলেই কি তাই মনে করো?

সমস্বরে সকলে বলল, আজ্ঞা হাঁ।

শ্যাওড়া গাছের তলায় হাঁটুর ওপর মুখ ঠেকিয়ে বসেছিল মানুবুড়ি। সকলের সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল সে। দীনু সাঁউতের খাজা কাঁঠাল কুমেদার বউ সোহাগি দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে।

তার দিকে চোখ পড়তেই গজগজ করে উঠল বুড়ির পেট। রাতচরা দীনু সাঁউতের অনেক রাতের অনেক কেচ্ছা তার পেট থেকে উঠে এল গলা অব্দি। কিন্তু সেগুলো আটকে রইল ওইখানেই। বুড়ি কিছুতেই সেগুলোকে উগরে দিতে পারল না।

অর্জুনা আর শৈল নদীনালা সাঁতরে, মাঠঘাট পেরিয়ে যখন ছোটকত্তা অনিন্দ্যবাবুর গ্রামে এসে পৌঁছোল তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

এখন বাবুপাড়ায় ঢুকতে গিয়েই অর্জুনা একেবারে ভড়কে গেল। তার বিশাল ছাতিখানা ডিব্‌ডিব্ করতে লাগল। ধুলোর পথ শেষ হয়ে বাবুপাড়ার ভেতর শুরু হয়েছে পাকা রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে মোটা মোটা পাকার দুটো থাম। তার ওপরে বাঁকানো লোহার কারুকার্য করা ফ্রেম, মাঝখানে বাতি দেবার জায়গা।

সাজপোশাক পরা একটা পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে। সে একটা থামের গায়ে ঢাল আর তলোয়ার রেখে তার লম্বা গোঁফ জোড়া চোমরাচ্ছিল। ওদের দেখেই সে হেঁকে বলল, কোথা যাবে?

কথা ফোটে না অর্জুনার মুখে। তবু সে প্রাণের দায়ে আমতা আমতা করে বলল, ছোটকত্তা অনিন্দ্যবাবুর সঙ্গে দেখা করব এজ্ঞে।

দরোয়ানজি বলল, ছোটকত্তা এখন বাড়ি নেই। কাম লিয়ে সদরে গেছেন। পরশুতক্ আসবেন।

অর্জুনা হতাশ হয়ে রাস্তার একধারে বসে পড়ল। সারারাত উত্তেজনায় কেটেছে তার।

তারপর এতটা পথঘাট ভেঙে একেবারে অভুক্ত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তারা। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, ছোটকত্তা বাড়ি নেই। দরোয়ানজি ওর অবস্থা দেখে বলল, কী হল কী?

অর্জুনা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ছোটকত্তার সঙ্গে দেখা না হলে আমি মরে যাব।

এই মৃত্যুসংবাদটি শোনার পর সম্ভবত দরোয়ানজির প্রাণে কিঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার হল। সে বলল, আরে বেয়াকুফ, মালিক কাজকাম সেরে ফিরলে তবে তো দেখা হবে।

অর্জুনা বলল, আমি এখন থাকব কোথায় দরোয়ানজি? আমার ট্যাঁকে পয়সাকড়ি একদম নাই। খাব কী?

পাশে আওরতের মুখখানা ময়লা চিরকুট একখানা কাপড়ের ঘোমটায় আবৃত ছিল। দরোয়ানজি মুখখানা দেখতে না পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। সে বলল, এই রাস্তায় খানিকটা হেঁটে গেলেই ডানদিকে বাবুর বাজার। বড় একটা পুকুরের দু' দিক ঘিরে বাজার দেখবি। তার ওপারে বাবুর ইস্কুলবাড়ি। বাঁধাঘাটেব পাশে শিবমন্দির। ওই মন্দিরের চাতালে রাতে শুয়ে থাকবি। কান খাড়া করে শুনবি, রাতে বাবুর বাড়িতে চার দফে ঘণ্টা পড়বে। চারবারের বার ঘণ্টা পড়লে তোরা বাবুর বাড়ির বাহারে দু' চারজন ভিখারির সঙ্গে বসে যাবি। ওখানেই খানা দেবে।

এত কষ্টের ভেতরেও কৌতূহলী হয়ে উঠল অর্জুনা, আচ্ছা দরোয়ানজি, চার বার ঘণ্টা পড়বে কেন?

আরে, একি চাট্টিখানি কথা! পহলে ঘণ্টা বাজলে বালবাচ্চা সব ভোজ লাগাবে। দোসরা ঘণ্টায় কত্তাবাবুলোকরা খানায় বসবে। তিসরা ঘণ্টায় যত মাইজি সব ভোজন সারবে। আর শেষ চৌঠা ঘণ্টায় চাকর-চাকরানি খানাপিনা করবে। ওই টাইমে ভিখিরি দু-দশ আদমির খানার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

শৈলর ঘোমটা মুখ ঢেকে নীচে ঝুলে আছে। তার ভাবান্তর বোঝার কোনও উপায় ছিল না। অর্জুনা তার হাত ধরে বলল, আমার পিছু পিছু চলি আয়।

দরোয়ানজির কথামতো কাজ করল ওরা। খেতে পেল, রাতের আশ্রয়েরও ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই শৈল অর্জুনাকে ঠেলা মেরে তুলে দিল। ওরা চারদিক ঘুরে-ফিরে এসে বসল বাঁধানো ঘাটের পাশে একটা ঝাঁকড়া আমগাছের তলায়।

ইস্কুলের দিক থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসছিল। অনেকগুলো ছেলে মনে হল একসঙ্গে গলা মিলিয়েছে। ওরা দারুণ কৌতূহলী হয়ে যেদিক থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল, সেদিকে চেয়ে রইল।

অল্প সময় যেতে না যেতেই সারি বেঁধে একদল ছেলে বেরিয়ে এল ইস্কুল থেকে। সামনে একজন আধবুড়ো মানুষ, গলায় একটা হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে নিয়ে বাজাচ্ছে। ভারী মিষ্টি আওয়াজ উঠছে তার থেকে। ওরা গাইছিল—

'বন্দি তোমায় ভারতজননী
বিদ্যামুকুট ধারিণী
বরপুত্রের তপ অর্জিত
গৌরব মণি মালিনী।'

সমবেত গলার এমন মধুর গান ওরা শোনেনি কখনও। এক বর্ণ অর্থ বুঝতে পারল না ওরা। সুরটা কানে ঢুকতেই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। পরে একটি লোককে জিজ্ঞেস করে অর্জুনা জেনেছিল, অনিন্দ্যবাবু নতুন ধরনের একটা ইস্কুল তৈরি করেছেন। একে জাতীয় ইস্কুল বলে। এখানকার ছেলেরা ভোরবেলা গান গেয়ে গেয়ে গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। চরকা কেটে কাপড় তৈরি করে। চাষবাস করে নিজেদের হাতে। স্বদেশীবাবুরা ওদের এসব কাজ শেখান।

অর্জুনা একটা কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। জেলখেটে দশ বছর পরে ছাড়া পেয়েছিল এক ডাকাত। সে জেলে বসে শতরঞ্চি তৈরি করা শিখেছিল। অনিন্দ্যবাবু তাকে জাতীয় ইস্কুলের মাস্টার করে নিয়েছেন। সে এখন ছেলেদের শতরঞ্চি বোনা শেখায়।

কেন জানি না, এই মুহূর্তে অনিন্দ্যবাবুর পায়ে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করছিল অর্জুনার। আহা, মানুষটির প্রাণে কী দয়া। তেনার ছোঁয়ায় ডাকাতটা একেবারে সাধু হই গেল গো।

সেদিন ছিল বাজার বার। দূর গাঁ-গঞ্জ থেকে পিলপিল করে মেঠো রাস্তা ধরে মানুষজন হাট করতে আসছিল বাবুর বাজারে। হাতে ঝুলছে দড়ির ফাঁদে বাঁধা তেলের বোতল। কোমরে একটা করে গামছা। গামছাতে সব্‌জিপাতি বেঁধে নিয়ে যাবে আর তেল ভরে নিয়ে যাবে বোতলে। ব্যাপারিরা ভারে ভারে তরিতরকারি, মশলাপাতি, হাঁড়িকুঁড়ি বয়ে আনছে। সে এক হইহই ব্যাপার। প্রথমে গুনগুন, তারপর কলরবে ভরে গেল সারা বাজার।

শৈলকে গাছতলায় বসিয়ে রেখে অর্জুনা এক ফাঁকে বাজারের ভেতর ঢুকে পড়ল। ভারী একটা ঠেলাঠেলি লেগে গেছে। একদল আসছে, একদল যাচ্ছে, তাই ধস্তাধস্তি।

দু' একটা বড় বড় বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে দেবার জন্য ব্যাপারিরা আঙুলের ইশারায় অর্জুনাকে ডাকল। সে এমনি সারা বাজারটা ঘুরে ঘুরে গোটা দশেক বোঝা নামাল। কোনও কোনওটাকে ঠাঁইনাড়া করতে হল। এর জন্যে একটা করে পয়সা পেল সে। বাজার থেকে সে যখন বেরিয়ে এল তখন হিসেব করে দেখল, তার ট্যাঁকে দশ দশটা পয়সা জমেছে। সে শৈলর কাছে ছুটে গিয়ে ওই দশটা পয়সা তার হাতে দিয়ে বলল, রাখি দে।

শৈল অবাক হয়ে বলল, কাই (কোথায়) পাইল গো?

সে অনেক কথা, অখন রাখি দে। আমি আর একবার ঘুরি আইসি।

অর্জুনা এখন ভারী ব্যস্ত। সে এই মুহূর্তে রোজগেরে মানুষ হয়ে উঠেছে। তার যেন হাঁপ ফেলার সময় নেই। কাল রাতে যে একটা জ্যান্ত মানুষকে কুপিয়ে খুন করেছে, সে কথা বেমালুম ভুলে বসে আছে।

শ'য়ে শ'য়ে মানুষ হাটে ঢোকার আগে শিবপুকুরের বাঁধানো ঘাটে নেমে হেকলে পায়ের কাদা ধুচ্ছিল। সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল শৈল। তার বুকখানা হঠাৎ হু হু করে উঠল। তার গাঁয়ে থাকলে এখন সে ডোবায়-খানায়-খালে-বিলে গা ডুবিয়ে পাঁকে হাত গুঁজে গুঁজে মাছ ধরত। জলের ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় জুড়িয়ে যেত তার সারা অঙ্গ। কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল তার। সারা বুক ভেসে যেতে লাগল কান্নায়। মনটা নরম হয়ে যেতেই মনে পড়ল তার গত সন্ধ্যার ঘটনাটা। কেমন করে দীনু সাঁউত তাকে জাপটে ধরেছিল, সেকথা ভাবতে গিয়ে তার বুকখানা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। হায়, হায়! তার জন্যি এমন মরদটাকেও গাঁ ছাড়ি আইজ পালাইতে হল।

হঠাৎ শৈলর চোখ পড়ল কেষ্টহরির মতো কে যেন হাটুরেদের সঙ্গে পুকুরঘাটে পা ধুচ্ছে। সে চোখ মুছে ভাল করে আর একবার দেখল, হাঁ, কেষ্টহরিই তো বটে। লিশ্চয় খুনের খবরটা লিয়ে এসেছে মুনিব বাড়িতে।

কাছে-পিঠে অর্জুনা নেই। বুকে পেটে একটা আতঙ্ক ঢুকে গেছে তার, চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যদি হঠাৎ লোকটার অজ্জুনদার সঙ্গে দেখা হই যায়। না, সে আর ভাবতে পারছে না। শিবমন্দিরের আড়ালে গিয়ে সে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল, হে বাবা বুড়া শিব, কেষ্টহরির সঙ্গে যন অজ্জুনদার দেখাটা নেই হয়। আমি এক পইসার বাস্‌সা (বাতাসা) দিব ঠাকুর। বাবা গো রক্ষা করো।

অর্জুনা আরও গোটা চারেক পয়সা কামিয়েছে। সে গাছতলায় এসে শৈলর দেখা না পেয়ে এদিক ওদিক চরকির মতো ঘুরে খোঁজ করেছে। শেষে মন্দিরের পেছনে দেখা পেয়েছে শৈলর।

কী করছিস এখানে? আরও চারটা পইসা লে।

এত বড় একটা শুভ সংবাদেও শৈলর বিন্দুমাত্র ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অর্জুনা বলল, কী হল রে তোর শৈল? এই চারটা পইসার দাম কত জান্‌ (জানিস)?

শৈল কাঁদো কাঁদো গলায় ফিসফিস করে বলল, সব্বনাশ হিছে (হয়েছে) গো।

কী সব্বনাশ রে?

কেষ্টহরি আস্‌সে (এসেছে)।

এ্যাঁ! অর্জুনা আঁতকে উঠল, কাই দেখলু?

পুকুরঘাটে পা হেকলাচ্ছিল।

অর্জুনা তখন সারা চরাচরে লুকোবার মতো কোথাও একটা ছিদ্র পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখছিল।

শৈল অর্জুনার মনের ভাবটি বুঝতে পেরে বলল, চলো মাঠে চলি যাই।

দুজনে দৌড়ে মাঠের দিকে পালিয়ে গেল। মাঠের মাঝ বরাবর বাবলা গাছে ঘেরা একটা পুকুরের আড়ালে ওরা সন্ধ্যা না নামা পর্যন্ত লুকিয়ে রইল।

সন্ধ্যারাতে বাজারে তালপাতার ছাউনির তলায় টেমি জ্বেলে শেষ কেনাবেচা চলেছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে সে আলো। পুকুরের পাশে মেঠো পথ ধরে কলকল করতে করতে হেঁটে চলেছে হাটফেরতা মানুষজন।

একসময় নীরব হয়ে এল পায়ের শব্দ। ওরা উঁকি দিয়ে দেখল হাটের আলোগুলোও কখন নিভে গেছে। দু'জনে চোরের মতো পা টিপে টিপে বাজারে ঢুকল। শৈল গিয়ে বসল বন্ধ মন্দিরের চাতালের এক কোণে। অর্জুনা বলল, তুই এখানে বস, মুড়ি, চিড়া পাওয়া যায় কিনা আমি খুঁজি দেখছি। চারটা পইসা দে।

শৈল বলল, তুমি কি ভুলি গেল অজ্জুনদা, শেষ ঘণ্টা পড়লে কত্তার বাড়িতে তো খাবার পাত পড়বে।

তোর মাথা খারাপ হিছে (হয়েছে) শৈল!

কেনি গো?

কেষ্টহরি আছে কত্তাবাবুর ঘরে. শালা দেখলে আর আস্ত রাখবেনি।

ব্যাপারটা এতক্ষণে শৈলর বোধগম্য হল। সে যেন অন্ধকারে সিধিয়ে যেতে যেতে বলল, তাউত (তাই তো), অজ্জুনদা, তুমি ঠিক কইছ। একবার দেখতে পেলি চকার (চীৎকার) লাগি দিবে।

পরের দিন সবে ভোরের আলোটুকু ফুটি ফুটি করছে, এমন সময় শৈলর ঠেলায় অর্জুনা চমকে উঠে বসল।

ফিসফিস করে শৈল বলল, দেখো কে যায়।

অর্জুনা বলল, কেষ্টহরি আর একটা লোক। ছাতা বগলে লোকটাকে চিনি পারলিনি।

শৈল দারুণ ভীত হয়ে পড়ল। সে স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগল, অজ্জুনদা, আর রক্ষা নাই গো, বোড়ো কাছারির লোককে ডাকি লি গেল।

থাম তো। খালি ফচর ফচর করিসনি। বাপের বাপ আছে। ছোটকত্তার একবার দেখাটা পাই।

বেলা তখন মাথার ওপরে। অনেকক্ষণ আগে ইস্কুল বসে গেছে। ওরা দুটিতে আমগাছের ছায়ায় বসে কান পেতেছিল ঘণ্টার আওয়াজ শোনার জন্য। মোটামুটি দশ অব্দি গুনতে পারত অর্জুনা। শৈলর আবার গোনাগুনি সব গুলিয়ে যেত।

শৈল বলল, দুটা ঘড়ি বাজি যাইছে না গো?

অর্জুনা বলল, মোটে একটা ঘড়ি তো বাজছে, তোর কি ভোক (ক্ষিদে) পাইছে নাকি রে শৈল?

শৈল পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিভ কাটল।

পরক্ষণেই ফিসফিস করে বলল, না গো না, আমার তরে কইনি, সউ (সেই) কখন তুমি খাইছ, আমি তো জানি তুমি ভোক চাপতে পারোনি।

ওদের কথার ভেতরেই হঠাৎ একটা আওয়াজ উঠল ইস্কুলবাড়ি থেকে, বন্দেমাতরম্, ভারতমাতা কী জয়।

ওরা উঠে দাঁড়িয়ে দেখল মাঠের দিকের রাস্তা ধরে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একদল লোক আসছে। গাছের ফাঁক দিয়ে তাদের দেখা যাচ্ছিল। তারা যখন কাছাকাছি এল্ল তখন দেখা গেল তাদের মাথায় একটি করে সাদা টুপি। ইতিমধ্যে ইস্কুল ভেঙে মাস্টার আর ছেলের দল বেরিয়ে পড়েছে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে। কতক্ষণ ধরে চলল সমবেত বন্দেমাতরম্ ধ্বনি! তারপর সবাই মিলে ইস্কুল-বাড়ির প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ল।

অর্জুনা বলল, ওই তো রে ছোট কত্তাবাবু!

শৈল ভিড়ের ভেতর চিনতে পারছিল না। সে উৎসুক গলায় বলল, কাই গো?

অর্জুনা তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

শৈল অভিভূত হয়ে বলল, হঁ গো হঁ, ওই তো চাঁদপানাবাবু, আমি চিনতে পারছি।

অর্জুনার মনে হল সে এখুনি ছোটবাবুর কাছে ছুটে চলে যায় কিন্তু এত লোকের ভিড়ের ভেতর যেতে তার পা সরল না।

এরই ভেতর দু'নম্বর ঘণ্টাটি বাবুর বাড়ি থেকে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়পাতলা হয়ে গেল। এখন বাবুদের খাবার সময়। হয়তো সেজন্যেই উৎসাহী জনতা সরে গিয়ে বাবুদের খাবার সুযোগ করে দিল।

আট-দশজন বাবু ছোটবাবুর পেছন পেছন বাড়ির দিকে খেতে চলে গেলেন।

এরপর তিন নম্বর ঘণ্টা বাজল, তারপর চার নম্বর ঘণ্টাটি পড়তেই অর্জুনা আর শৈল পায় পায় গিয়ে বসল উঠোনের একধারে। পাতা পড়ল, ভাত ডাল তরকারি পরিবেশন করা হল। খিদে আর চিন্তা দুটোই জড়িয়ে পাকিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে অর্জুনার একমাত্র চিন্তা হল কেমন করে সে ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। আশ্চর্য! ঠিক সেই মুহূর্তে বড় বড় দুটো পামগাছের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন ছোটবাবু। অর্জুনা ছুটে গিয়ে ছোটবাবুর পা জড়িয়ে ধরল। ঘোমটার ভেতর শৈল হঠাৎ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। তার আর ছোটকত্তাকে পেন্নাম করা হল না।

অনিন্দ্যবাবু বললেন, ওঠো, আমি সব শুনেছি। এমন একটা ভয়ংকর কাজ তুমি করতে গেলে কেন? শেষে খুন করে বসলে?

অর্জুনা ভাবতে পারল না, ছোটকত্তার মুখে সে এমন কথা শুনবে। অনিন্দ্যবাবুই তো তাকে বলেছিলেন পাপের মূল উপড়ে দিতে হয়। সারা গাঁয়ের মেয়েদের গায়ে হাত দেয়নি দীনু সাঁউত? তাকে মেরে সে কি পাপের মূল তুলে দেয়নি?

অর্জুনা হঠাৎ শৈলর দিকে হাত দেখিয়ে বলল, শৈলকে জিগাস করুন কত্তা, দীনু তার মতো সতী লক্ষ্মীর গায়ে হাত তুলছে। সউ (সেই) সময় আমি দেখি ফেলি। শৈল হাহাকার করি কাঁদি উঠল। আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি ছোটকত্তা।

অনিন্দ্যবাবু শুধু বললেন, কাল যখন আমি কাঁথি শহরে যাব তখন তুমি আমার সঙ্গে যাবে। সেখানে সব দোষ স্বীকার করে কোর্টে আত্মসমর্পণ করবে। গান্ধীজির কথা সবসময় মনে রাখবে, অহিংসা পরমো ধর্মঃ। খুনখারাপি করে মানুষের ভাল করা যায় না।

অনিন্দ্যবাবু ভেতরে চলে গেলেন। তাঁর এখন অনেক কাজ। কাঁথিতে কাল সন্ধ্যায় কংগ্রেসের জেলা কনফারেন্স ডাকা হয়েছে। সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে। ইতিমধ্যে এই গোঁয়ার খুনিটাকে নিয়ে একটা ভাবনা খেলে গেছে অনিন্দ্যবাবুর মাথায়। অর্জুনাকে কংগ্রেসিরাই এগিয়ে দেবে কোর্টে বিচারকের সামনে। সে গান্ধীজির অহিংসা ধর্মের নামে তার দোষ স্বীকার করে নেবে। তাতে যে শাস্তি হয় হোক। এটা পরোক্ষভাবে বাড়িয়ে দেবে কংগ্রেসের সম্মান।

সারারাত বুড়া শিবমন্দিরের চত্বরে বসে কাটাল দু'জনে। অর্জুনার হাত ধরে কেঁদে কেটে অস্থির হল শৈল। ধরা পড়লে অর্জুনার ভাগ্যে কি আছে কে জানে। অর্জুনাকে ছেড়ে শৈল থাকবেই বা কী করে!

একটা ভাবনাই কেবল অর্জুনার মাথায় ঘুরতে লাগল, ছোটকত্তার এ পরিবর্তন হল কী করে? কীরকম তেজি মানুষটা, হঠাৎ এমন জলে ভেজা মুড়ির মতো বতরে (নরম হয়ে) গেল!

এখন তার আর কোনও পথ নেই। বোরজ গাঙে ভাটার টানে নৌকোগুলো যেমন বাহার গাঙের দিকে ভেসে চলে যায় তাকেও ঠিক তেমনি ভেসে যেতে হবে। খর ভাটা ঠেলে সে আর নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে না।

শেষ রাতে শৈল ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি তুমার সঙ্গে যাব অজ্জুনদা।

অর্জুনা তার মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, তুই মায়ামানুষ, আমার সঙ্গে কাই যাবু! ঘরে ফিরি যা। সুধন্নাকে তোর পো বলি ভাববু। তাকে পালা পোষা কর, তাহিলে আমি যেখানে থাকি, সুখে রইব। তুই আমাকে ভুলবুনি শৈল।

এবার শৈল তার অজ্জুনদার হাত ধরে আবেগে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

অর্জুনা বলল, তোকে বাবুরা সঙ্গে লি যাবেনি। আমি খুব বুঝি লিছি (বুঝে নিয়েছি)। তুই ফিরার সময় বাঁশগড়া, তল্লা, হেঁড়িয়া, মুহাটী গেরামের নাম জিগাস করতে করতে যাবু। মুহাটীর পর বোরোজ নদী পড়বে। খিয়া (খেয়া) পারিলে তোর গেরাম পাবু। কুনও ভয় নেই। ভগবানকে ডাকি দিন কাটিইবু। আমার কথা ভাবি দরকার নেই, খালি টকাটার (ছেলের) কথা ভাববু।

মহাসমারোহে স্বদেশীবাবুদের যাত্রার সময় মালা পরিয়ে দেওয়া হল। তাঁদের হাতে শোভা পাচ্ছিল চরকালাঞ্ছিত পতাকা। অনিন্দ্যবাবু নিজেই একজনকে কী যেন ইংগিত করলেন। সে একটি ছোট মালা নিয়ে ছুটে গেল খালি গায়ে নতমুখে সবার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা খুনি আসামি অর্জুনার দিকে। মালাটা তার গলায় পরিয়ে দিতেই অর্জুনা কেমন হকচকিয়ে গেল। চারদিক থেকে সকলে হাততালি দিতে লাগল। কেন যে এই হাততালি তা অর্জুনার মাথায় ঢুকল না।

একটু তফাতে থেকে ওই দলের সঙ্গে হাঁটছিল হাতখানিক ঘোমটা দেওয়া একটি মেয়ে। ঘোমটার ভেতর তার চোখের জল বাধ মানছিল না।

বাবুরা একসময় বীরবন্দের দিকে চলে গেলেন নৌকো ধরার জন্যে। শৈলকে এবার সোজা না গিয়ে ডানদিকে যেতে হবে। সে কতক্ষণ একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইল। ঘোমটাকে বাঁ হাতে উঁচু করে ধরেছে সে। চোখের সামনে থেকে পথের বাঁকে যতক্ষণ না দলটি অদৃশ্য হল ততক্ষণ পা নাড়তে পারল না শৈল। তারপর চোখের জলে পথের মাটি ভেজাতে ভেজাতে, পথের লোককে গাঁয়ের নাম জিজ্ঞেস করতে করতে একেবারে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের পালাঘরে এসে ঢুকল শৈল। কী আশ্চর্য! এই আবছা অন্ধকারেও সুধ্না তাকে চিনে ফেলেছে। সে মাসি মাসি বলে ছুটে এসে শৈলের বুকে আছড়ে পড়ল। এত মনস্তাপ, এত পথকষ্টের পরেও চোখের জলের শেষ সঞ্চয়টুকু সুধ্নার মাথায় উজাড় করে দিল শৈল।

পরের দিন যথারীতি খুনের আসামি অর্জুনাকে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত করে 'বন্দেমাতরম্', 'ভারত মাতা কী জয়', 'গান্ধীজী কী জয়' ধ্বনির মধ্য দিয়ে ঠেলে দেওয়া হল আদালতের মুখে। সেই গোঁয়ার মানুষটা শীতে রক্তের তেজ কমে আসা একটা সাপের মতো ফণা গুটিয়ে গর্তের ভেতর সিঁধিয়ে গেল।

পরের দিন লোকাল পেপার 'শিশিরে' বেরুল—গান্ধীজির অহিংসা মন্ত্রের প্রভাবে এক খুনির চিত্ত পরিবর্তন। চরম শাস্তির কথা জেনেও বিচারকের কাছে আত্মসমর্পণ ও দোষ স্বীকার করতে কোনও রূপ দ্বিধাবোধ করেনি মানুষটি। এর পূর্বে এমন অভূতপূর্ব ঘটনার নজির আর নেই।

সদর আদালত পর্যন্ত আত্মপক্ষ সমর্থন না করে নীরব থেকে দোষ স্বীকার করে নিল আসামি। এমনকী শৈলর ওপর দীনু সাঁউতের অত্যাচারের কথা একবারও তার মুখ দিয়ে বেরুল না। অনিন্দ্যবাবুর ওপর ক্ষোভে অভিমানে সারা মনটা তার ভরে উঠেছিল। বিচারক মহোদয় এই নির্বোধ গ্রাম্য মানুষটার দিকে চেয়ে কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে উকিলবাবুদের ফাঁসির

আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। তবে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে বিচারের নিষ্পত্তি ঘটালেন।

জেলের মধ্যে আসামির পোশাক পরে ডাকাত আর খুনি আসামিদের ভেতর গিয়ে পড়ল অর্জুনা বাগদি।

সম্পূর্ণ জল-জঙ্গল আর আদিম মাটির একটা অকৃত্রিম মানুষ অপরিচিত ইঁট-কাঠ-পাথরের দমবন্ধ করা পাষাণপুরীতে ভাগ্যের চক্রান্তে নিক্ষিপ্ত হল।

এতগুলো মানুষের সঙ্গে থেকেও অর্জুনা একেবারে নিঃসঙ্গ। এখানে আকাশ নেই, দেওয়ালগুলো যেন তাকে পিষে দম বন্ধ করে মেরে ফেলবে। মাঝে মাঝে তার বুক ঠেলে অদ্ভুত একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে। পরক্ষণেই অখণ্ড নীরবতা। রাতে শতরঞ্জের ওপর শুয়ে যখন অন্য অপরাধীরা বিচিত্র সব ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে তখন সে তার বিছানায় চুপচাপ পড়ে থাকে। তার কানে এসে বাজে মাছ ধরার জন্য ভেসে চলা নৌকোর তলায় জলের ছলছলানি। জঙ্গলের ডালপাতা ছিঁড়ে হু হু করে বয়ে আসা কালবোশেখির ঝড়ের শব্দ, মেঘের ডাক, বাজের কড়কড়।

অর্জুনার চোখের ওপর ভেসে ওঠে কত ছবি। পাকা বাঁশের লাঠি কাঁধে নিয়ে পোস্তা (রাস্তা) ধরে এগিয়ে চলেছে সে পারঘাটের দিকে। পেছন পেছন ছুটে ছুটে আসছে সুধ্না। পরনে ছোট্ট একটি নেংটি, গলায় কালো কারে বাঁধা তামার একটা ফুটো পয়সা। কোমরের ঘুন্‌সিত্রে গাঁথা মায়ের দেওয়া কবেকার ক'টা বুনো ফলের বীজ।

পারঘাটে নৌকোয় পারাপার করতে ভারী খুশি হয়ে ওঠে সুধ্না। অর্জুনা ছেলেকে কাদায় না নামিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। তারপরে একেবারে ঝুপ করে নামিয়ে দেয় নৌকোর খোলের ভেতর। ওপারে নন্দের বাজার। জালপাইয়ের লোকেদের একমাত্র কেনাকাটার হাট। ওখানে অর্জুনা ব্যাপারিদের নৌকোয় বস্তাভরা ধান তুলে দেয়। কিছু পয়সা কামিয়ে আনাজপত্র আর চাল নুন কিনে পোঁটলায় বেঁধে লাঠির মাথায় গুঁজে ছেলের হাত ধরে গেরামের পথে ফেরে। তখন ঘাটমাঠ পেরিয়ে সন্ধ্যার শাঁখের আওয়াজ শোনা যায়। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় শন্‌শন্ শব্দে সাঁঝের সারস। আশেপাশের কোনও জলায় ওরা রাতের আশ্রয় খুঁজে পায়।

কোথা থেকে গাঁজা পায় এরা! মৌজ করে টানতে থাকে। গন্ধে দমবন্ধ হয়ে আসে অর্জুনার। একবার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ওকে বেদম মার খেতে হয়েছিল। ওয়ার্ডারগুলো সঙ্গী খুনিদের ইংগিতে ওকে বেধড়ক ধোলাই দিয়েছিল। পাশে দাঁড়িয়ে ফিক্‌ফিক্ করে হেসেছিল খুনিগুলো। সেই থেকে ও চুপ। কোথা দিয়ে ঘূর্ণির স্রোত কীভাবে যে পাক খেয়ে ঘুরে যায় তা মগজে ধরতে পারে না অজ গাঁয়ের সোজাসাপ্‌টা মানুষটা।

বাঁশের ঝুড়ি বোনার কাজটা ও বড় ভালবেসে বেছে নিয়েছে। গাঁয়ে থাকতে এসব কাজ তাদের করতে হয়েছে। যদিও এখানকার ঝুড়ির গড়ন গঠন আলাদা তবু তাকে দেখিয়ে দেওয়ামাত্র সে কাজটা ঝটপট শিখে নিয়েছে। এখানকার মাটি কিছুটা কাঁকরমেশা। অনেক সময় মাটি কুপিয়ে বাগান তৈরি করতে হয়। এটাও অর্জুনার মনের মতো কাজ।

বছর যেতে না যেতেই জেলার সাহেবের নজরে পড়ে গেছে অর্জুনা। কালো পাথর কুঁদে বিধাতাপুরুষ যেন তৈরি করেছে এই মানুষটাকে। এর চলাফেরার ভেতরে চালাক চতুর

মানুষের কোনও ছাপ নেই। ও যখন ঘুরেফিরে বাগানের কাজ করে তখন মনে হয় বৃষ্টিতে ছলছলে কাদামাটির বুকে একটা মাটির মানুষ ধান রুইছে।

একদিন অর্জুনা জেলার সাহেবের কোয়ার্টারের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল দেখে একজন ওয়ার্ডার পেছন দিক থেকে এসে তার ঘাড় চেপে ধরেছিল। সে চমকে উঠে প্রবল শক্তিতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল ওয়ার্ডারটিকে।

বিচার বসল। জেলার সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোয়ার্টারের দিকে চেয়ে চেয়ে কী দেখছিলে?

অর্জুনা মাথা নিচু করল।

জেলার আবার ধমকের সুরে বললেন, বলো কী দেখছিলে?

মানুষটা মাথা তুলল। মনের একটা কান্না দুটো চোখে ফুটে উঠেছে।

খোকাবাবু খেলা করছিল হুজুর, তাকে দেখতে ছিলাম।

জেলার সাহেব বিচক্ষণ আর বিবেকবান মানুষ। তাঁর মনে হল, লোকটা খুনি হলেও তার বুকের মধ্যে স্নেহের একটা স্থান আছে।

তিনি বললেন, তোমার নিজের কোনও ছেলেপিলে আছে?

এত বড় একটা পাথরে গড়া মূর্তির চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

জেলার সাহেব বললেন, কত বয়েস তোমার ছেলের?

মাথা নিচু করে কথা বলল অর্জুনা, আজ্ঞা, জানি না। ওই খোকাবাবুর মতন হবে।

আচ্ছা এখন যাও।

অর্জুনা চলে গেল।

এই প্রথম জেলারবাবু তার সঙ্গে দুটো কথা বললেন। সকলে জেলার সাহেবকে যমের মতো ভয় করে। কিন্তু অর্জুনার মানুষটাকে তেমন মনে হল না। কেমন তার ছেলেপুলে আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। ভাল মানুষকে লোকে কেন যে খারাপ বলে তা অর্জুনার মগজে এল না।

পরের দিন অর্জুনা যখন বাগানে কাজ করছিল তখন পেছনে এসে দাঁড়াল সেই ছেলেটি। অর্জুনা মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখেই একমুখ হেসে বলল, খোকাবাবু!

বারো-তেরো বছরের ছেলেটি, মনে হল তার সুধ্‌নার চেয়ে কিছু বড় হবে। কাল দূর থেকে ওকে সুধ্‌নার মতোই দেখাচ্ছিল।

কিশোরটি বলল, তুমি এই জেলে কেন এসেছ? তুমি যে ওয়ার্ডে থাকো সেখানে তো কেবল খুনি-ডাকাতরা থাকে।

ছেলেটির চোখে বিস্ময়। সে যেন ভাবতেই পারছে না এই মানুষটা কখনও খুনি-ডাকাতদের দলের লোক হতে পারে।

হাতটা তুলে কপালে ঠেকাল অর্জুনা। অর্থাৎ ভাগ্যের চক্রান্তে তাকে আসতে হয়েছে।

ছেলেটি কিছু বা আন্দাজ করল, অনেকটাই তার কাছে অজানা থেকে গেল। কিন্তু তার কিশোর চোখে এই মানুষটাকে খুনি-ডাকাতদের দলের লোক বলে মনে হল না।

জেলার সাহেবই ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন বাগানে খেলাধুলো করতে। লোকটা দেখুক তাঁর ছেলেকে। হয়তো তার বঞ্চিত পিতৃহৃদয়ের ক্ষুধা কিছুটা মিটতে পারে তাকে দেখে। জেলার সাহেবের মনে পড়েছিল 'রহমত' কাবুলিওয়ালার মখ।

প্রতিদিন একবার করে খোকাবাবুকে দেখতে না পেলে অর্জুনার মনটা ভারী হয়ে উঠত। সে খোকাবাবুর নামটি জেনেছিল। অমল রায়। অমল নামটার অর্থ সে জানত না কিন্তু নামটা তার কানে বেশ ভাল লেগেছিল।

ফুলের বাগানের সংলগ্ন একটা ছোট লন, সেই লনে দাপিয়ে বল খেলত অমল। প্রতিদিন অমলের খেলার সময় বল কুড়িয়ে দেবার কাজ পেয়ে গেল অর্জুনা। নিজের কাজের ফাঁকে সে বল খেলায় সাহায্য করত অমলকে। অমলই তাকে নিযুক্ত করেছিল এ কাজে।

অর্জুনা যখন কোনও হালকা কাজ করত তখন তার পাশে এসে দাঁড়াত অমল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গল্প হত দু'জনের।

অমল বলত, তুমি যে গাঁয়ে ছিলে সে গাঁ-টা কেমন অর্জুনকাকা?

সভ্য জগৎ থেকে অনেকখানি দূরে জল-জঙ্গলে ভরা একটা গাঁয়ের ছবি অর্জুনার চোখের ওপর ভেসে উঠত।

সে বলত, জঙ্গল, খাল-বিল, নদী সবকিছু আছে আমার গেরামে। নদী থেকে ছোট একটা খাল গেরামের ভিতর দিয়া চলি গেছে। দুপুরবেলা ছেলেপুলে মেয়েমদ্দ সক্কলে খালে মাছ ধরতে নামে। মাঠনু (মাঠ থেকে) যখন ধান তুলা হই যায় তখন মাঠে পাল পাল গোরু চরে। চুরুর চুরুর করি ছনছনিয়া ঘাস খায় গোরুগুলো। দামড়া আর কচি বাছুরগুলোর লাচ যদি দেখতে খোকাবাবু, তেমন লাচ কুনও মানুষ লাচি পারবেনি।

মুগ্ধ হয়ে এসব কথা শুনত অমল। হঠাৎ প্রশ্ন করত, তোমার গ্রামে পাখি নেই?

অর্জুনা হেসে বলত, পাখি আর কোন গেরামে নাই খোকাবাবু। আমার গেরামের মাঝখানে একটা বটগাছ আছে, কত পাখি যে সউ (সেই) গাছে বাসা বাঁধি রয় না দেখিলে বিশ্বাস হবেনি। জলার ধারে কুঁচ বগ্‌লা (বক) বুসি রয়। খপ্ করি মাছ ধরে আবার চুপ করি বুসি রয়। কাঁথড়ায় (মাটির ভাঙা দেওয়াল) কোকতুল (ঘুঘু) বুসি মাথা ঠুকি ঠুকি ঘুঘু ঘুঘু ঘু আবাজ (আওয়াজ) করে। গো খুঁটিয়া (একধরনের সাদা বক) গোরুর পিঠে বুসি ঠুক্‌রি ঠুক্‌রি কেঁউট (গোরুর গায় বসে যে এঁটুলি পোকা) খায়। কুনও কুনও সময় দল বাঁধি সারস পাখি উড়ি আইসে। পাঁউশের (ছাই) মতো রং। গলার উপ্‌রে লাল দাগ। ভারী যত্তন (সুন্দর) দেখতে। সক্কালবেলা সাতভায়ার (ছাতারে) কিচিরমিচির ডাকে কান পাতে কার সাদ্দি। বাঁশপাতা উড়ে, তুলাফুট্‌কি লাচে। কত পাখির কথা কইব খোকাবাবু।

অমল ট্রেনে করে কোথাও যাবার সময় মাঠঘাট, গাছপালায় ভরা গ্রাম দেখেছে কিন্তু কোনও গ্রামের অন্তরঙ্গ ছবি দেখার সুযোগ তার হয়নি। অর্জুনকাকার বর্ণনায় সে স্বপ্নেভরা গ্রামের একটা সত্যিকারের ছবি দেখতে পায়।

অন্ধকারে একা বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না অর্জুনার। সে শৈলর কথা ভাবে। সুধ্‌নার মুখটা ঘোর অন্ধকারের ভেতরেও সে স্পষ্ট দেখতে পায়। সে জানে শৈল তার ছেলেকে বুকে করে রাখবে। সে অবাক হয়ে ভাবে শৈলর না খেতে পাওয়া শরীরটার ভেতর এত স্নেহ কোথা থেকে এল! অনাহারে শুকিয়ে গেছে সে। তবু তার ওই দেহটা সঁপে দেয়নি দীনু সাঁউতের থাবার মধ্যে। কী করে চলছে ওদের? সে জানে শাকপাতা সেদ্দ করে খাবে, মাছ পুড়িয়ে খাবে তবু শরীর বেচবে না শৈল।

কান্নায় বুকের ভেতরটা গুমরে গুমরে উঠতে থাকে অর্জুনার। এই জেলখানার ভেতরেই কি তাকে কাটাতে হবে সারাটা জীবন! সে কি তার গ্রামে আর কোনওদিনও ফিরতে পারবে না! নৌকা ভাসিয়ে শুনিয়ার গাঙে মাছ ধরতে যাওয়া, বৃষ্টির দিনে জলে পা ডুবিয়ে ধান রোয়া, গোরু তাড়িয়ে মাঠে নিয়ে যাওয়া, এসব কি জন্মের মতো ঘুচে গেল তার!

গ্রামের কথা যেদিন সে ভাবে সেদিন সমস্ত কাজের ভেতরেও সে মনমরা হয়ে থাকে। কেবল অমলকে দেখতে পেলে তার মনের মধ্যে বৃষ্টিধোয়া একটা আলো হঠাৎ ফুটে ওঠে। দু' চার দিন অমল বাইরে কোথাও গেলে জেলখানাটাকে পুরোপুরি জেলখানা বলে মনে হয় তার। পাহারাওয়ালা, কয়েদি, এমনকী দেওয়ালগুলো পাথর দিয়ে গড়া বলে তার বোধ হয়। খালি নিয়ম, খালি কানুন। পানের থেকে চুন খসবে না। হিসেব করে পা ফেলতে হবে। সে যখন গ্রামে থাকত তখন হাওয়ার ঠেলায় ছুটত, পাখির সঙ্গে উড়ে চলত। গাছে চড়ে পাখির ডিম পাড়া, মাছরাঙার মতো ঝুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া, কী হালকা আর আনন্দের ছিল সে জীবন। আমের ডালে বোল (মুকুল) আসত টোপরের মতো। কদমের ফুল ফুটত বর্ষার জল পড়লে, সে ছবি আজও অর্জুনার চোখে ভাসে। নাকে আসে ওইসব ফুল আর গাছগাছালির গন্ধ। একটা সান্ত্বনা সে মনে মনে পায়, সে এসব না দেখতে পাক, তার সুধ্না তো ওই জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে হঠাৎ গ্রামের দেবী মা চণ্ডীকে স্মরণ করে। মনে মনে বলে, মাগো, তুমি আমার সুধ্নাকে দেখো মা। সে যন (যেন) কেষ্টহরির পা না চাটে। তার মনে তেজ দিয়ো মা। সে যেন পষ্ট কথা কইতে ভয় না পায়। খাটি খাবে, তবু কারও কাছে চাই খাবেনি।

কমলবিকাশ রায় তাঁর অফিসের চেয়ারটিতে এসে বসলেই নিয়মকানুনে গড়া ভারী কঠিন একটা মানুস হয়ে যান। এত বড় একটা জেলের শক্ত শেকলে বাঁধা আছে এতগুলো কয়েদি। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভারটি যেমন তাঁর ওপর এসে পড়েছে, তেমনি তাদের পলায়নের পথটিকে নিশ্ছিদ্র করে বন্ধ রাখার দায়িত্বও বর্তেছে তাঁর ওপর।

সম্প্রতি কমলবিকাশ রায় একটি আবেগের শিকার হয়েছেন। তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক একজন নির্বাচিত কয়েদির সঙ্গে দেখা করছেন। জিজ্ঞাসাবাদের ভেতর দিয়ে সংগ্রহ করছেন তাদের কেস হিস্ট্রি। বিচারকের জাজমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন তাঁর সংগ্রহ করা তথ্যগুলো।

কমলবিকাশ কলেজ জীবনে কিছু কিছু লিখতেন। তিনি এইসব কয়েদিদের নিয়ে বৈচিত্র্যময় ঘটনায় পূর্ণ একটি গ্রন্থ লিখতে প্রয়াসী হয়েছেন।

কিছুদূর এগিয়েই তাঁর মনে হল, সাক্ষ্য, উকিলের জেরা মিথ্যাকে সত্যের পোশাক পরাতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বিচারকও প্রভাবিত হয়ে যান। আইনের প্যাঁচে পড়ে তাঁর কলমও আঁকাবাঁকা পথ ধরতে বাধ্য হয়।

নিরপেক্ষ মন নিয়ে মানুষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে তিনি যথার্থ সত্যটিকে আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগলেন।

তাঁর অনুসন্ধানের প্রথম ফলটি তিনি পেলেন অর্জুনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রভাতী আলোর মতো একটি দীপ্ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ালেন কমলবিকাশ। তিনি অর্জুনাকে নিয়েই ছদ্মনামে প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম কাহিনী। আইনের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, কিন্তু কাহিনীর মাধ্যমে শৃঙ্খলিত সত্যকে মুক্তি দিলেন তিনি।

অবসর সময়ে বিচারক, আইনজ্ঞ এবং পাঠক সাধারণ ছদ্মনামধারী লেখকটির লেখা পড়ে উচ্ছ্বসিত হলেন, ছদ্মনামের আড়ালে কোন অভিজ্ঞ কুশলী লেখকটি লুকিয়ে আছেন তাই নিয়ে গবেষণাও চলল, কিন্তু আইনের অক্টোপাশ একটুও শিথিল করল না তার বাঁধন।

মাঝে মাঝে কয়েদিদের ভেতর প্রচণ্ড মারামারি হয়। হিংস্র জন্তুগুলো তখন মানুষের চামড়ার বাইরে বেরিয়ে আসে। হাতে কোনও অস্ত্র নেই তবু বিধাতার দেওয়া দাঁত আর নখের ব্যবহার করতে থাকে তারা। কিল, চড়, ঘুষি, লাথি শিলাবর্ষণের মতো পরস্পরের ওপর পড়তে থাকে। কখনও বা দুঃশাসনের রক্তপানের অভিনয় চলে। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবার পর ঘণ্টি বাজে। ওয়ার্ডাররা ঢুকে পড়ে কয়েদিদের জাপটে ধরে রদ্দা লাগায়।

অর্জুনা অবাক চোখ মেলে সঙ্গীসাথীদের এইসব ক্রিয়াকর্ম দেখে। অতি সামান্য কারণে কেন যে এরা এতখানি ক্ষিপ্ত হয় তা তার মগজে আসে না।

জেল ওয়ার্ডাররা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায় অর্জুনার আচার আচরণ দেখে। কোনওদিন কোনও লড়াইতে তাকে অংশ নিতে দেখেনি তারা। নেশাভাঙের আসরেও সে একেবারেই অচল। এমন একটা জরদগব কী করে যে একটা মানুষকে খুন করতে পারে তা তাদের বুদ্ধিতে আসে না।

একবার কী যেন একটা নেশার জিনিস নিয়ে মারামারি হয়েছিল সঙ্গীদের ভেতর। অর্জুনা দেখেছিল বাইরে থেকে পাহারাওলাদের একজন এনে দিয়েছিল সে বস্তুটি। মারপিটের ভেতরেই খবর পেয়ে এসে গেলেন ওপরওলা অফিসার। তাঁর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই সকলে চুপ। তিনি অভিজ্ঞ মানুষ, টেনে বের করলেন নেশার সে দ্রব্যটি।

কোথা থেকে এল এ বস্তু! প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও কারু কাছ থেকে পাওয়া গেল না কোনও সূত্র।

মারপিটের ভেতর বোবা বনে গিয়ে ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়েছিল অর্জুনা। হঠাৎ তার মুখ খুলে গেল। সে একজন ওয়ার্ডারের দিকে হাত তুলে বলল, ওই আনছে হুজুর।

ওয়ার্ডারটিকে ইংগিতে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন অফিসার।

এরপর পাহারাদারদের বিষ নজরে পড়ে গেল সে। সঙ্গীরাও তার এই কর্মের জন্য শাসাতে লাগল। সে ভেবেই পেল না সঙ্গীদের উপকার করতে গিয়ে সে তাদের ক্রোধের কারণ হল কেন!

জেলের অন্ধিসন্ধি, ফাঁকফোকর যে অনেক দূর পর্যন্ত শেকড় ছড়িয়েছে তা মুলদা গাঁয়ের ওই গোঁয়ারগোবিন্দের জানার কথা নয়।

অনেক সময় অর্জুনার মনে হয় সে একটা অবাঞ্ছিত জগতে এসে পড়েছে। এখানকার বিধিব্যবস্থা একেবারে তার নাগালের বাইরে। সারাটা জীবন তাকে এইসব মানুষদের ভেতর কাটাতে হবে। একথা ভাবলেই বুকখানা তার কেমন যেন শুকিয়ে আসে।

এখানে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ছাড়া অন্য কোনও ঋতু তার অনুভবের মধ্যে আসে না। হঠাৎ একদিন হাওয়ায় ঢাকের বাদ্যি ভেসে এল তার কানে। সে হাতের কোদাল ফেলে দিয়ে কান খাড়া করে শুনতে লাগল সে শব্দ।

আহা কোথায় পুজো হচ্ছে! তাদের গাঁয়ে চণ্ডী মায়ের পুজোয় একবার সে ঢাকের বাদ্যি

এনেছিল। বাদ্যিকারের বাজনার সে কী কেরামতি! তাক লেগে গিয়েছিল সবার। তার মনে পড়ল নন্দবাবুদের 'গঙ্গাধর মেলায়' একবার নদী পেরিয়ে সে গিয়েছিল। সেখানে পাইকান নাচের সঙ্গে ইংরিজি বাজনা বাজতে দেখেছিল সে। বাবুলোকেরা বলেছিল, ওগুলো ঢাক নয়, ডেরাম (ড্রাম)। আর পেতলের ঝকঝকে পাকানো অজগর সাপের মতো বাঁশিগুলোর মুখ দিয়ে কানফাটা একধরনের আওয়াজ বেরুচ্ছিল। সব মিলে সে এক তাজ্জব কাণ্ড। কতদিন সেই গল্প সে করেছিল গাঁয়ের লোকেদের কাছে।

পুজো এল কি গেল তা সে বুঝতে না পারলেও ওই বাজনার ধ্বনিটা কদিন ধরে বাজতে লাগল তার বুকের ভেতর।

স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেও অনিন্দ্যবাবুর দেহে ছিল জমিদারের রক্ত। তাই দীনু সাঁউত মারা যাবার পর মুলদা গাঁয়ের তদারকির ভার তিনি সঁপে দিলেন কেষ্টহরির হাতে। জমিদারি সেরেস্তার কাজকর্ম চালানো এত সহজ ব্যাপার নয়। যারা চিরদিন তার ভেতর ঢুকে আছে তারাই কেবল পারবে মহালটার কাজ ঠিকমতো চালিয়ে নিয়ে যেতে।

নতুন মসনদে বসেই কেষ্টহরি কাছারিবাড়িতে গাঁয়ের লোকদের ডেকে পাঠাল। সবাই এসে কেষ্টহরিকে পেন্নাম করে কাছারির উঠোনে বসে পড়ল।

কেষ্টহরি বলল, আজ বড় আনন্দের দিন। তোমরা সক্কলে আগু (আগে) তামুক খাও।

শীতের দিনে তামাক অতি উপাদেয় পানীয়। কেষ্টহরির ইঙ্গিতে কাছারির চাকররা তিন-চারটে হুঁকোয় তামাক সেজে দিয়ে গেল। টানতে টানতে তামাক ফুরোলে আবার নতুন করে কলকে সেজে দেওয়া হল।

কেষ্টহরি বলল, এ গেরামের ভালমন্দ আইজনু (আজ থেকে) তুমাদের উপর। দেবতার মতন দাদা আমার সগ্‌গে যাইছেন। আর সে বেটা খুনি অজ্জুনা জন্মের মতন জেলে পচি মরছে। তুমরা অখন থিকে বুঝিসুঝি কাজ করব। আমার মান-ময্যাদা তুমরা রাখব। আর আমি তুমাদের সুখদুঃখে পাশে দাঁড়াইব।

সকলে নতুন মনিবের প্রথম ভাষণে চমৎকৃত হল। এখন গাঁয়ের মোড়ল হয়েছে ঘনা ওরফে ঘনশ্যাম বাড়ুই। সে জোড়হস্ত হয়ে গরুড় পক্ষীর মতো বসে বলল, ধানকাটার মরসুম শুরু হিছে (হয়েছে) কত্তা। ভঁতা দা শানাইতে হবে, লতুন কটা দা (কাস্তে) ও চাই। কাছারি থিকে দিবার আজ্ঞা হয়।

কেষ্টহরি কী যেন একটু ভেবে নিল। সামান্য হলেও প্রথম গদিতে বসেই খরচ, তা হোক, প্রজার মনোরঞ্জন রাজার প্রথম কর্তব্য। তাই পাশে বসে থাকা মহুরি লব সাউকে বলল, এদের আজ্জি মতন কাজ করো।

মোড়ল ঘনা বাউড়ীর দিকে ফিরে বলল, কটা লতুন দা (কাস্তে) চাই তুমাদের?

নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ গুঞ্জন চলল। হিসেবের পর স্থির হল খান সাতেক নতুন দা চাই। আর সব কটা পুরানো দায়ে শান দিতে হবে।

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলল, ঘনাদা, হিসাবে শৈলর দা ধরা হয়নি। আর একটা যোগ হবে।

সঙ্গে সঙ্গে কানফাটানো একটা গর্জন তুলল কেষ্টহরি, সউ খুনি মাগিকে দা দিতে হবে! কখন সউ দা দিয়া আমার গলা কাটি দিবে। পরক্ষণেই কিছু একটা ভাবল কেষ্টহরি। এবার গলাটা একটু নরম করে বলল, ঠিক আছে, তুমাদের কথা রাখব। তার তরেও একটা দা তৈরি হবে।

প্রথম দিনের সভা এখানেই ভঙ্গ হল। সবাই যাবার সময় জেনে গেল, নবান্নে এবছর পাত পড়বে কাছারিবাড়িতে।

কেষ্টহরি অন্দরমহলে ঢুকতে ঢুকতে লব সাউকে বলল, প্রথমেই খাজনা আদায়ের ব্যাপারে জোর-জুলুম চালাইবনি। ধীরে ধীরে সব হবে। কানের জল বার করতে গেলে কানে জল ঢুকাইতে হয়। কিছু খচ্চা করলি, পরে কড়ায় গণ্ডায় উসুল হবে।

লব সাউ বক্‌সী হিসাবে অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি। একতারপুর থেকে সে নতুন আমদানি। কেষ্টহরির শালার বন্ধু সে। সেই সুবাদে বহাল হয়েছে মহুরির পদে।

লব বলল, আপনার সব কাজ অতি উত্তম হইছে কেষ্টদা। তবে শৈলের হাতে দা তুলে দিবার ব্যাপারটা মানি লিতে পারলিনি!

কেষ্টহরি মুচকি হেসে লবকে ঠেলা মেরে বলল, হাতে অস্তর ধরি দিলেই কি কেউ কোপ লাগায় রে। শৈল আমার তেমন মেয়েছেলে নয়।

লব নিমেষে ব্যাপারটা বুঝে নিল। বন্ধুর ভগ্নীপতির সঙ্গে তার রসিকতার সম্পর্ক। সে বলল, তবু সাবধান দাদা, অর্জুনা নাই বলি ভয়েরও কারণ নাই একথা ভাববনি। শালা কালকেউটের বাচ্চাটাকে শৈল ট্যাঁকে করি রাখছে। বাচ্চা হিলেও ছোবলে পুরা বিষ।

কেষ্টহরি বলল, দেখা যাবে।

অনিন্দ্যবাবুর কাছে আর্জি করে আদায় উসুলের জন্য একজন পশ্চিমা লগ্‌দির ব্যবস্থা করল কেষ্টহরি। ইয়া বড় গোঁফ, মাথায় পাগড়ি, হাতে পেতল বাঁধানো পাকা বাঁশের লাঠি। দশাসই চেহারার মানুষটাকে দেখেই মুলদা গাঁয়ের অনেকেরই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। দূর থেকে দরোয়ানজির সঙ্গে চোখাচুখি হলেই ছেলেরা উলটো দিকে পন্‌পন্‌ করে তাড়া-খাওয়া মশার মতো উড়ে পালাত। বয়স্ক লোকেরা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দরোয়ানজিকে নমস্কার না ঠুকে যেত না। এতে ভারী আত্মপ্রসাদ লাভ করত পশ্চিমা মানুষটি।

ওই একটি ছেলে কিছুতেই ভয় পায় না। সে কোনওদিকে না তাকিয়ে কাছারির সামনের রাস্তা দিয়ে গোরু তাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। তার খেলাধুলো, হাঁকডাক, চেহারা-টেহারা সবই অর্জুনার মতো। যে লম্বা একঠেঙে আকাশছোঁয়া তালগাছে কেউ উঠতে পারে না সেখানে সে অবলীলায় উঠে গিয়ে তালের কাঁদি পেড়ে আনে। দশ বছরের ছেলে হলে কী হবে উদ্‌বেড়ালের মতো টুব্‌ করে জলে ডুব দিয়ে পুকুরের তলার পাঁক থেকে মাছ তুলে আনতে সে ওস্তাদ। এই বয়সেই ঢিল ছুড়ে সাপের ফণা ভেঙে দিতে পারে সে। জেলেদের ভেসে চলা নৌকোয় লাফিয়ে উঠে পড়ে। তিন-চার দিন পাত্তাই নেই তার। কোথায় বাহার গাঙে জেলেরা মাছ ধরে, সেখানে সে ভাত রেঁধে দেয় তাদের, সেজে দেয় হুঁকো কলকে।

এই বয়েসেই সে মাছ ধরার অনেক কৌশল শিখে ফেলেছে। জেলেরা গাঁয়ে ফিরে যাওয়ার সময় আদর করে ওকে কিছু পয়সা আর মাছ দিয়ে দেয়। ও মুলদার চরে নেমে পোস্তা (বড়

রাস্তা) ধরে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলেই দু'-চারটে করে মাছ বিলিয়ে দেয়। দিলখানা হয়েছে তার একেবারে অর্জুনার মতো। ও ঘরে ফিরে এলেই শৈল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। এতগুলো দিনের অদর্শনে যতটা ভয়-ভাবনা তার মনে জমা হয়েছিল, কেঁদেকেটে সেগুলো উজাড় করে দেয় সে।

সুধ্‌না শৈলকে মাসি বলে জড়িয়ে ধরলেই গলে জল হয়ে যায় শৈল। হাওয়ায় উড়ে চলে যায় তার সব ক্ষোভ।

ধানকাটার সময় প্রতিবেশীদের ভাগের জমিনে জনমজুরি খাটে সে। ধান রোয়া, ধান কাটা এসব কাজে সে একেবারে রপ্ত। একটুও ফাঁক দেয় না সে কাজে, তাই তার ডাক পড়ে সবার ঘরে। কার্তিকের আকালে যখন টান পড়ে ধান চালে তখন সকলে বস্তা নিয়ে ছোটে কাছারিবাড়িতে। কেষ্টহরির দ্বারস্থ হতে হয়। লোক বুঝে ধান বাড় (দাদন) দেয় কেষ্টহরি। লব সাউ খাতায় নাম লিখে, ধান দেয় ও তার চতুর্গুণ সুদের অঙ্ক বসিয়ে টিপসই করিয়ে নেয়।

যার জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে থাকে কেষ্টহরি, সে কিন্তু আকালের দিনে ভুলেও এমুখো হয় না।

মাছের নৌকোয় যেটুকু রোজগার হয় সুধ্‌নার তাতেই নন্দের হাটে চাল কিনে কোনওরকমে দুটো পেট চালিয়ে নেয় শৈল। মাঠেঘাটে কলমি, শুষ্‌নি, হিঞ্চে যা পায় তাই তুলে আনে সে। পরের বাগানে ভুলেও সে কখনও ঢুকে পড়ে না।

সুধ্‌না কোথা থেকে তেঁতুল পেড়ে এনে বলে, মাসি মাছের টক রাঁধ। তোর শাকপাতা খাই মুখ মরি যাইছে।

শৈল হাসে। বলে, রাজার ব্যাটা তুই, তোর মুখে শাক পাতা রুচবে কেনি। তুই তো অজ্জুনের বেটা অবিমন্নু।

গাঙের ওপারে মনসাখালিতে শৈলর বাপেরবাড়ি। আইবুড়ো অবস্থায় সে 'অভিমন্যুবধ' পালাটি দেখেছে। গাঙের পাড়ে কতদিন নুন-মাটি চাঁচতে এসে সে অভিমন্যুর জন্য চোখের জল ফেলেছে

সুধ্‌না বলে, মাসি, তুমি খালি আমাকে রাজার বেটা বলো আর এ গেরামের সক্কল লোক আমাকে খুনির বেটা বলি ডাকে।

শৈল বলে, ভগবান জানে অজ্জুনদা আমার রাজা কি খুনি! তার মতো লোক নেই রে বাপ্।

সুধ্‌নাকে গোরু চরাবার সময় কেউ যদি খেপে গিয়ে খুনির বেটা বলে তাহলে সে বাঘের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন তাকে ঠেকায় কার সাধ্যি!

সুধ্‌নার এসব বিক্রমের কথা, ঔদ্ধত্যের কথা কাছারিতে এসে পৌঁছোতে বিলম্ব হয় না। কেষ্টহরি রাগে গরগর করতে করতে বলে, শালা বেজম্মা।

সুঁদরী আর অর্জুনার ছেলে বেজম্মা হলে এ ধরাধামে কেষ্টহরির জায়গাটি কোথায় নির্দিষ্ট হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

একদিনের ঘটনায় তুমুল শোরগোল উঠল। ফাঁকা মাঠে ছেলেরা গোরু চরাচ্ছিল। একদল ছেলে ডাংগুলি খেলছিল একটা গাছের তলায়। কাছারিবাড়ির বাগালটা (রাখাল) কাঠিতে লাঠি দিয়ে ঘা দিতেই বোঁ করে সে কাঠি উড়ে গিয়ে লাগল সুধ্‌নার গোরুটার চোখে। ঘা খাওয়া

গোরুটা শিং উঁচিয়ে অন্ধের মতো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দৌড়োতে লাগল। সামনে পড়ে গিয়ে শিংয়ের খোঁচা খেল গ্রামের একটা ছেলে।

হই রই কাণ্ড। রটে গেল খুনির ছেলেটা তার গোরুটাকে খেপিয়ে তুলে ছেলেদের ভেতর ছেড়ে দিয়েছে, তাই এ অঘটন।

বিচার বসল কেষ্টহরির এজলাসে।

সুধ্না আসতে চায়নি। শৈল তাকে অনেক বুঝিয়ে ধরে-পাকড়ে নিয়ে এল। তার বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষ দিলনা। কিন্তু গোরুটা যে গুঁতিয়েছে সে বিষয়ে কেউ অস্বীকারও করল না।

যাকে শাস্তি দেবার জন্য এত আয়োজন সে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে কেষ্টহরির মেজাজটা বিগড়ে গেল। সে চেঁচিয়ে বলল, আরে ব্যাটা গোরুটা কার? যার গোরু তাকে শাস্তি পাইতে হবে। নাহিলে গোরু খুঁয়াড়ে যাবে।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সুধ্না বিচারসভার কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কেষ্টহরির মুখ থেকে রায়টি শোনামাত্র সে চেঁচিয়ে উঠল, আমার গোরুর গায় যে হাত দিবে তাকে আস্ত রাখবনি। আমার গোরু যদি খুঁয়াড়ে যায় তবে এ কাচারির সক্কল গোরুকে আমি খুঁয়াড়ে পাঠিইব।

বয়সে কিশোর হলে কী হবে তার বুকের পাটা দেখে সবাই থ হয়ে গেল।

ভারী অপমান বোধ হল কেষ্টহরির। কেউ কোনও কথাটি কয় না। এর ভেতর জোর করে কিছু বলতে গেলে যদি হিতে বিপরীত হয়। তাই সে জড়িয়ে মড়িয়ে বলল, তাহিলে যা ইচ্ছা তাউ (তাই) করি বেড়িইবু তুই?

সুধ্না বলল, তুমার বাগালকে জিগাস করো, তার ডাংগুলির কাঠি ছুটি আসি আমার গোরুর চোখে লাগছে। সে তাড়সে ছুটি চলি যাইছে। দোষটা গোরুর না তুমার বাগালের (রাখাল)?

কেষ্টহরি মনে মনে ভাবল, জাত কেউটে রে বাবা। এর কাছনু (কাছ থেকে) পালি বাঁচতে হবে। সে নরম গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় উঠে দাঁড়াল শৈল। পেট থেকে আর কথাটা বের করল না কেষ্টহরি।

শৈল হাতজোড় করে বলল, আমার টকা (ছেলে) যদি কুনও দোষ করে তার শাস্তি আপনারা দিয়ো, কিন্তু অবলা জীবটাকে শাস্তি দিয়োনি ধম্মের বাপসব।

কেষ্টহরি শৈলের কথায় জল হয়ে গেল। সে বলে উঠল, আচ্ছা, আচ্ছা, দুটা পইসা জরিমানা বলো, আর কাছারি বাড়ির মান্যি বলো, দিবু।

ফুঁসছিল সুধ্না। সে কিছু বলার আগেই শৈল বলল, সভার সামনে বলি গেলি, কাল মুখিয়ার কাছে দুটা পইসা জমা দিব।

মান রক্ষা হল কেষ্টহরির। সুধ্না সকলের সামনে তার মুখখানা মাটিতে ঘষে দিচ্ছিল আর কি।

তবু একটা খেদ থেকে গেল মনে। শৈল দুটা পইসা ঘনার হাতে জমা না দিয়া যদি একটি বার কাছারিতে দিতে আসত!

আশ্চর্য সুধ্নার স্বভাব! শৈলর কথার একটিও প্রতিবাদ করল না সে সভায়। ঘরে এসে কিন্তু সে কেঁদেকেটে সারা হল।

তুমি ও দুটো পইসা দিতে পারবনি মাসি। আমি ত কুনও দোষ করিনি, তবে পয়সা দুব (দেব) কেনি?

শৈল এত বড় ছেলেটাকে বুকে টেনে নিয়ে অনেক আদর করল।

তুই বাপ্ আমার কবি (কবে) একটু শান্ত হবু ক ত(বল তো)?

এত বড় দুর্দান্ত সুধ্না মাসির হাতের ছোঁয়া পেলেই কেমন যেন শান্ত হয়ে যায়।

সে মুখ তুলে বলে, কাল আমি আর গোরু চরিইতে যাবনি মাসি। লৌকায় বাহার গাঙে মাছ ধরতে যাব। তুই ক'দিন গোরুটাকে দেখবু।

তুই গাঙের কথা কইলে আমার বুকটা কমন টিপটিপ করে বাপ।

সুধ্না হেসে বলে, অত ভয় পাও কেনি মাসি? আমার কিচ্ছু হবেনি।

সুধ্নার মাথাটা বুকে চেপে ধরে শৈল একমনে মা চণ্ডীর নাম করতে থাকে।

অমল ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে আসে। অর্জুন কাকাকে বাগানে কোদাল চালাতে দেখলেই অমল বেরিয়ে আসে পড়ার ঘর থেকে। লনের কোনায় একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ আছে। তার ছায়ায় অর্জুন কাকাকে টেনে নিয়ে যায় অমল।

গল্প বল অর্জুন কাকা, তোমার দেশ-গাঁয়ের গল্প।

এসব গল্প অমলকে চুম্বকের মতো টেনে রাখে।

আমার কাজ অখনও শেষ হয়নি খোকাবাবু।

অমল অর্জুনের শেষ শব্দটির ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, আমাকে তুমি অমল বলে ডাকবে, আমি খোকাবাবু নই।

জিভ কেটে অর্জুনা বলে, জেলর সাহিবের খোকা তুমি, আমারও খোকাবাবু।

এবার আর প্রতিবাদ করে না অমল। জেলার কমলবিকাশ তাঁর ছেলেকে 'খোকা' বলেই ডাকেন।

অর্জুনা গল্প বলে যায়। তার ছোটবেলার গল্প। বড় আগ্রহ নিয়ে সে সব শোনে অমল। তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে ছবির পর ছবি।

ছোটবেলায় অর্জুনাদের গাঁয়ে কোথা থেকে বনবাদাড় আর নদী পেরিয়ে আসত একটা মেয়ে। তার মাথায় ঝাঁকা। রেশমি চুড়ি বোঝাই। একটা ভারী রংদার শাড়ি পরে সে 'চাই রেশমি চুড়ি' বলে ডেকে ডেকে ফিরত। তার নিজের হাতেও পরে থাকত নানা রঙের একগাছা করে চুড়ি।

সৎচাষি আর বাগদি পাড়ার মেয়েরা তাকে ঘিরে বসে চুড়ি কিনত।

রোদের আলোয় কী রঙবাহারি ঝিলিক দিত সে সব চুড়ি!

একদিন ওই মেয়েটার পেছন পেছন সে অনেকদূর চলে গেল। নদীর ওপারে যাবার সময়ও মেয়েটা বুঝতে পারল না যে একটা ডানপিটে ছেলে তার সঙ্গ নিয়েছে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি মেয়েটা এসে পৌছোল এক জঙ্গলে ঘেরা পড়ো বাড়ির সামনে। আর ঠিক সেই সময় অর্জুনাকে দেখতে পেল সে।

আরে তু ইখানে এলি কুথা থেকে?

কথা বলে না অর্জুনা। মাথা নিচু করে থাকে।

মেয়েটা তাকে মুলদা গাঁয়ে দেখেছে পেছন পেছন ঘুরে বেড়াতে। সেই ছেলে এতদূর তার পেছন পেছন এসেছে!

কী আর করা যায়। পোড়ো বাড়ির ভেতর বসে মেয়েটা আগুন জ্বালল, রুটি সেঁকল, তরকারি বানাল। ওকে খেতে দিল, নিজেও খেল। একটা ছেঁড়া চট পেতে ওকে শুতেও দিল, নিজে শতরঞ্চির মতো একটা কী বিছিয়ে শুল।

অর্জুনার ঘুম ভেঙে গেল ভোর রাতে। পাশের গাঁ থেকে লোকেরা এসে জড়ো হয়েছে, সঙ্গে লাল পাগড়ি পরা পুলিশ।

অদ্ভুত একটা লোক হাতবাঁধা অবস্থায় বসে আছে চুড়িউলির পাশে। অর্জুনা তাকে আগে দেখেনি। রাতে কখন এসে জুটেছে এখানে।

এমন বীভৎস চেহারার লোক অর্জুনার চোখে পড়েনি কখনও। সারা মুখে বসন্তের দাগ। একটা চোখ সাদা, গলে ঠিক্‌রে যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। একটা কালো রঙের ফতুয়া গায়ে।

অর্জুনা লোকজনের কথাবার্তা থেকে যেটুকু জানতে পারল, তাতে সে বুঝল, লোকটা মাল পাচারের বিদ্যে জানে। নৌকোতে যখন মাল চলাচল করে তখন সে ভারী নিরীহ যাত্রী সেজে বসে। তারপর সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে মালের পেটি নামিয়ে নিয়ে পালায়।

চুড়ির পেটি নিয়ে এসে এই মেয়েটিকে দিয়ে বিক্রি করে।

পুলিশ অনেক সন্ধান করে, ফাঁদ পেতে পারঘাট থেকে বামাল লোকটাকে ধরেছে কাল রাতে।

নির্জন জঙ্গলের ভেতর পোড়ো বাড়িটাকে লোকে ভূতের বাড়ি বলে জানত। রাতেভিতে কেউ এখানে আসত না। অনেকেই মাঝরাতে একটা কাঁপা কাঁপা আলোকে এই জঙ্গলের ভেতর নড়েচড়ে বেড়াতে দেখত।

পুলিশ বলল, এ ছেলেটাকে কোথা থেকে ধরে এনেছিস বল? পাচার করার মতলব?

সব লোক চেঁচাতে লাগল, শালা, ছেলেধরাকে মারো।

খেপে গেছে তখন লোকগুলো। মারপিট শুরু হয়ে গেল। পুলিশ রুখতে পারে না। মেয়েটার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল কেউ।

অর্জুনা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, অকে (ওকে) ছাড়ি দও, আমি নিজে আসছি।

কারও কানে তখন ওর কথা পৌঁছোল না।

ও সেখান থেকে একছুটে পালিয়ে এল দূরে। ছড়ানো ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে দমাদম ছুড়তে লাগল লোকগুলোর দিকে।

ব্যস, কিছুক্ষণের ভেতরেই সব ফাঁকা। শেষে পুলিশগুলো ওই মেয়ে আর পুরুষটাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল পারঘাটের দিকে।

গল্পের শেষে অর্জুনা বলল, খোকাবাবু, আর কুনদিন আমি সউ (সেই) চুড়িউলিকে মুলদা গেরামে দেখিনি। আমাকে বড় আদর করি রাতে রুটি, তরকারি খাবাইছিল।

এমনি করে অর্জুনা তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বলে যায়, আর আশ্চর্য মুগ্ধতায় সেগুলো উপভোগ করে কিশোর অমল।

অর্জুন কাকার জন্য অমলের মনটা টনটন করে ওঠে। এমন একটা মানুষ কী করে যে খুন করতে পারে তা সে কিছুতেই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

একদিন শৈল এল অর্জুনার সঙ্গে দেখা করতে। অনিন্দ্যবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর অজ্জুনদার সঙ্গে এই তার প্রথম দেখা।

কেষ্টহরি গাঁয়ে রটিয়ে বেড়িয়েছে, শালা অর্জুনার যে ফাঁসি হয়নি সেটা বড় ভাল হিছে (হয়েছে)। প্রত্যেক দিন জেলখানায় শালাকে লুহার গরাদে বাঁধি, গুনি গুনি পঞ্চাশ ঘা কাঁটার জুতা মারে। অজ্ঞান হি গেলে ঘরের ভিতরে ছুড়ি ফেলি দেয়।

শ্রোতারা শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করে, জ্ঞান ফিরে কী করিকি?

কেষ্টহরি একটি বিশেষ জলীয় পদার্থের নাম করে বলে, ওই বস্তুটি সেপাইরা ওর চোখে মুখে ছড়িয়ে দিলেই ওর মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়।

অর্জুনার এই পরিণতির কথা শুনে আতঙ্কিত হয় মুলদা গ্রামের সকল নারীপুরুষ। সারারাত জেগে শৈল শুধু চোখের জল ফেলে। হায়! হায়! অজ্জুনদা বাঁচি থাকিও নরকভোগ করছে।

কেউ কোনওদিন দেখা করতে আসেনি অর্জুনার সঙ্গে। বাইরের বিশাল পৃথিবী আর তার ভেতর যে কোনওরকম একটা যোগাযোগ থাকতে পারে, সেকথা সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। ওয়ার্ডারের মুখে শৈলর নাম শুনে সে চমকে উঠল।

কত কষ্ট স্বীকার করে যে শৈল তার কাছে এসেছে তা বলার নয়। নদীনালা পেরিয়ে, হাট-মাঠ-ঘাট হেঁটে সে এসে পৌঁছেছে মহকুমা শহরে। সেখানে লোকজনকে জিগেস করে উঠেছে জেলা সদরে যাবার বাসে।

রাত হয়ে গিয়েছিল তার সদরে পৌঁছোতে। পথে পথে ঘুরে কাটিয়েছে অনেক রাত অব্দি। শেষে একটা বড় বাড়ির সদর দরজা বন্ধ হতেই সে বাড়িটার রোয়াকে আশ্রয় নিয়েছে।

গভীর রাতে একটা মাতালের চিৎকারে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসেছিল সে। মাতালটা তার কাছে এসে বলেছিল, কিচ্ছু ভয় নেই জননী, যতক্ষণ এ শর্মা আছে, ততক্ষণ কোনও শালা লোচ্চা তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।

তিন-চার বার চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে এই কথাটা ঘোষণা করে লোকটি চলে গিয়েছিল। তারপর বাকি রাতটুকু শৈল আর ঘুমোতে পারেনি।

অজ্জুনদার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই শৈল ডুকরে কেঁদে উঠল। অর্জুনা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুই কাঁদছু কেনি শৈল, তোর অজ্জুনদা ত মরি যায়নি।

শৈল আকুল হয়ে বলল, আমার লাগি খুন করল তুমি, সুধ্না পাশে আমার নেই রইলে কবি (কবে) গলায় কলসি বাঁধি মরতি।

নিজেকে দোষী ভাবছু কেনি শৈল, তুই তো সতী লক্ষ্মী। বদী বুড়া বলে, রাজার দোষে প্রজা মরে।

এবার শৈল তার অজ্জুনদার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল, কোথাও জুতোর কাঁটার চিহ্ন দেখা যায় কিনা।

কী দেখতেছিস অমন করি?

তুমাকে নাকি হরদিন (প্রতিদিন) জুতা মারে? কাঁটার জুতা?

কথাটা বলতে গলাটা কান্নায় বুজে এল তার।

অর্জুনা অবাক হয়ে বলল, কে কইছে তোকে এ কথা? আমাকে জুতা মারবে কেনি?

শৈল বলল, কেষ্টহরি সারা গেরামের লোককে বলি বেড়াইছে।

শালা কউ (বলুক), ভগবান একদিন তাকে মুখের মতো জবাব দিবে।

শৈল এবার বলল, সত্যি করি কও তুমি কেমন আছ?

অর্জুনা বলল, আমার চেহারাপত্তর কেমন দেখছু?

জেলে প্রথম দেখাতেই অর্জুনদার চেহারা শৈলর ভাল লেগেছিল। সে এক কথায় উত্তর দিল, যত্তন (সুন্দর)।

এবার গলাটা ভারী হয়ে উঠল অর্জুনার। সে বলল, খাবা-পরার ভাবনা নেই শৈল, খালি সুধ্না আর তোর জন্যি মন কাঁদে।

কথা শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল শৈল।

অর্জুনা বলল, সুধ্নাকে সঙ্গে লি (নিয়ে) আইলুনি কেনি?

মটরে দুজনের অনেক পইসা লাগবে অজ্জুনদা। তার উপরে বিয়ান (বাচ্চা দিয়েছে) গোরু আছে ঘরে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অর্জুনা বলে, চণ্ডীমা তাকে ভাল রাখু।

শৈলর মনে এলেও সে মুখে বলতে পারল না, সুধ্নাকে সক্কলে খুনির ব্যাটা বলে খ্যাপায়।

শৈল বলল, আমি তুমার টকাকে (ছেলেকে) বুকে করি রাখছি অজ্জুনদা।

সে আমি জানিরে। আমি অকে জন্ম দিলে কী হবে, তুই পেটে নেই ধরলেও, তুই অর (ওর) আসল মা।

সুখদুঃখের অনেক কথা হয় দু'জনের। ঘণ্টা বাজিয়ে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হয়, সময় হয়ে গেছে, চলে যেতে হবে।

অর্জুনা জেলার সাহেবের ছেলেটির কথা বলতে ভোলেনি শৈলকে। ছেলের নামটিও শোনা হয়ে গেছে শৈলর, অমলকান্তি রায়। ছেলেটিকে একবার চোখের দেখা দেখতে পেল না বলে ভারী আপশোস থেকে গেল শৈলর।

সারাপথ যেতে যেতে সে অমলের কথা ভাবতে লাগল। যে ছেলে তার অজ্জুনদাকে ভালবাসে, সে তো সনার চাঁদ।

একদিন জেলার সাহেবের কোয়ার্টারে আনন্দ-কলরব শুনে কাজের মাঝে ফিরে তাকাল অর্জুনা।

সেদিন শনিবার। স্কুলে হাফছুটি। অনেকগুলি ছেলে অমলকে ঘিরে হইচই লাগিয়েছে।

একটু পরে ভেতর থেকে ডাক এল। ছেলেদের নিয়ে অমল ভেতরে চলে গেল। অর্জুনা এবার কাজে মন দিয়েছে। আচমকা পেছন থেকে অমল তার গায়ে হাত রাখল।

অর্জুনা ফিরে একমুখ হেসে বলল, আজ কুনও পরব বলি মনে হইছে।

অমল বলল, আমার জন্মদিন। তোমার নেমন্তন্ন, তুমি এখানে থেকো অর্জুন কাকা, আমি আবার আসব।

জন্মদিন বলে কোনও উৎসব আছে তা সে জানে না। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কাউকে যে কিছু দিতে হয়, তাও অর্জুনার অজানা। তবু তার মন বলল, আজ খোকাবাবু এলে তার হাতে কিছু তুলে দিতে হবে।

মালীকে অর্জুনা ফুলের তোড়া বেঁধে সাহেবের কোয়ার্টারে দিয়ে আসতে দেখেছে। তার কাছে তোড়া বাঁধার কোনও জিনিসই ছিল না। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডালপাতাসমেত একটি আধফোটা গোলাপ ফুল তুলল। সেই ফুলটি হাতে নিয়ে সে বসে রইল অমলের প্রতীক্ষায়।

কোয়ার্টারের ভেতর থেকে অবোধ্য একটা ভাষায় ছেলেরা একসঙ্গে সুর করে বলছে, 'হ্যাপি বার্থডে টু ইউ'।

কতক্ষণ ফুলটি হাতে নিয়ে বসে রইল অর্জুনা, কিন্তু অমল তার কাছে এল না। কাজ শেষের ঘণ্টা পড়ল। ওয়ার্ডার তাড়া দিয়ে ওকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। জীবনে কোনও ব্যাপারে এতটা বিষণ্ণ সে কোনওদিন হয়নি।

পরের দিন সে কোপান মাটির ঢেলাগুলো নিয়ে আপনমনে নাড়াচাড়া করছিল, এমন সময় অমল এসে তার পাশে দাঁড়াল।

অর্জুন কাকা, এসো আমার সঙ্গে।

ওরা দু'জনে কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় গিয়ে বসল। অমল সঙ্গে একটা খাবারের প্যাকেট এনেছিল। সেটা খুলে সে অনেক রকমের খাবার বের করল।

অর্জুনা অবাক হয়ে বলল, এসব কী খোকাবাবু?

আমার জন্মদিনের খাবার অর্জুন কাকা। কাল আমি তোমাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলাম কিন্তু আসতে পারিনি, তুমি কিছু মনে কোরো না কাকা।

অর্জুনা বলল, তোমার বন্ধুরা আসছিল, তুমি সময় পাব কী করি!

অমল সোজাসুজি বলল, না, সেকথা নয়। মা-বাবা তোমাকে কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে বারণ করল। কয়েদিদের নাকি জেলার সাহেবের কোয়ার্টারে যাবার নিয়ম নেই।

এ কথার আর কী উত্তর দেবে অর্জুনা, সে নিরুত্তরে বসে রইল।

এবার অমল একটি কেক হাতে তুলে তার অর্জুন কাকার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, খেতে খুব ভাল, তুমি খাও।

অর্জুনা কেকটা হাতে নিয়ে বলল, সকালে টিফিন খাইছ তো খোকাবাবু?

অমল মাথা নেড়ে জানাল, সে টিফিন খায়নি।

অর্জুনা আবার বলল, এত বেলা হিল টিফিন খাওনি কেনি গো!

অমল মৃদু হেসে বলল, বাবা-মার ওপর রাগ করে আমি কাল থেকে কিছু খাইনি।

কেকে কামড় দিতে গিয়েও থেমে গেল অর্জুনা।

সেকী! কালনু না খাই আছ?

অমল বলল, তোমাকে আমি আমার জন্মদিনের খাবার খাওয়াতে পারিনি, তাই আমিও খাইনি। বাবা-মা সাধাসাধি করেছিল কিন্তু আমাকে খাওয়াতে পারেনি। আমি বলেছিলাম, তোমাকে না খাইয়ে আমি খাব না। তাই আজ সকালে তোমার জন্য খাবার এনেছি।

এত বড় মানুষটার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। সে বাঁ হাত দিয়ে সে জল মুছে বলল, তুমি অত ভাল খোকাবাবু! মা চণ্ডী তুমাকে কিরপা করবে। কিন্তু তুমি মুখে কিছু নাই দিলে আমি কিছু মুখে তুলি পারবনি।

অমল বলল, কী দেবে তুমি আমার হাতে তুলে দাও কাকা।

অর্জুনা তার হাতের কেকটা নামিয়ে রেখে একটা সন্দেশ অমলের মুখের কাছে তুলে ধরে বলল, এটা খাও বাবা।

অর্জুনা অমলকে নিজের হাতে মিষ্টি আর কেক খাইয়ে দিতে লাগল। আশ্চর্য একটা ছবি বার বার সে দেখতে পেল অমলের মুখে। সুধ্না পরম তৃপ্তিতে খাচ্ছে আর সে তাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছে।

অমল বলল, আমি আর একটুও খাব না, আমাকে সব খাইয়ে দিলে তুমি কী খাবে?

সেই বালক সুধ্নার মুখ! সেই তার না খাবার আর্জি।

এবার অমলের পীড়াপীড়িতে অর্জুনা খেল। জীবনে খেতে গিয়ে খাবারের এমন স্বাদ সে আর কোনওদিন পায়নি।

অনিন্দ্যবাবু মুলদা চকে একটা পাঠশালা খুলে দিয়েছেন। জমিদারি সেরেস্তা থেকে পণ্ডিতমশায়ের মাহিনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। তবু ছেলেদেরও কিছু দিতে হয়। মাস গেলে মাথা পিছু দুটি পয়সা মাত্র। পণ্ডিতমশায় ব্রাহ্মণ। ভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছেন। চাল আর আনাজপাতির জন্য তাঁকে ভাবতে হয় না, গাঁয়ের মানুষজন এসব তাঁকে জুগিয়ে যায়।

নানা জাতের ছেলে পড়ে পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালায়। সকলকে সমানভাবে বিদ্যাদান করেন তিনি।

পড়ন্ত বেলায় ছেলেদের নামতার ডাকে গ্রামের আকাশে বাতাসে অদ্ভুত একটা সুরের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। সেই শব্দের সঙ্গে মিশে যায় নীড়ে ফেরা পাখিদের অবিশ্রান্ত কুজন।

অনিন্দ্যবাবু একবার তাঁর এই প্রতিষ্ঠিত পাঠশালার প্রাঙ্গণে এসে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। গান্ধীজি বলেছেন, জাতপাতের বিভেদ ঘোচাতে হবে। সব মানুষই সমান। হরিজনের জন্য খুলে দিতে হবে মন্দিরের দ্বার।

অনিন্দ্যবাবু চলে যাওয়া মাত্র যথারীতি শুরু হয়ে গেল জাতপাতের বিচার।

দুলে, বাগদি আর চাষিদের ছেলেরা আলাদা আলাদা সারিতে চাটাই নিয়ে বসত। প্রত্যেক জাতের ছেলেদের জন্য একটি করে জলের কলসির ব্যবস্থা পণ্ডিতমশায় করে দিয়েছিলেন। নিজের জন্য থাকত আলাদা একটি কলসি।

একদিন পাঠশালার দরজা খুলে পণ্ডিতমশায় আঁতকে উঠলেন, সারা ঘর জলে জলময়! কে সব কটা কলসিকে উপুড় করে জল ঢেলে রেখে গেছে। কলসিগুলো একসঙ্গে জড়ো করা।

পণ্ডিতমশায় চেঁচিয়ে উঠলেন, কোন হারামজাদার এ কাজ?

সবাই চুপ। একজন বলল, সুধ্নাকে সে কাল সন্ধ্যায় পাঠশালার চারদিকে ঘুরঘুর করতে দেখেছে।

পণ্ডিতমশায়ের এবার চোখ পড়ল, কাঠের জানালার দু'-দুটো গরাদ ভাঙা।

হুংকার দিয়ে উঠলেন, সে হারামজাদাটা কই রে?

সুধ্‌না তখন সে তল্লাটে নেই। পুবের জলায় সে গলাজলে গা ডুবিয়ে কইনাড়ি (শালুক) টেনে তুলছে।

সুধ্‌নার বিরামহীন উৎপাতে মুলদা গ্রামের জীবন উঠেছে অস্থির হয়ে। পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে।

মাসি কেঁদেকেটে বলেছিল, তুই কি কুনদিন শান্ত হবিনি সুধ্‌না?

কেন মাসি, আমি তো কার খেতি করিনি।

মাসি রেগে উঠে বলল, খেতি করুনি কীরকম? পাঠশালায় কলসির জল ঢালি দিল কে?

অতি সহজে উত্তর করল সুধ্‌না, আমি।

তাহলে খেতিটা তুই করলু না অন্য কো (কেউ)?

এবার সুধ্‌না বলল, অনিন্দ্যবাবু তো বলি গেলেন, জাতপাত বলি কিছু নাই, তবে আলাদা কলসিগুলা কেন শুনি?

রেগে উঠল মাসি, তোর কী, সে ভাবনা ভাববে পণ্ডিতমশায়।

অদ্ভুত ছেলে সুধ্‌না। খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, তাহিলে তো সব জেতের জন্যি আলাদা আলাদা পুখুর কাটতে হবে গো মাসি।

আর একদিন অনিন্দ্যবাবুর পরিচিত উদ্যমশীল দুটি শিকারি মফস্বল টাউন থেকে মুলদায় পাখি শিকার করতে এসেছিলেন। তাঁরা কালিনগর থেকে নৌকোভাড়া করে এসেছিলেন মুলদায়। পুরাতন জঙ্গলের যে কটি প্রাচীন গাছ অবশিষ্ট ছিল সেখানে শত শত পাখি বাসা বেঁধে থাকত। বড় বড় জলায় বালিহাঁস ভেসে বেড়াত, সারস মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকত জলার ধারে।

কদিন বন্দুকের গুলির শব্দে, ঝাঁক ঝাঁক পাখির আর্তস্বরে আকাশে উড়ে চলার শব্দে সারা মুলদা গাঁ খানা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল!

এই একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্য গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেই নাওয়া-খাওয়া ভুলে শিকারিদের পেছন পেছন ঘুরে চলল। পাঠশালায় ছাত্র নেই। ঘরে কিংবা মাঠে কাজের লোকের দেখা নেই। বিরাট একটা উৎসব যেন লেগে গেছে সারা গ্রামখানা জুড়ে।

আশ্চর্য! দলে কিন্তু একদিনের জন্যেও কেউ দেখেনি সুধ্‌নাকে। সে তখন পশ্চিম দিকমুখো বাঁধটার আড়ালে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আর পাখিদের কী করে মুক্তি দেওয়া যায় সেকথা ভাবছিল।

পরের দিন সারা গ্রামে হইচই পড়ে গেল, শিকারিদের দুটো বন্দুকই খোয়া গেছে। যে নৌকোটা শিকারিদের নিয়ে এসেছিল সে নৌকোটাও খালে নেই। কোথায় কে টেনে নিয়ে পালিয়েছে।

লব সাউ পশ্চিমা লগ্‌দিকে (দরোয়ান) সঙ্গে নিয়ে ছুটল সুধ্‌নার বাড়ি। শৈল দাওয়ায় বসেছিল। লব হেঁকে বলল, সুধ্‌নাকে ডাকি দে, ব্যাটা বন্দুক চুরি করছে।

শৈল একটুও ভয় না পেয়ে বলল. সে ঘরে নেই।

লব আরও জোর আস্ফালন করে বলল, আমি তোর ঘর দেখব। ভাল চাউ (চাস) তো বন্দুক বার করি দে, নাইলে মাথা ফাটাফাটি হই যাবে।

এবারও ভয়ের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না শৈলর চোখে-মুখে। সে অনুত্তেজিত গলায় বলল, খুঁজি দেখো না আমার ঘর, বন্দুক পাইলে লি যাও।

ওরা সদর্পে ঘরে ঢুকে হাঁড়িকুঁড়ি নাড়াচাড়া করল, চালের বাঁশে লাঠি পিটল কিন্তু লুকোনো বন্দুকের হদিস পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যার দিকে খবর এল, খলাচাঁটির ট্যাঁকে একটা নাশিখালের ভেতর কে নৌকোটাকে ঢুকিয়ে রেখে গেছে। নৌকোর খোলে পড়ে আছে দুটো বন্দুক, হারিয়ে যাওয়া টোটাগুলোর কোনও হদিস নেই।

শিকারিরা ফিরে গেল। তার চার-পাঁচ দিন পরে গাঁয়ে হাজির হল সুধ্‌না।

কেষ্টহরির শাসানি, বক্‌সী লব সাউর তড়পানিকে সে আমলই দিল না।

মাসি সুধ্‌নাকে কাছে ডেকে ক্ষোভের সঙ্গে বলল, তোর জ্বালায় কি আমি গেরামে মুখ দেখিতে পারবনি সুধ্‌না। তোর বাপ কুনদিন ঘরে ফিরি আইলে তাকে কী জবাব দিব আমি?

হাড় জ্বলে-যাওয়া হাসি সুধ্‌নার মুখে। সে বলল, আমি কি কারও খাই মাসি! কারও ধার সুধ্‌না ধারেনি। নাই বা দেখিল (দেখালে) গেরামের লোককে মুখ। আর বাপের কথা কী কও? বাপ ফিরি আইলে কইব, খুনির ব্যাটা খুনি হইছে।

সুধ্‌নার দিকে তেড়ে যায় শৈল। বাপকে খুনি কইতে তোর লজ্জা হয়নি। জানি রাখ তোর বাপের মতো মনিষ এ পিথিমীতে (পৃথিবী) খুঁজি পাবিনি।

সুধ্‌না মাসির দিকে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, সত্যি নাকি গো মাসি, আমার বাপ অত বড় একটা মনিষ?

শৈল সুধনার কথার কোনও জবাব দিতে পারে না, সে শুধু তার চোখের জলে ধুইয়ে দেয় সুধ্‌নার জট-পড়া, ধুলোভরা মাথাটা।

অনিন্দ্যবাবুরা গান্ধীজির জয়ধ্বনির সঙ্গে মহাসমারোহে যাকে একদিন চারটে দেওয়ালের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই মূঢ় মানুষটার একবারও খোঁজ নেবার অবসর হয়নি তাঁদের।

জেলের ঘড়িতে ঘণ্টাগুলো পর পর বেজে গেছে, দিনগুলো গড়িয়ে গেছে মাসে, মাসগুলো বছরকে পূর্ণ করে তুলেছে। এমনি করে কেটে গেছে কতকগুলো বছর। জেলের ভেতরে কৃষ্ণচূড়া গাছটার পাতা ঝরেছে আর ফুল ফুটেছে কতবার। অর্জুনার রক্তে সেই যে ভরা কোটালের বান ডাকত তাতে কখন যে ভাটার টান ধরেছে তা সে নিজেই জানতে পারেনি। মাথার চুলে ধীরে ধীরে পাক ধরল তার। চারণভূমিতে দাপিয়ে বেড়ানো একটা বলদকে হঠাৎ ধরে বেঁধে জুড়ে দেওয়া হল হালে। সেই যে সে বাঁধা পথে সংসারের খেতে ঘুরে চলেছে তার থেকে আর মুক্তি নেই। কী করে যে এ জীবন সয়ে গেল তার তা সে নিজেই বুঝতে পারল না।

চলমান কালের যাত্রায় অর্জুনার চোখের সামনে কত যে পরিবর্তন ঘটে গেল তার লেখাজোখা নেই। কিশোর অমলকান্তি নামকরা আইনজ্ঞ হয়েছে। জেলা কোর্টের বারে যোগ দিয়েছে সে। বাবার কোয়ার্টার থেকেই সে রোজ যাওয়া আসা করছে কোর্টে। অর্জুনার সঙ্গে দেখা হলেই ব্যস্ত অমলকান্তি বলে ওঠে, অর্জুন কাকা, দেখো এবার আমি ঠিক তোমাকে জেল থেকে বের করে আনব।

অর্জুনা হেসে বলে, জেল থিকে বার করি দিলে আমি তুমাকে কেমন করি আর দেখতে পাব খোকাবাবু?

দুজনের পরিহাসের ভেতরে কর্মব্যস্ত অমলকান্তি কোর্টের পথে ছুটে চলে যায়।

অর্জুনা অমলকান্তির চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে থাকে। অপূর্বসুন্দর এই যুবাপুরুষটিকে সে কিশোর অবস্থা থেকে যৌবনে পদার্পণ করতে দেখল। অমলকান্তির কথা ভাবতে ভাবতে সে চলে যায় পথ-প্রান্তর পেরিয়ে একটি অজ পাড়াগাঁয়ে। সেখানে অমলকান্তির প্রায় সমবয়সি একটি যুবক তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। শ্যামলা রং, হালধরা, দাঁড়টানা শক্ত হাতের পেশি। যুবকটি অপরিচিত মানুষটিকে চিনতে পারে না। সে বলে, কোথা থিকে আসছ? কার দর্‌কে (বাড়ি) যাব?

অর্জুনা একটি কথারও উত্তর দিতে পারল না। সে শুধু যুবকটির মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তার মন বলতে লাগল, সুধ্‌না তোকে কি আমি ভুলি পারি রে বাবা। তোর গলায় আইজও বাঁধা আছে কালা (কালো) কারে ফুটা পইসাটা।

জালপাই অঞ্চলে বন্যার ভারী প্রকোপ। এক-দু'-বছর অন্তর অন্তর মাঠঘাট, ফসল, বাগান গিলে খেতে খেতে অজগরের মতো বন্যার ঢেউগুলো এগিয়ে আসে। এবারও কেলেঘাই নদীর বাঁধ ভেঙে বারচৌকা ডুবিয়ে বান ঢুকে পড়েছে গ্রামগুলোর ভেতর। উত্তর-দক্ষিণকে পৃথক করে পুব-পশ্চিমে চলে গেছে লোকাল বোর্ডের উঁচু বাঁধটা। জলের ঢল প্লাবিত করেছে উত্তরের চাষের জমিগুলো। মাটির বাড়িগুলো ধসে পড়েছে জলের তোড়ে। দক্ষিণ প্রান্তে চাষের মাঠের পরেই নদী। দক্ষিণ দিকটা ভিন্ন গ্রামের এলাকা। ওদিকের জমি ক্রমশ ঢালু হয়ে নদীর দিকে নেমে গেছে।

এবার এই বন্যা নিয়ে ভয়ংকর একটা দাঙ্গা বেধে গেল। উত্তর দিকে বাঁধের গায়ের জল থই থই। উত্তরের মানুষজন বাঁধ কাটিয়ে উত্তরের জল দক্ষিণে বের করে দিতে চায়, তাহলে দাঁড়িয়ে থাকা জল খুব তাড়াতাড়ি নদীতে চলে যেতে পারবে। দক্ষিণের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু দক্ষিণের মানুষ তা হতে দেবে না।

বৃষ্টির ভেতর দিনেরাতে পাহারা চলেছে। এপারে খেতের ফসল নষ্ট হবার যোগাড়। কিন্তু সাহস করে বাঁধ কাটবে কে? দক্ষিণের পাহারাদাররা ঘুরছে।

সুধ্‌না গাঁয়ের লোকেদের বলল, বাঁধ কাটিতে না পারলে না-খাই মরতে হবে। তার চাইতে লড়াই করি মরা ভাল। চল, আজই রাতে বাঁধ কাটাই।

রাতে বিশ-পঞ্চাশখানা কোদাল বাঁধের মাটি কুপিয়ে তুলতে লাগল। হইহই করে দক্ষিণের লোকেরা এগিয়ে আসতে লাগল পিছল রাস্তার ওপর দিয়ে। কেউ পিছলে পড়ল, কেউ বা কাদার ওপর লাঠি গেঁথে গেঁথে এগিয়ে গেল কাটানের জায়গাটার পাশে।

লড়াই বেধে গেল দু'পক্ষে। আলো নেই। গলার স্বরেই শুধু চেনা যায় স্বপক্ষের লোককে। সুধ্‌না একাই একশো।

অর্জুননগর থেকে লেঠেল নিয়ে এসেছিল দক্ষিণের লোকেরা। সুধ্‌না এতগুলো লোককে ঠেকিয়ে রাখল তার লাঠির দাপটে। ক'জনের যে হাত, পা, মাথা ভাঙল অন্ধকারে তা ঠাওর করা গেল না। আকাশে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছে বিদ্যুৎ। ঝকঝক করে উঠছে বন্যার

জল। সুধ্‌নার হাতের লাঠিতেও সেই বিদ্যুতের ঝিলিক। মেঘের গর্জনে, আহতের আর্তনাদে জায়গাটা মস্তবড় একটা রণভূমি বলে মনে হতে লাগল।

ক্লান্ত সুধ্‌না চিৎকার করে বলল, বাঁধকাটা হিল গো...।

সেই অন্ধকারে কেউ কোনও উত্তর দিল না। মুলদা গ্রামের প্রায় সকলেই শেষ মুহূর্তে সরে পড়েছে।

আবার বিদ্যুতের ঝিলিক। কাটান দিয়ে জল বাঁধের দক্ষিণ কিনারে এসে গেছে। লাফ দিয়ে একটা পড়ে থাকা কোদাল হাতে তুলে নিয়ে সুধ্‌না শেষ দু'-চারটে কোপ লাগিয়ে দিতেই বাঘের মতো বিপুল বিক্রমে উত্তরের জল ঝাঁপিয়ে পড়ল দক্ষিণের মাঠে।

লাঠির প্রবল একটা আঘাত এসে পড়ল সুধ্‌নার হাতের ওপর।

করাত দিয়ে কাটার মতো বন্যার জল তখন বাঁধটাকে ওপর থেকে নীচ অবধি এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। জলটা গিয়ে পড়ছে দক্ষিণের মাঠে, আবার মাঠের জল একটা নাশিখাল দিয়ে বিপুল গর্জনে বয়ে চলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাঁউসির গাঙে।

অন্ধকারে কাদাজলে মাখামাখি হয়ে প্রায় অচেতন অবস্থায় কতক্ষণ নাশিখালের ধারে পড়ে রইল সুধ্‌না। যখন ধীরে ধীরে তার চেতনা ফিরে এল তখন ক্ষীণ একটা স্বর জলের তরঙ্গের ওপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভেসে এল তার কানে। কে যেন তারই নাম ধরে ডাকছে, সু-ধ্-না...সু-ধ্-না...।

সুধ্‌না উঠে দাঁড়াল। বাঁ হাত আর কাঁধ আঘাতের ফলে প্রায় অবশ হয়ে গেছে। সে বাঁধের কাদামাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে উঠে এল বাঁধের ওপর। তখনও বন্যার জল গোঁ গোঁ শব্দ করে ঢুকছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। সে হামা দিয়ে তার গ্রামের দিকে নেমে এল।

এরই ভেতর জল অনেকখানি নেমে গেছে। সে প্রায় হাঁটুজল ভেঙে তার ঘরের দিকে এগোতে লাগল। গাঁয়ের রাস্তা ডুবে গেছে, আন্দাজে জল ঠেলে ঠেলে চলেছে সে। মাঝপথে বাজপড়া একটা বটগাছ পড়ল। সে গাছটা দু'-ফাঁক হয়ে গিয়েও বিপুল প্রাণের শক্তিতে বেঁচে আছে। তারই পাশ দিয়ে জেগে উঠেছে আর একটা তরুণ বটগাছ। সেই বটগাছের মোটা শেকড়ওয়ালা উঁচু একটা গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সুধ্‌নার নাম ধরে ডাকছে তার মাসি। কান্নাভেজা কাঁপা কাঁপা গলাটা করুণ আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে।

এই যে আমি মাসি, বলে সুধ্‌না মাসিকে জড়িয়ে ধরল। দু'জনে সেই অন্ধকারে জল ভেঙে গিয়ে উঠল আধভাঙা, চালাবসা একটা বাড়িতে।

হাতের কাছে কোনও ওষুধই ছিল না। গরিব মাসি শুধু স্নেহের প্রলেপ বুলিয়ে দিতে লাগল সুধ্‌নার চোট-লাগা হাতখানাতে।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। সর্‌সর্ করে জল নেমে গেছে উঠোন থেকে অনেক নীচে। সুধ্‌না মাসিকে বলল, আমাকে গেরাম ছাড়ি কদিনের তরে বাইরে চলে যেতে হবে মাসি।

কেনি বাপ? হাতে তোর অত ব্যথা, তোকে একলা ছাড়ি দিব কী করি?

আমি গেরামে রই পারবনি। কেষ্টহরি আর লব সাউ পুলিশকে খবর দিই আনবে। তোর সুধ্‌না দাঙ্গা করছে বলি ধরিই দিবে।

মাসি অবাক হয়ে বলে, দক্ষিণ গেরামের লোকের সঙ্গে দাঙ্গা হিছে, পুলিশ লি আইলে সে

গেরামের লোক লি আইসবে, কেষ্টহরি পুলিশ লি আসবে কেনি? তুই তো আমার গেরামের হই কী দাঙ্গা করলু।

সে তুমি বুঝবনি মাসি। কেষ্টহরির চাল তুমি বুঝি পারবনি। ভোর হতি না হতি ও লবকে দক্ষিণ গেরামে পাঠি দিবে। আমাকে দংশন করার তরে তখন ভাব হবে সাপে-নেউলে।

তোর হিঁয়ালির কথা অতশত বুঝি পারিনি বাপু, তুই এ ব্যথা লিকি (নিয়ে) কাই ঘুরি ফিরবু রে বাপ।

কাদামাখা কাপড়টা কোমরে এঁটে বেঁধে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল সুধ্‌না। বলল, আমার জন্যি ভাবনা করো না মাসি, আমি ঠিক সময়ে আসি যাব।

আলো-আঁধারি ভোরে সুধ্‌না হাতে একটা লম্বা লাঠি নিয়ে জল ঠেলতে ঠেলতে উত্তরে বোরজ নদীর দিকে চলে গেল। মাসি দাঁড়িয়ে রইল করুণ চোখ মেলে।

ক'মাস দেখা নেই সুধ্‌নার। কেঁদেকেটে মাসির চোখের জল প্রায় শুকিয়ে গেছে। এদিকে বন্যার পর কাছারিবাড়ির খামারে ধান উঠেছে নামমাত্র। হাহাকার পড়ে গেছে চারদিকে। কেষ্টহরি আর লব সাউ দাদন দেওয়া ধান আর তার সুদ হিসেব করে প্রায় সবটাই তুলেছে জমিদারের খামারে। কান্নাকাটি, ওজর-আপত্তি, হাতে-পায়ে ধরেও প্রজারা মন ভেজাতে পারেনি কেষ্টহরির। অগত্যা শালুকের নাল সেদ্ধ করে খেয়েছে। মাছ মেরেছে খালে বিলে নদীতে। সে মাছ ভেজে খাবার মতো তেল নেই। মাছ পুড়িয়ে খেয়েছে সবাই। এত কষ্টেও কেষ্টহরির খামার লুঠ করেনি কেউ।

এক রাতে মুলদা গ্রামের লোকের ঘুম ভেঙে গেল একটা চিৎকারে। ডাকটা আসছিল নদীর দিক থেকে। সবাই ছুটল শব্দটা লক্ষ্য করে।

নদীর পাড়ে এসে সবাই জমায়েত হল একটা তেঁতুল গাছের তলায়। ওই জায়গাটার নাম ছিল তেঁতুলতলির খেয়াঘাট। সকলে অবাক হয়ে দেখল তেঁতুলগাছের ওপর থেকে বেহ্মদত্যির মতো একটা কী নেমে আসছে। কাছে এসে দাঁড়াতেই সবাই দেখল ভেজা একটা গামছা পরে পলাতক সুধ্‌না দাঁড়িয়ে।

সে বোরজ নদীর ট্যাঁকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই দেখ তুমরা সবাই কেষ্টহরির কীত্তিটা।

সকলে ট্যাঁকের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল, মানুষজন একটাও নেই, বড় বড় তিনটে ধান বোঝাই নৌকো দাঁড়িয়ে আছে।

হইচই পড়ে গেল আধ-খাওয়া লোকগুলোর ভেতর।

সুধ্‌না চেঁচিয়ে বলল, তুমরা যদি লুঠ করো তাউ (তাই) গোলার ধান রাতে দক্ষিণ গেরামের লোক দিয়ে লৌকা বুঝাই করি কেষ্টহরির গেরামের দিকে চলেছে।

একজন বলে উঠল, গোমস্তাবাবু কই?

সুধ্‌না ধমকের সুরে চেঁচিয়ে উঠল, সেকি মুলদা গেরামের সক্কল লোকের বাপ? তুমাদের খাবার হক ধান দেয়নি সে শালা শকুন। তুমরা মরলে সে শালা তুমাদের শুক্‌না মাংস ছিঁড়ি খাইত। সব ধান যে যার ঘরে তুলি নিই চলি যাও।

সবাই তখন মরিয়া, ঘরের দিকে ছুটল ধামা বস্তা আনতে। সূর্য মাথার ওপরে ওঠার আগেই নৌকোর ধান যে যার ঘরে উঠে গেল।

শৈল শুনল সব কথা। সে কিন্তু একমুঠো ধানও ঘরে তোলেনি। তার ঘরের ধার দিয়ে যারা চলে যাচ্ছিল ধান নিয়ে, তাদের কাছে শুনল তার বাহাদুর ছেলে সুধ্‌নার কৃতিত্বের কথা। কিন্তু সুধ্‌না এল না তার কাছে। লোকেরা বলল, যে যার দরকার মতো ধান নিজের হাতে ভাগ করি দিই সুধ্‌না কোথা চলি গেল কো (কেউ) টের পাইলনি।

পরের দিন মুলদা গ্রামে হইহই কাণ্ড। দারোগা, হাবিলদার আর সেপাইতে কাছারিবাড়ি ছয়লাপ।

কাল রাতে ধান পাচারের সময় তেঁতুলগাছের ওপরে বসে সবকিছু লক্ষ করছিল সুধ্‌না। গোলার ধান নিঃশব্দে নৌকোয় তুলে দিয়ে দক্ষিণ গেরামের লোকেরা চলে গেল। হালে একটা করে মাঝি আর লগি হাতে দাঁড়ি দাঁড়িয়েছিল। পেছনের নৌকোটায় বসেছিল লব সাউ, সামনেরটায় কেষ্টহরি। ক'দিন থেকে চারদিকে ঘুরে ঘুরে সুধ্‌না কেষ্টহরিদের মতলব আঁচ করে নিয়েছিল। দক্ষিণ গেরাম থেকেই পাকা খবরটা পেয়েছিল সে।

সুধ্‌না তেঁতুলগাছ থেকে নেমে রই রই করে ট্যাঁকের দিকে দৌড়ে যেতেই মাঝি-মাল্লারা ভয় পেয়ে লাফিয়ে দৌড়ে পালাল। লব সাউ ঝাঁপ দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ল।

কেষ্টহরি চিনতে পেরেছে সুধ্‌নাকে। সে একটা চৌকিশর হাতে উঁচিয়ে ধরে হাঁকল, আয় শালা, আইজ তোর একদিন কি আমার একদিন। অজ্জুনার বংশ এক্কেবারে নিব্বংশ করি দিব।

সে সুধ্‌নাকে লক্ষ্য করে ছুড়ল পাঁচফলাওলা চৌকিশরখানা।

বেজির মতো বিদ্যুতগতিতে শরীরটাকে সরিয়ে নিলেও পাঁচফলার একটা ফলা গেঁথে গেল সুধ্‌নার পায়ে। সে মুহূর্তে নিচু হয়ে ফলাটা টেনে বের করে ফেলে দিল। ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। আর ঠিক সেই সুযোগে একটা শাবল নিয়ে লাফ মেরে এগিয়ে এল কেষ্টহরি। পলক ফেলতে না ফেলতে সুধ্‌না তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। সে কেষ্টহরিকে লাথি মেরে ফেলে দিল জলে। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তার ওপর।

স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে দু'জনে। দম ফুরিয়ে আসছে কেষ্টহরির। কুমিরের মতো সুধ্‌না ধরল কেষ্টহরির একখানা পা। সে টানতে টানতে তাকে নিয়ে চলল গভীর জলের ভেতর।

যখন কেষ্টহরিকে ছেড়ে দিল সুধ্‌না তখন নিষ্প্রাণ নিথর কাঠের গুঁড়ির মতো তার দেহটা ভেসে গেল স্রোতের টানে বাহার গাঙের দিকে।

লব সাউ সাঁতরে উঠেছিল ওপারে। সে মরা চাঁদের আবছা আলোয় ভেসে যেতে দেখেছে কেষ্টহরিকে। সে আর দাঁড়ায়নি এক দণ্ড। মাঠঘাট চিরে সে ছুটে চলেছিল ভগবানপুর থানায় খবরটা দিতে।

পুলিশ এসে পাত্তা পায়নি আসামির। গ্রামের লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, ধমকধামক দিয়ে ফিরে গেছে থানায়।

ক'দিন জালপাতার পরে একতারপুরের বাঁশের পোলটার নীচে ধরা পড়ল সুধ্‌না। তাকে কোমরে কাছি বেঁধে গ্রাম ঘুরিয়ে চালান করে দেওয়া হল মহকুমা হাজতে।

শুধু শৈল কাঁদতে কাঁদতে চলল সুধ্‌নার পিছু পিছু।

এরপর যথারীতি আইনকানুনের পথ ধরে বাপের মতো সুধ্‌নাও হাজির হল জেলা কোর্টে খুনের আসামি হয়ে।

সুধ্‌নার এই পরিণতিতে মুলদা গাঁয়ের লোকেরা দুঃখ পেয়েছিল ঠিক, কিন্তু তারাই আবার বলাবলি করছিল, এভাবে কেষ্টহরিকে ডুবিয়ে মারা সুধ্‌নার ঠিক হয়নি।

কেসটা বড় জটিল হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণ গ্রামের লোকেরা সেই বন্যার মারপিটের পর সুধ্‌নার নামে থানায় ডায়েরি করে রেখেছিল। দুটো পুলিশ কেসই একসঙ্গে চলতে লাগল।

শৈলর সঙ্গে জেল-জীবনে এই দ্বিতীয়বার দেখা হল অর্জুনার।

প্রথম দর্শনে কেউ প্রায় কাউকে চিনতেই পারল না। দু'জনেরই মাথায় থাক থাক কাঁচাপাকা চুল। মুখের আদল অনেকখানি বদলে গেছে। তবু অর্জুনাকে চেনা অসম্ভব ছিল না। জেলের নিয়মকানুনের ভেতরে থেকে শরীরটা তার বেশ পুষ্ট, বলিষ্ঠ। কিন্তু পোড়া পেটের ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে সুধ্‌নাকে সামাল দিতে দিতে শৈলর বার্ধক্য বয়সের বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়েছিল তার রুগ্ন ক্ষয়া শরীরটায়।

প্রথমে শৈলই চিনল তার অজ্জুনদাকে। অর্জুনা কিন্তু নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, কে? কে তুমি?

শৈল লোহার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

অজ্জুনদা গো, তুমার শৈলকে তুমি আইজ চিনি পারলনি! কী পড়া কপাল করি জন্মিথিলি (জন্মগ্রহণ করেছিলাম) আমি।

অর্জুনার আবেগ তখন তার বুক ঠেলে সারা-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

কাঁদিসনি শৈল, চুপ কর্, চুপ কর্। আমি প্রায় অদ্দেক জীবন ওউ (এই) দেবালের ভিতর পচি মরি আছি, আর মানুষ নাই। আমার আর চিনা না চিনা। পাথর হই গেছিরে শৈল, পাথর!

অর্জুনার কথা শুনে শৈল আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। কান্না যেন তার থামতেই চায় না। তারপর একসময় জলভরা চোখে বুকের শেষ নিশ্বাসটুকু যেন উজাড় করে পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, তুমি যাকু (যাকে) আমার হাতে তুলি দিল, তাকু আমি আর ধরি রাখতে পারলিনি গো অজ্জুনদা।

অর্জুনা চমকে উঠে বলল, কী কইলু! কী হিছে (হয়েছে) সুধ্‌নার? সে বাঁচিবত্তি আছে তো?

শৈল আবার কেঁদে উঠল, বাঁচি আছে সে, তবে মরণ তার মাথার উপ্‌রে।

লোহার গরাদের ওপর দুহাত চেপে ধরে মহা উদ্‌বেগে অর্জুনা বলল, হিয়ালি রাখ শৈল, সুধ্‌নার কী হিছে ক? কঠিন কুনও ব্যামোয় পড়ছে? ডাগদর কি আশা ছাড়ি দিছে?

না গো না, ব্যামো হিলে তো ভাল ছিল, তার চিকিচ্ছে ছিল, কিন্তু তা লয়। কথাটা বলে শৈল হাঁপাতে লাগল।

অর্জুনা গরাদের বাইরে শৈলর হাতটা জড়িয়ে ধরল। উদ্বেগে তার গলাটা বন্ধ হয়ে আসছিল। কী হিছে ক শৈল, সত্যি করি ক?

শৈল এবার ভেঙে পড়ল, তুমার মতো সুধ্‌না খুন করি ধরা পড়ছে গো।।

আঁতকে উঠল অর্জুনা, খুন! সুধ্‌না খুন করছে!

হঁ গো হঁ, কেষ্টহরিকে সে লদীর জলে চুবিই মারছে।

বজ্জাত কেষ্টহরির মুখখানা অর্জুনা স্পষ্ট দেখতে পেল।

কতক্ষণ কোনও কথা বলতে পারল না অর্জুনা। সে শৈলর হাতটা ছেড়ে দিয়ে গরাদে মাথা ঠেকিয়ে বসে রইল মেঝেতে। একসময় কাতর গলায় বলে উঠল, হায় হায়, কত আশা

করিথিলি (করেছিলাম) সুধ্নার উপ্রে, কী কপাল আমার রে, শেষে ব্যাটাটাও আমার মতো হিল।

শৈল এবার কান্না থামিয়ে একেবারে চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল, কী দিছ তুমি তুমার ব্যাটাকে? দিছ তো খুনির ব্যাটার ছাপ। কে তাকে বাঁচতে দিল? মাঠেঘাটে কে তাকে কাজ করতে দিল? রাস্তায় বার হিলে লতুন বক্সী লব সাউ টকাছাকাকে (ছেলেপুলেকে) পাছু লাগি দিল। টকাগুলো চিৎকার করি কয়, খুনির ব্যাটা খুনি।

কপাল চাপড়ে বলতে লাগল শৈল, আমার মতন একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষের তরে তুমি খুন করি বুসল। সউ পাপের গুণাগারি দিতে হল তুমার ব্যাটাকে।

অর্জুনা বলল, আমি তোর তরে দীনু সাঁউতকে খুন করি নাই শৈল, পাপের মূল তুলি দিবার তরে খুন করছি।

শৈল বলল, তুমার ব্যাটাও ত তাউ করল। গেরামের লোকের উব্গার (উপকার) করতে গিয়া নিজে আসামি সাজল। বানের জল বাঁধ কাটি পাঁউসির গাঙে বার করি দিল সুধ্না। নিজে মার খাইল দাঙ্গায়, দুটা মাথা ফাটাইল। পাশে মুলদা গেরামের একটা লোকও দাঁড়াইলনি। বাছা আমার একলা লড়ল।

শৈল বন্যার রাতের ছবিটা কল্পনা করে আতঙ্কে আবার কেঁদে উঠল।

অর্জুনা অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই যে কইলু সুধ্না কেষ্টহরিকে জলে চুবিই মারছে, সে কি ওউ বন্যার জলে?

না গো না, ধান হয়নি এ বছর, হাহাকার পড়ি যাইছে চারুবাড়ে (চারধারে)। লৌকায় কাছারির ধান সরিইবার সময় কেষ্টহরিকে লদীর ঘাটে হাতে-নাতে ধরে সুধ্না। কেষ্টহরি তাকে চৌকিশর ছুঁড়ি মারে। টকা আমার মরি যায় আর কি। নিজের পেরাণটা বাঁচাইতে সউখানে গুলামের ব্যাটাকে চুবিই মারে। লৌকার সবু (সব) ধান বিলি করি দেয় গেরামের সক্কলকে। তবু নিমখারামগুলা একজনও সত্যি কথা বললনি সাহস করি। বদমাইশ লব সাউটার ভয়ে সব জুজু। পুলিশ আইলে সক্কলে আমার সুধ্নাকে খুনি সাব্যস্ত করল।

কপাল চাপড়ে বলল অর্জুনা, সবু ভাগ্য রে শৈল, সবু আমার ভাগ্য।

শৈল এবার জোর গলায় বলে উঠল, ভাগ্য বলি মানি নিলে চলবেনি, টকাকে যুদ্ধ করি বাঁচাইতে হবে। দোষ তো তার লয়, কাছারির সউ বদমাইশগুলার বজ্জাতি সব।

অর্জুনা নিজের মনে কী যেন ভাবল, তারপর অসহায়ের মতো বলে উঠল. আমি ইখানে বন্দি হই বুসি আছি, নিজের ব্যাটার তরে কী করতে পারি ক? আমার হাত-পা বাঁধা, কিছো করার নাই।

শৈল শক্ত হয়ে বলল, পারলে তুমি তাকে বাঁচিতে পারব, আর কো (কেউ) পারবেনি।

আমি! তুই কি স্বপন দেখছু শৈল!

না গো না। সত্যি কইছি।

হাঁ করে শৈলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে অর্জুনা। একটা অবিশ্বাস্য শক্তির হঠাৎ আবির্ভাবেব প্রতীক্ষা করতে থাকে সে।

শৈল আকুল হয়ে বলল, সুধ্নার ফাঁসি হি যাবে, কুন উকিল দিকি (দিয়ে) মকদ্দমা চালাইতে পারবনি। চুপ করল শৈল। অর্জুনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপাল ঠুকল গরাদে।

শৈল এবার তার আসল পরিকল্পনাটা শোনাল।

জেলর সাহিবের ব্যাটা অমল রায় তুমাকে কাকা বলি ডাকত না? আগুরবার যখন আইসি তখন তুমি কইথিল আমাকে।

অর্জুনা মাথা নেড়ে বলল, হঁ। অখনও সে অর্জুন কাকা বলি ডাকে।

শৈল এবার অনেক আশা বুকে নিয়ে অস্থির হয়ে বলে উঠল, তুমি অমলবাবুকে টুকু (একটু) বলি দেখো। তেনার খুব নাম শুনি আইলি সদর কোর্ট নু (থেকে)।

অর্জুনা বলল, সে আমি পারবনি বাপু। আমি কুন মুখে কইব, আমার ব্যাটাও খুনি!

শৈল প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, সুধ্না আমার খুনি লয়। সে গেরামের সক্কলকে বাঁচাইতে, আর আপনার পেরানটা রক্ষা করতে একজনকে মারছে। তাছাড়া দুষ্ট কেষ্টহরিকে মারলে যে পাপ নাই সে কথা তুমি ভাল করি জানো।

এরপর চুপচাপ কিছুক্ষণ শৈল বসে রইল। তারপর নিরুত্তাপ গলায় সে বলল, আমার সুধ্নার ফাঁসি হিলে আমি গলায় দড়ি বাঁধি মরব অর্জ্জুনদা।

ঠিক সেই সময়ে জেলের সাক্ষাৎ-শেষের ঘণ্টা বেজে উঠল।

শৈলর মুখে ফাঁসির কথা শুনে অর্জুনা তার চুলগুলো মুঠো করে চেপে ধরল। বলল, তুই যা শৈল, আমি কাল খোকাবাবুকে বলি দেখব।

সন্ধা গাঢ় হল। রাতের খাবার খেতে পারল না অর্জুনা, বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না তার।

সে দেখতে পেল যেন অমলকান্তি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সব কথা শুনে অমলকান্তি ভীষণ রেগে গেল, তাহলে দেখছি খুনির ছেলেও খুনির রক্ত বয়ে বেড়ায়।

দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল, অর্জুনা কাতর হয়ে গড়াতে লাগল মেঝের ওপর।

কিছু পরে আবার একসময় অমলকান্তিকে সে দেখতে পেল। এবার যেন খোকাবাবু তাকে সহানুভূতির সুরে বলল, ভয় কী অর্জুন কাকা, আমি তো আছি।

শেষ রাতের দিকে কখন অর্জুনার দু' চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল আর সে ভয়ংকর একটা স্বপ্ন দেখল।

ফাঁসিঘরের দরজাটা আর্তনাদের মতো একটা আওয়াজ তুলে খুলে গেল। ভারী বুটের শব্দে কাঁপতে লাগল ঘরখানা।

কয়েদি এগিয়ে এসে দাঁড়াল ফাঁসির মঞ্চের কাছাকাছি। পেছনে কয়েকজন জজ মেজিস্টরের মতো ভদ্দরলোক। বন্দুক কাঁধে সারি দিয়ে সেপাই দাঁড়িয়ে।

মুখখানা সামনের দিকে উঁচু করে তুলে রেখেছে কয়েদি। এমন একখানা মুখ কখনও দেখেনি অর্জুনা। ফাঁসির দড়ি ঝুলছে সামনে তবু ভয়ের ছোঁয়া নেই সে মুখে। মুলদা গাঁয়ে থাকার সময় বেলা শেষের একটা নরম হলুদ আলো দেখেছে অর্জুনা। সবুজ গাছগাছালির গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ত সে আলো। আজ ঠিক তেমনি একটা আলো এসে পড়েছে ওই কয়েদির মুখে। এমন নিষ্পাপ নিশ্চিন্ত একখানা মুখ এই মুহূর্তে মুছে যাবে চোখের সামনে থেকে, একথা ভাবতে গিয়ে অর্জুনার বুকখানা যেন দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে গেল।

কয়েদির পেছনে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা কী যেন বলছিল। অর্জুনার কানে যায়নি সে সব কথা। তরুণ কয়েদিটাকে দেখে দেখে তার আর আশ মিটছিল না।

হঠাৎ কে যেন অর্জুনার কানের কাছে গম্ভীর গলায় বলল, ফাঁসুড়ে, ওর মাথায় টুপিটা পরিয়ে দাও।

তারই হাতে ধরা রয়েছে মুখ ঢাকার জন্য একখানা কালো টুপি।

টুপিখানা পরাতে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ কয়েদির গলা থেকে অস্ফুট একটা স্বর বেরিয়ে এল, তুমি কষ্ট পেওনা মাসি, আমি কুনও দোষ করি নাই।

শব্দটা শুনে অর্জুনা মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেল।

ঘুম ভেঙে গেল তার। সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে ঘামে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় বুকখানা তার ভারী হয়ে উঠেছে।

হাতে কোদাল, বাগানে বসে আছে অর্জুনা। দুটো পলকবিহীন চোখে সে চেয়ে আছে জেলার সাহেবের কোয়ার্টারের দিকে। খোকাবাবু কোর্টে বেরুবে আর সে তাকে ধরে বলবে তার ছেলে সুধ্‌নার কথা।

জেলের ঘড়িতে ন'টার ঘণ্টা বাজতেই চঞ্চল হয়ে নড়েচড়ে বসল অর্জুনা। একটা রুদ্ধ আবেগ আর আতঙ্ক তাকে অস্থির করে তুলছিল।

ঠিক সাড়ে ন'টায় আইনজীবীর পোশাক পরে কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল অমলকান্তি।

এ সময় অমলকান্তি একবার তার অর্জুন কাকার পাশে এসে দাঁড়ায়। হেসে দু'-চারটে কথা বলে। তারপর চলে যায় নিজের কাজে।

রোজকার মতো অমলকান্তি এগিয়ে আসছিল অর্জুনার দিকে। অর্জুনার মনে হচ্ছিল সে-ই ছুটে গিয়ে তার খোকাবাবুর কাছে সব কথা উজাড় করে দেয়।

কিন্তু এক পাও নড়তে পারল না অর্জুনা। তাকে কে যেন টেনে বসিয়ে রেখে দিল।

একমুখ হেসে অমলকান্তি বলল, অর্জুন কাকা, চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও, তোমার জেলের মেয়াদ ফুরিয়ে এল বলে।

অর্জুনার কোনও ভাবান্তর হলো না। দু'-চোখের পেছনে মনে হল, ঘনকালো একটা মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে।

অর্জুন কাকার ভাবান্তর অমলকান্তির নজর এড়াল না। সে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কি হয়েছে তোমার অর্জুন কাকা?

অমলকান্তির স্বরে এমন একটা উত্তাপ ছিল যা অর্জুনার ভেতর জমে ওঠা মেঘটাকে চোখের জলে গড়িয়ে ঝরিয়ে দিল।

অমলকান্তি কখনও তার অর্জুন কাকাকে এমন করে আবেগে ভেঙে পড়তে দেখেনি। সে অর্জুন কাকার একখানা হাত ধরে বলল, আমি তোমার ছেলের মতো কাকা, তোমার কষ্ট আমার কাছে খুলে বলো।

চোখ মুছল অর্জুনা। কোথা থেকে অদ্ভুত একটা সাহস নেমে এল তার বুকের মধ্যে। সে বলল, টুকু (একটু) সময় দিতে হবে খোকাবাবু।

অমলকান্তি বলল, অনেক সময় আছে আমার হাতে। তোমার সব কথা শুনে আমি কোর্টে যাব।

অর্জুনা প্রথমে নিজের কথাটি বলল। সে যে অপরাধের শাস্তি প্রতিবাদ না করে মাথা পেতে

নিয়েছিল, তার পেছনে শৈলর নির্যাতনের কাহিনীটি এতদিন পরে তার খোকাবাবুর কাছে বলে গেল।

বিস্মিত, স্তম্ভিত অমলকান্তি। সে বলল, নিজের পক্ষে এত বড় যুক্তি থাকা সত্ত্বেও তুমি কেন মাথা পেতে নিয়েছিলে এতখানি শাস্তি?

অর্জুনা শুধু তার ডান হাতখানা কপালে ঠেকাল।

অমলকান্তি মহা আপশোসে তার মাথাখানা নাড়তে লাগল।

অর্জুনা বলল, খোকাবাবু, সদর কোর্টে সুধ্না বলি কুনও আসামি আসছে, তুমি জানো?

সে এক মস্ত ক্রিমিনাল। তার কেসটা কোর্টের সকলেই জানে। শুধু খুন নয়, দাঙ্গা-হাঙ্গামার অনেকগুলো অপরাধ তার মাথায়। হাঁ অর্জুন কাকা, তার কথা হঠাৎ তুমি বলছ কেন।

অর্জুনা কাতর গলায় বলল, সে হতভাগা আমার ব্যাটা।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অমলকান্তি। তারপর ধীর গলায় বলল, তার কথা তুমি সব জানো?

অর্জুনা বলল, শৈল তার সব কথা আমাকে কইছে। শৈল মায়ের মতো তাকে পালা-পুশা করছে। এখন দু'দণ্ড বুসি আমার কথা শুনো খোকাবাবু, তারপর তুমরা তাকে যে শাস্তি দিবে সে মাথা পাতি লিবে। সত্যি বিচার হই (হয়ে) ফাঁসি হয়, কুনও দুঃখ নাই।

অমলকান্তি ধৈর্যের সঙ্গে সেদিন এক কয়েদি পিতার মুখ থেকে শুনল তার আসামি পুত্রের প্রতিটি কাহিনী।

শোনা শেষ হলে অমলকান্তি বলল, আইনের পথ একেবারে সোজা নয় অর্জুন কাকা। প্রমাণ ছাড়া কিছু হবার নয়। সত্য ঘটনার পক্ষে সাক্ষী দেবার কেউ জুটবে?

অর্জুনা বলল, সে সব আমি জানিনি খোকাবাবু, আমি খালি কোর্টের ন্যায়বিচারটা চাই। তুমি আমার সুধ্নার পাশে রইলেই আমি জানি বিচারটা ঠিক হবে।

অমলকান্তি কিন্তু অর্জুনাকে কোনও আশ্বাস দিতে পারল না। সে বলল, কাকা, আমি তোমার ছেলের হয়ে লড়াই করে যাব, শুধু এটুকু কথা তোমাকে দিতে পারি। বিপক্ষ প্রমাণ না করতে পারলে ফাঁসিটা হয়ত রদ হতে পারে বলে মনে হয়। এখনই ভেঙে পোড়ো না কাকা, ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখো।

অর্জুনা বলল, খোকাবাবু, তুমি আমার ছেলে, তুমিই আমার ভগবান।

অমলকান্তি চলে গেল, সূক্ষ্ম একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তার কপালে!

প্রায় দেড় বছর কেটে গেছে। এর ভেতরে অর্জুনা জেনেছে, তার ছেলের জন্য লড়াই করছে খোকাবাবু।

একদিন সে জানতে পারল, সদাচার আর শিষ্ট জীবন-যাপনের জন্য পাঁচ বছরের কয়েদ মকুব হয়েছে তার।

অর্জুনা শৈলকে তার মুক্তির দিনে আসতে বলেছিল। সে ছাড়া এ পৃথিবীতে আপনার বলতে তার পরিচিত আর কেউ ছিল না। তাই শৈলকেই সে ফিরে যাবার দিনে সঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছিল।

জেল ফটকের বাইরে বেরিয়ে এসে সে হঠাৎ রাস্তার ধুলো মাথায় ছুঁইয়ে নিল। দেখল দিগন্তছোঁয়া নীল আকাশ, টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ভাসছে। অনেক দূর থেকে ঢাকের শব্দ তার কানে এল। পুজো এসে গেছে।

এবার অর্জুনা চারদিকে শৈলকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু কোথাও নজরে পড়ল না।

এমন সময় ভারী একটা শব্দ করে কালো রঙের পুলিশ ভ্যান জেলের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রথমেই নেমে এল দু'জন বন্দুকধারী সেপাই। ঠিক তাদের পেছনে বেরিয়ে এল শ্যামলা রঙের একটা জোয়ান ছেলে। কোমরে তার কাছি দড়ি, হাতে লোহার-হ্যান্ড কাপ। কাছি ধরে যখন তাকে জেল ফটকের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসছিল, ঠিক সেই সময় সবাইকে চম্‌কে দিয়ে একটা আর্তকণ্ঠ ভেসে উঠল, সু-ধ্‌-না, সু-ধ্‌-না-রে...

প্রথমেই কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেল অর্জুনা। দেখল শৈল ছুটে ছুটে আসছে তার সুধ্‌নার দিকে। মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে। এত দিনের ছাইচাপা একটা আগুন হঠাৎ দপ্‌ করে জ্বলে উঠল অর্জুনার মাথায়।

সে এগিয়ে গিয়ে শৈলর হাতটা ধরে বলল, কাঁদিসনি শৈল, কাঁদিসনি। ওই দেখ আমার ব্যাটা, তার গায়ে আমার রক্ত। তাউ (সেজন্য) তার শাস্তি হিল।

এবার সে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, সুধ্‌না তুই শুনি রাখ, তোর বাপ দোষীকে কুনওদিন ছাড়বেনি। পাপের মূল নিকাশ করি ছাড়ব। যদি এবার ফাঁসির দড়ি গলায় পরতি হয়, জানবু তাতেও তোর বাপের কুনও পরোয়া নাই।

●

মাসাম্মা

মাসাম্মা বসেছিল গাছের তলায়। মেঘভাঙা চাঁদের আলো গাছের ডালাপালার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে পড়ে আলপনা আঁকছিল মাটিতে। মাসাম্মা আনমনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল প্রকৃতির গড়া সেই আলপনা। মেঘের ভেতর চাঁদ ডুবে গেলে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছিল সে ছবি। আবার ফুটে উঠছিল মেঘের ওপর চাঁদ ভেসে উঠলে।

চারদিকে ঘন নিবিড় অরণ্য। আবছা আলোয় দূরের সবুজ মালভূমি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। মাসাম্মা ভাবছিল আর ভাবছিল। তার জীবনটা ঠিক যেন এই আলপনার মতো, ফুটে উঠছে আবার মুছে যাচ্ছে।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে এই সেদিনের ছবি। গভীর বনের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ ভারতের তীর্থযাত্রীরা চলেছে শ্রীশৈলমে প্রভু মল্লিকার্জুনকে পুজো দিতে। চেঞ্চুরাই আবহমানকাল থেকে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। তাদের বোঝা বয়, পথে রান্না করে খাওয়ায়, দিনরাতের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে। গভীর বনে ভয় আছে হিংস্র জন্তুর। রাত জেগে চেঞ্চুরা তীর্থযাত্রীদের পাহারা দেয়। কত অথর্ব বুড়ো মানুষদের দীর্ঘ পথ তারা বয়ে নিয়ে যায় ডুলিতে করে। পৌঁছে দেয় দেবতার মন্দিরে। কত আশীর্বাদ কুড়োয় তাদের। চেঞ্চুরা, না থাকলে এ পথে অসম্ভব হয়ে উঠত তীর্থযাত্রীদের দেবদর্শন।

সেই কোন ছোটবেলা থেকে সে মা বাবার সঙ্গে যাত্রী নিয়ে যেত শ্রীশৈলমে প্রভু মল্লিকার্জুনের মন্দিরে। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এইসব যাত্রায়। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে চলা, তাদের একটা কিছু জিনিস অথবা পুঁটুলি হাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া, তার কাছে ছিল প্রবল একটা উত্তেজনার মতো।

এক একটি পরিবারের চেঞ্চুরা বিশেষ একটি তীর্থযাত্রীর দল নিয়ে এগোতো। মাসাম্মার বাবা গুরুপ্পার খুব নাম ছিল এ কাজে। তীর্থযাত্রীরা তার সেবার মনোভাবকে খুব তারিফ করত। তারা বনে ঢোকার পর খুঁজে খুঁজে আসত তাদের বাড়িতে। বাবার সঙ্গে যে দলের আগে দেখা হয়ে যেত, তারা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করত।

গুরুপ্পা ও চন্দ্রাম্মার সংসার

বনের ভেতর মাররিপালেম অঞ্চলে গুরুপ্পাদের তিনপুরুষের বাস। চারদিকে অরণ্য, কোথাও কোথাও অরণ্য বড় গভীর। পেছনে সবুজের ছোঁয়া লাগা মালভূমি। ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের দিকে। এসব পূর্বঘাট পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে আসা পাহাড়ী অঞ্চল।

সারা বনটা যেন গুরুপ্পার দখলে। সে বনের সব অন্ধি-সন্ধির খবর রাখে। এ অঞ্চলের কোথায় ঝরনা, কোথায় কূপ সব তার নখদর্পণে।

নাল্লামালাই আর অমরাবাদ অরণ্যের ভেতর দিয়ে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের যাত্রীরা দল বেঁধে শ্রীশৈলমের মন্দিরে যায় শিবরাত্রির ব্রত উদ্যাপন করতে।

যাত্রীরা জানে বনের ভেতর চেঞ্চুদের আড্ডা। বনের ভেতর, পাহাড়ের কোলে ওদের ঘরগুলোই চিনিয়ে দেয় ওদের বসত এলাকা।

ওরা বন থেকে বাঁশ কেটে আনে, ঐ বুনো বাঁশেই তৈরি হয় ওদের ঘর। ঘরের আকারটা একটু বিচিত্র রকমের। মাঝখানে একটা মোটা বাঁশের খুঁটি থাকে, তার ওপরে কচ্ছপের পিঠের মতো কতকটা ডিম্বাকৃতি একটা চালা। সেই চালাটিকে ধরে রাখে চারদিকে বাঁশের খুঁটি। খুঁটির গায়ে গায়ে বাতা সাজিয়ে ঐ কচ্ছপের পিঠের মতো গোলাকৃতি ঘর হয়। তার একটি মাত্র দরজা থাকে। বনের থেকে কাঠ কেটে এনে তার থেকে দরজা তৈরি হয়। মেঝেটা উঁচু, পেটানো মাটির মসৃণ মেঝে। তারই ভেতর রান্না খাওয়া শোয়া। গুরুপ্পার সংসার বড় নয়। বউ চন্দ্রাম্মা আর মেয়ে মাসাম্মাকে নিয়ে তার সংসার।

চন্দ্রাম্মা উচ্ছল নয়, একটু চাপা স্বভাবের। সে অত্যন্ত সাহসী, গভীর বনের ভেতরেও একা যেতে তার ভয় নেই। বন থেকে সে একাই শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আনে। সারা শরীর দিয়ে যখন তার ঘাম ঝরে তখনও কষ্টের ছবি তার মুখের ওপর ফুটে ওঠে না। সে নীরবেই কাজ করে যায়। প্রতিবেশী মেয়েদের সঙ্গে জল আনতে গিয়ে সে অযথা হাসি গল্পে সময় কাটায় না। যতটুকু না হলে নয়, ততটুকুই কথা বলে। কালে ভদ্রে ঠোঁটে হাসির রেখা ফোটে। চন্দ্রাম্মা জলকুণ্ড থেকে জল নিয়ে চলে আসার পর প্রতিবেশিনীরা তাকে নিয়ে আলোচনায় মত্ত হয়। চন্দ্রাম্মা তা অনুমানে বুঝতে পারে কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করার মতো তার একটা মানসিকতা আছে।

পাড়াপড়শীদের সব কাজেই সে সবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানেও চুপচাপ। সব কাজ ঠাণ্ডা মেজাজে সেরে দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে ঘরে ফিরে আসে।

মহুয়া ফোটার কাল এলে শুরু হয় নাচ গান। মেয়ে পুরুষে নাচে। নাচের শেষে মহুয়ার মদ খেয়ে ফূর্তি করে। হাসির হর্‌রা ওঠে, কিছু ঢলাঢলি হয়। কিন্তু চন্দ্রাম্মা একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে গুম মেরে বসে থাকে। তাকে কেউ কখনও মাতাল অবস্থায় হাসতে দেখেনি।

একটি লোক আসে গুরুপ্পার ঘরে প্রতি মাসে একবার করে। সে দু-তিনদিন থেকে চলে যায়। আসে একটি বিশেষ চিহ্নিত দিনে, যেদিন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে।

ঐ দু'তিনটে দিন কেউ কেউ হাসতে দেখেছে চন্দ্রাম্মাকে।

লোকটা আসে চন্দ্রাম্মার বাপের বাড়ি থেকে। মাসাম্মা তাকে ডাকে মামা বলে। আসলে কিন্তু লোকটি মাসাম্মার মামা নয়। ওর মামা বেশ জোয়ান অবস্থায় বনে কাঠ কাটতে গিয়ে ময়ালের পেটে গেছে। এই ভূমানি নাগান্না লোকটি আসলে তার মামার বন্ধু। মাসাম্মা তাই ওকে মামা বলে ডাকে। ভায়ের বন্ধুর সুবাদেই চন্দ্রাম্মার বাড়িতে আসে নাগান্না।

মৌচাক ভাঙার কাজে গুরুপ্পার মতো ওস্তাদ কেউ নেই এ তল্লাটে। এই পাহাড়ী মৌচাক ভাঙা বেশ জটিল কাজ। এতে প্রায়ই দুজন মানুষের সাহায্যের দরকার হয়।

পাহাড়ের অনেকখানি উঁচুতে একটা বেরিয়ে আসা পাথরের তলায় ধরা যাক বিশাল একটা মৌচাক হয়েছে। সেই মৌচাকটা ভাঙতে হবে। একটা বাঁশের সিঁড়ির মাথায় আর নীচে শক্ত চার টুকরো দড়ি বাঁধতে হবে। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে একটা শক্ত সমর্থ লোক সিঁড়ির মাথার দড়ি দুটো টেনে ধরে রাখবে। সে সিঁড়ি ঝুলে থাকবে শূন্যে। সিঁড়ির নীচ থেকে মাটি অবধি

ঝুলবে আরও দুটো দড়ি। নীচের দুটো দড়িও ধরে থাকবে আরেকজন লোক, সে বিশেষ বলশালী না হলেও চলবে। সে শুধু নীচের দড়ি দুটো ধরে পাহাড়ের ওপরের মানুষটির নির্দেশে চলাফেরা করবে। এবার মধু সংগ্রহকারী, যে ঐ সিঁড়িতে একটা দড়ি দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছে, সে এগোবে ঐ মৌচাকের দিকে। তাকে শূন্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে ঐ ওপর আর নীচের দুটো লোক। সে শূন্যে দুলতে দুলতে ঐ মৌচাকের দিকে এগোতে থাকবে। তার পিঠে ঝুলছে একটা বাঁশের ঝাঁপি। তার ডান হাতে ধরা আছে একটা মশাল। মশালের মাথা থেকে বুলবুলিয়ে উঠছে ধোঁয়া। কাঁচা পাতার নুটিতে আগুন ধরিয়ে প্রচুর ধোঁয়া তৈরি করা হয়েছে। সেই ধোঁয়ার গন্ধ পেলেই মৌচাক ছেড়ে পালাবে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি।

মধু সংগ্রহকারীর আপাদমস্তক জড়ানো থাকবে কাপড় অথবা চটে। শুধু খোলা থাকবে চোখ দুটি। মনে হবে সে যেন কোন মানুষ নয়, অতিপ্রাকৃত জগতের কোন জীব।

ধোঁয়ার তাড়ায় মৌমাছিরা উড়ে গেলে একটা ধারালো কাঠের টুকরো দিয়ে মৌচাকটাকে খণ্ড খণ্ড করা হবে। ঐ মধুভরা টুকরোগুলোকে ভরা হবে বাঁশের ঝাঁপিতে। তারপর কাজ শেষ হলে লোকটা সিঁড়ি বেয়ে, দড়ি ধরে সরসর করে নেমে যাবে অনেক নীচে।

পাহাড়ী বনে দেখা যায় প্রচুর মৌচাক। এক একটা এলাকায় একাধিক মৌচাক গাছের কোটরে বা পাহাড়ের খাঁজে অথবা গাছের মোটা ডাল থেকে ঝুলতে দেখা যায়। চেঞ্চুদের বিশেষ বিশেষ এলাকার লোকে তাদের এলাকার মৌচাকের অধিকারী। সেখানে অন্য কোন এলাকার লোক এসে মৌচাক ভাঙতে পারবে না।

মৌচাক ভাঙার ক্ষেত্রে মধু সংগ্রহকারীর প্রাণ-ভোমরাটি রয়েছে পাহাড়ের ওপরে দড়ি ধরে থাকা ঐ লোকটির হাতে। সে যদি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক হাতের দড়ি ছেড়ে দেয় তাহলে মধুসংগ্রহকারীর মৃত্যু অবধারিত। অনেক নীচে পাথরে মাথা ঠুকে পড়ে মরবে। তাই চেঞ্চুরা সাধারণত নিজের ভাই কিংবা জ্ঞাতিগোত্রকে ওপরের দড়ি ধরার জন্যে ডাকে না। তাদের মনের ভেতরে একটা লোভ থাকতে পারে। তারা ঐ লোকটাকে নীচে ফেলে দিলে তার বিধবা বউটাকে বিয়ে করতে পারবে এবং মৃতের যা কিছু সম্পত্তি ভোগ করবে। তাই সাধারণত মধু সংগ্রহকারীরা নিজের শালাকে এই কঠিন কাজটি করার জন্য ডেকে নেয়। সে কখনো ঐ রকম কুকর্ম করে তার বোনের মাথার সিঁদুর মুছে দেবে না।

গুরুপ্পার নিজের শালা ময়ালের পেটে যাওয়ায় সে একটা যোগ্য লোকের সন্ধান করে ফেরে। যে লোকটা বিশ্বাসী হবে এবং তাকে মৌচাক ভাঙার কাজে সাহায্য করবে। এ বিষয়ে একদিন সে চন্দ্রাম্‌মার সঙ্গে পরামর্শে বসল।

কি করা যায় বল তো?

কিসের?

এই মৌচাক ভাঙার কাজে কে আমাকে সাহায্য করবে? ভরসা করা যেতে পারে এমন লোক তো চাই।

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল চন্দ্রাম্‌মা। এক সময় মরদের মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, একটা নাম মনে পড়েছে, যদি তুমি রাজি থাক তাহলে বলি।

কে সে?

আমার ভায়ের বন্ধু ভূমানি নাগান্না। তুমি আমার বাপের বাড়িতে ওকে দেখেছ।

গুরুপ্পা বলল, হাঁ হাঁ, দু তিনবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। এখানেও সে একবার এসেছিল।

ওকে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পার। যদি বল, আমি একদিন বাপের বাড়ি গিয়ে ওকে ডেকে আনব।

এ তো খুবই ভাল কথা রে।

সেই থেকে নাগান্না প্রতিমাসে পূর্ণিমায় একদিন করে গুরুপ্পার বাড়িতে আসে, ওকে মৌচাক ভাঙার কাজে সাহায্য করে, দু তিনদিন থেকে বাড়ি ফিরে যায়।

বেশ কিছুদিন ধরে এমনি নিয়মিত নাগান্না আসছে যাচ্ছে। ভাল মানুষ গুরুপ্পার মনে নাগান্না সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। বাপের বাড়ির লোককে কাছে পেয়ে চন্দ্রাম্মার মুখে হাসি ফোটে। এ দৃশ্য সরল মনে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে গুরুপ্পা।

হাঁ, তাগদ আছে বটে নাগান্নার। ওপরের দু-খানা দড়ি ধরে সে যখন পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে আর সিঁড়ির ওপর ভর করে দুলতে দুলতে এগোতে থাকে একটা জোয়ান মরদ তখন সে দৃশ্য দর্শকের চোখে সৃষ্টি করে বিপুল এক বিস্ময়। নাগান্না আর গুরুপ্পা দুজনেই তাগড়াই জোয়ান।

বেশ কয়েকবার মৌচাক ভাঙার কাজে গুরুপ্পাকে সাহায্য করেছে নাগান্না।

এই মধু সংগ্রহের কাজে প্রতিবেশীরা একমত হয়ে গুরুপ্পাকে নির্বাচন করেছে। কারণ সে চেঞ্চুদের ভেতর এ কাজে যোগ্যতম ব্যক্তি।

নাগান্না যখন আসে তখন গুরুপ্পার বাড়িতে চাঞ্চল্য দেখা যায়, হয়তো কুণ্ড থেকে জল আনতে গেছে চন্দ্রাম্মা, গুরুপ্পা মহাসমাদরে নাগান্নাকে ডেকে দাওয়ার ওপর বাঁশের চাটাইতে বসায়।

মাসাম্মাকে বলে, মামা এসেছে রে, তোর মাকে জলদি ডেকে নিয়ে আয়।

একটা খরগোশের মতো লাফাতে লাফাতে মাসাম্মা কুণ্ডের দিকে ছোটে। মা, মা মামা— উত্তেজনায় পুরো কথাটা শেষ করতে পারে না সে।

মাসাম্মা এই নতুন মামাটিকে পেয়ে একেবারে জমে গেছে। নাগান্না যখনই আসে তখনই মাসাম্মার জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসে। কোনও মেলা থেকে কপালের টিপ অথবা রেশমি চুড়ি, নিদেনপক্ষে কিছু মেঠাই।

নাগান্নাকে দূর থেকে দেখলেই, উত্তেজনায় চেঁচাতে থাকে মাসাম্মা। এটা তার নতুন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে জেগে ওঠা উচ্ছ্বাস।

মেয়ের গলায় মামা এসেছে ডাকটা বাতাসে ভেসে গেলেই চন্দ্রাম্মা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কাছে সে মনের উচ্ছ্বাসটা চেপে যায়। সে শান্তভাবে কুণ্ড থেকে জল তুলে নিয়ে ঘরের পথ ধরে। কেউ তাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখুক এটা সে চায় না। মন চঞ্চল হলেও সে ধীরে ধীরে পা ফেলে কুণ্ডের এলাকা ছাড়িয়ে চলে যায়।

কোন প্রতিবেশিনী হয়তো বলে, তাড়াতাড়ি হাঁটো, ভাই বলে কথা। সে চলার পথে ফিরে তাকিয়ে একটুকরো মৃদু হাসি উপহার দিয়ে যায়।

তার মরদ গুরুপ্‌পার সামনে নাগান্‌নাকে বসে থাকতে দেখে মনে মনে খুশিতে ভরে ওঠে কিন্তু প্রকাশ ঘটে না তার মুখের ভাবে। অবশ্য নাগান্‌নার তিনদিনের অবস্থানের ভেতর কখনও কখনও তার চোখে খুশির ঝিলিক দেখা যায়। সেই খুশিটা ধরা পড়ে গুরুপ্‌পার চোখে। সে নিজেও খুশি হয়। কোনওরকম সন্দেহের মেঘ ঘনায় না তার মনের ওপর।

অতি সাদা সরল মানুষ এই গুরুপ্‌পা। লম্বা সরল একটা বাঁশের মতো বেড়ে উঠেছে সে। তেমনি চিকন শ্যামল রং তার। বউয়ের জন্য, মেয়ের জন্য, চারদিকের মানুষজনের জন্য তার মনটা বাঁশের পাতার মতো তির্‌তির্‌ করে কাঁপতে থাকে।

তার হৃদয়টা যেন চেম্বু, বা একটা গভীর পাত্র যার ভেতরটা পূর্ণ হয়ে আছে দুধে। এই সুধা দিয়েই যেন দেবতা তার মনটাকে ভরে দিয়েছেন।

সে চন্দ্রাম্‌মাকে ডাক দিয়ে বলে, শালা কুটুম এল, তার খাওয়ার কি ব্যবস্থা রেখেছিস?

চন্দ্রাম্‌মা চোখের কোণে তাকিয়ে বলে, তুমি ঘরের মনিব, তোমারই তো ব্যবস্থা করার কথা। আসন ছেড়ে ছিটকে উঠে পড়ে গুরুপ্‌পা, ঘরের কোণ থেকে বের করে আনে তীর আর ধনুক।

চন্দ্রাম্‌মা বাধা দিয়ে বলে, রাখো তোমার বীরত্ব। তোমরা বসে বসে আড্ডা জমাও, আমি খাবার জোগাড় করে আনছি। বলতে বলতে সে বেরিয়ে যায় পাখি ধরার জাল নিয়ে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে দেখা যায় যে খালি হাতে ফেরেনি। লতায় বাঁধা দুটো পাখি ঝুলছে তার হাতে। চন্দ্রাম্‌মা শুধু পাখি ধরাতেই ওস্তাদ নয়, খরগোস, কাঠবেড়ালি সবই তার জালে এসে পড়ে।

দূর থেকে চন্দ্রাম্‌মাকে আসতে দেখে গুরুপ্‌পা চেঁচিয়ে বলে, আজ কি শিকার করে আনলি ভায়ের জন্যে?

মুখে কোনও উত্তর না দিয়ে চন্দ্রাম্‌মা দুটো হাত তুলে দেখায়। এক হাতে দুটো কবুতর আর অন্য হাতে একখণ্ড মেটে আলু।

তাই দিয়েই রাতে খাবার তৈরি হয়। বনের ভেতর সূর্য ডুবে যাবার আগেই রাতের খাবার কাজটা সেরে নেয় ওরা।

ভালবাসা যে কখন কোন ফাঁকে মনের ভেতর ঢুকে পড়ে তা আগে থেকে কেউ আঁচ করতে পারে না। এ যেন বনের গভীরে চোরা আলোর হঠাৎ ঢুকে পড়া।

একদিন একটা দৃশ্য দেখেছিল মল্‌লাম্‌মা। সে দৃশ্যটা ভালবাসার কি উপভোগের তা স্পষ্ট করে ধরা পড়ার আগেই মুছে গিয়েছিল ছবিটা।

চেঞ্চুদের একটা অলিখিত নিয়ম আছে, ঘরের ভেতর রাতে স্ত্রী পুরুষে দেহ-মিলন ঘটাবে না। বনের ভেতর দিনের বেলা কোন নিভৃত ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষের আড়ালে তারা মিলিত হবে।

মল্‌লাম্‌মা সেদিন তার মরদ গুল্‌লা টোটাইয়াকে নিয়ে নর্মলীলায় মেতেছিল। সুরত ক্রিয়া যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তখন পাশের একটা ঝোপে কিছু শুকনো পাতার ওপর কারুর পায়ের খসখসানির আওয়াজ পেল। ভালুক কিংবা বাঘ যে নয় তা সে বুঝেছিল। পায়ের আওয়াজে কোন মানুষ বলেই তার মনে হল। হয়ত তারই মতো অন্য কেউ এ বনে এসে যেতে পারে, তাই সে টোটাইয়াকে দু হাতে চেপে ধরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, আর কেউ এসেছে।

ওরা ক্ষণকালের জন্য স্থির হয়ে গেল। টোটাইয়া কোন কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু শায়িত অবস্থায় মল্লাম্মা ঝোপের ফাঁকফোকর দিয়ে ওপারের দৃশ্যটা খুব স্পষ্ট না হলেও দেখতে পাচ্ছিল। তার মনে হল, একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রীলোক ওপারে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ও চন্দ্রাম্মার মুখটাকে দেখতে পাচ্ছিল। যে পুরুষটা ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল তাকে মল্লাম্মা চিনতে পারল না। তার কেমন যেন মনে হল ঐ মানুষটা গুরুপ্পা নয়, কারণ সে একটু আগে গুরুপ্পাকে তার দাওয়ায় বসে পাখির খাঁচা তৈরি করতে দেখে এসেছে।

মল্লাম্মার মনে হয়েছিল এ লোকটা কি তাহলে ভুমানি নাগান্না, যাকে চন্দ্রাম্মা দাদা বলে পরিচয় দেয়?

এতদিনে ওরা সকলে জেনে গেছে নাগান্না ওর নিজের দাদা নয়, ভায়ের বন্ধু। গুরুপ্পার চাক ভাঙার কাজে সাহায্য করতে আসে।

কিন্তু ছবিটা স্পষ্ট হওয়ার আগে চন্দ্রাম্মারা দ্রুত পা চালিয়ে বনের বাইরে চলে গিয়েছিল।

মল্লাম্মা কিন্তু তার গভীর সন্দেহের কথাটা ফাঁস করে দেয়নি টোটাইয়ার কাছে। সে জানে টোটাইয়া পেট আল্‌গা লোক, কথাটা শোনামাত্র চাউর করে দেবে বন্ধুবান্ধবের কাছে, সারা এলাকায়। টোটাইয়া চাক ভাঙার ব্যাপারে গুরুপ্পার প্রতিদ্বন্দ্বী। এ তল্লাটের চেঞ্চুরা তাকে ফেলে গুরুপ্পাকেই মধু সংগ্রহের কাজটা দিয়েছিল, তাই গুরুপ্পার ওপরে মনে মনে রাগ ছিল টোটাইয়ার।

এসব খবর মল্লাম্মার অজানা নয়, তাই সে আজকের দৃশ্যটা মনে মনে যা বুঝল, বাইরে প্রকাশ করল না।

সাঁঝবেলায় কুণ্ডে জল আনতে গিয়ে দেখা হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রাম্মার সঙ্গে। সে তীক্ষ্ণ চোখ মেলে খুঁজছিল ওবেলার কোন ছবি চন্দ্রাম্মার মুখে চোখে ফুটে ওঠে কিনা। কিন্তু না চোখ মুখ একেবারে স্থির। দুরন্ত বাতাসের ছোঁয়ায় একটি চুলও নড়েনি, চোখের একটি পাতাও কাঁপেনি।

চন্দ্রাম্মা যখন জল নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখনও পেছন থেকে তাকে তাড়া করছিল মল্লাম্মার কৌতূহল। কে সেই পুরুষ যে তাকে আজ গভীর বনের ভেতর ভোগ করেছে। কৌতূহলটা মল্লাম্মার মগজের ভেতর থেকেই গেল, কোনওরকম সমাধানে সে পৌঁছতে পারল না।

কিছুদিন ধরে যাত্রী নিয়ে শ্রীশৈলম মন্দিরে যাওয়ার সময় নাগান্না সঙ্গ দিচ্ছে গুরুপ্পাকে। মেয়ে বউ এর সঙ্গে সেও হয়ে গেছে গুরুপ্পা পরিবারের একজন। যাত্রীদের সেবা যত্নে সেও অংশ নিচ্ছে, গুরুপ্পা আর চন্দ্রাম্মাকে সাহায্য করছে নানাভাবে।

সাপের দেবতা নাগেন্দ্র উৎসব হয় কার্তিক মাসে। চেঞ্চুদের ভেতর তিনদিন ধরে চলে এ উৎসব। মেয়েরা নানারকম পূজার উপকরণ নিয়ে একটা নির্দিষ্ট ঢিবির কাছে যায়। সে ঢিবির মাঝখানে একটা গর্ত। ঐ ঢিবিতেই সর্পদেবতা নাগেন্দ্রের বাস। মেয়েরা ঢিবির ওপরে ধূপ আর প্রদীপ জ্বেলে দেয়, দুধ আর ফলমূল রেখে দেয় গর্তের বাইরে। তাদের ধারণা সাপের দেবতা এসে তাদের ভোগ খেয়ে যাবে।

গর্তের চারদিকে সিঁদুর আর হলুদ গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, উপচার সাজিয়ে নাগ-পূজা করল

চন্দ্রাম্‌মা। আশপাশে কেউ ছিল না। চোখ বন্ধ করে করজোড়ে বসে ছিল সে। যেহেতু পুরুষেরা এ পূজায় অংশ নেয় না, সেজন্য কাছে পিঠে কোনও পুরুষ ছিল না।

সাধারণত মেয়েরা দল বেঁধে যায় কিন্তু সেদিন অসময়ে একাই গিয়েছিল চন্দ্রাম্‌মা। কিছুদূরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ওর পূজা দেখছিল নাগান্‌না। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, সর্পদেবতা গর্ত থেকে খানিকটা বেরিয়ে এসে তার ফণা দোলাচ্ছে। চোখ বন্ধ ছিল চন্দ্রাম্‌মার তাই সে দেখতে পায়নি নাগেন্দ্রকে।

একটা ভয়াবহ কিছু ঘটতে চলেছে অনুমান করেই সেদিকে ছুটল নাগান্‌না। হাতে একটা ঢিল তুলে নিয়ে অব্যর্থ লক্ষে ছুঁড়ে মারল সাপের ফণায়। সাপটা আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু ভয়ঙ্কর কিছু না। সে ছোবল না মেরে ফণা গুটিয়ে নিয়ে ঢুকে গেল গর্তের ভেতর।

চোখ বন্ধ ছিল বলে পুরো ঘটনাটা দেখতে পেল না চন্দ্রাম্‌মা। সে ঢিল পড়ার একটা শব্দ শুনে কিছু পরে ধীরে ধীরে চোখ মেলেছিল। সে দেখতে পেয়েছিল সাপের মাথাটা গর্তের ভেতর ডুবে যাচ্ছে, অমনি সে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে, নাগেন্দ্র তার পূজা গ্রহণ করেছেন।

সেদিন কিন্তু চন্দ্রাম্‌মার কাছে ঘটনাটা ভেঙে বলেনি নাগান্‌না। কারণ সে জানত, নাগ দেবতার অসম্মান সইতে পারবে না মেয়েরা। নাগান্‌না কিন্তু সেই বিভীষিকার হাত থেকে চন্দ্রাম্‌মাকে রক্ষা করতে পেরে মনে মনে গভীর নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছিল।

এমনি একটি ভালবাসার পাকে জড়িয়ে পড়েছিল দুজনে। সকলের দৃষ্টির অগোচরে এই দুটি নারী পুরুষকে যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছিল একটা অজগর।

নাগেন্দ্রের রূপ ধরে শেষ ছোবলটা মারল কিন্তু নাগান্‌না। এই দংশনটা গিয়ে পড়ল সহজ সরল বিশ্বাসে ভরপুর একটি মানুষের শিরে। সে মানুষটা অতি নির্বোধ আর নিরেট, গুরুপ্‌পা।

সেদিন পূর্ণিমার আলোয় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। এমনকি গাছের পাতাপত্র থেকে গড়িয়ে পড়ছে সে আলো মাটিতে। দোল উৎসবের দিন সেটি। জমে উঠেছে নাচগানের আসর। মাঝে মাঝে মহুয়ার মদ খেয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে পুরুষগুলো। মেয়েরা সে দৃশ্য দেখে হাসছে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছিল, তখনও কিছুটা ঘোরের ভেতর ছিল গুরুপ্‌পা। সে যেন সেই ঘোরের ভেতর থেকেই দেখল, তার স্ত্রীর অর্ধেক কাপড় কখন টেনে নিয়ে নিজের গায়ে জড়িয়েছে নাগান্‌না। রাতে সে এমনি করেই শীত তাড়াবার চেষ্টা করছিল নিশ্চয়ই। এ রীতিটা আছে চেঞ্চুদের ভেতর, তবে সেটা স্বামী স্ত্রীর ভেতরই সীমাবদ্ধ।

একটা ছোট্ট শাড়ি কেনা হয় স্ত্রীর জন্যে, তার সামান্য খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে লেঙট করে পরে পুরুষেরা। বাকি শাড়িটুকু নারীর পরিধেয়। কিন্তু বনপাহাড়ী অঞ্চলে রাতে শীত নামে, তখন স্বামী স্ত্রী দুজনে ভাগাভাগি করে গায়ে দেয় স্ত্রীর ঐ পরিধেয় শাড়িটা।

একই বিছানায় একটু তফাতে শোয় নাগান্‌না, কিন্তু আজ রাতে যেন সে বড় কাছে সরে এসেছে। চন্দ্রাম্‌মার নিজের পরিধেয় শাড়ির একাংশ নাগান্‌নার গায়ে জড়ানো। দুজনে রাতে বড় কাছাকাড়ি সরে এসেছিল মনে হয়। তবু সব দেখেও মনের স্বাভাবিক উদারতাটা বিসর্জন দিল না গুরুপ্‌পা। সে বিচার করে ভাবল, মদের নেশায় এমনটা হলেও হতে পারে। এটাকে একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে ধরা যায়।

গুরুপ্পা সব ঘটনাটাকে লঘু করে দিয়ে বলল, ওঠ হে স্যাঙাৎ, মৌচাক ভাঙার কাজটা শেষ রাতেই সেরে নিই। আমি বাইরে বেরুলাম, এখুনি আসছি, তুমি তৈরি হয়ে থেকো। ও বেরিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেল ঝটপট একটা কাপড় টেনে নেওয়ার শব্দ।

উঁচু পাহাড়ের খাঁজে বিশাল মৌচাক। একটা কালো ভালুক যেন পাহাড়ের খাঁজ ধরে ঝুলে আছে। শেষ রাতেও চাঁদের আলো ফিন্‌কি দিয়ে ফুটছে। পাহাড় বেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে নাগান্‌না, তার দুহাতে ধরা দুখণ্ড দড়ি। সিঁড়িটা গুরুপ্পাকে নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে শূন্যে। একটা দৈত্য যেন দু হাতে ধরে রেখেছে প্রাণ-রজ্জু। সিঁড়ির নীচের দুটো দড়ি সাপের মত সর্‌সর্‌ করে নেমে গেল নীচে। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রাম্‌মা। ঘরের ভেতরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে মাসাম্‌মা। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে এরা তিনজন। আজ সবচেয়ে বড় মৌচাকটা ভাঙবে গুরুপ্পা। সূর্য উঠলেই এই বিশাল মৌচাক ভাঙার দৃশ্যটি দেখবার জন্য জড়ো হয়ে যাবে কৌতূহলী জনতা। তাই শেষ রাতেই এই বিশাল কাজটি করার ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে।

ওরা জানে, ফাগুয়ার রঙ মাখামাখি আর হুল্লোড়ের পর বেলা অবধি ঘুমোবে মহল্লার লোকেরা।

দুটো দড়ির মাঝখানে দোল উৎসবের দোলনার মতো শূন্যে দুলছে সিঁড়িটা। হাতে একটা ধোঁয়ার মশাল নিয়ে সেই সিঁড়ির ওপর নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে গুরুপ্পা। এবার দোল খেতে খেতে সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো মানুষটা এগিয়ে চলল ঐ খাঁজ আঁকড়ে ধরা ভালুকটাকে বধ করতে। প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে ঘাতক। ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে গেছে মৌমাছিগুলো। সদ্য ঘুম ভাঙা পাখা মেলে তারা বাসা ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

এবার পিঠের ঝাঁপি থেকে খাঁড়ার মতো পাতলা কাঠের টুকরোটাকে বের করে আনল গুরুপ্পা। তারপর মহা বিক্রমে সে চাকভাঙার জন্য শূন্যে তুলল অস্ত্রটা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনাটা। খসে পড়ল নাগান্‌নার দুহাতের দড়ি। শূন্যে ডিগবাজি খেতে খেতে সিঁড়ি সমেত নামতে লাগল গুরুপ্পা। মাঝে একটা গাছের ডাল ধরে সে বাঁচার শেষ চেষ্টা করল কিন্তু সরু ডালটা তার ভার সইতে পারল না, মড় মড় করে ভেঙে পড়ল।

খাদের কিনারে পাথরের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল গুরুপ্পা। সরল নিষ্পাপ একটা মানুষ কুটিল নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে ধরাশায়ী হল।

বেলা তখন বেশ খানিকটা বেড়ে উঠেছে। মাসাম্‌মার কান্না শুনে জড়ো হয়ে গেল প্রতিবেশীরা। মা বাবা আর মামাকে দেখতে না পেয়ে সে তারস্বরে চিৎকার করছিল। তার কান্নার শব্দ শুনেই জড়ো হয়ে গিয়েছিল সবাই।

চেঞ্চুরা জানত, যে কোনদিন গুরুপ্পা ভাঙবে ঐ মৌচাকটা। ওরা সবাই মিলে ছুটল পাহাড়ের দিকে। দূর থেকে দেখল কালো ভালুকের মতো সেই মৌচাকটা তখনও ঝুলে আছে, কেউ হাত দেয়নি তার গায়ে।

কাছে গিয়ে দেখা গেল এক বিভৎস দৃশ্য। সিঁড়ি সমেত পড়ে আছে গুরুপ্পা, তার দেহের নিম্নাংশ বাঘে খেয়ে গেছে। চারদিক শুনশান, কেউ কোথাও নেই। না, চন্দ্রাম্‌মা আর না, নাগানননা।

কোথায় গেল ওরা! চারদিকে খোঁজাখুঁজি চলল কিন্তু কেউ হদিশ পেল না তাদের।

কেউ মন্তব্য করল, ওদের দুজনকে আগেই হয়ত একটা বাঘ আর বাঘিনী ধরে নিয়ে গেছে, পরে বাঘটা এসে গুরুপ্‌পার অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে।

বুদ্ধিমান কেউ প্রশ্ন তোলে, নাগান্‌না তো ছিল পাহাড়ের ওপরে, সে কি করে নীচে পড়ল? বাঘ তো আর তাকে ধরবার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে না।

কেউ নাগান্‌নার পক্ষ সমর্থন করে বলল, দড়ি হাত থেকে খসে যাওয়ার সময় সে ধরে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টায় কিনারা পর্যন্ত এসেছিল, তাই অসাবধানে উল্টে পড়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত বিতর্কের কোন সমাধান হল না, কেবল মল্‌লাম্‌মার মুখে মৃদু একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে নিশ্চিত বুঝতে পারল, সেদিন বনের ভেতর যে পুরুষটাকে সে চিনতে পারেনি, সে নাগান্‌না ছাড়া আর কেউ নয়। ওরা দুজনে অবশ্যই হতভাগ্য গুরুপ্‌পাকে বধ করে এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু কোন কথাই সে কাউকে মুখ ফুটে বলল না।

মাসাম্‌মার নতুন মুনিব

মা বাপ সংসার থেকে মুছে যাবার পর কিছুকাল শুকনো পাতার মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালো মাসাম্‌মা। কোথাও কেউ দুটি কৃপা করে খেতে দেয় তো খায়, যেদিন কিছু জোটেনা সেদিন শুধু এক পেট কুণ্ডের জল খেয়ে সে ঘরের মেঝেতে পড়ে ঘুমোয়। বেশীরভাগ রাত কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে।

কোনওদিন বা বন থেকে শাকপাতা মেটে আলু তার কপালে জুটে যায়। সেদিন শুকনো ডালপালা জ্বালিয়ে সে উনুন ধরায়। ঐ স্বাদে গন্ধে ভরপুর আহার্যগুলি সে সেদ্ধ করে খায়। একটুখানি নুনের জন্য মাসাম্‌মা গিয়ে দাঁড়ায় প্রতিবেশীদের উঠোনের ধারে। মুখ নিচু করে থাকে, দরকারের কথাটুকু জানায় অতি মৃদু শব্দে।

চেঞ্চুরা দিন আনে দিন খায়। সাধ থাকলেও কোনওরকম খয়রাতি করার সাধ্য থাকে না তাদের।

মল্‌লাম্‌মা মেয়েটাকে ভালবাসে। সে-ই কেবল স্থির নিশ্চিত জানে, চন্দ্রাম্‌মার পালিয়ে যাওয়ার কাহিনী। মেয়েটাকে দেখে তার দুঃখ হয়, চেঞ্চুদের ভেতর এমন সুন্দরী মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না। কলাপাতার মতো চিকন গা মেয়েটার, মুখের আদলখানা লম্বা, মাথায় তেলহীন লাল চুলের বোঝা। মায়ের কাকুই দিয়ে ওই চুলই সে আঁচড়ে রাখে। প্রতিদিন দু'বেলা চান করে, মায়ের ফেলে যাওয়া কাপড় রোজ ধুয়ে শুকিয়ে পরে।

শ্রীশৈলমে পুজোর মরসুমে এ বছরও যাত্রীরা খোঁজ করেছে গুরুপ্‌পাকে। তার জীবনের নিদারুণ পরিণতির কথা শুনে তারা হায় হায় করেছে। অনেক সান্ত্বনার সঙ্গে কিছু কিছু টাকাপয়সাও পেয়েছে মাসাম্‌মা। সে সাধ্যমতো তাদের সেবা করেছে, কিন্তু সঙ্গে যায়নি।

পরের বছর গুল্‌লা টোটাইয়ার সঙ্গে মাসাম্‌মাকে যাত্রী তদারকির কাজে পাঠিয়ে দিল মল্‌লাম্‌মা। প্রতিবছর যাত্রী নিয়ে অন্যদের মতো টোটাইয়া একাই যেত। এবছর মাসাম্‌মা তার সঙ্গে।

টোটাইয়ার সঙ্গে মাসাম্মা যাচ্ছে শুনে অনেক যাত্রী ওই দলে ভিড়ে গেল। টোটাইয়ার সঙ্গে থাকায় মাসাম্মা-র খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধে হল না।

শ্রীশৈলমে যাওয়ার মাঝপথে খুদে আকারের একটা পাহাড়ী শহর পড়ে। একরাত সেই শহরের চটিতে কাটায় যাত্রীরা। দু-চারঘর খ্রিস্টানও অনেকদিন থেকে বাসা বেঁধে আছে সে শহরে। সেসিল অরওয়েল প্রথম জীবনে হায়দ্রাবাদে কাজ করতেন। এখন এই বন-পাহাড়ী শহরে রিটায়ার জীবনযাপন করেন। ছেলে ডিক পড়ে হায়দ্রাবাদের একটা কনভেণ্টের হায়ারক্লাসে। ওই একমাত্রই ছেলে, তাই মায়ের নয়নের মণি। মিসেস পেগি আজ দু-বছর হল প্যারালিসিসে পঙ্গু, বহু চিকিৎসা হয়েছে কিন্তু আখেরে শূন্য। ছেলে বাইরে, সেসিলই দেখাশোনা করেন স্ত্রীর। পুরুষ মানুষ তাই সবদিক একহাতে সামলে উঠতে পারেন না।

যাত্রীরা আজ রাতে বিশ্রাম নেবে এই শহরের চটিতে। কাল ভোর পর্যন্ত কোনও কাজ নেই টোটাইয়ার। সে মাসাম্মাকে বলল, যাবি এক জায়গায়?

বড় বড় দুটো চোখ টোটাইয়ার মুখের ওপর রেখে সে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন আঁকল।

টোটাইয়া তার মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলল, চল না আমার সঙ্গে, গেলেই দেখতে পাবি। খুব ভাল মানুষ ওরা, কিশ্চান।

মাসাম্মা কখনও কিশ্চান বলে কী ধরনের জীব তা জানে না, তাই সে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠল। সন্ধ্যার আগেই টোটাইয়ার সঙ্গে ও গিয়ে উঠল অরওয়েল সাহেবের বাড়ি।

বেলাশেষের গাঢ় হলুদ রংটা এসে পড়েছিল মি. সেসিলের বাগানে। বেশ সাজানো বাগান। দু-চাররকম সিজন ফ্লাওয়ার, আর কয়েকটা ফলের গাছ রয়েছে। কোনও একটা গাছের পাতার আড়ালে বসে হলুদ পাখিটা ভারী মিষ্টি সুর তুলে ডাকছিল, কিন্তু তাকে কোনও ভাবেই দেখা যাচ্ছিল না। মাসাম্মা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোঁজ করল পাখিটার কিন্তু হদিশ পেল না।

টোটাইয়ার ডাকে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন অরওয়েল সাহেব। তাঁর চোখমুখ দেখে মনে হল তিনি টোটাইয়াকে দেখে ভীষণ খুশি হয়েছেন।

আরে এসো এসো। দু-দুটো বছর তোমার পাত্তাই নেই।

টোটাইয়া বলল, এ দু-বছর এ শহরে ডেরা পড়েনি। যাত্রীরা আরও এগিয়ে গিয়েছিল, তাই আসা আর হয়ে ওঠেনি।

ঘর থেকে বড় মাপের একটা চাটাই এনে দাওয়ার ওপর বিছিয়ে দিলেন সেসিল সাহেব।

ওটি কে?

টোটাইয়ার ইঙ্গিতে মাসাম্মা সাহেবকে নত হয়ে নমস্কার করল।

টোটাইয়া বলল, কিছুকাল আগে বেচারার মা-বাপ বাঘের পেটে গেছে, ওকে দেখভাল করার কেউ নেই তাই ওকে এবছর আমার সঙ্গে নিয়ে চলেছি। খুব কাজের মেয়ে। যাত্রীরা ওকে দারুণ পছন্দ করে।

সাহেবের কথায় ওরা চাটাইয়ের ওপর বসল।

দাওয়ায় একটা সাদা আর্মচেয়ার পাতা ছিল, ওটাতে সেসিল সাহেব বসলেন না, তিনি বসে পড়লেন চাটাইয়ের একপ্রান্তে।

টোটাইয়া, আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চেয়েছিলাম, মনে আছে?

টোটাইয়ার যেন হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল, সে অমনি বলে উঠল, হ্যাঁ সাহেব।

আমি যে আর পারছি না, টোটাইয়া। একটা মেয়েকে কোনও রকমে জোগাড় করেছি। সে দু'চারটে কাজ সেরে বাড়ি চলে যায়। তার পর সারা দিন আর রাত্রি আমি এই দুটো হাতে হাল ধরে আছি।

হাঁ সাহেব, বুঝতে পারছি আপনার খুবই কষ্ট।

সেসিল সাহেব হঠাৎ টোটাইয়ার দুটো হাত ধরে ফেললেন। বললেন, তুমি কিছু একটা করলে আমি বেঁচে যাই।

টোটাইয়া ধীরে ধীরে সাহেবের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাথা ঠুকে নমস্কার করল, তারপর মাথা তুলে বলল, সেবারের কথা ভুলিনি সাহেব, যাত্রীরা সব চটিতে আর আমি গাছতলায়। রাতে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি, অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখা যায় না। ঝড়ে তার ছিঁড়ে সব বাতি নিভে গেছে। বিদ্যুতের চমক ছাড়া আলো নেই। আমি অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে ছুটেছি কোনও একটা আশ্রয়ের খোঁজে। আপনার বাড়ির দাওয়ায় এসে আছড়ে পড়েছিলাম। আপনি শব্দ শুনে মাঝরাতে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন।

হাতের টর্চটা জ্বলে উঠেছিল। সারা শরীরটা তখন ভিজে গেছে আমার। আপনি আমাকে হাত ধরে তুলে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়েছিলেন। বৃষ্টির সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ভেজা কাপড়ে আমি থর থর করে কাঁপছিলাম। উঃ, সে রাতে কত করলেন আমার জন্যে। গা ধোওয়ার জন্যে গরমজল করে দিলেন। আপনার পুরনো একটা পোশাক পরতে দিলেন আমাকে। তারপর গরম দুধ খাইয়ে আপনি আমাকে একটা বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন।

সে কথা থাক টোটাইয়া। একজন অসহায় মানুষের জন্যে সেদিন আমি যেটুকু করেছি তাকে আমি আর মনে রাখিনি। আমার প্রভুই সে কাজ আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন।

চুপচাপ কতক্ষণ বসে রইল টোটাইয়া। সে যেন সেদিনের সেই ঝড়বাদলের শব্দটা কান পেতে শুনছিল। হঠাৎ তার মনের ভেতরে একটা আবেগ জোয়ারের মতো ফুলে ফেঁপে উঠল।

সে বলল, দেখুন তো সাহেব, এই মেয়েটাকে নিয়ে আপনার চলবে কিনা? বড় ভাল মেয়ে, কোনওদিন মুখ তুলে একটা কথা বলতে জানে না, সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে কোনওদিনই ওকে ঝগড়া করতে দেখিনি। আমার পল্লীর সকলে ওকে একডাকে চেনে আর ভালবাসে।

সাহেব বলল, এমন একটি মেয়ে পেলে তো আমি হাতে স্বর্গ পাই টোটাইয়া।

সাহেব, বড় অভাবী মেয়েটা। যেখানে একটু ভালবাসা পায় সেখানেই জড়িয়ে থাকে।

সাহেব অধীর হয়ে বলেন, কবে কখন পাব? ওর আর কে আছে?

মা বাপ, ভাইবোন কেউ নেই ওর। আমি চেষ্টা করব মন্দির থেকে ফেরার পথে ওকে এখানে রেখে যেতে।

টোটাইয়া এবার মাসাম্‌মার দিকে ফিরে বলল, কি রে সাহেবের কাছে থাকবি তো? ভাল পরবি, ভাল খাবি, অনেক আদর পাবি।

এরকম একটা জায়গায় থাকতে পারবে, এ ছিল মাসাম্‌মার স্বপ্নেরও বাইরে।

সাহেব ভেতরে গিয়ে ওদের জন্য কফি বানিয়ে আনলেন। একটা প্লেটে নিয়ে এলেন কিছু বিস্কিট।

তোমরা এখন এটুকু খেয়ে নাও, রাতে আমার এখানেই তোমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা।

টোটাইয়া ব্যস্ত হয়ে বলল, সেদিনের মতো আজ তো আর ঝড়-বাদল নেই, গাছতলাতেই রান্না করে খাব, শোব।

তা হয় না, আমার বাড়িতে না এলে হত, এখন আর হয় না।

টোটাইয়া বলল, আপনার তো রান্নার লোক নেই, এতগুলো মানুষের রান্না কে করবে?

যে করে হোক, খেতে তো হবে। দুজনের হলে আর দুজনেরও হয়ে যাবে।

রাত নামল। বিজলি বাতি জ্বলে উঠল। আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মাসাম্‌মা খুশিতে ঘর বার করতে লাগল।

সাহেব একফাঁকে মাসাম্‌মাকে মিসেস পেগির কাছে নিয়ে গেলেন। একটা মনোজ্ঞ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে দিলেন।

মিসেস পেগির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মাসাম্‌মাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। হাতের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন।

সেই রাত থেকেই কিন্তু ঘরের টুকিটাকি অনেক কাজে হাত লাগাল মাসাম্‌মা। পরের দিন যাবার ইচ্ছে না থাকলেও টোটাইয়ার মুখের ওপর সে কথা বলতে পারল না। সাহেব গত রাতের কিছু খাবার ওদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

টোটাইয়া পথে নেমে যাওয়ার আগে হাত তুলে সাহেবকে নমস্কার করে বলল, ফেরার পথে মাসাম্‌মাকে আপনার কাছে আমি ঠিক দিয়ে যাব সাহেব।

মি. সেসিলের বাড়িতে তিনমাস কাজে যোগ দেওয়া হয়ে গেল মাসাম্‌মার। মিসেস পেগির প্রায় সব কাজই আজকাল মাসাম্‌মা করে দিতে পারে। মিসেস পেগি একটু বদরাগী মানুষ। ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিসটা রাখতে ভুল হয়ে গেলেই তিনি ক্ষেপে যান। তখন মুখে যা আসে তাই বলেন। ভয় পেয়ে মাসাম্‌মা ভুলের পর ভুল করতে থাকে। হাতের প্লেট মেঝেতে পড়ে ঝনঝন শব্দ ওঠে। আরও ক্ষেপে যান মিসেস পেগি। তারপর কখনও গরম কাপ থেকে চলকে পড়ে কমপ্লান।

একসময় বকুনি থামিয়ে শুধু বড় বড় চোখ বের করে তাকিয়ে থাকেন মিসেস পেগি।

মাঝে মধ্যে বেশি চেঁচামেচি শুনে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েন সেসিল সাহেব। তিনি স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনও রকমে পরিস্থিতি সামাল দেন।

অন্যসময়ে মিসেস পেগি অন্য মানুষ। কখনও বা দেখা যায় দুপুরে খাওয়া দাওয়ার শেষে মিসেস পেগির মাথার চুল নিয়ে খেলা করছে মাসাম্‌মা। তখন কিন্তু মিসেস অন্য মানুষ। বেশ স্নেহপ্রবণ। তিনি ওকে ঈশপের গল্প শোনান। ইতিমধ্যে মি. সেসিল সকালে একঘণ্টা করে নিয়মিত ইংরেজি পড়ান মাসাম্‌মাকে। এখন ও ইংরেজি বাক্য কিছু কিছু বুঝতে পারে, নিজেও দু-চারটে কথা বলে ফেলে। মি. সেসিলের ধারণা, আর মাস দুয়েকের ভেতর ও ইংরেজিতে কথাবার্তা চালাতে পারবে।

ডিসেম্বরে কাজের পাঁচমাস পূর্ণ হল মাসাম্‌মার। মি. সেসিলের বাড়িতেও সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। বড়দিনের ছুটিতে ডিক আসবে বাড়িতে। বয়স হলে কী হবে উৎসাহে একটুও

ভাঁটা পড়েনি মি. সেসিলের। তিনি বাজার থেকে নানারকম জিনিস কিনে এনে ঘর সাজাতে লেগে গেছেন। এমনকি সান্তাক্লজকেও একটা গাছের তলায় হরিণে টানা রথের ওপর বসিয়ে দিয়েছেন। সান্তাক্লজের হাতে ঝলমল করছে রূপালি সোনালি অনেকগুলো কার্ড।

মি. সেসিলের প্রতিটি কাজে দৌড়ে দৌড়ে সাহায্য করছে মাসাম্‌মা। সব কিছু দেখে খুশিতে তার সারা মন ভরে উঠেছে। তা বলে সে একটুও ফাঁকি দিচ্ছে না মিসেস পেগির কাজে।

মাসাম্‌মাকে সঙ্গে পেলে কেমন যেন ছেলেমানুষ হয়ে যান মি. সেসিল। তিনি সাজানো গাছের চারদিকে ঘুরে ঘুরে হাততালি দিতে থাকেন। আর তার পেছন পেছন তালি দিয়ে ঘুরতে থাকে মাসাম্‌মা।

তেরো-চোদ্দ বছর বয়স হলে কী হয়, মাসাম্‌মা বেশ হৃষ্টপুষ্ট ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেছে। সে এখন কিশোরী। প্রকৃতির একটা আশ্চর্য হাওয়া মাঝে মাঝে তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আজকাল তার মনের ভেতর কি সব ভাবনা যেন জেগে ওঠে। সে ভাবনা নিয়ে মনে মনে কিছু ভাববার আগেই সে সব কোথায় যেন ভেসে চলে যায়। আসলে ও মনে প্রাণে বড় শুদ্ধ। কিন্তু উদ্দাম প্রকৃতিকে ঠেকাবে কী ভাবে?

একটা হলুদ পাখি মাঝে মাঝে এসে ডাক দিয়ে যায়, আর ঠিক সে সময়ে তার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে মিসেস পেগির কাছে জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকলেও মুহূর্তে লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায় পাখিটার খোঁজে।

মি. সেসিলের কাছে পড়তে বসেও ওই একই দশা। পাখিটা তার মন কেড়ে নিয়ে পালায়। আবার কখন ওর ডাক শুনতে পাবে সেই আশায় ওর সব কাজের ভেতরে ও কান পেতে থাকে।

অনেক আলো, অনেক সাজসজ্জার ভেতরে এক সন্ধ্যায় এসে পড়ল মি. সেসিলের একমাত্র ছেলে ডিক। মিসেস পেগির মুখে ডিক সম্বন্ধে প্রায় সব কথাই শুনে ফেলেছে মাসাম্‌মা। পড়াশোনায় ভাল, ক্রিকেট খেলায় ওস্তাদ আর সর্বোপরি বেশ লম্বা হ্যাণ্ডসাম ছেলে।

চোখে দেখে মিসেস পেগির কথার সত্যতা বুঝতে পারল মাসাম্‌মা। যা মিসেস পেগি বলেননি তাও দেখা গেল ষোল-সতেরো বছরের তরুণ মি. ডিকের মুখে। সুন্দর গোঁফ দাড়ি প্রকাশ করছে ডিকের পৌরুষ।

আড়ালে আবডালে থেকে মাসাম্‌মা চকিতে দেখে নিচ্ছে ডিককে। কিন্তু লজ্জায়, সঙ্কোচে কাছে ভিড়তে পারছে না।

মি. সেসিল একসময় কাছে ডাকলেন মাসাম্‌মাকে। তখন ড্রয়িংরুমে পিতাপুত্রের বসে গল্প হচ্ছিল। কী একটা কথায় প্রাণ উজাড় করা হাসি হাসছিল ডিক। মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকল মাসাম্‌মা। চাপা দৃষ্টিতে তাকাল মি. সেসিলের দিকে।

ডিক, এই হল মাসাম্‌মা।

চিঠিতে যার কথা লিখেছিলাম, এই হল সেই, তোমার মায়ের সেবিকা। নার্স-এর সব কাজ ও করতে পারে। একে বলা যায় কিশোরী-নার্স।

ডিক মাথা ঘুরিয়ে হেসে হাত নাড়ল।

সংকুচিত একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল মাসাম্মার মুখে। সেও হাত তুলে পতাকার মতো নাড়তে লাগল।

লেসের কাজ করা হলুদ রঙের ভারী সুন্দর একটা ফ্রক পরেছে মাসাম্মা। এটা তার ক্রিসমাসের উপহার। পনি-টেল করে লাল রিবন দিয়ে চুল বাঁধা। এই কেশ সজ্জাটুকু অনেক কষ্টে তাকে করে দিয়েছেন মিসেস পেগি।

তিনি তাকে সাজিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ও ঘরে গিয়ে আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নে।

লজ্জায় দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু নিজেকে দেখতে ভোলেনি।

নারসিসাসের মতো নিজেকে দেখে সে নিজের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। এমন সুন্দর সে! নিজের সঙ্গে মাসাম্মার যেন আজ নতুন করে পরিচয় হল।

দু-তিন বছরের বড় ছোট দুটি ছেলে মেয়ের লজ্জা ডিঙিয়ে ভাব জমতে বেশি সময় লাগল না।

উৎসবের দিন সূর্যের সোনালি আলো গাছের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছিল বলগা হরিণগুলোর ওপর। মনে হচ্ছিল, সান্তাক্রুজ হরিণের মুখে বাঁধা সোনার বলগাগুলো ধরে আছে। তারে বাঁধা হরিণের গলার রূপোর ঘণ্টাগুলো মাঝে মাঝে বেজে উঠছে।

উঠোন ভরে অতিথিরা ক্যারল গাইল। তাদের প্লেটে প্লেটে খাবার পরিবেশন করল মাসাম্মা। ঘরের ভেতরে থেকে সে খাবারগুলো সাজিয়ে দিল ডিক।

উৎসব শেষ হল, কিন্তু তার রেশ রয়ে গেল মাসাম্মার মনে। স্বপ্নে জাগরণে সে দৃশ্য ফিরে ফিরে আসতে লাগল।

হায়দ্রাবাদ ফিরে যাবার কদিন আগে বাড়ির সকলের কাছে একটা প্রস্তাব রাখল ডিক। সে খ্রিস্টান হলেও একবার শ্রীশৈলমের মন্দির দেখতে যাবে। পায়ে হেঁটে দু-তিনদিনের পথচলা দারুণ এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার বলে মনে হয়েছে তার কাছে।

মি. সেসিল চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে আমার ঘরেই রয়েছে শ্রীশৈলমে যাবার গাইড।

কী রকম?

কেন, এখানে আসার আগে মাসাম্মা কত যাত্রীকে নিয়ে গেছে শ্রীশৈলমে।

বিস্ময় প্রকাশ করল ডিক, মাসাম্মা!

হাঁ হাঁ, ছোটবেলা থেকে ও ওর বাবার সঙ্গে যাত্রী নিয়ে যেতে যেতে পথঘাট সব চিনে ফেলেছে। ও-ই তোমাকে নিয়ে যাবে।

ডিক উল্লসিত হয়ে বলল, তা হলে বেশ মজা হবে। গভীর বনের ভেতর দিয়ে একসঙ্গে পথ চিনে যাওয়ার এক আলাদা রোমাঞ্চ আছে। কিন্তু.....।

মিঃ সেসিল বললেন, কিন্তু কি?

আমার সঙ্গে মাসাম্মা গেলে তিন চারটে দিন মায়ের যে বড় অসুবিধে হয়ে যাবে।

মিঃ সেসিল ডিকের কথাটাকে একদম উড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই আমি তো রয়েছি। মাসাম্মা আসার আগে তোমার মায়ের সব কিছু কাজ কে করেছে?

নম্র হয়ে এবার জবাব দিল ডিক, সে কথা ঠিক বাবা।

ছেলে আর স্বামীর কথা শুনে মিসেস পেগি বিছানায় শুয়ে হাসতে লাগলেন।

একদিনের ভেতরেই যাত্রার সব প্রিপারেশন কমপ্লিট হয়ে গেল।

হায়দ্রাবাদ থেকে আসার সময় মায়ের নতুন সেবিকাটির কথা ভেবে একটা ব্যাগ উপহার হিসেবে দেবে বলে নিয়ে এসেছিল ডিক। সেটাতে নিজের পোশাক থালা, গ্লাস সব গুছিয়ে নিল মাসাম্‌মা। ইস্পাতের একটা ধারাল ছোট্ট কুড়ুল ছিল বাবার, সেটাকে সে ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেলল। কোমরে ফিতের সঙ্গে বেঁধে নিল আংটা পরানো একটা কোদাভালি বা হাঁসুয়া।

ভোর হতে না হতেই সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে বনের পথে পা চালাল।

এই ক-মাসে মাসাম্‌মার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে বেশ খানিকটা লম্বা হয়ে গেছে। চিকচিক করছে তার গায়ের শ্যামলা রং। পনিটেল করেছে, আজকাল দু-একটা ফুলও গোঁজে মাথায়। তা ছাড়া মনের অনেক ভাব প্রকাশ করতে পারছে ইংরেজিতে।

আগে যারা মাসাম্‌মাকে দেখেছে তারা হঠাৎ মুখোমুখি হলে একেবারে চিনতেই পারবে না। এতো পরিবর্তন!

কিছু পথ পা চালিয়ে যাওয়ার পর পাহাড় আর বনের আড়াল থেকে লাল সূর্যটাকে উঁকি দিতে দেখা গেল। চলার পথে দাঁড়িয়ে পড়ল মাসাম্‌মা। সে নত হয়ে সূর্যের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাল। ওর পেছনে আসছিল ডিক, সেও থেমে দাঁড়িয়েছিল। সে দেখছিল নম্র, নত মাসাম্‌মাকে।

এক সময় ডিকের দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে মাসাম্‌মা বলল, তোমাকে দেরি করিয়ে দিলাম।

একথা কেন বলছ?

এগিয়ে যেতে যেতে মাসাম্‌মা বলল, তোমরা তো সূর্য প্রণাম কর না, কেবল আমার জন্যে তোমাকে দাঁড়াতে হল।

না না ওইটুকু দাঁড়ানোতে কি এসে যায়। আমি দেখেছি তোমরা বহু দেবদেবীর পূজা কর।

মাসাম্‌মা বলল, আমাদের ধারণা, আমাদের চারদিকে যত বিপদ আপদ রয়েছে, তার থেকে উদ্ধার করেন আমাদের দেবদেবীরা।

ডিক হেসে উঠল।

থমকে দাঁড়িয়ে মাসাম্‌মা বলল, তুমি হাসলে যে?

তোমাদের এই সব বিশ্বাসের কথা শুনে।

না, না হাসির কথা নয়। এই বনজঙ্গলে আমাদের থাকতে হয়। সাপের মুখে পা পড়ে যায়। সাপ কামড়ালে অনেক সময় বাঁচার উপায় থাকে না, তাই আমরা সাপের দেবতা নাগেন্দ্রের পূজা করি। তা ছাড়া আমাদের রোগের দেবতা রয়েছেন, ভূত-প্রেত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেও আমরা দেবতার পূজা করে থাকি। তুমি এসো আমার সঙ্গে। এই বনটা পেরিয়ে গিয়ে যে সবুজ ভ্যালিটা পড়বে সেখানে তুমি আমাদের এক দেবীকে দেখতে পাবে। চলো, আমরা পা চালিয়ে যাই, ওঁর পাশ দিয়েই আমাদের যেতে হবে।

মিনিট দশেক চলার পরেই সেই সবুজে ছাওয়া স্বপ্নের মতো মনোরম উপত্যকাটা এসে গেল। একটা টিলার কোলে সবুজ একখানা গালচে যেন ঢালু হয়ে নেমে গেছে। টিলার গায়ে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে ছোট বড় অনেক রকমের গাছ।

মাসাম্মা ওই লনের ওপর দিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে ভ্যালির ওপারে গিয়ে পৌঁছল। ওখানে থমকে দাঁড়িয়ে ডিককে বলল, ওই যে গাছের তলায় একটা উঁচু পাথর দেখছ না?

হাঁ।

ওই গাছের ওপার থেকে শুরু হয়েছে একটা গাঁও। উনিই ওই পল্লীর দেবী। সারা গাঁওকে উনি বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। বিজয়া-দশমীর দিনে গ্রাম থেকে মেয়ে-পুরুষেরা দলে দলে এসে দেবীর পুজো দিয়ে যায়।

ডিক বলল, তোমাদের দেবদেবীর তো অনেক রকম নাম থাকে, এই পাথরের টুকরোটির কি নাম?

মাসাম্মা অমনি বলে উঠল, এমন করে বলতে নেই ডিক, ইনি বড় জাগ্রত দেবী।

কি নাম বললে না তো?

কনক দুর্গাম্মা।

নামটি বলে ও দুর্গাম্মার কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। ডিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখল।

আবার শুরু হল পথ চলা। বহু পাখি আকাশের কোলে ডানা মেলে সূর্যের সোনা মাখতে মাখতে উড়ে গেল।

এখনও অনেক পাখি গাছের ডালে বসে কলরব করছিল। তাদের ভেতর কেউ কেউ কথা শেষ করে উড়ে গেল। কেউবা ওই ডালে বসেই প্রভাতী আড্ডা জমাতে লাগল।

ডিক বলল, ওদেরও বোধহয় ক্রিসমাস হলিডে, তাই বসে বসে গল্পে মেতেছে।

ঝকঝকে দাঁতে খিলখিল করে হাসি ছড়াল মাসাম্মা। তার পর হাততালি দিয়ে উড়িয়ে দিল সবকটা পাখিকে।

ডিক বলল, এটা কী করলে? ওরা দিব্যি মনের সুখে ঘরের দাওয়ায় বসে আড্ডা দিচ্ছিল।

মাসাম্মা গম্ভীর হয়ে বলল, অলসদের এমনি করেই তাড়া দিয়ে কাজে পাঠাতে হয়। তারপর ডিকের হাতখানা ধরে জোরে টানতে টানতে বলল, চল, ওদের মতোই আমরা উড়ে চলে যাই।

দুজনে বনের ভেতর দিয়ে হাত ধরাধরি করে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পরে মাসাম্মা বলল, এসো আমরা এই গাছের তলায় বসি।

ডিক বলল, কেন? এখুনি কি চলার শেষ হয়ে গেল?

না না, তুমি তো ঘরে ফিরে গিয়ে মাকে বলবে, ঠিক সময়ে মাসাম্মা আমাকে ব্রেকফাস্ট দেয়নি।

আরে, পথ চলার সময় অত কেউ নিয়ম কানুন মানে না।

তা হোক, তুমি বোস।

দুজনে বসল সেই গাছতলায়।

সবুজে সোনায় মিলে অপরূপ রোদ মাখা বন, তার মধ্যে এই একজোড়া কিশোর-কিশোরীকে দেখে মনে হল ওরা ভিন্ন জগতের মানুষ।

গাছটার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা বুনো লতা। এমন শীতেও কিন্তু তার পাতা ঝরেনি, সে গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ ফুল ফুটিয়েছে। অতি মৃদু আর মিষ্টি একটা সৌরভ ছড়াচ্ছে সে ফুলগুলো।

বাড়িতে রোজ সকালে ডিকের ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে মাসাম্‌মা। সে ডিমসেদ্ধ, কেক আর কলা নিয়ে এসেছে। ডিমসেদ্ধ সে রাতেই করে রেখেছিল। ও ডিককে প্লাস্টিকের প্লেটে খেতে দিল।

ডিক চুপচাপ বসে আছে দেখে মাসাম্‌মা বলল, কি হল?

তোমার কই?

মাসাম্‌মা হেসে বলল, আমার না রেখে কি তোমায় সব দিয়ে দেব।

না, তা নয়, এক যাত্রায় এক সঙ্গে খাব।

মাসাম্‌মা নিজের খাবারটাও এবার বের করে প্লেটে সাজাল। হেসে বলল, এবার খাও।

ডিক নিজের প্লেট থেকে একটা কলা তুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, এটা তুমি নাও।

মাসাম্‌মা ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওমা কেন, আমারও তো কলা রয়েছে।

ডিক গম্ভীর হয়ে বলল, তোমারটা আমাকে দাও, আমারটা তুমি নাও।

খুব অবাক হয়ে মাসাম্‌মা তাই করল। কিন্তু এ ব্যাপারটার কোনও অর্থ তার হৃদয়ঙ্গম হল না।

ডিক বলল, কিছু বুঝলে?

মাসাম্‌মা যথারীতি মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, সে কিছু বোঝেনি।

ডিক বলল, খাবার বিনিময়ের ভেতর দিয়ে আজ আমরা বন্ধু হলাম।

কিশোরী মেয়েটি সেই মুহূর্তে নিজের ভেতর অদ্ভুত এক ধরনের শিহরণ অনুভব করল। কোনও দিন কোনও পুরুষ ছেলে এমন করে তাকে বন্ধু বলে ডাকেনি। সে বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারল না। কেবল দু এক টুকরো খাবার মুখে ফেলে চিবোতে লাগল।

নতুন বন্ধুটি তাকে কিভাবে গ্রহণ করল, তাই দেখার জন্য ডিক খেতে খেতে তাকাচ্ছিল মাসাম্‌মার দিকে। মাসাম্‌মা কিন্তু মুখ তুলে আর তাকাল না।

শীতের হাওয়াতে কি ছোঁয়া লাগল বসন্তের! সে কি দুলিয়ে দিয়ে গেল ওই হলুদ রঙের পুষ্পগুচ্ছকে?

ডিক মাসাম্‌মাকে নীরব থাকতে দেখে আবার বলল, আমার কথাটা তোমার পছন্দ হল না তো।

মাসাম্‌মা মাথাটাকে ডাইনে-বাঁয়ে আর ওপর-নীচে বারবার দোলাতে লাগল। ওতে হাঁ না দুটোই মেশানো।

আনন্দে ওরা পথ চলছে। সন্ধে সকালের কোনও হিসেব নেই। ঝড় উঠলে টিলার কোলে কোনও পাথরের আড়ালে অথবা গুহার ভেতর আশ্রয় খুঁজছে, আবার চাঁদের বুকে জ্যোৎস্নার ঢেউ উঠলে ওরা কোনও গাছের তলায় পাশাপাশি বসে সুন্দরী চাঁদকে দেখছে। কি অপরূপ মাজা রূপোর কান্তি। নীলে রূপোয় সারা গগনমণ্ডল ঝলমল।

দ্বিতীয় দিনে বেলা পড়ে এসেছে। সূর্যের হলুদ আলো বনস্থলী থেকে চুইয়ে পড়ছে সবুজ ঘাসের গালিচায়।

মাসাম্‌মা হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল। তাকে অনুসরণ করে হাঁটছিল ডিক। সে-ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

মাসাম্‌মা হঠাৎ ডিকের হাতখানা জোরে টেনে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

এই ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখ, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

বিস্ময়ে চাপা গলায় ডিক বলল, কি?

ফিসফিস করে মাসাম্‌মা বলল, একদম কথা নয়। ওই যে সামনে দেখ। ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় কয়েকটা লাফ দিতে দিতে যেন উড়ে চলে গেল একটা সম্বর।

মাসাম্‌মা বলল, কোন ডাক শুনতে পাচ্ছ?

কান পাতল ডিক। সত্যিই তো, ঘুপ্ ঘুপ্ ঘুপ্, একটা শব্দ ক্রমাগত এগিয়ে আসছে।

ডিক বলল, কিসের আওয়াজ?

মাসাম্‌মা কোনও উত্তর দেবার আগেই আওয়াজটা ভয়ঙ্কর রূপ ধরে ছড়িয়ে পড়ল ওই ছোট্ট প্রান্তরে।

ডিক ঝোপের আড়াল থেকে দেখল, সম্বরটা যেদিকে ছুটে গেছে, সেই পথরেখা ধরে একঝাঁক গুলি যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল।

ডিকের গলাটা মুখের কাছে টেনে এনে মাসাম্‌মা ফিসফিস করে বলল, বুনো কুকুরের পাল সম্বরটাকে ধরতে ছুটেছে।

অল্প সময়ের ভেতরেই ওরা পশুকণ্ঠের একটা আর্ত চিৎকার শুনতে পেল। বন কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সে শব্দটা বাজছিল। মন্থর হাওয়াটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল সে শব্দে। কিছুক্ষণের ভেতরেই সে আওয়াজটা স্তিমিত হয়ে এল।

প্রায় একঘণ্টা পরে সূর্য ডুবে গিয়ে চাঁদ উঠল। মাসাম্‌মা বলল, আরও খানিকটা এগিয়ে যাই চলো, তারপর কোনও গাছতলায় বসে রাতের খাবার তৈরি করব।

কিন্তু যদি ওই কুকুরগুলোর মুখোমুখি পড়ে যাই?

মাসাম্‌মা হাসি ছড়িয়ে বলল, এমন সাহসী তুমি?

এটা সাহসের ব্যাপার নয় মাসাম্‌মা, প্রাণরক্ষার তাগিদ।

ওরা বনের পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে গাছের তলায় একটা কঙ্কাল পড়ে আছে। হরিণের কঙ্কাল। শিং, সাদা হাড়, পায়ের খুর ছাড়া নাড়িভুড়ি রক্তমাংসের লেশমাত্র নেই। চেচেপুছে সব খেয়ে গেছে।

মাসাম্‌মা বলল, ওই কুকুরগুলোর সামনে যারা পড়বে তাদেরই এই দশা হবে।

ডিক শুধু বলল, ভয়ঙ্কর!

গাছের তলায় ধিক ধিক করে আগুন জ্বলছে। এ যেন মজার বনভোজনের আয়োজন।

বন্দুক ছুঁড়ে পাখি শিকার করতে পারে ডিক। তার হাতের নিশানা প্রায় অব্যর্থ। সে কিন্তু এ যাত্রায় বন্দুক নিয়ে আসেনি আর তার নিয়ে আসার কথাও নয়। সে সঙ্গে এনেছে দুটো গুলতি, আর তাই দিয়ে সে আমিষের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। ঘুঘু, কবুতর তার পাল্লার ভেতর এলেই নিস্তার নেই।

মাসাম্‌মার মাংস ভোজনে কোনও অনিচ্ছা নেই। কিন্তু সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনও প্রাণীবধ পছন্দ করে না। একটি কবুতর হলেই তাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট, তার বেশি নয়।

একদিন হাতের কাছে পেয়ে তিন তিনটে পাখি মেরেছিল বলে সব মাংসটুকু ও ডিকের প্লেটে দিয়ে দিয়েছিল। ডিক বিস্মিত হয়ে বলেছিল, তুমি খাবে না?

এত মাংস খেতে আমার ভাল লাগে না। তোমার জন্যে একটি মেরে এনো, আমি রান্না করে দেব।

ডিক বলল, এটা তোমার রাগের কথা মাসাম্‌মা। তুমি না খেলে আমিও খাব না।

সে কি? তোমাদের মাংস না হলে চলে না, দেখেছি।

তুমিও তো খাও, হঠাৎ বন্ধ করে দিলে কেন?

মাসাম্‌মা করুণ গলায় বলল, দেখো, ওরা গাছের ডালে বসে বসে যখন গান করে, কথা বলে, তখন তুমি ওদের গুলতি মেরে নামাও। কেন জানি না আমার বড় কষ্ট হয়।

ডিক বলল, আমি যদি একটা পাখিকে কোনও গাছের ডালে বসতে দেখি আর তাকে গুল্‌তি চালিয়ে নামাই, তা হলে কি তুমি তার মাংস খাবে?

মাসাম্‌মা বলল, ঠিক আছে তাই কোরো।

ডিকের কাঠকুটো কুড়োবার অভ্যেস নেই। মাসাম্‌মার সঙ্গে পড়ে সে গাছের শুকনো ডাল ভাঙতে লাগল। কেবল রান্নার জন্যে নয়, শীতকালে কিছু রাত অবধি জ্বালিয়ে রাখতে হয় শুকনো ডলপালাগুলো। তারপরেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ে কম্বল ঢাকা দিয়ে।

ডিক বড় ঘুমকাতুরে। গল্পের ভেতর যতরাতই হোক সে জেগে থাকে, কিন্তু একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর তাকে তোলা যাবে না। উঠবে সেই একেবারে ভোরবেলায়।

মাসাম্‌মা কিন্তু রাতে ঘুমের ভেতরেও কয়েকবার জেগে উঠে বসে। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কোনও জন্তু জানোয়ার কাছে পিঠে রয়েছে কিনা।

একরাতে শ্বাস টানতে শুনে সে চমকে উঠে বসেছিল। কোনও জন্তুর নিঃশ্বাসের শব্দ কি সে শুনছে? না, ডিক আরামে ঘুমোচ্ছে, তারই শব্দিত নিঃশ্বাস তার গায়ে এসে লাগছে। সে মৃদু হেসে তার কম্বলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

রাতের অন্ধকারে সে বনের দিকে তাকিয়ে থাকে। দূর থেকে দেখে, কোনও জন্তুর চোখ জ্বলছে কিনা। হাতের কাছে, ছোট্ট কুঠারটা সে রেখে দেয়। এইটুকু বয়স কিন্তু প্রচণ্ড সাহস আর শক্তি তার। সে বাঘ কিংবা ভালুকের সঙ্গে নির্ভীকভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে, জয় পরাজয় যাই হোক না কেন।

একবার সে একটা ভালুকের সামনে পড়ে গিয়েছিল। তখনও ডিক কনভেন্ট থেকে আসেনি তার বাড়িতে। সে গিয়েছিল মিসেস পেগির জন্য বিশেষ একটি ঝরনা থেকে জল আনতে। সে জানত না বেলাশেষে জানোয়াররা ওই ঝরনায় এসে জল খেয়ে যায়।

ও তখন জল ভরছিল। ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল ভালুকটা। সে ভাবতেই পারেনি তার জল খাওয়ার জায়গায় অন্য কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। ভালুক তার থাবাটা ওর পিঠের ওপর রাখল। ও ছিটকে অনেকটা দূরে গড়িয়ে পড়ল। ভরা কলসী গব্‌ গব্‌ করে জল ওগরাতে ওগরাতে চলে গেল ঝরনায়।

মাসাম্‌মা ফিরে দেখল, একটা ভালুক ওর দিকে চেয়ে আছে। দুটো পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। সাদা সাদা হিংস্র দাঁতগুলো তার বেরিয়ে পড়েছে।

মুহূর্তে মাসাম্‌মা তার কোমর থেকে ঝুলে থাকা কুডুলখানা টেনে নিল। এখন থপ থপ করে তার দিকে এগিয়ে আসছে ভালুকটা। একটা হিংস্র ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছে সে। নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের মতো নিঃশ্বাস।

মাসাম্‌মা বুঝে নিল, এই ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার হাত থেকে নিষ্কৃতির কোনও উপায় নেই। ছুটে পালাতে গেলে সে ধরে ফেলবে।

ঠিক সেই সময় কে যেন তার পেছন থেকে বলল, ভয় কি, এগিয়ে যা। কুডুলটা তো তোর হাতেই রয়েছে।

মাসাম্‌মা কোনও দিকে না তাকিয়ে ডান হাতে কুডুলটা নিয়ে চালিয়ে দিল ভালুকটার নাক আর কপালের মাঝখানে। আশ্চর্য! ভালুকটা চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল।

মাসাম্‌মা পেতলের কলসীটা ঝরনা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে জল তুলল। আর্ত পশুটার মুখে মাথায় কিছুটা জল ঢেলে দিয়ে বাড়ির পথে রওনা হল। কিন্তু তার এই বীরত্বের কথা কারও কাছে আর সে বলল না।

পরের দিন মৃত ভালুকটাকে দেখতে পেয়ে শহরতলীর কিছু লোক সোরগোল তুলেছিল। মি. সেসিল শহরের কারও কারও মুখ থেকে সে খবর শুনেছিলেন। তিনি বাড়িতে এসে মিসেস পেগির কাছে বলেছিলেন, তুমি আর মাসাম্‌মাকে ওই ঝরনায় জল আনতে পাঠিও না। অনেকে বলেছে, ওখানে জানোয়াররা জল খেতে আসে। ওখানে একটা ভালুককে নাকি মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

মিসেস পেগির কাছে বসেছিল মাসাম্‌মা। সে সব শুনল, কিন্তু একটা কথাও মুখ ফুটে বের করল না।

অনেক পরে অবশ্য কথাপ্রসঙ্গে মি. সেসিল ঘটনাটা জানতে পেরেছিলেন। তিনি খুশি হয়ে মাসাম্‌মাকে একটা ঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন।

মাসাম্‌মা বলেছিল, তোমার ঘড়ি নেব বাবা, কিন্তু আগে বলো, তুমি শহরে এ কথাটা রটনা করে বেড়াবে না।

আরে, আমি কেন, তোর এই বীরত্বের জন্য গভর্ণমেণ্টই তোকে পুরস্কার দেবে।

মাসাম্‌মা বলেছিল, আমার কোনও পুরস্কারই চাই না বাবা। ভালুকের থাবা এড়িয়ে মায়ের জন্য জল আনতে পেরেছি, এতেই আনন্দ।

গভীর জঙ্গলের ভেতর শুয়ে রাতে ঘুম এলো না মাসাম্‌মার। স্মৃতিগুলো নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে জোনাকির মতো, ভিড় জমাচ্ছে মগজের চারধারে। আবার চলে যাচ্ছে নাচতে নাচতে। রাতে বনের কি অদ্ভুত রূপ। বুনো ফুলের গন্ধ, নানা ধরনের পাতার গন্ধ, ঘাসের গন্ধ মিলেমিশে বাতাসে ভর করে ভেসে আসে। দিনে কিন্তু সেই মিশ্রিত সুবাস কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

এরপর শব্দ। শত শত কীটপতঙ্গের সম্মিলিত ধ্বনি যেন বনের আসরকে মাতিয়ে রাখে। তার ওপর আছে নাটকের কুশীলবেরা। বাঘ, ভালুক, হরিণ, কুকুর থেকে রাতচরা পাখি আর বিচিত্র দর্শন পেঁচা। অরণ্যের রঙ্গমঞ্চে সহসা জেগে উঠেছে প্রচণ্ড আর্তনাদ। মৃত্যুপথযাত্রী সম্বরের করুণ চিৎকার। বাঘের হুংকারও শোনা যায়। তখন থরথর করে বন কেঁপে ওঠে।

বিশাল অজগর যখন জ্যান্ত পশুটাকে গ্রাস করতে থাকে তখন অতি সূক্ষ্ম করুণ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে বাতাস চিরে চিরে।

আবছা জ্যোৎস্নায় পেঁচাগুলো গাছের কোটর থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নখে গেঁথে তুলে নিয়ে যায় ধেড়ে ইঁদুরগুলোকে। সুযোগসন্ধানী সাপ রাতের আবছা অন্ধকারে গাছের ওপর উঠে গিয়ে পাখির ছানাগুলোকে গিলতে থাকে। পাখিদের পাড়ায় তখন শুরু হয় ভীষণ কোলাহল। তারা পাখা ঝাপটে কিছুটা ওপরে উড়ে যায়, আবার ফিরে আসে তাদের বাসায়। মমতার বাঁধন ছিঁড়ে তারা বাচ্চাগুলোকে বাসায় ফেলে রেখে দূরে সরে যেতে পারে না।

রাত আর দিনের সব খবরই রাখে মাসাম্‌মা। চেঞ্চুদের কন্যা বনের অন্ধিসন্ধি চেনে, বনবাসী জীবজন্তুদের সমস্ত আচার আচরণ।

পাশে পড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে ডিক। এ কি তার মাসাম্‌মার ওপর একান্ত নির্ভরতা?

ভোর হলেই সমস্ত বন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আলোর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। সে সমস্ত জড়তাকে ধীরে ধীরে কাটিয়ে দেয়।

ডিককে কিন্তু ঘুম থেকে ঠেলে ওঠাতে হল। সে বোধহয় ঠিকমতো ছুটিটাকে উপভোগ করতে জানে। এ যাত্রায় ঘুম আর বনভোজন তার আনন্দের পাত্রকে পূর্ণ করে দিয়েছে।

ওই বনের ভেতরেই দু-চারটে মিষ্টি ফলের গাছ দেখা গেল। পাথর ছুঁড়ে বা গুলতি চালিয়ে বেশ কিছু ফল পাড়ল ডিক। বলল, অজানা অচেনা গাছপালার ভেতরে এমন সুস্বাদু ফলের গাছ জন্মায় কি করে?

মাসাম্‌মা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ওগুলো বানজারাদের কাজ। চেঞ্চুদের ভেতরেও বানজারা সম্প্রদায় রয়েছে। তারা কখনও একজায়গায় ঘরবেঁধে থাকে না। তারা বনের ভেতর যেখানে সেখানে সরস ফলের গাছ লাগায়। শুধু তাই নয়, রোগ উপশমের জন্য যে সব লতাপাতার দরকার হয় সেগুলোও ওরা বনের যেখানে সেখানে রোপণ করে।

অনেকে বানজারাদের চোর বলে অপবাদ দেয়। ওরা সুযোগ পেলে গৃহস্থদের টুকিটাকি হাতসাফাই করে নিয়ে পালায়। ছাগল মুরগিও তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু উপকার করে অনেক বেশি। ফল আর রোগ নিরাময়ের গাছ লাগিয়ে ওরা মানুষের জীবন বাঁচায়।

ডিক বলল, সত্যিই বিচিত্র এই সব মানুষ!

ওরা শ্রীশৈলমের দেবমন্দির দর্শন করল। দারুণ ভক্তিমতী মাসাম্‌মা।

সে আগেও বহুযাত্রী নিয়ে এই দেবমন্দিরে এসেছে। তবু যখনই আসে তখনই তার সবকিছু নতুন বলে মনে হয়।

সে কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে দেব-বিগ্রহকে প্রণাম করল। একসময় পাশে তাকিয়ে দেখল, ডিক মন্দিরে নেই। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, ডিক মন্দিরের দিকে পেছন করে সামনে দোকানপাটের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে আহত হল মাসাম্‌মা।

ফেরার পথে মাসাম্‌মা জানতে চাইল, সে দেবতাকে প্রণাম করেছে কিনা?

ডিক বলল, তোমাদের ওই দেবতাকে প্রণাম করতে যাব কেন? আমি তো পৌত্তলিক নই।

মাসাম্‌মা বলল, আমি কিন্তু তোমাদের চার্চের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে নমস্কার করি।

ডিক বলল, আমরা মুর্তিপূজার ঘোরতর বিরোধী, এটা কি তুমি জান না?

মাসাম্‌মা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, তা হলে এত পথ পেরিয়ে তুমি মন্দির দেখতে এলে কেন?

রাগ কোরো না মাসাম্‌মা, আমি বনের ভেতর দিয়ে পথচলার আনন্দটুকু উপভোগ করতে এসেছিলাম। দেবদর্শন উপলক্ষ মাত্র। এবার বলো, এতটা পথ এসে তুমি খুশি হয়েছো তো?

মাসাম্‌মা বলল, তুমি পথ চলার আনন্দটুকু পেয়েছ এতেই আমি খুশি।

ফিরে যেতে যেতে ডিক বলল, বনের সত্যিই একটা আশ্চর্য টান আছে। গাছগুলো কথা বলে না, কিন্তু কাছে টানে, তা ছাড়া..........

মাসাম্‌মা বলল, তা ছাড়া কি?

এই যে প্রতিদিনের বনভোজন, এ আনন্দের কি তুলনা আছে!

ফেরার পথেও সেই আনন্দ, সেই উত্তেজনা। ডিক তার গুলতি দিয়ে পাখি মারে, মাসাম্‌মা তৈরি করে মুখরোচক খানা।

চলতে চলতে কথা হয়। ডিক বলে, শুনেছি তোমাদের অজস্র দেবদেবী। ওরা কি তোমাদের পুজোয় কেবল তুষ্ট হয়ে থাকেন, না ওদের আলাদা কিছু কাজকর্ম আছে।

মাসাম্‌মা বলল, আমাদের সব সুখদুঃখের পেছনে দেবতার হাত থাকে। কনক দুর্গাম্‌মা-র কথা তোমাকে আগেই বলেছি, দেবী পলের্‌রাও গ্রামবাসীদের ভীষণ সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করেন। এই যারা শিকারে যায়, বনের পশুদের দেবীর কাছে তাদের পুজো দিতে হয়। এতেই তারা বাঘ ভালুকের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়, ভাল ভাল শিকারও জোটে তাদের ভাগ্যে।

ডিক বলল, তোমাদের এই পশুদের দেবীটির কোনও নাম আছে নাকি?

আছে বইকি। ওর নাম, গর্‌লা মইসাম্‌মা। একটি নয়, হাজারো দেবদেবী রয়েছেন। ওঁদের কাছ থেকেই তো আমরা নানা রকম শক্তি পেয়ে থাকি।

পথে পড়ল মার্‌লিপালেম গ্রাম। এ গ্রামটাতে সাপুড়েদের বাস। যাওয়ার সময় এ পথ দিয়ে যায়নি ওরা, একটা নতুন রাস্তা দিয়ে ফিরবে ডিককে নিয়ে তাই এ গ্রামে ঢুকে পড়েছে মাসাম্‌মা।

ওরা দেখল, একটা গাছের তলায় ঢিবিতে দেবী নাগিনার পুজো করছে কতকগুলো লোক।

মেয়েরা যেমন দেব নাগেন্দ্রের পুজো করে, দেবী নাগিনার পুজো করে পুরুষরা।

সাপ ধরতে গিয়ে সাপে যাতে না কাটে তাই দেবীর পুজো দিয়ে ওরা বেরোয়।

ডিক বলল, তোমাদের এ দেশেই আমার জন্ম। দু-একটা সাপও যে দেখিনি তা নয়, তবে ওদের নাম গোত্র কিছুই আমার জানা নেই। দু-একটা নাম বলবে? এই সাপুড়েরা যে সব সাপ ধরে।

মাসাম্‌মা বলল, এই যেমন জের্‌রিপুট, বাতালিপুট, দাসারিপানু, এদের বিষ আছে কিন্তু গোখরোর মতন নয়।

ওরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, এমন সময় সর্পদেবীর পুজো শেষ করে সাপুড়েরা গ্রামের ভেতর চলে গেল। যে লোকটিকে দলের পাণ্ডা বলে মনে হচ্ছিল সে অন্য সাপুড়েদের সঙ্গে গেল না। বসে বসে কতক্ষণ চোখবন্ধ করে বিড়বিড় করতে লাগল।

একসময় পুজো শেষ করে উঠে দাঁড়াল সাপুড়েদের সর্দার। এতক্ষণে তার চোখ পড়ল মাসাম্‌মা আর ডিকের ওপর। বিস্ময়ে তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। এরা আবার এলো কোথা থেকে!

একজন ধবধবে ফর্সা সাহেব অন্যজন ময়লা রঙের চেঞ্চু।

সর্দারকে উঠতে দেখে ডিক বলল, চলো, ওর কাছে যাই।

মাসাম্‌মা বলল, কি করবে ওর কাছে গিয়ে?

সাপে কাটার মন্ত্র-টন্ত্র কিছু জানে কিনা দেখি।

মাসাম্‌মা বলল, ওসবে তো তুমি বিশ্বাস কর না।

না না, সাপুড়েদের কাছে ও সব শিখে নিতে হয়।

এখন ডিক প্রবল বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। মাসাম্‌মা ডিকের সঙ্গে এগিয়ে গেল। সাপুড়েদের সর্দার জিজ্ঞেস করল, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

মাসাম্‌মা বলল, শ্রীশৈলেম মন্দির থেকে।

যাচ্ছ কোথায়?

মাসাম্‌মা জবাব দিল, পুল্লাইপল্লী।

সাপুড়ের সর্দার সব জানে। সে বলল পুল্লাইপল্লীর রাস্তা তো এটা নয়।

মাসাম্‌মা এবার বলল, রাস্তাটা দক্ষিণে আমরা ছেড়ে এসেছি। এদিকে ঢুকে পড়েছি গ্রামটা দেখব বলে, তারপর আবার দক্ষিণের পথ ধরে এগোবো।

সাপুড়ের সর্দার বলল, কি নাম তোমাদের বাপ?

ডিক বলল, ও মাসাম্‌মা, আমি ডিক।

তোমাব কি নাম সর্দার?

গুন্‌টি আঙ্কাটাইয়া।

এবার আবদার ধরল ডিক, সর্দার একটা কথা রাখবে আমার।

বলো কি কথা?

তুমি কি আমাকে একটা সাপে কাটার মন্ত্র শিখিয়ে দেবে?

বেশ কিছুক্ষণ আপনমনে কি যেন ভাবল আঙ্কাটাইয়া। একসময় ডিকের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি কিছু খরচ করতে পারবে? আমার কাছে এমন কিছু আছে, কিছুদুর থেকে তার গন্ধ পেলেই সাপের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

দাও সর্দার, ওটা আমাকে দাও।

আগেই বলেছি এটার অনেক দাম, বড় কষ্ট করে এ জিনিস সংগ্রহ করতে হয়।

ডিকের গলায় একটা সোনার চেন ছিল, তাতে ঝুলছিল যিশুর প্রতিকৃতি আঁকা একটি লকেট। সে বলল, আমার কাছে বেশি টাকা পয়সা নেই, তোমাকে এই সোনার চেনটা দিলে তুমি আমাকে ওই বস্তুটি দেবে?

সর্দারের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। সে বলল, তুমি যখন এত করে বলছ তখন দিতে পারি। মাঝে মাঝে এটিকে দুধে চুবিয়ে সূর্যের আলোয় শুকিয়ে রাখবে।

মাসাম্‌মার চোখও বড় বড় হয়ে উঠল, যেন পরশমনির সন্ধান পাওয়া গেছে। সে বলে উঠল, তোমার ও জিনিসটি কি 'নাগমুষ্ঠি চেক্‌কা'?

হেসে মাথা নাড়ল সাপুড়ে সর্দার।

এবার ট্যাক থেকে একটা শেকড় বের করে ওদের সামনে তুলে ধরল সে।

অমনি গলা থেকে ডিক খুলে ফেলল তার সোনার চেনটা। যিশুর লকেটটা বের করে নিয়ে চেনটা সর্দারের হাতে তুলে দিয়ে বলল, দাও আমায় ওই শেকড়। কি যেন নাম বললে ওর?

সর্দার বলল, 'নাগমুষ্ঠি চেক্কা'।

ডিক শেকড়টা হাতে নিয়ে মাথায় ছুঁইয়ে সযত্নে পকেটে রেখে দিতেই মাসাম্‌মা বলল, এতদিনে তোমার আমাদের দেবদেবীর ওপর ভক্তি হল।

ডিক তখন হীরের খনি পাবার আনন্দে ভরপুর। সে শুধু খুশিতে ডগমগ হয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

ঘরে ফেরার এইটি শেষ রাত। সারা পথ ওই দুর্লভ বস্তুটি লাভের উত্তেজনায় বুঁদ হয়ে ছিল ডিক। পথে শিকার করেছে মনের আনন্দে।

মাসাম্‌মার নির্দেশ মেনে সে কিন্তু একটির বেশি পাখি শিকার করেনি। মাসাম্‌মা মাটি খুঁড়ে একটি মেটে আলু সংগ্রহ করেছিল, সেটি দিয়ে তৈরি হয়েছিল মাংসের সুস্বাদু কারী। দুজনে কাছাকাছি বসে বড় পরিতৃপ্তির সঙ্গে রাতের আহার শেষ করেছিল। ডিক জোর করে নিজের প্লেট থেকে দু'এক টুকরো মাংস তুলে নিয়ে মাসাম্‌মার প্লেটে রেখে বলেছিল, এগুলো তোমাকে খেতেই হবে।

মাসাম্‌মা মাথা নেড়ে বলেছিল, তুমি জানো আমি বেশি খেতে পারি না।

আমার অনুরোধ ওই দু-টুকরো খেয়ে নাও।

মাসাম্‌মা আর কোনও প্রতিবাদ না করে অতিরিক্ত দু-টুকরো মাংস খেয়ে নিয়েছিল।

এরপর ডিক একটি কাণ্ড করে বসল, যা ছিল মাসাম্‌মার ভাবনার বাইরে। ডিক খাওয়া শেষ করে তার ব্যাগের চেনটা খুলে ফেলে তার ভেতর থেকে টেনে বের করল একটা হুইস্কির বোতল।

ততক্ষণে মাসাম্‌মার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। সে মি. সেসিলকে ড্রিংক করতে দেখেছে। মিসেস পেগিও দু-এক পেগ খান। কিন্তু ডিককে তার বাড়িতে কিংবা বেড়াতে আসার পথে একবারও খেতে দেখেনি, তাই সে অবাক হল। ও বস্তু খাবার মতো বয়স ডিকের এখনও হয়নি।

ডিক বলল, আজ আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে।

বুদ্ধিমতি মাসাম্‌মা ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল। সে ক্ষোভের সঙ্গে বলল, তুমি ওই বস্তুটি খাবার কথা বলবে তো? আমি এখনও আমার মহল্লার মেয়েদের সঙ্গে বসে একবিন্দু মহুয়ার মদ খাইনি। অন্যকিছু অনুরোধ থাকলে করতে পার।

ডিক কাতর চোখে তাকিয়ে বলল, ছোট্ট একটা পেগ কি তুমি আমার অনুরোধে খেতে পার না?

তুমি আমাকে বার বার ও কথা বললে আমি কষ্ট পাব ডিক।

দ্বিতীয়বার অনুরোধ না করে পেট ভর্তি করে ডিক হুইস্কি খেতে লাগল।

সেদিকে না তাকিয়ে মাসাম্‌মা আপনমনে কাজকর্ম সেরে নিল।

তার মনে হল, গুলতি ছুঁড়ে ডিক তার বুকের একটা পাঁজর খসিয়ে দিয়েছে।

সব কিছু ধুয়ে মুছে গোছগাছ করে সে বিছানা পাতল। ডিকের দিকে না তাকিয়েই সে বুঝতে পারল, হুইস্কির ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। হাসছে, অসংলগ্ন কতকগুলো কথা বলে যাচ্ছে ডিক।

একবার মাসাম্‌মা সোজাসুজি তাকাল ডিকের দিকে। বলল, বিছানা তৈরি, শুয়ে পড়ো।

ডিক টলতে টলতে উল্টোদিকে চলে যাচ্ছিল। মাসাম্‌মা তাকে জোর করে ধরে এনে শুইয়ে দিল।

ডিক কতক্ষণ আপনমনে বকবক করে গেল। মাসাম্‌মা কিন্তু তার বিছানায় শুয়ে অন্ধকারের ভেতরেও জেগে ছিল। ডিক যখন একেবারে চুপ করে গেল তখন মাসাম্‌মা বোঝার চেষ্টা করল সত্যিই ডিক ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা।

দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছিল ডিকের। মাসাম্‌মার মনে হল সে ঘুমোচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল মাসাম্‌মা। অল্প সময়ের ভেতরেই তার চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে।

স্বপ্ন দেখছে মাসাম্‌মা—হাজার হাজার সাপ কিলবিল করে খেলা করছে ভ্যালির সবুজ ঘাসের মধ্যে। তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। কেউ ফণা তুলে বার বার ছোবল মারছে মাটিতে। ও কেবলই ভাবছে, কোথায় গেল সেই নাগমুষ্ঠি চেক্‌কা।

হঠাৎ অনুভব করল, একটা বিশাল অজগর সহসা তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে, মুখে এসে লাগছে তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। সে হাত-পা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল কিন্তু প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরছে সে সরীসৃপটা। এ কি! ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে লজ্জাবস্ত্র। সে মরিয়া হয়ে কোমর থেকে টেনে বের করল তার কোদাভালি। আক্রমণকারীর শরীরে বসিয়ে দিল একটা কোপ।

তীব্র একটা আর্তনাদ উঠল। আহত আজগর তো এমন করে শব্দ করে না। সরীসৃপটা দেহ ছেড়ে মনে হল পাশে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

স্বপ্ন ও ঘুমের ঘোরে মাসাম্‌মা যা দেখছিল আর ভাবছিল, মুহূর্তে তা পরিবর্তিত হয়ে গেল।

গাছের ফাঁকে সেই মুহূর্তে এসে পড়ল রহস্যময় একটুকরো আলো। সে ভাল করে চোখমুখ মুছে চারদিকে দেখতে লাগল।

সে দেখল পাশের বিছানায় ডিক উপুড় হয়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। যে অজগরটা একটু আগে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, সে ডিক ছাড়া আর কেউ নয়। ডিকই তাহলে তাকে বিবস্ত্র করার চেষ্টায় ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে তার পরিধেয়!

কোথায় গেল তার কোদাভালি? সে হাত বাড়িয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখল, ডিকের পিঠে অস্ত্রটা তখনও গেঁথে আছে। সে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে টেনে বের করে আনল। এই মুহূর্তে ভয়ের সঙ্গে একটা করুণা জন্ম নিল তার মনে।

ভয় মি. সেসিলের কথা ভেবে। এই আঘাতের জন্য ডিকের মা বাবার কাছে সে কি কৈফিয়ৎ দেবে! তার সঙ্গেই ডিককে ওরা ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের ছেলেকে ও নিজের হাতে তীব্র আঘাত হেনেছে। এ জন্যে তাকে নিশ্চয়ই শাস্তি পেতে হবে। অন্যদিকে তার একান্ত সঙ্গীটিকে আঘাত দেওয়ার জন্যে মনে জেগে উঠল করুণা।

মাসাম্‌মা পাগলের মতো ছুটলো লতাপাতা সংগ্রহ করতে। আজন্ম বনবাসীরা জানে, লতাপাতার বিচিত্র সব গুণ।

কিছুক্ষণের ভেতরেই সে কতকগুলো পাতা আর শেকড় থেঁতো করে আনল। সে নিজের কাপড়ের কিছু অংশ ছিঁড়ে পাতার মণ্ডগুলো দিয়ে ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিল। থেঁতো করা শেকড়টা খাইয়ে দিল জলের সঙ্গে।

অল্প সময়ের ভেতরেই ঘুম এসে গেল ডিকের। ওর যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে।

পাতার গুণে ইতিমধ্যেই রক্ত একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাতে যে শেকড়টা খাইয়েছিল তার অবশিষ্ট অংশটা আজও থেঁতো করে খাওয়াল। ওই শেকড়টি ছিল যন্ত্রণা হরণের মহৌষধ।

নিজের মনের দুঃখ আর অপমানকে সে চেপে রেখে ডিকের সেবা করতে লাগল।

সঞ্চিত খাবারও ফুরিয়ে এসেছিল, একদিনের বেশি কোনওমতেই আর থাকা চলে না। ডিককে তার বাড়িতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে দিতে হবে।

মাসাম্‌মার ওপর ভর রেখে ধীরে ধীরে চলতে লাগল ডিক। কোনও কিছু না বলে অবশিষ্ট খাবারটুকু ডিককে খাওয়াতে লাগল মাসাম্‌মা।

পথ চলতে চলতে মাসাম্‌মা ভাবতে লাগল, ডিক কি অর্ধচেতন অবস্থায় তাকে আক্রমণ করেছিল? না তীব্র একটা প্রলোভন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে?

এর কিছু সমাধান সে খুঁজে পেল না। সে যা করেছে তা তার আত্মরক্ষার তাগিদেই করেছে। সে জ্ঞাতসারে কোন অন্যায় করেনি।

বহু যত্নে, বহু সেবায়, বহু কষ্টে পরদিন সন্ধ্যায় মাসাম্‌মা ডিককে নিয়ে তুলল মি. সেসিলের বাড়িতে।

ছেলের অবস্থা দেখে মিসেস পেগি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। পেছনের কিচেন গার্ডেনে কাজ করছিলেন মি. সেসিল। স্ত্রীর কান্না শুনে ছুটে এলেন তিনি।

একি অবস্থা হয়েছে ডিকের। তিনি ছেলেকে ধরে শুইয়ে দিলেন মিসেস পেগির পাশের কটে। স্ত্রীর সেবার জন্যে এখানেই মি. সেসিল রাত্রিযাপন করেন।

মি. সেসিলের নির্দেশে মাসাম্‌মা ছুটল হাউস ফিজিসিয়ান ডঃ গিলবার্টকে খবর দিতে।

ডাক্তার এসে অ্যান্টি টিটেনাস দিয়ে বাকি ওষুধপত্র প্রেসক্রাইব করে গেলেন। ডিসপেনসারি থেকে ওষুধও নিয়ে এল মাসাম্‌মা।

ঘটনা বর্ণনার সময়ে সে যে অজগর ভেবে অস্ত্র চালিয়ে ডিককে আহত করেছে সে কথা ডিকের মা-বাবাকে বলতে ভুলল না। কিন্তু কোনও মতেই মুখ ফুটে বলতে পারল না ডিকের নগ্ন বিকৃত কামনার কথা।

মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মিসেস পেগি। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মুহূর্তে ওই ডাইনীটাকে ঘর থেকে বের করে দাও। ডাক্তারের নির্দেশ মতো তুমিও ওর পরিচর্যা করতে পারবে। দু-চারদিনের ভেতরে নিশ্চয়ই ও ভাল হয়ে উঠবে।

জলভরা চোখে সমস্ত শাস্তিটুকু মাথা পেতে নিল মাসাম্‌মা। একটিও কথা উচ্চারণ করল

না, ডিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই সে করল না। সবার উদ্দেশ্যে একবার শুধু মাথা নত করে ঘর থেকে পথে নেমে গেল মাসাম্‌মা।

পশ্চিম আকাশে তখন সন্ধ্যা নামছে। সে চলতে লাগল তার ছেড়ে আসা গ্রাম লক্ষ করে। সমস্ত বুক ভরে উঠেছে তার কান্নায়।

পেছন থেকে এসে কে তার মাথায় হাত রাখল! সে থমকে ফিরে দাঁড়াল। মি. সেসিল দু-হাতে তার মুখখানি তুলে ধরেছেন। টপ্‌ টপ্‌ করে দু-ফোঁটা জল মি. সেসিলের হাতে এসে পড়ল। তিনি তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি না বললেও সমস্ত ঘটনাই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তুমি ডিককে আঘাত করে অন্যায় করনি।

মি. সেসিল একবাণ্ডিল নোট মাসাম্‌মার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, অসুস্থ স্ত্রীর মনে কোনওভাবেই আমি আঘাত দিতে চাই না, তাই প্রবল ইচ্ছে থাকলেও তোমাকে আমি রাখতে পারলাম না। এই টাকা কটা তোমার কাজে লাগলে আমি বড় আনন্দ পাব মাসাম্‌মা।

ও মাটিতে নতজানু হয়ে বসে পড়ে মি. সেসিলের জানু স্পর্শ করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার স্নেহ ভালবাসার কথা আমি কোনও দিনই ভুলতে পারব না মি. সেসিল, শুধু একটা অনুরোধ, এই টাকাগুলো দিয়ে আপনাদের কাছে আর ঋণী করে রাখবেন না।

করুণ চোখে মি. সেসিলের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে মাসাম্‌মা সন্ধ্যার অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

নাল্‌লাপটুলা ও মাসাম্‌মা

নিজের গাঁও-তে গিয়ে পৌঁছতেই হই হই পড়ে গেল চারদিকে। মাসাম্‌মা ঘরে ফিরে এসেছে খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ফেলে ছুটে এল সবাই। মেয়েরা তাকে ঘিরে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল।

পুরুসদের সঙ্গে মুখিয়া গুরুপ্‌পার উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল, এখন বেশ ডাগর ডোগরটি হয়েছ, নিজের বাড়িঘর সামলাও, করে কর্মে খাও, বিয়ে সাদি হয়নি, গাঁয়ের মেয়ে বাইরে থাকবে কেন, সকলের সঙ্গে থাকলে একটা পেট খুব চলে যাবে।

সকলের ভরসায় বাপের ঘরে ঝাঁটপাট দিল মাসাম্‌মা। জ্ঞাতিরা এসে উড়ে যাওয়া চালে খড় চাপিয়ে দিয়ে গেল। সব বাড়ির মেয়েরা এক একদিন করে ডেকে খাওয়ালো। তাকে ঘিরে বসে সাহেব বাড়ির গল্প শুনল কৌতূহলী মেয়েরা। কিন্তু কি কারণে সে কাজ ছেড়ে এসেছে সে কথা একবারও বলল না কারও কাছে।

নিজের বাড়ির চারদিকের জমিটুকু খুঁড়ে খুঁড়ে কিছু ফসল তৈরি করল সে। ফাঁদ পেতে পাখি আর খরগোস ধরে জীবন নির্বাহ করতে লাগল। যে ডাকে, তারই কাজে সাহায্য করতে ছুটে যায় মাসাম্‌মা।

বছরখানেক এইভাবে কাটল। জীবনের একটা ধর্ম আছে, যৌবনের একটা চাহিদা আছে, মহুয়া গন্ধ ছড়ায় বনে আর মনে। বসন্তের বাতাসে কার যেন ডাক ভেসে আসে, রঙিন ফুলে রাঙা হয়ে ওঠে বন, অনুরাগের রং লাগে ষোড়শী মাসাম্‌মার মনে। কুণ্ডে জল আনতে গিয়ে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পায় সে।

একদিন গাঁও-তে এল এক টাট্টো (উল্কি) আঁকনেওয়ালা। মেয়েরা বাহুতে, হাতে উল্কি আঁকতে লাগল। বেশির ভাগ, বীর হনুমানের লম্ফ দেওয়ামূর্তি। সবার ধারণা, বীর হনুমান তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

উল্কি পরার সময় সব মেয়েই প্রায় ব্যথা পেয়ে একটু চেঁচামেচি করতে লাগল। কিন্তু ঠায় বসে রইল মাসাম্মা। মুখে তার কষ্টের এতটুকু চিহ্ন নেই।

বয়স্ক শিল্পীটি একটু অবাক হল। তার কাজ শেষ হলে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গাঁয়ের মুখিয়াকে সে বলল, অসম্ভব সহ্য শক্তি এই মেয়েটির। এ যে ঘরে যাবে, সে ঘর ভরে উঠবে লক্ষ্মীর দানে।

মোড়ল অমনি বলল, তুমি তো সব জায়গায় ঘোরো, মাসাম্মার একটা পাত্র জোগাড় করে দাও না?

একটু ভেবে নিয়ে লোকটি বলল, অবস্থা ভাল তবে দোজবর। বছর তিনেক বিয়ে হয়েছিল, ছেলেপুলে না রেখে বউ মরেছে। বাপ বাঁশের কাজ করে, ব্যবসা জমজমাট। ছেলেটাও বেশ রোজগেরে। গবরমেণ্টের বন বিভাগে চৌকিদার। সে পাত্রী খুঁজছে। যদি রাজি থাকো, আগামী মাসেই শুভকাজটা সেরে দেওয়া যাবে।

মোড়ল দু-চারজনের সঙ্গে কথাটা নিয়ে আলোচনা করল, তার পর একজনকে উল্কি আঁকনেওয়ালার সঙ্গে পাঠিয়ে দিল ওই পাত্রটির গাঁয়ে।

কনেপক্ষের লোককে বেশ খাতির যত্ন করল বরপক্ষের লোক। কনের বাড়িও এলো বরপক্ষের লোকেরা। পাকা হয়ে গেল কথাবার্তা। বরের বাপ একশো টাকা দেবে মুখিয়াকে কনেপণ বাবদ। সঙ্গে এক কুইণ্টাল চাল, একটা পাঁঠা আর কয়েক বোতল মহুয়ার মদ।

গাঁয়ের কেউ মাসাম্মাকে তার বিয়ের ব্যাপারে কোন কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনবোধ করল না। কেবল মেয়েরা তাকে ঘিরে নানারকম কৌতুক করতে লাগল। বর সরকারী চাকুরে, এত বড় সৌভাগ্য এই পাঁচসাতটা তল্লাটে কারই বা হয়েছে। সেদিক থেকে মাসাম্মা ভাগ্যবতী বই কি।

বিয়ের দিন মুখিয়ার নেতৃত্বে বিয়ের প্যাণ্ডেল বাঁধা হল। বরপক্ষের প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন এসে পড়ল মাসাম্মাদের গাঁয়ে।

বিয়ের আগে আলাদা আলাদা জায়গায় স্নান করানো হল বর আর কনেকে। এরপর ওরা একটি করে সাদা কাপড় পরল, মেয়ের ব্লাউজটিও সাদা। কেবল পাড়টি তৈরী করা হয়েছে হলুদ রঙ দিয়ে। বর আর বধূর একই রকম। হলুদ জলে ছোপানো একটুকরো কাপড় বাঁধা আছে বরের ডান হাতে। ঠিক এমনি একটুকরো কাপড় বাঁধা রয়েছে মেয়ের বাম হাতে।

কোলাগাদু বা পুরোহিত বসে আছে বরের পাশে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে। বরের পাশে একটা থালায় রাখা আছে কিছু আতপচাল, তাতে হলুদের গুঁড়ো ছড়ানো। ছেলের কাপড়ের খুঁটের সঙ্গে একসময় বেঁধে দেওয়া হল মেয়ের আঁচলের একটা অংশ। বর বধূর এই বাঁধনটা বরের বাড়ি অবধি অটুট থাকবে। পুরোহিতের নির্দেশে ওরা হলুদ গুঁড়ো মাখানো চাল পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে দিল।

ইতিমধ্যে কোলাগাদু রূপোর একটি তালিবট্টু (লকেট) বরের হাতে দিয়ে বলল, এটি মেয়ের গলায় পরিয়ে দাও।

বর নাল্‌লাপটুলা পুরোহিতের কথায় নববধূর গলায় ঐ রূপোর লকেটটি পরিয়ে দিল।

এবার আর একটি মজার ব্যাপার ঘটল। এককুচি সুপারীসহ একটি ভাঁজ করা পানের পাতার অর্ধেক পুরোহিতের নির্দেশে নববধূ মুখে পুরলো। এখন মুখের বাইরে বেরিয়ে থাকা পাতার বাকি অংশটুকুকে বর দাঁত দিয়ে কেটে নেবে। কেটে নেওয়ার সময় একটা শব্দ যেন ওঠে। উপস্থিত সকলে বলবে, তারা শব্দটা শুনেছে। কৌতুক করে তারা যদি বলে, তাদের কানে শব্দ পৌঁছয়নি তাহলে বরকে আবার ঐ পানের কিছু অংশ শব্দ করে দাঁতে কাটতে হবে। এই ক্রিয়াটি মেয়েকেও করতে হবে বরের মুখের পান দাঁতে কেটে।

এ হল বিয়ের আসরের নিছক এক কৌতুক।

বিয়ের পর মাসাম্‌মা চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। সেখানেও কিছু অনুষ্ঠান হল।

নিয়মমত বিবাহিত পুত্রের জন্য বাপকে আলাদা জায়গায় একটা ঘর তুলে দিতে হয়, কিন্তু বিয়ে করে এসেই বউকে নিয়ে ছেলে বাবার বাড়িতে ওঠে। তারপর তিনদিন নিয়মমত ওদের বনবাস যাপন করতে হয়। একে হানিমুনও বলা যায়। ঐ তিনদিন ওরা সবার অলক্ষ্যে বনের মধ্যে কাটাবে। গাছের ফল ছাড়া ঐ কদিন ওরা অন্য কিছু খেতে পাবে না। মাসাম্‌মাকে পেয়ে মনে হল শ্বশুরবাড়ির সবাই খুশি হয়েছে।

শ্বশুর কুদুমুল্‌লা নতুন বউকে বাঁশের ঝুড়ি বোনা শেখাতে লাগল। শহরে ওগুলো বেশ দামেই বিক্রি হয়। তাছাড়া আজকাল কো-অপারেটিভ সোসাইটি হয়েছে, সেখানে ওরা এসব বাঁশের কাজ বিক্রির জন্য রাখে।

অতি বুদ্ধিমতী মাসাম্‌মা। তার হাতের সব কাজই নিখুঁত। তার আচার আচরণ সাধারণ চেঞ্চুদের থেকে অনেক উন্নত।

বিয়ের বছর খানেকের ভেতরেই বন-রক্ষক চৌকিদার হিসেবে নাল্‌লাপটুলা বনের ভেতরেই একটা ছোট্ট কোয়ার্টার পেল। যদিও ওদের গ্রাম থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বেশি দূরে নয়, তবুও কোয়ার্টারটা ওকে দেওয়া হল। এটা ওর অনেক দিনের প্রাপ্য। কিন্তু বউকে নিয়ে সেখানে চলে যাবার সাধ থাকলেও বাবাকে সেকথা বলার সাহস ছিল না তার। মাসাম্‌মা আগের মত শ্বশুরের কাজেই লেগে রইল।

নাল্‌লাপটুলা চার দিন থাকে বনের কোয়ার্টারে। একাই হাত পুড়িয়ে রান্না করে খায়, বাকি দু দিন ঘর থেকে যাতায়াত করে।

এমনি ব্যবস্থা বহাল রইল পুরো দুটো বছর। এরপর হঠাৎ কুদুমুল্‌লা মারা গেল। বাপ মারা যাবার পর পাল্টে গেল বাড়ির সব ব্যবস্থা। নাল্‌লাপটুলার মা আগেই মারা গিয়েছিল। একমাত্র বোন পাশের গাঁয়ে সংসারী। এখন বাড়ির সব ভারটা এসে পড়ল মাসাম্‌মার ওপর। সে বাড়ি ঘর গুছিয়ে সংসার চালাতে লাগল। স্বামী-সেবার ত্রুটি ছিল না তার। যে তিনটে দিন নাল্‌লাপটুলা বাড়িতে থাকত সে দিনগুলোতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্বামীর সঙ্গে নানারকম গল্প করে কাটাত সে। কিন্তু ধীরে ধীরে পাড়া প্রতিবেশীরা নিজেদের ভেতর একটা কথা বলাবলি করতে লাগল, মাসাম্‌মা কি বাঁজা? কারণ, বিয়ের পর দু'দুটো বছর পার হয়ে গেছে, সে এখনও তার স্বামীকে কোন সন্তান উপহার দিতে পারল না।

যতদিন যেতে লাগল গুঞ্জন ক্রমশ কলরবে পরিণত হল। পথে ঘাটে দেখা হলেই বন্ধুরা

নাল্‌লাপটুলাকে ক্ষ্যাপায়, এবার আরেকটা বিয়ে কর, দু'দুটো বাঁজা বউ নিয়ে সংসার করেছিস এতদিন, এবার শেষ চেষ্টা করে দেখ। বলিস তো আমরা কনে খুঁজি।

নাল্‌লাপটুলা কোন জবাব দেয় না, কেবল মুচকি মুচকি হাসে।

এবার সে ঠিকই করে ফেলল বউকে নিয়ে বনের কোয়ার্টারে গিয়ে উঠবে। মাসাম্‌মাকে সে কথা জানাতেই সে বলল, বাঁশের ব্যবসার কি হবে? এতে তো তোমার বেশ কিছু রোজগার হচ্ছে। বাবা কষ্ট করে ব্যবসাটা ফেঁদেছেন, তাকে তুলে দেওয়া কি ঠিক হবে?

নাল্‌লাপটুলা বউকে একটু মেজাজ দেখিয়ে বলল, তুই তাহলে তোর ঐ ব্যবসা নিয়েই থাক, আমি এবার থেকে সপ্তাহের সাতদিন ঐ বনবাসেই কাটাব।

অগত্যা মাসাম্‌মাকে বাঁশ বাখারির কারবার ছাড়তে হল। ঘরের পাট গুটিয়ে একদিন সে স্বামীর সঙ্গে চলল বনের কোয়ার্টারে।

এই তার প্রথম বনবাস-যাত্রা।

নাল্‌লাপটুলা আজ দামী প্যাণ্ট জুতো পরেছে, হাতে একটা লাঠি। লাঠিটা আকারে একটু ছোট, ছড়ির মত সরু। আগে আগে চলেছে ছড়ি উঁচিয়ে বনের চৌকিদার, পেছনে ঘোমটায় মুখ ঢাকা তার বউ।

মাসাম্‌মা অতখানি ঘোমটা টেনে চলার মেয়ে নয়, কিন্তু স্বামীর কড়া নির্দেশে তাকে এমনি কলা বউটি সেজে চলতে হয়েছে। কেউ তার সুন্দরী বউয়ের ওপর কুনজর দিক এটা চায় না নাল্‌লাপটুলা।

ইজারাদারের লোক গাছ কাটছে। পথ দিয়ে যেতে যেতে অকারণে ছড়ি ঘুরিয়ে তাদের শাসাচ্ছে বনের চৌকিদার, দেখ চারাগাছের ওপর যেন কাটাগাছটা না পড়ে যায়, তাহলে রক্ষে থাকবে না কিন্তু।

ওর বাহাদুরী দেখে ইজারাদারের লোকেরা কৌতুক বোধ করে। মাসাম্‌মা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে লোকগুলোর দিকে তাকায়। সে বুঝতে পারে ওদের মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

মাসাম্‌মাকে ঘোমটা ফাঁক করতে দেখে ওরা তার দিকে কৌতূহলী চোখ মেলে তাকাতে থাকে।

মাসাম্‌মা বোঝে মানুষটা তার ক্ষমতা দেখাবার জন্যেই লোকেদের ওপর এমন হাঁক ডাক করছে। এটা নতুন বউ-এর কাছে একটা ক্ষমতা জাহিরের চেষ্টা।

কোয়ার্টারটা মন্দ নয়। সামনে দু চারটে ফলকর গাছ আছে, যদিও কোয়ার্টার একখানা ঘরেরই। সে এতেই খুশি। পরিজনদের কাছ থেকে চলে আসার একটা কষ্ট আছে ঠিক কিন্তু মাসাম্‌মা চিরদিনই একটু কম কথা বলে, নীরবতাই তার প্রথম পছন্দ। সে মানিয়েও নিয়েছিল, দু চারদিনের ভেতরেই গুছিয়ে নিয়েছিল তার সংসার।

একদিন নাল্‌লাপটুলা কাজ থেকে ফিরে এসে বলল, দু হাত দূরে রেঞ্জার সাহেবের বাংলো, তাঁর বউ দেশে গেছেন, তুই যদি ক'দিন তাঁর কাজ করে দিস তাহলে ভাল হয়।

মাসাম্‌মা বলল, কেমন মানুষ তেমার রেঞ্জার সাব?

একেবারে দেবতা। অফিসে তাঁর অনেক কাজ আমিই তো করে দিই রে। উনি তো শিগগির বদলি হয়ে যাচ্ছেন, আবার কিরকম মূর্তি আসবে কে জানে।

স্বামীর কথায় মাসাম্‌মা রেঞ্জার সাহেবের বাড়িতে কাজে যেতে লাগল।

মানুষটিকে চোখে দেখে ভাল লাগল মাসাম্‌মার। তিনি যখন কোনকিছু বলেন তখন মনে হয় সাহেব নিজের ঘরের মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। গলার স্বর কখনও উঁচু পর্দায় ওঠে না। মাসাম্‌মা এই মানুষটিকে রান্না করে দেয়। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ থেকে ডিনার সবই।

রেঞ্জার সাহেব বলেন, তুমি কিন্তু খেয়ে যাবে। তোমার স্বামীর জন্যেও টিফিন কেরিয়ারে করে নিয়ে যেও।

এক একটি মানুষ আছেন যাঁদের আচার আচরণ কথাবার্তা মানুষের মনে শান্তি এনে দেয়। রেঞ্জার সাহেব ঠিক সেই প্রকৃতিরই মানুষ।

মাসাম্‌মার মনে হয়েছিল, মিঃ সেসিলের কাছ থেকে সে যেমন ভালবাসা পেয়েছিল, এ মানুষটিও সেই ভালবাসার সুরে কথা বলছেন।

কিন্তু এ সুখ দীর্ঘদিন মাসাম্‌মার কপালে জুটল না, সাহেব অন্যত্র ডি.এফ.ও-র পোস্টে প্রমোশন পেয়ে বদলি হয়ে গেলেন।

এবার তাঁর পোস্টে এলেন অন্য এক রেঞ্জার। মানুষটি বেশ সুদর্শন, অনেক কম বয়স। ক'দিন দেখা গেল ড্রাইভারকে পাশে বসিয়ে রেখে নিজেই জীপ চালাচ্ছেন। বনের আঁকা বাঁকা পথে গাড়ি যেন উড়ে চলেছে। হাঁকডাকে অধস্তন কর্মচারীরা তটস্থ হয়ে উঠল।

মাসাম্‌মা স্বামীকে বলল, আমি আর সাহেবের কোয়ার্টারে কাজ করতে যাব না।

নাল্‌লাপটুলা বউকে দাবড়ানি দিয়ে বলল, কেন যাবি না? তুই সাহেবের কাজে থাকলে আমার ওপর সাহেবের নজর খুশ্‌ থাকবে। তোকে তো নতুন সাহেব কাজ করতে বারণ করেনি।

মাসাম্‌মা মেঝের ওপর বুড়ো আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, একবার মানুষটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছিল আমার, কেমন যেন ভাল লাগেনি।

নাল্‌লাপটুলা রাগ করে বলল, তুই তোর ভাললাগা, মন্দলাগা নিয়েই থাক। তোকে আর বনের কোয়ার্টারে থাকতে হবে না, গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে যা। ইচ্ছে হলে গাঁয়ে যাব না হলে এখানেই থেকে যাব। হাত পুড়িয়ে না হয় রান্নাই করতে হবে, ওতে আমি ভয় পাই না।

ওর প্রবল রাগ গোঁসা দেখে মাসাম্‌মা একটু পিছিয়ে গেল। সে বলল, ঠিক আছে, তুমি যেমন ভাল বোঝো তাই হবে।

নাল্‌লাপটুলার মুখে খুশির হাওয়া বয়ে গেল। সাহেব তার বউকে দুচারদিন ভাল করে তো দেখুন। বুঝুন, এ তল্লাটে এমন একটা মেয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন সুন্দরী আর এমন কাজের মেয়ে।

ভোরবেলা নতুন সাহেব তাঁর কোয়ার্টারে ছিলেন। নাল্‌লাপটুলা তাঁর কাছে গিয়ে লম্বা একটা সেলাম ঠুকে বলল, সাহেব আপনার খানা পাকাবার কি বন্দোবস্ত হবে?

সাহেব বললেন, কেন চৌকিদারই তো রান্না করে দেবে।

নাল্‌লাপটুলা মাথা চুলকে বলল, ওর হাতের রান্না কি আপনি খেতে পারবেন সাব?

আগের সাহেব কি করে খেতেন?

একটি মেয়ে তাঁকে রান্না করে দিত। আপনি যদি চান সে মেয়ে আপনাকেও রান্না করে দেবে।

কোথায় সে?

হুজুর সে আমার কোয়ার্টারেই থাকে, আমার ঘরওয়ালি।

সাহেব বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আমি কাল একটি মেয়েকে প্লেট ধুয়ে কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি, সে কি তোমার বউ?

জী হুজুর।

বেশ তো কাল থেকে সেই খানা পাকাবে। চৌকিদারকে অন্য কাজে ভিড়িয়ে দেওয়া যাবে।

সাহেবের খানা পাকানো, প্লেট সাফ করার কাজে থেকে গেল মাসাম্‌মা।

এমন কি আগের মত বিছানা পাতা, পরিষ্কার করার দায়িত্বও থেকে গেল তার ওপর।

কয়েকটা দিন নিরুপদ্রবে কাটল মাসাম্‌মার। নাওয়া খাওয়ার হিসেব ছিল না নতুন রেঞ্জারের। ক্রমাগত ছুটোছুটি করে বুঝে নিচ্ছিলেন নতুন এরিয়ার কাজকর্ম। ওপরওয়ালার তাগিদ এসেছে রিপোর্ট পাঠাবার জন্য। তাই চোখে কানে দেখতে পাচ্ছিলেন না রেঞ্জার।

অনেকরাতে ফেরেন অফিস থেকে। কর্মীদের ওভারটাইম দিয়ে বকেয়া কাজকর্ম সেরে নিচ্ছিলেন।

গভীররাতে ফিরেই নাকে মুখে কিছু গুঁজে শুয়ে পড়েন পাতা বিছানায়।

টেবিলে সব খাবার সাজিয়ে রেখে আড়ালে দাঁড়িয়ে মাসাম্‌মা দেখে সাহেবের ভোজনপর্ব।

টলতে টলতে সাহেব এসে বসেন খাবার টেবিলে। কয়েক গ্রাস গেলেন ঢুলতে ঢুলতে। তারপর কোনওরকমে মুখটা ধুয়ে গড়িয়ে পড়েন পাতা বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

মাসাম্‌মা উঁকি দিয়ে দেখে, সাহেব পোশাকগুলো না ছেড়েই শুয়ে পড়েছেন। হাত পা ঝুলে পড়েছে খাটের বাইরে। মশারি ফেলার সময়ই নেই।

মাসাম্‌মা চিন্তিত হয়ে পড়ে, মশা ছেঁকে ধরবে এখুনি। তাছাড়া বিচিত্র সব পোকামাকড় উড়ছে। কোন কোনটা মুখের ওপর দিয়ে চলে গেলেই, চামড়া পুড়িয়ে দাগ টেনে দেবে।

পায়ে পায়ে নিঃশব্দে বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মাসাম্‌মা। অনেক রকম পরীক্ষার পর সে সাহেবের ঝুলে থাকা হাত-পাগুলোকে টেনে বিছানার ওপর তুলে দেয়। মাশারি ফেলে গুঁজে দেয় চারদিক। বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। সে কাজ সেরে কোনরকমে ছিটকে বেরিয়ে আসে বাইরে। নিজের কোয়ার্টারে ছুটে পালাতে পারলেই যেন বাঁচে।

নাইটগার্ডটা হাতের বন্দুক নামিয়ে রেখে গেটের দরজা খুলে দেয়। মাসাম্‌মা ছুটে গিয়ে তার কোয়ার্টারে ওঠে।

অন্ধকারে ঘরের ভেতর থেকে শব্দ ওঠে, কি রে, এত দেরী?

গলার স্বরে যেন অভিযোগ।

মাসাম্‌মাও ক্ষোভের সঙ্গে বলে, তোমার সাহেবকে কথাটা জিজ্ঞেস কর।

তেতে ওঠে নাল্‌লাপটুলা, তোর মুখে কি ঘা হয়েছে নাকি রে?

এই তো বন টুঁড়ে হাজার কাজ সেরে ফিরল তোমার সাহেব। আমি এতো রাত জেগে হা পিত্যেশ করে বসে থাকি, তোমার সাহেবের ফেরার আর সময়ই হয় না। আমি কাল থেকে আর সাহেবের কাজ করতে পারব না।

গতিক সুবিধের নয় দেখে নরম হল নাল্‌লাপটুলা। বলল, রাগ করছিস কেন? খেতে দিবি না?

কয়েকদিনের ভেতরেই থিতিয়ে পড়ল কাজের চাপ আর ব্যস্ততা। এখন স্বাভাবিক নিয়মে চলতে লাগল ফরেস্ট অফিসের কাজকর্ম।

কাজের চাপে যে লোকটা মাথা তুলতে পারছিল না সে এখন স্থির হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সে অবাক হয়ে ভাবল, সামনে এত বড় শিকার কিন্তু তাকে ফেলে সে শুধু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে।

থাবার ভেতর শিকার থাকলে বাঘ যেমন নিশ্চিন্তে বসে তার দিকে তাকায় ঠিক তেমনিভাবে কদিন ধরে মাসাম্‌মার ক্রিয়াকর্ম দেখতে লাগল রেঞ্জার সাহেব।

জঙ্গলে শুরু হয়ে গেল ঝড়-বৃষ্টির দিন। বিশাল একটা দৈত্য মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ে ফরেস্টের ভেতর। ডালপালা ভেঙে পাতাপত্র ছিঁড়েখুঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। বৃষ্টি নামে, অঝোর বর্ষণ। এক হাত দূরের মানুষকেও দেখা যায় না। সাপের মতো জলের প্রবাহগুলো এঁকে বেঁকে গাছের ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে চলে যায়।

এমন একটা দিনে রেঞ্জার সাহেব নাল্‌লাপটুলাকে কাছে ডেকে বললেন, চার নম্বর বিটে যে অফিস সেখানে একটা ফাইল নিয়ে দিয়ে আসতে হবে। ওখানে তিন চারদিন থেকে ওদের ফাইলগুলো আমার কাছে এনে দেবে। বিশ্বাসী লোক ছাড়া কারও হাত দিয়ে এ সব ফাইল চালাচালি করা যাবে না।

নাল্‌লাপটুলা মনে মনে গর্বে ফুলতে লাগল। সাহেব তার ওপর এতখানি ভরসা রাখেন!

সে বাড়ি ফিরে বউকে বলল, তিন-চারটেদিন আমাকে বাইরে যেতে হবে রে, তুই একা সাবধানে থাকিস। সাহেব বড় দায়িত্বের কাজ দিয়ে আমাকে পাঠাচ্ছেন।

গম্ভীর হয়ে মাসাম্‌মা বলল, কবে যাচ্ছ?

কালই বেরোতে হবে।

ভোরবেলা?

যত ভোরে সম্ভব। তুই আমাকে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে তুলে দিস।

মাসাম্‌মা জিজ্ঞেস করল, কতদিনের জন্য যাচ্ছ?

এই তিন কী চারদিন।

আমিও কাল ভোরে বেরিয়ে যাব তোমার সঙ্গে। দিন সাতেক বাড়িতে থেকে ফিরে আসব এখানে।

তুই কি আমার সঙ্গে রসিকতা শুরু করলি না কিরে?

কেন কিসের রসিকতা? কতদিন দেশে যাইনি। এই সুযোগে সবার সঙ্গে দেখা করে আসা যাবে।

নাল্‌লাপটুলা নরম গলায় বলল, তুই ভেবে দেখ, সাহেব আমার ওপর কত বড় দায়িত্ব দিয়েছেন। এ সময় তাঁর সামান্যতম অসুবিধে ঘটানো কি আমাদের উচিত হবে? কবে তোর মাথাটা ঠাণ্ডা হবে বল তো? তুই কি চাস সাহেবের কোপে পড়ে আমার চাকরিটা চলে যায়?

মাসাম্‌মা নিরাসক্ত গলায় বলল, বেশ রইলাম।

নাল্‌লাপটুলার চলে যাওয়ার পরের দিন রাত্রেই ঘটনাটা ঘটল।

অনেক রাতে সাহেব ফিরলেন কোয়ার্টারে। তেমনি জেগে বসেছিল মাসাম্‌মা। বাইরে শুরু হয়েছে ঝড়বৃষ্টি।

সাহেব খাবার খেলেন। মুখ ধুয়ে প্রতিরাতের মতো বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন। আড়াল থেকে মাসাম্‌মা দেখল, সাহেবের হাতখানা খাট থেকে নিচে ঝুলে পড়েছে।

ঘরের একটা জানালা ভেজানো ছিল, হঠাৎ খুলে গেল বৃষ্টির ঝাপটায়। একরাশ জল ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

মাসাম্‌মা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বন্ধ করে দিল জানালাটা। এবার ফিরে দাঁড়িয়ে তাকাল সাহেবের দিকে। তেমনি হাতটা ঝুলে আছে। প্রতিদিনের মতো ঘরের কোণে অতি অল্প আলো ছড়াচ্ছে একটা হ্যারিকেন। সে যাবার সময় সাহেবের মশারিটা গুঁজে দিয়ে আলো নিভিয়ে চলে যায়। সাহেব ঘুমের সময় আলো পছন্দ করেন না। তাই এই নিয়ম।

ও আস্তে করে সাহেবের হাতটা খাটের ওপর তুলে রাখল। মাশারিটা ফেলে গুঁজে দিল। পেছন ফিরে বাতিটা নেভানোমাত্র একটা বাজ পড়ার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে মাসাম্‌মার মনে হল, পেছন থেকে একটা হাত তাকে আকর্ষণ করছে। সে বুঝে নিল এটা মানুষেরই হাত।

ঝড় আর মেঘগর্জন চলছে বাইরে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুতের আলোয় মাসাম্‌মা দেখল, মশারির বাইরে বসে তার হাত ধরে টানছে রেঞ্জার।

আবার বিদ্যুৎ।

দুটো ক্ষুধার্ত চোখ জ্বল-জ্বল করছে।

আঁচলটাকে পিঠে তুলে মাসাম্‌মা ডান হাতে টেনে নিল তার কোদাভালি।

সে কোপ বসাবার ভঙ্গিতে হাতটা শূন্যে তুলে চিৎকার করে বলল, শূকরের মরণ আর কি! ছাড় হাত, নইলে উড়িয়ে দেব ও হাতখানা।

ওর মূর্তি দেখে আর হাতে এই তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রটা দেখে হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল রেঞ্জার।

সেই ঝড় বৃষ্টির রাতেই বিদ্যুতের আলোয় পথ চিনে গাঁয়ে পালিয়ে এল মাসাম্‌মা। সে রাতে কারো সঙ্গে দেখা করল না।

বিছানায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

ভোরের আলো ফুটলে চুল মুছে, ভেজা কাপড় বদলে সে স্বাভাবিক হল।

অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল সকালে।

প্রতিবেশীরা জানতে চাইল, কখন এলি?

মাসাম্‌মা বলল, এই তো কিছুক্ষণ আগে।

একেবারে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, কোনও অনুযোগ, অভিযোগ নেই।

একজন জিজ্ঞেস করল, নাল্‌লাপটুলাকে দেখছি না তো?

ও তিন-চারদিনের জন্য কোয়ার্টার ছেড়ে কাজ নিয়ে বিট অফিসে গেছে, তাই আমি গাঁয়ে চলে এসেছি।

একটি মেয়ে বলল, বেশ করেছিস। ক-দিন একসঙ্গে কুণ্ডে জল আনতে যাওয়া যাবে, তোর বনের গপ্পো শুনবো।

মাসাম্‌মা মনে মনে বলল, অতি বিচিত্র সে গল্প। কাউকে যেন আর তেমন গল্প না শুনতে হয়। মুখে বলল, শুনবি বইকি। বানানো গল্প শুনতে খুবই ভাল লাগে। কিন্তু গল্প সত্যি হলেই বিপদ। তখন গল্পের বাঘ বুকের ওপর আস্ত থাবাটা বসিয়ে দেবে।

কথাগুলো বলে খিল খিল করে হেসে উঠল মাসাম্‌মা।

ওরাও কিছু না বুঝে ওর হাসিতে যোগ দিল।

পাঁচদিনের দিন সন্ধ্যায় নাল্‌লাপটুলা এসে উঠল তার ঘরে। তখন মেয়েদের সঙ্গে কুণ্ডে জল আনতে গিয়েছিল মাসাম্‌মা। সে ফিরে এসে দেখল ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ। যাবার সময় ও ভেজিয়ে রেখে গিয়েছিল, এখন আবার কে এল? নাল্‌লাপটুলা ছাড়া ভেতর থেকে ঘর কেই বা বন্ধ করবে।

কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে মাসাম্‌মা নরম গলায় বলল, কি হচ্ছে? দরজাটা খোলো।

কোনও শব্দ নেই।

এবার দরজা ধাক্কালো মাসাম্‌মা। বলল, ভারী কলসী নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?

ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল নাল্‌লাপটুলা, জন্মের মতো এ ঘরে ঢোকা তোর বন্ধ হয়ে গেছে। ওই কলসী গলায় বেঁধে কুণ্ডের জলে ডুবে মরগে। আমার চাকরিটা খেয়ে নিলি হারামজাদি।

মাসাম্‌মাও তেজের সঙ্গে বলল, তুমি তো সাহেবের পেয়ারের গোলাম, তা হলে তোমার চাকরি কি করে যায়?

আগে বল, তুই পালিয়ে এলি কেন?

সে কথা তোমাকে বলে কি লাভ। তোমার গায়ের চামড়া বড় মোটা, সেখানে ফোস্কা পড়বে না। তবু যদি শুনতে চাও, শোনো।

ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেল।

কি শোনাবি, শোনা!

ঝড়ের রাতে সুযোগ বুঝে ওই শয়তানটা আমার হাত জাপটে ধরেছিল।

বিকৃত ভঙ্গি করে নাল্‌লাপটুলা বলল, আহা, ওইটুকুতে সতীর সোনার অঙ্গ গলে গেল। এদিকে আমার চাকরির যে বারোটা বাজল, তার কি হবে?

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে মাসাম্‌মা বলল, বউকে ভেট দিয়ে যে চাকরি রাখতে হয়, সে চাকরিকে বিদায় করে দাও ঝেঁটিয়ে। আমি তোমাকে খাওয়াব। খোন্তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে চাষ করব, বন থেকে মেটে আলু তুলে আনব, ফল-পাকড় জোগাড় করব, জাল পেতে পাখ-পাখালি ধরব, তোমার খাবার কোনও অভাব রাখব না।

নাল্‌লাপটুলা বলল, সাহেবের বড় দয়ার শরীর। তিনি বলেছেন, তোকে ছেড়ে দিলে আমি চাকরি ফিরে পাব।

মাসাম্‌মা রাগ করে বলল, তা হলে তোমার চাকরি নিয়ে থাকো। যেদিকে দুচোখ যায়, আমি বেরিয়ে গেলাম।

না, অমন করে যাওয়া চলবে না, তোর যাওয়ার পাকা ব্যবস্থাই আমি করে দিচ্ছি।

সত্যি, ঘটনাটা ঘটাল নাল্‌লাপটুলা। সে বুড়োদের সঙ্গে পরামর্শ করল, পঞ্চায়েত ডাকল। পঞ্চায়েত জমায়েতে কেবল পুরুষরা নয়, মেয়েরাও হাজির হল। বিশেষ ডাক দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে মাসাম্‌মাকে।

নাল্‌লাপটুলা আগেভাগেই এসে হাজির হয়েছিল।

বিচারসভা বসেছে। গ্রাম-মোড়লের হাতে বেশ কিছু টাকা গুঁজে দিয়েছে নাল্‌লাপটুলা।

মোড়লই মুখপাত্র হয়ে বলতে লাগল, তোমাদের কাছে একটা কথা বলি, নাল্‌লাপটুলার ওপরে এ গাঁয়ের অনেকেরই ঈর্ষা আছে। কারণ, সে ব্যবসাদার বাপের ছেলে, তাই পৈতৃক সূত্রে কিছু টাকা পেয়েছে। তা ছাড়া ও নিজে সরকারি অফিসে কাজ করে, তাই ওকে দেখে আমাদের ঈর্ষা হবারই কথা। কিন্তু ও যে কতখানি দুর্ভাগা, তা কি আমরা কোনওদিন ভেবে দেখেছি।

জনতা অবাক হয়ে মোড়লের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মোড়ল বলল, এত টাকা পয়সা মান প্রতিপত্তির ভেতরে থেকেও ওর কিছু নেই।

একজন বলে উঠল, কিছু নেই কি রকম, ওর তো সবই আছে।

মোড়ল গলা চড়িয়ে বলল, উত্তালুরিকে তোরা নিশ্চয়ই ভুলে যাসনি?

একজন বলল, নাল্‌লাপটুলার প্রথম বউ তো?

হাঁ, সে দু-তিনবছর ঘর করেছে, কিন্তু স্বামীকে একটিও সন্তান দিতে পারেনি। সে মরে প্রাশ্চিত্তির করেছে। তারপর বেচারা বিয়ে করে আনল আর একটা মেয়েকে। এ বউকে নিয়েও বেচারা ঘর করল দু-তিনটে বছর। কিন্তু এখানেও শূন্য। নল্‌লাপটুলার কপালটা দেখ, দুটি বউ-ই বাঁজা। এখন ওকে তো একটা বংশরক্ষা করতে হবে, না হলে বিয়ান্‌না পরিবারটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় যে।

সবাই তখন সায় দিয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

মোড়ল বলল, তা হলে একটা পাত্রীর খোঁজ করো তোমরা। তার আগে নল্‌লাপটুলাকে তার বউকে ত্যাগ করতে হবে।

একটি মেয়ে বলল, মাসাম্‌মা তো কোনও দোষ করেনি।

মোড়ল ধমক দিয়ে বলল, তুমি মেয়েছেলে, বিচারের কি জানো? বাঁজা মেয়েকে সমাজ থেকে সরিয়ে দেবারই নিয়ম। স্বামী যদি বিসর্জন দেয়, তা হলে সবচেয়ে ভাল হয়।

কি হে নাল্‌লাপটুলা, তোমার মতলবটা কি বলো তো? তোমার বাঁজা বউয়ের দিকে তাকিয়ে গাঁয়ের ক-টা নতুন বউ যেন বাঁজা হয়ে না যায়। ওদের ছায়া মাড়ালেই বিপদ।

নাল্‌লাপটুলা বউকে ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করবে বলে উঠেছিল, কিন্তু তার কিছু বলার আগেই মাসাম্‌মা উঠে দাঁড়াল। সে শান্ত গলায় বলল, অকারণে আমার স্বামীকে দিয়ে একটা অন্যায় কাজ কেন করিয়ে নিতে চাইছেন আপনারা। তার চেয়ে আমি স্বেচ্ছায় এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনাদের কারও ওপরে আমার কোনও অভিযোগ নেই।

সবার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নত হয়ে নমস্কার করে স্বামীর ঘর থেকে বিদায় নিল মাসম্‌মা।

মেয়েরা এই স্বল্পভাষী মেয়েটিকে মনে মনে খুবই ভালবাসত। ওরা সকলে মাসাম্‌মাকে ঘিরে নিয়ে বনের ভেতর কিছুদূর এগিয়ে দিতে গেল। অনেক ফল আর খাবার-দাবার দিয়ে দিল ওর সঙ্গে। কেউ কেউ ওকে বেশ কয়েকখানা কাপড়ও উপহার দিল।

এত দুঃখের ভেতরে মাসাম্‌মার চোখ দিয়ে একবিন্দুও জল গড়িয়ে পড়ল না। তার মনে হল, সে যেন একটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

পুরো একদিন একরাত্রি বন চিরে চলল মাসাম্‌মা। এদিকে বন অতি নিবিড়। লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

মাসাম্‌মা এসে থামল একটা টিলার তলায়। টিলার তিনভাগ সবুজ ঘাসে ছেয়ে আছে। নীচে ঘন নিবিড় অরণ্যের ভেতর বিধাতা দু-চারটে ফলকর গাছও রেখে দিয়েছেন। জানি না, কোনও সময় নিবিড় বন চিরে এখানে কোনও বানজারার দল এসেছিল কিনা, যারা এই ফলকর গাছগুলো লাগিয়ে রেখে গেছে।

টিলার তলায় এমন একটা গুহা মিলে যাবে তা ভাবতে পারেনি মাসাম্‌মা।

মাসাম্‌মার নতুন মানুষ

কোটি কোটি ভোমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলছিল। পুরো টিলাটা যেন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। গুহা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল মাসাম্‌মা। শেষ বেলা পর্যন্ত খোন্তা দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে বীজ বুনছিল মাসাম্‌মা। তারপর ক্লান্ত হয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিচ্ছিল গুহার ভেতর। এমন সময় এই প্রলয়ঙ্কর গর্জনটা তাকে জাগিয়ে তুলল।

মাসাম্‌মা টিলার দিকে তাকিয়ে দেখল, অন্ধকার আকাশের বুক থেকে ভয়ঙ্কর গর্জন করে নেমে আসছে একটা অগ্নিপিণ্ড। পিণ্ডটা আছড়ে পড়ে যেন ভেঙে দিল টিলার মাথাটা। আরও প্রবলবেগে জ্বলে উঠল আগুন। মাসাম্‌মা ভয় পেয়ে আবার গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। এত আলো ছড়িয়ে পড়ছিল যাতে রাতেও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল বনটাকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মুছে গেল আলোর চিহ্ন। সে কিন্তু গুহা থেকে আর বেরিয়ে এল না। সে রাতে সে কিছু খেতে পারল না। তার কাছে রান্নার সব ব্যবস্থাই ছিল কিন্তু রান্না করতেও তার প্রবৃত্তি হল না।

মাঝরাতে মাসাম্‌মা দেখল, নির্মল আকাশে কখন চন্দ্রোদয় হয়েছে। সেই চাঁদের আলো গলে ঝরে পড়ছে বনের ভেতর।

সে বেরিয়ে এলো। টিলার মাথা থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছিল। মাঝে মাঝে দগ্‌দগে খানিকটা আগুনের আভাও তার চোখে এসে লাগছিল।

এই বনে প্রায় দু-বছরের বাসিন্দা সে। সব পথঘাট এখন তার নখদর্পণে। সে সোজা পথটা ধরে টিলার দিকে চলল। টিলার যে দিকটা চাঁদের আলো ধুইয়ে দিচ্ছিল সেদিকে গিয়ে পৌঁছল সে। এখানে টিলার তলায় কতকগুলো গাছের জটলা।

এ কি! গাছ থেকে কি যেন একটা বস্তু ঝুলে পড়েছে। সে সেদিকে এগিয়ে গেল। এ যে একটা মানুষ।

মাসাম্‌মা ভাল করে তাকিয়ে দেখল একটা কাপড়ের বিরাট ছাতা কয়েকটা গাছের মাথায় জড়িয়ে আছে আর সেখানে থেকে ঝুলছে কয়েক টুকরো দড়ি, যাতে বাঁধা হয়ে আছে একটা মানুষ। সে মানুষটা যেন পাথুরে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

সেদিকে ছুটে গেল মাসাম্‌মা। হাঁ, মানুষই তো বটে। তবে মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মি. সেসিলের বাড়িতে একটা বইয়ের ভেতর সে একটা ছবি দেখেছিল। শরীরে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি মানুষ এমনিভাবে বিশাল একটা ছাতার তলায় ঝুলে আছে।

মি. সেসিল বলেছিলেন, প্যারাসুটে ভর করে মানুষ মাটিতে নামছে। এটা তাহলে একটা প্যারাসুট।

কিন্তু মানুষটির কাছে গিয়ে সে পরীক্ষা করে দেখল, প্রাণে বেঁচে থাকলেও মানুষটি অচৈতন্য, ডান হাঁটুটা দুমড়ে-মুচড়ে আছে। সে দৌড়ে গিয়ে ঝরণা থেকে খানিকটা জল নিয়ে এলো। লোকটার মুখে মাথায় ঢেলে দিল সে জল।

লোকটা একটু একটু মাথা তোলার চেষ্টা করছিল আর জল খাবার জন্য জিভটা বের করছিল। ও তার কোমর থেকে কোদাভালিটা টেনে নিয়ে লোকটার কোমরের সব কটা দড়ি কেটে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ওরই ওপর ঢলে পড়ল মানুষটা।

এরপর যেন অসুরের বল এলো তার শরীরে। সে মানুষটাকে জাপটে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল তার গুহার ভেতর।

প্রথমে জল ঢেলে ধুইয়ে দিল তার মাথা। চোখে জলের ঝাপ্টা দিল। মুখের ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প জল খাইয়ে দিল। মানুষটা ঘোলাটে চোখ মেলে তাকাতে লাগল।

দুমড়ে যাওয়া ডান পা খানা ধরে সোজা করে দিতেই মানুষটা একটা গোঙানির শব্দ তুলল।

মাসাম্‌মা ছুটে গেল বাইরে, প্রচণ্ড ব্যথা হরণ করতে পারে এমন ওষুধ তার জানা ছিল। সে কতকগুলো মূল্যবান শেকড় আর পাতা তুলে আনল। পাথরের নোড়ার সাহায্যে বাটল সেগুলো। তারপর খাইয়ে দিল মানুষটাকে।

সে জানে, এ ওষুধ ব্যথা কমাবে আর ঘুম এনে দেবে। পাতা থেঁতো করে মানুষটার ডানপায়ের হাঁটুর ওপর রেখে নিজের কাপড়ের একটা অংশ ছিঁড়ে বেঁধে দিল।

পরের দিন দুপুরে জাগল মানুষটা। কেবল এদিক ওদিক তাকাতে লাগল, কিন্তু ওঠার ক্ষমতা তার ছিল না।

এই অবস্থায় মাসাম্‌মা মানুষটার সেবা যত্ন করল ছ-মাস ধরে। লোকটির বুকপকেট থেকে একটা ফটো পাওয়া গিয়েছিল। তার ওপর লেখা, এরিখ পেটকফ।

মাসাম্‌মা বুঝেছিল মানুষটা মি. সেসিলদেরই স্বজাতীয় কেউ। সে ওই টিলার ওপরে প্লেনের একটুকরো ভাঙা পাখাকে পড়ে থাকতে দেখেছিল। সেই টুকরোটুকু ছ'মাস পরেও সেখানে পড়ে আছে। সূর্যের আলো পড়লে সেটা এখনও চকচকে আলো ছড়িয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

মানুষটাকে মোটামুটি সচল করে তুলতে প্রায় একটি বছর লেগে গেল মাসাম্‌মার।

এরিখ বাঁ পায়ে ভর দিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। বাঁ হাতটা একটু দুর্বল হলেও অচল নয়। ডান পায়ে ব্যথা না থাকলেও অচল হয়ে গেছে।

মাসাম্‌মার কাঁধে ভর দিয়ে এরিখ বনের পথে হাঁটার চেষ্টা করে, হঠাৎ হঠাৎ গাছের কাণ্ডকে ধরে ব্যালেন্স রক্ষা করে।

মাসাম্‌মার সেবা যত্নের যেন কোনও তুলনা নেই। একদিকে নিজে ক্ষেত তৈরি করছে,

ফসল ফলাচ্ছে, অন্যদিকে ফল সংগ্রহ করছে গাছ থেকে। রান্নাবান্না করছে, ফাঁদ পেতে পাখি আর খরগোস ধরে এরিখের জন্য স্যুপ তৈরি করে দিচ্ছে। এমনিভাবে সে সুস্থ করে তুলছে একটা পঙ্গু মানুষকে।

একদিন এরিখ মাসাম্‌মার পরিচয় জানতে চেয়ে বলেছিল, তুমি কি আজীবন এই গুহাতেই বাস করছ, তোমাকে দেখে যেন তাই মনে হয়।

মাসাম্‌মা হেসে বলল, এখানে থাকলে আমি কি তোমার ভাষায় তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম।

এরিখ বলল, তাই তো আমি অবাক হয়ে ভাবি, তুমি কি কেবল আমাকে রক্ষা করার জন্যেই এখানে এসেছ?

হয়তো দেবতা মল্লিকার্জুন তোমার জন্যেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি আগে মানুষের সমাজেই বসবাস করে এসেছি। তোমাদের জাতের এক দয়ালু মানুষ আমাকে তোমাদের ভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছেন। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু দুঃখকে সঙ্গী করে একদিন আমাকে এখানে আসতে হয়েছিল। হয় তো তাই দেব মল্লিকার্জুন তোমার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিলেন।

এরপর এরিখের জিজ্ঞাসার উত্তরে একে একে জীবনের সব পাতাগুলো উল্টে গেল মাসাম্‌মা।

বিস্মিত স্তম্ভিত এরিখ মন্তব্য করল, এইটুকু জীবনে এত অভিজ্ঞতা তোমার!

মাসাম্‌মা জিজ্ঞেস করে, তুমি কি একাই প্লেন নিয়ে বেরিয়েছিলে?

হ্যাঁ। একটা কষ্টের ছাপ এরিখের সারা মুখে ফুটে ওঠে। সে বলে, ও নিয়ে আমাকে আর প্রশ্ন কোরো না। ও কথা ভাবতে গেলেই আমার মাথায় তীব্র একটা যন্ত্রণা শুরু হয়। আমি পেছনের জীবনের কথা একেবারেই মনে করতে চাই না। তোমাকে এখানে পেয়ে আমি একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছি। এই আরণ্যক জীবনটাকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যেতে চাই না।

এই চেঞ্চু মেয়েটা কি ভানুমতী? তার ভালবাসার, তার মমতার গন্ধে কি মাতাল হয়ে গেল স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত ভ্রাম্যমাণ এরিখ পেটকফ?

প্রতিদিনই আজকাল মাসাম্‌মার সাহায্য ছাড়া গাছ ধরে ধরে হাঁটার চেষ্টা করে এরিখ। আজকাল সে উঁচু টিলাটাতে ওঠার চেষ্টা করে হামা দিয়ে দিয়ে। বেশ কিছুটা ওপরে উঠে সবুজ ঘাসের বিছানায় শুয়ে শুয়ে রোদ পোহায়।

তার কাছে অবলীলায় উঠে যায় মাসাম্‌মা। নিজের কোলে এরিখের মাথাটা তুলে নিয়ে আঙুল চালিয়ে তার চুলে বিলি কেটে দেয়। জগৎ সংসারের কেউ নেই কোনদিকে। চারিধার নিভৃত নির্জন। কখনও সুধার পাত্র ভরে নিয়ে চাঁদ ওঠে। সেই অমৃত ছড়িয়ে দেয় সুধাকর। দুটি হৃদয় আকুল হয়ে তা পান করে।

এমনি করে ঋতুপর্ব পার হয়ে যায়। আষ্টেপিষ্ঠে তাদের জড়িয়ে ধরে অরণ্যবাস। বনে ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, হাওয়া বয়ে যায়। এরিখ ভাবে, এ যেন কেবল তাদেরই জন্য।

রাতে দুজনে গুহার অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে থাকে। দুজনের হাত নিয়ে দুজনে খেলা

করে। আঙুল দিয়ে মুখে, বুকে চিত্রলেখা আঁকে। কিন্তু নৈশ মিলনের কোন সুযোগ দেয় না মাসাম্‌মা। এখানে সে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে চেঞ্চুদের রীতি।

এরিখ প্রতীক্ষা করে অরণ্য-গভীরে দিবামিলনের জন্যে। রাতের অন্ধকারে তারা কথা বলে।

নারীকণ্ঠ শোনা যায়, আমার মনে হয়, তোমার জন্যেই আমি এত কষ্টের পথ পার হয়ে এসেছি।

কিন্তু আমি যে পঙ্গু মাসাম্‌মা। আমি কেবল তোমার সেবা পেয়েই যাচ্ছি, তোমাকে কিছু দিতে পারছি না।

সব দুঃখের শেষে তুমি বসন্তের ফুল হয়ে আমার মনে ফুটে উঠেছ এরিখ।

এরিখ বলল, এই বনেই শুরু হল আমাদের জীবনের খেলা। দেখা যাক ঈশ্বর কত দূরে আমাদের নিয়ে গিয়ে সে খেলায় ইতি টানেন।

এরিখের মুখ চেপে ধরে মাসাম্‌মা বলে, শুরুতেই শেষের কথা বোলো না এরিখ। তুমি আমার বড় কষ্টের ধন। তোমাকে পেয়ে সব কষ্ট আমার ধুলো হয়ে গেছে।

এরিখ বলল, আমিও ভুলে গেছি আমার অতীতকে। যতবারই সে আমার স্মৃতির পথ ধরে আসতে চায়, আমি যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাই। তাই অতীত আমার কাছে মৃত।

মাসাম্‌মা বলল, এসো আমরা ভাবি, একটা নতুন জগতে দুজনে এসে পড়েছি, সেখানে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই।

এরিখ বলল, আছে। শুধু পাখির গান আর হাওয়ার বিচিত্র শব্দ। মাসাম্‌মা; আমি আজকাল যেন গাছের ভাষাও বুঝতে পারি। তারা ফুলে ভরা ডাল নেড়ে আমাকে ডাকে। বলে, তুমি ফুল ছিঁড়ে নিজের হাতে নষ্ট কোরো না, তুমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখ, আমি তোমার মন ভরে দেব মিষ্টি গন্ধ পাঠিয়ে।

মাসাম্‌মা বলে, তুমি কবি। মি. সেসিল আমাকে অনেক কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন। মি. সেসিলকে আমি অল্পদিন পেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমার বাবার মতো, আর ওই দেবতা মল্লিকার্জুনের মতো। চলে আসার সন্ধ্যায় আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছেন।

এরিখ বলল, তোমাকে সকলেই ভালবাসবে মাসাম্‌মা। তোমার সঙ্গ যে একবার পাবে সে তোমাকে জীবনে ছেড়ে থাকতে পারবে না।

একটা কষ্টের ঢেউ মাসাম্‌মার বুক ঠেলে উঠে এল। নীরবে সেই ব্যথাটা সে বুকের মধ্যে চেপে রাখল।

ওঃ! কি অসহ্য সেই যন্ত্রণা! একজন নারীকে বন্ধ্যা অপবাদ দিয়ে সমাজ থেকে বের করে দেবার নিষ্ঠুরতা আর কি হতে পারে তা তার জানা নেই। আজ কেন জানি না, সংশয় জাগল মাসাম্‌মার মনে, সে কি সত্যিই বন্ধ্যা? সে কি কোনও দিন ফুলের মতো একটা শিশুর মুখ দেখতে পাবে না? সে কি তার গায়ের কচি গন্ধটুকু বুক ভরে টেনে নিতে পারবে না? তাকে স্তনদান করে সে কি তার ক্ষুধাটুকু মিটিয়ে দিতে পারবে না? রাতের অন্ধকারে চোখের জলে ভাসতে লাগল মাসাম্‌মা।

কোথায় যেন একটা বেদনার সুর বেজেছে, এটি অন্ধকারের ভেতরেও অনুভব করল এরিখ। তার ডান হাতখানা আপনিই চলে গেল মাসাম্‌মার মুখের ওপর। সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই, চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে।

এরিখ সেই অন্ধকারে নিটোল গোলাপের মতো মাসাম্‌মার মুখখানাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরে দিল। সে জানে না, কেন মাসাম্‌মার এই কান্না, কিন্তু তার মনের বীণায় বেদনার রাগিণীটি ঠিকই বেজে উঠেছিল।

ভালবাসা এক আশ্চর্য যাদুকর। দেহের মিলনে যখন পুরুষ নারী ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে তার যাদু-প্রদীপটি তুলে ধরে তাদের চোখের সামনে। এই স্নিগ্ধ, শান্ত, উজ্জ্বল প্রদীপটি তাদের আকর্ষণকে আবার ফিরিয়ে দেয়।

মাসাম্‌মা বুঝেছে, এরিখের ভালবাসার ভেতর কামনার উত্তেজনার চেয়ে স্নিগ্ধতার স্পর্শটাই বেশি আছে। সে আমাকে চায়, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছিল বসন্তের বন। মিলনের সুর তুলে প্রেমিকাকে ডাকছিল বিচিত্র নাম না জানা পাখি। চুপি চুপি বাতাসের পাখায় ভর করে হলুদ প্রজাপতিটির মতো কাঁপতে কাঁপতে বনের ভেতর ঢুকে পড়েছিল একফালি রোদ্দুর, ঠিক সেই মুহূর্তে মহুয়া বনে ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো উড়ে এল একটা শব্দ।

টিলার সবুজ গা বেয়ে অনেকটাই ওপরে উঠে গিয়েছিল এরিখ। নিচে বনের ভেতর দাঁড়িয়ে বসন্তের কয়েকটা ফুল নিয়ে খোঁপায় গুঁজছিল মাসাম্‌মা। হঠাৎ তার মনে হল, ভ্রমরের যে গুঞ্জনটা সে শুনতে পাচ্ছিল, সেটা কাছাকাছি কোথাও এসে থেমে গেছে। ওদিকে দৃষ্টি না দিয়ে সে নিজের মনে নিজেকে সাজাতে লাগল। সত্যিই কত ফুল তাকে উপহার দিয়ে গেছে বসন্ত।

হঠাৎ তার মনে হল, কারা যেন টিলার ওদিকে কথা বলছে। কোনও এক নারীকণ্ঠের উচ্ছ্বাস শুনে সে ফিরে তাকাল। সে বন থেকে বেরিয়ে চলতে লাগল টিলার দিকে। কিছু পথ এগিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। তার চোখের সামনে দেখতে পেল একটি দৃশ্য।

টিলার মাঝখানে নতজানু হয়ে বসে আছে এরিখ। সূর্যের সোনালি আলো তার নগ্ন ঊর্ধ্বদেহে খেলা করছে। মাসাম্‌মার মনে হল, এ যেন এরিখ নয়, কোনও দেবদূত।

টিলার নিচ থেকে একটি শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী নারী উঠে চলেছে তার দিকে। কোলে ফুলের মতো একটি শিশুকন্যা।

এরিখ! এরিখ! যেন বসন্তের কোন বিরহিণী পাখি ডেকে উঠল।

এরিখ কি স্তব্ধ হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে? সে কি শুনতে পাচ্ছে না সে আহ্বান?

সূর্যের স্পর্শে তুষারশৃঙ্গ যেমন বিগলিত হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে একসময় গলে ঝরে পড়ল এরিখ।

ততক্ষণে যুবতী তার শিশুকন্যাটিকে তুলে দিয়েছে এরিখের কোলে।

চিরন্তনী নারী সমর্পণের ভঙ্গিতে পুরুষের জানুর ভেতর ডুবিয়ে দিয়েছে তার কান্নাভেজা মুখ।

নিচে জিপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এ দেশীয় একটি ড্রাইভার।

সবই বুঝতে পারল মাসাম্‌মা।

ওই মেয়েটি, ওই শিশুটি খুঁজতে এসেছে তাদের হারিয়ে যাওয়া আপনজনকে। পেয়েও গেছে প্রভাতের এক সুন্দর মুহূর্তে।

একটুও ঈর্ষা এল না মাসাম্‌মার মনে। সেই পবিত্র দৃশ্যটা দু-চোখ ভরে দেখল, সারা মন দিয়ে অনুভব করল।

এতক্ষণে এরিখের চোখ পড়েছে মাসাম্মার ওপর। সে তার প্রিয়জনকে কানে কানে কিছু বলল। মাসাম্মার দিকে ফিরে তাকাল মেয়েটি। এবার তিনজনই নেমে আসতে লাগল নিচে।

যুবতীর কাঁধে ভর রেখে নামছে এরিখ। মাসাম্মার পাশে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল।

সহসা নিজের গলার মূল্যবান মুক্তোর মালাটা খুলে নিয়ে যুবতী মাসাম্মার দিকে এগিয়ে ধরল।

তুমি আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছ, তোমার ঋণ কোনওদিনই শোধ করতে পারব না। এই সামান্য উপহারটুকু তোমাকে দিতে চাই। কৃতজ্ঞতার একটুখানি চিহ্ন।

এক পা পিছিয়ে গিয়ে মাসাম্মা বলল, মি. সেসিল বলতেন, উপকার করে তার বিনিময়ে কিছু নেওয়া ঠিক নয়। আমি যদি আপনার স্বামীর সামান্য উপকারও করে থাকি তা হলে তার বিনিময়ে আমি যেটুকু আনন্দ পেয়েছি সেটাই আমার পুরস্কার।

ওরা তিনজনে বিদায় নিয়ে একসময় গাড়িতে গিয়ে উঠল। এই মিলনদৃশ্য দেখে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল মাসাম্মার চোখ ছাপিয়ে।

হঠাৎ সে শুনতে পেল গাড়ি চলে যাওয়ার একটা গর্জন। তার মনে হল, যে শব্দ ধরে একদিন এই বনের মধ্যে এক দেবদূত আবির্ভূত হয়েছিল, আর এক শব্দের ভেতর দিয়ে ঘটল তার প্রস্থান। এই শব্দটুকুই থেকে গেল মাসাম্মার কানে। তার মনে হল, আর সবটুকুই একটা অলীক স্বপ্ন।

কিন্তু না, এ যে স্বপ্ন নয়, তা সে অল্প কয়েকদিনের ভেতরেই অনুভব করল।

এরিখ জানতে পারল না, সে তার মাসম্মাকে কত বড় একটি উপহার দিয়ে গেছে।

কেবল সন্তান নয়, সে দু'হাত দিয়ে মুছে দিয়ে গেছে তার বন্ধ্যাত্বের অপবাদ।

একদিন দেখা গেল, এক মা একটি শিশুকে বুকের মধ্যে ভরে নিয়ে গর্বিত পায়ে বন চিরে এগিয়ে চলেছে তার ফেলে আসা গাঁয়ের দিকে। মায়ের মুখে বিজয়িনীর হাসি।

●

ময়ূরপঙ্খী

জোয়ান মরদটাকে বালির ওপর দিয়ে সুখী টেনে টেনে আনছে। সেই মোহনার মুখ থেকে জেলেপাড়াটা কি কম দূর! টানতে টানতে থকে গেলে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে রক্ষেকালীর থানে পোঁতা ধ্বজদণ্ডটা। কাঁটা বাঁশের মাথায় পতপত করে উড়ছে লাল নিশান। না, মরদ এখনও লাশ বনে যায়নি। সুখী ওর বুকে কান গুঁজে শুনছে, ধকধক করছে প্রাণপাখি।

অনেকটা হিঁচড়ে টেনে এনে সুখীর এখন মনে হচ্ছে, মরদটার শরীল নয়তো, একটা লোহার তাল। আর সুখী যে ওকে টেনে আনতে পারছে সে ওর কষ্টিপাথরে গড়া শরীলটার জন্যে।

নরম বালির ওপর দিয়ে লোকটা সুচমুখো সাল্‌তির মতো সরসর করে চলে এল জেলেপাড়ার সীমানা অব্দি।

এখন মুখের ডানপাশে হাতের পাতা ঠেকিয়ে চিল চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সুখী।

ঠা-ঠা দুপুর! রোদ্দুরে ঝাঁঝ। মরদগুলো এখনও বাহার গাঙ থেকে মাছ নিয়ে ডাঙায় ওঠেনি। কচিকুচোগুলো সুবর্ণরেখার জল দাবড়ে কখন ঘরে সিঁধিয়েছে। গরম ভাত আর চিংড়ির টক খেয়েছে পেটপুরে। এখন রাঁধাবাড়া সেরে ব্যাঙাচিগুলোকে খাইয়ে ঘরের মরদদের ফেরার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে মেয়েরা। আর পুরুষ বলতে রয়েছে দু'-চারটে বুড়ো, যাদের নাম এখন বাতিলের খাতায়। খাবার জন্যে তারা কাঁদে। একটু দেরি হয়ে গেলেই বাড়ির মেয়ে-বউদের গালিগালাজ আর শাপ-শাপান্ত করে।

মেয়েগুলো সুখীর চেঁচানি শুনে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। উঁচু ঢিবির গা বেয়ে তরতরিয়ে নেমে গেল নদীর চরে।

একটা মরদকে ঘসটাতে ঘসটাতে টেনে আনছে সুখী। সুরুলিয়া পাখির মতো এক ঝাঁক প্রশ্ন উড়ে এল চারদিক থেকে। মরদটা কে? কোথায় ছিল? কোনওকালে কাছেপিঠে কেউ দেখেনি একে! জলে ডোবা লোক বলেই তো মনে হচ্ছে! হাত আর পায়ের পাতা চাকুন্ডা গাছের ফুলের মতো সাদা হয়ে গেছে।

সুখী কোনও কথার জবাব না দিয়ে এমন একটা মুখভঙ্গি করল, যাতে বোঝা গেল সে এই মানুষটার ল্যাজামুড়ো কিছুই জানে না। শেষে হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল, ঝটপট মানুষটাকে ওপরের পালাঘরে নিয়ে যাওয়া দরকার।

এখন আর হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া নয়, সকলে মিলে শূন্যে তুলে নিল লোহার মতো ভারী শরীলটাকে। কাছেপিঠে গর্ত থেকে আধখানা লালটুকটুকে শরীর বের করে দৃশ্যটা দেখতে লাগল শয়ে শয়ে ফুলকাঁকড়া।

সুখীর টুঙি পালার মেঝেতে হেঁস পেতে শোয়ানো হয়েছে লোকটাকে। পীতু বুড়োকে ডেকে আনা হলে সে জলে ডোবা রোগীর কৃত্যাকর্মগুলি করে ওষুধপালা দিয়েছে। এখন লোকটার শ্বাস-প্রশ্বাস খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছে। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে নাক ডাকছে তার।

দূরে দেখা গেল নৌকোগুলো বালির চড়ায় টেনে তোলা হচ্ছে। কোনওটাকে বা বাঁশ বেঁধে ঝুলিয়ে এনে রাখা হল। এখন পাঁচ-সাতজন মিলে বয়ে আনছে সারণী জাল।

মেয়েরা মুখিয়ে আছে। মরদগুলো ঘরে ফিরলে খবরটা দেবে।

আগে কাঁসা ভরে ভাত তারপর কথা।

কেউ বলে সুখীর ঘরে লতুন মানুষ আসছে গো।

ফ্যালফ্যাল করে ঘরের মানুষ মুখের ভাত ফেলে বউয়ের দিকে চেয়ে রয়।

প্রশ্ন করে, কী রকম?

সে বড় তাজ্জব।

ঔৎসুক্যের পর ঔৎসুক্য জাগিয়ে পরে আসল কথাটি পাড়ে।

খবর যে জব্বর সন্দেহ কী। তড়িঘড়ি খাওয়া শেষ করে নামমাত্র আঁচিয়ে জেলে বস্তির সব ক'টা মদ্দ জড়ো হয় সুখীর ঘরের সামনে। মেয়েরাও সঙ্গে।

লোকটা সুখীর ওপর হেলান দিয়ে শুয়ে আছে তখন। একটু জ্ঞান ফিরতে সুখী তাকে খানিকটা গরম ফ্যান খাইয়ে দিয়েছে। সে এখন আধঘুমে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে সুখীর বুকে।

সুখীর লজ্জাশরম নিয়ে কেউই প্রশ্ন তোলে না। কারণ, সে একা আর স্বাধীন। তা ছাড়া সবার সব কাজে সে।

বছর বাইশ বয়েস সুখীর, ইতিমধ্যে তিনবার মালা বদল হয়েছে। এই তালসারি গাঁয়ের জেলেপাড়ার মেয়ে সে। তবু নিজের পাড়ার কাউকে সে বিয়ে করেনি। দূর দূর থেকে সম্বন্ধ এনেছে ঘটকঠাকুর। সুখীর যাকে পছন্দ হয়েছে তার গলায় মালা পরিয়েছে। কিন্তু মন মেলাবার দেবতা আড়ালে বসে হেসেছেন। মাস ছয়েক পেরোতে না পেরোতেই সে ফিরে এসেছে নিজের গাঁয়ে।

কোনও লোকটাকে মনে হয়েছে, একটা গিদধোড়, কাউকে বা মনে হয়েছে মেনিমুখো। শেষেরটা তো পাঁড় মাতাল। সাঁঝ নামলেই হাঁড়িয়া গেলা আর বউ ঠেঙানো। নতুন বউ মাসখানেক বরের রকমসকম দেখল, তারপর বেহুঁশ মরদটাকে নৌকোর পাতগাছি (দড়ি) দিয়ে বেঁধে সটকে পড়ল। সারা রাত নদীর ধারে ধারে হেঁটে দশ ক্রোশ পথ পেরিয়ে অনাল ভোরে (অন্ধকার সরে যাচ্ছে) তালসারি গাঁয়ে হাজির।

শেষের মরদটা সহজে ছাড়তে চায়নি সুখীকে। সে সুখীর গাঁ অব্দি ধাওয়া করেছিল। হম্বিতম্বি শুরু করতেই জেলেপাড়ার জোয়ান মরদগুলো জুটে লোকটাকে বেধড়ক ঠেঙিয়ে বিদেয় করল।

তালসারির কোনও মানুষই সুখীর দোষ দেখতে পায় না। আপদে বিপদে যে যখন ডেকেছে, সুখী একপায়ে খাড়া। কারু ভেদবমি, সুখী রাতভোর জেগে সেবা করছে। বুড়োদের সকলে এড়িয়ে চলে। কাজের মানুষের সময় কই বুড়োদের সঙ্গে দুদণ্ড বসে কথা বলার। কিন্তু বুড়ো বয়সে কাউকে নিজের কথা শোনাতে না পারলে ভারী কষ্ট। সুখী কাজের ফাঁকে সময় ছিনিয়ে কোনও না কোনও বুড়োর পাশে হাজির। গল্প বল আজা (দাদামশায়)।

সুখীর মুখ থেকে গল্প বলার বায়না পেয়ে বুড়োদের খুশি ফেনিয়ে ওঠে। তারা তাদের জোয়ান বয়সের গল্প বলে যায়। আথাল-পাথাল সমুদ্রে মাছ ধরার কৃতিত্ব, কত দুর্যোগ, কত ঝড় ঝাপটার দিনের গল্প। শ্রোতার মুখে অবাক বিস্ময়ের আওয়াজ শুনে বুড়োরা মেতে ওঠে।

নিজের পেট নিজেই চালিয়ে নিতে পারে সুখী। শামুক, গেঁড়ি আর ঝিনুক কুড়িয়ে আঠা আর রং লাগিয়ে অদ্ভুত সব খেলনা তৈরি করতে পারে। খরগোস, হাতি, কচ্ছপ, রথ, মা মনসা এমনি সব। গঙ্গার একটা মূর্তি তৈরি করেছিল নানারকম ঝিনুক, গেঁড়ি আর শামুক সাজিয়ে। চন্দনেশ্বরের ব্যবসাদার সেটার জন্যে তাকে অনেক দাম দিয়েছিল। আরও অনেক অর্ডার গেয়েছিল। মা মরেছিল সুখীকে জন্ম দিয়ে, বাপ মরেছে বছর পাঁচেক আগে। মরার আগে সুখীকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে ওই ঝিনুকের কারিগরিটা। জেলের ঘরে জন্ম হলে কি হবে, সুখির বাপ ছিল জাতশিল্পী। কোনওদিন মাছ ধরার জন্যে নৌকোয় চেপে জাল নিয়ে সাগর চোঁড়েনি সে।

দিন তিনেক সুখীর হাতে সেবা-যত্ন পেয়ে ঘরের দাওয়ায় একা একা উঠে এসে বসেছে লোকটা। নিজের নাম বলতে পেরেছে, গাঁইগোত্তর, চালচুলোর হদিস-হদ্দ দিতে পেরেছে সুখীর কাছে। সুখীর মতো তারও নাকি ঝাড়া হাত পা। পেছটান এ্যাকেবারেই নেই। এক বোন, সোয়ামির ঘর করছে। ভাইভগ্র বেবাক আলাদা।

সুখী ঠাকায় করে বেথুয়া শাক আর ডান হাতে একখানা লগির বাঁশ নিয়ে পালার সামনে এসে দাঁড়াল। উত্তেজনায় বাঁশের খুঁটি ধরে উঠে পড়ল সোন্দর।

এই যে তোমার লগি আনছি, লও ধরো।

সোন্দর লগিটায় হাত ঠেকিয়ে বলে, ঠিক সউ (সেই) জায়গায় পাইল (পেলে)?

হুঁ, সউটি (সেখানে) পাইছি। তুমি কী করি জাইগাটা ঠিক ঠিক কই পারল? গাঙের চড়ায় বালির খোঁদলে (খাদ) জল, তারু ভিতরে লগিটা পড়ি আছে।

দূর গাঙের দিকে উদাস চোখে চেয়ে সোন্দর বলে, আমি লিদ্রা গেলে স্বপন দেখি আর স্বপনে সব দেখতে পাই।

সত্যি কও!

টকাবালানু (ছেলেবেলা থেকে) এ অভ্যাস সুখী।

সোন্দর মালোর এই এক অলৌকিক ক্ষমতা। স্বপ্নে সে অনেক সঠিক জিনিসের সন্ধান পায়। জেগে উঠে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পৌঁছোলে সে বস্তু মিলে যায়। এ তার জীবনে একাধিকবার ঘটেছে, আর তার সাক্ষী হয়ে আছে ভাঙনমারির পুরো জেলে বস্তিটা।

সে ধনরত্ন পাবার স্বপ্ন দেখে না, তার নিজের হারানো জিনিসের হদিস পায় স্বপ্নে।

সেবার তার পোযা কুকুরটা বেপাত্তা হয়ে গেল। সাদা-কালো এক ফোঁটা তুলোর তাল সে তুলে এনেছিল মফস্বল শহরের রাস্তা থেকে। বাজারে মাছ বেচতে গিয়েছিল, ফেরার পথে কুঁই কুঁই আওয়াজ শুনে কুকুর ছানাটিকে দেখতে পায়। অমনি খালি ঝুড়িতে তুলে এনেছিল অসহায় জীবটাকে। তারপর পাঁচ বছর সে ছিল সোন্দর মালোর ছায়াসঙ্গী। অবশ্য রাতে যখন ছায়া মুছে যেত তখনও সে প্রভুর বিছানায় পায়ের তলায় পড়ে থাকত। গরম বালির ওপর চিংড়ি মাছের শুঁটকি তৈরির সময় সুরুলিয়া আর কেরাই পাখির ঝাঁক উড়ে আসত। তখন সারা চত্বরে পাহারাদার ওই এক কেল্লু। সোন্দরের কেল্লুই তখন রক্ষাকর্তা। সে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে দাবড়ে বেড়াত তল্লাট। পাড়ার কুকুরগুলো সুযোগ বুঝে ঢুকে পড়ে খটিতে (যেখানে মাছের কারবার চলে)। দু'-একটা মাছ, কাছিম মুখে তুলে নিয়ে পালাবার ধান্দা করে। কিন্তু কেল্লুর

কাছে সব চালাকি ভন্ডুল হয়ে যায়। ঘ্যাঁক করে তেড়ে গেলেই লেজ গুটিয়ে পালাবে নেড়িগুলো।

এদিকে প্রভুভক্তি তার অচলা। সোন্দর যতক্ষণ বাহার গাঙে থাকবে নৌকোয়, কেল্লু কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকবে ততক্ষণ বালির জমিনে। চোখ দুটো তার আথাল-পাথাল সমুদ্রের দিকে খোলা।

নৌকোগুলো ফিরতে শুরু করলেই কেল্লু চারিদিকে ছুটতে শুরু করবে। এ তার বিপুল খুশির বহিঃপ্রকাশ।

সেই কেল্লু হারিয়ে গেল। বাজারে সোন্দরের সঙ্গে প্রায়ই চলে যায়। আবার সন্ধ্যায় প্রভুর পায়ে পায়ে ঘাট-মাঠ পেরিয়ে ফিরে আসে। সেদিন কিন্তু মাছ বেচা শেষ করে সোন্দর চেয়ে দেখে কেল্লু ধারে-কাছে নেই। অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাছের বাজারে লম্ফ জ্বেলে কেনা-বেচা চলে। তারপর একসময় বাজার ভাঙলে জেলেরা পাততাড়ি গুটিয়ে লম্ফ নিভিয়ে ঘরের পথে পা বাড়ায়।

সেদিন সকলের লম্ফ নিভলেও কত রাত অব্দি জ্বলতে লাগল সোন্দরের সেই কেরাসিনের (কেরোসিন) ডিব্বা। পাগলের মতন সোন্দর কতক্ষণ খুঁজে বেড়াল কেল্লুকে। একবার বাজারের আনাচে-কানাচে খুঁজে আসে, আবার লম্ফের কাছে এসে দাঁড়ায়। যদি তাকে দেখতে না পেয়ে ফিরে যায় কেল্লু।

কিন্তু সে রাতে একাই ফিরে যেতে হয়েছিল সোন্দরকে। ভোরে আবার গিয়েছিল বাজারে। খুঁজেছিল পাতিপাতি করে, কিন্তু সব বৃথা। মাসখানেক পাথর হয়েছিল সোন্দর, কাজেকম্মে মন ছিল না। নৌকো ভাসাত কালেভদ্রে। শেষে পড়শিরা প্রবোধ দিলে। স্যাঙাতরা জোর করে টেনে নামাল জলে। মরা মনে আবার কাজ শুরু করল সোন্দর।

বছরখানেক পরে সোন্দরকে স্বপ্ন দেখাল কেল্লু। একটা গাছতলায় শুয়ে কেল্লু চেয়ে আছে সামনের দিকে। পাটকিলে রঙের একটা কুকুরি তিনটে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

সোন্দর স্বপ্নে দেখল কেল্লুর সাজানো সংসার। পরের দিন জেলেপাড়ার বউ-ঝি, ছেলেবুড়ো সকলে জেনে গেল কেল্লুর খবর। তারা সবটাই অকাট্য সত্য বলে বিশ্বাস করে নিল। কারণ তাদের একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল, সোন্দরের স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হতে পারে না।

পাঁচ দিন পরে ঘটনাটা ঘটল। গাঙ থেকে কূলে নৌকো ভিড়িয়ে সোন্দর দেখে কেল্লু দাঁড়িয়ে আছে। আগের মতো সেই ছুটোছুটি করে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ নেই।

আবেগে 'কেল্লু' বলে ডাক দিয়ে নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ল সোন্দর। কেল্লু কিন্তু পিছন ফিরে ছুট। ছাড়বে কেন সোন্দর। সেও কেল্লুর নাম ধরে হাঁক পাড়তে পাড়তে ছুট লাগিয়েছে।

শেষমেষ সমুদ্দুরের বাহার ভেড়ির (সমুদ্রের প্লাবন রোখার জন্য যে বাঁধ) কাছে এসে কেল্লু থমকে দাঁড়াল। এক সময়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে ভেড়ির ওপারে চেয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

হাঁপাতে হাঁপাতে কেল্লুর কাছে কাছে এসে পৌঁছোল সোন্দর। এবার কিন্তু কেল্লু পালাল না। লাজুক চোখে নীচের দিকে চেয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

সোন্দর ভেড়ির ওপরে চেয়ে তাজ্জব বনে গেল। তার স্বপ্নে দেখা কেল্লুর সুন্দরী, সঙ্গে

একটা নয়, পাঁচটা নয়, ঠিক গনাগুনতি সেই তিনটে বাচ্চা। ওপর দিকে চেয়েছিল কেল্লুর বউ। সোন্দরের সঙ্গে চোখাচোখি হতে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

শেষে বাচ্চাগুলোকে কোলে তুলে মালো পাড়ায় নিয়ে এল সোন্দর। কেল্লু আর তার বউ এল সঙ্গে সঙ্গে।

কেল্লুর সংসার দেখতে সেদিন ভেঙে পড়েছিল ভাঙনমারির পুরো মালোপাড়াটাই।

এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে সোন্দরের জীবনে।

এই তো লগির ব্যাপারটাই ধরা যাক না কেন। নৌকোডুবির পর যে লগিখানা সঙ্গে নিয়ে সে ভেসেছিল, সেটা জ্ঞান হারাবার সঙ্গে সঙ্গে হাতছাড়া হয়ে যায়। বলতে গেলে পুরো দিন ওই লগিখানা আর একটা ফুলে ওঠা বেঢপ মড়াই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

গতরাতে ওই লগিখানার স্বপ্ন দেখেছিল সোন্দর। ভেসে ভেসে এসে জোয়ারের তোড়ে ঢুকে পড়েছে তালসারির ট্যাকে (নদীর বাঁক) জলার মধ্যিখানে।

স্বপনের কথা বলতেই সুখী বলেছিল, দেখব, ঝিনুক কুড়ি (কুড়িয়ে) ফিরার পথে।

একখানা ছেঁড়া ফিকে লালশাড়ির এক ফালি নিশানের মতো কেটে নিয়ে লগির আগায় বেঁধে দিল সুখী। তারপর বাঁশখানাকে তার পালাঘরের এক কোনায় বেঁধে সিধে দাঁড় করিয়ে দিল। পত পত করে উড়তে লাগল পতাকা। সুখী এবার ছুটে গিয়ে রক্ষেকালীর থানে একটা পেন্নাম ঠুকে এল।

সব মায়ের কৃপা। অকালে কেউ মরলেও মায়ের কৃপা, আবার দৈবাৎ অঘটনের হাত থেকে বেঁচে গেলেও তাই।

একদিন দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে সোন্দর বলল, অনেক সেবা পাইলি তুমার অখন আজ্ঞা করো।

সুখী দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যমনস্কভাবে কাপড়ের খুঁটখানা দাঁতে টানতে টানতে থেমে গেল।

কীসের আজ্ঞা?

সোন্দর আরও নরম গলায় বলল, কতদিন আর তুমার একলার রোজগারে ভাগ বুসিইব সুখী? তুমি একটা মড়াকে বাঁচিই তুলছ, অখন আজ্ঞা করো দেশে ফিরি।

সুখী এবার সিধে সোন্দরের চোখে চোখ রেখে বলল, আমি তুমাকে বাঁচিইছি?

একশোবার।

ঠিক কওঠ (বলছ)।

হুঁ।

এবার হাসি হাসি মুখ করে বলল সুখী, তাহিলে তুমার এ জীবনটা আমার হাতে ছাড়ি দও।

এ দরপড়া (আধপোড়া) জীবনটা লিয়া কী করব সুখী?

মরা শামুক আর মরা ঝিনুক দিয়া আমি পুতুল তৈয়ার করি। মরা মানুষটাকে দিয়া কুন (কোন) ঠাকুর গড়া যায় কিনা দেখি।

সোন্দর কৌতুক করে বলে, খরচ পুষিইবেনি (পোষাবে না) সুখী।

জোর দিয়ে সুখী বলে, তুমি থামো, যে গড়বে সে তার লাভ লোকসান বুঝবে।

সুখীর কথার উত্তাপে গলে যায় সোন্দরের মন। তার আটাশ বছরের চওড়া বুকখানার ভেতর তোলপাড় হয়ে যায়।

সোন্দর ভেবে পায় না তার এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণটা। সে যৌবনের এতগুলো দিন মেয়েদের ব্যাপারে প্রায় উদাসীন থেকেছে। শুধু একখানা নৌকো তৈরির স্বপ্ন দেখেছে সে। নিজের একখানা নৌকো। সেটায় চড়ে সে নীল সাগর চুঁড়বে আর জাল ভরে রুপোলি মাছ তুলবে।

মালোপাড়ার মেয়েরা কিন্তু তাকে ছাড়েনি সহজে। আইবুড়ো মেয়েদের কাছে তবু পার পাওয়া যায়, কিন্তু বাড়ির বউড়িদের হাত থেকে রক্ষে পাওয়া বড় মুশকিল। মরদ মাছ ধরতে গেছে আর সোন্দর ঘরে আছে, অমনি ফাঁক-ফোঁকর খুঁজে ঢুকে পড়বে কেউ না কেউ। ঠাট্টা তামাশার সম্পর্ক, হাতে খাবার। মজার কথা বলে বলে সোন্দরের গায়ের তাপ বাড়াবে। শেষে জোর করে হাতের খাবার মুখে গুঁজে দিয়ে আদর জানাবে। ঝাপটে ধরতে গেলেই ছিটকে পালাবে সোন্দর। চরে চক্কর মারবে যতক্ষণ না মাছ ধরে ফিরছে মরদগুলো।

ভীষ্মের পিতিজ্ঞে করেছে সোন্দর, নিজের নৌকো না হলে বে-শাদি নেই, আর চরিত্তিরও খোয়াবে না।

যেদিন যার নৌকোয় যাবে সোন্দর, তার পয়। নৌকো ভরে মাছ উঠবে। জাল ফেলতে, জাল টেনে তুলতে ওস্তাদ সে। ফুট (ঘাই) দেখে বলে দেবে কোন মাছের ঝাঁকটি চলেছে জলে। এক এক চাকে এক এক ধরনের মাছ। ইলিশ, আড়, কাঁটুয়া। আবার জলের রং দেখেও মাছের আগমন জানতে পারে। ঘোলাটে জল না চোখা।

দ্বাদশী থেকে পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যা থেকে চতুর্থী, জোয়ারিয়া কোটাল। ঢেউয়ের যেমন দাপট স্রোতের তেমনি টান। তাই মাছ পড়ে কম। তবু এসব দিনেও সোন্দর সাগরের টানে বেরিয়ে পড়ে। ভয়ডর তার নেই। যেখানে প্রকৃতি কৃপণের মতো তার ধন আগলে রাখে সেখানে সোন্দরের লুঠের নেশা বেড়ে যায়। অবশ্য শীতের দিনে এই কোটালেই মাছের হরির লুঠ।

সে সাবাড় জেলেদের সঙ্গে কখনও বা দু'-তিন মাসের জন্য বাহার গাঙে 'ছোট্' নৌকো চালিয়ে বেরিয়ে যায়। বিজয়ার পর যাত্রা আর সেই মাঘের শীত সমুদ্দুরে ঝেড়ে ফেলে ঘরে ফেরা।

সাবাড় জালের সঙ্গে থাকে সাধারণত ছ'খানা করে নৌকো। দু'খানা নৌকো জালকে গোল করে ঘিরে আনতে থাকে। চারখানা নৌকো জালের বাইরে থেকে জলে লাঠির বাড়ি মারতে থাকে। তরাসে মাছ জল কেটে জালের দিকে এগোতে ঘিয়ে একবারে গেঁথে যায়।

জল পেটাবার কায়দা জানে সোন্দর। কখন বড় চাক ভেঙে দিয়ে মাছের ঝাঁকের টান থেকে নৌকো বাঁচাতে হয়, আবার কখন কতটা জালে ভরতে হয় তা সোন্দরের নখদর্পণে।

এই যে কূল ছেড়ে মাস তিনেকের জন্যে অথৈ জলে পালিয়ে বেড়ানো, এ শুধু তার টাকা রোজগারের ধান্দা নয়। পাড়া ছেড়ে কিছুদিনের জন্য পালাবার একটা ফিকির।

কম সে কম জনা বিশেক এ যাত্রায় পাড়া ছেড়ে যাবেই যাবে। তিন-চার মাস বউ থাকবে মরদকে ছেড়ে। সোন্দর এ সময় ঘরে থাকলে যৈবন রাখা দায়। রোদে কতটুকু পোড়ায়, জ্যোৎস্নায় পোড়ায় তার দশগুণ। আকাশে চাঁদ, দবিয়া ঝউলাটিয়া (মাতাল), তালের পাতায়

হুর্ ফেলে (চিৎকার তুলে) দম্‌কা বাতাস বয়ে যাচ্ছে, অমনি জলপরি এসে দাঁড়ায়। সোন্দরের ঘুম ভেঙে যায়। সে মটকা মেরে পড়ে থাকে। সমানে চলতে থাকে আগড় খুলে দেবার অনুনয়। কিন্তু সোন্দর জানে, একবার ঝাঁপ খুললেই চরিত্তির নষ্ট, আর এতদিনের পুষে রাখা পিতিজ্ঞে ভঙ্গ।

ফোঁস ফোঁস আর বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নায় আকুল হয়ে উঠবে রাত। সোন্দরের পাষাণ দেহখানা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চাইবে, তবু দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকবে সে। ঘন ঘন জপ করবে লাইকানি দেবীর নাম।

এসব ভাল লাগে নাকি! হাজার হোক একজনের আথাল-পাথাল আত্মাটাকে তো দুঃখু দেওয়া।

তাই পড়শিদের সঙ্গে মাস কয়েকের জন্যে বাহার দরিয়ায় বেরিয়ে পড়া। কান্নাকাটি শোনাও নয়, মন কেমন করাও নয়।

এদিকে ভাদ্র থেকে ফাল্গুন, মাছ মারার মরশুম। এ সময় জেলেদের, ঘরে রাত কাটাবার নিয়ম নেই। সমুদ্রের ধারে পালা মেরে (খড়, কঞ্চির ছোট ঘর) তারই ভেতর রাত কাটাতে হবে। এ সময়টাতে শুদ্ধ থাকতে হয়। সারাদিন ঘর-বার করো, কিন্তু রাতে ওদিকে পা মাড়িয়ো না। তবু কেউ কেউ সঙ্গীসাথীদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে। রাত কাটিয়ে শেষ পহরে সুট সুট করে পালায় এসে শুয়ে পড়ে। ধরাও পড়ে যায়। তখন প্রায়শ্চিত্তির। দোষ করেছ, দেহের জ্বালা জুড়িয়েছ, স্নান সেরে গঙ্গামায়ের পুজো করে শুদ্ধ হয়ে নাও। সে বিধান আছে।

এ সময় সোন্দর বহাল তবিয়তে ঘরে থাকতে পারে, কিন্তু তা সে থাকবে না। বউ নেই, শুদ্ধ অশুদ্ধের প্রশ্নও নেই, তবু থাকবে না ঘরে। বন্ধুদের সঙ্গে ওই এক পালাঘরে গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়ে রাত ভোর করে দেবে। সকাল হলেই নৌকো নাববে জলে। বালির বিছানা থেকে তাকে তুলে জলে নামাতে হবে। তারপর সাজ পরানোর পালা। দাড়, হাল, নোঙর, দড়ি-দড়া, বালতি আর পাল নিয়ে এসে নৌকোকে সাজিয়ে দাও। এরপর জাল ওঠাও। সঙ্গে চলল ভার-ঝাঁকা, খ্যাপা (জালের মতো তৈরি থলে), বাটখারা আর দাঁড়িপাল্লা।

সবাই সোন্দরকে সঙ্গে নিতে চায়। সে শুধু পয়মন্ত নয়, খাটেও অসুরের মতো। আধাআধি বখরার সময় ভাগীদারকে সে কিছু বেশি দেবেই। লও, লও, তুমার ঘরে খাউকি (খাবার লোক) মেলা। বে হইলে তখন তুমার আমার আধাআধি ভাগ। তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। হিসাব লিকাশ সমান সমান।

কথাগুলো বলে হা-হা করে বাতাস ফাটিয়ে হাসবে সোন্দর।

এমন জোয়ান মরদকে দেখে কোন মেয়ে না মজে, কিন্তু সুখী মজেছে কিনা বোঝা শক্ত। সুখী যখন সোন্দরের সঙ্গে কথা বলে তখন উত্তাপ থাকে ঠিক তবে সে তাপটুকু হঠাৎ সুখী রসিকতার স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। তাছাড়া সোন্দর একটা সত্যি বুঝে নিয়েছে, সুখী আর পাঁচটা মেয়ের মতো না। কোটালের জোয়ার জেগেছে সারা শরীরে তবু কূল ভাসবে না। পার ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে কথার খেলায় মাতবে কিন্তু সীমা ডিঙিয়ে সে কক্ষনও গৃহস্থের খামার ডোবাবে না।

দশদিন আছে সোন্দর সুখীর টঙে, তার সেবা যত্নে, তবু কোনওদিন সুখী দেহের টানে কাছাকাছি হয়নি সোন্দরের। জলডুবির সময় সমুদ্রের মাছে অনেকখানি কুরে খেয়েছিল

সোন্দরের দাপনার মাংস। তাতে প্রতিদিন জড়ি শিকড়ি বেটে কাথ লাগিয়েছে সুখী। যন্ত্রণায় প্রথম দিকে কাতরে কাতরে উঠত সোন্দর। সুখী রাত-দিন তার পাশটিতে সেঁটে বসে হাত-পা, ঘাড়-গর্দান টিপে দিয়েছে। আবার সোন্দর যখন সুস্থ হয়ে উঠেছে তখন সুখী সরে গেছে তার দেহের ছোঁয়া থেকে দূরে। ছলছুতোয়ও গায়ে হাত দেয়নি সে। রাতে এখন টঙের ভেতর সোন্দরকে শুইয়ে ঝাঁপ টেনে দিয়ে নিজে একখানা সঁপ (মাদুর জাতীয়) বিছিয়ে পড়ে থাকে দাওয়ায়। সোন্দর ক'টা রাত সুখীর এ ব্যবস্থায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল কিন্তু ফল হয়নি। ব্যবস্থাটা মেনে নিতে হয়েছে।

সোন্দর প্রতিবাদ করেছিল, একী কও তুমি! মায়ালোক রইবে ঘরের বাইরে মদ্দ রইবে ভিতরে।

অন্ধকারেও সুখীর সেই মুখটেপা হাসি। বলেছিল, তুমার মনকে (তোমাদের) বিশ্বাস কী, যদি ভাগি পড়ো। তাউ (তাই) ঝাঁপ দিয়া পাহারায় রই।

আমাকে দেখি কি অত নিমকহারাম মনে হয় তুমার?

নিমকহারামী কি গায়ের রং যে দেখি কি চিনা যায়, ও ভিত্‌রে রয়। কখন যে ফুটি বারিবে সে কওয়া মুশকিল।

হার মানছি তুমার পাশে, আমি তুমার ঘরে বন্দি হয়া (হয়ে) রইলি।

কদ্দিন?

যদ্দিন তুমি রাখব।

আবার মুখটেপা হাসি সুখীর, কী ভাগ্য আমার গো! একটা জুয়ান মরদ আমার শাড়ির খুঁটে বাঁধা।

কত রাত এমনি কথার পিঠে কথা পড়ে, তারপর সব চুপচাপ।

বাদাম আর ওলাং গাছের পাতার ফাঁকে রাতচরা পাখি হঠাৎ হঠাৎ ডেকে ওঠে। রাতে গবজড়া গাছ আঁকড়ে পাখা চুলকে চুলকে ঝিঁঝি সানাই বাজায়। নাচকনা আর অর্ক গাছে জোনি (জোনাকি) পোকা আলোর ফুলকি তুলে নাচে।

ঘুম আসে না সুখীর। গাল বেয়ে গলা আর বুকের কন্দরে জল গড়ায়। জীবনে কী পেয়েছে আর কী পায়নি তার উত্তর কে দেবে। নিজের কাছে কোনওদিন উত্তর খুঁজে পায়নি সে! বিয়ে করেছিল সুখী হবে ভেবে, কিন্তু সুখ নেই তার কপালে। প্রতিটি মরদ মাছ মদ আর মৈথুন ছাড়া কিছুই জানে না। মেয়েমানুষ গতর খাটাবে আর বছর বছর গভ্‌ভ ধারণ করবে, এছাড়া তাদের ভাবনায় আর কিছু নেই। সুখী তা ভাবতে পারে না বলেই যত বিরোধ। কোথায় একটা শিল্পী মন তার লুকিয়ে থাকে। শরীরের জ্বালা মেটার সঙ্গে সঙ্গে যার খিদে মিটে যায় না। তার অনেক বায়নাক্কা। এই যে গেঁড়া (গেঁড়ির বড় আকার) দিয়ে হাতি বানালে, সরু শামুক জুড়ে তৈরি করলে শুঁড় আর পা, তার পিঠে হাওদা কই? মাথা খাটিয়ে বানাও হাওদা।

তুমি ভাবতে বসেছ, কেমন করে সব ঠিকঠাক সাজানো যাবে অমনি মরদ এল ঘরে।

চিৎকার, ভাত কাই? অখনও হাঁড়ি চড়েনি চুলোয়! ভাতারখাকি করছু কী সারাদিন?

চুলের মুঠি ধরে মাটিতে শুইয়ে ফেলে দমাদ্দম কিল, চড়, লাথি। তারপর হাঁড়ি ভেঙে শিল্পকর্ম দূরে ছুড়ে ফেলে বিক্রম প্রকাশ।

সুখী ওদের দোষ দেয় না। সত্যিই তো, মেয়েরা ঠিক সময়ে পুরুষদের পরিচর্যা না করলে

কি চলে। কিন্তু ধাত তো সবার সমান নয়, তাই মানাতে না পেরে সময় থাকতে সরে এসেছে সে। একটা প্রায়ই তাকে মারত আর অন্যটা করত পদসেবা। তাই দুজনের একটিও ছিল না তার পছন্দের মানুষ। তৃতীয়জনকে মদে খেয়েছিল। তাই তাকে বেহুঁশ অবস্থায় বেঁধে রেখে পালিয়ে আসতে হয় সুখীকে।

সেই সুখীর চোখে জল গড়াল। এ যে অন্য এক পুরুষ। একটা খোলা ঝাঁপের এপার-ওপার দু'জনে শুয়ে আছে তবু সাড়াটি নেই। জোয়ানি আছে কিন্তু জবরদস্তি নেই। এত কাছে তবু অচেনা, অনেক দূরের। আর তাই সুখীর গিঁট পড়েছে বাঁধনে। সহজে কি খোলা যাবে এ গিঁট! সুখী নিজেই পায়নি এর উত্তর।

সেদিন সুখী বলল, যাব আমার সঙ্গে দীঘা? হাতের কাজ অনেক জমা হইছে, বেচি আসব।

খুম (খুব) রাজি, কতদিন বার হিতে (বের হতে) পারিনি। চল যাই।

সোন্দর এক পায়ে খাড়া।

সুখী হেসে বলে, দীঘার হোটেলে খাবিইতে (খাওয়াতে) পারবনি গো, অত পইসা নেই। একটু সবুর করো, চারটি ভাত ফুটাই। কত রাতে ফিরব, পেটে দুটা ফেনা ভাত রইলে কাজ দিবে।

তাই সই। বাধ্য ছেলের মতো সুখীর কথা শুনে খুঁটি হেলান দিয়ে দাওয়ায় বসে থাকে সোন্দর। টঙের ভেতরে টগবগিয়ে ভাত ফোটে। সুখী বাঁ হাঁটুতে মুখ গুঁজে আড় চোখে চেয়ে থাকে দাওয়ায় বসে থাকা মানুষটার দিকে। মনে মনে ভাবে, এমন দরদ দিয়ে কখনও কি সে ঘরকন্না করেছে। এই কটা দিনমাত্র মানুষটা এসেছে তার ঘরে, এরই ভেতর সারা ঘরখানা সে জুড়ে বসেছে। শুধু ঘর কেন, একটা আস্ত মন। আর মনটা কখন যে ধীরে ধীরে ভরে উঠেছে তা সে টেরও পায়নি।

দীঘার সমুদ্রে নেমে যাবার রাস্তা। দুধারে সারি সারি দোকানপাট। ডিজাইনওলা মসলন্দ মাদুর। ঝিনুকের তৈরি হাতের আংটি, কানের দুল। শাঁখের তৈরি গয়নার সাজ। শামুক, ঝিনুক মিলিয়ে হাতি, কচ্ছপ, খরগোশ আর দেবদেবীর মূর্তি। সাদা রঙের ওপর হালকা হলুদ আর লালের ছোঁয়া। পেতলে চিত্রিত মুকুটওলা দেবীর মুখ। আরও কত কী। খাবারের পসরা তো আছেই।

ভালই হল বেচাকেনা। সুখীর হাতের কাজ দেখে ততক্ষণে তাক লেগে গেছে সোন্দরের। সুখী যে এত গুণের গুণী তা কি সে বলেছে কোনওদিন। বড় চাপা সে নিজের সম্বন্ধে। সোন্দর ঘরে আসার আগে সুখী ক'টা কাজ তৈরি করে রেখেছিল। সুযোগ পেয়ে আজ এসেছে বেচতে। আর তাই সুখীর এই গুণের খবর জানতে পারল সোন্দর।

আজ চাঁদের আলোয় বান ডেকেছে। সমুদ্রের জলে পা ডুবিয়ে বেড়াচ্ছে এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে। খাবারের দোকান, মনিহারি দোকান আর হোটেল, রেস্তোরাঁয় আলো জ্বলছে। একটা বাচ্চা ছেলেকে ঘোড়ায় বসিয়ে ঘুরিয়ে আনল ঘোড়াওয়ালা। একদঙ্গল তরুণ তরুণী শেষ খেপে নৌকো চড়ে গিয়েছিল সমুদ্র বিহারে, তারা এইমাত্র ঝুপ ঝুপ করে নৌকো থেকে নেমে এল। প্যান্ট আর সালোয়ারের প্রান্ত ভিজল ; ভিজল শাড়ির পাড়। কী যায় আসে তাতে। খিল খিল খুশির খই ছড়িয়ে উঠে গেল।

সোন্দর আর সুখী চেয়ে চেয়ে দেখল ওদের।

অনেক রাস্তা যাইতে হবে গো, চলো পা চালাই।

সুখীর কথায় সোন্দর বলে, হুঁ চলো। ছ'সাত মাইল হবে।

আরও বেশি। রাইত (রাত) হবে মেলা।

ওরা পা চালায়। সুখী কোমরের কাপড়ে ভরে নিয়েছে মুড়ি আর ছোলা ভাজা। চারটে নারকেল নাড়ু আর এক ঠোঙা কাঠি গজা ঢুকিয়েছে তালপাতার হাতলওলা ব্যাগে।

এই যে, আমার কোঁচড়নু (কোঁচড় থেকে) লিয়া খাও।

সোন্দর সুখীর কোঁচড়ে হাত ঢুকিয়ে মুঠো ভরে মুড়ি তুলে নিয়ে মুখে পোরে।

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে মুড়ি আর ছোলাভাজা চিবোয়। এখানে বালি মাটি মেশা শক্ত সমুদ্রতীর। হনহন করে হেঁটে চলে যাওয়া যায়। ওরা সামনে হেঁটে চলেছে, দীঘার আলো ধীরে ধীরে পিছু হটছে। চাঁদের আলো বিছিয়ে পড়েছে বালুর জমিনে। দূর সমুদ্রে ঢেউ-এর দোলায় দুলছে কটা নৌকো। তাদের আলোগুলো নক্ষত্রের পরীর মতো একবার ডুবছে, একবার উঠছে।

কথা বলল সোন্দর, তুমার ঝিনুকের থালা, শামুকের পুতুল বাবুমনকের (বাবুদের) বোড়ো পছন্দ।

কী করি জানল?

মুখ দেখি।

আবার সেই টেপা হাসি সুখীর ঠোঁটে, মুখ দেখি কি করি জানা যায় গো!

সোন্দর বলে, ঘুরিই ফিরি দেখছে আর মাথা লাড়ছে।

তুমার ভাল লাগেনি?

সত্যি সুখী তুমার হাতের কাজ দেখি আমি অবাক হই যাইছি। তুমি অত গুণের গুণী।

মুড়ি শেষ হয়ে এসেছে। সুখী কোঁচড়ের ভেতর হাত ছেনে শেষ কটি তুলে সোন্দরের হাত টেনে নিয়ে ভরে দিল।

সোন্দর বলে, তুমি দুটো লও।

না, ওই ক'টা তুমি খাও।

আধাআধি।

অবশেষে তাই হল। এই ক'টি মুড়িও দু'জনের মুখে উঠল।

পাশাপাশি শুয়ে আছে দুটো নৌকো। সুখী বলল, বৃসব দু'দণ্ড?

হুঁ বুসো।

ওরা দুটো নৌকোর মাঝখানে পাশাপাশি বসল। সুখী নারকোল নাড়ু আর কাঠিগজা বের করল তালপাতার পেঁটরা থেকে।

সোন্দর বলল, তুমার লক্ষ্মীর ঝাঁপিরে অতও আছে!

আমার গা ছুঁই কও, আমারে দেখে তুমার লক্ষ্মী মনে হয়?

হঠাৎ কী হল সোন্দরের, সে একটা আঙুল সুখীর মুখে ছুঁইয়ে দিয়ে বলল, এ লক্ষ্মীর মুখ লয় তো কী?

সুখী বাধা দিল না। শুধু দু'ফোঁটা চোখের জল গড়াল তার গাল বেয়ে। এমন সুখের কান্না সে কোনওদিন কাঁদেনি। তিনটে পুরুষের ঘর করেছে সে, কিন্তু সুখের কান্না কী করে কাঁদাতে হয় তা ওদের ভেতর একজনও জানত না। তেমন হলে সুখী পারত ওদের ছেড়ে আসতে?

সুখী এবার বড় শান্ত, বড় সহজ গলায় কথা বলল, তুমাকে অনেকদিন অনেক কথা জিগাস করব মনে করি কিন্তু করে উঠতে পারিনি।

কও, কী জানতে চাও। আমি নিজের মুখ ফুটি কথা কাউকে কুনওদিন কইনি। জিগসাইলে কই।

তুমার ঘর যে জুনপুট, সে কথা তুমি সকলের কাছে কইছ। আর মাছ ধরতে গিয়া ঝড়ে লৌকাডুবি হইছে, সে কথাও কইছ। কিন্তু ...।

ওই কিন্তুর পর আর এগোয় না সুখীর বাক্যি।

সোন্দর বলে, কিন্তু বলি থামল কেনি গো, আর কী জানতে চাও কও। তুমার কাছে লুকিইবার আমার কিছু নেই।

এবার মুখোমুখি প্রশ্ন সুখীর, বউ বাচ্চা?

হেসে বলে সোন্দর, বিভা (বিয়ে) হয়নি, বাচ্চা আইসব কী করি গো।

সুখীর সেই মুহূর্তে মনে হল, সে এক অলৌকিক জগতের বাসিন্দে। সে আর সোন্দর ভেসে চলেছে নৌকোয় করে। ঝকঝকে রুপোর পাতের মতো জল থেকে ছোট ছোট সাদা পুঁতির দানা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। যাত্রায় সে যেমন সদাগর পুত্তুর দেখেছে ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে সোন্দরকে। আর সে নিজেই নিজেকে চিনতে পারছে না। সারা শরীরটা তার যাত্রার সেই রাজকন্যে হয়ে গেছে। শ্রীমন্ত সদাগর লঙ্কার রাজকন্যাকে বিয়ে করে ময়ূরপঙ্খীতে ফিরছে দেশে।

সুখীকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে সোন্দর আবার বলল, কী ভাবছ গো?

সে কথাটুকুও সুখীর কানে পৌঁছোল না। সে তেমনি বসেই রইল।

এবার সোন্দর সোজাসুজি প্রশ্ন করল, তুমার বিভা হয়নি সুখী?

হঠাৎ যেন সাতসাগরের উন্মত্ত ঢেউ আছড়ে পড়ল সুখীর কানের ওপর। কাল কেউটের ছোবল পড়ল বুকের ঠিক মধ্যিখানে। সুখী এতক্ষণে লন্ডভন্ড হয়ে গেল। ছিঁড়েখুঁড়ে দমকা হাওয়ায় উড়ে গেল স্বপ্ন।

না, সুখী একটুও ভয় পাবে না। যা সত্যি তাই সে সোন্দরকে বলে দেবে।

তিন তিনবার আমি বিভা করছি আবার ভাঙি বি দিছি, দোষ কারও নয়, আমার।

সোন্দর ঘন ঘন মাথা নেড়ে জানাল, সুখী দোষী, একথা সে ভাবতেই পারে না।

বিশ্বাস করো, তারমনে (তারা) আমাকে ছাড়তে চায়নি, আমি নিজে ছাড়ি চলে আসসি (এসেছি)।

তারমনকের (তাদের) দোষ নেই রইলে তুমি ছাড়ি আসতে পারতনি।

এবার সুখী তিন তিনটে মরদের পক্ষ নিয়ে নিজের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে যায়। সে যেন সোন্দরের সামনে নিজেকে ছিঁড়ে চিরে তার দোষগুলো তুলে ধরতে চায়।

অনেকক্ষণ উত্তেজনায় ঘুরে ফিরে সুখী হাঁপাতে থাকে।

সোন্দর শান্ত গলায় বলে, তুমি যা কও সুখী, দোষ তুমার টুকু বি (একটুও) নেই। আমি মানুষ চিনি। মরদগুলা নিমকহারাম।

সুখী এবার সোন্দরকে ধরে পড়ে, বলো, তুমি আমার কী জানো?

অতদিন একঘরে পাশাপাশি শুইছি, তবু বল তুমাকে চিনতে পারিনি!

সুখী এবার হঠাৎ করে কোনো উত্তর দিতে পারে না।

কিছু পরে বলে, তুমার মতো আর একটি মরদও আমি এ জীবনে দেখিনি।

হাসে সোন্দর। বলে, বিশ্বাস করো সুখী, লোভ আমারও আছে। তবে একটা কঠিন পিতিজ্ঞে আমার, বিভা না হিলে কুন মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুলবনি।

সুখীর গলায় এবার একরাশ কৌতূহল, অতদিন আইবুড়ো আছ, সংসার করোনি কেনি?

সোন্দর বলে, সে মেলা কথা। টাকা আয় উপায় করি একটা লৌকা তৈরির স্বপন দেখি। নিজের লৌকা হিলে ঘর পাতব, এই পিতিজ্ঞে।

সুখী এবার উঠে দাঁড়াল। দু'-চারটে চাপড় মেরে পেছনের বালি ঝরিয়ে বলল, রাত বাড়ে, চল যাইগা।

আবার দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলল। আদিম জাতির প্রতিনিধি দুটি নরনারী এগিয়ে চলেছে। ওপরে সৃষ্টির আদিযুগের চাঁদ, আলোর জলে ধুইয়ে দিচ্ছে তাদের পথ। বাঁয়ে আছড়ে পড়া সমুদ্রের অনন্তকালের ছেদহীন গান।

কয়েক ক্রোশ পথ একটানা এসে সুখী এক জায়গায় থমকে দাঁড়ায়। ডাইনে দীর্ঘ ঝাউয়ের ঘন বন। সরকারি ব্যবস্থায় সারি দিয়ে লাগানো হয়েছে। তাই সারিগুলোর মাঝে মাঝে তৈরি হয়েছে জ্যোৎস্না ভাঙা আলোর পথ।

সুখী এখন জেলেদের ভারী চঞ্চল এক কিশোরী কন্যা হয়ে গেছে। সে সোন্দরের হাত ধরে টানতে টানতে বলল, চলো না গো, ঝাউ বনের ভিতরে যাই।

সুখীর টানে প্রায় ছুটতে ছুটতেই ঝাউবনের ভেতর সোন্দর আর সুখী ঢুকে পড়ল।

এখানেও একটা নৌকো! কাঠ আর বাঁশের ঠেকো দিয়ে দাঁড় করানো আছে।

সোন্দর নৌকোটার দিকে ঝুঁকে পড়ে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে বলল, সুখী, দেখো দেখো, নতুন নৌকা। আলকাতরার গন্ধ বার হিছে।

সুখী পর্যবেক্ষণ করে অভিজ্ঞের মতো বলল, হুঁ।

হুঁ লয়গো, তৈরি হই যাইছে। দু'চার দিনের ভিতরে জলে ভাসবে।

তুমি জানলে কী করি?

আমি নিজে ওড়িশার মিস্ত্রির সঙ্গে লৌকা তৈরির কাজ করছি, তাউ সব জানি।

ছোট মেয়ের মতো কৌতূহলী হয়ে ওঠে সুখী, আমাকে বুঝিই দাও। আমি লৌকাটার কিছু জানিনি।

তুমি জালির (জেলের) ঝি, তুমি জানোনি!

আমি ঝিনুক কুড়াই, শামুক কুড়াই, আর তাউ (তাই) দিয়া খেলনা তৈরি করি। লৌকার আমি কী জানি কও।

সোন্দর নৌকোর মাথা এবং পেছনের উঁচু দুটো জায়গা দেখিয়ে বলল, এ দুটা হিল, আগ্‌লি আর পিছলি মঙ্‌। অর (ওর) ঠিক নীচেই ছাপরানের কাঠ। ছাপরান থিকে লৌকার নীচ দিয়া সামনে পিছনে টানা কাঠটা—দাঁড়া।

সুখী আলো আঁধারি বালুর জমিনে কাত হয়ে বসে দাঁড়াখানায় হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল।

সোন্দর তখন সমানে বকে চলেছে, এই যে সুখী, দাঁড়ার উপরের কাঠগুলো, লৌকার খোলের ধাউড়। একেবারে উপ্‌রের চওড়া টানা কাঠটা সাম্‌লি।

এখন সুখী উঠে দাঁড়িয়ে সাম্‌লির আলকাতরা মাখানো কাঠের চিকন গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

সোন্দর দাঁড় বাঁধার জায়গাটাতে হাত ঠেকিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, অমনি সুখী তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, অটা (ওটা) আর কই (বলে) দিতে হবেনি গো, খুঁটিয়া, খুঁটিয়া।

সোন্দর বলে চলে, লৌকার উপ্‌রে পাঁচখণ্ড (পাঁচখানা) কাঠ চওড়া বরাবর আঁটা আছে, এটা হিল বারি। আর লৌকার ভিতরে খোলটাকে বন্ধন করি রাখছে যে ক'টা বাঁকা কাঠ, তাকে কয় বাঁক।

সোন্দর যেন তার মনের মতো একটা বিষয় পেয়ে গেছে। সে ক্রমাগত নৌকোর অন্ধিসন্ধি বলে চলেছে। সে এমন তন্দ্গত হয়ে বলছে, যাতে মনে হবে, ও স্বপ্নের ঘোরে বলে যাচ্ছে।

সুখী এক কাণ্ড করে বসল, সে নৌকোর খুঁটিয়া ধরে বারির ওপর উঠে পড়ল। তারপর একেবারে তলায় গিয়ে সিঁধল।

সুখীর কাণ্ড দেখে হেসে উঠল সোন্দর। নৌকোর বাইরে দাঁড়িয়ে সোন্দর, আর ভেতরে সুখী। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ ভেতর থেকে একখানা হাত বেরিয়ে এল। তার আঙুলগুলো নড়ছে। বাইরের মানুষটিকে ডাকছে ভেতরে।

ঝাউবনের রহস্যময় আলো অন্ধকার, সমুদ্র থেকে ভেসে আসা অনাদিকালের গান, মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যাওয়া দমকা মাতাল হাওয়া, সবকিছু যোগ দিল ওই একখানা হাতের ইশারার সঙ্গে।

সোন্দর নিশি পাওয়ার মতো সে ডাকে সাড়া দিয়ে নৌকোর খোলের ভেতর লাফ দিয়ে পড়ল।

নৌকোর ভেতরটা ছায়ায় ঢাকা। ঝাউয়ের ছায়া আর নৌকোর নিজের ছায়া মিশে ভেতরটায় আবছা অন্ধকার।

একখানা হাত সোন্দরকে একান্ত কাছে টেনে নিল। ফিস্‌ফিসে গলায় বলল, ভয় কীগো, আমি কি বাঘ না ভালুক।

একটু থেমে আবার বলল, এক সাঙ্গে (সঙ্গে) দু'দণ্ড বুসব বলি ডাকলি। কুনও ভয় নেই গো, কুনও ভয় নেই।

সোন্দরের সেই মুহূর্তে ভয়ের ভাবনা ছিল না, আদিম অরণ্যে মউল ফুলের গন্ধ তাকে মাতাল করে তুলেছিল। তার এতদিনের প্রতিজ্ঞা ভেসে যেতে বসেছিল এই রহস্যময় অন্ধকারের জোয়ারে। কিন্তু সুখীর আশ্বাসে সে তার হারানো সংবিত ফিরে পেল। সোন্দর অন্ধকারে সুখীর হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় ভরে নিল। তার মনে হল, এতদিন সে যেসব মেয়েমানুষ দেখে এসেছে সুখী তাদের থেকে একেবারে আলাদা।

সোন্দর বলল, লৌকায় চড়ি মনে হিছে আমার মনে বাহার গাঙে ভাসি যাইছি।

হঠাৎ সুখী বলল, অতদিন লৌকাডুবির কথা তুমাকে জিগাস করিনি, পাছে তুমি কষ্ট পাও, আইজ শুনতে বোড়ো মন চাইছে গো। যদি কষ্ট পাও তাহিলে বলি কাজ নেই।

সেদিন নৌকোর খোলে বসে সোন্দর তার জলে ডোবার কাহিনী বলে গিয়েছিল সুখীর কাছে, আর সে কাহিনী শুনে বার বার শিউরে উঠেছিল সুখী। নিজের অজ্ঞাতেই কখন বুকের মধ্যে চেপে ধরছিল সোন্দরের হাতটা।

ওরা নৌকোয় ছিল পাঁচজন। পাটিয়া নৌকো। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ঘোড়ার মতো ছুটছিল

লাফিয়ে লাফিয়ে। এ নৌকোর চলনই তাই। বাহার গাঙে অনেকখানি গিয়ে ওরা জাল ফেলতে শুরু করেছিল। নৌকো ভরে উঠে আসছিল ফিল্‌কা (পমফ্রেট), গুরা (কাঁটা কম), শিলা (ভোলা) আর পামরা (বাগদা) চিংড়ি। যত মাছ উঠে আসছিল জালে ততই ওরা খুশি হয়ে উঠছিল। শেষে এক ধরনের নেশায় ওদের পেয়ে বসেছিল।

নৌকোটা ছিল গুরাই মালোর। সে ভাড়া নিয়েছিল মহাজনের কাছ থেকে। গুরাই প্রথম থেকেই একজনকে তার নৌকোয় তুলতে চায়নি। সে লটাই মালো। প্রৌঢ় বলে নয়, অপয়া বলে। কিন্তু সোন্দরের একান্ত অনুরোধে লটাইকে শেষ পর্যন্ত রাখতে হল দলে।

লটাই কথা বলে কম। তাকে যেটুকু কাজ দেওয়া হয় তা সে নিষ্ঠার সঙ্গে করে। অবশ্য নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোনও কিছু করার ক্ষমতা তার কোনওদিনই ছিল না। লটাইয়ের ভাগ্যটাই খারাপ। যার নৌকোয় যেদিন সে গেছে তার সেদিনকার মাছের বরাতটাই মন্দ। যে নৌকোয় যায় না, রোজদিন কি সে নৌকোয় মাছ উপচে পড়ে নাকি? আদপেই না। তবু মন্দ ভাগ্যের অপবাদটা রটে গেছে লটাইয়ের নামে। তা হোক, তবে লটাই-এর মতো মানুষ সারা মালো পাড়ায় আর একটিও মিলবে না। ব্যাঙাচির মতো মালো পাড়ার যে বাচ্চাগুলো সারাদিন সমুদ্রের জলে ঝাঁপাই ঝুড়ছে, তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে লটাই। তাদের সাঁতার শেখানো, ঢেউয়ের চালচলন বোঝানো থেকে পাড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসা অব্দি সব কাজই করে সে। বছর বারো হলেই নৌ-যাত্রার প্রথম পাঠ নিতে হবে লটাই মালোর কাছে। এসব ব্যাপারে সারা মালোপাড়া তার হাতে সবকিছু সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত। তারা লটাইকে এসব কাজের জন্যে কিছু দিতে চায় কিন্তু লটাই গরিব হলেও হাত পেতে কিছু নেবে না। নিজের নৌকো থাকলে সে কি কোনওদিন কাউকে তোষামোদ করত। তা ছাড়া তার মেয়ে দুখিয়া আছে না? তার জন্যে বাপ হয়ে সে কিছু করবে না, এ কি হয়! মা মরা দুখিয়া বড় শান্ত। বাপের মতো নীরবে সবকিছু করে যায়। মালোপাড়ায় মেয়েদের ভেতর যখন কাজিয়া (ঝগড়া) হয় তখন চিলও চেঁচায় আকাশে, কিন্তু কোনওদিনই সেখানে দুখিয়ার দেখা মিলবে না। ঝগড়া দেখার জন্য সার দিয়ে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ভেতর খুঁজে দেখো, দুখিয়া নেই। মালোপাড়ার সকলে জানে দুখিয়া গরিব, কিন্তু সে তার বাপের মতোই সৎ। তাই নৌকো তৈরির জন্য যে টাকা ধীরে ধীরে জমাচ্ছে সোন্দর তার সবটাই সে রেখে দিচ্ছে দুখিয়ার কাছে। প্রথমে সোন্দর টাকা রাখার কথাটা পাড়লে দুখিয়া বলেছিল, আমি গরিব, টাকাটা কি গচ্ছিত রাখতে পারব সোন্দরদা? তুমি বরং আর কারু কাছে রাখো।

কারও কাছে রাখবনি, বালির ভিতরে পুঁতি রাখব।

সোন্দরের রাগ, অভিমান সবই বোঝে দুখিয়া। সে এবার হাত বাড়িয়ে বলে হিসাবপত্র আমি জানিনি, কত টাকা দিল তার হিসাব তুমি রাখব।

সোন্দর দুখিয়ার মত পরিবর্তনে খুশি হয়ে ওঠে। ট্যাঁক থেকে টাকাগুলো বের করে দুখিয়ার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, হিসাবে দরকার কী, টাকা জমছে, ব্যস্।

সেই থেকে যত টাকা জমছে সোন্দরের সবই দুখিয়ার বটুয়ামণির ভেতর বাঁধা পড়ে থাকছে। দু'জনের কেউই প্রশ্ন করছে না কত টাকা। দুখিয়া জানে এ টাকায় সোন্দরদার নৌকা হবে।

কেবল লটাইয়ের মেয়ের সঙ্গে আর্থিক ব্যাপারে একটা যোগ আছে বলে নয়, সোন্দর,

অসহায়, ভাগ্যতাড়িত লটাইকে যে কোনও ভাবেই হোক সাহায্য করতে চায়। লটাইকে নৌকায় চড়বার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে সোন্দর।

গুরাই মালোর নৌকোয় সোন্দরের এমনি চেষ্টার ফলে জায়গা পেয়েছিল লটাই।

মাছ পড়েছে দেখে নৌকোর মালিক গুরাই চোখ টিপে মেধোকে বলল, লটাই-এর অপয়া নামটা বোধহয় ঘুচল এবার।

মেধো মাথা নেড়ে হাসল। কিন্তু সেই মুহূর্তে জলের দেবতা আড়ালে থেকে মুচকি হাসলেন।

ফাগুনের শেষ হপ্তা। এ সময় সাধারণত নৌকো ডাঙায় তুলে নেয় জেলেরা। আবার সেই ভাসবে ভরা বর্ষায়। এ দিন কটা বড় দুঃসময়। মউলির মদ খাও আর দুঃখ দূর করো। নয়তো সূতো, ছুরি, সুড়ুঙ্গি নিয়ে জাল বোনো, জাল সারাও। কাঠের করমলি দিয়ে শনের দড়ি পাকাও।

গুরাই মালো মহাজনের হাতে তার নৌকোটা ফেরত দেবার আগে শেষ ক্ষেপে সমুদ্র মন্থন করে কিছু মৎস্য-রত্ন তুলে নিতে চেয়েছিল।

রাতটা সাগরে কাটিয়ে ভোরের জোয়ারে ফিরে যাবে ডাঙায়, এই মতলব এঁটে বসেছিল মালোপাড়ার পাঁচ পাঁচজন মালো। রাতে লটকন (চৌকোনা চিমনিওলা ল্যাম্প) জ্বেলে রান্নাবান্না, খাওয়া দাওয়া হয়েছে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর চোখ জড়িয়ে এসেছে ঘুমে। তাই আকাশের তারা মুছে দিয়ে কখন যে এগিয়ে আসছে বাজপাখির মতো একটা ঝড় তার হদিস পায়নি নৌকোর আরোহীরা। যখন পেল তখন ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকা টালমাটাল।

সামাল, সামাল রব তুলে বাবা মছন্দলির নামে সিন্নি মানত করে নৌকো ছেড়ে দিল নদীর স্রোতের মুখে।

পলকে বাতাসের বেগে উড়ে চলে গেল নৌকো। অন্ধকারে জলস্থল অদৃশ্য। হালটা ধরে থাকতে হয় তাই থাকা। একটা ঢেউ এসে মহাশূন্যে তুলে দিল নৌকোটাকে পর মুহূর্তেই ফেলে দিল অনন্ত অতলে। আর সেই মুহূর্তে নৌকো থেকে ছিটকে জলে পড়ে গেল পাঁচজন। একবার ওই ঝড়ের গর্জনের ভেতর শোনা গেল একটা আর্ত গলার কাঁপা কাঁপা আওয়াজ, দুখিয়া, দুখিয়া রে...।

সোন্দর কী করে যে হাতের কাছে শুকনো বাঁশের লম্বা লগিখানা পেয়ে গেল তা সে এখন আর মনে করতে পারে না। তবে তার এটুকু স্পষ্ট মনে আছে, সে ওই কাঁপা গলার দুখিয়া ডাক শুনে লটাই খুড়োর নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিল। তারপর অন্ধকারে, ঝড়ে সাগরের অনন্ত জলরাশি তোলপাড়।

বাঁশখানা সেই যে আঁকড়ে ধরে আছে তা আর ছাড়েনি সোন্দর। ছিলা থেকে বেরিয়ে যাওয়া তিরের মতো লগিটা তখন স্রোতের মুখে ছুটে চলেছে।

ভোর হল, ঝড়ের চিহ্নমাত্র নেই। সোন্দর ভেসে চলেছে স্রোতের টানে। হঠাৎ ফুলেওঠা একটা মড়াকে সে ভেসে যেতে দেখল। অমনি বাঁ হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরল তার একখানা পা। যা কিছু ভেসে যাচ্ছে তাই এখন জীবনরক্ষার উপায়। পচা মড়াটায় কামড়ে ধরে আছে এক ঝাঁক ট্যাংরা জাতীয় মাছ। ঘোলাটে চোখে এক লহমায় সব দেখে নিয়ে মড়ার ওপর নিজেকে তুলে বুক সাঁতারে স্রোতের অনুকূলে এগিয়ে যেতে লাগল সে। তাকেও বিরক্ত করতে লাগল মাছগুলো। দাপনার মাংস অতি মিহি দাঁতে কুরে কুরে খেতে লাগল। একসময় যন্ত্রণায়

কাতরাতে কাতরাতে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় সে প্রবল আক্ষেপে জলে হাত পা ছোঁড়া শুরু করতেই হাত থেকে বেরিয়ে গেল বাঁশ আর মড়া দুইই। ঠিক সেই মুহূর্তে কটা ঢেউ সোন্দরের দেহটাকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে চলল কূলের দিকে। সোন্দর জলে ওলটপালট খেতে খেতে কখন যে জ্ঞান হারাল তা আর তার জানা নেই। তার পরের ঘটনা তালসারি গ্রামে সুবর্ণরেখার মোহনায়, আর সে ঘটনার সুবাদে সোন্দরের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল সুখী।

ঝাউগাছের পাতায় সমুদ্রের হাওয়া লেগে অদ্ভুত একটা শব্দ উঠছিল। সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ছিল রহস্যময় জ্যোৎস্না আর জনহীন বালিয়াড়ির ওপর।

জলে ডোবার কাহিনী কখন শেষ হয়ে গেছে, সুখী আর সোন্দর বসে আছে পাশাপাশি। কারও মুখে কথাটি নেই। সোন্দরের একখানা হাত তখনও সুখী চেপে ধরে আছে বুকে।

এক সময় সোন্দর বলল, কিগো উঠবনি?

সুখী যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে আস্তে বলল, না।

আরও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটল। এবার সুখী বুকে চেপে ধরে রাখা হাতখানা সোন্দরের কোলে নামিয়ে দিয়ে বলল, রাত অনেক হইছে। চলো যাই।

দু'জনে নেমে এল নৌকা থেকে। ঝাউবন পেছনে রেখে ওরা বেরিয়ে এল সমুদ্রের ধারে। আবার শুরু হল হাঁটা। ডানহাত তুলে একটা দিক নির্দেশ করে সুখী বলল, চন্দনেশ্বর পুয়াটাক (এক ক্রোশের চার ভাগের একভাগ) দূর। বোড়ো জাগ্রত ঠাকুর। একদিন পূজা দিয়া যাব।

কার মঙ্গল কামনায় সুখী পূজা দিতে আসবে সেকথা মুখ ফুটে না বললেও সোন্দরের অনুমান করে নিতে অসুবিধে হল না।

গভীর রাত্রে ওরা এসে পৌঁছোল ওদের পালা ঘরে। খিদে তেষ্টায় দু'জনেই কাহিল।

সোন্দর বলল, আইজ রাতে রাঁধিয়া কাজ নেই সুখী। দুটা মুড়ি চিবিই জল খাই।

সুখীর এত পরিশ্রমেও সেই মুখ টেপা হাসি, নিজে হইলে একরকম, ঘরে কুটুম আছে না?

বিস্ময় প্রকাশ করে সোন্দর বলে, তুমি অখ্‌খুন (এখন) আবার রাঁধতে বুসব!

সুখী দাওয়ায় সঁপখানা বিছিয়ে দিয়ে বলে, দুদণ্ড বুসি পড়ো, চাউল ক'টা ফুটিই লিতে কতক্ষণ।

রান্না শেষ করে তেলতাপ্‌ড়ি মাছের ঝাল দিয়ে একথালা ভাত বেড়ে সোন্দরকে পাশে বসে খাওয়াল সুখী। সোন্দর খাচ্ছে আর ঘন মমতার চোখ মেলে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সুখী। মানুষটা কত অল্পে তুষ্ট। যেমন বলবান তেমনি সরল। এক ফোঁটা রাগ নেই শরীরে।

সে রাতে অবাক স্বপ্ন দেখল সোন্দর। কে যেন তার কাছে কাতর অনুনয় করে বলছে, আমি বারচৌকার চড়ায় গামা গাছের ধারে পড়ে আছি, তুই আমাকে উদ্ধার কর বাপ।

সোন্দরের ছ্যাঁৎ করে ঘুম ভেঙে গেল। ভোরের ঝাঁক ঝাঁক পাখি তখন কিসের খবর পেয়ে ঠান্ডা বাতাস চিরে উড়ে যাচ্ছে।

সোন্দর চোখ বুজে স্বপ্নের কথাটা ভাবতে লাগল। অমনি একটা ছবি ফুটে উঠল তার চোখের সামনে। গরাই মালোর সেই জলে ডোবা নৌকোখানা বারচৌকোর চড়ায় বালির ভেতর আধখানা পোঁতা হয়ে আছে। সেদিনের বিপুল ঢেউ আর ঝড়ের বেগ নৌকোখানাকে নিশ্চয়ই এনে ফেলেছে ওই বালির চরে।

সোন্দর এখন সজাগ। সে বেরিয়ে এসে খুঁজছে সুখীকে। এখুনি তাকে চলে যেতে হবে ভাঙনমারির মালোপাড়ায়। লোকজন নিয়ে উদ্ধার করতে হবে গুরাই মালোর নৌকোখানা।

নদীর চর থেকে সুখীকে আসতে দেখা গেল। সোন্দরের তর সইছিল না। সে ছুটল সেদিকে।

সুখী থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগল সোন্দরকে।

সুখী, সুখী, লৌকা ফিরে আসছে।

অবাক প্রশ্ন সুখীর গলায়, লৌকা। কুন্ (কোন) লৌকা?

সউ (সেই) ডুবি যাওয়া লৌকা গো।

সুখী এবার অবিশ্বাসের সুরে বলে, ডুবি যাওয়া লৌকা কূল পাবে কী করি কও?

আমি তো লৌকানু (নৌকো থেকে) পড়ি গেলি জলে, তারপর লৌকা ভাসল কি ডুবল কে জানে। ঝড়ে, ঢেউয়ে তাকে ঠেলি লি (নিয়ে) আসছে বারচৌকার চড়ায়।

অত ভোরে তুমি খবর পাইল কী করি—কে আইল খবর দিতে?

স্বপন দেখছি গো, অব্বখ স্বপন।

সুখী এ নিয়ে বেশি দূর এগোল না। সোন্দরের স্বপ্ন যে সফল হতে পারে তার প্রমাণ সে আগেই পেয়েছে।

অখন (এখন) ভাঙনমারি যাই, লৌকার খবর দিতে হবে।

সুখী বলল, আগর (আগে) দেখো, লৌকা সত্যি সত্যি বারচৌকায় ফিরছে কিনা, তারপরে খবরাখবর করো।

কেনি (কেন), আমার স্বপ্নে তুমার বিশ্বাস নেই?

আছে গো আছে। আমার মনে হইল, তুমি একবার বারচৌকা ঘুরি চলি যাও গেরামে।

সোন্দর একটু চিন্তা করে বলে, ঠিক কইছ (বলেছ), যাবার পথে একবার দেখি যাব।

সুখী সোন্দরকে নিজের গ্রামে যেতে একবারও বাধা দিল না। তার যত কষ্টই হোক, অন্যের ইচ্ছার পথে সে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

একখানা লাল ডুরে গামছায় এক পোঁটলা মুড়ি বেঁধে সোন্দরের কোমরে জড়িয়ে দিয়ে সুখী বলল, অনেক বেলা হবে, মুড়ি চাট্টি বাঁধা রইল।

সোন্দর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে সুখীর দুটো হাত নিজের হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমার এ দেহে প্রাণটা ফিরিই দিছ সুখী, কুনওদিন তুমাকে ভুলবনি।

তুমি ফিরি আইস্‌ব (আসবে) তো?

আইস্‌ব গো আইস্‌ব (আসব)।

সুখী সোন্দরের সঙ্গে অনেকখানি পথ হেঁটে গেল। একটা গাছের তলায় এক সময় দাঁড়াল দু'জনে। সোন্দর বলল এবার ফিরি যাও সুখী। আমি নিজের লৌকা তৈরি করি তুমার তালসারি গ্রামে আইস্‌ব, তখন সোন্দর বলি চিনতে পারব তো?

চিনতে যেদিন পারিনি সেদিন ওই (এই) সুখী তুমাকে ঘরে টানি তুলছে। আবার যেদিন আইস্‌ব (আসবে) সেদিনও তুলবে।

বারচৌকায় ঠিক মিলল সেই নৌকো। ভাঙনমারি পৌঁছোতেই রটে গেল খবর। সোন্দর ফিরে এসেছে। পাঁচ মালোর জীবনের আশাই ছেড়ে দিয়েছিল মালোপাড়ার সকলে। এখন

সোন্দর ফিরতে আনন্দের বান যেমন ডাকল তেমনি আর ক'টি ঘরে ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার রব উঠল। বিকেলবেলা খবর পেয়ে ছুটে এল ভুবন ভক্তা। গুরাই তার কাছ থেকে নৌকো জমা নিয়েছিল। সে নৌকার আশা ছেড়েই দিয়েছিল, কিন্তু সোন্দরের জন্য হারানো নৌকোটা তার ফিরে পেল।

সবাই মিলে পরের দিন গেল বারচৌকোয়। মিস্ত্রি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল ভুবন ভক্তা। ক'দিন ধরে নৌকো সারাই চলল। শেষে খাঁজে খাঁজে তুলো গুঁজে ছেনি, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কোকিন করা হল। এরপর আলকাতরা লেপে একদিন নৌকো ভাসানো হল জলে। ভুবন ভক্তা, সোন্দর আর তিন-চারজন মালোয় মিলে নৌকোটা নিয়ে এল ভাঙনমারিতে।

ভক্তার নজর আছে বলতে হয়। পাঁচ পাঁচশো টাকা পুরস্কার মিলল সোন্দরের।

গ্রাম গ্রামান্তে, হাটে বাজারে রটে গেল সোন্দর দৈবী ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। সে চোখ বুজলে হারানো জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায়।

দল বেঁধে মালোপাড়ায় মানুষ আসতে লাগল। কাতারে কাতারে বাচ্চা থেকে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ সব্বাই। কেবল হারানো জিনিসের খোঁজ পাবে বলে নয়, রোগের উপশমের জন্য দৈব ওষুধ পাবার আশায়। কদিন এমন ভিড় উপচে পড়ল যে সমুদ্রের ধারে সংক্রান্তির মেলা বসেছে বলে মনে হল। আপনি গজিয়ে উঠল খাবারের দোকানপসার।

সোন্দর ভাবে একী হল! একদিনে সে সোন্দর মালো থেকে ঠাকুর বনে গেল। সে তো সত্যি কারু উপকার করতে পারে না, রোগ উপশম তো দূরের কথা। কিন্তু ইতিমধ্যেই অতি ধূর্ত কটা শাগরেদ কোথা থেকে এসে জুটে গেছে। সোন্দর লোকজনদের সত্যি কথাটা বলে দিতে চাইলেও তারা বলতে দেবে না। তারাই সোন্দরের নামে রোগীদের শেকড়বাকড় দিতে লাগল। হারানো জিনিসের খোঁজে ঈশান, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু-কোন কোণে ধাওয়া করতে হবে তা বলে দিতে লাগল। মালোপাড়ার লোকেরাও ধীরে ধীরে কেমন বদলে গেল। তাদের এতকালের পরিচিত সোন্দর এখন অন্য মানুষ। তারা সোন্দরের দিকে তাকাতে লাগল সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে। ঝড়ে জলে নৌকো ভাসাবার আগে মালোপাড়ার মানুষজন এসে দাঁড়াল সোন্দরের কাছে। সোন্দর হাত তুললে তবে নৌকো ভাসবে জলে না হলে যাত্রা নাস্তি।

পাঁচ আনার পুজোয় টাকার পাহাড় জমে উঠল।

রাতে একা বিছানায় শুয়ে সোন্দর কাঁদে। সেই বাঁশের ঝাঁপটানা ঘরের মেঝেতে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকা নেই। ইঁটের মেঝে আর দেয়ালের ওপর টালির ছাউনি। খাটের ওপর ধবধবে বিছানা পাতা। ঘুম আসে না সোন্দরের। মালোপাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে টঙে বসে আড্ডা, ইয়ার্কি নেই। নৌকো চেপে বাহার গাঙে মাছ ধরতে যাওয়া নেই। এ কি জীবন? সে মনে মনে বলে হে, লাইকানি দেবী, হে বাবা মহাকাল, হে মা রক্ষেকালী আমার দোষ লিয়োনি। সকল মানুষের যাতে রোগ-ব্যাধি সারে তার ব্যবস্থা করো হে মা বাবারা—মালোপাড়ার জাগ্রত ঠাকুর দেব্তাগণ।

শ্রাবণের আকাশ ভেঙে ঘন বর্ষা নেমেছে। মাঝ রাতে সোন্দরের চোখ জড়িয়ে ঘুম নামল। আজকাল ঝোরকা দিয়ে কোনও মেয়ের ফোঁপানির আওয়াজ শোনা যায় না। বাঁশের বন্ধ ঝাঁপের ওপারে মাথা কুটে কুটে কেউ ঘরে ঢোকার আর্জি জানায় না। এখন সবাই তাকে ভয় পায়। জাগ্রত দেবতার সামনে কেউ কি কখনও পাপের কথা মনে আনতে পারে।

রাতে বিছানায় শুয়ে মাঝে মাঝে সোন্দরের আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। এক একবার মনে হয় সেই ফোঁপানি, সেই ঘরে ঢোকার জন্য অনুনয়বিনয় বোধকরি এই বন্দি জীবনের চেয়ে ভাল ছিল। পর হয়ে গেছে সে। নিজের মানুষ আর তাকে চিনতে পারে না।

ঘুম ভেঙে গেল সোন্দরের। পেছনের জানালায় মুখ রেখে কে যেন তাকে ডাকছে। চাপা গলায় কোনও মেয়ের ডাক। অমনি বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে জানালার পাশে চলে গেল সোন্দর। অন্ধকারে, বৃষ্টির শব্দে ডাকটা অদ্ভুতভাবে মিশে ছিল।

কে, কে ডাকে?

একটা জলে ভেজা ফিসফিসে আওয়াজ, সোন্দরদা, আমি দুখিয়া।

সেই মুহূর্তে সোন্দরের কী ভাল যে লাগল, দুখিয়া নামটা। কতদিন এমন আপনার করে নাম ধরে কেউ তাকে ডাকেনি। তাছাড়া তালসারি গ্রাম থেকে ফিরে আসার পর এমন কুম্ভীপাকে সে পড়েছে যেখান থেকে দুখিয়া নামটা একেবারেই মুছে গিয়েছিল।

সোন্দর চেঁচিয়ে বলল, ভিতরে আইস, আমি দরজা খুলি দেইঠি (দিচ্ছি)।

দরজা খোলা মাত্রই জলের ছাঁটে অনেকটা মেজে ভিজে গেল। দুখিয়া ঘরে ঢোকামাত্র দরজাটা বন্ধ করে দিল সোন্দর। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। জানালার ফাঁকে ঘরের মধ্যে সে আলো এসে পড়েছিল।

সোন্দর চমকে উঠল। শতচ্ছিন্ন একটা ময়লা কাপড়ে নিজের শরীরখানা ঢেকে রাখবার বৃথা চেষ্টা করেছে দুখিয়া। তার ওপর জলে লেপটে গিয়ে দেহের সঙ্গে কাপড়খানাকে আর পৃথক করা যাচ্ছে না।

সারা শরীলটা ভিজে যাইছে তুমার। আমি কাপড় দেইটি (দিচ্ছি), পরি লও।

সোন্দর ব্যস্ত হয়ে উঠল।

দুখিয়া বলল, থাউক (থাক)। আমি ভিখারিরও অধম। আমাকে নতুন কাপড় মানাইবেনি। খুব তাড়া আছে, অখখুন (এখুনি) আমাকে চলি যাইতে হবে।

সোন্দর এই সৎ আর চাপা স্বভাবের দুঃখী মেয়েটার কথার কোনও জবাব দিতে না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

দুখিয়া এবার কোমরে জড়ানো বটুয়াখানা অতি সন্তর্পণে বের করে আনল। যখের ধনের মতো এতকাল যা সে আগলে রেখেছিল, খিদের জ্বালায়, লজ্জা নিবারণের তাগিদে যার থেকে সে একটি কপর্দকও বের করে আনেনি, তার সবটাই সে তুলে দিল সোন্দরের হাতে।

সেই মুহূর্তে সোন্দরের মনে হল, দুখিয়া ভিখারি নয়, তার কাছে যে ধন আছে তা আব কারু কাছে নেই।

হঠাৎ একটা শব্দ শ্রাবণের প্রবল বর্ষা ঠেলে সোন্দরের কানে এসে বাজল। দুখিয়া দুখিয়া।

প্রচণ্ড ঝড়ে সমুদ্রের আকাশ ছোঁয়া ঢেউ নৌকোটাকে তুলে দিল শূন্যে, পর মুহূর্তে সেটা আছড়ে পড়ল সমুদ্রের অতলে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঢেউ-এর মধ্যে হারিয়ে যাবার আগে লটাইয়ের বুক ফাটা ডাকটা ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকার চরাচরে।

আমি যাই সোন্দরদা।

স্বপ্ন ভেঙে গেল সোন্দরের। সে বলল, কাই (কোথায়) যাব (যাবে) দুখিয়া?

যেদিকে দু'চোখ যায়।

ঘর ছাড়ি। দেশ ছাড়ি যাব (যাবে)?

ভিখারির দেশ নাই সোন্দরদা।

বিদ্যুতের আলো একবার ঝলসে উঠল। দুখিয়ার সারা মুখখানা ঝকঝক করে আবার অন্ধকারে ডুবে গেল। সোন্দরের মনে হল এমন সুবর্ণ সুযোগ আর তার জীবনে আসবে না।

আমিও যাব দুখিয়া। এ কারাগার ভাঙি আজই চলি যাইতে হবে।

তুমি কাই (কোথায়) যাব সোন্দরদা।

টাকার থলিটা দুখিয়ার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সোন্দর বলল, সমুন্দুরের কি শেষ আছে। আর একটা জায়গা ঠিক খুঁজি পাব। দু'জনে মিলি সেঠি (সেখানে) আমরা স্বপনের নৌকাটা তৈরি করব।

দু'মাস ধরে সুখী তার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কাজ করেছে। শামুক আর ঝিনুক দিয়ে তৈরি করেছে একটি অতি সুদৃশ্য ময়ূরপঙ্খী। তার পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক সদাগর।

কাজটা নেবার জন্য অনেকেই তার কাছে আসা যাওয়া করছে, দরও উঠেছে অনেক কিন্তু সুখী তার ময়ূরপঙ্খী কারু হাতে তুলে দেবে না। যেদিন তার আসল সদাগর নৌকো চালিয়ে তার খোঁজে এসে পৌঁছবে, ঠিক সেদিন সে খুশির জোয়ারে ভাসিয়ে দেবে তার ময়ূরপঙ্খী।

●

বানজারা

চারদিকে হইহই পড়ে গেল। তার সঙ্গে মিশে গেল ফোঁপানো কান্নার একটা আওয়াজ। আন্নামালাই জঙ্গলের সবুজ টিলাগুলোর ওপর আছড়ে পড়ছিল সেই শব্দগুলো।

কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু থেকে বহু তীর্থযাত্রী বনের পথ ধরে শ্রীশৈলম মন্দিরে প্রভু মল্লিকার্জুনকে দর্শনের জন্য আসে। চৈত্র শুদ্ধ পূর্ণিমাতে শ্রীশৈলম মন্দিরে কুম্ভোৎসভম্ চলছিল। প্রতিদিন ঢেউয়ের মতো মন্দিরপ্রাঙ্গণে আছড়ে পড়ছিল তীর্থযাত্রীরা। অরণ্যে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল আদিবাসী চেঞ্চুরা। তারা ডুলিতে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। এ-উৎসব প্রধানত চেঞ্চু সম্প্রদায়ের উৎসব।

কয়েক শতাব্দী আগে ওই অঞ্চলের রাজারা বনের ভেতর পাথর-বাঁধানো কয়েকটা পথ তৈরি করে দিয়েছিল।

এলাহাবাদ থেকে প্রবাসী দুটি বাঙালি পরিবার দু'খানা জিপে করে এসেছিল শ্রীশৈলমের উৎসব দেখার জন্য। ফেরার পথে তারা আন্নামালাই জঙ্গলের ভেতর থেকে বয়ে আসা একটা ছোট্ট পাহাড়ি নদীর ধারে পিকনিকে মেতে উঠেছিল। বড়রা গল্পগুজব আর রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, আর ছোটর দল মত্ত ছিল খেলায়। পিকনিকের ভেতর চলেছিল তাদেরও পিকনিক। অবশ্য মাটি, ঢেলা, বুনো ফল-পাতা দিয়ে।

কোনও কোনও বাচ্চা পাতা-পত্র সংগ্রহের জন্যে বনের ভেতর ঢুকেছিল। তাদেরই সঙ্গে ছিল চার বছরের ছোট্ট মেয়ে ঝুম্‌কি।

একটা পাখির ডাক শুনে সে তার বড় বড় দুটি চোখ মেলে তাকাল।

হলুদবরণ পাখিটা পাখায় ঝিলিক তুলে এ-গাছ ও-গাছ করছিল। মাঝে মাঝে সুরেলা ডাক।

ঝুম্‌কি তখন সব ভুলে গেছে। সে এগিয়ে চলেছে পাখির সঙ্গে সঙ্গে বনের গভীরে। এদিকে বন্ধুরা যে কখন তাকে একা ফেলে চলে গেছে, সে খেয়ালই তার নেই।

রান্না শেষ হলে বাচ্চাদের ডাক পড়ল খাওয়ার।

খাওয়ার নামে ছোটরা সব দল বেঁধে ছুটে এল। শালপাতায় খাবার দেওয়া হয়েছে, তারা সব সারি বেঁধে বসে গেল।

কিন্তু ঝুম্‌কি! ঝুম্‌কি কই?

শর্মিলা দেবী মেয়েকে দেখতে না পেয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন।

ঝুম্‌কি কোথা গেল রে?

বাচ্চারা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু সঠিক কোনও উত্তর দিতে পারল না।

এবার ঝুম্‌কি ঝুম্‌কি বলে চিৎকার করে ডাক দিতে লাগলেন তার মা। চঞ্চল হয়ে উঠল সকলে। মুহূর্তে বড়রা এদিকে ওদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলে। বনের ধার, নদীর তীর, সবদিকেই ঘুরতে লাগল এক ঝাঁক চোখের দৃষ্টি।

কিন্তু দৃষ্টির সীমানায় ঝুম্‌কির চিহ্নমাত্র নেই। ততক্ষণে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছেন শর্মিলা দেবী।

একমাত্র সন্তান তাঁর। প্রতিবেশীদের সঙ্গে মহা উৎসাহে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। শেষমুহূর্তে জরুরি কাজে আটকে পড়ে তাঁর স্বামী সঙ্গে আসতে পারেননি।

প্রথমে শর্মিলা দেবী দোটানার মধ্যে ছিলেন কিন্তু একরকম জোর করেই তাঁর স্বামী তাঁর বন্ধুদের দলের সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

ভয়ে, দুর্ভাবনায় কাঁপতে শুরু করলেন শর্মিলা দেবী। নদীর তীর ধরে অনেকেই ছুটে গেলেন, মেয়েটা যদি স্রোতের টানে ভেসে গিয়ে থাকে।

পাথরে, নুড়িতে শুধু খল্‌খল্‌ আওয়াজ। অনেক দূর থেকে ওরা বিষণ্ণ মুখ নিয়ে আবার ফিরে এল পিকনিকস্পটে।

বাইরে থেকে জঙ্গলের ভেতরে যতদূর চোখ যায় ততদূর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ঝুম্‌কিকে পাওয়া গেল না।

সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত তারা খোঁজার কাজ চালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এরপর আর অপেক্ষা করা যায় না। অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে রাতের আশ্রয়ে পৌঁছোতে হবে।

কারও মুখে সান্ত্বনার কোনও ভাষা ছিল না। তারা প্রায় মূর্ছাহত শর্মিলা দেবীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এগোতে লাগল। স্থানীয় কোনও পুলিশ স্টেশনে যত দ্রুত সম্ভব ইনফর্ম করতে হবে।

প্রায় বিশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ওরা একটা পুলিশ চৌকিতে পৌঁছেছিল। সেখানে ইনফর্ম করে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে আস্তানা গেড়েছিল একটা পথের ধারের ধাবায়।

সাতদিন বহু কষ্ট সহ্য করে, বহু তদ্বির-তদারক করেও ঝুম্‌কির কোনওরকম হদিশ পাওয়া গেল না।

পুলিশ বলল, চিতা গভীর জঙ্গলে নিঃশব্দে টেনে নিয়ে গেছে।

অগত্যা পাষাণ-ভার বুকে চাপিয়ে নিয়ে সমস্ত দলটা ফিরে চলল বাড়ির পথে। মধ্যপ্রদেশের কতকগুলো দর্শনীয় স্থান দেখার কথা ছিল, বাতিল হল সেসব পরিকল্পনা।

সারা পথ শর্মিলা দেবীর চোখে জল ছিল না, মুখে কথা ছিল না। মাঝে মাঝে শুধু বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছিল দীর্ঘশ্বাস। তিনি এলিয়ে পড়েছিলেন মূর্ছাহতের মতো।

এদিকে বনের ভেতর পাখি খুঁজতে খুঁজেতে ঝুম্‌কি এসে পড়ল একটা ফাঁকা জায়গায়। সামনে গাছপালায় ঢাকা সবুজ একটা টিলা। তাকে বেড় দিয়ে বয়ে আসছে জলধারা। সম্ভবত এই জলস্রোতই বনের বাইরে ছোট্ট নদীর আকার নিয়ে বয়ে গেছে।

টুংটুং টুংটুং শব্দ শুনে ডানদিকে ফিরে তাকাল ঝুম্‌কি।

ওদিকের বন চিরে একটা পথ ফাঁকা জায়গাটিতে এসে মিশেছে।

সেই পথে প্রথম দেখা গেল একটা সাদা বলদকে। তার পাশে পাগড়ি- পরা একটি লোক। তাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল ঝুম্‌কি।

বলদটার পিঠে নানা রঙের রেশমি সুতোর তৈরি আস্তরণ। গলায় ওই সুতোরই তৈরি দড়িতে গাঁথা একসার বাজনদার ঘণ্টা। তার থেকেই বেরিয়ে আসছিল টুংটুং আওয়াজ।

লোকটা পরেছে ডবল পাক দেওয়া দেহাতি ধোতি। গায়ে চাপিয়েছে লম্বা ফুলহাতা জামা, বারকাসি। বুকের দিকটা ঢেকেছে বোতামের বদলে বারোটা ফিতের বাঁধন দিয়ে। কাঁধের ওপর পড়ে আছে হলুদ রঙের সেলা বা দোপাট্টা। মাথায় পেটমোটা হাঁড়ির আকারে লাল পাগড়ি। তার গায়ে রুপোলি সুতোর টান।

কানে পরেছে রুপোর রিং, বালি। কোমরে ঝক্‌ঝক্‌ করছে রুপোর কোমরবন্ধনী।

লোকটি প্রৌঢ়। লম্বা দোহারা চেহারা। চোখা নাক-মুখ। রং ফরসা না হলেও বেশ উজ্জ্বল। কাঁচা-পাকা একজোড়া চোমরানো গোঁফ। ডান হাতে ধরা একটি বর্শা কাঁধে ঠেকিয়ে চলেছে, সাজানো 'নন্দী বইল'টির পাশে পাশে।

ঝুম্‌কি ভয়-ডর জানে না। সে ভারী মিশুকে। তার আপন-পর বাছবিচার নেই। যে ডাকে তার কাছেই চলে যায়। একটুতেই কোমরের দু'দিকে হাত ঠেকিয়ে আধবসার ভঙ্গিতে খিলখিল করে হেসে ওঠে। ঠাকুরমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'মরে যাই'।

এ-হেন ঝুম্‌কি ওই চোমরানো গোঁফওয়ালা মানুষটাকে দেখে পাশেই একটা মোটা গাছের আড়ালে সরে দাঁড়াল।

বেরিয়ে এল বনের পথে একপাল বলদ। পিঠের দু'দিকে ঝুলছে বস্তাবন্দি বোঝা। তাদের পাশে পাশে চলেছে আগের মতো সাজপোশাক পরা লোকজন, প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে বর্শা।

এরপর বেরিয়ে এল পঁচিশ তিরিশটা গাইগোরু। দু'পাশে ছেলের পাল সিধে রাখছে লাইন।

সবার পেছনে বাচ্চাকাচ্চা সমেত একদল মেয়ে। যেন সেজেগুজে মেলায় চলেছে। পরনে উজ্জ্বল, নানা রঙের ঘাগরা। ছোট ছোট গোল আয়না আর রঙিন সুতোয় নকশার কাজ পোশাকে। দোপাট্টার একপ্রান্ত ঘাগরার সঙ্গে বাঁধা। অন্য প্রান্ত পিঠের দিকে ঘুরে মাথার ওপর ঘোমটা তৈরি করেছে। অবশ্য ওটা আধখানা ঘোমটার আকার নিয়েছে।

কানে ঝুম্‌কো। নাকে সোনার নথ। টাকার তৈরি হাঁসুলি পরেছে গলায়। কনুইতে বাজুর মতো বাঁধা রয়েছে কোপ্‌রা। কারও হাতে রুপোর কোপ্‌রা বা চুড়ি। কারও হাতে বা হাতির দাঁতের তৈরি ছাল্লা বা আংটি। পায়ে রুপোর তোড়িয়া। চলার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠছে রুম্‌ঝুম্‌ শব্দে।

আবাক হয়ে ওদের গাছের আড়াল থেকে দেখতে লাগল ঝুম্‌কি।

এবার পুরো দলটা পার হতে লাগল নুড়ি ছড়ানো ঝরনার ওপর দিয়ে। কৌতূহলী ঝুম্‌কি এখন বেরিয়ে এসেছে গাছের আড়াল থেকে। সে এত বড় একটা জেল্লাদার দলের জল ঠেলে পার হওয়া দেখবে।

ঠিক চোখে পড়ে গেল পান্নাবাইয়ের। পঁয়ত্রিশ বছরের পান্নাবাই দলের নায়েক বা প্রধানের বউ। যে মানুষটা প্রথম 'নন্দী বইল'-এর সঙ্গে বন চিরে বেরিয়ে এসেছিল, সে-ই দলপতি হরদয়াল। পান্নাবাই আর হরদয়ালের কোনও ছেলেপুলে ছিল না।

ঝুম্‌কির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল পান্নাবাই। চোখে তার বিস্ময়! মুখে খুশির ঝিলিক।

খোকি, বনের ভেতর কী করছ একা একা?

মেয়েটির রঙিন ঘাগরা, সাজপোশাক আর মুখের হাসি দেখে ঝুম্‌কির মনে হল, একে ভয় পাবার কিছু নেই। পান্নাবাইয়ের মুখের হাসি দেখে সেও চোখে-মুখে খুশির ঢেউ তুলল,

বান্‌জারার দলটি ঝুমকিকে পেয়ে মহাখুশি। পান্নাবাই তো তাকে বুক থেকে নামাতেই চায় না। মেয়েটিকে যত দেখে তত তার চোখে জল আসে। তার বঞ্চিত বুকটা যেন জুড়িয়ে যায়।

অনেক খুঁজল ওরা। বন চিরে বেশ কয়েকজন এদিক-ওদিক তাকাল কিন্তু কারও হদিস পাওয়া গেল না। তবে মেয়েটা এই বনের ভেতর এল কী করে?

শেষে একে জঙ্গলের দেবী বন্‌জারির দান বলে ওরা বুকে তুলে নিয়ে, পুরো দল বা টান্ডা চালিয়ে নিয়ে চলে গেল।

ওরা বান্‌জারা বা বনবাসী। আসলে বনের পথ দিয়ে গেলেও ওরা চেঞ্চুদের মতো বনে ঘর বেঁধে থাকে না। বান্‌জারা যাযাবর গোষ্ঠীর লোক। পোড়ো জায়গা, গাছতলা কিংবা বনের ভেতর ওরা সাময়িক আস্তানা গেড়ে থাকে। আধা শহরের প্রান্তে, নদীর ধারেও ওদের ডেরা ফেলে থাকতে দেখা যায়।

বান্‌জারা সাধারণত পুকুর, নদী কিংবা অগভীর কুয়োর জল পান করতে চায় না। নদীর ধারে বালিতে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট গর্ত খোঁড়ে। ওখানে যে জল চুইয়ে জমা হয় সেই জলই ওরা পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে। কখনও বা গভীর কুয়ো থেকে জল তুলে সেটা কাজে লাগায়। কত দল, উপদলে ভাগ হয়ে আছে এই বান্‌জারা সম্প্রদায়।

মথুরিয়া বান্‌জারার দল ওদের ভেতর উঁচু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়।

তারা নিরামিষ খায়। ওদেরও আবার চারটি শ্রেণী আছে। এমনকি পথচারী হয়েও ওরা যথাসময়ে ব্রাহ্মণের মতো গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে।

গোর বান্‌জারারা রাজপুত, ক্ষত্রিয়, ওদেরকে চারণ-বান্‌জারাও বলে। তুনওয়ার, বাদতিয়া, ভুকিয়া এরা সব এই দলের লোক।

বোধহয় এই দুনিয়ায় অপরিচিত বলে কেউ নেই ঝুম্‌কির কাছে। যেখানে ভালবাসা সেখানেই ঝুম্‌কির খুশি ঝলকে ওঠে।

সে এখন হরদয়ালের বউ পান্নাবাইয়ের বুকে চেপে চলেছে।

বনের ভেতর টিলার ধারে চেঞ্চুদের একটা গ্রামে এসে ওরা পৌঁছাল। ছোট ছোট বাঁশ আর পাতা দিয়ে তৈরি ঘর এদিক-ওদিকে ছড়ানো।

সন্ধ্যা নামে। গাছের ডালে সন্ধ্যার পাখিরা কলরবে মেতে উঠেছে। বান্‌জারার দল একটু ফাঁকা জায়গা দেখে রাতের আস্তানা গাড়ল।

কাঠকুটো জ্বেলে ওরা রান্নার আয়োজন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু চেঞ্চুদের কয়েকজন মুরুব্বি ছুটে এসে বলল, তোমরা আমাদের গ্রামে এসেছ, আমাদের একটু সুযোগ দাও তোমাদের সেবা করবার।

অনেক ক্ষেত্রে এটাই রীতি, বান্‌জারারা চেঞ্চুদের কাছে সমাদর পায়।

পাখির মাংস বানিয়ে, রুটি, সব্‌জি ইত্যাদি তৈরি করে ওরা খাইয়ে দিল বান্‌জারাদের।

দলের ছেলেমেয়েরা মহাখুশি। নতুন একটা বাচ্চা তাদের দলে এসেছে। ইতিমধ্যেই তাকে ঘিরে নাচ গান শুরু করে দিয়েছে সবাই।

খাবার পরে বিশ্রামের আগে বান্‌জারাদের নায়েক তার তিনজন শাগরেদ—কারবারি, নভি আর ভাটকে সঙ্গে নিয়ে দু'-চারটে যুবক ছেলের কাঁধে ঘিয়ের কলসি, ছানার তাল চাপিয়ে দিয়ে চেঞ্চুদের মুখিয়ার ডেরায় গেল।

চেঞ্চুরা সাধারণত গোরু পোষে না। তারা এই সব উপহার পেয়ে মহাখুশি।

ফিরে আসার সময় চেঞ্চুরা নায়েকের হাতে মধুভরতি একটা বড় ভাঁড় ধরিয়ে দিল। বন-পাহাড়ে যত বড় বড় মৌচাক হয়, তার থেকে মধু সংগ্রহ করে চেঞ্চু সম্প্রদায়। মধু পেয়ে বান্‌জারাদের নায়েক কৃতজ্ঞতায় মাথা নাড়তে লাগল।

রাতে ঘুমে ঢলে পড়ার আগে বানজারাদের ছেলেমেয়েগুলো কিন্তু নায়েকের মুখ থেকে পুরনো দিনের যে কোনও একটা কাহিনী শুনবেই শুনবে।

নায়েক হরদয়ালও গল্প জমিয়ে বলতে ওস্তাদ।

সবুজ ঘাসে ভরা আস্তানার চারদিকে জঙ্গলের বড় বড় গাছ শাখাবাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বান ডেকেছে চাঁদের আলোর। গোরুর পাল শুয়ে আছে একদিকে। দু'-একটা কাপড়ের তাঁবুর ভেতর বিশ্রামের জন্য ঢুকে পড়েছে মেয়েরা।

গল্প-পাগল ছেলেমেয়েরা ঘিরে বসেছে হরদয়ালকে।

ভাটুরি বলল, নায়েক, চেঞ্চুরা আমাদের অত খাতির করল কেন?

হরদয়াল বলল, তার কারণ আছে বই কী।

ঘুঙ্‌রি বলল, চাচাজি, আমরা তো আরও বহুত জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু এমন করে কেউ আমাদের আগে খাতির করেনি।

হরদয়াল আবার বলল, এর কারণ আছে।

কী কারণ?

তা হলে আসল কাহিনীটা শোন :

চেঞ্চুরা মনে করে, বান্‌জারাদের সঙ্গে তাদের এককালে রক্তের যোগ ছিল।

দুমকা বলল, কী রকম?

হরদয়াল বলল, আজ ভোজের আসরে গিয়ে দেখেছিস, দূরে সারি দিয়ে কত কুকুর বসে আছে

লম্বু বলল, হাঁ, ওরা কিন্তু ডাকহাঁক কিছু করছিল না।

না, চেঞ্চুদের প্রত্যেকের ঘরে অনেক আদরে কুকুর পোষে। কেন জানিস?

গল্প শোনার আগ্রহে হরদয়ালের দিকে মুখিয়ে বসে রইল ছেলেমেয়েরা।

বহুকাল আগে আমাদেরই মতো এক বান্‌জারা স্বামী-স্ত্রী ঘুরে বেড়াত। তাদের দিনরাত্রি কাটত বনে বনে। কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না তাদের। সঙ্গে থাকত একটা কুকুরী। তারও কোনও বাচ্চা হয়নি।

মনমরা হয়ে ঘুরত এই বান্‌জারা দম্পতি।

একদিন ওরা ঘুরতে ঘুরতে একটা নতুন বনে ঢুকে পড়ল। সেখানে একটা টিলার তলায় ওদের চোখে পড়ল একটা গুহা। এই গুহার সামনে সন্ধ্যায় ধুনি জ্বলতে দেখে ওরা পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল।

সে সময় দারুণ শীত পড়েছিল। অল্প দূর থেকে ওরা ধুনির আলোয় দেখতে পেল, এক সন্ন্যাসী ঠাকুর বসে রয়েছেন।

বানজারা স্বামী-স্ত্রী তার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম জানাল ভক্তিভরে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর চোখ মেলে তাকালেন। মেয়েটিকে দেখে তাঁর বিশেষ ভক্তিমতী বলে মনে হল।

ইতিমধ্যে বান্‌জারার বউ তার ঝুড়ি থেকে কয়েকটা ফল বের করে সাধুবাবার কাছে রেখে দিয়ে হাত জোড় করে বলল, বাবা আমরা বড় গরিব, এই সামান্য ফল আপনি সেবা করুন।

আরও মুগ্ধ হলেন সন্ন্যাসী ঠাকুর।

একসময় ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা ভবঘুরে, বন-পাহাড় আকাশ-বাতাস তোদের সঙ্গী। তোদের বুক-ভরা আনন্দ কিন্তু তোদের চোখেমুখে একটা দুঃখের ছায়া দেখছি কেন?

জল গড়িয়ে পড়ল বান্‌জারা বউয়ের চোখ দিয়ে।

সে কাতর গলায় বলল, বাবা, অনেকদিন বিয়ে হয়েছে আমাদের, কিন্তু এখনও আমরা কোনও ছেলেমেয়ের মুখ দেখতে পাইনি। তাই আমাদের দু'জনের কারও মনেই কোনও শান্তি বা আনন্দ নেই।

বড় কষ্টে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল মেয়েটি।

সাধু কতক্ষণ চুপ করে ধ্যানে বসে রইলেন। একসময় চোখ মেলে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই তো বেশ আছিস, আবার দুঃখকে ডেকে আনা কেন।

ওরা কিছু না বুঝতে পেরে সাধুবাবার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

সাধু আবার বললেন, আমার কথাটা বুঝতে পারলি না? তবে মন দিয়ে শোন।

তোরা তো দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিস, ছেলেমেয়ে হল একটা বন্ধন। সংসারে যত জড়াবি, সুখ-আনন্দ তোদের কাছ থেকে ততদূরে সরে সরে যাবে।

বান্‌জারা-পুরুষটি বলল, আমাদের সম্বলের মধ্যে এই কুক্কুরী আর একটা গাইগোরু আছে। আমরা চোখ বুজলে এদের দেখবে কে বাবা! প্রাণ থাকতে কারও হাতে তো এদের তুলে দিয়ে যেতে পারব না।

সাধু এবার সোজাসুজি বললেন, তোদের ছেলেমেয়ে হতে পারে, কিন্তু তাদের জন্মের পর তোদের দু'জনের ভয়ংকর বিপদ ঘটবে।

কী বিপদ বাবা?

ছেলেমেয়েদের মুখ দেখার পর অল্পদিনের ভেতরই তোদের এই দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হবে। আজ রাতে বিশ্রাম কর, কাল ভোরে এসে জানাবি, তোরা কী চাস।

গল্প বলতে বলতে চুপ করে গেল নায়েক।

ভাটুরি অমনি বলল, রাতে ওরা কী ঠিক করল বুয়াজি?

নায়েক হেসে বলল, তোরাই বল।

রেতি বলল, ওরা নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মরার কথা শুনলে কেউ আর ছেলেমেয়ে চায়! এ তো আর যার তার কথা নয়, সন্ন্যাসীবাবার কথা।

হরদয়াল বলল, ঠিক এর উলটোটি চাইল ওরা দু'জন। সারারাত ওদের ঘুম হয়নি। বসে বসে ভেবেছে আর দুজনে আলোচনা করেছে। শেষে ওরা ঠিক করে ফেলল, মরে যাই যাব কিন্তু এ দুনিয়ায় আমাদের একটা চিহ্ন রেখে যাব। একদিন তো আমাদের মরতেই হবে। হয় আগে, নয় পরে।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে সেই কথাটি বলার পর, তিনি ধুনির আগুন থেকে তুলে আনলেন পোড়া দু'-টুকরো নারকেল। সেই নারকেল মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, টিলার ওপাশে জলের কুণ্ড আছে, সেখান থেকে জল তুলে নিয়ে শুদ্ধ মনে এই দু'-টুকরো নারকেল না চিবিয়ে গিলে খেয়ে নাও।

মোরী নামে মেয়েটার ধৈর্য ধরছিল না, সে বলল, তারপর!

তারপর আর কী। গিলে খেয়ে ফেলল।

এবার ছেলেমেয়েরা সকলেই উত্তেজিত। বলল, তারপর?

ওই বান্‌জারা-বউটির যমজ মেয়ে জন্মাল। মেয়ে দুটির মুখ দেখে তার বাবা-মা ভারী খুশি। তারা নিজেদের পরিণতির কথা একেবারে ভুলে গেল। কিন্তু সাধুবাবার কথা মিথ্যে হওয়ার নয়। মেয়েদের জন্মের পর ছ'মাসও কাটল না। এক দুর্যোগের রাতে বান্‌জারা স্বামী-স্ত্রী যখন তাদের বাইরের কাজ শেষ করে নিজেদের ডেরায় ফিরছিল তখন অন্ধকার চিরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর গর্জন করে একটা বাজ পড়ল গাছের ওপর। হতভাগ্য স্বামী-স্ত্রী সে-সময় গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারা দু'জনেই বিদ্যুতের ছোবলে ঝলসে গেল।

ঘুঙ্‌রি মন্তব্য করল, সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা ফলে গেল আশ্চর্যভাবে।

রেতি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করল, বাচ্চা দুটোর তাহলে কি হল মাউসাজি?

ওরা তখন একটা গুহার ভেতর ঘুমোচ্ছিল। বাজ পড়তে হঠাৎ কেঁদে উঠে আবার দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল।

গাইগোরুটা ডেকে উঠেছিল। কুকুরটা কিন্তু ডাকেনি। তার সজাগ দৃষ্টি ছিল ঘুমিয়ে থাকা দুটো মেয়ের ওপর।

কয়েকদিনের ভেতরেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। গাইগোরুটার একটা বাছুর হল। কুক্কুরীটাও দুটো বাচ্চার জন্ম দিল।

কুক্কুরী মায়ের যত্নে, আর গাইগোরুটার দুধ খেয়ে বেড়ে উঠতে লাগল সেই যমজ দুটি বোন।

কয়েক বছর পরে অপূর্ব সুন্দরী দুটি কন্যা বেড়াতে লাগল বন আলো করে। তারা কুক্কুরীটিকে মায়ের মতো ভক্তি করত আর তাদের মা বলেই জানত।

একদিন জঙ্গলের একটি জামগাছের তলা থেকে জাম কুড়োচ্ছিল যমজ বনের ছোটটি। বড়টি একটু দূরে একটা ছোট নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আপন মনে গান করছিল।

হঠাৎ নদীর ওপার থেকে একটা শিকারি যুবক তাকে দেখতে পেয়ে নদী পেরিয়ে এপারে চলে এল।

সে সরাসরি মেয়েটির কাছে এসে বলল, তুমি এমন নির্জন বনে কী করছ? এত সুন্দর গানই বা তুমি শিখলে কোত্থেকে? কোন ভাগ্যবান বাবা-মায়ের কন্যা তুমি?

যমজের বড় বোনটি বলল, আমরা দু'বোন এই বনে থাকি। আমাদের কুক্কুরী মা অনেক যত্নে আমাদের প্রতিপালন করেছে।

শিকারি যুবকটি হো হো করে হেসে উঠে বলল, কুক্কুরী আবার মা হয় নাকি?

ছেলেটি যত হাসে মেয়েটি তত জোর দিয়ে বলে, হাঁ, কুক্কুরী আমার মা।

যুবক তখন সোজাসুজি তার কাছে বিয়ের কথা পাড়ল।

মেয়েটি বলল, আমি তোমার কথা আমার বোনের কাছে বলব।

শিকারি যুবক, তার মেজাজই অন্যরকম। সে মেয়েটির হাত ধরে বলল, আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে। চলো, আমি তোমাকে নদী পার করে নিয়ে যাই। একটুও সময় নেই আমার হাতে।

মেয়েটি কিন্তু অপরিচিত যুবকের সঙ্গে যেতে চাইছিল না। সে চেঁচিয়ে তার বোনকে ডাকতে লাগল।

শিকারির গায়ের শক্তি দারুণ। সে মেয়েটিকে দু'-হাতে তুলে নিয়ে নদীর পার হয়ে চলে গেল।

সারা পথ মেয়েটি কাঁদল, হাত-পা ছুড়ল। তার গয়নাগাঁটির সবকটাই একে একে পথে ছড়িয়ে দিল।

একসময় ছোট বোনটি দিদির নাম ধরে ডাক দিতে দিতে নদীর তীর ধরে এগোতে লাগল। সে এক জায়গায় এসে দেখল, নদীর ওপারে তার দিদির হলুদ রঙের দোপাট্টাটা পড়ে আছে। সে তক্ষুণি নদী পেরিয়ে ওপারে উঠল। তারপর দোপাট্টা কুড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলল।

পথে দেখতে পেল দিদির খসে পড়া গয়নাগাঁটির নানা চিহ্ন।

সেই চিহ্ন ধরে অনেক পথ পেরিয়ে একসময় সে পৌঁছে গেল লোকালয়ে, দিদির বাড়ির সামনে। সেখানে দেখা হয়ে গেল তার দিদির সঙ্গে।

বোনকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে দিদির আনন্দ আর ধরে না। ইতিমধ্যে সে শিকারিকে শাদি করবে বলে কথা দিয়ে ফেলেছে।

দু'বোনে বেশ কয়েক দিন কাটাল শিকারি যুবকের বাড়িতে।

শিকারি তার পাশের গ্রামে এক যুবকের সঙ্গে ছোট বোনটার বিয়ে দিয়ে দিল।

হরদয়াল অনেকক্ষণ একটানা কথা বলার পর এবার একটু থামল।

মোরী তাকে থামতে দিল না। সে উদগ্রীব হয়ে বলল, ওদের কুক্কুরী মায়ের কী হল বুয়াজি?

সেই কুক্কুরী তো চতুর্দিকে তার দুটো মেয়েকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

অবশেষে মাটিতে পায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কুক্কুরী নদী পার হয়ে একদিন এসে পৌঁছোল বড় মেয়ের বাড়িতে।

মাকে দেখে তার গলা জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না মেয়ের। কুক্কুরীর দু'চোখ বেয়েও জল গড়িয়ে পড়ছিল।

দু'-চারদিন বড় মেয়ের আদর-যত্নে রইল কুক্কুরী-মা।

সে শুনল, তার ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে পাশের গাঁয়ে।

এক সকালে কাউকে কিছু না বলে সে চলে গেল ছোট মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

সে পথ চিনে একসময় ঠিক পৌঁছে গেল ছোট মেয়ের বাড়ির দোরগোড়ায়।

মেয়ে কিন্তু তাকে চিনতে পারল না। একটা পথের কুকুর ভেবে দূর দূর করে তাকে তাড়াতে গেল। সে কিন্তু কেঁউ কেঁউ করে তার মেয়েকে কত আদরের কথা বলতে লাগল। দোর থেকে একদম সরল না।

শেষে রেগে গিয়ে একটা চেলাকাঠ তুলে তাকে বেধড়ক মারতে লাগল মেয়ে।

কুক্কুরী-মা কাঁদে আর মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। শেষে কোনওরকমে ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে টানতে টানতে বড় মেয়ের বাড়ির কাছে এসে পড়ে গেল। সেখানেই বেরিয়ে গেল হতভাগ্য কুক্কুরী-মায়ের প্রাণটা।

বড় মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার মায়ের এই অবস্থা দেখে কেঁদে আছড়ে পড়ল তার ওপর। সে বহুদূর থেকে তার মায়ের কাতর একটা ডাক শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু হায়! কাছে এসে দেখল, সব শেষ।

পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, এ তার ছোট বোনেরই কীর্তি।

ছোট বোন যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল তখন তার আক্ষেপের শেষ রইল না। সে কপালে হাত চাপড়ে কাঁদতে লাগল, আর মুখে বলতে লাগল, হায়! হায়! আমি আমার মাকে চিনতে পারলাম না!

বড় মেয়ে তার মাকে বাড়ির ছাদের ওপর একটা বাক্সবন্দি করে রেখেছিল। ছোট বোনের আকুতিতে মাকে দেখবার জন্য দু'বোন ছাদে উঠল।

আশ্চর্য! ক'দিনের পচা মরা দেহটা থেকে কোনওরকম গন্ধ বেরিয়ে আসছিল না।

বড় মেয়ে কাঠের বাক্সের ডালাটা খুলে ফেলল। দু'জনে অবাক হয়ে দেখল, কুক্কুরী মায়ের দেহটা সেখানে নেই, তার বদলে রয়েছে একতাল সোনা।

মরে গিয়েও তার মা জানিয়ে দিল, তার ভালবাসা ছিল খাঁটি সোনার মতো।

দুম্‌কা বলল, সেজন্যই কি চেঞ্চুরা কুকুরের এমন ভক্ত?

হরদয়াল বলল, চেঞ্চুরা মনে করে, তারা ওই বান্‌জারা মেয়ে-পুরুষের বংশধর আর ওই কুক্কুরী তাদের আদি মাতাপিতার বংশকে রক্ষা করেছিল।

রেতি মন্তব্য করল, তাই বুঝি চেঞ্চুরা আমাদের এত খাতির করে। কুকুরদের এত ভালবাসে।

ঠিক তাই।

দুই

পরের দিন ডেরা তুলে নিয়ে আবার যাত্রা।

গত রাতে স্বপ্ন দেখেছে পান্নাবাই। ঝুম্‌কি তার হাত ধরে টানতে টানতে বনের বাইরে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেছে। সেখানে ঘাসের জমিনের ওপর লুটিয়ে পড়ছিল চাঁদের আলো। কখন এক পশলা বর্ষা হয়ে গেছে, মুক্তোর দানার মতো বর্ষার বিন্দুগুলো চাঁদের আলোয় ঝলমল করছিল।

হঠাৎ পরির মতো ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল ঝুম্‌কি। গলায় মিহি মিঠে একটা আওয়াজ

বাজছে। একসময় সে সাদা ডানা মেলে শূন্যে উড়তে লাগল। চাঁদের দিকে যেতে যেতে হাত নেড়ে সে বিদায় জানাল পান্নাবাইকে।

স্বপ্নের ভেতর কান্নায় তখন ভেঙে পড়েছে পান্নাবাই। সে উঠে বসে অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল। এই তো তার বুকের সোনা, হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাঁবুর একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে চাঁদের একটুকরো আলো এসে ঘুমন্ত ঝুম্‌কির কপালে টিপ পরিয়ে দিয়েছে।

আজ ঝুম্‌কিকে বুকে চেপে ধরেই পথ চলছিল পান্নাবাই।

ওরা কখনও বন চিরে, কখনও বা লোকালয়ের ভেতর দিয়ে, আবার কখনও বা নদীতীর ধরে উত্তরমুখো চলছিল।

এবার তাদের যাত্রা মধ্যপ্রদেশের দিকে। নর্মদা নদীতে স্নান করে খাজুরাহোতে যাবে মহাদেবের চরণে বেলপাতা নিবেদন করতে।

রায়পুর ছুঁয়ে ওরা চলে গেল জব্বলপুরের দিকে। ঘি আর ছানার ব্যবসা বেশ জমল।

শহরের একটু দূরে মেলা বসেছিল। সেই মেলায় ওরা ঘুরে বেড়াল।

সুখলাল ভারী করিতকর্মা লোক। সে নায়েককে এসে খবর দিল, মেলার কর্তাকে ধরে একটা নাচগানের আসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দিনেরবেলা মেলার কর্তৃপক্ষ ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছে, রাতে বান্‌জারাদের নাচগান হবে।

বান্‌জারাদের কিশোর-কিশোরী ছেলেমেয়েরা হোলির গান গাইতে গাইতে কী দারুণ নাচ নাচল। ঘাগরা দুলিয়ে, দোপাট্টা উড়িয়ে মেয়েদের চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে সে কী নাচ! কখনও দু'দলে আলাদা হয়ে, কখনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আগুপিছু নাচছে। সাদা পোশাক আর হলুদ পাগড়িতে দারুণ লাগছে ছেলেদের।

কিশোররা কিশোরীদের কাছে আসার জন্য নাচের ভঙ্গিতে ডাকছে।

কিশোরীরা আধখানা মুখ ফিরিয়ে নাচতে নাচতে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

গানের মিঠে সুরে উতল হয়ে উঠেছে হোলির আকাশ।

কেউ যেন সবাইকে ডাকছে বাতাসে হোলির রঙিন আবির ওড়াবার জন্য।

> 'আওরে দেসানি, হোলির খেলা
> বার মিনাম আইর হোলি হোলি
> খেলোর জোকেতি।'

আবার গান আবার নাচ। দোপাট্টা উড়িয়ে নতুন ভঙ্গিতে নাচছে ছেলেমেয়েরা। মাঝে মাঝে বাতাসে উড়িয়ে চলেছে গাঢ় গোলাপি রঙের ফাগ। দর্শকরা একেবারে মাতোয়ারা।

গান হচ্ছে :

> 'মহুর পাদেপ বল রিচ হোলি,
> অনসূয়া করমেলি ক্ষীর পোলি,
> দত্তারো বল রামরো হোলি,
> পন্ধারপুরম বল রিচ হোলি।'

মন্থুরেতে চলেছে হোলি খেলা। দেবী অনসূয়া বানিয়েছেন ক্ষীর আর পুলি। প্রভু দত্তাত্রয় খেলছেন। পন্ধারপুরমে হোলির মাতন লেগেছে।

নাচে-গানে, সারেঙ্গি, করতাল, ঢোলক আর বাঁশির সম্মিলিত তানে রাতের মেলা সরগরম।

অনেক বকশিশ পেল বান্‌জারার দল। পরের বছর মেলায় এমনি নাচগানের আসর জমাবার জন্যে বায়নার টাকা নিয়ে এল মেলা কর্তৃপক্ষ।

নায়েক হরদয়াল হাতজোড় করে বলল, মহাশয়গণ, আমরা বান্‌জারা। এক ঠাঁই বেশিদিন থাকার অভ্যেস নেই আমাদের। যদি চলতি পথে কখনও এখানে এসে পড়ি তা হলে আমার ছেলেমেয়েরা আবার আপনাদের এমনি পেয়ার আর শুভকামনা কুড়িয়ে নেবে।

পরদিন ভোর হতে না হতেই 'নন্দী বইল'কে সামনে রেখে, ডান কাঁধে বর্শা ঠেকিয়ে, বাঁ হাতের আঙুলে গোঁফ চোমরাতে চোমরাতে এগিয়ে চলল নায়েক হরদয়াল। পেছনে লম্বা লাইন,—স্ত্রী-পুরুষ, কাচ্চাবাচ্চা আর গোরুর পাল।

পাগড়ি-পরা পুরুষগুলো যখন কাঁধে বর্শা ঠেকিয়ে হাঁটে তখন মনে হয় রাজার সেপাইরা হেঁটে চলেছে। ঝকঝকে বর্শার ফলাগুলো ঝলকাচ্ছে আলো পড়ে।

তির-ধনুকগুলো বান্ডিল করে বাঁধা আছে ভারবাহী বলদের পিঠে।

বনের পথে চলার সময় বনবরা, খরগোশ আর হরিণ শিকার করতে গেলে দরকার হয় তিরধনু আর বর্শা।

ছেলেমেয়েরা ফাঁদ পেতে পাখি ধরতে ওস্তাদ। তা ছাড়া ছোটবেলা থেকেই নাচেগানে তারা তালিম নেয় মা-মাসি, বাপ-জেঠা, মেসো-পিসেদের কাছ থেকে।

অল্পবয়স থেকেই ছেলেমেয়েদের শেখানো হয় আত্মরক্ষার জন্য ছোরা আর লাঠি খেলা।

বাজিকররাও বান্‌জারাদের মতো ভবঘুরে, কিন্তু ওরা গৃহস্থদের উঠোনে গিয়ে নানারকম বাজি দেখায়। হাটের পাশেও দু'দিকে বাঁশের ওপর টান টান করে দড়ি বেঁধে তার ওপর দিয়ে নির্ভয়ে চলাচল করে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেয়। দড়ির খেলায় কড়িও জোটে অনেক।

বানর আর ভালুকের খেলা দেখাতেও ওরা ওস্তাদ।

বান্‌জারাদের নামের সঙ্গে বনের যোগটা নিবিড়। ওরা বন্‌চরা। বনের ভেতরের পথ দিয়েই ওদের যাতায়াত বেশি।

ওরা বনের পর বন ভেঙে চলে, তাই গাছগাছালির পাতাপত্র, শেকড়বাকড়ের সন্ধান রাখে। কেবল খোঁজ নয়, গুণাগুণও জানে।

লোকালয়ে যাবার সময় ছানা আর ঘি বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে ওরা শেকড়বাকড়ও বিক্রি করে। কোন রোগে কোন দাওয়াই, তাও জানিয়ে দেয়।

পথের ধারে কিংবা পড়ো ঢিবিতেও ওরা সঙ্গে বয়ে আনা গাছের চারা লাগিয়ে দেয়। সেই চারা বড় গাছে পরিণত হয়ে যখন ফল দেয়, ছায়া দেয়, তখন কিন্তু বান্‌জারারা আর সেখানে থাকে না। পৃথিবীকে যেন সবুজ করা, শ্যামল করা তাদের ধর্ম।

খোলা আকাশের নীচে, বনের শ্যামলিমায়, বহতা নদীর তীরে ঘুরতে ঘুরতে উদার হয়ে গেছে ওদের দিল্‌।

দিনে দিনে ঝুম্‌কি হয়ে উঠেছে বান্‌জারাদের নয়নের মণি। সে এখন কেবল পান্নাবাইয়ের বুক জুড়ে থাকে না, ছেলে-মেয়ে সকলের কোলে-পিঠে-কাঁধে চড়ে বেড়ায়।

ব্রিজলাল ওকে ছুড়ে দেয় শূন্যে, একটুও ভয়ডর নেই ওর। শূন্য থেকে নেমে আসার সময় খিলখিল করে হাসতে থাকে।

মেয়ে নয় তো, আকাশ থেকে ঝরে পড়া একটা জ্বলজ্বলে নক্ষত্র। যত দিন যায় ঝুম্‌কির রূপের বাহার চাঁপাফুলের মতো ছড়াতে থাকে।

ঝুম্‌কি এখন শুধু ঝুম্‌কি নয়, ঝুম্‌কি তুনওয়ার। এখন ও হরদয়াল আর পান্নাবাইয়ের মেয়ে, তাই ওদের পদবিটাই ওর নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই দলে পাওয়ার, বাদতিয়া, ভুকিয়া, চবন আরও কত পদবির লোকজন একসঙ্গে রয়েছে। ওরা একে অপরের আত্মীয়। কেউ কারও বহনাই, কেউবা কারও বহু, বহেন।

কোনও মেয়ের দেবর চলেছে, সঙ্গে তার বউ দেবরানিও সঙ্গিনী। জেঠ, জেঠানি ; মাউসি, মাউসাজি; ননন্দাই, ননন্দ ; এরা সকেলেই এক দলভুক্ত বান্‌জারা।

আশ্চর্য এদের ভালবাসা! ভুলিয়ে দিয়েছে ঝুম্‌কির আগের জীবনটাকে। সে এখন বান্‌জারাদেরই একজন। তার বয়সি কেউ নেই ওই দলে। দু'-চার বছরের বড় অনেক-কটিই রয়েছে ওখানে। তারা সারাদিন ওকে নিয়ে খেলা করে, ওকে নিয়েই মেতে থাকে।

রাতে হরদয়ালকে পান্নাবাই বলল, দেবী জগদম্বার দয়ায় আজ আমার বন্ধ্যা দশা ঘুচেছে। হ্যাঁ গা, মেয়েটাকে পেলাম, একটু পুজোটুজো দেবে না?

হরদয়াল বলল, বল্‌ কোথায় পুজো দিতে চাস?

কেন, অমরকণ্টকে। সামনে তো সংক্রান্তি, ওখানেই গিয়ে দেবতার চরণে প্রণাম জানাব।

বেশ তো, তোর যা ইচ্ছে তাই হবে।

পান্নাবাই বলল, তার আগে চলো চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরে। ওখানে পুজো দিয়ে ভেরাঘাটে যাওয়া যাবে। ভেরাঘাটের কাছেই তো নর্মদা নদী পড়েছে একটা গভীর খাদে। ওটাই তো ধোঁয়াধার জলপ্রপাত। তারপর পাহাড়ের ভেতর দিয়ে নদী এঁকেবেঁকে কতদূর চলে গেছে।

হরদয়াল বিস্মিত, তুই এত সব জানলি কী করে?

সব আমার মায়ের মুখ থেকে শুনেছি। বিয়ের পর মা-বাবা দুজনেই এদিকে এসেছিল।

হরদয়াল তার দলবল নিয়ে একদিন তিন তিনটে নৌকো ভাড়া করে নর্মদার স্রোতে জলবিহার করল। শ্বেতপাথরের পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ওরা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু তীরে ওঠার সময় ঘাটের কাছে একটা অঘটন।

ঘাটের পাটে নামবার সময় টলে গেল পান্নাবাইয়ের নৌকোটা। অমনি ঘাটের কাছে পান্নাবাইয়ের বুক থেকে ছিটকে পড়ল ঝুম্‌কি। সঙ্গে সঙ্গে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পান্নাবাইও ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

এখানে নদীর স্রোত প্রবল। একটু দূরেই সে স্রোত নীচের দিকে জলপ্রপাতের মতো নেমে গেছে।

বান্‌জারার দলের মানুষগুলো কী করবে ভেবে পেল না। তারা পাহাড়ি ছোট ছোট নদী পেরিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু এমন ডুবজলের খরস্রোতা নদীতে সাঁতার কাটার অভ্যেস নেই। আতঙ্কে তাদের চোখগুলোই শুধু বিস্ফারিত হয়ে গেল। হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল বাচ্চার দল।

হঠাৎ মা জগদম্বা যেন পাঠালেন লোকটিকে। সে লাফ দিয়ে ওই স্রোত কেটে কুমিরের মতো সোঁ সোঁ করে এগোতে লাগল। অবশেষে নাগাল পেল দু'জনের। ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে একটু দূরে কূলে গিয়ে উঠল। ততক্ষণে তীর ধরে দৌড়োচ্ছে বান্‌জারা মেয়ে-পুরুষের দল।

পান্নাবাই জল খেয়ে বেশ জখম হয়েছিল কিন্তু ঝুম্‌কির বিশেষ কিছুই হয়নি। লোকটা ততক্ষণে ওদের পরিচর্যায় লেগে গিয়েছিল। তার নিজের যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাব।

সুখলাল বলে উঠল, ওই লোকটিই তো নর্মদা যেখানে পাহাড়ের খাদে পড়ছিল সেখানেই দাঁড়িয়েছিল খালি গায়ে।

ব্রিজলাল বলল, ওই সেই লোক, যে সেদিন ধোঁয়াধার জলপ্রপাতের অত গভীর খাদে বার দুয়েক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মরে যাবার কথা, কিন্তু দু'দুবার উঠে এসেছিল অবলীলায়।

দু'জনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল যে তাকে ওরা এক ভাঁড় ঘি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে তা নিল না। শুধু মৃদু হেসে ঝুম্‌কির গালটা নেড়ে দিয়ে চলে গেল।

মস্ত বড় ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় বান্‌জারাদের পুরো দলটা মহাখুশি। তারা রাতে জ্যোৎস্নার আলোয় ওই নর্মদার তীরেই নাচগান জুড়ে দিল। হারানিধি ফিরে পাওয়ার আনন্দে তখন তারা মাতোয়ারা।

পাহাড়, অরণ্য, নদীর স্রোত, চাঁদের আলো যেন এক মায়াময় জগতের সৃষ্টি করছিল।

বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল পান্নাবাইকে, সে কিন্তু দু'-হাতের বাঁধন থেকে ঝুম্‌কিকে একবারও ছাড়েনি।

সংক্রান্তির মেলা বসবে অমরকণ্টকের মন্দির-প্রাঙ্গণে। যাত্রীরা স্নান করবে কুণ্ডে।

অমরকণ্টকে কখনও আসেনি এই দলটি। হঠাৎ সেখানে হাজির হয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেল।

জায়গাটা সবুজ তৃণে ছাওয়া একটা মালভূমি। আশেপাশে গভীর বন। স্বচ্ছ জলে ভরা ছোট ছোট কয়েকটি স্রোতধারা রুপোলি সুতোর মতো ছড়িয়ে আছে মালভূমির চারদিকে।

বর্ষার সময় কিন্তু এর অন্য রূপ। এই স্রোতধারাগুলি তখন থইথই নাচতে নাচতে ছুটে চলে। উত্তরের স্রোত গিয়ে পড়ে শোণ নদীতে। গোদাবরীতে যায় দক্ষিণের স্রোত। পূর্বের স্রোত পুষ্ট করে মহানদীকে। আর পশ্চিমের স্রোত প্রবাহিত হয় নর্মদায়।

অসাধারণ পুণ্যক্ষেত্র এই অমরকণ্টক।

সামনে একটি বাঁধানো জলাধার। তার থেকে পশ্চিমবাহিনী হয়েছে একটি ঝরনা। ওই ঝরনাই নদী নর্মদার উৎস।

জলাধার ঘিরে মন্দির। ভক্তদের স্তোত্রপাঠ, ভজন-আরতির ঘণ্টাধ্বনি, সব মিলে মেলা-প্রাঙ্গণ প্রাণচঞ্চল। ধুনি জ্বলছে সারা প্রান্তর জুড়ে। পাঠ আর ভজনগানে শব্দিত আকাশ-বাতাস।

বান্‌জারার দল মন্দিরের পুরোহিতকে নিবেদন করেছে কয়েকঘড়া ঘৃত, দুধ আর সদ্য কাটানো টাটকা ছানা। এই সব উপহার পেয়ে দারুণ খুশি প্রধান পুরোহিত।

নায়েক হরদয়াল ঝুম্‌কির নামে বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা করেছে। সারারাত ধরে চলেছে পুজো। জেগে আছে পান্নাবাই ঝুম্‌কিকে কোলে নিয়ে। তার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে জল টপটপ করে ঝরে পড়ছে ঘুমন্ত ঝুম্‌কির মাথায়।

শেষ রাতে সমাপ্তি পুজো। সারারাত জাগরণে, দেবার্চনায় কেটেছে যাত্রীদের। এখন সবাই বসেছে সমাপ্তি পূজা দর্শনের জন্য মূল মন্দিরচত্বরে।

পুজো দেখে সমস্ত মন ভরে উঠেছে বান্‌জারাদের।

পরদিন তাঁবু উঠল। মালবাহী বলদের পিঠে চাপানো হল সেগুলো। আগের মতো ঠিক তেমনি সারি দিয়ে চলতে লাগল বান্‌জারাদের টান্ডা।

মেলায় উপস্থিত ভক্তরা দেখতে লাগল এই অপূর্ব রঙিন সমারোহপূর্ণ চলচ্ছবি।

রায়পুর থেকে জব্বলপুর গিয়েছিল ওরা। জব্বলপুর থেকে ভোপাল, ইন্দোর করে প্রায় সারাটা মধ্যপ্রদেশ ঘুরতে লাগল।

এই মধ্যপ্রদেশেই ঘুরতে ঘুরতে ওরা কাটিয়ে দিল পাঁচ-সাতটা বছর। এখন ঝুম্‌কি পা দিয়েছে এগারো বছরে। এই বয়সেই যেমন বাড়বাড়ন্ত শরীর তেমনি তার নয়নভোলানো রূপ।

ঝুম্‌কির চেয়ে কিছু বড় যেসব ছেলেমেয়ে, তারা আজকাল ওর কথা মেনে চলে। ভালবাসা দিয়ে সবার মন কেড়ে নিয়েছে ঝুম্‌কি।

ও নাচ শিখেছে রূপমতীর কাছ থেকে। সে এখন নাচে-গানে সবার সেরা। গলায় তার পাপিয়ার তান।

জ্যোৎস্না রাতে সে যখন সাদা পোশাক পরে নাচে তখন তাকে আকাশপরি বলে মনে হয়।

তার কিশোরী দেহে বনফুলের সুবাস। আজকাল তার চুল চূড়া করে বেঁধে দেয় রূপমতী। দুটি গুচ্ছ গালের দু'দিক দিয়ে সামনে এসে পড়ে। পেছনের বিনুনিতে রুপোর একসারি ছোট্ট ঘুন্‌টি।

নাচের সময় ওর রুপোর তোড়িয়া থেকে ভারী চমৎকার রুমঝুম আওয়াজ ওঠে।

কখনও কখনও তাকে কিশোব কৃষ্ণ সাজিয়ে আর সব ছেলেমেয়েরা মণ্ডলী রচনা করে নাচে।

ওরা হোলির নাচ নাচে একসঙ্গে পা ফেলে, সবার কোমর জড়িয়ে ধরে ঘুরে ঘুরে নাচে।

দুর্গা উৎসবেও ওরা নাচে তিপ্‌রি নাচ। হাতে থাকে ছোট ছোট কাঠি। পরস্পর সেই কাঠি বাজিয়ে বাজিয়ে নাচে।

তেজ উৎসবে ওরা নাচে লঙ্‌দি পায়ে। তখন পা পড়ে আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে।

দাফ্‌দি, খোলি, ঝাঁঝ, নাগরা, দোদ্‌পাই এই সব বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ওরা নাচের আসর জমায়।

কেবল মেয়েদের নাচের সময় টান্ডা বাজাতে শোনা যায়।

কখনও বা মাথায় দইয়ের ভাঁড় নিয়ে ঝুম্‌কি মথুরার দিকে যাত্রা করে। সুরেলা গলায় তার মথুরা যাত্রার গান :

> 'রুমঝুম রুমঝুম চলি মথুরান,
> শির পর দহির মাঠ, ভাই-ভাইরে
> শির পর দহির মাঠ,
> ছোদর কৃষ্ণ ছোদর মুরারি
> যায়দ মথুরাউ।'

সে চলেছে মথুরায়। রুমঝুম আওয়াজ তুলে বাজছে তার ঘুঙুরো। তার মাথায় দইয়ের

ভাঁড়। সে মিনতি করে বলছে, ওহে মুরারি, আমাকে মথুরায় যেতে দাও, আমার পথ আগলে থেকো না।

কাজল-তেজ উৎসব শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়া থেকে শুরু হয়। এ-অনুষ্ঠান কেবল কিশোরীদের। আটদিন ধরে চলে এ-উৎসব। উৎসবের আগে মেয়েরা যায় নায়েকের কাছে। তার অনুমতি নিয়ে তারা তেজ-উৎসবের সূচনা করে।

অবিবাহিত মেয়েরা একটা গাছের তলায় গিয়ে সাতবার পাক দেয়। ছেলেরা তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করে। পরে মেয়েরা কিছু মাটি সংগ্রহ করে ছোট ছোট বাঁশের তৈরি বাক্সে ভরে দেয়। তারপর তার ওপর গমের বীজ ছড়ায়।

বীজ বোনার পর সপ্তম দিনে একটা উৎসব হয়, যাকে বলে, থামোলি। সেই উৎসবের পর সবাইকে প্রসাদ বিলি করা হয়।

নবম দিনে 'গাঙ্গুর' আর 'সামন্ত' নামে দুটি ছোট্ট মূর্তি তৈরি হয় এবং কিশোরীরা সারারাত ধরে তার পুজো করে। ভোরবেলা তেজকে ভেঙে দেওয়া হয়। গম থেকে যে অঙ্কুর বেরোয় সেগুলিই সবাইকে বিতরণ করে কুমারী কন্যারা।

বান্‌জারাদের উৎসবের শেষ নেই। তেজ, দশেরা, হোলি, আরও কত উৎসব। দেবতাদের ভেতর কান্‌হোবা (কৃষ্ণ), বালাজি, জগদম্বা দেবী, মহাদেব, খাণ্ডোবা, সামকি মাতা, হনুমান, সতী আয়ি, সেবা ভায়া, মিঠু, ভুখিয়া, এমনি আরও কত দেব-দেবী। তা ছাড়া বনচারীদের বন্‌জারি দেবী তো আছেনই।

এমনি গানে-নাচে, পূজা পার্বণে বান্‌জারাদের আনন্দ বনপুষ্পের মতো ফুটে ওঠে।

পথ চলতে চলতে কিন্তু সন্ধ্যার আসরে পুরনো দিনের গল্প বলা থামে না হরদয়ালের। তার গল্পের শ্রোতা কেবল তরুণ-কিশোররাই নয়, টান্ডার মেয়ে-পুরুষ, সব কজন সদস্যই।

প্রথমবার জব্বলপুরের মেলায় নাচ দেখিয়ে, গান শুনিয়ে নাম কিনেছিল নায়েক হরদয়ালের টান্ডার ছেলেমেয়েরা। পরের বছর আসার জন্য আগাম আমন্ত্রণও পেয়েছিল তারা। কিন্তু ভবঘুরে মানুষদের জীবন সংসারী মানুষদের মতো ছকে বাঁধা নয় বলে তারা ভবিষ্যতের জন্য কাউকে কোনও কথা দিতে পারে না। হরদয়ালও দেয়নি। কিন্তু বছর সাতেক পরে সে ঘুরতে ঘুরতে আবার এসেছে সেই জব্বলপুরে তার দলবল নিয়ে।

এ-সময় অবশ্য মেলার নামগন্ধ নেই। তবু তারা এসে ডেরা ফেলেছে নর্মদার কূলে, পাহাড় আর জঙ্গলের কোলে।

শহরে ঘি আর ছানা বিক্রি করতে গিয়ে একদিন চোখে পড়ে গেল মেলা কমিটির কর্তার। ছেলেগুলো বড় হয়ে গেলে কী হবে, ঠিক তাদের চিনে নিয়েছেন ওই হুঁশিয়ার মানুষটি।

কী খবর! এতদিন কোথায় ছিলে তোমরা?

উঠতি বয়সের ছেলেগুলো কিন্তু চিনতে পারল না মানুষটিকে।

ওদের একজন বলল, ঘি নেবেন বাবু সাহেব, ঘি? শুঁকে দেখুন হাতে ঘষে। ছানাও আছে, দেখুন মুখে ফেলে সোয়াদ কী রকম।

মানুষটি বললেন, নেব নেব, সব নেব, কিন্তু তোমরা এতদিন কেমন ছিলে বলো? সেই যখন

তোমরা আট-দশ বছরের ছিলে তখন তোমাদের দেখেছি। মেলায় কী নাচই না তোমরা নেচেছিলে! সঙ্গে সেই মনমাতানো গান! তোমাদের নায়েক হরদয়াল কোথায়?

এতক্ষণে ছেলেরা বুঝল, তাদের নাড়ি-নক্ষত্র সবই ভদ্রলোকটির নখদর্পণে।

ওদের সর্দার ভাটুরি বলল, নায়েক এসে দেখা করে যাবেন আপনার সঙ্গে। কিন্তু দেখাটা হবে কোথায়?

মিলিটারি ব্যারাক পেরিয়ে ডানদিকের প্রথম বাড়িটা আমার।

ফিরে গিয়ে নায়েককে বলে দেব।

আমার নামটা এখনও বলা হয়নি তোমাদের।

ওরা এবার জিজ্ঞাসু চোখ মেলে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মোহনলাল মুন্দ্রা। হরদয়ালকে আমার নামটা বললেই আশা করি চিনতে পারবে।

বান্‌জারা যুবকরা নত হয়ে নমস্কার করে চলে যাচ্ছে দেখে ভদ্রলোক বললেন, কই ঘি দিয়ে যাও?

কানাইয়া বলল, আপনি কৃপা করে আমাদের নায়েকের হাত থেকেই ঘি-টা নেবেন।

ওরা ডেরার দিকে চলে গেল।

হরদয়াল ছেলেদের মুখে সব ঘটনা শুনে বলল, বাবুসাহেব কেবল পয়সাওলা আদমি নয়, বহুৎ বড়া দিলবালা আদমি। আজ সাঁঝবেলা ওনার সাথে দেখা করে আসব।

সাঁঝ নামল। দিক ভাসল চাঁদের আলোয়। ছেলেমেয়েরা রোজকার মতো আসর জমিয়ে বসল।

কাঁধে বর্শাখানা ঠেকিয়ে মিলিটারি ব্যারাকের দিকে এগিয়ে চলল হরদয়াল। মুন্দ্রাসাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যে সে এখন উৎসুক হয়ে উঠেছে।

ব্যারাক পেরিয়ে সামান্য এগিয়েই হরদয়াল থমকে দাঁড়াল।

ওই তো ডানদিকে প্রথম বাড়ি।

আরেব্বাস! বাড়ি নয় তো, প্রাসাদ। তিনতলা পেল্লাই চকমেলানো বাড়ি। ভেতরে আলো জ্বলছিল। সিং-দরজার ঠিক ভেতরে বিরাট উঠোনের দুদিকে সমান উচ্চতাবিশিষ্ট দুটো ম্যাগনোলিয়া গাছ। চাঁদের দুধসাদা আলোয় তাদের গাঢ় সবুজ পাতা আর শ্বেতপদ্মের মতো ফুল দেখা যাচ্ছিল।

লোহার গেটের ভেতর একটা টুলের ওপর বসেছিল দারোয়ান। হাতে বন্দুক।

হরদয়াল এগিয়ে গেল। পাথুরে রাস্তায় মোটা সুকতলাওয়ালা নাগরার ঠোক্করে যে আওয়াজ উঠছিল তাতেই সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়াল দরোয়ান।

গেটের বাইরে চোমরানো গোঁফওয়ালা আধবয়সি একটা লোককে অদ্ভুত পোশাক পরা অবস্থায় কাঁধে বর্শা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দরোয়ান গম্ভীর গলায় বলল, কৌন হ্যায়?

উত্তর এল, মোহনলালজিকো সেলাম ভেজো, হরদয়াল আ গিয়া।

গেট না খুলেই দরোয়ান ভেতরে ঢুকে গেল। কিছু পরে ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে গেট খুলে দিয়ে বলল, আইয়ে।

হরদয়াল দরোয়ানের পেছনে পেছনে মূল বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

বাইরের দেওয়ালে বর্শাটা ঠেকিয়ে রেখে সে ভেতরে ঢুকে সেলাম জানাবার আগেই তার দিকে এগিয়ে এলেন মুন্দ্রাসাহেব।

দুটো হাত ধরে তাকে একটা সোফায় বসাতে গেলেন কিন্তু কিছুতেই সে সোফায় বসল না। শেষে মেঝের ওপর পাতা কার্পেটের এক কোণে বসে পড়ল। মোহনলালবাবুও একটু দূরে কার্পেটের ওপর বসলেন।

কুশল প্রশ্নাদির পর মোহনলালবাবু বললেন, এখন মেলার সময় নয়, কিন্তু আমি তোমার ছেলেমেয়েদের নাচগান দেখতে চাই। আমার এ বাড়ির পেছনে একটা বড় বাগান আছে। বাগানের চারদিকে সবুজ গাছপালা, মাঝখানে অনেক বড় ঘাসে ছাওয়া জমিন। তার ভেতর ফোয়ারা আছে। ফোয়ারার জলে আলো পড়লে ভারী সুন্দর রং খেলে। খুব ভাল লাগবে তোমাদের। ওখানেই আমি তোমাদের নাচগানের আসর বসাব।

হরদয়াল বলল, সে তো বহুৎ খুশির খবর বাবুসাহেব।

হঠাৎ হরদয়ালের চোখ আটকে গেল পাশের ঘরে একটা মূর্তির ওপর।

খোলা জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে দেখা গেল ঘরের ভেতর হালকা সবুজের আভা লাগা একটা আলো জ্বলছে। সেখানে হরিণের চামড়ায় পদ্মাসনে বসে রয়েছেন একটি মানুষ। পরনে ছোট একটা ধুতি। ঊর্ধ্ব অঙ্গে কোনও বাস নেই। অতি সুঠাম ফরসা সুন্দর চেহারা।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল হরদয়ালের!

এ তো সেই দেওতা, যিনি তার ঝুমকি আর পান্নাবাইকে সাত বছর আগে নর্মদার স্রোত থেকে তুলে এনেছিলেন।

কিন্তু তিনি এখানে এলেন কী করে!

হরদয়ালকে পাশের ঘরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে দেখে মোহনলালজি নিজের থেকেই বললেন, ও আমার চাচাতো ভাই। নিজের সাগা ভাইয়ের চেয়েও অনেক বড়। ওর কথা বলে শেষ করা যাবে না।

হরদয়াল বলল, উনি দেওতা।

মোহনলালজি বললেন, তুমি কি ওকে জানো!

ওঁকে আমি দুবার দু'জায়গায় দেখেছি।

ধোঁয়াধার জলপ্রপাতে ওঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি দু'দুবার। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেছি, জলের ওই গভীর কুণ্ড থেকে উঠে আসতে দেখে!

মৃদু মৃদু হাসছিলেন মোহনলালজি। পরে বললেন, তোমরা কেবল দু'বারই দেখেছ কিন্তু পুরো দশটা বছর ধরে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব কটা ঋতুতেই ও প্রতিদিন অন্তত চার-পাঁচবার মা নর্মদার কুণ্ডে ঝাঁপ দিচ্ছে।

কিন্তু কেন বাবুসাহেব? প্রাণ নিয়ে এমন খেলা উনি খেলছেন কেন?

একটু থেমে হরদয়াল আবার বলল, সাত বছর আগে আমি যখন এসেছিলাম তখন নৌকো চেপে ঘুরেছিলাম নর্মদা নদীতে। হঠাৎ নৌকো টলে উঠতে আমার চার বছরের মেয়ে ঝুমকি জলে পড়ে যায়। তারপর মা-ও মেয়েকে ধরতে জলে ঝাঁপ দেয়।

মোহনলালজি সবিস্ময়ে বললেন, সেখানে তো প্রবল স্রোত, বাঁচল কী করে!

হরদয়াল পাশের জানালার দিকে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, সেদিন ওই সাহেবই আমার বউ আর বাচ্চাকে জল থেকে তুলে এনেছিলেন।

মোহনলাল বললেন, ও বড় চাপা। পরের উপকার করলেও সেকথা কোনওদিন কাউকে মুখ ফুটে বলে না। আমি জানতামই না।

আমার গোস্তাকি মাপ করবেন। ওঁকে দেখে মনে হয় উনি একজন সাধু মানুষ। উনি কি সংসারধর্ম করেননি?

মোহনলালজির মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি মাথা নেড়ে জানালেন, না, তাঁর ভাইটি সংসারধর্ম করেনি।

হরদয়াল বিস্মিত হয়ে বলল, কিন্তু এত অর্থ, এত রূপ!

মোহনলালজি বললেন, তোমার এখন কি সময় আছে, না তুমি এখুনি দলে ফিরে যাবে?

হরদয়াল সসংকোচে বলল, একথা কেন বাবুসাহেব, আপনার দামি সময় নিয়ে নিচ্ছি না তো?

না, না, একেবারেই না। তোমার সময় থাকলে ওই বাবুজির কথা তোমাকে শোনাতাম।

সে তো খুব খুশির বাত বাবুসাহেব।

মোহনলালজি বললেন, তবে চলো, বাড়ির ছাদের ওপর যাই। সেখানে সতরঞ্চ পাতা আছে। চাঁদের আলোয় বসে তোমাকে বহুৎ পুরানা এক কাহিনী শোনাব।

মোহনলালজির সঙ্গে সঙ্গে হরদয়াল উঠে দাঁড়াল।

আলোকিত চওড়া সিঁড়ি ভেঙে ওরা দু'জনে ওপরে উঠে গেল।

এবার শতরঞ্চে মুখোমুখি বসল দু'জনে।

নীলাকাশে চতুর্দশীর চাঁদ জ্যোৎস্নার ঢেউ তুলেছে।

মোহনলালজি শুরু করলেন কাহিনী ঃ

তিন

তুমি ঠগিদের নাম শুনেছ হরদয়াল?

শুনব না বাবুসাহেব! খুনখারাপি নিয়েই তো ছিল ওদের কারবার।

ঠিক বলেছ। একসময় সারা ভারত জুড়ে ছিল ওদের কারবার। প্রতি বছর কত সহস্র মানুষ যে ওই ঠগিদের হাতে প্রাণ দিয়েছে তার লেখাজোখা নেই।

মোহনলালজি একটু থেমে বললেন, মানুষ যেমন সংসার প্রতিপালনের জন্য দোকানপাট, কাজকারবার করে, এদেরও ছিল তেমনি ঠগি-ব্যবসা।

ওরা ওই ব্যবসাটাকে কোনওরকম ঘৃণার কাজ বলে মনে করত না। ওটা ছিল ওদের কাছে আর পাঁচটা কাজের মতো একটা কাজ।

হরদয়াল বিস্মিত হয়ে বলল, ঠান্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে গিয়ে ওদের মনে কি কোনওরকম আঁচড় লাগত না?

আমি যতটুকু জেনেছি ওরা ও কাজকে সাধারণভাবে মাটি কোপানো কাজের মতোই মনে করত। এমনকী বাড়ির ছেলেদেরও ছোটবেলা থেকেই এসব কাজে পাকা করে তুলত। ঠগিরা

যখন বাড়িতে থাকত তখন কেউ আঁচও করতে পারত না সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের এতটা তফাত। তারা ঘর ছাইত, মাছ ধরত, লাঙল দিত মাঠে। একেবারে শান্ত, নিরীহ গাঁয়ের মানুষটি।

হরদয়াল বলল, বড় তাজ্জব!

মোহনলালজি বললেন, বর্ষাকালে সাধারণত ওরা বেরোত না।

শীতকালে যখন ফসল তোলা হয়ে যেত, শুকনো ঠকঠকে হয়ে যেত মাঠঘাট তখন ওরা মা ভবানীর পুজো দিয়ে বেরিয়ে যেত কাজে।

হরদয়াল বলল, খুনের কাজে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দেবীর পুজো করত কেন?

ওদের ধারণা, মা ওদের এই রোজগারের কাজে আশীর্বাদ করবেন।

এ ব্যাপারটা আমার মগজে ঢুকছে না বাবুসাহেব।

দেখো, যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ। আমার ধারণা, ঠাকুর-দেবতার এখানে করণীয় কিছু নেই। মানুষই ঠাকুরকে সাক্ষী রেখে কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে।

বাবুজি, এখন আপনার ভাইয়ের কথা শুনতে দিল চাইছে। তাঁর কথাই বলুন।

অনেককাল আগে আমাদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণগোপাল মুন্দ্রা এই অঞ্চলের নামকরা এক জমিদার ছিলেন। মানুষটি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। তীর্থমুখী ছিল তাঁর মন।

জমিদার কৃষ্ণগোপালের দুটি বিয়ে। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি করে পুত্রসন্তান। প্রথম স্ত্রী ছিলেন ধর্মপ্রাণ, দ্বিতীয় স্ত্রী ঘোরতর সংসারী।

প্রথম স্ত্রীকে নিয়েই কৃষ্ণগোপাল তীর্থভ্রমণে বেরোতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় স্ত্রী দেওয়ানজির সঙ্গে পরামর্শ করে জমিদারির কাজকর্ম পরিচালনা করতেন।

একদিন দেওয়ান ছোট রানিমার সঙ্গে গোপন পরামর্শে বসলেন। পরামর্শটা কী তা শুনলে তুমি অবাক হবে।

হরদয়াল বলল, তা কী এমন পরামর্শ বাবুসাহেব?

মোহনলালজি বললেন, সে সময় বহু রাজা, জমিদার আর ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ ছিল ঠগিদের সঙ্গে। তাঁরা ওই সব খুনিদের নানাভাবে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করতেন।

বিস্মিত হয়ে হরদয়াল জিগ্যেস করল, কিন্তু খুনিদের এভাবে আড়াল করার কারণ?

বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে জমিদার ব্যবসায়ীরা তাদের এলাকার ঠগিদের আড়াল করে রাখত বলে তাদের রোজগারের ওপর একটা বখরা পেত। সে অর্থের পরিমাণটা কিন্তু খুব কম নয়।

বাবুসাহেব, ঠগিরা সাধারণত কাদের শিকার করত?

তীর্থযাত্রীদের ওপর তাদের সবচেয়ে বেশি লক্ষ ছিল। তারপর বিত্তবান মানুষজন, সরকারি খাজনাবাহক ইত্যাদি।

তীর্থযাত্রীদের আক্রমণ করতে ওদের একটু ডর লাগত না?

কীসের ডর?

তীর্থদেওতার। তাঁর অভিশাপের ভয় করত না ওরা?

ওরা মনে করত, দেবী ভবানীই সব দেবদেবীর ওপরে। একবার তাঁর পূজা করে অনুমতি নিয়ে নিলে আর কোনও দিকে তাকাবার দরকার নেই।

মোহনলাল বলে চললেন, সেকালে দলে দলে তীর্থযাত্রী দেবদর্শনে বেরিয়ে পড়ত। গ্রামের

মানুষেরা জানত তিন-চার মাসের আগে এরা ফিরবে না। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও অধিকাংশ যাত্রীকে আর ফিরে আসতে দেখা যেত না।

কেন বাবুসাহেব?

ঠগিরা পথে ওদের টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি এমনকী প্রাণ পর্যন্ত কেড়ে নিত।

একটু থেমে বললেন, ঠগিদের কারবার ছিল চতুর-বুদ্ধি দিয়ে সাজানো। তাদের ফেলা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভবই ছিল।

এখন তোমাকে তাদের কাজকর্মের একটা নকশা এঁকে দিচ্ছি।

হরদয়াল শোনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে মোহনলালজির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রথমেই ওদের চরের কথা বলি। তাদের বলে, তিলহাই। তারা চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে, এমনকী বড় বড় গাছের ওপর চড়ে যাত্রীদের সন্ধান করে বেড়ায়।

শাঁসালো যাত্রী চিনতে তাদের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না।

একজন চলে যায় মূল আখড়ায় খবরটা পৌঁছে দিতে। অন্য দু'-চারজন সাধারণ পথিক সেজে ওই যাত্রী দলের সঙ্গে মিশে যায়। আলাপ জমানোতে ওরা খুবই ওস্তাদ।

ওরা কখনও বা কোনও নিষেধ না শুনে তীর্থযাত্রীদের বোঝা বয়ে দেয়। বাধা দিলে বলে, এ বড় পুণ্য [illegible] করে প্রভুর কৃপা থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

এমনিভাবে পথ [illegible]তে চলতে ওদের বিশ্বাস অর্জন করে তিলহাইরা।

ওরা জানে, [illegible] কোন জায়গায় সন্ধ্যা ঘনাবে এবং সেখানেই বিশ্রাম নিতে হবে যাত্রীদের।

দলে আগাম খবর দিয়েছে যে সব তিলহাই তারা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গেছে ওই তীর্থযাত্রীদের দলটিকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য।

হয়তো একটা বড় গাছের তলায় তাঁবু ফেলে বসে গেছে সবাই। তাঁবুর বাইরে আসর পাতা, ভজন-গানে মেতে উঠেছে ঠগির দল।

সর্দারের আগেই জানা হয়ে গেছে যাত্রীদলে কতজন মানুষ আছে। সেইমতো তারা তাঁবুও টাঙিয়ে রেখেছে।

দলে সাতজন তীর্থযাত্রী থাকলে আগেভাগেই একটু দূরে ওরা সাতখানা কবর খুঁড়ে রাখে।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এতখানি পথ হেঁটে আসার ফলে ক্লান্ত হয়েছে তীর্থযাত্রীদের শরীরগুলো। এখন তারা একটুখানি বিশ্রামের জন্য উন্মুখ।

গাছতলা থেকে সান্ধ্য ভজনের সুর কানে এসে বড় তৃপ্তি দিচ্ছে তীর্থযাত্রীদের।

পথে যে-সব তিলহাই ওদের সঙ্গে যাত্রী সেজে এসেছিল তারা ওদের এক জায়গায় বসিয়ে রেখে গাছতলার মানুষগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে কথা বলার অভিনয় করে ওরা আবার ফিরে এলে ওই তীর্থযাত্রীদের কাছে।

এবার তাদের সঙ্গে গাছতলার দু'-একটি মানুষ। পরম বৈষ্ণবের মতো মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে আগত তিলহাইরা যাত্রীদের বুঝিয়ে বলল, এনারা আজ রাতে আপনাদের সেবা করতে চান।

অমনি গাছতলা থেকে আসা দুটি মানুষ আরও অনেকখানি মাথা নত করে বিনীত গলায় বলল, আমরাও আপনাদের মতো 'কাওঁারিয়া মহাদেও' দর্শনে চলেছি। আসুন, আজ রাতটা আমরা একসঙ্গে কাটাই। রাতে আমাদের সেবাটুকু গ্রহণ করলে আমরা কেতাত্থ হব। পরের দিন সকালে একই পথে যাত্রা শুরু হবে আমাদের। সেদিন অপরাহ্নে আমরা আবার আপনাদের অতিথি হব।

ওদের ভেতর আর একজন বলল, পথে-ঘাটে যেমন চোর-ছ্যাঁচড়, ঠগির উপদ্রব তাতে দলে ভারি হয়ে যাওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

তীর্থযাত্রীরা একবাক্যে বলে উঠল, সত্যি, মহাদেবই আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা সকলেই এখন থেকে বন্ধু আর সহযাত্রী। চলুন, আপনাদের ডেরায় যাই।

এমন আমন্ত্রণ বড় ভাগ্যে জোটে। ক্লান্ত শরীরে রান্নাবান্নার বালাই নেই। ভজন-গান শোনা আর রাতের ভোজন, তারপর রাতের মতো নিদ্রার কোলে ঢলে পড়া।

দলটি তাঁবুর কাছে যেতেই গান থেমে গেল। হাতজোড় করে উঠে দাঁড়াল সবাই। অতিথি নয় তো, নারায়ণ। তাদের সভক্তি আবাহন করতে হয়।

অভ্যর্থনাকারীদের একজন বলল, সন্ধ্যা নামতে না নামতেই বড় ঠান্ডা পড়ে গেছে। চলুন, তাঁবুর ভেতরে আসর জমাই।

বিরাট তাঁবু। তার ভেতর পুরোটাই খড় বিছিয়ে শতরঞ্চ পাতা। এ[illegible]ে মাঝখানে বসেছে গানের দল, শ্রোতারা চারদিক ঘিরে। অতিথিদের সারি দিয়ে একঠাই [illegible]না হয়েছে।

ভজনে যখন মাতন লেগেছে তখন তীর্থযাত্রীরা গভীর আবেগ নিয়ে শুনছে সেই গান। পরিবেশে বইছে একটা ধর্মের হাওয়া।

হঠাৎ 'ঝিরনি' উঠল।

হরদয়াল জিগ্যেস করল, 'ঝিরনি' ব্যাপারটা কী বাবুসাহেব?

ঠগিদের ধর্মে আছে, কোনও মানুষকে অসতর্ক মুহূর্তে ফাঁস পরাতে নেই। ঘুমন্ত মানুষকে 'সিক্কা' বা ফাঁস পরাতে গেলে হঠাৎ সাপ, সাপ বলে চেঁচিয়ে উঠতে হয়। ঘুমজড়ানো চোখে তারা জেগে উঠতে না উঠতেই গলায় আটকে যায় ফাঁস।

এখন যারা মগ্ন হয়ে ভজন শুনছিল তারা বিছে, বিছে শব্দ শুনে চমকে উঠল, তাদের সাতজনের পেছনে দাঁড়িয়েছিল সাতটি 'ভুকোত'। ওদের প্রত্যেকের হাতে এক টুকরো করে হলুদ কাপড়। কাপড়ের এক কোণে একটা আস্ত টাকা বাঁধা। 'ভুকোত'-রা কাপড়টা তীর্থযাত্রীদের গলার কাছে এনে মুহূর্তে এমন প্যাঁচ দিয়ে দেয় যে দমটা বন্ধ হয়ে আসে। ধস্তাধস্তির আগে পায়ের ধাক্কায় পথিককে মাটিতে ফেলে দেয় 'চুমিয়া'রা আর হাতগুলো চেপে ধরে 'সামসিরিয়া'রা।

কয়েক পলকের ভেতর হাসিল হয়ে যায় কাজ। তখন 'ভোজা' আর 'পুথাওয়া' মিলে শবগুলোকে বয়ে নিয়ে যায় কবরের জায়গায়।

ভালভাবে কবর দিয়ে মাটি চাপা দেয় ঘাসের চাবড়া বসিয়ে।

তুমি অবাক হয়ে যাবে হরদয়াল! ওই কবরের ওপর শতরঞ্চ বিছিয়ে গুড়ের শরবত খাবে ঠগিরা। এতে নাকি দেহে শক্তি সঞ্চার হয়।

এরপর হতভাগ্যদের জিনিসপত্র, অর্থ সবই ভাগাভাগি হয়ে যায় নিজেদের ভেতর। অর্থের একটা অংশ পায় জমিনদার বা ব্যবসাদাররা। তারাই আবার কোতোয়ালিতে কিছু টাকা দিয়ে কোতোয়ালের মুখ বন্ধ করে দেয়।

হরদয়াল পাশের ঘরের ওই দেবোপম লোকটির কথা ভোলেনি। সে বলল, এবার বলুন সাহেব, আপনার ভায়ের কথা।

মোহনলাল এবার আসল কাহিনীতে এলেন।

আমাদের পূর্বপুরুষ সেই পিতামহ, পিতামহী তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে গেলেন।

কৃষ্ণগোপাল জানতেনই না তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী দেওয়ানের পরামর্শে ঠগিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন আর সেই গোপন পথে বিপুল অর্থসমাগম হচ্ছে তাঁর স্ত্রীর।

আশ্চর্য! স্ত্রীর নামটিও ছিল কৈকেয়ী দেবী। দেওয়ান তাকে পুরোপুরি জমিদারির তক্তে বসাবার জন্যে নায়েবের সঙ্গে যোগসাজশ করে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

এবার নায়েব সরাসরি যোগাযোগ করল ঠগিদের সঙ্গে।

জমিদার কৃষ্ণগোপাল এই তীর্থযাত্রায় তাঁর প্রথম পক্ষের পুত্রটিকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন।

বিষধর সাপের মতো বনজঙ্গল পর্বত চিরে ঠগিরা কৃষ্ণগোপাল আর তাঁর স্ত্রী পুত্রকে অনুসরণ করতে লাগল।

কৃষ্ণগোপালদের সঙ্গে ছিল তিনটি বলশালী লোক। তারা বাক্সপেটরা মাথায় নিয়ে চলেছিল। গয়নাগাঁটি না থাকলেও কতকগুলো হিরে সঙ্গে নিয়েছিলেন কৃষ্ণগোপাল, দেবস্থানে নিবেদন করবার জন্যে। তা ছাড়া পথের খরচের জন্য বেশ কিছু মোহরও সঙ্গে ছিল।

ধর্মপ্রাণ মানুষটি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি তাঁরই ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছে একটা বিষধর সাপ।

অনেক দূর পর্যন্ত তাঁদের ছোট্ট দলটাকে সাপের বিষাক্ত দৃষ্টি অনুসরণ করছিল।

অবশেষে এ-দুনিয়ার নৃশংস খুনিরা দুজন ধর্মপ্রাণ স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের বালক পুত্রটিকে ধরে ফেলল।

সেই আপ্যায়ন, সেই অভ্যর্থনার ঘটা।

ওই বলশালী তল্পিবাহকগুলিও ছিল মারাত্মক ঠগি দলটির 'তিলহাই'। ওদেরকে জব্বলপুর থেকেই জোগাড় করে দিয়েছিল নায়েব।

এদের সঙ্গে ছিল এক একটা মোটা বাঁশের সড়কি।

হরদয়াল জানতে চাইল, ওই মোটবাহক 'তিলহাই'রা তো সড়কির ঘায়ে ওঁদের মেরে ফেলতে পারত। অতদূর নিয়ে যাওয়ার দরকার কী ছিল।

মোহনলাল বললেন, হয়তো খুন করা সম্ভব হত, কিন্তু মৃতদেহগুলোকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হত না। তা ছাড়া ঠগিদের একটা নিজস্ব নিয়ম আছে—যার যে কাজ, কেবল সেই কাজটুকুই তাকে করতে হবে। 'তিলহাই'রা খবর সংগ্রহ করবে এবং যাত্রীদের পৌঁছে দেবে যথাস্থানে অর্থাৎ বধ্যভূমিতে।

তারপর?

শেস রাতে তেমনি 'ঝিরনি' উঠেছিল। শয্যার পাশে কেউ যেন চেঁচিয়ে উঠেছিল সাপ, সাপ বলে।

ধড়ফড় করে ঘুমজড়ানো চোখে ওরা উঠে বসেছিল বিছানার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে এগিয়ে এসেছিল তিনটি নরঘাতক 'ভুকোত'।

ঝলসে উঠেছিল হলুদ কাপড়গুলো। হাতের কসরতিতে প্যাঁচ লেগে গিয়েছিল টাকায়। তিনটে দেহকেই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল চুমিয়ারা। নিয়মমতো হাতগুলো চেপে ধরেছিল তিনজন সামসিরিয়া।

ভোর হওয়ার আগেই আলোর পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তারা কবরের তলায়। আর কোনওদিন তাদের কোনও চিহ্নই পাওয়া যায়নি।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল কৃষ্ণগোপালের দ্বিতীয়া স্ত্রী কৈকেয়ীর। তার পুত্রই পেয়েছিল জব্বলপুরের এই জমিদারির পূর্ণ অধিকার।

এর সঙ্গে আপনার দেবপ্রতিম ভাইটির সম্পর্ক কী বাবুসাহেব?

আমরা জমিদার কৃষ্ণগোপালের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের বংশধর।

বাবুসাহেব কিছু যদি মনে না করেন, আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে।

বলো না, মন খুলে বলো। কোনও সংকোচের কারণ নেই।

কৃষ্ণগোপালজির পরিবারের এই সব কথা বা তাদের খুনের ঘটনা আপনারা জানলেন কী করে?

মোহনলালজি বললেন, ঠিক ওইসময় ইংরাজদের একজন দক্ষ শাসকের ওপর ভার পড়ে ঠগি দমনের। তাঁর নাম ছিল শ্লিম্যান।

তিনি সারা ভারতে জাল ফেলে ছেঁকে তোলেন ঠগিদের। তাদের ভেতর বহু ঠগিকে এই জব্বলপুরের জেলে আটক করা হয়েছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল সেইগুলো ইংরাজ সরকার নথিভুক্ত করে রেখেছিল।

আমার ওই ভাইটি তার প্রথম জীবনে ওইখানে কাজ করত। সে নথি ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওই পুরনো দিনের কাহিনীগুলো জানতে পারে।

কৃষ্ণগোপালের মালবাহক ওই 'তিলহাইয়া'দের জবানবন্দি থেকে নায়েব আর কৈকেয়ী দেবীর ষড়যন্ত্রের কথা জানা যায়।

এই সব তথ্য জানার পর আমার ভাইয়ের মনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। তার ধারণা হয়, তার দেহে পাপের রক্ত আছে। তাই সে তার পাপ ধুয়ে ফেলার জন্য বারে বারে ওই খরস্রোতা নর্মদার জলে ঝাঁপ দেয়। তার মনে হযেছে, এতে যদি তার মৃত্যুও হয় তা হলেও সে এ পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

সেদিন অনেক রাতে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে টাণ্ডায় ফিরে এসেছিল হরদয়াল।

দু'-চারদিনের ভেতরেই হরদয়ালের কাছে লোক পাঠালেন মোহনলালজি।

একটা নির্দিষ্ট দিনে তার নাচ-গানের দলটিকে নিয়ে আসতে হবে মোহনলালজির বাড়িতে।

যথাসময়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাজির হল হরদয়াল। সন্ধ্যা হতে না হতেই আলোর মালায় সেজে উঠল মোহনলালজির বাগান। গাছগুলোর ভেতর ঝলমল করতে লাগল নানা রঙের টুনিবালব্।

বড় বড় ফ্লাড লাইটের আলো চারদিক থেকে এসে পড়ছিল সবুজ ঘাসে ভরা জমিতে। ফোয়ারায় সৃষ্টি হচ্ছিল ইন্দ্রধনুর খেলা। এই মায়াময় পরিবেশে শুরু হয়ে গেল নাচগান।

যেন নন্দনকানন জুড়ে নাচছে দেবকন্যা, দেববালকেরা।

যন্ত্রসঙ্গীতে আর গানের সুরের মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস ঝংকৃত।

এবার শুধু গান-নাচ নয়, সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালার কিছু কিছু অংশ নাটকের ভেতর দিয়ে দেখানো হল।

দ্রৌপদীর অভিনয়, সীতার অভিনয় এমনকী অষ্টসখীর নাচে রাধার অভিনয় যে মেয়েটি করল সে একেবারে চমকে দিল শহরের বিশিষ্ট দর্শকদের। যেমন তার বাচনভঙ্গি, তেমনি তার মুখচোখের অভিব্যক্তি।

বানজারাদের মেয়েপুরুষ সুদর্শন কিন্তু এ মেয়েটি যেন অনন্যসাধারণ রূপ নিয়ে এসেছে।

কী করে এত অল্প বয়সে এমন দক্ষ অভিনেত্রীর মতো অভিনয় করে গেল মেয়েটি, তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্থির হয়ে সামনের দর্শক আসনে বসেছিলেন মোহনলালজির ভাই অরুণলালজি। সেই দেবকান্তি মানুষ যিনি নর্মদার জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন ঝুম্‌কিকে।

সেই একাদশবর্ষীয়া ঝুম্‌কিকে আর চেনাই যাচ্ছিল না।

নাচ, গান, অভিনয়ের শেষে দর্শকদের উচ্ছ্বাস যেন আর থামতেই চায় না। এক ঝাঁক উড়ন্ত পায়রার ডানার শব্দের মতো শ্রোতাদের করতালি ধ্বনি আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

মোহনলালজি বিদায়ের সময় হরদয়ালকে একান্তে ডেকে বললেন, তুমি একদিন একা ঝুম্‌কিকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসো। এমনি সন্ধ্যায় যে কোনওদিন এলেই আমাদের দেখা পেয়ে যাবে।

নমস্কার করে হরদয়াল সেদিন চলে এসেছিল কিন্তু দু'দিন পরেই কথা রেখেছিল সে। কেবল ঝুম্‌কিকে নিয়ে হাজির হয়েছিল মোহনলালজির সেই বাগানওয়ালা বাড়িতে।

সে রাতে এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যা কেউ আগে থেকে ভাবতে পারেনি।

মোহনলালজির সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে তাঁরই নির্দেশে ঝুম্‌কি গেল অরুণলালজির ঘরে।

সেই সবুজ আলোর মায়াময় ঘরে অপূর্ব সোনালি কাজ করা শ্বেতবসন পরে হাজির হল একাদশী দেবকন্যা ঝুম্‌কি।

সবে ধ্যান ভেঙে উন্মীলিত চোখে বসেছিলেন অরুণলালজি।

মেয়েটিকে দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক! কোথায় যেন একে দেখেছেন তিনি। সঠিক স্মরণে আসছে না।

তিনি নির্নিমেষ চেয়ে রইলেন এই দেবকন্যাটির দিকে।

একঝলক হাসি ছড়িয়ে মেয়েটি বলল, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি ঝুম্‌কি।

ভারি মিষ্টি গলা, তবু যেন স্মৃতিতে আনতে পারছেন না।

তুমিই তো আমাকে নর্মদার জল থেকে তুলে এনেছিলে। মনে নেই?

মুহূর্তে যেন সব মনে পড়ে গেল অরুণলালের, তুমি এত বড়টি হয়ে গেছ!

কেন, দু'দিন আগে তুমি আমাকে দেখোনি? আমি তোমাকে যে নাচ দেখিয়ে গেলাম।

সবই একে একে মনে পড়ে যাচ্ছে অরুণলালের।

তুমি বোসো মা বোসো, আমি তোমাকে দু'চোখ ভরে দেখি।

অসংকোচে তাঁর একবারে কাছে এগিয়ে এল ঝুম্‌কি। দুটো হাত ধরে বলল, তুমি এমন দুঃখী দুঃখী মুখ করে বসে থাকো কেন? তোমার কি কেউ নেই?

মাথা নেড়ে জানাল অরুণলাল, সত্যিই তাঁর কেউ নেই।

কেন, আমি তো রয়েছি।

চোখে-মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল অরুণলালের। তিনি বললেন, তুমি আমার কে?

আগে বলো, তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

রাখব।

সত্যিই রাখবে?

ঝুম্‌কির দুটো হাত ধরে মাথা নেড়ে অরুণলাল বললেন, রাখব, রাখব।

তুমি আর কোনওদিন নর্মদার কুণ্ডে ঝাঁপ দিতে পারবে না। কথা দাও।

কী এক আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তি আছে মেয়েটির ভেতর!

অরুণলাল স্তব্ধ হয়ে ঝুম্‌কির দিকে চেয়ে রইলেন।

একসময় বলে উঠলেন, তাই হবে মা, কথা দিচ্ছি।

ঝুম্‌কি তার কোমল হাত দিয়ে অরুণলালের খোলা বুকটা ছুঁয়ে দিল।

অরুণলালের মনে হল, জননী নর্মদা বালিকামূর্তিতে তাঁকে স্পর্শ করে আছেন।

চার

হর হর মহাদেও ধ্বনি দিতে দিতে হরদয়াল তার টান্ডা নিয়ে যাত্রা শুরু করল। এবার তারা যাবে খাজুরাহোর মন্দিরে কাণ্ডারিয়া মহাদেও দর্শনে। সেখান থেকে একেবারে চলে যাবে উত্তরপ্রদেশে। হরদয়াল ঠিকই খোঁজ রেখেছে, এবার কুম্ভমেলার স্নান, এলাহাবাদের ত্রিবেণী-সংগমে। সে তার দলবল নিয়ে যোগ দেবে সেই মেলায়। স্নান করবে পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীতে, যেখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী মিলিয়েছে তাদের পবিত্র ধারা।

এখন তারা চলেছে খাজুরাহোর পথে।

কয়েকদিন প্রায় একটানা পথ চলে ওরা এসে পৌঁছোল সাতনায়।

রাতে এসব অঞ্চলে দস্যু, তস্করের উপদ্রব। শ্লিম্যান সাহেবের কৃতিত্বে নিষ্ঠুরতম খুনির দল, ঠগিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও দস্যুরা এক একটা ঘাঁটি গেড়ে সমানে চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের লুণ্ঠন। তাই রাতে সজাগ থাকত হরদয়ালের টান্ডার পাহারাদাররা।

বানজারাদের সঙ্গে গোরুর পাল ছিল ঠিক কিন্তু লুটে নেবার মতো অর্থের সঞ্চয় ছিল না। এসব খবর ছিল দস্যু-তস্করের নখদর্পণে। তাই লুণ্ঠিত হওয়ার ভয় ছিল না তাদের।

কিন্তু একটা ভয় ছিল হরদয়ালের মনে। সে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে সংগ্রহ করেছিল অনেক তথ্য।

সমুদ্রের ধারে গোয়া বলে একটা নগর আছে, সেখানে সাদা চামড়ার বিদেশি মানুষরা শাসনের কাজ চালায়। তাদের নাকি বলে পর্তুগিজ।

ওরা বাংলাদেশের দক্ষিণ সমুদ্রতীরগুলো পালতোলা জাহাজে চড়ে চষে বেড়ায়। তলোয়ার

উঁচিয়ে ওরা সমুদ্র অথবা নদীতীরের হাটবাজারগুলোতে ঢুকে পড়ে। তাদের দেখলেই মানুষজন যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালাতে থাকে।

ওরা বেশ শক্তসমর্থ ছেলেমেয়েদের বেছে বেছে ধরে ফেলে। অনেক সময় ঘোড়ায় চড়ে আসে ওরা, ঘিরে ফেলে চারদিক। তখন আর পালাবার পথ থাকে না।

এরপর মোটা কাছি দিয়ে বেঁধে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে তোলে জাহাজের খোলে। সুযোগ পেলে ওরা যদি লড়াই চালায় তাই বড় নিষ্ঠুরের মতো তাদের হাতের চেটোতে বেতের ছিলা ঢুকিয়ে চার-পাঁচজনকে একসঙ্গে বন্দি করে রাখে। ছোট্ট ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো শুকনো ভাত।

বেশ কয়েকটা দিন এমনি কষ্টে ওদের কাটাতে হয়। তারপর গোয়ায় পৌঁছে ওদের বিক্রি করে দেওয়া হয় দাসদাসীর হাটে।

কেবল সমুদ্র বা নদীতীরের বাজারহাট থেকেই নয়, সারা দেশে ছড়িয়ে আছে ওদের আড়কাঠিরা।

তারা নানা কৌশলে ফাঁদ পেতে ভাল ভাল সব ছেলেমেয়েদের যোগাড় করে ওই দাসদাসীর হাটে চালান করে দেয়।

কোনও মেয়ে ঘর সাজানোর কাজে নিপুণ, আবার কেউ বা আচার তৈরি কিংবা ছুঁচ সুতোর কাজে দক্ষ। কেউ বা নাচে গানে ওস্তাদ।

আর ঠিক এইখানেই ভয় হরদয়ালের। তারা রাজপুত অর্থাৎ চারণ-বানজারা। তাদের দলের ছেলেমেয়েরা মাতিয়ে দিতে পারে একটা মস্ত বড় আসর।

তাই বিশেষ করে মেয়েদের পাহারা দিয়ে রাখতে হয় রাতের বেলা। আচমকা কোনও লুঠেরা এসে যেন লুঠ করে না নিয়ে যেতে পারে মেয়েদের।

ওরা একদিন পথ চলতে চলতে এসে পৌঁছল খাজুরাহোতে। কোনওরকম অঘটন ঘটল না পথে।

একেবারে মন্দিরের কাছেপিঠে লোকালয় খুব কম। বিশেষ কোনও একটি উৎসব বলে দূর দূর থেকে মানুষজন আসছে কাণ্ডারিয়া মহাদেও দর্শনে। দুধ ঢেলে স্নান করাবে শিবকে। তারপর পূজা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে ঘরে ফিরবে।

হরদয়ালের টাণ্ডা মন্দির থেকে সামান্য দূরে চার-পাঁচ দিনের জন্য তাদের আস্তানা গাড়ল।

কৃষ্ণা চতুর্দশীর ক্ষীণ চন্দ্র কাণ্ডারিয়া মহাদেও-এর মন্দির চূড়ায় দেখা গেল শিবের ললাটে শশাঙ্ক-লেখার মতো।

ঝুমকির বিস্ময় যেন আর ধরে না। সে তার সঙ্গী মেয়েদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল সারা মন্দির।

নাচের মূর্তিগুলোর কাছে গিয়ে সে তেমনি বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার হাতের মুদ্রা, পায়ের কাজ আর শরীরের ভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে যায় তার সঙ্গীসাথীরা।

ঝুমকির মনে হয়, মন্দির থেকে তুলে নেওয়া এইসব ভঙ্গিগুলোকে সে তাদের নাচের ভেতর যোগ করে দিতে পারবে।

তার নাচের গুরু রূপমতীকে সে তার মনের কথা জানায়।

রূপমতী তাকে নিরাশ করে না, বরং তার এই নতুন প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায়। সে তালি

দিয়ে গান গায়, ঝুম্‌কি ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে নতুন পাওয়া মুদ্রাগুলি যোগ করে। তালের সঙ্গে সেগুলিকে মিলিয়ে নেয় সঠিকভাবে।

শেষবেলা নাচে ওরা, করতালি দেয় দর্শকেরা।

উৎসবের শেষ সন্ধ্যায় মন্দির সুসজ্জিত হয়েছে সহস্র সহস্র দীপালোকে।

সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে জ্বলছে বিরাট আকৃতিবিশিষ্ট মশাল। আলোয় ভরে গেছে প্রাঙ্গণ।

আজ বানজারাদের শেষ নৃত্যানুষ্ঠানে হর-পার্বতীর বিবাহ-উৎসব এবং সমাপ্তিতে শঙ্কর-পার্বতীর যুগল নৃত্যানুষ্ঠান হবে।

অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে বসে আছে দর্শকেরা।

গতকাল হোলি-নৃত্যে ঝুম্‌কি রাধা সেজে এমন অপূর্ব নাচ নেচেছিল যে, এ অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিনদার প্রত্যেক নর্তকীকে দিয়েছিলেন একটি করে সোনার মোহর। আর রাধার ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় ও নৃত্যকুশলতা দেখানোর জন্যে ঝুম্‌কিকে দিয়েছিলেন সোনার ফুলের ওপর হিরে গাঁথা হার।

হইচই পড়ে গিয়েছিল কেবল বানজারাদের ভেতরেই নয়, উপস্থিত দর্শকেরা একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

জমিনদার বাহাদুর তাঁর চেলাদের মুখে খবরটা পেয়েছেন মাত্র তিনদিন আগে। এই তিনদিনই তিনি দলবলসহ এসেছেন ঘোড়ায় চড়ে।

অনুষ্ঠানের সময় একবারও তাঁকে এদিকে-ওদিকে চোখ ফেরাতে দেখা যায়নি। তাঁর দৃষ্টি যেন আঠার মতো আটকে ছিল নর্তকীদের লীলার মধ্যে।

আজও তিনি এসেছেন, কিন্তু আসন নিয়েছেন শেষের সারিতে।

হরদয়াল হাত জোড় করে তাঁর কাছে গিয়ে সামনের আসনে বসার অনুরোধ জানিয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন হাসিমুখে হাত ওপরে তুলে।

হঠাৎ অনুষ্ঠানের মাঝেই একটা কোলাহল শোনা গেল। প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম থেকে ভেসে আসছিল সে শব্দ।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা সে আওয়াজ ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

দূর দূর অঞ্চল থেকে যারা এসেছিল তারা কীসের যেন গন্ধ পেয়ে পালাতে লাগল।

মেয়েরা সচকিত। তাদের নাচ থেমে গেছে। ভয়মেশানো একটা বিস্ময় খেলা করছে তাদের চোখে-মুখে।

উঠে দাঁড়িয়েছেন জমিনদার বাহাদুর। হাতের ইঙ্গিত করতেই বানজারাদের ঘিরে দাঁড়াল দু'-চারজন লেঠেল আর বন্দুকধারী। বাকিরা সব শব্দ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

তখন মন্দিরপ্রাঙ্গণে ওই বানজারার দল ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না।

জমিনদার অভয় দিয়ে বললেন, তোমরা কোথাও নড়বে না, আমার লোক চলে গেছে ডাকাতদের শায়েস্তা করার জন্যে।

তিনি আরও বললেন, কাল যে মেয়েটি রাধা সেজেছিল, আজ সে সেজেছে পার্বতী। ইতিমধ্যে তাকে হিরের হার উপহার দেওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। মেয়েটি ওই হার পরেই হরপার্বতীর মিলনবাসরে উপস্থিত হয়েছে।

আজ মন্দির প্রাঙ্গণে শেষ অনুষ্ঠান—এ খবর এ অঞ্চলের সব ডাকাত-সর্দারই জানে। তাদেরই কেনও দল এই হারটা লুঠে নেবার জন্যে এগিয়ে আসছে।

কথা শুনে ব্রিজলাল, সুখলাল, তোপ সিং, হরদয়াল—সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল।

মন্দির-প্রাঙ্গণের অল্প দূরেই ওদের টান্ডা। সেখানে গোরুগুলোই কেবল শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে।

শুধু দুটো কুকুর পাহারা দিচ্ছে পুরো টান্ডা।

আজ সবাই চলে এসেছে শেষ অনুষ্ঠানটি দেখার জন্যে।

মন্দিরে কিন্তু বানজারারা তাদের বর্শা আনেনি। তারা জানে, এখানে কাণ্ডারিয়া মহাদেওই তাদের রক্ষক।

এই অবস্থায় তারা বিচলিত হয়ে উঠল।

কিন্তু দূরে ঠকাঠক লাঠির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

হঠাৎ বন্দুকের থেকে দু'-চারটে গুলির আওয়াজও বেরিয়ে এল।

জমিনদার তাঁর এক তরুণ ঘোড়সওয়ারকে হাঁক দিয়ে কাছে ডাকলেন। সে ঘোড়া থেকে নেমে সেলাম করে দাঁড়াল।

বছর কুড়ি বয়সের এক তরুণ যুবা পুরুষ।

জমিনদার বাহাদুর বেশ চড়া গলায় আদেশ করলেন, প্রীতম, তুমি এই মুহূর্তে ওই হিরের হার পরা মেয়েটিকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে খোয়াইয়ের পথ ধরে আমার কোঠিতে চলে যাও। আমি বাকি সবাইকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় যাচ্ছি।

তখন কারও কোনও কথা বলার বা বিবেচনা করার অবস্থা ছিল না। সমস্ত দলটা জমিনদার বাহাদুরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

ঠিক সেই অবস্থায় আবার কতকগুলো গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

একজন লোক সঙ্গে সঙ্গে জমিনদার বাহাদুরের ঘোড়াটা এনে দিল। তিনি ঘোড়াতে উঠে বললেন, তোমরা সকলে আমার পেছনে পেছনে চলে এসো।

ঘোড়ার সহিস প্রাঙ্গণের তিনটে বড় বড় মশাল নিভিয়ে দিয়ে চতুর্থটি নিয়ে আগে আগে চলল। ইতিমধ্যে জমিনদার বাহাদুরের নির্দেশে সে একটা বন্দুক তাঁর হাতে তুলে দিল।

আগে আগে মশাল চলেছে। পেছনে ঘোড়ার ওপর জমিদার বাহাদুর। তার পেছনে সারি দিয়ে চলেছে হতবুদ্ধি, নির্বাক বানজারার দল। তারা বুঝে গেছে এই মুহূর্তে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

তারা মশালের আলোয় অনেকখানি পথ হেঁটে চলে এল।

এসে পড়ল সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা এক পরিবেশে।

ইতিমধ্যে গোলমালের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। গুলির শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

জমিনদার বাহাদুর বললেন, এই গাছতলায় তোমরা বিশ্রাম করো, আমার লেঠেল আর বন্দুকধারীরা মনে হয় ডাকাতদের হটিয়ে দিয়েছে। আমি অবস্থাটা বুঝে নেবার জন্যে লড়াইয়ের জায়গায় যাচ্ছি, পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

পান্নাবাই কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমার মেয়েটা?

ওর জন্যে ভাবনা কী! নিরাপদ জায়গায় ওকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

অন্ধকারে মুখ বুজে চুপ করে বসে রইল বানজারার দল। তাদের এই পরিস্থিতিতে করার কিছুই ছিল না।

রাত তখন কত বোঝা যাচ্ছিল না। নিদ্রাহীন চোখে কেউ বা তাকিয়েছিল অন্ধকার চরাচরের দিকে, কেউ বা লক্ষ করছিল জ্বলজ্বল চোখে চেয়ে থাকা আকাশের অগণিত নক্ষত্রগুলোকে।

হঠাৎ দ্রুত পায়ের সাড়া পেয়ে হরদয়াল চেঁচিয়ে উঠল, কে?

উদ্বেগ-আকুল গলার স্বর ভেসে এল, আমি ঝুম্‌কি বাবুজি।

ততক্ষণে সকলে অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে উঠেছে।

কেঁদে উঠল পান্নাবাই। অন্ধকারে দু'হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, তুই কোথায়?

ঝুম্‌কি অনুমান করে মায়ের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

একটু পরে মায়ের বাঁধন ছাড়িয়ে নিয়ে ঝুম্‌কি চেঁচিয়ে বলল, যে আমাকে মন্দির থেকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল, সেই ঘোড়সওয়ার প্রীতম আমাকে এখানে সঙ্গে করে এনেছে। এখুনি আমাদের সবাইকে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে হবে।

হরদয়াল বলে উঠল, এ অন্ধকারে কোথায় যাব?

প্রীতমই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বাবুজি।

সুখলাল বলল, কিন্তু আমাদের টান্ডায় যে খাবারদাবার, অস্ত্রশস্ত্র, গোরুবাছুর রয়েছে, সেগুলো ফেলে যাব কী করে? আর কেনই বা যাব? জমিনদার বাহাদুর তো আমাদের আশ্বাস দিয়ে গেছেন।

ঝুম্‌কি চেঁচিয়ে উঠল, ও জমিনদার নয়, আস্ত একটা রাক্ষস। ওর নিজের দলের লোকেরাই মিছিমিছি লড়াইয়ের অভিনয় করেছে তোমাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে। তার নাচঘরে আমাকে নাচওয়ালি করে রাখবার মতলব ছিল।

হরদয়াল আকুল হয়ে বলল, তুই এসব কথা জানলি কী করে বেটি?

এই প্রীতমই আমাকে সব কথা জানিয়ে দিয়েছে।

আমাদের নাচ আর অভিনয় দেখে প্রীতম ভাইয়ার বড় ভাল লেগে গিয়েছিল, তাই আমার কোনও ক্ষতি হোক সে তা চায়নি। জমিনদারের সব পরিকল্পনার কথা সে জানত। এই রাতেই হয়তো সেই পাষণ্ড আমাদের আক্রমণ করার জন্য এসে পৌঁছোবে। প্রীতম ভাই আমাকে অনেক কৌশলে উদ্ধার করে এনেছে। এখন সব উঠে পড়ো, পথ চলতে চলতে সব কথা হবে।

ব্রিজলাল বলল, গোরু আর খাবারগুলো?

প্রাণটা আগে চাচাজি, গোরুগুলো চরে খেতে পারবে। আর প্রাণে বাঁচলে আমরা ঠিক খাবার জোগাড় করে নিতে পারব।

শব্দ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল প্রীতম, সেই শব্দ অনুসরণ করে পুরো দলটা এগিয়ে চলল।

সারারাত চলে তারা পৌঁছে গেল একটা নিরাপদ দূরত্বে। এবার একটা খোয়াইয়ের মধ্যে তারা আত্মগোপন করে রইল।

অল্প পরেই ফুটে উঠল ভোরের আলো। দূরে দেখা গেল একটা উঁচু পাড়ওয়ালা পুকুর।

প্রীতম বলল, তোমরা ওই পুকুরের পাড়ে গাছের তলায় নির্ভয়ে বিশ্রাম করতে পারো। আমি তোমাদের সকলের খাবার ব্যবস্থা করছি।

অদূরেই ডানদিকে জনপদ দেখা যাচ্ছিল। প্রীতম আরও তিন-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে আহারের সন্ধানে সেদিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে।

পুকুরের পাড়ে বিশাল বটগাছের তলায় মেয়েরা রান্নার আয়োজন করতে লাগল।

সেখানেই ঝুম্‌কির মুখ থেকে ওরা শুনল প্রীতমের পরিকল্পনার কথা।

জমিনদারের নির্দেশ ছিল, প্রীতম ঝুম্‌কিকে নিয়ে তার খড়ের চালওয়ালা একটা কোঠিবাড়িতে বন্ধ করে রাখবে, যাতে কোতোয়াল খবর পেলেও তার সন্ধান না পায়।

সেই খড়ের চালওয়ালা, মাচানে শুকনো কাঠভরতি ঘরটাতে আগুন লাগিয়ে ও একেবারে ছাই করে দিয়েছে। আমি ওই হিরের হারটাকে ওখানেই ফেলে দিয়ে এসেছি যাতে জমিনদার বুঝতে পারে আমরা দু'জনেই হঠাৎ লাগা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছি।

আশ্চর্য! যে-সব বানজারা নর্তকীদের ওই জমিনদার এক একটা করে মোহর দিয়েছিল তারা ওগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিল পুষ্করিণীর জলে।

বানজারার দল খুশিই হল, ওই মোহরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ায়।

পাঁচ

সব পথই এখন চলেছে ত্রিবেণীসঙ্গমে। কাতারে কাতারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসছে মানুষজন কুম্ভমেলায় পুণ্যস্নান করতে।

বিশাল জায়গা জুড়ে কুরুক্ষেত্রের রণভূমির মতো পড়ে গেছে সারি সারি তাঁবু। এক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক এক একটি তাঁবুতে তাদের ধর্মীয় আসর জমিয়েছে।

ওরা একটা বিশেষ জায়গা নির্বাচন করে ওদের থাকার ব্যবস্থা করল।

অনেকটা অর্থই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল প্রীতম। তা ছাড়া হরদয়ালের কাছেও ছানা আর ঘি বিক্রির বেশ কিছু টাকা ছিল।

এই টাকা দিয়ে প্রথমেই তারা একটা সাধারণ রকমের তাঁবু কিনে নিল। বাকি টাকায় মজুত করল কয়েক দিনের মতো প্রয়োজনীয় খাদ্য।

তা ছাড়া বহু সংস্থা সেবাব্রতের ঢালাও ব্যবস্থা রেখেছে। সেখানে গিয়েও তারা আহার সংগ্রহ করতে লাগল মাঝে মাঝে।

এবার তারা সুযোগ-সুবিধেমতো ধর্মীয় পালাগানের আসর বসাল। তাদের চমৎকার গান আর অভিনয়ে জমে উঠল আসর। পেলা দিতে লাগল কুম্ভমেলার যাত্রীরা।

কয়েকটি দিন বেশ উন্মাদনায় কাটল। লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে তারাও পুণ্যস্নান করল ত্রিবেণীতে। একদিন সমাপ্তি ঘটল মেলার। কিন্তু শেষ হল না বানজারাদের নাচগান আর অভিনয়। কারণ তাদের এখন প্রচুর টাকার দরকার নতুন করে টান্ডা গড়ার জন্য।

শহরের প্রতিটা বাড়িতে তারা নাচগানের দল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বড় বড় বাড়িতে নাচগানের আসর বসিয়ে তাদের রোজগারও হতে লাগল আশাতীত।

তিন-চার মাসের ভেতরেই ওরা কিনল একটি 'নন্দী বইল'। সঙ্গে দুগ্ধবতী একটি গাইগোরু। নায়েক হরদয়ালের একটা বর্শা নইলে বানজারাদের সর্দার বলে মানায় না। তাই টান্ডার সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু তার জন্যেই কেনা হয়েছে ওই বর্শাটি।

এখন সুসজ্জিত ও চিত্রিত 'নন্দী বইল'টির সঙ্গে চলে চোমরানো গোঁফওয়ালা হরদয়াল, তার লাল পাগড়ি আর বিচিত্র পোশাক পরে। কাঁধে ঠেকানো থাকে তার লম্বা বর্শাখানা।

ধীরে ধীরে ভাঙা টান্ডা গড়ে উঠেছে। কিন্তু মনে শান্তি নেই কারও, কারণ বানজারারা ভবঘুরের জাত। এক জায়গায় ঠাঁই গেড়ে থাকা তাদের স্বভাবই নয়। কেবল অর্থাগম হচ্ছে, তাই এখানে এতদিন থেকে যাওয়া।

একটা বাড়িতে এখনও ওরা ঢুকতে পারেনি। বাড়িটা পেল্লাই। সবাই খুব নাম করে। জব্বলপুরের বাড়ির চেয়েও এ বাড়ি অনেকটাই বড়। লোকে বলে, 'মিত্রমহল'।

অনেকদিন ও বাড়ির সামনে দিয়ে ওরা গেছে, কিন্তু একটি ছাড়া দ্বিতীয় মুখ দেখা যায়নি। সে মুখ, বাড়ির দরোয়ানের। সামনের লনের কোনায় দরোয়ানের ঘর। সে একাই থাকে।

ওই নেপালি দরোয়ানটির মুখ থেকেই ওরা শুনেছে, বাবুরা সব ছেলেপুলেদের নিয়ে তীর্থভ্রমণে গেছেন। কুম্ভমেলার পরে গঙ্গোত্রীতে স্নান করার জন্যে চলে গেছেন তাঁরা।

ওরা জিজ্ঞেস করেছিল একদিন, বাবুরা কবে ফিরবেন?

দরোয়ান বলেছিল, পুজোর আগে ওনাদের ফিরতেই হবে। শহরে এত বড় পুজো নাকি আর দেখা যায় না।

ওরা সেই আশাতেই বুক বেঁধে আছে। পু'জোর সময় কটা দিন যদি এই বাড়িতে আসর জমাতে পারে। আশা, বেশ কিছু রোজগারের। তারপরই ওরা এলাহাবাদের এই আস্তানা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবে।

দেখতে দেখতে আকাশ নীল হয়ে গেল। থমকে আছে গগনের গায় সাদা তুলোর মতো দু'খণ্ড মেঘ। শহরের একটু বাইরে গেলে কখনও বা বাতাসে ভেসে আসে নীলকণ্ঠ পাখির ডাক। নীল ডানা ছড়িয়ে পাখিটা অনেক ওপরে উঠে যায়। মনে হয় কাকে যেন আসার জন্যে আকুল হয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

একদিন 'মিত্রমহলে'র পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওরা দেখল, সিংহদরজাটা হাট করে খোলা। ভেতরে দোতলা বাড়ির সবকটা জানালাই খোলা হয়ে গেছে।

নতুন পোশাক পরে বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল দরোয়ান। তাকে জিগ্যেস করে বানজারারা জানল, তীর্থ করে মিত্রবাবুরা সবাই ক'দিন হল ফিরে এসেছেন। এবার নাকি পুজোর বাজনা বাজবে। ইতিমধ্যে শহরের এদিক ওদিক থেকে ঢাকের বাদ্যি শোনা যাচ্ছে। মিত্রবাড়িতেও শুরু হবে বাজনা।

ইতিমধ্যেই দরোয়ানজির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছিল ওরা। সেই সূত্র ধরে একদিন বড়কর্তার বৈঠকখানায় ঢোকার অনুমতি পেল।

বেশ রাশভারী লোক মিত্রমশায়।

কী চাই তোমাদের?

হুজুর, আমরা বানজারা। উৎসব বাড়িতে আমরা নাচগান করে বেড়াই। যাঁরা চান তাঁদের আমরা পালাগান অভিনয় করে দেখাই। হুজুরের অনুমতি মিললে ...।

মিত্রমশায় বললেন, ষষ্ঠীর সন্ধেবেলা, সপ্তমীতে রাত দশটার পর আর একাদশীর দিন সন্ধ্যায় তোমরা অনুষ্ঠান করতে পারো। তা তোমাদের নাচগান কত সময় ধরে চলবে?

আপনারা যতটুকু সময় দেবেন হুজুর। আমাদের ছেলেমেয়েরাই নাচবে, গাইবে, অভিনয় করে দেখাবে।

বেশ, ষষ্ঠীর দিন এসো তোমরা সকলে।

চলে আসার সময় আবার বললেন, পুজোর ক'টা দিন এখানেই তোমাদের পাত পড়বে।

হরদয়াল সেলাম জানিয়ে বলল, হুজুরের যেমন মর্জি।

ষষ্ঠীর দিন আসর জমিয়ে দিল বানজারার দল। আত্মীয়স্বজন আর শহরের বন্ধুবান্ধবে 'মিত্রমহল' একেবারে সরগরম।

প্রথম দিন ওরা শুধু নাচগান করে দেখাল। দেবীবরণের গান গাইল ওরা। ঘুরেফিরে নাচল ছেলেমেয়েরা। ওদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল নাচের ভারী উপযোগী। ঘুঙুর বাজিয়ে, ঘাগরায় ঘুর্ণি তুলে, ওড়না উড়িয়ে সে কী রংবাহারি নাচ আর গান!

দর্শকদের হাততালি পেল ঘন ঘন, কারণ বানজারাদের নাচ এখানকার দর্শকরা আগে বড় একটা দেখেনি। অবশ্য দু'-চারজন বাঙালি ইতিমধ্যে কোনও কোনও বাড়িতে গিয়ে দু'-একবার ওদের নাচ দেখেছে। কিন্তু এখানে যেন আলাদা মাত্রা পেয়েছে ওদের নাচ। আলোর খেলায় নাচের আসরে যেন ইন্দ্রপুরীর ছোঁয়া।

দুর্গা-উৎসবে বানজারাদের নাচের দল পরিবেশন করে 'টিপরি নৃত্য'। কাঠিতে কাঠি বাজিয়ে ওরা ঘুরে ঘুরে নাচে আর গান গায়। মাঝে মাঝে জয় হো, জয় হো বলে ধ্বনি দেয় মা দুর্গার।

প্রথমেই আসরে গণপতি-বন্দনা করে ওরা।

'জয় গণপতি, স্বামী গণপতি, তু ঘন নীলা ...'

হে গণপতি, তোমার বর্ণ নীল। তুমি শুণ্ডধারী। তোমরা জয় হোক। আমরা পূজার পবিত্র দীপ জ্বেলে তোমার আরতি করছি।

আবার দশেরার দিনে বানজারার দল গায় জননী জগদম্বার স্তুতি গান।

'জে জে জগদম্বাদেবী ইয়েদি বাঘেপর সভার বেগি...'

হে দেবী মাতা জগদম্বা, তুমি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে এসেছ। তোমার হাতে রয়েছে চাবুক। কৃপা করে মা সবাইকে আনন্দ বিলিয়ে দাও। আমাদের ধেনুগুলির বৃদ্ধি সাধন করো। সম্পন্ন করো মা আমাদের। জীবনে জয় এনে দাও। আমাদের খাদ্যবস্তুর যেন অভাব না হয় কোনওদিন। পূর্ণ করো মা আমাদের সকলের আশা। তোমার নাম, যশ আর পূজা প্রচারিত হোক দিকে দিকে।

ষষ্ঠীর দিন সামিয়ানার তলায় সাজানো আসরে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে বসে গৃহস্বামী রাধাবল্লভ মিত্র বানজারাদের নাচগান উপভোগ করলেন। ঘন ঘন বাহবা দিলেন সবার সঙ্গে।

মণ্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়ে যে কিশোরী মেয়েটি নাচছিল, সে যেন সবার থেকে আলাদা। সত্যি, চোখে পড়ার মতো রূপ তার। নাচে আর গানে তার দক্ষতা, সবার থেকে আলাদা করে চেনায় তাকে।

মেয়েটি মণ্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়ে রাজপুতানি নর্তকীদের মতো ঈষৎ বেঁকে ঘাগরা ঘোরাতে ঘোরাতে যখন নাচছিল তখন উল্লাস আর করতালির ধ্বনিতে মেতে উঠেছিল আসর।

নাচের শেষে রাধাবল্লভ সেদিনের জন্য হরদয়ালকে এক হাজার টাকা দিলেন। আলাদা করে ঝুম্‌কির হাতে দিলেন আরও পাঁচশো টাকা। বললেন, তোমরা সবাই কিছু কিনে খেয়ো।

তারপর আবার বললেন, পুজোর কদিন তোমরা কিন্তু এখানেই খাবে। হরদয়ালকে আমি বলে রেখেছি।

বারো মাসে তেরো পার্বণে 'মিত্রমহল' যখন আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব সমাগমে কলরবে মুখরিত হয় তখন বুকের ভেতর এক ধরনের শূন্যতা বোধ করেন রাধাবল্লভ মিত্র।

এলাহাবাদের অন্যতম বিজনেস ম্যাগনেট হিসেবে তিনি সমস্ত মহলেই পরিচিত। ইদানিং সব কিছু দায়িত্ব একমাত্র পুত্র অর্ণবের ওপর সঁপে দিয়ে নিজেকে বেশ খানিকটা ভারমুক্ত করে নিয়েছেন।

কিন্তু তবুও এড়াতে পারছেন না মনের গুরুভার। পুত্র অর্ণবের পর কী হবে এই বিশাল সাম্রাজ্যের! তৃতীয় কোনও উত্তরাধিকারীর সন্ধান 'মিত্রমহলে' এখনও পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যৎ পরিণতির শোক পাষাণভারের মতো চেপে আছে তাঁর বুকে।

তবু মিত্র বংশের ঐতিহ্যরক্ষায় এতটুকু ভাঁটা পড়ে, তা তিনি চান না।

রাত সাড়ে এগারোটার পর সামান্য অবসর মিলেছে এ বাড়ির বধূর।

যষ্ঠীর দিনে হাঙ্গামা কম তাই আত্মীয়-স্বজনের সেবাযত্ন শেষ হয়ে গেছে এগারোটার ভেতর।

এখন একটু ফুরসুত পেয়ে খাস পরিচারিকা সরমাকে নিয়ে বউরানি উঠে এসেছেন ছাদ সংলগ্ন চিলেকোঠায়। কেশ পরিচর্যার অবকাশ জুটেছে প্রায় এই মাঝরাতে।

চুলে চিরুনির টান দিতে দিতে সরমা বলল, আজ ভারী সুন্দরী একটা মেয়েকে দেখলাম বউরানি।

কোথায় রে?

বানজারাদের নাচ হচ্ছিল যেখানে।

তাই!

ছোটমুখে একটা বড় কথা বলব বউরানি।

কী বলতে চাস বল না।

ঠিক তোমার মতন সুন্দর দেখতে।

হেসে উঠলেন অর্ণব মিত্রের স্ত্রী। বললেন, হ্যাঁরে, যেখানে যত সুন্দরী দেখিস, অমনি আমার কথা মনে পড়ে যায়?

সে কথা নয় বউরানি, এ মেয়েটাকে দেখতে অবিকল তোমার মতো। এমনি টানা টানা চোখ, টিকোলো নাক, থুতনির কাছে চাপা। গায়ের রং গয়নার রঙের মতো।

তুই এতও মিল খুঁজে খুঁজে বলতে পারিস বটে সরমা।

একবার হেসেছিল, গালে ঠিক তোমার মতো টোল পড়ল। বিশ্বাস না হয় আমার কথা, কাল একবার নিজের চোখে দেখোই না।

বউরানি হেসে বললেন, আচ্ছা সে দেখা যাবে'খন।

পরের দিন নাচের সময় সামান্য ফাঁক খুঁজে বউরানি নাচের আসরে মেয়েটিকে দেখলেন।

একঝলক দেখে নিয়ে মনে হলো, সরমা খুব একটা ভুল বলেনি। বেশ খানিকটা মিল আছে তাঁর সঙ্গে। হয়তো তাঁর দশ-বারো বছর বয়সে তোলা ফোটোর সঙ্গে মেলালে মিলটা আরও বেশি করে চোখে পড়বে।

সরমা পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল, দেখলে বউরানি?

কাল সকালে জল খাওয়ার পর তুই ওকে একবার নিয়ে আসিস তো আমার ঘরে। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। শুধু ওকে বলবি, বউরানি ডাকছে।

পরের দিন ঠিক ন'টা নাগাদ সরমা ওকে বউরানির ঘরে এনে হাজির করল।

বারমহল থেকে অন্দরমহলে ঢোকার পর যে বারান্দা, সেখানে সারি সারি ঝুলছে অজস্র খাঁচা। তাতে নানা রঙের, নানা জাতের পাখি।

বউরানির ঘরে ঢোকার মুখে খাঁচায় বন্দি কাকাতুয়াটা বলে উঠল, এসো এসো।

বউরানি ঘরের ভেতর থেকে বুঝলেন, যাকে চেয়েছিলেন, তাকে নিয়েই হয়তো সরমা আসছে।

সত্যিই সরমার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল মেয়েটি।

মুখোমুখি থমকে দাঁড়াল দু'জনে। যেন দু'জনে দেখছে দু'জনের প্রতিবিম্ব।

চমকে ওঠারই কথা, এত মিল হতে পারে! যদিও দু'জনের পোশাকে অনেক গরমিল

কী নাম তোমার?

ঝুম্‌কি তুনওয়ার।

একটু থমকে গেলেন বউরানি।

তোমার বাবার নাম?

হরদয়াল তুনওয়ার।

বউরানি আবার জিগ্যেস করলেন, সঙ্গে তোমার মা এসেছে?

হ্যাঁ মেমসাব। জলখাবার খেয়ে টান্ডায় ফিরে গেছে।

আবার প্রশ্ন, তোমরা ক'ভাইবোন।

আমি একাই।

এবার মেয়েটি ভারী মিষ্টি হেসে বলল, দলে আমরা অনেকগুলো ভাইবোন আছি।

বউরানি বললেন, তুমি এখানে বোসো মা, আমি আসছি।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বউরানি অদ্ভুত চোখে তাকালেন সরমার দিকে।

বললেন, আমার সঙ্গে শুধু মুখের মিল নয় রে, নামটা শুনেছিস?

হ্যাঁ বউরানি, ঝুম্‌কি।

আনমনে বউরানি বললেন, সবদিক থেকেই কী অদ্ভুত মিল!

সরমা শেষ কথাটার তাৎপর্য বুঝল না। হঠাৎ বউরানি বললেন, সরমা তুই দেখে আয় তো, ওর বাঁ কানের নীচে একটা কালো জড়ুল আছে কিনা?

সরমা ঘরে ঢুকে গেল।

মেয়েটি তখন নিবিষ্ট হয়ে ঘরের দেওয়ালে চিপানডেলের ভেতর বোতলে রাখা একটা পুতুলের দিকে তাকিয়েছিল।

সেই সুযোগে সরমা তার কানের তলায় কালো জড়ুলটি দেখে নিল।

ঘরের বাইরে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, অবাক ব্যাপার! ঠিক ধরেছ তুমি!

এবার বউরানি স্বয়ং ঢুকে এলেন ঘরে।

পায়ের সাড়া পেয়ে মেয়েটি ফিরে তাকাল। তার মুখ চোখ কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতো মনে হচ্ছিল।

সে হঠাৎ বলে উঠল, এই বোতলের ভেতর রাখা সাহেব-মেম নাচে না?

বউরানি এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, নাচে বই কী।

বলেই তিনি এগিয়ে গিয়ে স্প্রিংয়ে দম দিয়ে দিলেন।

অমনি ঘুরে ঘুরে নাচ শুরু করে দিল সাহেব-মেম।

মেয়েটি হাঁটু গেড়ে বসে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল।

একসময় মুখ ফিরিয়ে বলল, বাজনা বাজছে না কেন?

ওটা খারাপ হয়ে গেছে।

তারপর আবার বললেন, তুমি এ পুতুল আগে দেখেছ?

মেয়েটা কেমন যেন ঘোরের ভেতর থেকে বলল, দেখেছি।

কোথায়?

এখানে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটা শুনতে পেল, সারা ঘর ভরে উঠেছে পিয়ানোর মিষ্টি বাজনায়।

অদ্ভুত এক আবেগে বউরানি জড়িয়ে ধরলেন মেয়েটিকে। চোখ দিয়ে ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু। নিজে আবেগকে কোনওরকমে সামলে নিয়ে সরমাকে বললেন, তুই এর সঙ্গে কথা বল, আমি এখুনি আসছি।

অর্ণবকে খোঁজ করে বউরানি টেনে আনলেন নিভৃতে, খুলে বললেন সব কথা।

আড়াল থেকে অর্ণব মেয়েটিকে দেখে গেলেন। তার ছায়া পড়েছিল পাশের টেবিল-মিররে। একেবারে বধূ শর্মিলার যেন কিশোরী মূর্তিটি।

অর্ণব সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন বাবার কাছে। নির্ভৃতে রাধাবল্লভের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর আলোচনা হল।

উত্তেজিত রাধাবল্লভ বললেন, পুলিশে খবর দাও।

অর্ণব বললেন, বাবা, উত্তেজিত হবেন না, হরদয়ালকে আগে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

লোক পাঠিয়ে হরদয়ালকে ডেকে আনা হল একটা নিভৃত ঘরে।

কথার ভেতর বোঝা গেল হরদয়াল বেশ সহজ সরল মানুষ। সে কিন্তু কোনও কথা গোপন করল না। বনের মধ্যে ঝুম্‌কিকে পাওয়ার পর থেকে সব ঘটনাই সে একে একে বলে গেল।

কথাগুলো বলছিল সে হাতজোড় করে। গাল বেয়ে দরদর করে বয়ে যাচ্ছিল চোখের জল। শেষে কান্নাভেজা গলায় বলল, পান্নাবাই ওকে বুকে করে মানুষ করেছে; সে এ আঘাত সইতে পারবে না। আমি চুরি করিনি হুজুর, ভগবানই আমাকে ওর ভার বইতে দিয়েছিলেন। আজ ভগবানই আমাদের বুক থেকে ওকে ফিরিয়ে নিলেন।

রাধাবল্লভ বললেন, তোমরা যে আমাদের মেয়েকে প্রতিপালন করেছ, তার জন্য যত অর্থ চাই আমি দেব।

হরদয়াল বলল, টান্ডায় আমাকে খবরটা দিতে দিন হুজুর। আপনাদের মেয়েকে আপনারা রেখে দিন।

হরদয়াল চলে গেল।

সন্ধ্যার মুখে ফিরে এসে বলল, খবরটা শুনে পান্নাবাই মূর্ছা গিয়েছিল। মূর্ছা ভেঙে এখন বোবার মতো বসে আছে। এই অবস্থায় আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টান্ডা নিয়ে এলাহাবাদ ছেড়ে চলে যেতে চাই।

রাধাবল্লভ বললেন, এ আনন্দ-মুহূর্তে আমরা যে তোমাদের বেশি করে চাই হরদয়াল।

হাতজোড় করে হরদয়াল বলল, টান্ডার সকলেই এ খবর শুনে একেবারে ভেঙে পড়েছে হুজুর। ওদের এখান থেকে যত সত্বর পারি সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ঝুম্‌কি ওদের প্রাণ।

রাধাবল্লভের ইঙ্গিতে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা নোটের বান্ডিল নিয়ে এলেন অর্ণব মিত্র।

হরদয়ালের দিকে সেই বান্ডিলটা এগিয়ে দিয়ে রাধাবল্লভ বললেন, তোমরা যে ভালবাসা দিয়ে আমার নাতনিকে প্রতিপালন করেছ তার মূল্য আমি কোনওদিন দিতে পারব না। এটুকু শুধু গ্রহণ করো আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসেবে।

হাতজোড় করে জিভ কেটে হরদয়াল বলল, কোনও দামেই আমি আমার মেয়ে বেচতে পারব না হুজুর, এটা আপনার কাছেই রেখে দিন।

'মিত্রমহল' ছেড়ে চলে গেল হরদয়াল, একবারও আর পেছন ফিরে তাকাল না।

সব ঘটনা শুনল ঝুম্‌কি। তাকে ঘিরে উচ্ছ্বাস আর আবেগের বন্যা বয়ে গেল। সে কিন্তু নীরব। একটি কথাও বেরোল না তার মুখ দিয়ে।

ভোর রাতে উঠে দেখা গেল, বিছানায় নেই ঝুম্‌কি।

খোঁজ! খোঁজ!

এ কী! খাঁচার সব কটা দরজাই খোলা!

পাখিদের নীলাকাশে মুক্তি দিয়ে ঝুম্‌কি নিজেও উড়ে চলে গেছে।

●

শনিচারি

ঘুম ভেঙে যায় রাতে। একটা ভারী জিনিস ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাই। তার পরেই চোখের ওপর ফুটে ওঠা একটা ছবি। দীর্ঘদেহী একটি মানুষ ফরেস্ট হস্‌পিটাল থেকে বেরিয়ে আসছেন। হাতে একটি ল্যাম্প। এদিক ওদিক কী যেন খুঁজে ফিরছেন তিনি।

হঠাৎ আলোটা নিভে যায়।

শনি-চা-রি-ই...।

একটা আর্ত চিৎকার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে। সারজম গাছের ওপর থেকে পাখা ঝাপটে উড়ে যায় বনমোরগ আর সারো-ময়নার দল।

এরপর কতক্ষণ স্তব্ধতা। কান পাতলে শোনা যায় দু'চারটে কথা। টুকরো টুকরো, কতক বা অস্পষ্ট।

আমি মরতে চাইনি ডাক্তার। অতি ক্ষীণ আহত একটা গলার আওয়াজ।

তবে কেন এমন করলে?

তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসি, তাই।

এ বনের থেকে তোমাকে মুক্ত করে আমার দেশে নিয়ে যাব মনে করেছিলাম শনিচারি।

তোমার দেশে!

কথা অস্পষ্ট। একটা যন্ত্রণার কাতরোক্তি বলে মনে হয়।

সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে আমি উপযুক্ত মর্যাদা দিতাম। বীরাঙ্গনার যোগ্য মর্যাদা।

আজ এই শেষ মুহূর্তে তোমাকে গ্রহণ করলাম ডাক্তার। পঙ্গু হয়ে, তোমার বিপদের কারণ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারলাম না। আমার মত আমার দেশের মানুষকেও তুমি চিরদিন ভালবাসবে। কথা দাও, কোনওদিন তাদের ছেড়ে যাবে না।

কথা দিচ্ছি শনিচারি।

এরপর সীমাহীন নীরবতা! পাহাড়ের আড়াল থেকে অতি উজ্জ্বল নীলাভ একটি দ্যুতি ফুটে উঠছে। সূর্যোদয়ের সূচনা হচ্ছে ওপারে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে এ পারের ছবি।

নতজানু হয়ে বসে আছেন ডাক্তার জনসন প্রার্থনার ভঙ্গীতে। সামনে নিস্পন্দ শুয়ে আছে আদিবাসী এক কন্যা। যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে।

*　　　　*　　　　*

আপনারা যদি কেউ কখনও সিংভূমের সারান্দা ফরেস্টে আসেন তা হলে আমার মত এমনি বিচিত্র এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন কিছুকাল। সাতশোটি পাহাড় সারান্দা নাম নিয়ে সবুজ অরণ্যের পোশাক পরে দক্ষিণ পশ্চিম থেকে উত্তর পূর্বে চলে গেছে। আপনি পাহাড়ি রাস্তা ধরে এগিয়ে আসবেন। একদিকে উঁচু পাহাড়, অন্যদিকে পাহাড়ি খাদ। তার মাঝে অপ্রশস্ত পথ। পাহাড়ের গায়ে আদিম অরণ্য। শাল, হেসেল, বীজা, শিমূলের ঘন বসতি। অজস্র লতাগুল্মে রহস্যময় বলে মনে হবে আপনার সারান্দা বনভূমি। কুইনা রেঞ্জ ধরে চলে আসুন।

কিছুদূর এগিয়ে সামনে দেখবেন একটি পাহাড়ি নদী। ভারি মিষ্টি তার নাম। কোয়েল নামের সত্যি একটা যাদু আছে। নুড়ির নূপুর বাজিয়ে কোয়েল একখানা রঙিন শাড়ি গায়ে পাক দিয়ে জড়াতে জড়াতে ছুটে চলেছে।

নদী পেরিয়ে চলতে চলতে আপনি একসময় এসে পড়বেন 'ছোট নাগরা' নামে একটি পাহাড় ঘেরা আদিবাসী গ্রামের মাঝখানে। দূর থেকে দেখতে পাবেন আদিবাসী 'হো'দের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। লাল কালো মাটির প্রলেপ লাগানো দেওয়াল। ঐ পাহাড়ি গ্রামটিতে ঘুরতে ঘুরতে আপনি কয়েকটি চিহ্ন দেখতে পাবেন। পাথর-গড়া মন্দির আর ইঁটের তৈরি ভাঙা গড়ের ধ্বংস-স্তূপ। বনের মাঝে এ ধরনের চিহ্নগুলি সত্যিই আপনাকে অবাক করবে। আপনি ভাবতে ভাবতে গ্রামটি পেরিয়ে আসবেন। কিছুদূর বনের পথে এগিয়ে এসে বাঁক ফিরলেই আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটি পরিচ্ছন্ন শাল মহুয়ায় ঘেরা আস্তানা। বেশ খানিকটা জমি নিয়ে চমৎকার গাছপালা, লতায় ফুলে সাজানো জায়গাটি আপনাকে আকর্ষণ করবে বিশেষভাবে। আপনি পথ থেকে একটু উঠে এলেই দেখতে পাবেন কয়েকটি বাংলো টাইপের খড়ো ঘর। তাদের একটির ওপরে কাঠের সাদা রঙ করা ক্রুশ আপনার চোখে পড়বে। এই নিভৃত বনভূমিতে আপনি ক্রুশচিহ্ন দেখে যখন মনে মনে চিন্তা করবেন, কী করে এখানে এল খৃষ্টধর্ম, ঠিক সেই সময় হয়তো আপনার চোখে পড়বে আর একটি বিচিত্র বস্তু। চার্চের সামনেই একটি বাঁধানো বেদির ভেতরে ঈষৎ উঁচু একটি মঞ্চ। আপনি যদি আদিবাসী 'হো' দের সংস্কার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হন তা হলে সহজে বুঝতে পারবেন ওই মঞ্চটি 'আদিং' ছাড়া আর কিছু নয়। ওই আদিংয়ের ভেতর রক্ষিত আছে কোনও আদিবাসীর আত্মা।

আপনি নিশ্চয়ই এ দৃশ্য দেখে অবাক হবেন। একই সঙ্গে চার্চের এলাকায় এ ধরণের আদিংয়ের অস্তিত্ব কী করে থাকতে পারে এই নিয়ে যখন আপনি জটিল চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়বেন, ঠিক সেই সময় এক অতি বৃদ্ধ পাদ্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যেতে পারে।

তাঁর তুষারশুভ্র কেশ আর মুখের মৃদু হাসিটি আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

আপনি এগিয়ে গিয়ে এই বিচিত্র ব্যাপারটি সম্বন্ধে তাঁর কাছে কিছু জানতে চাইবেন। তিনি অমনি মৃদু হেসে আপনার হাত ধরে নিয়ে যাবেন চার্চের ভেতরে। তারপর আপনার হাতে একখানি অতি জীর্ণ পুঁথি তুলে দিয়ে ইঙ্গিতে পড়তে বলবেন। আপনি বৃদ্ধ পাদ্রীর নির্দেশে বাইরে এসে বাঁধানো বেদির পাশে বসে একের পর এক পাতা উল্টে যাবেন। অজ্ঞাত অরণ্য-মানুষের অলিখিত এক ইতিহাস ফুটে উঠবে আপনার চোখের ওপর। 'ডাক্তার জনসনের ডায়ারি' থেকে আপনি অরণ্যের বিচিত্র অনাস্বাদিত এক রহস্যের সন্ধান পাবেন।

ডাক্তার জনসনের ডায়ারি

উৎসর্গ : যে প্রেম আমার ভেতর মহৎ ভালবাসার সৃষ্টি করেছে সে প্রেমকে নত হয়ে নমস্কার করি। যে কুমারী আমাকে সেই প্রেম দান করেছে, তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি আমার এই স্মৃতি-গ্রন্থখানি।

২০ জুন : ১৮৯৮

জামদা থেকে হাডসনের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে আসতে বেশ মজা লাগল। এখানে ওখানে পাহাড়গুলো ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে সমতল। কোথাও বা দু'চারটে জলের ধারা চোখে

পড়ে। ইঁটের রঙের মত জলের রঙ এখানে। হাডসন বললেন, এখানকার পাথরে নাকি প্রচুর লোহা আছে।

পথের মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ভালই হল। যে রকম রোদ চড়তে আরম্ভ করেছিল, তার ভেতর এতটা পথ আসা সত্যিই কষ্টকর হত। প্রভুকে ধন্যবাদ, মেঘ করে বৃষ্টি এল। পাহাড়ের ওপর যখন মেঘ জমে উঠেছিল তখন আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম সেদিকে। ছোট এক টুকরো মেঘ দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের ভেতর পাহাড়ের কোল বেয়ে নামতে লাগল সে মেঘ। গুরু-দেহ পাখি যেমন পায়ের ওপর ভর রেখে কিছুটা দৌড়ে এসে আকাশে ডানা মেলে দেয়, ঠিক তেমনি পাহাড়ের কোল বেয়ে খানিকটা নেমে এসেই মেঘটা যেন পাখা ঝাপটে উড়ে আসতে লাগল। শোঁ শোঁ শব্দ উঠল। হাডসন ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। আমাকেও নামতে বললেন। পথের পাশে কয়েকটা শালের গাছ জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। আমরা তার আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘোড়া দুটোকে সেই গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলাম।

মুক্তোর দানার মত এক সময় বৃষ্টি ঝরতে লাগল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটা, তারপর অঝোর ধারায়। যেদিক থেকে বাতাস বইছিল আমরা তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়েছিলাম। ইচ্ছে করছিল, একটু জলে ভিজি। হাডসনকে আমার ইচ্ছের কথাটা জানালাম।

হাডসন হেসে বললেন, ডাক্তার, চিকিৎসার গোড়ার কথা হল প্রকৃতি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানা। তারপর ওষুধের কথা।

বললাম, তা মানি, কিন্তু এ কথা কেন?

এই যে তুমি চাইলে বৃষ্টিতে ভিজতে। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দিগর্মিতে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। যে দেশে ডাক্তারি করবে, সে দেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হয়।

কথাটা ভালই লাগল। বয়সের একটা অভিজ্ঞতা আছে। ডাক্তার হলেও আমি তরুণ, হাডসন ফরেস্ট-রেঞ্জার হলেও অনেক প্রবীণ। পুঁথিপড়া শিক্ষার চেয়ে অভিজ্ঞতার দাম অনেক বেশি।

আমরা নিজেদের বৃষ্টির ছোঁয়া থেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সবটুকু পারলাম না। এলোমেলো বাতাসে কিছুটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। এদিকে শালের বড় বড় পাতা থেকে ভারি ভারি জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল আমাদের মাথা আর পোশাকের ওপর।

বৃষ্টি থামলে শান্ত হল প্রকৃতি। গরম অনেক কম বলে মনে হল। আমরা আবার ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিলাম।

বনের ভেতর ঢুকে মনে হল, দিনের বেলাতেই সূর্য ডুবে গেছে। হাডসন সামনে চলেছেন. আমি আছি পেছনে। পথের অন্ধি সন্ধি হাডসনের নখদর্পণে। তবু চারদিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন তিনি। আমার কিন্তু চারদিকের গাছপালা, লতাপাতার নিবিড়তা মনোরম মনে হচ্ছিল।

হাডসন ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলেন। ইঙ্গিতে আমাকে থামতে বললেন। তারপর হাতের ইসারায় যে দৃশ্য দেখালেন তা কোনওদিন ভোলার নয়।

একটি একশিলা পাথরের ওপর মেঘের ছায়া এসে পড়েছে। লতায় পাতায় ফুলে জায়গাটি মনোরম। পাশের পাহাড় থেকে ঝির ঝির শব্দে ঝরে পড়ছে একটা ক্ষীণাঙ্গী ঝরণা। ওই একশিলা পাথরের ওপর পাখা মেলে নাচছে একটি ময়ূর। পাখায় কী উজ্জ্বল রঙের বাহার। কতক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মেঘভাঙা রোদের দু'এক টুকরো রশ্মি ইতিমধ্যে

এসে পড়েছে ওর চিত্রিত পাখার ওপর। ওই যে আর একটি ময়ূর। একটা মহুয়া গাছের ডালে সে বসেছিল। এবার দ্বৈত নৃত্য শুরু হল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে লাগলাম। বনের নটনটী নেচে চলেছে আপন মনে। দর্শকের দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। মানুষের তৈরি করা রঙ্গমঞ্চে যে নৃত্য-শিল্পীরা নাচে, তারা কি এমন করে দর্শকদের ভুলে আপনার ভেতর ডুবে থাকতে পারে।

১ সেপ্টেম্বর ঃ

কয়েকমাস যেন বৃষ্টিতে ভেসে গেল পাহাড়ি দেশটা। কুমডির বাংলোতে প্রায় বসে বসেই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। বর্ষার দিনে পাহাড়ে ধ্বস নেমে পথ দুর্গম করে দিয়েছে। তার ওপর দিয়ে পথ করে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

আমাদের বাংলোর দেওয়াল, মেঝে সব কাঠের। ছাউনিটা খড়ের। চাল বেয়ে টপ টপ করে যখন বৃষ্টির জল পড়ে তখন জলের রঙ প্রথম দিকে লালচে দেখায়। সামনে একটা চেয়ার ফেলে সারাদিন আমি বসে থাকি! বাংলোর চারদিকে কাঠের খুঁটির বেড়া। সেই খুঁটিগুলো আর দেখা যায় না। কত রকমের লতা, পাতা, ফুলে তাদের ছেয়ে ফেলেছে। বাংলোর কর্মচারীদের কাছ থেকে কয়েক রকমের ফুল আর লতার নাম শিখে নিয়েছি। একটি লতার নাম 'জনাপা'। গুচ্ছ গুচ্ছ বেগুনি আর সাদা ফুলে তার সর্বাঙ্গ ভরে আছে। বনমল্লী, যুঁই আরও কত ফুল। মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়! পাশেই কারো নদী। মাঝে মাঝে বান ডাকে। শোঁ শোঁ শব্দ উঠলেই আমি বাংলো থেকে বেরিয়ে নদীর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ওপরের পাহাড়ে কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেলে সেই বৃষ্টির ঢল নেমে আসে নদী বেয়ে। তার আওয়াজ ভেসে আসে বহু দূরের থেকে।

নদীতে দেখা যাচ্ছে নীল জলের প্রবাহ, পরক্ষণেই কত উঁচু একটা গৈরিক জলের ঢেউ তার ওপর এসে পড়ল। অমনি কূল ছাপিয়ে বইল জলের ধারা।

মাঝে মাঝে কুলিকামিন নিয়ে হাডসন পথের অবস্থা দেখতে বেরিয়ে যান। কখনো বা তাঁর বাংলোতে ফিরে আসার আগেই প্রবল বর্ষা শুরু হয়। মেঘের মাতামাতি চলতে থাকে। বাজের গর্জনের সঙ্গে পাহাড়ের ওপর পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা যায়। আশেপাশের পাহাড়গুলো সে শব্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে। হাডসনের জন্যে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ি। বড় জেদী আর একরোখা মানুষ এই হাডসন। বিপদের ঝুঁকি যতটা নেওয়া চলে তার চেয়ে অনেক বেশি নিতে পারেন তিনি। তাই মাঝে মাঝে তাঁর জন্যে চিন্তিত না হয়ে উপায় থাকে না। হাডসন আমার পিতৃব্যের বন্ধু। তাঁর ভরসাতেই আমার এখানে আসা। কুলিকামিনেরা পাহাড়ি রাস্তাঘাট তৈরি করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। মাঝে মাঝে জ্বরজাড়িতে ভোগে। তাদের জন্যে সরকারী রিজার্ভ ফরেস্টে চিকিৎসকের দরকার। নতুন জায়গা দেখার একটা লোভও ছিল আমার। তাই হাডসনের ডাকে চলে এলাম।

এই বর্ষার ভেতর দু'একদিন হাডসনের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। বৃষ্টি বন্ধ থাকলেও পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘ থমকে থাকত। তারই ফাঁকে সূর্যের আলো এদিক ওদিক একটু দেখা দিলেই পাখিরা ঝাঁক বেঁধে রোদ্দুরের লোভে জড় হত। নিপুণ শিকারী হাডসনের অব্যর্থ লক্ষ। কয়েক জোড়া বন মোরগ তিতির শিকার করে বুনো লতায় বেঁধে নিয়ে আমরা বাংলোয় ফিরতাম।

রাত্রে বৃষ্টি নামত। আমাদের বাংলোটা সেই মুহূর্তে মনে হত যেন সমস্ত জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশাল সমুদ্রের বুকে একটি নিঃসঙ্গ তরণীতে আমরা দুটি প্রাণী কোথাও ভেসে চলেছি বলে মনে হত।

হাডসন যেমন শিকারী তেমনি ভোজনবিলাসী। এখানকার বাবুর্চির রান্না তাঁর আদপেই পছন্দ হয় না। রাতে বসে বসে হাডসন তাঁর সংসারের কথা তুলতেন। আগামী শরৎকালে সমস্ত পরিবারকে এনে ফেলার একটা পরিকল্পনাও তিনি এই সময় স্থির করে ফেললেন।

১৭ নভেম্বর ঃ

একদিন দেখলাম হাডসন আর বাংলো থেকে কাজে বেরুলেন না।

বললাম, কি হল, শরীর খারাপ নাকি?

হাডসন কোনও কথা না বলে আমার হাতে একখানা চিঠি এগিয়ে দিলেন।

চিঠিখানা এসেছে বোম্বে থেকে। হাডসনের এক বন্ধু সেই চিঠির রচয়িতা। সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তিনি। চিঠির মোটামুটি বক্তব্য এই, সরকার একদল মিশনারীকে সারান্দা ফরেস্টে পাঠাচ্ছেন আদিবাসীদের ভেতর খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য। এ কাজে দু'দিক থেকেই লাভ হবে! অখৃষ্টানেরা প্রভু যীশুর মাহাত্ম্য বুঝতে পারবে। তা ছাড়া পরোক্ষ আর একটি বড় রকমের লাভের সম্ভাবনা আছে। সেটি হল, খৃষ্টধর্মের প্রভাবে এলে আদিবাসীদের ভেতর কথায় কথায় বিদ্রোহ করবার আগ্রহ কমে আসবে। তখন সরকারের পক্ষে বনভূমিতে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করা আর ব্যবসা চালানোর সুবিধে হবে।

বললাম, এতে তো আপনারই সুবিধে। আদিবাসীরা আপনাকে কুলিকামিন দিয়ে এখন সাহায্য করতে চাইছে না, তখন আর এ হাঙ্গামা থাকবে না।

হাডসন বললেন, চিঠির শেষ অংশটুকু পড়ে দেখ।

চিঠি শেষ করে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, কী আনন্দ, আপনার পরিবারের সবাই দেখছি ওই দলের সঙ্গেই আসছেন।

হাডসন এবার উঠে বসলেন। এমন উত্তেজিত মুখভাব আমি এর আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।

বললেন, পাদ্রী পিটারের সঙ্গে আসছে দেখতে পাচ্ছ না?

ওঁর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে আমি বোকার মত তাকিয়ে রইলাম।

হাডসনের মুখে করুণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। মুহূর্তে হাডসন শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়লেন।

জনসন, এ একান্ত আমার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা। অন্য কারও জানার কথা নয়।

এমন বলিষ্ঠ মানুষের এমনি কোমল একটা আঘাতের জায়গা থাকতে পারে তা আগে কোনওদিন ভাবতে পারিনি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা।

হাডসন বললেন, তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ডাক্তার, তবু এই নির্জন জায়গায় একই সঙ্গে আমরা কাটাচ্ছি, তাই তুমি আমার বন্ধু। তোমার কাছে গোপন করার কিছু নেই আমার।

মনের কোন একটি গোপন কথা হাডসন আমাকে আজ শোনাতে চান, তাই এ ভূমিকা।

হাডসন বললেন, আমার স্ত্রী তাঁর কুমারী জীবনে পিটারের প্রতি আসক্তা ছিলেন। আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হলে পিটার অবিবাহিত থেকে যান, পরে মিশনে যোগ দেন।

হাডসনের ব্যথার কাঁটা কোথায় বিঁধে আছে এতক্ষণে তা বুঝলাম।

সান্ত্বনা দেবার ত্রুটি রাখলাম না।

বললাম, কুমারী জীবন আর বিবাহিত জীবনের ভাবনা এক হবে এমন কোনও কথা নেই। আজ উনি পাদ্রী পিটারের সঙ্গে আসছেন বলে আমরা নিশ্চিত ধরে নিতে পারি না যে ওঁর মনে এখনও কুমারী জীবনের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

হাডসন হেসে বললেন, যুক্তি মনকে অনেক সময় প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মন প্রায়-ক্ষেত্রেই তাকে স্বীকার করতে চায় না।

বললাম, কোনও সন্দেহ থাকলে আপনি বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ নিতে পারতেন।

করুণ হাসি হাসলেন হাডসন।

বললেন, একবার এক হিন্দু সাধুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছিল। সাধু আমাকে বললেন, যে বাতাস আমাদের নৌকো ডোবায়, জলের ভেতর ডুবে যেতে যেতে আমরা সেই বাতাসকেই প্রতি মুহূর্তে চাই।

কথাটা মনে রাখার মত।

হাডসন বললেন, আমাদের যা পারা উচিত, বা পারা দরকার ছিল তা সব সময় পারা যায় না। যে আমাদের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটায়, অনেক সময় আমাদের মন তাকেই বেশি করে আগলে রাখতে চায়।

আমি চুপ করে গেলাম। জীবনের রহস্য সত্যিই বিচিত্র।

২৫ নভেম্বর ঃ

ইতিমধ্যে মিসেস হাডসন এসে পৌঁছেছেন। সঙ্গে অবিবাহিতা বোন, ডরোথি।

দু'জনের বয়সে যেমন তফাৎ স্বভাবেও ঠিক তেমনি।

মিসেস হাডসন অত্যন্ত বাকপটু। রসিকতার সঙ্গে সামাজিকতার চমৎকার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি। সারাক্ষণ কৌতুক আর হাসির টুকরো ছড়িয়ে চলেছেন।

তাঁর বাইরের এই উজ্জ্বলতার ভেতর কোথাও যে মনের আকাশে মেঘ জমে থাকতে পারে তা একেবারেই ভাবা যায় না।

ডরোথির প্রকৃতি একটু চাপা, চেষ্টা করেও সে উজ্জ্বল হতে পারে না। স্বভাবের গভীরে কোথায় যেন তার একান্ত নির্জন বাসের একটা জায়গা আছে। সেখান থেকে তাকে কদাচিৎ বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

যে ক'দিন পাদ্রী পিটার বাংলোতে রইলেন, হাডসন অন্য-মানুষ। চেনাই যায় না যে ভেতরে তাঁর কোন ক্ষত আছে।

আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রইল না। সকাল, সন্ধ্যা পিটারের সঙ্গে চলতে লাগল নানান পরিকল্পনা। স্থির হল, সাসাংদাতে একটি চার্চ তৈরি করে সেখান থেকেই ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাসাংদায় চার্চ তৈরি হল। কাঠের বাড়ি, খড়ের চাল। চার্চের লাগোয়া আরও কয়েকখানা ঘর উঠলো। পাদ্রী পিটার আর তাঁর দলবল থাকবেন সেখানে। ফুলের জন্যে জমি তৈরি করা হল।

উদ্বোধনের দিন আমরা সবাই মিলে ঘোড়ায় চড়ে চললাম সাসাংদার চার্চে। সারা দিন রইলাম সেখানে। প্রার্থনায় যোগ দিলাম। প্রথম দিনেই একটি আদিবাসী মেয়েকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা

দেওয়া হল। মেয়েটি আমাদের বাংলোতে পরিচারিকার কাজ করত। স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছিল তার। দীক্ষা নিয়ে মেয়েটি মিশনারীদের কাছেই থেকে গেল।

কাজকর্মের জন্য একটি লোকের দরকার ছিল। তাই চার্চেই রাখা হল মেয়েটিকে।

সন্ধ্যায় আমরা সবাই মিলে ফিরে এলাম বাংলোতে।

২১ ডিসেম্বর ঃ

বর্ষায় ভেঙে গিয়েছিল পথঘাট, ডিসেম্বরের ভেতর সব মেরামত হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কুম্‌ডির বাংলো থেকে খানিক দূরে থলকোবাদে গড়ে উঠেছে আমার হাসপাতাল। রোগী অল্পই থাকে, আমাকে প্রায় একা একাই কাটাতে হয়। বসে বসে বই পড়ি। শিকার-কাহিনী পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। পাদ্রী পিটার কয়েকখানা বই পাঠিয়েছেন। সবই প্রায় ধর্মগ্রন্থ। এত সহজ করে বইগুলির ভেতর ধর্মের কথা লেখা আছে, যা পড়লে সাধারণ মানুষও ধর্মপথের মোটামুটি একটা হদিস পেতে পারে।

হাসপাতালের সামনে একটি চমৎকার শালের বন। তলাকার পাথরগুলো বড় পরিচ্ছন্ন। আমি বসে বসে দেখি, একটির পর একটি শালের পাতা খসে খসে পড়ছে। একটা দমকা হাওয়া লাগল, অমনি কী বিচিত্র শব্দ করে ঘুরতে ঘুরতে ওরা নেমে গেল নীচের উপত্যকার ভেতর। রাতের আকাশ ঘন নীল। জ্বল জ্বল করে জ্বলছে একটা তারা শাল গাছটার ঠিক মাথার ওপর। আরও অগুন্‌তি তারা আকাশে। সবার ভেতর এটি যেন একটু আলাদা।

কত কাছে আর কত স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে। যীশুর আবির্ভাবের সময় পূর্ব-দেশের সাধুরা এমনি একটি নক্ষত্র আকাশে দেখেছিলেন।

শাল গাছের মাথার ওপর ওই তারাটি দেখলে আমার মন কেমন যেন শান্ত আর গভীর হয়ে আসে।

কয়েকদিন আগে আমার হাতপাতালে একটি রোগী এসেছে। সে রাতে কিছুতেই ঘুমুতে পারছে না। ঘুমের ওষুধ দিলে কিছু সময় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে, তারপর জেগে উঠলেই শুরু হয় গোঙানি। ওর জন্যে এ ক'দিন আমার চোখেও ঘুম নেই।

মনে মনে প্রার্থনা করি, আমার হাসপাতালে যে রোগীটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রাতে ঘুমুতে পারছে না, তার ঐ তারার আলোর মত স্নিগ্ধ শান্তি আসুক। জগতের যেখানে যত রোগার্ত, শোকার্ত রয়েছে তারা সুস্থ হয়ে উঠুক, সুখী হোক।

এই শীতের রাত্রি, কুয়াশার চাদর বিছানো উপত্যকায় অতন্দ্র চাঁদের আলো, বনভূমির নিভৃতলোকে কীটপতঙ্গের বিচিত্র ধ্বনি আমাকে যেন আবিষ্ট করে রাখে।

৩০ ডিসেম্বর ঃ

সেদিনটির স্মৃতি বোধকরি ভুলতে পারব না কোনও দিন।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম কুম্‌ডির বাংলোর দিকে। পথের ধারে দেখলাম কাঞ্চন ফুল ফুটে আছে। এ দেশের গাছপালা আর ফুলের কত নামই না আমার ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে।

একটা দুটো গাছ নয়, শত শত কাঞ্চন ফুলের গাছের যেন বন তৈরি হয়েছে। আমি ঘোড়ায় বসে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখ আর ফেরাতে পারলাম না। কোনও কোনও গাছে সাদা সাদা ফুল ফুটেছে, আবার কোনও গাছে বা ঈষৎ বেগুনি আভার ফুল। গাছ খুব বড় নয়, কিন্তু বড় শোভন সুন্দরভাবে ডালপালা পাতাপত্র মেলে রেখেছে।

আরও এগিয়ে চললাম। বেলা শেষের তখনও অনেক বাকি। শীতের বনভূমি এরই মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। প্রকৃতির কী বিচিত্র আয়োজন। টেকোমা ফুল ফুটে রয়েছে পথের ধারে। গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ রংয়ের ফুল। খাদের ধারে তিলাই গাছটার ছোট ছোট সাদা ফুলে তখনও মৌমাছিদের ভিড় ভাঙেনি। ওদিকে ডাইনে উঁচু পাহাড়ের গায়ে আরাবা গাছে বসে আছে এক ঝাঁক পাখি। বিচিত্র কলরব তুলেছে তারা। ডালে ডালে লাল ছোট ছোট ফুলগুলি উঁকি দিচ্ছে।

শীতের প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে অতি ধীরে এগিয়ে চলেছি, আর মনে মনে ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টির তারিফ করছি। হঠাৎ আমার ঘোড়াটা থমকে দাঁড়াল। সামনে একটি টিলা, ঐ টিলার কোল ঘেঁষেই আমার পথ। পথটা ঐ পাহাড়ের কাছে এসে কোণ তৈরি করে বেঁকে গেছে। এপারের থেকে ওপারের পথটা দেখা যায় না। ঘোড়াটা হঠাৎ থামল দেখে আমি চারদিকে তাকাতে লাগলাম। হঠাৎ যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পাহাড়টা যেখানে দুটো পথের কোণ সৃষ্টি করেছে তার নীচেই সাদা সল্ট লিকের একটা রেখা অগভীর ভ্যালির মধ্যে নেমে গেছে। ঐ সল্ট লিক্ ধরে উঠে আসছে একটা সম্বর। আর তার কয়েক হাত ব্যবধানে শাল আর হেসেল গাছের আড়ালে থেকে একটা চিতা গুঁড়ি মেরে সম্বরটাকে অনুসরণ করছে। সম্বর কিছু একটা বিপদের গন্ধ পেয়েছে কিন্তু চিতাটাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই লাফাতে লাফাতে সল্ট লিক্ ধরে ওপরের পাহাড়ের দিকে উঠে আসছে, আবার একটু থেমে সিধে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

এ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল। ঘোড়ায় চড়ে এই পাহাড়ি আঁকাবাঁকা খাদের পথে দৌড়ানো সম্ভব নয়। তাতে যে শব্দ হবে, চিতাটা সে শব্দে অন্যমনস্ক হয়ে যাবে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আশেপাশে একটা গাছ খুঁজতে লাগলাম। ওই টিলার পাশেই একটা উঁচু পলাশ গাছ ছিল। জুতো খুলে তার ওপর উঠলাম।

এখন টিলার দু'পাশে দুটো পথই আমি দেখতে পাচ্ছি। সম্বরটা লাফ দিয়ে এক ধাপ টিলার ওপর উঠে এল। চিতাটা এখন পথের পাশে একটা ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসেছে।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। দুটি গরু কতকগুলো কাঠের ভারি বোঝা বয়ে আনছিল পশ্চিমের পথটা ধরে। তাদের পেছনে আদিবাসী একটা লোক গরুগুলোকে তাড়িয়ে আনছিল। আমি এই দৃশ্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। চেঁচিয়ে সাবধান করতে গেলেই চিতাটার নজর সম্বরের ওপর থেকে গরু আর আদিবাসীর ওপরে গিয়ে পড়বে। তখন ফল ফলবে বিপরীত।

আমি চুপচাপ প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে হরিণটা আর এক লাফ দিয়ে ওপরের বনের কাছাকাছি গেলেই বাঘটা তাকে অনুসরণ করে আরও ওপরে উঠে আসবে। তখন ওই লোকটা বেঁচে গেলেও যেতে পারে।

কিন্তু সম্বর নড়ল না, বাঘটাও বসে রইল পথের ওপর। আর তাদের মাঝে এসে পড়ল গরু দুটো আর আদিবাসী লোকটি। বাঘটাকে দেখে গরুদুটো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। লোকটা তখনও বাঘটাকে দেখতে পায়নি। সে গরুগুলোকে আয়ত্বে আনবে বলে হেঁই-হো হেঁই-হো করে তাদের পিছু পিছু দৌড়ে চলল। লোকটি যেই চিতার ধার ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে, অমনি একটা থাবা এসে পড়ল তার ঘাড়ে। বলিষ্ঠ লোকটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমি গাছের

ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠলাম। পাহাড়ে পাহাড়ে আমার সে চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

গাছের ওপর থেকে চেয়ে দেখি, বেড়াল যেমন করে ইঁদুরকে একবার আঘাত করে আবার খেলা করে, ঠিক তেমনি লোকটাকে নিয়ে বাঘটা খেলা করতে লাগল।

সূর্যাস্ত হয়ে গেল সামনের পাহাড়ের আড়ালে। পেছনের রাস্তায় একটা হৈ চৈ শুনে তাকিয়ে দেখি কতকগুলি আদিবাসী তীর ধনু নিয়ে মশাল জ্বেলে এদিকে দৌড়ে আসছে। আমি গাছের ওপর থেকে চিৎকার করে তাদের ডাকতে লাগলাম। মশাল দেখে হৈ চৈ শুনে বাঘটা শিকারকে পথের ওপর ফেলে রেখে সরে গেল।

ওরা এসে লোকটাকে ঘিরে চেঁচামেচি জুড়ে দিল। আমি গাছের থেকে নেমে এলাম। পথের ওপর থেকে কুড়িয়ে নিলাম আমার ওষুধের ব্যাগটা। লোকটির কাছে গিয়ে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে আমার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে আসতে বললাম। লোকটির তখনও জ্ঞান ফেরেনি। ওরা ওকে আমার হাসপাতালে রেখে দিয়ে গেল। আজ ক'দিন ধরে সমানে লোকটার চিকিৎসা চলেছে। সম্পূর্ণ আরোগ্য হতে পারেনি এখনও।

রাতে বসে বসে রহস্যময় প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, এত সুন্দর তুমি অথচ কী ভীষণ।

১৫ মার্চ ঃ ১৮৯৯

হাডসনের লোক এসে জরুরী খবর দিয়ে গেল, যেন একটুও দেরি না করে আমি কুমডির বাংলোতে যাই।

তাড়াতাড়ি হাসপাতালের কাজ গুছিয়ে আমি বাংলোতে গিয়ে পৌছলাম। গেটের সামনেই পায়চারি করছিলেন হাডসন। আমাকে দেখেই বেরিয়ে এলেন। বাংলোতে না গিয়ে হাডসনকে অনুসরণ করে আমরা এসে বসলাম কারো নদীর ধারে নতুন তৈরি সাঁকোটার ওপর। হাডসন আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

ব্যাপার কী বলুন তো, কোনও অঘটন কী ঘটেছে?

আমার হাত তেমনি হাডসনের হাতের ভেতর ধরা রইল।

কিছুক্ষণ পরে আত্মস্থ হয়ে বললেন, রেবেকা পাগল হয়ে গেছে!

রেবেকা হাডসনের স্ত্রী। আমি গত সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে কথা বলে গেছি। পাগলামোর কোনও লক্ষণই তাঁর ভেতর প্রকাশ পায়নি।

বললাম, আনুপূর্বিক ঘটনাগুলো বলে যান।

হাডসন বললেন, ইদানিং প্রায়ই উনি সাসাংদার গীর্জায় যেতেন। তুমি জান, নানা কাজে আমাকে বাইরে বাইরে যেতে হয়। আমি ওঁর সঙ্গে যেতে পারতাম না। ডরোথিকে নিয়েই উনি ওখানে যেতেন। সঙ্গে থাকত আমার আরদালী।

প্রথম দিকে গীর্জা থেকে ধর্মবিষয়ক অনেকগুলি করে বই আনতেন। রাত জেগে তাই পড়তেন। তুমি জান জনসন, কারও স্বাধীন ইচ্ছায় আমি কখনও বাধা দিতে চাই না।

উনি এক ঘরে পড়তেন, আমি অন্য ঘরে ঘুমোতাম।

এক রাতে ডরোথির সঙ্গে কী নিয়ে যেন ওঁর কথা কাটাকাটি হল। কিছুই বুঝলাম না। তারপর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছেন। গীর্জায় যান না, একা একাই ঘরের এদিক ওদিক ঘুরে

বেড়ান। কী যেন হারিয়ে ফেলেছেন, তাকেই পাতি পাতি করে খোঁজেন। প্রথমদিকে ডরোথিকে দেখলে কথা বলতেন না। এখন ওকে একেবারেই দেখতে পারেন না। কারণে অকারণে তেড়ে যান।

বললাম, কিছু যদি মনে না করেন তা হলে আমি দু'একটি কথা আপনার কাছে জানতে চাই।

স্বচ্ছন্দে, হাডসন বললেন।

ডরোথির কী আপনার ওপর কোন দুর্বলতা লক্ষ করেছেন?

হাডসন যেন আকাশ থেকে পড়লেন, আমার ওপর! ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব নিকট হলেও বয়সের পার্থক্যটা নিশ্চয়ই তুমি লক্ষ করেছ।

আপনি আপনার দিকের কথাই বলছেন, ওঁর মনের দিকটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখেননি।

চিন্তিত হলেন হাডসন।

বললেন, আমি কিন্তু কোনওদিন তার কোন আভাস পাইনি।

আচ্ছা, এটা কি লক্ষ করেছেন, আপনার কাছে ডরোথি কোনও কারণে এলে আপনার স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন?

হাডসন কিছুক্ষণ পেছনের ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এক সময় বললেন, তোমার অনুমান সত্য বলেই মনে হচ্ছে ডাক্তার।

ডরোথিকে কোনও সময়ে আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকতে দেখলেই উনিও সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হন। ডরোথি চলে গেলে উনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর এদিক ওদিক কী যেন খুঁজতে শুরু করেন।

হাডসনের শেষের কথাটার ব্যাখ্যা ঠিক মত করে উঠতে পারলাম না। হাডসনের ওপর ডরোথির অনুরাগকে সন্দেহের চোখে দেখলে রেবেকা ডরোথিকে চোখে চোখে রাখতে পারেন, কিন্তু এর ভেতর খোঁজাখুঁজির প্রশ্নটা আসে কোথা থেকে।

ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিকমত পরিষ্কার হল না।

বললাম, আপনি বুঝতেই পারছেন, এ রোগটা সম্পূর্ণ মানসিক। সুতরাং মনের চিকিৎসা ছাড়া এর নিরাময় সম্ভব নয়। তবে সাময়িক উত্তেজনা যাতে খানিকটা দূর করা যায় সেজন্যে ওষধু একটা দিয়ে দিচ্ছি।

আমি আর বাংলোর ভেতর গেলাম না। হাডসন আমার সঙ্গে এলেন হাসপাতালে।

ওযুধ তৈরি করে দিয়ে বললাম, কয়েকদিন গেলে তারপর নতুন চিকিৎসার কথা ভাবা যাবে, কী বলেন?

কথা বলতে গিয়ে হাডসনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেখানে যেন উদ্বেগের কোনও ছায়া নেই।

ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে হাডসন হেসে বললেন, নিশ্চিন্ত হলাম ডাক্তার। পিটারকে নিয়ে রেবেকা সম্বন্ধে যে দুশ্চিন্তা ছিল তা আর রইল না। ডরোথির ওপর রেবেকার ঈর্ষাই আমাকে এতদিনের দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

হাডসন চলে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম। রেবেকার খোঁজাখুঁজির অর্থটা কিছুতেই আমার কাছে পরিষ্কার হল না।

২০ এপ্রিল ঃ

মার্চে সারান্দা বনভূমিতে যেন উৎসব লেগে গেল। শীতে শালের পাতা ঝরে গিয়েছিল, বসন্তের বাতাসে নতুন প্রাণের জোয়ার এল। কোথা থেকে শূন্য ডালে জ্বলে উঠল নতুন পাতার আগুন। দেখতে দেখতে ঘন পাতায় গাছ ছেয়ে গেল। গাছে গাছে ফুল এল এক সময়। থোকা থোকা মাখন-রংয়ের ফুল।

মিষ্টি একরকম গন্ধে সারা বন মেতে উঠল। মৌমাছি পাড়ায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মধু লুটবার। পাহাড়ি ঝোরার ধারে সাংকারলা লতা ভরে সাদা সাদা ফুল এলো। হলুদ রংয়ের কেশর দুলতে লাগল।

শালের গাছে এসে বসল হাজার হাজার টিয়া। রাতদিন গাছে গাছে চলল তাদের জলসা। পাতায় পাতায় মিশে রইল তারা।

এদিকে 'বাহা' পরব শুরু হয়ে গেল আদিবাসীদের। শালের ফুল ফুটল আর ওদের মনে লাগল উৎসবের রং। নাচ গান চলল ওদের গাঁয়ে গাঁয়ে। আসর বসল শালের ছায়ায়। মহুয়ার ফুল কুড়োবার ধুম পড়ে গেল। হাড়িয়া তৈরি হল সেই ফুলে। তারপর হাড়িয়ার মদে মাতামাতি।

হো সম্প্রদায়ই এ অঞ্চলে সংখ্যায় বেশি। সাঁওতাল আর লোহার আছে অল্প স্বল্প।

পরবে মেয়েদের সাজের বাহার দেখবার মত। বনদেবতা 'জায়েরা'র আস্তানায় পুজো দিতে গেল আমার হাসপাতালের সামনের পথ দিয়ে। খোঁপায় গুঁজেছে লাল সাদা ফুল আর হরেক রকম পাতা। গান গাইছে। বিচিত্র সুর আর ভাষা। তবে এই আদিম অরণ্য পরিবেশের সঙ্গে ওদের এই গানের সুরের কোথায় যেন একটা গভীর যোগ আছে। বহু রাত অবধি শোনা যায় মাদল, নাগরা আর বাঁশির আওয়াজ।

হাসপাতালে বসে বসে শুনতে পাই ওদের গানের সুর। সেই সঙ্গে দু'এক টুকরো কথাও ভেসে আসে।

'হেসামাতা মাতালেনা, বাড়িমাতা মাতালেনা,
হেসামাতা চবজনা, বাড়িমাতা চবজনা,
সমাগেজা তুইম বন্দলেকেনা।'

আমি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ি। উৎসবের দিনগুলোতে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। ওদের গাঁয়ে আমি যেতে আরম্ভ করেছি। কেউবা সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কারও চোখে বা কৌতূহল।

কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে।

একটা লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল। অমনি গাঁ উজাড়। এ রোগ ধরলে কাছে পিঠে যে থাকবে তার নাকি নিস্তার নেই। কথাটা শুনেই আমি গাঁয়ে গেলাম। লোকটার ঘরে গিয়ে দেখি সে কাতরাচ্ছে। ওষুধপত্র সঙ্গেই ছিল। চিকিৎসা শুরু করলাম। কয়েকদিনের ভেতর লোকটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

একদিন বসে আছি হাসপাতালের বারান্দায়। দেখি, দল বেঁধে আদিবাসী মেয়ে পুরুষ হাজির। কারও হাতে মুরগি, কারও বা পায়রা, আবার কেউ এনেছে মাটির ভাঁড়ে হাড়িয়া। মেয়েরা ফুল এনেছে। কী ব্যাপার! ওদের ভেতর দেখি সেই লোকটি, যার চিকিৎসা আমি করেছিলাম। লোকটি ছিল গাঁয়ের মাতব্বর। সে সেরে উঠেই দলবলকে খবর দিয়েছে। তারা

তো তাজ্জব। যে লোকটা নির্ঘাত মরবে সে কিনা এমনি বেঁচে গেল। তারপর সব শুনে ভেট নিয়ে এসেছে আমার কাছে।

মেয়েরা এসে বলল, ফুল নে, তোর বউয়ের লেগে আনলাম।

আর একটি মেয়ে বলল, কই বউ দেখাবি না?

বললাম, আমার বউ নেই।

ওরা সব হেসে লুটিয়ে পড়ল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে আজও আমি বিয়ে করিনি।

তারপর সারা হাসপাতাল ঘুরে উঁকি দিয়ে আমার বউয়ের খোঁজ করতে লাগল। শেষে কোনও মহিলাকে না দেখতে পেয়ে ওরা আবার ফিরে এল। এরপর যে যার নিজেদের খোঁপায় ফুল গুঁজতে লাগল। আমি ওদের কাছ থেকে ফুল চেয়ে নিয়ে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলাম। ওরা আমার কাণ্ড দেখে হেসে অস্থির। ফুলদানিতে যে কেউ কখনও ফুল রাখতে পারে, তা ওরা ধারণাই করতে পারে না।

একজন ফুলদানির দিকে তাকিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওটা তোর বউ?

অমনি হাসির ঢেউ উঠল।

এই জঙ্গলের মেয়েগুলির ভেতর এত হাসি, এত প্রাণ আছে দেখলে অবাক হতে হয়।

ওরা মুরগি আর পায়রা আমাকে খেতে দিয়ে গেল। হাসপাতালে বসেই ওরা হাড়িয়া খেল। তারপর আমার উদ্দেশ্যে যে সব প্রশংসা বর্ষণ করতে লাগল তাতে মনে হল আমি একজন ছদ্মবেশী দেবতা।

ওরা চলে গেল, আর আমি সারাদিন বসে বসে ওদের সারল্যের কথা ভাবতে লাগলাম।

৫ মে ঃ

হাডসনের বাংলোতে গিয়ে দেখলাম, কারো নদীর তীর ঘেঁষে যে খালি জায়গাটা পড়েছিল তাতে সারি সারি ক্যাম্প পড়েছে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন হাডসন।

সরকার সারান্দা বনে আদিবাসীদের গাছ কাটা নিষেধ করে নাগরা দিয়েছিল। তাতে আদিবাসীরা ভয়ানক ক্ষেপে গেছে।

বললাম, ওদের আস্তানার গাছ ওরা কাটবে, তাতে বাধা দিতে গেলেই বিপত্তি আসবে, এ তো স্বাভাবিক।

কথাটা তা নয় জনসন। প্রথমে ওদের কাছে নামমাত্র খাজনা চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু ওরা আমলই দেয়নি। তখন বনের কাঠ কাটা নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

বললাম, আর্মড পুলিস ফোর্স এলো কোত্থেকে?

হাডসন বললেন, আমাদের অনুগত যে ক'টি আদিবাসী নাগরা দেবার কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের একটি ছাড়া আর কেউ ফেরেনি।

খবর পেয়ে গিয়ে দেখি, কয়েকটি নাগরাওয়ালাকে অগুণতি তীরে গেঁথে গাছের সঙ্গে প্রায় ক্রুশ-বিদ্ধ করে রেখে গেছে। পরিস্থিতি বিশেষ খারাপ হবার আগেই হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠিয়ে ফোর্স আনা হয়েছে।

বললাম, ব্যাপারটা ঘোরাল না করে সহজ সমাধানের একটা পথ বের করলে হত না?

হাডসন মনে হল উত্তেজিত হয়েছেন।

বললেন, রাস্তাঘাট বানাতে সরকারের কি পরিমাণ টাকা খরচ হচ্ছে তা তুমি জান, জনসন। যদি তার থেকে ঠিকমত রিটার্ণ না পাওয়া যায় তা হলে সরকার সে লোকসান কতদিন বইতে পারবে। বৃটিশ সরকারের অনুগত কর্মচারী হিসেবে আমাদের এ কথাগুলি ভেবে দেখা দরকার নয় কি?

হাডসনের কথার কোনও জবাব না দিয়ে নীরব হয়ে রইলাম। ওঁর মুখ থেকেই শুনতে পেলাম, বরাইবুরুতেও এমনি ক্যাম্প পড়েছে।

বললাম, ওরা আমাদের এ ধরনের প্রস্তুতিকে কী চোখে দেখছে, তার খবর কিছু পেয়েছেন?

হাডসন বললেন, টাকা পয়সা আর হাড়িয়া খাইয়ে কতকগুলো ইনফরমার জোগাড় করেছি। তাদের কাছ থেকে যে খবর পেলাম তাতে ও পক্ষের প্রস্তুতি বেশ জোরালই চলেছে বলে মনে হল।

একটু থেমে হাডসন বললেন, ওদিকে ছাতমবুরুর পাহাড়ে লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে। সরকার খুব শীঘ্রই পাহাড় ভেঙে লোহা তোলার ব্যবস্থা করবে। সেজন্যে গুয়াতে একটা কলোনী গড়ে তোলারও পরিকল্পনা হয়েছে। তখন এ অঞ্চলটা অনেক বেশি সুরক্ষিত হয়ে যাবে।

বললাম, এই আদিবাসী হো সম্প্রদায় বনের এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া ওরা অশিক্ষিত। ওদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান খুব সহজ হবে বলে মনে হয় কি?

হাডসন বললেন, যতটা ভাবছ, পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের পক্ষে সে পরিমাণে অনুকূল নয়।

একটু থেমে বললেন, ইনফরমারের কথা যদি মিথ্যে না হয় তা হলে শুনছি আদিবাসী এক রাজ পরিবারের মেয়ে নাকি সমস্ত হোদের সঙ্ঘবদ্ধ করছে।

কথাটা শুনে কেমন যেন চমক লাগল। এদের ভেতর কোন প্রতাপশালী রাজার অস্তিত্ব থাকতে পারে এ আমার কল্পনারও বাইরে। তার ওপর আদিবাসী রাজ পরিবারের মেয়ে হোদের সঙ্ঘবদ্ধ করছে! সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর আমি বিরাট এক রহস্যের গন্ধ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

ফেরার সময় হাডসনকে তাঁর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, নতুন একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি।

কী রকম?

হাডসন বললেন, আগে আমার কাছে ডরোথিকে দেখলে দু'জনের দিকে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ করতেন। আজকাল ডরোথিকে আমার কাছে আসতে দেখলেই দৌড়ে ঘরে ঢুকে কপাট দিয়ে দেন। অনেক সাধ্যসাধনায় তবে দরজা খোলেন।

খুলেই কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। চোখেমুখে তখন তাঁর কেমন যেন ভয়ের ছায়া এসে পড়ে।

বললাম, পিটার আসেননি ইতিমধ্যে?

এসেছিলেন, কিন্তু রেবেকা তাঁর সঙ্গে দেখাই করলে না। ডরোথি যেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেল, অমনি ওঘর থেকে চেঁচাতে লাগলো রেবেকা।

হাসপাতালে ফিরতে গিয়ে সারাপথ নানা চিন্তায় ডুবে রইলাম। এই শান্ত নিরুপদ্রব হো'রা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল কেন? কেনই বা একজনের জন্মগত অধিকার থেকে অন্যজন তাকে বঞ্চিত করতে চায়। কী লাভ এই বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে।

মনে হল সেই হো-রাজকুমারীর কথা। এই অরণ্যের ভেতর এমন আগুনই বা ছিল কোথায়! তার শিখায় একদিন হয়তো সমস্ত বনভূমি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

১২ মে ঃ

দূর পাহাড়ে আগুন লেগেছে। হাসপাতালের সামনের দাওয়ায় বসে দেখছি। মনে হল আগুনের ফুল দিয়ে একটি মালা গাঁথা হচ্ছে। ক্রমে মালাটি বেড়ে চলল। তারপর একসময় মনে হল পাহাড়ের গলায় সে মালা সম্পূর্ণ হয়ে দুলছে।

কী প্রচণ্ড গরম এ দেশে। ঘরের বাইরে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কোনও কোনও পাহাড়ে লোহার পরিমাণ খুব বেশি, গরমও তাই প্রচণ্ড। পাথরের ওপর পাথর গড়িয়ে পড়ল, অমনি আগুন জ্বলে উঠল। সে আগুনের ছোঁয়া লাগল গাছের শুকনো পাতার রাশে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। তারপর সামনে কিছু পড়ল, অগ্নিনাগ সব গ্রাস করে চলল।

গরমের দিনে বনে বনে এমনি আগুন লাগে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ বেড়ে যায় তখন। দামি গাছগুলোকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করে। যেদিকে আগুন আসছে সেদিকের শুকনো পাতার রাশ বনবিভাগের লোকজন লাইন ধরে পরিষ্কার করে ফেলে। সাধারণতঃ নদী বা জলার দিকে শুকনো পাতা লাইন করে জড়ো করা হয়। আগুন ওই লাইন ধরে যেতে যেতে এক সময় নদী বা জলাশয়ে এসে নিভে যায়।

এবার যেমন গরম পড়েছে অত্যধিক, তেমনি আগুনও জ্বলছে চারদিকে। রাতে যেদিকে তাকাই সেদিকে আলোর মালা। বন পুড়ছে, আদিবাসীদের ঘর পুড়ছে, পশুপাখি পুড়ে মরছে। মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বেরুলে বনে বনে বিরাট অংশ জুড়ে কালো কালো চিহ্ন দেখা যায়। আগুনের ধ্বংসলীলা এগুলি।

সেদিন বসে আছি, দশ বারোটি আদিবাসী দোলায় করে নিয়ে এল কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে। আগুনে পুড়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করলাম। সবাইকে বাঁচানো গেল না। দুটি মারা গেল। তাদের মুখ চোখ কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। এমন অবস্থায় বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। কিন্তু ডাক্তারের ভাবনা তা নয়, যেমন করে বাঁচুক, চেষ্টা করে যেতে হবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার।

একটি দল ভাল হয়ে গেল দেখে আগুনে-পোড়া রোগীরা দূর দূর জঙ্গল থেকে আসতে লাগল। আমার ছোট হাসপাতালে আর জায়গা দিতে পাবা গেল না। এখন ঘোড়ায় চড়ে ওষুধের বাক্সপত্র নিয়ে যেতে হচ্ছে বিভিন্ন জঙ্গল এলাকায়! গ্রামের লোকদের সঙ্গে এমনিভাবে সেবার ভেতর দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে আমার পরিচিতি।

পথের দু'পাশে ওদের লম্বা ধরনের ঘর। মাটির বা পাথরের দেয়াল। খাপরার ছাউনি। ঘরের মুখগুলো কিন্তু পথের দিকে নয়।

হামা দিয়ে আমাকে অনেক সময় ঘরের ভেতর ঢুকতে হয়। এদের ঘরের মাঝে এক ধরনের উঁচু বেদি আছে। সেই বেদিকে ওরা বলে আদিং। আদিংকে ওরা বিশেষ পবিত্রভাবেই রাখে। হো-দের পূর্বপুরুষদের আত্মা নাকি থাকে তার ভেতর।

হাসপাতালে ফিরতে ফিরতে ভাবি, কত বিচিত্র সংস্কার মানুষের।

১৭ জুন ঃ

কয়েকদিন আগে হাসপাতালে ফিরে দেখি হাডসন আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, পাশে ডরোথি।

কি ব্যাপার? হাডসনকে জিজ্ঞেস করলাম।

ডরোথিকে দেখিয়ে হাডসন বললেন, বিভ্রাট বাধিয়েছে। টন্‌শিলটা এত বড় হয়েছে অপারেশন না করলেই নয়। বম্বেতে থাকার সময়ে অপারেশনের কথা উঠেছিল, কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। এখন তোমার হেফাজতেই অপারেশনের কাজটা হয়ে যাক। ডরোথিও তাই চায়।

ভর্তি করে নিলাম ডরোথিকে। জরুরী কাজ ছিল হাডসনের, থাকতে পারলেন না।

যাবার সময় বলে গেলেন, কয়েকটা দিন ডরোথি থাকবে তোমার এখানে। আমি সময়মতো একদিন এসে ওকে নিয়ে যাব।

বললাম, খুব আনন্দের কথা।

পরের দিন ডরোথির অপারেশন। সব প্রস্তুত। এনাস্থেসিয়া দেওয়া হল।

একি শুনতে পাচ্ছি! এনাস্থেসিয়ার প্রভাবে ডরোথির অবচেতন মনের কয়েক টুকরো কথা বেরিয়ে এল। কথাগুলি অসংলগ্ন, তবু তার মূল্য কম নয়।

'পিটারকে আমি ভালবাসি। তুমি বিবাহিতা।' ...'কাছে এসো না আমাদের, এসো না বলছি'। — 'চিঠি পাবে না, কিছুতেই পাবে না।' ...'সরে যাও রেবেকা, নইলে হাডসনকে তোমার সব চিঠি দেখিয়ে দেব।'

অপারেশন শেষ করলাম। ডরোথি ঝিমিয়ে পড়ে রইল। জ্ঞান আসতে দেরি আছে। হাসপাতালের বারান্দায় বসে চিন্তা করতে লাগলাম।

ডরোথি পিটারকে ভালবাসে। রেবেকা হাডসনের বিবাহিতা স্ত্রী। প্রকাশ্যে একজন পাদ্রীর ওপর সে ভালবাসা দেখাতে পারছে না। কিন্তু চিঠি এল কোত্থেকে!

হঠাৎ রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়ে গেল। রেবেকার কোনও কিছু খোঁজার অর্থ পরিষ্কার হয়ে এল। নিশ্চয়ই ডরোথি পিটারকে লেখা রেবেকার প্রেমপত্র কোনওরকমে সংগ্রহ করে লুকিয়েছে। এটা রেবেকাকে ডরোথির ভয় দেখানোর কৌশল। রেবেকাকে ভয় দেখিয়ে পিটারের কাছ থেকে দূরে রাখাই তার উদ্দেশ্য। 'হাডসনকে তোমার সব চিঠি দেখিয়ে দেব।' ডরোথি এই এক টুকরো কথায় সবকিছু স্পষ্ট করে ধরে দিয়েছে। রেবেকার উন্মাদনা তা হলে এই কারণে। প্রথম দিকে সে হাডসন আর ডরোথিকে চোখে চোখে রেখেছিল, তার কারণ ডরোথি হাডসনকে তার চিঠির কথা বলে কিনা দেখার জন্যে। পরে তার পাগলামো যখন বাড়ল তখন তার মনে হল, হাডসন নিশ্চয়ই তার গোপন প্রণয়পত্রের কথা জানতে পেরেছে। ইদানিং তাই সে ভয়ে ভয়ে থাকতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু রেবেকার চিঠিগুলো ডরোথি কোথায় লুকিয়েছে। নিশ্চয়ই ডরোথি কাছ ছাড়া করেনি সেগুলো। সুটকেশের ভেতরে ওর দৈনন্দিন ব্যবহারের পোশাক আশাক রয়েছে। নাড়াচাড়া করতে করতে তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একরাশ চিঠি।

এ চিঠি নিশ্চয়ই রেবেকার। কারণ রেবেকার হাতের লেখা আমার কাছে অপরিচিত নয়। মাঝে মাঝে বাংলো থেকে আমার নিমন্ত্রণ আসত। সেই নিমন্ত্রণের চিঠি রেবেকাই লিখে পাঠাতেন। তাঁর চিঠির ভাষাও ছিল বিশেষ উপভোগ্য।

চিঠিগুলো কাছে রেখে দিলাম, ডরোথি সুস্থ হয়ে উঠল।

হাডসনের কাছে চিঠি লিখলাম, তিনি যেন রেবেকাকে অবশ্যই পাঠিয়ে দেন হাসপাতালে। আমি তাঁর চিকিৎসা করব।

হাডসন চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই রেবেকাকে নিয়ে এলেন।

বললাম দু'বোনকে আমি কয়েকদিন এক সঙ্গেই রাখতে চাই।

হাডসন বললেন, স্বচ্ছন্দে।

উনি চলে গেলে রেবেকাকে সঙ্গে নিয়ে আমি চললাম শালবনে বেড়াতে।

আমার কাছে রেবেকা চুপচাপ থাকেন, এটা লক্ষ করেছি। আমি আগে চলেছি, রেবেকা আসছেন পিছনে। এবার একটু পিছিয়ে ওঁর পাশাপাশি চলতে লাগলাম।

বললাম, আপনার ব্যবহার আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে।

রেবেকা আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম, আপনার কোনওরকম উপকার করতে পারলে আমি খুব খুশি হই।

রেবেকার মুখে কেমন যেন ভাবান্তর হল।

বললেন, আপনি আমার উপকার করতে পারেন, সত্যি বলুন?

নিশ্চয়ই পারি।

আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে রেবেকা আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন, না, আপনি পারেন না।

সামনের একটা পাথর দেখিয়ে বললাম, আসুন এর ওপর বসা যাক্।

রেবেকা আর আমি বসলাম পাথরটার ওপর।

পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করে রেবেকার হাতে দিয়ে বললাম, দেখুন তো হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কিনা।

মানুষের মুখের এমন পরিবর্তন আমি আগে কখনও লক্ষ করিনি।

মুহূর্তে রেবেকা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, এ চিঠি আমার, এ চিঠি আমার।

পরক্ষণেই আমার দিকে তাকিয়ে কাগজের মতো রক্তশূন্য হয়ে গেলেন।

এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন ডাক্তার জনসন? ডরোথি আমার সব চিঠিই তো চার্চে গিয়ে পিটারের কাছ থেকে নিয়ে এসেছে।

বললাম, আমি যদি আপনাকে আপনার সবগুলো চিঠিই ফিরিয়ে দিই।

আমার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসলেন রেবেকা।

চিরদিন কৃতজ্ঞ হয়ে রইব মিঃ জনসন।

বললাম, প্রতিদানে আমি যদি কিছু চাই, দেবেন?

নিশ্চয়ই দিতে চেষ্টা করব জনসন।

বললাম, কথা দিন হাডসনকে ছেড়ে কোনও দিন আর পিটারের কাছে যাবেন না।

কতক্ষণ আপন মনে কী ভাবলেন রেবেকা। দু'চোখ বেয়ে জল নামল। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। আমি আর বাধা দিলাম না। কাঁদতে কাঁদতে মনটা হাল্‌কা হয়ে গেলে মানসিক যন্ত্রণার গুরুভারটা নেমে যাবে।

এক সময় শান্ত হলেন রেবেকা।

বললেন, আমি জানতে চাই না কী করে ডরোথির কাছ থেকে আপনি আমার চিঠিগুলো উদ্ধার করলেন। তবে আমি আর পিটারের কাছে যাব না কথা দিচ্ছি।

ওঁর হাতে চিঠির গোছা তুলে দিতে যেতেই উনি কী যেন ভাবলেন।

আপনি ওগুলো রেখে দিন মিঃ জনসন। মানুষের মন, কখন কী হয় বলা যায় না। চিঠিগুলো আপনার কাছে থাকলে তবু মনে একটা ভয় থাকবে।

বললাম, আপনার ভয় থাকবে কিনা জানিনা, তবে আমি নির্ভয় হয়েছি, এ কথা বলতে পারি।

চিঠিগুলো পাথরের ওপর জড়ো করলাম। পকেট থেকে দেশলাই বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম।

দাউ দাউ করে রেবেকার জীবনের অনেক স্মৃতি জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল।

২২ আগস্ট ঃ

কয়েক মাস বর্ষার ভেতর কাটল। এবার পথের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। সরকারী বন-বিভাগের পুলিশের যাতায়াতের জন্যে হাডসন বিশেষ পরিশ্রম করে পথঘাট ভালভাবে মেরামত করেছিলেন। বর্ষায় কর আদায় কিংবা জঙ্গলের বাসিন্দাদের ওপর জোর জুলুমের কোনও চেষ্টাই করা হল না।

এই বর্ষায় আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে। কাজের ভেতর থেকেও যা আমি একেবারেই ভুলতে পারছি না।

কয়েকদিন একটানা বৃষ্টির ভেতর হাসপাতালে বন্দি থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম! হঠাৎ সকাল থেকে মেঘ কেটে গেল।

বর্ষাধোয়া আকাশে সোনা রংয়ের রোদ্দুরটুকু বড় উপভোগ্য হয়ে উঠল। আমি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথের ধারে গাছপালার মখমলের মত সবুজ পাতার ওপর থেকে রোদের সোনা গড়িয়ে পড়ছিল। আমি তাই দেখতে দেখতে চললাম। পাহাড়ি ঝোরার ধারে ওই যে বসে আছে ধনেশ পাখি। বড় বড় বাঁকানো শান দেওয়া ঠোঁট। হরিয়াল উড়ে গেল। আকাশের গায়ে যেন মিশে গেল আকাশি রঙ। পথে পথে বন যুঁই। সবুজ পাতার ওপর একরাশ সাদা তারা-ফুল ফুটিয়ে রেখেছে। কী মিষ্টি গন্ধ।

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি আর প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য দেখছি। দেখতে দেখতে কতদূর চলে এসেছি, বুঝতে পারিনি।

সামনে আর এক রূপের জগত আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

একটি শালগাছের তলায়, যেখানে পাথরের গর্তের ভেতর বর্ষায় জল জমে ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে শিশুকে নিয়ে মা-হরিণী।

জল খেতে এসেছে বোধহয়। ঘোড়ার পায়ের সাড়া পেয়ে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বর্ষাধোয়া রোদ তাদের সুচিক্কণ দেহের ওপর যেন পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

ওরা তাকিয়ে আছে, আমিও ওদের থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। মা-হরিণী বাচ্চাটাকে লেহন করতে লাগল। এত স্নেহ জননীর। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। কত শৈশবে মাকে হারিয়েছি।

বর্ষাধোয়া প্রকৃতির মত মনটা কেমন ভিজে নরম হয়ে গেল।

বেলা বাড়ল। আমি এপথে ওপথে চলতে লাগলাম। যখন খেয়াল হল তখন দেখি আমি চেনা পথ হারিয়েছি। একটি পথ ধরে কিছু সময় ঘোড়া ছুটিয়ে যাই, আবার অন্য পথ ধরি।

এমনি ভাবে চলতে চলতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এদিকে আকাশ ঘিরে মেঘ জমতে শুরু করেছে।

সামনে একটি উঁচু টিলা দেখে ঘোড়া ছেড়ে তার ওপরে উঠলাম; যদি এর ওপর থেকে কোনওরকম চেনা জায়গার সন্ধান পাওয়া যায়। টিলার ওপর উঠে সামনে যতদূর দেখা যায়, অসংখ্য পাহাড়ের রাজ্য।

নীলে সবুজে মেশা পর্বত-তরঙ্গ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। কী অপরূপ সৌন্দর্য ঈশ্বর এই দুটি চোখের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন।

বামে চোখ পড়তে দেখলাম, খুব কাছেই একটি উপত্যকা। সহসা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। গাছপালার ফাঁকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা ভাঙা দুর্গের মত কী যেন আমার চোখে পড়ল।

এখানে আদিবাসী এলাকায় দুর্গ এল কোথা থেকে! ভাল করে দেখলাম, মন্দির রয়েছে একদিকে। একটি জলধারা বয়ে চলেছে দুর্গটি বেষ্টন করে।

কতক্ষণ এমনি একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম, হঠাৎ একটা নাগরার আওয়াজ শুনে টিলার ওপর থেকে নেমে এলাম। কোথা থেকে নাগরার শব্দটা আসছে বোঝা গেল না, কারণ মুহূর্তে সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে-পাহাড়ে। দূরে কাছে যত পাহাড় আছে, মনে হল তাদের প্রতিটির থেকেই এ শব্দ-তরঙ্গ উঠে আসছে।

টিলার থেকে নেমেই ঘোড়ায় চড়ে যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে ফিরে চললাম। পাহাড়ি বাঁক ঘুরতেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার বিস্ময় চরমে উঠল।

ঘোড়ার ওপর চড়ে একটি মেয়ে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

সাধারণ হো সম্প্রদায়ের মেয়েদের ভেতর যে ধরনের গড়ন দেখেছি তার থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। কেবল গায়ের রঙের কিছুটা মিল রয়েছে, তবু আদিবাসী হোদের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। দেহের গড়ন সুঠাম। মনে হল যেন পাথর কুঁদে দক্ষ কোনও শিল্পী এ মূর্তিটি গড়েছেন।

আমি তার উপস্থিতি ভুলে, সেই বিশেষ ধরনের পরিবেশের কথা ভুলে, তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটি প্রথমে কথা বলল, এ অঞ্চলে আসার কারণটা জানতে পারি কি?

পথ হারিয়ে হঠাৎ এসে পড়েছি।

আস্তানা বরাইবুরু না কুম্‌ডির বাংলো?

বললাম, ও দুটোর কোনওটাতেই নয়।

তবে? কথার ভেতর সামান্য একটু ঝাঁঝ ছিল।

বললাম, থলকোবাদের হাসপাতালে আপাততঃ আমার ডেরা।

মেয়েটি সহসা ঘোড়ার থেকে নেমে মাথা নত করে আমাকে অভিবাদন জানাল।

আপনিই ডাক্তার জনসন!

কথা শুনে আমি হতবাক। এতদূরে এই রহস্যময়ী মেয়েটি আমার নাম জানলো কী করে!

আমাকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটি বলল, এর আগে আপনাকে আমি না দেখলেও, আপনার নাম আমার কাছে অপরিচিত নয়।

আকাশে মেঘের ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি, বর্ষার প্রায় সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে।

মেয়েটি কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, দূরে এসে পড়েছেন ডাক্তার জনসন, তা ছাড়া এই

ছোটনাগরা এলাকাটিও ইংরাজদের পক্ষে খুব সুখকর নয়। আসুন, আপনাকে পথে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

মেয়েটি আগে আগে চলল, আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। ভাঙা চোরা. উঁচুনিচু কত অজানা অচেনা পথ ধরে মেয়েটি অবলীলায় এগিয়ে চলল, আর আমি তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করতে লাগলাম।

এক জায়গায় এসে দেখলাম, দুটি পাহাড়ের মাঝে গিরিসঙ্কট। সেই ফাঁকে একটি খরস্রোতা জলধারা বয়ে চলে গেছে উপত্যকার একেবারে ভেতরে। কাছাকাছি এসেই মেয়েটি বলল, সাবধানে আমাকে লক্ষ রেখে আসুন।

ওকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সেই দুর্গম স্থানটি পার হলাম।

মনে হল, এই অঞ্চল মেয়েটির একেবারে নখদর্পণে।

এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার পথ প্রদর্শিকা বলল, এখন যতদূর সম্ভব দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে আমাকে অনুসরণ করুন। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। বৃষ্টি হলেই কোয়েল নদীতে বান আসবে। তখন পার হওয়া দুঃসাধ্য হবে। পথ সংক্ষেপ করার জন্যে ওপরের পথ ছেড়ে নীচের পথেই আমাদের চলতে হচ্ছে।

বেশ কিছু সময় চলার পর আমরা কোয়েলের কূলে এসে পৌঁছলাম। পার হতে গিয়ে ঘোড়ার বুক অবধি জলে ডুবল। আমরা ঘোড়ার ওপর প্রায় দাঁড়িয়েই পার হলাম, তাই পোশাক কোনওরকমে রক্ষা পেল।

কোয়েল পেরিয়ে আসতেই চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এল। আরও কিছু পথ একসঙ্গে আসার পর মেয়েটি বলল, আশাকরি এখন আপনি আপনার চেনা পথ পেয়ে গেছেন।

এতক্ষণ ওকেই অনুসরণ করে এসেছি, তাই পথ চেনার দরকার হয়নি, এখন চোখ মেলে ভাল করে চারদিকে তাকালাম।

সামনেই কুম্‌ডির পথ চলে গেছে। দু'জনে পথের ওপর উঠে এলাম।

মেয়েটি ঘোড়ার থেকে নেমে দাঁড়াল, আমিও নামলাম।

আপনি আমাদের জঙ্গলের লোকদের ভালবাসেন, সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

বললাম, ডাক্তারের কাছে যেমন রোগের বিচার নেই, চিকিৎসাই একমাত্র ধর্ম, ঠিক তেমনি মানুষেরও বিচার নেই। সেবা করার জন্যেই আমাদের ডাক্তারী শিক্ষা।

ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে ততক্ষণে। রহস্যময়ী মেয়েটি আমাকে শেষবারের মত অভিবাদন জানিয়ে বলল, আশা করি আজকের এই সাক্ষাতের কথা লোকের মুখে মুখে রটবে না।

বললাম, ডাক্তার জনসন অকৃতজ্ঞ নয়।

বৃষ্টি জোরে জোরে পড়তে লাগল। বাতাস বইল। মেয়েটি ঘোড়ায় চড়ে বলল, আপনি যান ডাক্তার জনসন। বান আসার আগেই আমাকে অন্ততঃ কোয়েল নদী পার হয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে।

দ্রুত ঘোড়া ছুটল। চোখের পলকে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল!

আমি ফিরে চললাম কুম্‌ডির বাংলো লক্ষ করে। কিন্তু অল্প দূর যেতে না যেতেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। বাতাসের বেগও দ্রুত হল। একান্ত চেনা পথে আমায় বিশেষ কোনও অসুবিধেয় পড়তে হল না। কুম্‌ডির বাংলোতে বেলা শেষের আগেই পৌঁছে গেলাম। কিন্তু

আমার চিন্তায় কেবল একটি কথা আসা যাওয়া করতে লাগল, বান আসার আগেই রহস্যময়ী নদী পার হয়ে যেতে পেরেছে কী!

১৯ ডিসেম্বর ঃ

প্রথমে সাসাংদা গীর্জা আক্রান্ত হল। আগুন লাগিয়ে কাঠ আর খড়ের তৈরি গীর্জা, সংলগ্ন বাসগৃহগুলি পুড়িয়ে দিল বিদ্রোহীরা।

তার আগে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল ছাতমবুরুতে। হোদের ঈশ্বর সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার আস্তানা ছিল ওই পাহাড়ে। সেখানে সরকার লোহার সন্ধান পেয়েছিল, সুতরাং সরকারী নিয়ন্ত্রণের ভেতর আনা হল ছাতিমবুরুকে। বসল সেখানে সশস্ত্র রক্ষীদল।

হোদের অসন্তোষ আগেই ধূমায়িত হয়েছিল। সরকারকে কর দেবার ব্যাপারে, বনে কাঠ কাটার ওপর নিষেধ জারির ব্যাপারে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তার ওপর ধর্মস্থান যখন বন্ধ হল তখন ধূমায়িত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

এর ফলে সাসাংদার গীর্জায় প্রথম শুরু হল বিদ্রোহীদের হানা। পিটার আর তাঁর দলবলের ওপর কোনও রকম আক্রমণ করা হল না। তাঁরা কুম্‌ডির ডাক বাংলোতেই আশ্রয় নিলেন।

সরকারী পুলিশ ফোর্স গেল সাসাংদায়। হার মানলেই বিদ্রোহীরা সুযোগ পাবে বেড়ে ওঠার। তাই নতুন করে গীর্জা তৈরির কাজ শুরু হল। কয়েকদিনের ভেতর নতুন ছাউনি উঠল। আবার পিটার চললেন তাঁর দলবল নিয়ে। এবার গীর্জা সংলগ্ন জমিতে পুলিশ ব্যারাকও তৈরি হল। গীর্জা আক্রান্ত হলে সরকারী বাহিনী তা রক্ষা করবে। এদিকে আদিবাসীদের ভেতর যারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা দলে দলে চলে এল সাসাংদার কাছাকাছি। সরকারের আশ্রয় না থাকলে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সরকারী পুলিশ সাসাংদার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও টহল দিতে শুরু করল।

কয়েকদিন চুপচাপ কেটে গেল। সরকারী বাহিনী পর্যবেক্ষণ করতে লাগল আক্রমণের প্রকৃতি। কিন্তু কোনওদিক থেকেই কোনওরকম সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল ইনফরমারদের মুখে শোনা যেতে লাগল নানান কাহিনী। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হো, লোহার, মুণ্ডা, সাঁওতাল সম্প্রদায়কে একত্রিত করা হচ্ছে। ওই একটি মেয়েই এ কাজে অগ্রণী হয়েছে।

মনে মনে মেয়েটিকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলাম না। আমি নিশ্চয়ই দেখেছি তাকে। আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, সেই রহস্যময়ী তরুণীর দ্বারা সব কিছুই করা সম্ভব।

মেয়েটির নাম নাকি শনিচারি। নামটা বার বার উচ্চারণ করলাম। তার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল আমার চোখের ওপর। কিন্তু আমি কারও কাছে তার কথা বলতে পারলাম না। আবার খবর পেলাম সাসাংদার গীর্জা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সংলগ্ন গ্রামের একটি কুটিরও অক্ষত নেই। এত কড়া পাহারার ভেতর কী করে এমন কাণ্ড ঘটল, তা ভেবে প্রথমে বিস্মিত হলাম। পরে শুনলাম, মাঝরাতে যখন সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ, শুধু দু'একজন পাহারাদার গীর্জা সংলগ্ন ব্যারাকে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তখনি আক্রমণ শুরু হয়।

সকলে জেগে উঠে দেখে গীর্জা জ্বলছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে গ্রামখানা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বিদ্রোহীদের ভেতর একটি মানুষেরও সন্ধান পাওয়া গেল না।

ভোরে উঠে রহস্যের সমাধান হল। তীরের মুখে আগুন জ্বেলে দূর থেকে বিদ্রোহীরা গীর্জা আর গ্রাম লক্ষ করে ছুঁড়েছে। তার ফলে এই অগ্নিকাণ্ড।

সরকার এবার এক একটি গ্রাম লক্ষ করে ঘেরাও করল। কর আদায়ের জন্যে মারধোর শুরু হল। কিন্তু খবর পেলাম, একটিও মানুষের কাছ থেকে নাকি কর আদায় করা সম্ভব হয়নি। গ্রামের মাতব্বরদের ধরে নিয়ে আসা হল বরাইবুরুর ক্যাম্পে। সেখানে তাদের ওপর চলল অত্যাচার। কিন্তু কারও মুখ থেকে তাদের প্রধান ঘাঁটির খবর বের করা গেল না।

বরাইবুরুতে গড়ে উঠেছিল সাময়িক কয়েদখানা। দলে দলে আদিবাসীদের ধরে নিয়ে এসে সেখানে কয়েদ করে রাখা হত। কথা আদায়ের জন্যে চলত নানা ধরনের অত্যাচার।

একদিন বরাইবুরুর কোয়ার্টার থেকে আমার ডাক এল। গিয়ে দেখি, কয়েকটি আদিবাসী কয়েদখানার মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাদেব নাকে মুখে রক্ত চাপ বেঁধে জমে আছে।

শুনলাম, তাদের কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্যে অতিরিক্ত প্রহারের ফল।

এদের সুস্থ করে তোলার ভার পড়ল আমার ওপর। কারণ এরা নাকি অনেক কিছুই জানে। বিদ্রোহী আদিবাসী দলের অন্যতম তিনজন প্রধান এরা।

সাধ্যমত চিকিৎসা করলাম। আর্তের চিকিৎসা করা আমার কর্তব্য বলে আমি করলাম। কিন্তু যে অবস্থার ভেতর ওরা পড়েছে তাতে মৃত্যুর আগে নিষ্কৃতি পাবে বলে মনে হল না।

শুনলাম, এরা একটু সুস্থ হলেই আবার শুরু হবে জেরা। দিনরাত্রি পুলিশের লোক এদের সঙ্গে কথা কইবে। বিশ্রামের কোনও সুযোগই দেওয়া হবে না এদের। তারপর নখের ভেতর সূঁচ ঢুকিয়ে গোপন কথা আদায়ের চেষ্টা চলবে।

ফিরে এলাম হাসপাতালে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মানুষের ওপর এ ধরনের নির্দয় অত্যাচারের ভেতরে যে পশু মনোবৃত্তি আছে আমার আত্মাকে বার বার তা পীড়া দিতে লাগল। একবার ভাবলাম, চাকরী ছেড়ে চলে যাব এখান থেকে। আবার মনে হল, এখানে থাকলে তবু আহতের সেবার সুযোগ পাওয়া যাবে। সাধ্যমত তাদের সারিয়ে তোলার চেষ্টা করব। আমার জাতি, আমার দেশ আজ ভিন্ন দেশের মানুষের ওপব যে অন্যায় আচরণ করছে, তার সামান্য কিছু যদি আমার সেবার ভেতর দিয়ে লাঘব করতে পারি।

সেদিন আর একটি অমানুষিক ঘটনা ঘটতে দেখলাম।

বরাইবুরু থেকে ডাক আসতে গিয়ে দেখি, একটি মেয়ে কয়েদখানায় পড়ে আছে। দেহ তার ক্ষত বিক্ষত। পরীক্ষা করে দেখলাম, অত্যাচারের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। মানুষের পশুবৃত্তি কতদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তার পরিচয় পেলাম সেদিন।

চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাঁচান গেল না।

মেয়েটি নাকি কয়েকদিন আগে উপযাচক হয়ে এসেছিল ইনফরমারের কাজ করবে বলে। তারই নির্দেশমত এখানকার পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের একটা গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধানে যায়। মেয়েটিকে কিন্তু আটকে রাখা হয় বরাইবুরুর ব্যারাকে।

পুলিশ বাহিনী মেয়েটির নির্দেশমত এসে পৌঁছল একটি পাহাড়ি নদীর কাছে। নদীতে জল ছিল হাঁটু পরিমাণ। সেখান থেকে গুপ্ত ঘাঁটির দূরত্বও ছিল অনেকখানি। তারা যখন সবাই মিলে নদী পার হচ্ছিল, তখন হঠাৎ পাশের জঙ্গল থেকে ঝাঁক ঝাঁক তীর এসে পড়তে লাগল তাদের ওপর। দু'চারটি ছাড়া বিরাট পুলিশ বাহিনীর প্রায় সব ক'টিই নিঃশেষ হয়ে গেল।

এরপর মেয়েটির ওপর শুরু হল অত্যাচার। প্রতিপক্ষের গুপ্তচরের ওপর যে ধরনের আচরণ এদের বিধানে আছে, তার সব ক'টিরই পরীক্ষা করতে লাগল এরা।

শুনলাম, পুলিশ বাহিনীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার খবর শুনে মেয়েটি সেই যে হাসি শুরু করেছিল, অজ্ঞান হয়ে যাবার মুহূর্ত পর্যন্ত সে হাসি আর থামেনি।

সে নাকি অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে বলেছিল, তার স্বামীকে মেরে ফেলার প্রতিশোধ সে নিয়েছে।

মৃতের কাছ থেকে উঠে আসার সময় শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে মনে মনে বললাম, এ দেশের মানুষের ওপর আমার শ্রদ্ধা তুমি বাড়িয়ে দিলে। আমার অন্তরের অভিনন্দন রইল তোমার উদ্দেশ্যে। সর্বময় প্রভু তোমার মঙ্গল করুন।

১৪ ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯০০

একটি খবর শোনা গেল। উড়িষ্যা থেকে আদিবাসীরা দলে দলে আসছে সারান্দা বনের দিকে, হাতে তাদের তীর ধনু আর টাঙি। সরকারী গুমটির টহলরত দু'জন পুলিশ তাদের দেখতে পেয়েছিল, গতিরোধের চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু তারা সমর্থ হয়নি। এক রাত বন্দী থেকে তারা ফিরে এসেছে। তাদের মুখে শোনা গেল এক রহস্যজনক কাহিনী। একটি অশ্বারোহিণী মেয়ে, হাতে তলোয়ার নিয়ে পরিচালনা করছে সমস্ত দলটিকে। গভীর পাহাড়ি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে দলে দলে তারা এগিয়ে আসছে। রাতে মশাল জ্বেলে চলেছে তারা। দিনের বেলা ঘন বনের ভেতর আত্মগোপন করছে। তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে টহলদারী পুলিশেরা বন্দি হয়েছিল।

এক রাত তাদের নাকি কাটাতে হয়েছিল ওই আদিবাসীদের সঙ্গে। বিশেষ অভিজ্ঞতা নিয়েই তারা ফিরে এসেছে ক্যাম্পে।

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলের নেত্রীর নির্দেশে তারা সকলে মিলে প্রার্থনা করে। তারপর নেত্রী তাদের সামনে আদিবাসীদের অধিকার সম্বন্ধে, তাদের একতা সম্বন্ধে, কথা বলে যায়। সে কথা নাকি আদিবাসীরা গভীর আগ্রহে শোনে। প্রাণ দিয়েও নেত্রীর অনুগত থাকবে বলে তারা প্রতিজ্ঞা করে।

সবশেষে শুরু হয় নাচ আর গানের আসর। দীর্ঘ পথ চলতে গিয়ে তাদের মন যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে সেজন্য এই ব্যবস্থা। মণ্ডলের মাঝে ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়ে থাকে নেত্রী। তাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় নৃত্য আর গীত। সে এক বিশেষ উপভোগ্য দৃশ্য। টহলদার পুলিশের সামনেও এমনি নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়েছে। তারপর নেত্রী পুলিশদের বলেছে, তোমরা দেশের মানুষ হয়ে কেন এমন শত্রুতা করছ আমাদের সঙ্গে।

পরের দিন সকালে অবশ্য তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তারা ফিরে আসার সময়ে নেত্রী বলে দিয়েছে, সরকারকে প্রস্তুত থাকতে বলো। আমাদের দেশের এই সরল মানুষগুলি সহজে তাদের অধিকার ছেড়ে দেবে না।

বসে বসে ভাবছি, এ নিশ্চয়ই সেই অরণ্য-কন্যা, যার ক্ষণিক সঙ্গ আমি পেয়েছিলাম। সেদিন তার চোখে মুখে যে দীপ্তি, যে পরোপকার-ব্রত দেখেছি, আজ মনে মনে তাই আর একবার স্মরণ করলাম। নেত্রী হবার উপযুক্তই বটে। কিন্তু কোথায় ছিল এ অরণ্য-অগ্নি। যে সব আদিবাসীদের সঙ্গে আমি মিশেছি, তাদের ভেতর এ স্ফুলিঙ্গ তো কোনও দিন দেখিনি।

হয়ত এমনি হয়। যখন মানুষ অত্যাচারের শেষ সীমায় এসে দাঁড়ায় তখন তারা মরিয়া হয়ে ওঠে।

তারা আঘাত হানবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সেদিন তাদের পরিচালনা করবার জন্য তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় উপযুক্ত কোনও চালক।

জোয়ান অব আর্কের কথা মনে পড়ল। আমাদের জাতির মানুষ যখন পর-রাজ্যের লোভে এগিয়েছে, তখনই নিপীড়িত মানুষের মধ্য থেকে জেগে উঠেছে মহিয়সী মহিলা জোয়ান।

আজ আমার চোখের ওপর নতুন এক জোয়ানের আবির্ভাবের ছবি ফুটে উঠেছে। জোয়ানকে যে অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়েছিল, দেখছি সেই অগ্নি থেকেই যেন শাণিত তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে আসছে আর এক অগ্নি-কন্যা। আমি ভয় পেলাম না। আমার জাতির অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মনে মনে তাকে স্বাগত জানালাম।

১৭ মে ঃ ১৯০০

এবার হাডসন বরাইবুরুর হেড কোয়ার্টারে একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। তার পরিকল্পনাটি ছিল এইরূপ, গ্রীষ্মকালে বনে বনে যখন আগুন লাগবে, আর সে আগুন ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে, তখন তাকে নেভাবার কোনও চেষ্টাই করা হবে না; বরং নদীর বিপরীত মুখে দুর্গম আদিবাসী এলাকায় যাতে সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

হেড কোয়ার্টার মেনে নিল হাডসনের এই পরিকল্পনা। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরের মত এ বছরও আগুনের ভয়াবহ খেলা শুরু হয়ে গেল।

সরকারী চেষ্টায় যে আগুনের গতি নদীর পথে চালনা করা হত, তা আর হতে পারল না। ফলে, আগুনের তাণ্ডব চলল সারা গ্রীষ্মকাল ধরে।

আমার হাসপাতালে কিছু কিছু আগুনে পোড়া রোগী আসতে লাগল। আমি তাদের সেবায় রাত দিন নিযুক্ত রইলাম। কিন্তু বেশিদিন তা করা চলল না। সরকার থেকে আমার কাছে কড়া নির্দেশ এল, আমি যেন আদিবাসী রোগীদের সরকারী হাসপাতালে ভর্তি না করি।

এর উত্তরে আমি জানালাম, আমি ডাক্তার, রোগী এলে তাদের ফেরানো আমার সাধারণ সেবাকর্মের নীতির বাইরে। সুতরাং আমাকে এই হাসপাতালের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

আমার সাফ জবাবে কতৃপক্ষ কিছুটা নরম হলেন। তাঁরা আর আমাকে বরখাস্ত বা বদলী করতে চাইলেন না।

কিন্তু আর একটি উপায় তাঁরা অবলম্বন করলেন।

বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলে নাগরা পিটিয়ে ঘোষণা করতে লাগলেন যে, এরপর যদি কোনও আগুনে পোড়া রোগীকে হাসপাতালের পথে বয়ে আনতে দেখা যায় তা হলে তাদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

এই ঘোষণায় আমি খুবই আহত হলাম। কিন্তু আমার দিক থেকে এর প্রতিবাদে কোনও কিছু করার রইল না।

হাসপাতালে রোগীর আসা বন্ধ হয়ে গেল। সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি মনে মনে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম।

শেষে স্থির করলাম, রাতের বেলাতেই গোপনে আমি পাহাড়ি গ্রামে গ্রামে যাবার চেষ্টা করব।

শেষ পর্যন্ত তাই শুরু করলাম। রাতে ঘোড়ায় চড়ে পথে যেতে খুব অসুবিধে হত। অন্ধকার রাতে পথ চিনে যেতে পারতাম না। চাঁদের আলোয় বের হতাম। এ অঞ্চলগুলো আমার চেনা জানা হয়ে গিয়েছিল, তাই বিশেষ কষ্ট হত না।

রোগীর সেবা করে যখন হাসপাতালে ফিরতাম, তখন মনটা তৃপ্তিতে ভরা থাকত। পথের হিংস্র পশুর ভয় আমার মনকে আচ্ছন্ন করতে পারত না।

এবার বিপদ এল অন্য দিক থেকে। ওষুধ ফুরিয়ে গেল। কর্তৃপক্ষের কাছে ওষুধ পাঠাবার জন্যে লিখতেই উত্তর এল, আগুনে পোড়া সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা নিশ্চয়ই এমন অধিক নয় যে প্রভূত পরিমাণ ওষুধ ডাক্তার জনসনের দরকার হতে পারে।

আমি প্রায় নিরুপায় হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে শুধু হাতে গিয়ে ওদের সমবেদনা জানিয়ে আসি। ওষুধ নেই, তাই আজকাল প্রায় দিন আমার আর গ্রামে যাওয়া হয় না।

এক সন্ধ্যায় হাতপাতালে বসে বসে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। আগুন জ্বলছিল সে পাহাড়ে। আমার মনে এসেও লাগছিল সে আগুনের আঁচ। এমন সময় একটি বলিষ্ঠ মানুষ আমার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। দেখলাম, লোকটা আদিবাসী।

আমাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, ডাক্তার জনসন যদি অনুগ্রহ করে আগুনে পোড়া রোগীর ওষুধগুলো লিখে দেন তা হলে আমি আপনাকে তা আনিয়ে দিতে পারি।

লোকটির কথায় বিস্মিত হলাম। কিন্তু এখানে কাছেপিঠে এমন কোনও মেডিক্যাল স্টোর নেই যেখান থেকে ওষুধ নিয়ে আসা যায়।

বললাম, আমি লিখে দিচ্ছি, কিন্তু ওষুধ এ অঞ্চলে পাওয়া সম্ভব হবে না। তা ছাড়া আমার হাতের লেখা প্রেসক্রিপশন যেন কর্তৃপক্ষের হাতে কোনও রকমে না পড়ে।

লোকটি আমার প্রেসক্রিপশন নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

কয়েকদিন পরেই দেখি সেই লোকটি আবার ফিরে এসেছে। বিরাট একটি ওষুধের প্যাকেট আমার হাসপাতালের বারান্দায় নামিয়ে রেখে সে বলল, ডাক্তার জনসন, আশাকরি এরপর আপনার চিকিৎসার কোনও অসুবিধে হবে না।

লোকটি আর অপেক্ষা না করে ঘোড়ার পিঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি একটু অবাক হলাম। প্রথম যেদিন লোকটি আসে সেদিন ভেবেছিলাম দরকারটা ওরই বাড়ির। হয়ত কোনও সম্পন্ন আদিবাসী ও। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। আমি নিজের সম্প্রদায়ের ওপর দরদী ওই লোকটিকে মনে মনে অশেষ সাধুবাদ দিলাম।

এরপর আদিবাসীদের সেবা করতে আমার আর কোনও অসুবিধেই হল না।

১৫ আগস্ট ঃ ১৯০০

এবার বর্ষায় লড়াই চরমে পৌছল। হাডসন এ বছর আরও উৎকৃষ্টভাবে পথঘাট তৈরি করে রেখেছিলেন।

নতুন কয়েকটা পথও শুকনোর দিনে তৈরি করা হয়েছিল। তবে সে সব পথে আশানুরূপ কাজ এগোয়নি। কারণ আদিবাসীরা লড়াইয়ের জন্য সরকারী কাজ করতে নারাজ।

এবারও কর্তৃপক্ষ বর্ষাতে চুপচাপ থাকতে মনস্থ করেছিল, কিন্তু তার সুযাগ পাওয়া গেল না।

বর্ষা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে আদিবাসী তীর ধুন টাঙি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন ঘাঁটি লক্ষ করে। সমানে লড়াই চলল। বাঁধান সরকারী পথ বিদ্রোহীরা জায়গায় জায়গায় কেটে দিল। বর্ষার জল সেই পথে গড়িয়ে গিয়ে ভয়াবহ খাদের সৃষ্টি কবল।

যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

খবর এলো, দলে দলে আদিবাসী যোদ্ধা চলেছে ছাতমবুরুর দিকে। মারংবোঙ্গা আর সিংবোঙ্গাকে উদ্ধার করতে হবে শত্রুর হাত থেকে। তারা গভীর জঙ্গল, দুর্গম গিরিখাদ, সব কিছু পার হয়ে চলেছে। মেয়েরা চলেছে আগে আগে। তাদের মাথায় কলস। পূজার উপচার হাতে। দেবস্থান উদ্ধার হলে তারা পূজা দেবে দেবতার উদ্দেশ্যে।

বরাইবুরুর ক্যাম্প থেকে সশস্ত্র পুলিশ পাঠান হল। তারা ঘোড়ায় চড়ে চলল ছাতমবুরুর দিকে। ওখানে যে সব রক্ষী রয়েছে, তাদের দলবৃদ্ধি করাই এদের উদ্দেশ্য।

আদিবাসীরা দুর্গম পথ দিয়ে চলেছে, আর এরা চলেছে বাঁধান পথের ওপর দিয়ে। কিন্তু পদে পদে বাধা। সরকারী পথ যেখানে সেখানে আদিবাসীরা ভেঙে দিয়েছে। সেই ভাঙা পথে কোথাও কোথাও বয়ে চলেছে বর্ষার খর জলস্রোত।

সরকারী পুলিশেরা ছাতমবুরুর কাছাকাছি এসেই বিপদের সম্মুখীন হল। শাল আর শিমুলের ঘন বনের আড়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর-বৃষ্টি তাদের ওপর শুরু হল। ঘোড়া সমেত আরোহীরা এই অসতর্ক আক্রমণে ছিট্‌কে পড়ল ডানদিকের গভীর খাদে। তাদের ভেতর অতি অল্পই পৌঁছল ছাতমবুরু আক্রমণ করতে।

তখন গভীর রাত। ছাতমবুরু পাহাড়ে ওঠার পথে সারি সারি সান্ত্রী বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খবর পাওয়া গেছে আজই আদিবাসীরা ছাতমবুরু আক্রমণ করবে।

বেস ক্যাম্পে কারও চোখে ঘুম নেই। বয় বেয়ারাগুলো পর্যন্ত তটস্থ হয়ে আছে। কীট পতঙ্গ রাতের অন্ধকার চিরে চিরে শব্দ করছে। মাঝে মাঝে হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে দু'একটা হিংস্র জন্তুর। কিন্তু এসব ব্যাপার আজ কারও মনে কোন রেখাপাত করছে না। আসন্ন একটা ভীষণ বিপদের জন্য প্রতীক্ষা করছে সবাই।

পাহাড়ে ওঠার এই একমাত্র পথ। অন্য দিকগুলো ভয়ানক খাড়াই, আর গভীর জঙ্গলে পূর্ণ।

বেস ক্যাম্পে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আলো জ্বালা হয়নি। অন্ধকারে ওঁৎ পেতে সান্ত্রীরা অপেক্ষা করছে শত্রুর আগমনের। রাত তখন প্রায় দুটো।

হঠাৎ মনে হল চারদিক কাঁপিয়ে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। ছাতমবুরুর পাহাড় যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে নীচে খসে পড়ছে। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কেবল পালাও, পালাও শব্দ। চারদিকে আতঙ্ক। গভীর অন্ধকারে পথ দেখা যায় না। পাথর এসে পড়ছে ক্যাম্পের ওপর। ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সব। চিৎকার উঠছে। মানুষের আর্ত চিৎকার। কে কোথায় পাথরের তলায় চাপা পড়েছে, তার গোঙানি উঠেছে।

আহত ঘোড়াগুলো বীভৎস আর্তনাদ করছে।

যারা কোনও রকমে বনের আড়ালে থেকে বেঁচে গেল, তারা সভয়ে দেখল একটা, দুটো করে শত শত মশাল জ্বলে উঠছে ছাতমবুরুর ওপর। নাগরার আওয়াজ ভেসে আসছে।

তারপর পঙ্গপালের মত দলে দলে বেস ক্যাম্পের পাশ দিয়ে উঠে যেতে লাগল আদিবাসীর দল। মারংবোঙ্গা আর সিংবোঙ্গার জয়ধ্বনি দিতে দিতে তারা উঠে চলল ওপরে।

আদিবাসীরা সেই রাতে অধিকার করে নিল ছাতমবুরু পাহাড়। সিংবোঙ্গা, মারংবোঙ্গার মন্দির মুক্ত হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে ইনফরমারের মুখে খবর পাওয়া গেল, দুর্গম খাড়াই পাহাড়ের যে দিকটাতে পাহারার কোনও ব্যবস্থা ছিল না, সেই পথে কতকগুলো আদিবাসী আগের রাতে কাঁধে কাঁধে

ভর দিয়ে ত্রিভুজের মত ওপরে উঠেছে। তারপর দড়ির সাহায্যে টেনে টেনে তুলেছে অন্যান্য সঙ্গীদের। তারা ওপরের পাহাড়ে শিলাখণ্ড আর নুড়িগুলোকে একত্র জড়ো করেছে।

সারাদিন এই কাজ করার পর, গভীর রাতে বেস ক্যাম্প লক্ষ করে ছেড়ে দিয়েছে সেই সব পাথরের বড় ছোট চাঁইগুলো। সারা পাহাড় কাঁপিয়ে সেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে নীচে। যখন বেস ক্যাম্পের লোকেরা আহত হয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন পাহাড়ের ওপর মশাল জ্বেলে আদিবাসীরা নাগরায় আওয়াজ তুলেছে। নীচে জঙ্গলের আড়ালে অপেক্ষমান হাজার হাজার আদিবাসী সেই শব্দে উল্লাসধ্বনি করতে করতে উঠে গেছে ওপরে।

বর্ষায় ছাতমবুরু পুনরাধিকার অসম্ভব। চেষ্টা করতে যাবার অর্থই হল অযথা অজস্র লোকক্ষয়। এদিকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলছে। বরাইবুরুর দিকেও নাকি এগিয়েছে দাঙ্গাকারীরা। বরাইবুরু অবশ্য সুরক্ষিত। সেখানে জঙ্গলের অংশ কম। অনেকখানি সমতল জুড়ে কয়েকশ সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রয়েছে সব সময়।

কুম্‌ডির বাংলো থেকে রেবেকা আর ডারোথিকে হাডসন বরাইবুরু পাঠাতে পারতেন, কিন্তু কী মনে করে থলকোবাদে আমার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন।

আমার হাসপাতালে আমি একটি সান্ত্রীকেও থাকতে দিইনি। তবু হাডসন আমার আস্তানাকেই সবচেয়ে নিরাপদ ভাবলেন।

রেবেকা আর ডরোথি এল। দেখলাম ইতিমধ্যে দু'বোনের খুব ভাব হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে সারাদিন সমানে চলল ওদের রসিকতা।

ডরোথির সঙ্গে আমার নাম যোগ করে কথা বলতে ভালবাসে রেবেকা। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, সেই কৌতুকময়ী মেয়েটি আবার তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছে।

মাঝে মাঝে রেবেকা বিষণ্ণ হয়ে যান। জিজ্ঞেস করলে আমাকে জানান হাডসন সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তার কথা। যে রকম এক রোখা মানুষ, না জানি এইসব হাঙ্গামার দিনে কী ভাবে সময় কাটাচ্ছেন।

ডরোথির বিষণ্ণতা কিন্তু অন্য দিকের। রাতের আঁধার নামলেই সে চারদিকের দরজা, জানালা বন্ধ করে বসে থাকে। তার কেবলই ভয়, এই বুঝি বুনো মানুষগুলো হাসপাতাল ঘেরাও করে তাকে ধরে ফেলল।

যত বোঝাই, আর সব জায়গায় গেলেও আদিবাসীরা এখানে আসবে না, ততই ডরোথি অবিশ্বাসের হাসি হাসে। বলে, বরাইবুরুতে যেতে পারলে সব চেয়ে খুশি হত সে।

এদিক থেকে আমি তাকে খুশি করতে পারলাম না ঠিক, কিন্তু আর এক দিক থেকে সে কেমন এক ধরনের আনন্দ অনুভব করতে লাগল।

রেবেকা যখন আমার সঙ্গে ডরোথিকে জড়িয়ে কৌতুক করেন, তখন ডরোথি খুশি হয়।

সেদিন হাসপাতালে রোগী দেখে কোয়ার্টারে ফিরে ডরোথিকে দেখলাম না। রেবেকা উঠোনে বসে কী যেন একটা বুনছিলেন।

ক'দিন একটানা বৃষ্টি হবার পর সবে এক চিলতে রোদ দেখা দিয়েছে। চারদিক সেই করুণ আলোর প্রসন্ন ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ভারী উপভোগ্য মনে হচ্ছিল এই দৃশ্যটুকু। আমি হাসপাতালের পাশের পাহাড়ে উঠে এলাম। এখানে একটি ঝর্ণার ধারে কয়েকটি শালগাছ ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে, তার তলায় একটি মসৃণ পাথর। আমি সেখানে গিয়ে প্রায়ই বসতাম।

পাহাড়ে উঠে দেখি, ঝর্ণার ধারে ওই পাথরটার ওপর ডরোথি বসে আপন মনে গান গাইছে। আমি তার পেছনে ছিলাম, তাই সে আমাকে দেখতে পায়নি।

সামনে শালগাছে দড়ি বাঁধা। তার থেকে ঝুলছে আমার সদ্য ধোয়া পোশকগুলো।

আমি পাহাড়ের আড়ালে থেকে ঝর্ণার জলে একখণ্ড পাথর ছুঁড়ে মারলাম। ডরোথি চম্‌কে শিলাস্তূপটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকাতে লাগল। আবার একটা পাথর ছুঁড়লাম। শালগাছের কাণ্ডে লেগে সেটা পাহাড়ের ওপর গড়িয়ে চলল। এমন ভয়ের চেহারা আমি এর আগে কখনও দেখিনি।

ডরোথি কাঁপতে লাগল। আমি পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই ও প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিল। তারপর আমাকে দেখে দৌড়ে এসে ভয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরল।

যত বোঝাবার চেষ্টা করি, ততই সে ভয় পেয়ে আমাকে জড়ায়। যখন বললাম, আমিই পাথর ছুঁড়েছি, তখন ও আমাকে ছেড়ে দিয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, আমাকে কুম্‌ডিতে পাঠিয়ে দিন। আমি আর এক মিনিটও এখানে থাকব না।

সেদিন তাকে শান্ত করতে অনেক সময় কেটে গেল আমার।

পরে মুখে কয়েকবার বললেও, থলকোবাদ ছেড়ে ও আর কোথাও যেতে চাইল না।

একদিন হাডসন এলেন হাসপাতালে। তাঁর মুখেই শুনলাম, এখন হাঙ্গামা একটু কমেছে।

হাডসন বললেন, যদি এর পর বৃষ্টি না হয়, তা হলে আমাদের সুবিধে হয়ে যাবে। হেড কোয়ার্টার থেকে ফৌজ আনিয়ে তখন বুনোগুলোকে সায়েস্তা করার আর কোনও অসুবিধেই থাকবে না।

হাডসন, রেবেকা আর ডরোথিকে কুম্‌ডিতে নিয়ে গেলেন। ডরোথির এখানে আরও কিছুদিন থেকে যাবার ইচ্ছে ছিল, সেটা সে আমার কাছে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশও করেছিল, কিন্তু রেবেকাই তাকে একরকম জোর করে নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন খোশ গল্পের মাঝে ভাঁটা পড়তেই আমি বুঝলাম, কোথায় যেন কী একটা আনন্দের সূতোয় টান পড়েছে। নিজেকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা দিল ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা। যে ভাবে বর্ষার শুরু হয়েছিল তা একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। বর্ষার দিনের মেঘের চিহ্নমাত্র রইল না। হাডসন ভাঙা পথ আবার গড়ে তুললেন। সংবাদ পাঠিয়ে বহু সংখ্যায় সশস্ত্র পুলিশ আনিয়ে রাখা হল। এবার প্রবলভাবে সরকার পক্ষের পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। পক্ষকাল যুদ্ধ চলল সমানে। শেষে হট্‌তে লাগল আদিবাসীর দল। ছাতমবুরুর পাহাড় ছেড়ে দিতে হল তাদের। এবার গভীর জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল তারা।

একটি বিষয় বরাবর আমি লক্ষ করছিলাম। লড়াইয়ে যাতে কম লোকক্ষয় হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল নেত্রীর। ছাতমবুরু রক্ষার জন্য বহুদিন যুদ্ধ চালাতে পারত আদিবাসীরা, কিন্তু তা তারা করল না। অকারণ লোকক্ষয়ের থেকে সরে দাঁড়াল তারা। লড়াইতে এই সূক্ষ্ম বিবেচনা বোধ যাঁর, তাঁর ওপর গভীর শ্রদ্ধায় আমার সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল।

১৭ ডিসেম্বর ঃ ১৯০০

বিধাতা সত্যিই এবার জঙ্গলের মানুষগুলির বিপক্ষে দাঁড়ালেন। বর্ষাকালে নামমাত্র বৃষ্টি দিয়েই আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেল। চারিদিকে অনাবৃষ্টি। ফসল ফলল না এককণা। এদিকে দীর্ঘকাল যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল আদিবাসীরা। কয়েকমাস পরে তাদের মাঝে নেমে এল

ভয়াবহ অনাহার আর মৃত্যুর আতঙ্ক। সারান্দা বন জুড়ে শুরু হয়ে গেল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর ধ্বংসলীলা।

সরকার এবার এক কৌশল অবলম্বন করল। ঘোষণা করা হল ছামবুরুতে সিংবোঙ্গা আর মারংবোঙ্গার মন্দির আদিবাসীদের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হবে। তাছাড়া যে সকল আদিবাসী সরকারের কাছে নতি স্বীকার করবে, দুর্ভিক্ষের দিনে তাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করবে সরকার।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘোষণাও করা হল, যে রাজকুমারী শনিচারির সন্ধান সরকারকে দিতে পারবে তাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঘোষণার পর কিছুকাল পর্যন্ত কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর একে একে সরকারী ক্যাম্পে আদিবাসীরা আসতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সারান্দা বনভূমির ক্ষুধার্ত মানুষগুলো জলস্রোতের মত বরাইবুরুর ক্যাম্পে সাহায্যের জন্য ভেঙে পড়ল।

কর্তৃপক্ষ ক্ষুধার্ত লোকগুলোকে নিয়ে শুরু করল জিজ্ঞাসাবাদ। রোজ নানা ধরনের লোক সাহায্যের আশায় আসা যাওয়া করত। কর্তৃপক্ষ তাদের একজনের কাছ থেকে প্রধান ঘাঁটির খবরটা সংগ্রহ করল। সেই হল সরকার পক্ষের ইনফরমার।

ছোটনাগরার উপত্যকার সেই ভগ্নদুর্গ, যা একদিন আমি দেখে এসেছিলাম পথ হারিয়ে, সেই দুর্গই নাকি বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি।

সরকারী পুলিশবাহিনী আর কালবিলম্ব করল না। তারা সেই ভগ্নদুর্গ আক্রমণ করল।

লড়াই চলল তীরধনু আর বন্দুকে। বেশি সময় লাগল না।

গুপ্তঘাঁটি সরকারী দখলে এসে গেল। কিন্তু দলের নেত্রী সেই রহস্যময়ী রমণী, কখন দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে তা কেউ বুঝতে পারল না।

মনে মনে আমি পরম স্বস্তি অনুভব করলাম। প্রভু যীশুর কাছে কেন জানি না নতজানু হয়ে সেদিন শনিচারির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানালাম।

১৩ জানুয়ারি ঃ ১৯০১

একটি বিশেষ ঘটনার কথা আজ শুনলাম হাডসনের মুখে। কথাটা শুনে এদেশের মেয়েদের ওপর গভীর শ্রদ্ধায় মনটা ভরে গেল।

হাডসন যখন কথা বলছিলেন, তখন কিন্তু তাঁর গলায় আফশোসের সুরই বাজছিল। মেয়েটি মারা গিয়ে নাকি সবকিছু ভেস্তে দিয়ে গেল। নইলে শনিচারির খবর তার কাছ থেকে যে কোনও রকমেই হোক আদায় করা যেত।

ঘটনাটি এইরূপ ঃ

একদিন একটি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এল বরাইবুরুর ক্যাম্পে। যেখানে আদিবাসীদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল, সেখানে সে গেল না। সে পুলিশ অফিসারদের কাছে এসে কেঁদে কেটে অস্থির করে তুলল।

জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল, সে তার হারানো স্বামীকে খুঁজছে। মেয়েটি কথা বলে আর কাঁদে।

কতদিন নাকি তার স্বামী তাকে ছেড়ে এসেছে। সে খেতে পরতে না পাক তাতে দুঃখ নেই কিন্তু একা ঘরে সে কাটাবে কেমন করে। সেই যে কতদিন আগে ক্যাম্পে যাচ্ছি বলে এলো, আর ফিরে গেল না। রাত দিন সে চোখের জলে ভাসছে।

শনিচারি মেয়েটা মাঝে মাঝে তার কাছে আসে। সে বলে, তার স্বামী নাকি সরকারের কাছে ছোট নাগরা দুর্গের খবর দিয়েছে।

শনিচারি তাকে মেরে ফেলবে বলে শাসায়।

মেয়েটার কাছে এতগুলো খবর পেয়ে বরাইবুরুর ক্যাম্প ইনচার্জ চঞ্চল হয়ে উঠল। এবার তা হলে শনিচারিকে ধরা যাবে।

ক্যাম্প ইনচার্জ মেয়েটিকে এবার শনিচারি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিল।

কিন্তু মেয়েটি আর কোনও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেবল কাঁদতে লাগল। সে আগে তার মরদকে দেখবে তারপর অন্য কথা। কতদিন সে তার স্বামীকে দেখেনি।

মেয়েটির স্বামী যথার্থই ইনফরমারের কাজ করছিল। লোকটি যে ক্যাম্পে ছিল, মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল।

সে কী কান্না তার। কত অভিমান। স্বামী লোকটা বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে থামাতে পারে না।

কি করেই বা সে গাঁয়ে ফিরে যাবে। শনিচারি একবার তার সন্ধান পেলে আর আস্ত রাখবে না। সে সরকারকে ছোটনাগরার খবর দিয়েছে. এর পরে তার আর গাঁয়ে ফিরে যাওয়া চলে না।

মেয়েটি সব শুনল। ধীরে ধীরে তাদের মান অভিমানের পালা চুকলো। সে সারাদিন রইল তার স্বামীর কাছে। ক্যাম্প ইনচার্জ তাদের একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। একটু শান্ত হলে মেয়েটার কাছ থেকে অনেক সন্ধানই পাওয়া যাবে। এখন আদিবাসীরা শান্ত হয়েছে, কিন্তু ওদের ওপর ভরসা করা চলে না। দুর্ভিক্ষ কেটে গেলেই তারা শনিচারির নেতৃত্বে আবার রুখে দাঁড়াতে পারে। অতএব সবার আগে চাই শনিচারির সন্ধান।

ইনচার্জ মনে মনে পুলকিত হল।

একরাত স্বামী-স্ত্রী কাটাল ক্যাম্পে। শেষ রাতে একটা প্রাণ-ফাটানো আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই দৌড়ল সেদিকে। ইনফরমারের রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে কালকের মেয়েটা অট্টহাসি হাসছে। হাতে তার একখানা রক্তাক্ত ছোরা।

তাকে ধরতে যেতেই সে হাতের ছোরাখানা নিজের বুকে আমূল গেঁথে দিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে বলে গেল, দেশের শত্তুর, বেইমানের সাজা সে দিয়েছে। আর কিছুই চায় না সে। আজ তার সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন।

হাডসনের মুখে কথাটা শুনে সত্যিই আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের স্বামীকে খুন করল মেয়েটি দেশের জন্যে।

আমি মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম সেই রহস্যময়ী অরণ্য-কন্যাকে, যে এই অশিক্ষিতা মেয়েটির মনেও দেশকে ভালবাসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

২৩ মার্চ ঃ ১৯০১

দূরে কোন আদিবাসী গ্রাম থেকে মাদলের দ্রিম্ দ্রিম্ আওয়াজ ভেসে আসছিল। আকাশে চাঁদের আলো কত উজ্জ্বল, কেমন স্নিগ্ধ। সামনে শালের বনের প্রতিটি পাতা যেন গোনা যায় সেই আলোয়। মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল একটি উপভোগ্য বাতাস। পথের ধারের কত রকমের ফুলের গন্ধ সেই বাতাসের পাখায় জড়ানো।

কোন কাজ ছিল না হাতে, বসে বসে দেখছিলাম বসন্ত রাত্রির রূপ।

হঠাৎ চমকে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হল, শালের বনের প্রান্তে দুর্গম উপত্যকা থেকে অতি কষ্টে কে যেন উঠে আসবার চেষ্টা করছে।

দ্রুত এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। কাছাকাছি হতেই চাঁদের আলোয় যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার সামনে একটি শালের গাছকে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সেই রহস্যময়ী রাজকুমারী শনিচারি।

আমি কোনও কিছু বলার আগেই শনিচারির মুখে ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল।

ডাক্তার জনসন, আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল।

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, কিন্তু তোমাকে ধরার জন্যে যে সবাই ওৎ পেতে রয়েছে।

আবার সেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল শনিচারির মুখে। বলল, ধরা যদি দিতে হয় ডাক্তার, তাহলে তোমার কাছেই দেব।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওর পোশাকের দিকে।

একি, তোমার পোশাক যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

ওকে ধরে ফেললাম।

শনিচারি বলল, ও কিছু নয় ডাক্তার, তোমাদের লোকেরা আমাকে বসন্তের রাঙা ফুল উপহার দিয়েছে।

বললাম, শিগ্‌গির এসো আমার সঙ্গে। গুলি লেগেছে নিশ্চয়ই।

ও বলল, তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাই না ডাক্তার। চলে যাচ্ছি বহুদূর, তার আগে আমার দেশের মানুষের হয়ে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতে চাই।

ও কাঁপছিল। রক্তের পরিমাণ দেখে ওর আঘাতের গুরুত্ব যে কতখানি তা আমার বুঝতে বাকি রইল না।

ওকে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এলাম হাসপাতালে। শুইয়ে দিলাম অপারেশন টেবিলে। পায়ের ভেতর দিয়ে গুলিটা চলে গেছে। ক্ষতটা গভীর, সারতে সময় নেবে।

পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন শনিচারি বলল, তা হলে সত্যিই আমায় ধরলে ডাক্তার?

বললাম, যতদিন সুস্থ না হচ্ছ ততদিন এ হাসপাতালে আমার নজরবন্দি হয়ে থাকতে হবে। পরে তোমার কাজ ফুরোলে যেখানে খুশি যেও।

পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই আমার ডিসপেনসিং রুমে ওর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল, অল্প সময়ের ভেতর গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

বাইরে এসে বারান্দায় বসলাম। সমস্ত ঘটনাটি আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল। যাকে আমি শ্রদ্ধা করি, যার মঙ্গলের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি, সে শেষপর্যন্ত আমার কাছে এসে ধরা দেবে, এ যে একেবারেই অভাবনীয় ছিল। এমনি অভাবিত বস্তু কখনও কখনও আমাদের হাতের কাছে এসে যায়। তখন মনে হয় সমস্ত ঘটনাটি যেন অলীক একটি স্বপ্নের ভেতর দিয়ে ঘটে যাচ্ছে!

সারারাত ঘুমল ও, আমি পাশে বসে কাটিয়ে দিলাম। ছুরিতে ডিসেকসন করে যা দেখা যায় না কোনওদিন, ওর সেই শক্তি আর শ্রীকে মনে মনে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ভোরের কাছাকাছি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে একটু তন্দ্রার ঘোর এসে গিয়েছিল, বাইরে কাদের গলার আওয়াজে উঠে বসলাম।

দেখি, আমার আগেই শনিচারি উঠে বসেছে। ওকে ইসারায় কথা বলতে বারণ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

অনেক আগেই ভোর হয়ে গেছে। চারিদিক রোদ্দুরে ঝলমল করছে। হাসপাতালের সামনের পথে দেখি দুটি অশ্বারোহী পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

মুখোমুখি হতেই ওরা আমাকে অভিবাদন জানাল।

একজন বলল, ডাক্তার জনসন, কাল রাতে কি আপনি কোন স্ত্রীলোককে এ পথে যেতে দেখেছেন?

আমি বিস্ময়ের ভান করলাম, এ পথ দিয়ে চলে যেতে, কই না তো!

ওরা আবার অভিবাদন জানিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি সুবাদার সাহেব? আসুন, চা পান করা যাক।

ওরা ঘোড়া থেকে নেমে এসে বসল হাসপাতালের বারান্দায়।

বামিয়াকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বললাম।

বামিয়া আদিবাসী একটি ছেলে। গত বছর আগুনে পুড়ে গিয়ে হাসপাতালে আসে ভাল হয়ে ও আর গাঁয়ে ফেরে না, আমার কাছেই থেকে যায়। হাসপাতালের ফরমায়েস খাটে বামিয়া।

হেসে বললাম, হঠাৎ ভোরবেলা স্ত্রীলোকের খোঁজ কেন সুবাদার সাহেব?

আর বলেন কেন ডাক্তার সাব, ওই মেয়েটার জন্যে আমাদের দিন রাত ঘুম নেই।

কোন্ মেয়ে আবার?

ওই যে ডাকু মেয়েটা, যে আদিবাসী জানোয়ারগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

বললাম, তার জন্যে আপনাদের ঘুমের কামাই হবে কেন?

ওকে ধরতে না পারলে সোয়াস্তি নেই। বাইরে থাকলেই আবার জ্বালাবে। কোন্‌দিক থেকে যে কী করে বসবে বলা যায় না।

বললাম, সামান্য একটা মেয়ে, তার এত দাপট! এতগুলি ঝানু জাঁদরেল পুলিশকে ভাবিয়ে তুলল!

আত্মসম্মানে মনে হল ঘা লেগেছে সুবাদার সাহেবের।

বলল, সামান্য মেয়ে হলে কী আর ধরতে সময় লাগে ডাক্তার সাব। এ মেয়েকে আপনি দেখেননি, তাই এমন কথা বলছেন।

আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই।

তা আর দেখিনি। ছাতমবুরুতে লড়াই হল, সে কী মূর্তি তার। ঘোড়ায় চড়ে চোখের পলক না পড়তে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে চলে যাচ্ছে।

বললাম, তা হলে বেশ দক্ষ বলতে হয়।

দক্ষ বইকি। শেষে লড়াই-এ হটে গিয়ে যে পথ দিয়ে ওদের লোকজন নিয়ে নেমে গেল, আমরা তা কোন দিন ভাবতেও পারতাম না।

কোন রকমে পাকড়াও করতে পারলেন না ওকে?

চেষ্টার কসুর করিনি, কিন্তু দেখতে না দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

চা নিয়ে এলো বামিয়া। ওদের চা আর কেক খাওয়ালাম। খুব খুশি।

বলল, একটা কথা বলি ডাক্তার সাব, যদি কিছু মনে না করেন।

মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এরা আবার কী কথা বলতে চায়।

মুখে বললাম, আপনারা কোনও সংকোচ না রেখেই কথা বলুন। আমি কিছুমাত্র মনে করব না।

ওদের একজন বলল, পুলিশ ব্যারাকের অফিসাররা মনে করেন, আদিবাসীদের ওপর আপনার নাকি একটু দরদ আছে।

বললাম, নিজের কাজের ওপর আকর্ষণ থাকাই তো স্বাভাবিক। আমি ডাক্তার, আমার কাছে রোগীর কোন জাত ধর্ম নেই।

ওরা দুজনেই আমার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গেল।

খাওয়ার শেষে উঠল ওরা।

বললাম, সেই মেয়েটিকে কাল রাতে দেখার কথা কী যেন বলছিলেন?

হ্যাঁ, আমরা ওর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, সামনের ভ্যালিটার ওই প্রান্তে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে সে।

সবিস্ময়ে বললাম, তাকে স্পষ্ট দেখলেন?

চাঁদের আলোয় যতটা দেখা যায়। আর দেখুন, এ দেশে ওই একজন ছাড়া কোন স্ত্রীলোককে কেউ কখনও ঘোড়ায় চড়তে দেখেনি।

তারপর কী হল?

গুলি ছুড়লাম ওকে লক্ষ করে। মুহূর্তে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

তা হলে সে এতক্ষণে নিশ্চয়ই এ বন ছেড়ে বহুদূর জঙ্গলের ভেতর পালিয়েছে।

ওরা ঘোড়ায় চড়ে ওদের পাঁচ হাজার টাকার শিকারের লোভে বনের দিকে দ্রুত চলে গেল।

ফিরে এলাম ডিসপেনসিং রুমে। এসে দেখি বিছানায় উঠে বসে শনিচারি বামিয়ার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বামিয়া লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। শনিচারি সে দৃশ্য দেখে হেসেই অস্থির।

কপট গাম্ভীর্য মুখে এনে বললাম, ও আমাকে ভয় করে।

হাসি আর থামতেই চায় না শনিচারির।

আমার চেয়েও বেশী ভয় ওর?

বললাম, কে তোমাকে বসতে হুকুম দিয়েছে, জান, এটা হাসপাতাল। এখানে একমাত্র আমার আদেশই পালন করা হবে।

মুহূর্তে ওর হাসি থেমে গেল। চোখমুখে অসহায় অপরাধীর ভাব ফুটে উঠল। পাটা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল ও।

হাসি চাপতে চাপতে বাইরে এলাম।

বামিয়াকে বললাম, খাবার দিয়ে এস ভেতরে। আর একটা কথা, ও যে এখানে আছে কেউ যেন না জানে।

বামিয়া মাথা নেড়ে চলে গেল। তের চোদ্দ বছর বয়েস হবে ছেলেটার। যেমন সরল তেমনি বিশ্বাসী।

এ দেশের মানুষ মাত্রেই সহজ সরল। এই ক'বছরে কেন জানি না বড় ভালবেসে ফেলেছি এ দেশটাকে।

বাইরে বসে শনিচারির কথাই ভাবতে লাগলাম।

কী তাজা প্রাণশক্তি এই মেয়েটির। তবু শিশুর মত ভীরু। একটু কপট ক্রোধ দেখাতেই ভয়ে কেমন জড়োসড়ো হয়ে গেল।

আশ্চর্য, যার ভয়ে সকলে ভীত, যার নিজের প্রাণের বিন্দুমাত্র ভয় নেই, সে একজন ডাক্তারের সামান্য কথায় ভয় পেয়ে গেল। মানুষের কী বিচিত্র রূপ।

বসে বসে ভাবছিলাম নানা কথা। বামিয়া এসে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি এক কাণ্ড। শনিচারির সামনে কেক আর দুধ রাখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো সে একেবারেই ছোঁয়নি, কেবল কেঁদে চলেছে।

বামিয়াকে বাইরে যেতে বললাম। ও চলে গেলে শনিচারির কাছে গিয়ে বসলাম।

আমাকে দেখে শনিচারি তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে লাগল।

বললাম, ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গেছে কখন, কেক আর দুধটুকু খেয়ে নাও। গায়ে বল না এলে তাড়াতাডি সেরে উঠবে কি করে।

ও বলল, কিছুতেই ওগুলো মুখে তুলতে পারব না ডাক্তার।

ভাবলাম, আমি খৃষ্টান, কোনও কোনও আদিবাসী খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে একটু গোঁড়া। তাই হয়ত শনিচারি আপত্তি তুলেছে।

বললাম, দুধটুকু আপাততঃ খেয়ে নাও, বামিয়া এনেছে। তোমার আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করে দেব।

মুহূর্তে কী যেন ভেবে সামনে পড়ে থাকা প্লেট থেকে কেকটা তুলে নিয়ে ও কামড় দিল।

খেতে খেতে বলল, আমাকে ভুল বুঝ না ডাক্তার। জাতের বালাই আমার নেই। আমার বাবা ছিলেন আদিবাসী আর মা রাজপুতানী। আমি খেতে চাইনি ভিন্ন কারণে।

বললাম, কারণটা যদি দুঃখের হয় তাহলে আমি তা জানতে চাইব না শনিচারি।

ও চোখ মুছে বলল, খেতে গেলেই মনে পড়ে ওদের কথা। জঙ্গলের কত লোক না খেয়ে কাটাচ্ছে, তুমি ভাবতে পারবে না ডাক্তার।

শনিচারির ওপর শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল।

সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, যতদিন চিকিৎসা চলবে ততদিন আমার দেওয়া খাবার খেতে হবে শনিচারি। তুমি এতে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবে।

এবার শনিচারির মুখে কেমন যেন ম্লান এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

সেরে উঠে কী হবে ডাক্তার, তার চেয়ে শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল।

এ কথা বলছ কেন?

কোনও দিক থেকে মানুষ যখন সফল হতে পারে না, তখনই কেবল তার মনে বাঁচা মরার প্রশ্ন জাগে।

তুমি ভাল হয়ে ওঠ, একদিন তোমার সব কিছু আবার ফিরে পাবে শনিচারি।

আমাকে স্বার্থপর ভেবো না ডাক্তার। আমি আমার সেই ভাঙা দুর্গটুকু ফিরে পাবার জন্যে মোটেই চিন্তিত নই। সারা বনের মানুষগুলো আজ পঙ্গু হয়ে গেল। এ দুঃখ কিছুতেই সইতে পারছি না।

বললাম, সুস্থ হয়ে ওঠ, তখন নতুন কিছু চিন্তা করা যাবে।

একটা যন্ত্রণার ছায়া নেমে এলো ওর মুখের ওপর।

ওকে কথান্তরে নিয়ে যাবার জন্য আজ সকালের গল্প জুড়ে দিলাম। সেই সুবাদারদের খোঁজাখুঁজির ব্যাপার।

কথায় কথায় ওর মুখের ভাবের পরিবর্তন হয়ে গেল।

হেসে বলল, পাঁচ হাজার টাকার ভাগ বুঝি আর কাউকে দিতে চাও না। নিজেই সবটা নেবে?

বললাম, নিজেকে এত অল্প দামের ভাবছ কেন শনিচারি। তোমার আসল দাম আমার অজানা নয়, তাই এত কম দামে কারো কাছে তোমাকে তুলে দিতে মন চায় না।

ও হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। কোনও কথা বলল না।

আমি দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম আমার কাজে।

কয়েকদিন এমনি কেটে গেল। নিভৃতে গল্প করি শনিচারির সঙ্গে। এ কদিনেই বুঝতে পেরেছি কী বিপুল ঐশ্বর্য ওর ভেতর রয়েছে।

আমার ডিসপেনসিং রুমের জানালাটা খুলে দিলে সামনের উপত্যকা আর তার ওপারে বড় পাহাড়টা স্পষ্ট চোখে এসে পড়ে।

গভীর রাতে যখন চারদিক ঘুমে ডুবে যায় তখন কোনও কোনও দিন আমরা দু'জনে বসে বসে গল্প করি।

টুকরো টুকরো কথার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে শনিচারির জীবনের কথা।

সেদিন এমনি সে গল্পে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। কথায় কথায় বলল, ছোটনাগরা দুর্গের কথা। আর তার মৃত পিতামাতার কাহিনী।

বলল, বাবা ছিলেন আদিবাসী হো সম্প্রদায়ের লোক। ছেলেবেলায় খেতে না পেয়ে এই বনে মনোহরপুরের জায়গীরদার অভিরাম সিং-এর ডেরায় গিয়ে ওঠেন।

অভিরাম সিং-এর একটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে ছিল বাবার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। বাবা সেখানে অভিরাম সিং-এর আস্তাবলে কাজ করতেন। কালে সেই মেয়েটির সঙ্গে বাবার ভালবাসা জন্মে। বিয়ে করবেন বলে উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

কথাটা ক্রমে অভিরামের কানে যায়। তিনি এমন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন যে কোমর থেকে তলোয়ার খানা টেনে নিয়ে বাবাকে আঘাত করেন। ফলে বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তার একটি হাত দু'খণ্ড হয়ে যায়।

অভিরামের রাগ পড়লে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। বাবাকে স্নেহ করতেন খুব। তাড়াতাড়ি লোক দিয়ে রাঁচিতে পাঠিয়ে দেন চিকিৎসার জন্য। তোমাদের দেশীয় এক ডাক্তার সেখানে বাবাকে সুস্থ করে তোলেন। তিনি নিজের দেশে ফিরছিলেন, বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

কয়েক বছর বিদেশে কাটিয়ে বাবা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরে নিজের জঙ্গল আবাসেই ফিরে আসেন তিনি।

ফিরেই দেখা করতে যান অভিরাম সিং-এর সঙ্গে।

অভিরাম তখন মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র কন্যা তারাবাঈ বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

কিন্তু সরকার তারাবাঈকে নানা কৌশলে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করল। তারা কৌশলে সমস্ত মহাল খাস করে নিল।

বাবার সঙ্গে গভীর জঙ্গলে চলে এলেন তারাবাঈ। সঙ্গে আনলেন, বহুদিনের সঞ্চিত সোনা।

বিয়ে হল দুজনের। ছোটনাগরায় বাবা বসতি পত্তন করলেন। পাথর সাজিয়ে সাধারণভাবে গড়ে তুললেন দুর্গ। গড়লেন 'গরাম' দেবতার মন্দির। ধীরে ধীরে জঙ্গল মহলের প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের আদিবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। তাদের দীক্ষা দিলেন জাতীয়তার মন্ত্রে।

বাবা বলতেন, নিজের ধর্মের ভেতর দিয়ে ভগবানকে পাবার চেষ্টা করবে। ভগবানের রাজ্যে জাতির বিচার নেই। অন্যায় সহ্য করবে না।

জঙ্গলের লোকে বাবাকে তাদের রাজা বা দেবতা বলে মনে করত।

বাবা অত্যন্ত মুক্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের তদারকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন।

কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল শনিচারি। একটা বিষাদের ছায়া এসে পড়ল তার চোখেমুখে।

কিছুক্ষণের ভেতর নিজেকে সংযত করে ও আবার কথা শুরু করল।

প্রকৃতি বাদ সাধল এক সময়। পাহাড় হঠাৎ থর থর করে কেঁপে উঠল। ছোট নাগরার দুর্গ ভেঙে পড়ল। তার একটি স্তূপের ভেতর আমার বাবা-মা চিরদিনের মত সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

এ প্রসঙ্গে ছেদ টেনে দিয়ে আমি বললাম, প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিন কিন্তু আদিবাসী বলে ভুল করিনি।

শনিচারি উত্তেজিত হয়ে উঠল হঠাৎ।

আমি আদিবাসীর মেয়ে ডাক্তার জনসন। আমার দেহে আদিবাসীরই রক্ত বইছে। আমার ধর্ম আর আমার এই জংলী দেশকেই আমি ভালবাসি।

বললাম, আমি সেজন্যে তোমাকে শ্রদ্ধা করি শনিচারি। আমাকে ভুল বুঝ না।

সহজ হল শনিচারি। আমার হাতটা টেনে নিয় বলল, তোমাকে দেখে ইংরাজের ওপর সব অশ্রদ্ধা দূর হয়ে যায় ডাক্তার। আমার বাবাও তোমার মত দয়ালু এক ইংরাজ ডাক্তারের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

যত তাড়াতাড়ি পায়ের ক্ষতটা সেরে উঠবে মনে করেছিলাম, তা আর হল না। শনিচারিকে বেশ কিছুদিন ভুগতে হবে বলেই মনে হল।

মাঝে মাঝে ও অস্থির হয়ে উঠত। বনে বনে রাত্রি দিন ঘুরে বেড়ানোই যার স্বভাব, কতকাল ছোট্ট একটি বেডের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা যায়।

এক একদিন শনিচারি হাঁপিয়ে উঠত।

বলত, কতদিনে সারব ডাক্তার?

বুঝিয়ে বলতাম, আঘাতটা গুরুতর, তাই সারতে একটু সময় লাগছে।

অনুনয় করত, আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যেতে পারবে ডাক্তার। কতদিন চারদিকটা ভাল করে দেখিনি। শালের ফুল ফুটেছে। 'বাহা' পরবের ঢেউ উঠেছে সারা বন জুড়ে। আমার মন কেমন করছে ডাক্তার।

গভীর রাত। চাঁদের আলোয় বন, পাহাড় ভেসে যাচ্ছে। ওকে সাবধানে ধরে নিয়ে এলাম হাসপাতালের বাইরে।

কতক্ষণ একটি পাথরের চাঁই-এর ওপর বসে রইলাম দুজনে। ও কতদিন পরে চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আপন মনে মগ্ন হয়ে গেল একসময়।

বহুদূর থেকে মাদলের ক্ষীণ একটা আওয়াজ ভেসে আসছিল। শনিচারি কান পেতে সেই শব্দটুকু শুনতে লাগল। তারপর নিজেই ধীরে ধীরে গাইতে লাগল 'বাহা' পরবের গান।

সেই জ্যোৎস্নার জলে ধোওয়া বন পাহাড়ের রহস্যময় পরিবেশে সে সুর চারিদিকে আশ্চর্য স্বপ্নের জাল বুনতে লাগল। আমি মুগ্ধ হয়ে সেই অরণ্যকন্যাকে দেখতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা আর ধর্ম নিয়ে আলোচনা হত। আমি ওকে প্রভু যীশুর ত্যাগের কথা শোনাতাম। কথায় কথায় আদিবাসীদের বিচিত্র সংস্কার আর দেবতার কথা এসে পড়ত।

শনিচারি বলত, আমি জানি ডাক্তার, আমাদের ধর্মবোধের ভেতর অনেক কুসংস্কার আছে। কিন্তু নিজের ধর্মের চেয়ে অন্য কোনও ধর্মকে আমি বড় বলে ভাবতে শিখিনি।

বলতাম, তোমার মুক্ত মনের কাছে এটা একটা সংস্কার বলেই আমি মনে করি।

ও অমনি বলত, তোমার ধর্মও একেবারে কুসংস্কার থেকে মুক্ত নয় ডাঃ জনসন। তাই খৃষ্টানরাও কিছু পরিমাণে সংস্কারাচ্ছন্ন।

এ তোমার তর্কের কথা শনিচারি।

ও আবার নীরব হয়ে যেত। কতক্ষণ ভাবত। তারপর বলত, প্রতি জাতির ধর্ম গড়ে ওঠে বহুদিনের সাধনা আর সংস্কারে। এক একটি জাতির কাছে তার ধর্ম তার একান্ত প্রাণের জিনিস। আমার মনে হয় কী জান, নিজের নিজের ধর্মকে ধীরে ধীরে সংস্কার করে নিলে তার ভেতর দিয়েই ঈশ্বরের সহজ রূপটি দেখা যায়।

প্রভু যীশুর প্রতি সম্পূর্ণ অনুরক্ত থেকেও শনিচারির কথাকে অস্বীকার করতে পারতাম না।

নানা আলোচনার ভেতর দিয়ে এই অরণ্য কন্যাটি ধীরে ধীরে আমার সমস্ত মন অধিকার করে বসল। আমার দিন, আমার রাত্রি, আমার সমস্ত ভাবনা কল্পনা এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে লাগল।

শনিচারির মনের বিপুল ঐশ্বর্যের ভেতর আমি ধীরে ধীরে মগ্ন হয়ে গেলাম।

কয়েকদিন পরে এক দুপুরে হাসপাতালের বারান্দায় বসে আমাদের কথা হচ্ছিল।

বললাম, ডাক্তার হয়ে বলব, তোমার অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে যাক্, কিন্তু আমার ভেতর আর একটা মানুষ বলছে, অসুখ সারলেই ও পালাবে। যে ক'টি দিন ও হাসপাতালে বন্দি হয়ে থাকে সে ক'টি দিনই লাভ।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল শনিচারির মুখে। বলল, খাঁচার ভেতর যে পাখি কিছুকাল বন্দি হয়ে থাকে, খাঁচা মুক্ত করে দিলেই কী সে উড়ে যেতে পারে ডাক্তার?

হেসে বললাম, বুনো পাখিরা বড় একটা পোষ মানে না। খাঁচার ভেতরে থেকে তারা কেবল পালাবার জন্যে পাখা ঝাপটায়!

হেসে ফেলল শনিচারি। তারপর হঠাৎ মুখে ভাবনার ছায়া নামল ওর। অনেকক্ষণ বসে বসে আপন মনে চিন্তার জাল বুনে চলল। আমি যে কতক্ষণ তার পাশেই বসে আছি, সে খেয়ালই নেই তার।

একসময় দেখলাম, চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শনিচারির। কী একটা ভাবনার দীপ্তিতে সে যেন ঝলমল করছে।

আচ্ছা ডাক্তার, রবার্ট ব্রুস খুব বড় সাধক ছিলেন, তাই না?

তিনি বীর ছিলেন।

না ডাক্তার, যত বড় বীর ছিলেন, তার চেয়ে সাধক ছিলেন অনেক বড়। হেরে গিয়েও তিনি হার মানেননি, চেষ্টা করে গেছেন বারবার।

বললাম, তুমিও চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই সফল হতে পারবে।

ও আমার দুটো হাত চেপে ধরে বলল, তুমি বলছ ডাক্তার, আমি পারব?

বললাম, নিশ্চয় পারবে তুমি। সে বিশ্বাস আমার আছে। আমি দেখেছি তোমার দেশের সেই মেয়েটিকে যে দেশের জন্য নিজের স্বামীকে হত্যা করেছে।

শনিচারি চমকে উঠল বলে মনে হল।

তুমি জান ডাক্তার, সে মেয়েটির কি হয়েছে?

স্বামীকে খুন করে সে নিজের বুকেও ছোরা বসিয়েছে।

দুটি হাত জোড় করে শনিচারি প্রার্থনা করল। চোখ বেয়ে ঝরতে লাগল ফোঁটা ফোঁটা জলের ধারা।

একসময় শান্ত হয়ে বলল, তোমাদের সরকারের অত্যাচার তাকে ভোগ করতে হয়নি, আমি কত সুখী হয়েছি তার মৃত্যুতে, সে তুমি বুঝবে না ডাক্তার।

একটু থেমে মনে মনে কী যেন ভাবল ও। তারপর বলল, সোনিয়া মারা গিয়ে আমার একখানা হাত ভেঙে দিয়ে গেছে ডাক্তার।

বললাম, মেয়েটির আচরণ দেখে ও যে তোমারই লোক তা বোঝা গিয়েছিল।

শনিচারি বলল, তোমাদের চার্চে সোনিয়া আর তার স্বামী দীক্ষা নিয়েছিল। আমি ওই মেয়েটিকে কী যে ভালবাসতাম। আমার কাছ থেকে ও বিদেশী সাহিত্যের বই নিয়ে পড়াশোনা কবত।

একটু অবাক হয়েই বললাম, সোনিয়া শিক্ষিতা মেয়ে!

তোমরা শিক্ষিত কাকে বল জানি না, তবে সোনিয়ারা শুধু পড়াশোনার শিক্ষা পায়নি, দেশের জন্যে নিজের স্বামীর প্রায়শ্চিত্তও সে নিজেই করেছে।

জান ডাক্তার, ওর স্বামী ছিল একেবারে অশিক্ষিত। কিন্তু কী সেবাই না সোনিয়া তাকে করত। যেদিন শুনল, ওরই স্বামী সরকারের ইনফরমার হয়েছে, সেদিন ও আমার কাছে এসে বলল, ওর প্রায়শ্চিত্তের ভার আমার হাতে তুলে দাও শনিচারি।

বললাম, দেশ আমাদের সবার চেয়ে বড়, শুধু এই কথাটুকু মনে রেখ।

সে কথা সে মনে রেখেছিল। তাই ভাবি ডাক্তার, আবার আমি হয়ত দাঁড়াতে পারব।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দুর্ভিক্ষ চিরদিন থাকে না, মানুষের দুর্বলতাও চিরদিনের নয়।

আচ্ছা ডাক্তার, তোমার হাতে কী এমন ক্ষমতা নেই যাতে আমি খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারি।

কথাটা আঘাত করল আমার মনে। বললাম, তুমি কী মনে কর, ডাক্তার তার রোগ সারাবার ক্ষমতাগুলো হাতের ভেতর রেখে দিয়ে চিকিৎসা করে।

ওর মাথাটা নত হল।

আমাকে ক্ষমা কর ডাক্তার। নিজের মনের উত্তেজনায় তোমাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছি।

বললাম, আমার কাছে দেশ নেই, জাতি নেই। আমি শুধু মানুষকে ভালবাসি। তাকে সারিয়ে তোলাই আমার একমাত্র ব্রত। এখানে শনিচারির সঙ্গে হাডসনের কোনও ভেদ নেই।

তুমি মানুষকে ভালবাস, তাই আমি তোমাকে ভালবাসি ডাক্তার জনসন।

আমার হাসপাতাল দেখার সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই হেসে বললাম, একজন রোগীর কাছে এত সময় দিলে বাকি রোগীদের ওপর অবিচার করা হবে।

উঠতে যাচ্ছিলাম, শনিচারি হঠাৎ হাত ধরে টেনে বসাল।

রোগ গুরুতর হলে রোগীর কাছে বেশি সময় দিতে হয় বইকি।

তোমাকে অতিরিক্ত সময় দিয়ে ফেলেছি।

শনিচারি অমনি বলল, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে গেলে আমিও তোমার কাজে সাহায্য করতে পারব। তখন শোধ দেব তোমার এই সময়ের অপচয়ের।

বললাম, তা হলে তোমার দেশোদ্ধার?

চুপ করে গেল শনিচারি। আমি হেসে হাসপাতালে উঠে এলাম।

কয়েক দিন পরের কথা। হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলো রাউন্ড দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে দেখি বামিয়া আর শনিচারি গভীরভাবে কী যেন আলাপ করছে।

আমি এলাম, পাশের ঘরে চলে গেলাম, ওরা কথা বলায় এমনি মত্ত যে আমার আসার সাড়াই পেল না।

ভাবলাম, বেচারা পায়ে আঘাতের ফলে বাইরে বেরোতে পারছে না, তাই মনের নির্জনতাটুকু ঘোচাতে চায় যে কোনও একটি মানুষের সঙ্গে কথা বলে।

পাশের ঘরে এসে আমি পোশাক ছাড়লাম। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। বসে থাকতে থাকতে কয়েকটা কথা কানে ভেসে এল।

সাসাংদা কোথায় জানিস বামিয়া?

ওখানে তো আমার মামার বাড়ি।

দুপুরে একদিন যেতে পারবি ওখানে?

কেন পারব না। তুমি বললে আমি সব পারি।

তারপর আরও কী সব কথা হল, আমি ঠিক শুনতে পেলাম না।

শনিচারি বামিয়াকে সাসাংদায় পাঠাতে চায় কেন। কী উদ্দেশ্য ও মনে মনে পোষণ করে রেখেছে!

আমার মনে এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন জাগল, কিন্তু আমি শনিচারিকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। ও যখন সহজ মন নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করে, তখন একটি অবোধ শিশুর মত মনে হয়। একটি কিশোরী যেন চপলতা প্রকাশ করছে কথায় কথায়। আবার কখনও বা সে ভীরু চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু যখন ও গভীর হয়, আপনার ভেতর ডুবে থাকে সবকিছু ভুলে, তখন ওর দিকে সসম্ভ্রমে আমি তাকিয়ে থাকি।

আমার চেয়ে বয়সে ও কত ছোট, তবু মনে হয় কী বিপুল ব্যক্তিত্ব নিয়ে ও বসে আছে। ওর সঙ্গে আমাদের ব্যবধানটা তখন বড় বেশি করে চোখে পড়ে।

বামিয়ার সঙ্গে ওর কথা আমাব কৌতূহল জাগালেও, এ নিয়ে শনিচারির সঙ্গে আমি কোনও রকম আলোচনা করতে পারলাম না।

এমনি কেটে গেল কয়েকটা দিন। এক দুপুরে কোয়ার্টারে ফিরে দেখি, বামিয়া উধাও।

এদিকে রান্নাঘরে এসে দেখি, ফল বা দুধের কোনও ব্যবস্থাই সে করে যায়নি। কিছু পরেই রোগীদের ঘরে ঘরে ফল আর দুধ দিয়ে আসতে হবে।

আমি চিন্তিত হলাম। কী করা যায় ভাবছি, এমন সময় রান্নাঘরে এসে ঢুকল শনিচারি।

বললাম, তোমার না ডিসপেনসিং রুম থেকে বের হওয়া বারণ, তবে কেন এখানে এলে? এমন করে চলাফেরা করলে সহজে পাটা সারবে?

ও কোনও কথা না বলে বসে গেল ফলের ঝুড়ি আর ছুরি নিয়ে। ফল কেটে কেটে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্লেটে সাজাতে লাগল।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, আজ তুমি নিজেই এগুলো নিয়ে যাও ডাক্তার। তোমার রোগীরা খুব খুশি হবে।

বললাম, তা নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু বামিয়া কোথায়?

শনিচারি বলল, একটু বাইরে গেছে, ফিরতে খানিক দেরি হতে পারে।

আর কোনও প্রশ্ন না করে আমি নিজেই নিয়ে গেলাম ফলের প্লেটগুলো।

শেষে রান্নাঘরে এসে দেখি, শনিচারি আরও এক প্লেট ফল আর দুধ কার জন্যে যেন রেখেছে।

আমাকে দেখেই বলল, আর একটু পরে তোমার খাবার সময় হবে, তখন খেও।

আর কোন কথা না বলে ও ওর ঘরে উঠে চলে গেল। দেখলাম, বড় কষ্ট করে পাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও।

মনে হল, সারাটা বনে যে মেয়ে বিদ্যুতের মত খেলে বেড়াত, আজ সে সামান্য একটা হাসপাতালের ভেতর বন্দি হয়ে আছে।

এসব কথা ভাবতে গিয়ে মনে মনে দুঃখ পেতাম। কিন্তু অমার সাধ্যমত চেষ্টাতেও শনিচারিকে সারিয়ে তুলতে পারলাম না।

ওর পায়ের ক্ষতটা দিনে দিনে আমার চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। শনিচারির ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, বেডের ওপর শুয়ে ও একখানা ডাক্তারী বইয়ের পাতা উল্টে পাল্টে দেখছে।

ঘরে ঢুকে বললাম, তুমি ডাক্তার হলে আমাকে যে বেকার হতে হবে শনিচারি।

ও হেসে বলল, আমি পঙ্গু হয়ে পড়ে রইলাম তোমার হাসপাতালে। তুমি যখন সুস্থ রয়েছ তখন আমার কাজগুলো তুমিই কর। আর তুমি আমার কাজে গেলে তোমার কাজগুলো আমাকেই তো চালিয়ে নিতে হবে। তাই বইপত্তর দেখে রাখছি।

বললাম, তা হলে তোমার দেশের উদ্ধারও হল, আর আমার হাসপাতালও চলল।

শনিচারি বলল, দেখে নিও, একটু ভাল হলেই আমি তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কেমন ডাক্তারী করি।

বললাম, ডাক্তার হতে হলে নিজের শরীরটাকে আগে সুস্থ রাখতে হয়। আজ দুধ আর ফল খেয়েছ?

শনিচারি বলল, একজন ডাক্তার সুস্থ থাকলে অনেক রোগীই সুস্থ হতে পারে। তাই দুধ আর ফল তোমারই আগে খাওয়া দরকার। তিনটে বাজল, এখন যাও তোমার খাবার সময় হয়ে গেছে।

আমি বেরিয়ে এলাম ওর ঘর থেকে। পেছন থেকে ও ডাক দিয়ে বলল, তুমি বরং বসো এখানে, আমি এন দিচ্ছি।

বললাম, বেডের সঙ্গে এবার দেখছি তোমাকে বেঁধে রাখতে হবে।

একটা হাসির ঝলক ভেসে এল ওর ঘর থেকে।

তুমি আমাকে বাঁধবে ডাক্তার। তোমার এমন দড়ি নেই যা দিয়ে তুমি আমাকে বেঁধে রাখতে পার।

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, তবে কী দিয়ে বাঁধব বলে দাও। বিনা দড়িতে বাঁধার কৌশলটা আমাকে শিখিয়ে দাও।

আমার দেশের মানুষকে তুমি ভালবাস, সেই ভালবাসায় আমিও বাঁধা পড়ে গেছি ডাক্তার।

ফিরে এলাম কিচেনে। ওর জন্যেও প্লেট সাজালাম। তারপর দুটো প্লেটই নিয়ে গেলাম ওর ঘরে।

এসো খাওয়া যাক্।

কি যেন ভাবল ও।

তারপর বলল, জান ডাক্তার, এই দুর্ভিক্ষের সময় আমরা একটুখানি খাবার অনেকে একই সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছি। তাতে কারো ক্ষুধা মেটেনি, কিন্তু মন ভরেছে। একই সঙ্গে কষ্ট সহ্য করার শক্তি পেয়েছি।

বললাম, দুর্ভিক্ষই তোমাদের সমস্ত মনের বল নষ্ট করে দিয়েছে।

ও বলল, এ কথা মিথ্যে নয় ডাক্তার, তবে বনের মানুষগুলোর অনেকেই কিন্তু সাহায্য নিতে চায়নি। আমি অনেক বুঝিয়ে ওদের রাজি করিয়েছি।

তোমার বিবেচনার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে শনিচারি। মিথ্যে মানুষগুলোকে মেরে তো কোনও লাভ নেই।

শনিচারি কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমি অনেক ভেবে দেখেছি ডাক্তার, প্রকৃতির ওপর মানুষের কোনও হাত নেই। প্রকৃতি মানুষকে এগিয়ে যাবার পথে যেমন সাহায্য করে, তেমনি তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পেছনে ফেলেও দেয়।

বললাম, এত বড় বীর নেপোলিয়ানকেও একদিন প্রকৃতির আঘাতে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল।

আমি তা জানি ডাক্তার। তারপর কতক্ষণ কী ভেবে ও বলল, বৃষ্টি যদি এবছর সমানে চলত তাহলে হয়ত এতদিনে এ বনের ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেতে পারত।

সেজন্যে ভেবো না শনিচারি, বৃষ্টি আবার শুরু হবে।

কিন্তু মানুষগুলোর ভাঙা মন কী করে জোড়া লাগবে ডাক্তার?

তোমার ভালবাসার টানেই তারা আসবে।

কিন্তু আমি যে তাদের ভেতর ঘুরে বেড়াতে পারছি না ডাক্তার।

এর উত্তর আমার কাছে ছিল না। শনিচারি আমাকে প্রশ্ন করেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে বসে রইল।

ওকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। তাই বললাম, তোমাকে সারিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছি শনিচারি। নিশ্চয়ই তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

শনিচারির মুখে করুণ এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

সুস্থ হই আর না হই, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তোমার কথা আমার মনে থাকবে ডাক্তার।

এত অল্পেই তুমি ভেঙে পড়ছ শনিচারি। তুমি না বনের মানুষগুলোকে জাগিয়ে তোলার ব্রত নিয়েছ?

আজকাল মাঝে মাঝে কেমন দুর্বল হয়ে পড়ি ডাক্তার। মনে হয়, আমার এতবড় কল্পনার সব কিছুই কী করে যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

ওর হাতে দুধের গ্লাসটা তুলে দিয়ে বললাম, শরীরটাকে সুস্থ রাখ, তাহলে মনের দুর্বলতাগুলো সহজে জয় করতে পারবে।

হাসপাতাল থেকে কোয়ার্টারে ফিরে আসতে সেদিন একটু রাত হয়ে গেল।

এসেই দেখি বামিয়া ইতিমধ্যে এসে গেছে। রাতের খাবার তৈরির কাজে মন দিয়েছে সে। আর তার পাশের ঘরে জানালায় বসে তাকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে শনিচারি। আমার ডিসপেনসিং রুমের জানালা খুললেই কিচেন দেখা যায়।

রাতের খাওয়া শেষ করে বারান্দায় এসে বসলাম। চাঁদের আলোয় এই বনভূমি কেমেন রহস্যময় মনে হল। কতদিন এই চন্দ্রালোক-ধোয়া পাহাড়ি পথ ধরে আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছি। বনের হিংস্র পশুর ভয় আমাকে আড়ষ্ট করতে পারেনি। আমি চলে গেছি কত পাহাড়ি বাঁক পেরিয়ে, কত ঝর্ণার পাশ দিয়ে। রাতে বনের ফুল কী মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়।

কে যে এসে তাদের গন্ধ আঘ্রাণ করে তা আমি জানি না। হয়তো কোনদিন দুধসাদা চাঁদের আলোয় মৌমাছিরা উড়ে আসে ওই সব ফুলের বনে। অথবা কোনও হরিণ ঝর্ণার ধারে শালের ফুলের গন্ধে এসে দাঁড়ায় তার সঙ্গিনীকে নিয়ে। রাতের জগত কী রহস্যময়, কী রোমাঞ্চকর। দিনের বেলা মানুষের চলাফেরার পথে, সহস্র কাজকর্মের মাঝে প্রকৃতি নিজেকে তেমন করে প্রকাশ করে না। কিন্তু রাতে যখন দিনের কর্ম কোলাহল নীরব হয়ে আসে, তখন প্রকৃতি তার মুখের ওপর ঢেকে রাখা ওড়নাখানা সরিয়ে ফেলে। তখনই তার অপরূপ রূপের দেখা পাওয়া যায়। চাঁদের আলোয় সে স্নান করে। সবুজ অরণ্যের কোমল একটা লাবণ্য গড়িয়ে পড়ে তার সর্বাঙ্গ বেয়ে।

পাহাড়ি জ্যোৎস্নার ওড়না ঢাকা গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম, আর ভাবছিলাম কত কথা।

শনিচারি পাশে এসে বসল। ডিসপেনসিং রুম থেকে আমার বাইরের ঘরের বারান্দা একটু দূরেই বলতে হবে। ওর পক্ষে ঠিক এতখানি পথ না আসাই উচিত ছিল। তবু ওকে কিছু বলতে পারলাম না। এই আশ্চর্য জ্যোৎস্নার প্রেমে কতক্ষণ দুজনেই মগ্ন হয়ে রইলাম।

শনিচারি প্রথমে কথা বলল, আমার দেশ তোমার ভাল লাগে ডাক্তার?

তোমার দেশের এই চাঁদের আলো আমার কাছে বিটোফেনের সংগীতের মত মনে হয়।

শনিচারি মিষ্টি একটা হাসি হাসল।

তুমি ডাক্তার না শিল্পী আমি মাঝে মাঝে তাই ভাবি।

হেসে বললাম, মাঝে মাঝে তা হলে আমার কথা ভাব শনিচারি!

ও বলল, তুমি আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছ।

বললাম, সেকি! ভাবতে কাউকে কখনও কেউ বাধ্য করতে পারে।

তুমি করনি ঠিক, কিন্তু আমি বাধ্য হয়েছি ভাবতে।

কথা ক'টি বলে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল শনিচারি। আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এখন যে কেউ ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেই বুঝতে পারবে, সব কিছু ভুলে কী গভীর হয়ে ও ওর চিন্তার ভেতর ডুব দিয়েছে।

এক সময় ও যেন আবেগে ভেঙে পড়ল, আচ্ছা ডাক্তার, তুমি বলতে পার, কেন তুমি আমার জন্যে এত করছ? তুমি জান, আমি তোমার দেশের, তোমার জাতির শত্রু, তবু কেন

আমাকে এমন করে আশ্রয় দিলে। আমি এর কোন প্রতিদানই তো তোমাকে দিতে পারব না ডাক্তার।

বললাম, বার বার তুমি একটি ভুল করছ শনিচারি। আমি তোমাকে আগেও বলেছি, আহতকে সেবা করা আমার ধর্ম। যে কোনও ঘটনাতেই হোক, আমরা সেদিন যখন ওই শালের বনে মুখোমুখি হলাম, তখন সুস্থ নও। তার পরের কর্তব্যটুকু আমি স্বাভাবিকভাবেই করেছি। সুতরাং এখানে দান প্রতিদানের কথাই আসে না।

এবার কী ভেবে হাসি ফুটল শনিচারির মুখে।

বলল, বেশ আছি ডাক্তার! বনে বনে অভুক্ত থেকে কোথায় যে ঘুরে বেড়াতাম তার ঠিক ঠিকানা নেই। এখন নিশ্চিত আরামে তোমার আশ্রয়ে যে ক'টা দিন কাটানো যায়, সেই লাভ।

অন্য কথার অবতারণা করলাম, বামিয়াকে কোথায় পাঠিয়েছিলে শনিচারি?

ও আমার ডান হাতটা ওর দুটো হাতের ভেতর নিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, আমাকে ও প্রশ্ন এখন কোরো না ডাক্তার।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, তোমার দেওয়া অধিকারের অপব্যবহার করছি, তাই না? কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর ডাক্তার। অধিকার যখন দিয়েছ, তাকে পুরোপুরি ভোগ করতে দাও।

বললাম, বামিয়া ছেলেটা যেমন বিশ্বাসী তেমনি কাজের, তাই না?

ও বলল, আমার দেশের সব ছেলেমেয়েরাই তাই।

তাই তোমার দেশকে এমন ভালবেসে ফেলেছি শনিচারি।

ও বলল, যখন তোমার দেশের মানুষ আমার দেশে এসে শোষণ আর অত্যাচার শুরু করল তখন তাদের ক্ষমা করতে পারিনি। আমি প্রতিদিন তাদের বিরুদ্ধে আমার মনের ঘৃণাকে সঞ্চয় করেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সে ধারণা বদলে গেছে ডাক্তার। কতকগুলো মানুষকে দেখে একটি জাতকে বিচার করা যায় না।

বললাম, তোমাদের ওপর ইংরাজদের ব্যবহারে আমি লজ্জিত হই শনিচারি।

তুমি কেবল ইংরাজ হলে আমি তোমাকে ভালবাসতাম না ডাক্তার। তুমি একটি সুন্দর হৃদয়বান মানুষ বলে তোমার ওপর আমার এত আকর্ষণ।

বললাম, আচ্ছা শনিচারি, তুমি দেশকে ভালবাস, না মানুষকে?

তোমার কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না ডাক্তার। একটু সহজ করে বুঝিয়ে বল।

মনে কর একটি দেশকে তুমি ভালবাস, আবার একটি মানুষও তোমার কাছে প্রিয়। সেখানে প্রয়োজন হলে তুমি কাকে ত্যাগ করতে পার?

এ প্রশ্ন কেন ডাক্তার?

এ আমার নিছক কৌতূহল শনিচারি।

ও স্থির হয়ে বসে রইল কতক্ষণ। তারপর বলল, দেশ চিরদিনই মানুষের চেয়ে বড়, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম আছে।

যেমন?

যদি কোনও মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্ক থাকে তা হলে সে ক্ষেত্রে দেশ মানুষের চেয়ে বড়। কিন্তু যেখানে একটি মানুষ নিজের আশ্চর্য ক্ষমতায় দেশের গণ্ডীর বাইরেও মনটাকে তুলে ধরতে পারেন, সেখানে দেশের চেয়ে আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি।

বললাম, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত নই শনিচারি। একটি মানুষ যত বড়ই হোন, দেশের চেয়ে কী করে তাঁকে বড় বলব তা বুঝতে পারি না।

শনিচারির গলার স্বর গম্ভীর হল। দেখেছি, মনের কোনও গভীর উপলব্ধির কথা বলতে গেলে সে খুব জোরের সঙ্গে তা বলার চেষ্টা করে।

দেশকে একান্ত করে ভালবাসার ভেতর একটু স্বার্থপরতা মিশে আছে। সেখানে মানুষের মন দেশে দেশে বিভেদের গণ্ডীকে মুছে ফেলতে পারে না। কিন্তু যে মানুষ দেশের মোহ কাটিয়ে সবার জন্যে নিজেকে দান করেন, তিনি দেশের চেয়েও বড়।

তুমি তা হলে তোমার দেশের জন্যে সংগ্রাম করছ কেন?

আমি দেশের জন্যে সংগ্রাম করছি না বলে. অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি বললেই ঠিক হবে। সে অন্যায়টা যেহেতু আমাদের দেশের মাটিতেই ঘটছে, তাই তাকে দেশের হয়ে যুদ্ধ বলতে পার।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম শনিচারির দিকে। সেই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে আমার মনে হল পৃথিবীটা কত কাছে সরে এসেছে। সারান্দার এই শৈলঘেরা বনভূমির সঙ্গে আমার দেশের কোথায় যেন হুবহু একটা মিল আছে। এই অরণ্য-কন্যাটির মুখে আমি সারা পৃথিবীর ছায়া-মণ্ডল দেখতে পেলাম।

১০ জুন ঃ

বামিয়া আর শনিচারি প্রায় রোজই-একটা খেলা খেলে। আমি সে খেলার একমাত্র দর্শক।

আমার কোয়ার্টারের পেছনেই একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপরে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা শালের গাছ। ডিসপেনসিং রুমের জানালা দিয়ে শনিচারি তীরের খেলা খেলে। তার পাশে থেকে শিক্ষানবিশি করে বামিয়া।

বামিয়া শাল গাছের কোনও একটি স্থান নির্দেশ করে। অমনি সুঁই করে ছুটে যায় একটা তীর। আমি অবাক হয়ে যাই শনিচারির লক্ষ্যভেদের কৌশল দেখে। নির্দিষ্ট স্থানের ঠিক মধ্যবিন্দুতে শনিচারির তীর বিদ্ধ হয়ে যায়। আমার মনে হয়েছে হাডসনের চেয়েও লক্ষ্যে একাগ্র শনিচারি। হাডসন সুটিং-এ বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। এ বনে হাডসনের তুল্য দক্ষ শিকারীও কেউ নেই। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে শনিচারি হাডসনের চেয়েও দক্ষ।

আমার কোয়ার্টার থেকে ওরা লক্ষ্য ভেদ করে। হাসপাতাল থেকে কেউ তা দেখতে পায় না। আমি বারান্দায় বসে বসে ওদের খেলা দেখি। আজকাল বেলাশেষের কিছু আগে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই চলে আসি ওদের খেলা দেখতে।

এই ব্যাপারটা আমাকে কেমন যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে।

ইতিমধ্যে তীরের খেলায় আমাকে প্রায় অবাক করে দিয়েছে বামিয়া। লক্ষ্যে প্রায় অব্যর্থ সে।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। বারান্দায় বসে আছি। লক্ষ্যভেদের খেলা তখনও শুরু হয়নি। আমি তাকিয়েছিলাম পাহাড়ের ওপর শাল গাছগুলোর দিকে। দেখি, পাহাড় বেয়ে বামিয়া উঠছে। ব্যাপারটা দেখবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

যেখানে দুটো শাল গাছ গায়ে গায়ে জড়াজড়ি হয়ে উঠেছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল বামিয়া।

কিছুক্ষণের ভেতর এক অদ্ভুত কাণ্ড। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটছে তারদিকে। উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হবার জোগাড়। কিন্তু বামিয়া দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচুর মত। তার মাথা ঘেঁষে, কান, বুক হাত ঘেঁষে তীরগুলো বিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে শালের গাছে।

একসময় তীর ছোঁড়া শেষ হল। বামিয়া বেরিয়ে এল। মনে হল, শালের গাছে তীর দিয়ে আঁকা হয়েছে একটি মানুষের অবয়ব।

উঠে গেলাম ডিসপেনসিং রুমে। জানালার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে শনিচারি; পায়ের কাছে পড়ে আছে ধনুকটা। আমার পায়ের সাড়া পেয়ে ও ফিরে তাকাল মুখে মিষ্টি একটা হাসি লেগে আছে।

বামিয়ার জন্যে ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলে, তাই না ডাক্তার?

বললাম, তোমার ওপর ভরসা থাকলেও ভয় আমি পেয়েছিলাম।

ও অমনি বলল, আমার ওপর তোমার বিশ্বাসের চরম পরীক্ষা আজ করছিলাম।

হেরে গেলাম, তাই না?

ওর মুখের কেমন যেন পরিবর্তন ঘটে গেল। মনে হল একটা বেদনা ধীরে ধীরে ছায়া ফেলছে ওর মনের ওপর। ও নীরব হয়ে রইল কতক্ষণ।

একসময় বলল, তোমার ওপর বিশ্বাস হারালে আমার আর কী রইল ডাক্তার। একটা পঙ্গুকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ। যখন তার মাথার লোভে তোমারই দলের লোক ঘোরাঘুরি করছে, তখন সে পরম নিশ্চিন্তে স্থান পেয়েছে তোমারই কাছে। এর চেয়ে বিশ্বাসের পরীক্ষা আর কী হতে পারে। আর যা হই, আমাকে তুমি অকৃতজ্ঞ ভেবোনা ডাক্তার।

পরিস্থিতিটা সহজ করবার জন্যেই বললাম, বামিয়ার কিন্তু তোমার ওপর অগাধ বিশ্বাস। তুমি তীর ছুঁড়ছ, আর ও দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল হয়ে। অন্য কেউ হলে, সে একেবারে দাঁড়াতেই পারত না।

ও আমাকে ভালবাসে ডাক্তার।

বললাম, ভালবাসাই বিশ্বাসের জন্ম দেয়।

আমার কথা শুনে চুপ করে রইল শনিচারি। কতক্ষণ এমনি থেকে হঠাৎ এক সময় বলল, তুমি তা হলে আমাকে ভালবাস ডাক্তার?

হেসে বললাম, এ ধারণা তোমার কী করে হল?

তুমিই তো বললে, ভালবাসা থেকেই বিশ্বাস জন্মায়। তুমি আমাকে ভাল না বাসলে আমি তোমাকে এতখানি বিশ্বাস করতাম কী করে।

বললাম, তোমাকে আমি যেমন ভালবাসি, তেমনি শ্রদ্ধাও করি। তোমার ভেতর জোয়ান অব আর্কের মত আগুনের ছোঁয়া পেয়েছি বলেই শ্রদ্ধা করি শনিচারি।

আর ভালবাস কেন ডাক্তার?

তুমি আমার পেসেন্ট বলে। প্রতিটি রোগীকেই আমি ভালবাসি।

এবার অন্যমনস্ক হল শনিচারি। কিছুক্ষণ পরে বলল, তুমি জোয়ান অব আর্কের কথা বলছিলে না ডাক্তার। আমি তাঁর কথা ইতিহাসে পড়েছি। তিনি তো তোমার দেশের শত্রুই ছিলেন।

শত্রু ছিলেন কিনা জানিনা, তবে তিনি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের শ্রদ্ধার পাত্রী, এ কথা বলতে পারি।

শনিচারি আমার ডান হাতখানা আবার তুলে নিল, তুমি জাতির চেয়ে মানুষকে শ্রদ্ধা কর, তাই তোমাকে আমিও শ্রদ্ধা করি ডাক্তার।

ইতিমধ্যে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। হাসপাতাল থেকে সন্ধেবেলা রাউন্ড দিয়ে কোয়ার্টারে ফেরবার পথে দেখি পাহাড়ের তলায় একটা সাদা কালোয় মেশা প্রকাণ্ড ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে দেখি, পাশের একটি পাথরের সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

ঘোড়াটা দেখে বিস্মিত হলাম। হাডসনের ঘোড়া আমি চিনি। আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সব ঘোড়াই আমার চেনা। তা হলে এই নতুন ঘোড়া এলো কোথা থেকে। কোয়ার্টারে গেলাম। সম্ভবতঃ নতুন কোনও অতিথি এসে থাকবেন। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখলাম না। বামিয়াকে জিজ্ঞেস করেও কোন হদিস পাওয়া গেল না।

ডিসপেনসিং রুমে গিয়ে শনিচারিকে এই রহস্যময় ঘোড়ার কথা জানালাম।

আমার মুখে কথাটা শুনে মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল শনিচারি। তার চোখে মুখে প্রবল এক উত্তেজনার আভাস ফুটে উঠল। বললাম, কী হল তোমার শনিচারি। হঠাৎ এভাবে উঠে দাঁড়ালে কেন?

তুমি আমাকে একবার ওর কাছে যাবার অনুমতি দেবে ডাক্তার?

তুমি কেন যাবে, আমিই নিয়ে আসছি ওকে।

না, আমার যাওয়া দরকার। ও আমারই ঘোড়া। তা ছাড়া আমার লোকেরা নিশ্চয়ই কাছে পিঠে কোথাও আছে।

একা তোমার পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয় শনিচারি। আমি তোমাকে বরং সাহায্য করতে পারি।

তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে ওরা কিছুতেই কাছে আসতে চাইবে না ডাক্তার।

তা হলে?

শনিচারি মুহূর্তকাল চিন্তা করল। তারপর বলল, বামিয়াকে আমার সঙ্গে দাও। ওর ওপর ভর রেখে আমি এটুকু পথ চলে যেতে পারব।

বামিয়াতে নিয়ে শনিচারি চলে গেল। আমি বারান্দায় এসে বসলাম। এলোমেলো কত কথা আমার মনে আসতে লাগল। সেই প্রথম দিনটির কথা, যেদিন শনিচারির সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়েছিল সেদিনও বোধকরি এমনি একটি ঘোড়ায় চড়ে আমার পথ রোধ করে ও দাঁড়িয়েছিল।

তারপর কী ক্ষিপ্রতায় ও আমাকে বর্ষার ভেতর আমার পরিচিত পথের ওপর পৌঁছে দিয়ে গেল।

কতদিন কত কথা শুনেছি ওর সম্বন্ধে। কত নতুন বুদ্ধির খেলা ও দেখিয়েছে লড়াইয়ের সময়। ওর বিচক্ষণতাকে দূর থেকে আমি সম্ভ্রমের চোখে দেখেছি।

তারপর একদিন ও এসে ধরা দিল আমারই কাছে। কী বিশ্বাসের ছবি ও প্রথম দিন দেখেছিল আমার চোখে, যে জন্য নির্ভয়ে সে আমার কাছে চলে আসতে পারল।

আমি মানুষকে ভালবাসি, তাই ও আমাকে বিশ্বাস করেছে।

মানুষকে ভাল না বাসলে ডাক্তার হব কী করে। মানুষে মানুষে ভেদ, দেশে দেশে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেন অসুস্থ রাজনীতিজ্ঞেরা, কিন্তু ডাক্তারের বৃত্তি তো তা নয়। আমাদের কাছে

প্রতিটি মানুষের মূল্যই এক। দেহের অস্থিমজ্জার গঠনে রাজা প্রজা বলতে তো কোন ভেদ নেই।

শনিচারি আমার এই মনোভাবের প্রশংসা করে। কিন্তু ও ডাক্তার হলে বুঝতে পারত এতে প্রশংসা করবার কিছু নেই। এ আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম।

আচ্ছা, আমি কি শনিচারিকে আশ্রয় দিয়ে অন্যায় করছি না। আমি আমার সরকারের অর্থ নিচ্ছি, তার সেবা করা, তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই কী আমার উচিত নয়। শনিচারি আমাদের সরকারেরই তো বিরুদ্ধাচরণ করছে।

কিন্তু অন্যায় করছে আমার সরকার। শনিচারি তার দেশকে ভালবাসে, এটা তার অপরাধ হতে পারে না। পরদেশের মানুষের কাছ থেকে আঘাত পাওয়া স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায়না।

আমার দেশ, আমার জাতি মানুষকে পীড়ন করে যে অন্যায় করেছে, আমার সেবা দিয়ে যদি তার সামান্য পরিমাণও স্খালন করতে পারি।

আচ্ছা, শনিচারি যদি আর ফিরে না আসে। সে যদি তার দলের লোকজনের সঙ্গেই চলে যায় গভীর অরণ্যে।

কথাটা ভাবতে গিয়ে মনটা কেমন দমে গেল। একটা দুর্জন অভিমান আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ও কি যাবার আগে একবারও আসবে না আমার কাছে। শনিচারি কৃতজ্ঞতা জানাক তা আমি চাই না। আমি কর্তব্য করেছি, কৃতজ্ঞতা আমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু এতদিন একই সঙ্গে রইলাম, তাই যাবার আগে স্বাভাবিক সৌজন্যটুকু দেখিয়ে যাবে না।

কি এলোমেলো ভাবছি আমি। শনিচারি রক্তাক্ত দেহ নিয়ে একদিন যদি তার দেশের মানুষের হয়ে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে আসতে পারে তা হলে আজ আমি তার আচরণকে সন্দেহ করব কেন।

কত সময় এমনি ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার সামনে শনিচারি এসে দাঁড়িয়েছে। তার পেছনে বামিয়া। হাতে খাবারের প্লেট।

আজ এইখানে বসেই তোমার ডিনার হোক্।

ওকে দেখে মন হঠাৎ খুশিতে ভরে উঠল।

বললাম, এসো আমরা একসঙ্গে বসে খাই।

শনিচারি ইঙ্গিত করল। বামিয়া আমার খাবার রেখে ওর খাবারটা আনতে গেল।

তুমি এতক্ষণ আসনি দেখে মনে মনে বেশ চিন্তিত হচ্ছিলাম।

হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর মুখে।

বলল, ভাবনা হচ্ছিল বুঝি, যদি আর ফিরে না আসি।

চলে গেলেও যে বলে যাবে, সে ধারণা আমার আছে।

বড় দেরি হয়ে গেল আমার, তাই না?

বললাম, রাত কত হল তা ঠিক বুঝতে পারিনি। টুকরো ভাবনার ভেতর সময়টা কেমন নিঃসাড়ে কেটে গেল।

কি ভাবছিলে ডাক্তার?

যদি বলি, তোমার কথা।

শনিচারি হেসে বলল, খুব স্বাভাবিক। এত বড় একটি রোগী বাইরে বেপরোয়া ঘুরে বেড়ালে ডাক্তারের ভাবনা হবে বইকি।

বামিয়া খাবার দিয়ে গেল। আমরা দুজন গল্প করতে করতে খেতে লাগলাম।

শনিচারি বলল, আজ বহুকাল পরে আমার দলের কোনও কোনও সর্দারের সঙ্গে দেখা হল ডাক্তার!

বললাম, শুভ সংবাদ, কিন্তু কী করে তারা তোমার সন্ধান পেল?

তুমি কিছু অনুমান করতে পার?

এদিকে ওদিকে ভেবে বললাম, বামিয়া ওদের খবর দিয়েছে নিশ্চয়।

পারলে না ডাক্তার।

তবে?

তোমার মত ওরাও আমার তীরের খেলা লক্ষ করেছে।

সে কী!

হ্যাঁ, ডাক্তার। কয়েকদিন থেকে আশপাশ ঘুরে ওরা তীরের খেলা দেখছিল। যেদিন বামিয়াকে দাঁড় করিয়ে তীর ছুড়লাম, সেদিন ওরা আমার এখানে থাকা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে।

তারপর?

ওরা ভেবেছিল আমি এখানে আহত অবস্থায় বন্দি হয়ে আছি। তাই আমার ঘোড়াটাকে সাহায্যের জন্য এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তোমার ঘোড়া কোথায় ছিল?

যেদিন গুলিতে আহত হলাম, সেদিন ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওরা তাকে বনের পথে ধরেছিল। কিন্তু আমি কোথায় আছি তা জানতে পারেনি।

এখন কি করবে তুমি?

হেসে বলল, তোমার চিকিৎসায় থেকে সুস্থ হয়ে উঠব।

তাড়াতাড়ি সারতে না পারলে?

কোনও ক্ষতি নেই। ওরা আমার সন্ধান জেনে গেল। এখান থেকেই আমি ওদের পরামর্শ দিতে পারব।

বললাম, এটা সরকারী হস্‌পিটাল, পলিটিক্যাল মিটিংয়ের জায়গা নয়।

তুমি যে জায়গায় হাসপাতাল করেছ, এটা আমাদেরই দেশের মাটি ডাক্তার।

আচ্ছা, এটা যে তোমাদের জায়গা তা না হয় মানলাম, কিন্তু হাসপাতাল এলাকায় মিটিং করা কী উচিত?

শনিচারি হেসে বলল, চিন্তা করোনা ডাক্তার। যেদিন মিটিং হবে সেদিন আমি তোমার হাসপাতাল থেকে দূরে চলে যাব।

যদি তোমাকে অনুমতি না দিই।

আমাকে তুমি বেঁধে রাখতে পারবে ডাক্তার?

এ কি বলছ তুমি শনিচারি! ডাক্তার যদি রোগীকে বাইরে যাবার অনুপযুক্ত মনে করে, তা হলে রোগী কি তার অবাধ্য হবে?

আমার কথা শুনে শনিচারি হঠাৎ মুখ নিচু করল।

আমাকে ক্ষমা কর ডাক্তার। যদি অশোভন কিছু বলে থাকি, সে জন্যে মাপ চেয়ে নিচ্ছি।

বললাম, চিন্তিত হয়ো না। তেমন বুঝলে অবশ্যই তোমাকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে।

১৭ আগস্ট ঃ

কী বিপুল কর্মের উদ্যম দেখলাম শনিচারির। দুটি মাসের ভেতর সিন্ধবাদের গল্পের সেই অতিকায় পাখির মত দুটি ডানা মেলে সারা বনভূমি আচ্ছন্ন করে ফেলল।

কী অসাধারণ প্রাণের জোয়ার। আমার কতটুকু সাধ্য ওকে বাধা দিয়ে রাখতে পারি। প্রথম প্রথম এক আধটু বাধা দিয়েছি; অমনি আমার দুটি হাত ধরে ও অনুনয় করেছে, আমাকে একবারটি যেতে দাও ডাক্তার। এই বর্ষার সুযোগ হারালে আর কখনও দাঁড়াতে পারব না।

ওকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। যে ইচ্ছা করলে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে, সে যখন অনুমতি ভিক্ষা করে, তখন তাকে বাধা দেবার মত মনের শক্তি থাকে না।

মাঝে মাঝে আমি বিশেষ দুঃখিত হয়েছি। বলেছি, নিজের পাখানাকে দিনের পর দিন এমন করে জখম করছ কেন শনিচারি?

ও উত্তর দিয়েছে, সারা জীবন পঙ্গু হয়ে, পরাধীন হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না বলেই তো এমন করে পাখানাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ডাক্তার।

আমি আর কোনও কথাই বলিনি। বোধহয় বলতে পারা সম্ভব ছিল না।

বর্ষার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করল শনিচারি। পাহাড়ী বন্যার মত আদিবাসীরা ভেঙে পড়ল বরাইবুরুর পুলিশ ক্যাম্পগুলোর ওপর।

গত লড়াইয়ের পর সরকারী আর্মড ফোর্সের বেশি অংশই বন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আদিবাসীরা ওই সুযোগ পেয়ে গেল। তারা বরাইবুরু দখল করে নিল।

হাডসন ছাতমবুরু থেকে কিছু সংখ্যক ফোর্স আনলেন কুম্ডির বাংলো রক্ষার জন্যে।

খণ্ড খণ্ড লড়াই চলল। বহুক্ষেত্রে আদিবাসীরাই জয়ী হল। এই বর্ষাই তাদের একমাত্র ভরসা। প্রকৃতির এই সহযোগিতার সদ্ব্যবহার করতে না পারলে আর কোনও আশাই থাকবে না তাদের।

একদিন শনিচারি ফিরে এল হাসপাতালে। দেখলাম, ক্ষতস্থান দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। ক্ষোভের সঙ্গেই বললাম, হয় তুমি একেবারে বাইরে চলে যাও, নয়তো চিকিৎসার ভেতর থাক কয়েকদিন।

ও বলল, এই চরম মুহূর্তে তুমি কী বলছ ডাক্তার। আমার দেশের মানুষগুলো একমাত্র আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে।

উত্তেজনায় কাঁপছিল ও।

বললাম, এমনভাবে রক্ত পড়তে থাকলে আর দু-চারদিনও তারা তাদের নেত্রীকে তাদের মাঝে পাবে না।

শরীরের অবস্থাটা কী খুব খারাপ ঠেকছে ডাক্তার?

তোমার মত আমি উত্তেজিত হইনি শনিচারি। আমি ডাক্তার। রোগীর অবস্থাটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় উত্তেজনার কারণ।

শনিচারি আমার নির্দেশে কয়েকদিন চিকিৎসার ভেতর থেকে গেল। একটা উত্তেজনার তাড়নায় ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল; বুঝতে পারেনি, ভেতরে ভেতরে ও কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

উত্তেজনার পরেই অবসাদ। মাঝে মাঝে শনিচারি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই অবস্থায় কেবল যুদ্ধের প্রলাপ চলতে থাকে। আমি সাধ্যমত সেবা করি। যখন ও জ্ঞান ফিরে পায় তখনই বামিয়াকে নির্দেশ দিয়ে পাঠায় তার দলবলের কাছে। এমনিভাবে কাজ চলতে থাকে।

এক সন্ধ্যায় ফিরে এল বামিয়া। তার মুখের ভাব দেখে মনে হল, কোথায় যেন কী একটা অঘটন ঘটেছে।

গোপন খবরটা শনিচারিকে দেবার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু তখন শনিচারি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে।

আমি বামিয়াকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বললাম, খবর যত গুরুতরই হোক্, শনিচারির অসুখ তার চেয়েও গুরুতর। সুতরাং একটু সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তার কাছে কিছু বলা চলবে না।

মনে হল ও আমার সামনেই কেঁদে ফেলবে।

বললাম, কি ব্যাপার বামিয়া?

ও যা বলল তার অর্থ হল, শনিচারির দলের প্রধান সর্দার আজ গুলির ঘায়ে মারা গেছে। দলের সাধারণ লোকেদের মনে ক'দিন থেকেই এ রকম একটা ধারণা জন্মেছিল, শনিচারিকে সরকার নাকি বন্দি করে ফেলেছে। সে খবর শুনে দলের ভেতর ভাঙন ধরেছিল। তারপর আজ সর্দার মারা যেতে সবাই বরাইবুরু ছেড়ে বনের ভেতর আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যাচ্ছে।

এ সময় শনিচারি সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াতে পারলে ওরা সবাই ফিরে আসত।

শনিচারির কাছে গেলাম। ও তেমনি পড়ে আছে আচ্ছন্ন হয়ে। মনে হল, ওর জাতির এই চরম অবস্থার কথা ওকে একবার জানানো দরকার। নইলে আমিই হয়ত ওদের এই পরাজয়ের জন্য দায়ি হয়ে যাব।

কাছে গেলাম, ধীরে ধীরে ওকে জাগাবার চেষ্টাও করলাম, কিন্তু ও একবার চোখ মেলে পরক্ষণে গভীর ঘুমে ডুবে গেল। বামিয়া আর আমি শনিচারির জাগার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

পরের দিন খবর এল, সরকারী নতুন ফৌজ-বাহিনী জামদা থেকে মার্চ করে আসছে। আদিবাসীরা সে খবর পেয়ে গভীর বনের ভেতর লুকিয়েছে।

এবারের পরাজয় আদিবাসীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেল। যে উদ্যম নিয়ে ওরা শুরু করেছিল, সেটুকু শেষ অবধি বজায় রাখতে পারলে, সরকার হয়ত বনের আদিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারত। চিরস্থায়ী একটা সুযোগ সুবিধেও ভোগ করতে পারত তারা। কিন্তু বিধাতার উদ্দেশ্য তা নয়। শনিচারির আঘাত আজ সমস্ত অরণ্যের মানুষদের ওপর চরম আঘাত হানল।

২৩ অক্টোবর ঃ

পায়ের আঘাত থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছে শনিচারি, কিন্তু মনের ক্ষত আরোগ্য হবে কী করে।

সারাদিন বসে থাকে ঘরের ভেতর। ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে দূরের উপত্যকার দিকে। উপত্যকার শেষে ছোটনাগরার সীমানা। ওর পিতার রাজ্য, ওর বাল্য, কৈশোরের স্বপ্নভূমি। হয়ত ও ভাবে ওর অতীত জীবনের কথা। স্বপ্ন দেখে আবার সে রাজ্য সে ফিরে পেয়েছে। সেখান থেকে জড়ো করেছে অরণ্যের সাধারণ মানুষদের। আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলছে তাদের।

আজকাল আমি যখন ওকে ডাক দিই তখন কেমন অসহায় দুটো চোখ মেলে ও আমার দিকে তাকায়। যা বলি, কোন প্রতিবাদ না করে তাই শোনে।

ওর এই অসহায় ভাবটা আমাকে বড় পীড়া দেয়। যার ইঙ্গিতে সারা বনের মানুষ প্রাণ দিতে পারত, আজ সে সামান্য একটা ঘরের ভেতর অন্যের আশ্রয়ে তার দুর্ভাগ্যকে বয়ে নিয়ে চলেছে।

একদিন বসলাম ওকে প্রবোধ দিতে।

বললাম, রবার্ট ব্রুসের সাধনার কথা তুমি জান। তা হলে এমন ভেঙে পড়ছ কেন শনিচারি।

ও আমার দিকে তাকাল। মুহূর্তে মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আবার কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

বলল, কোনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না ডাক্তার।

এখন তোমার তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথা দিয়ে কেমন করে যে সুযোগ এসে যাবে তা তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না।

আমার দেশের মানুষ কী আর সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইবে।

তুমি শক্তি জোগালে তারা আবার জাগবে।

তুমি জান না ডাক্তার, যে খাবার দেয়, মানুষ তার কাছে নিজেকে বিক্রি করে। তোমাদের সরকার আমার দেশের সাধারণ মানুষকে খাবার দিয়ে বশ করেছে।

আমার মনে হয় আদিবাসীদের পরাজয়ের প্রধান কারণ তোমার অনুপস্থিতি। আর একটা কারণ, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব। তীর আর বর্শা নিয়ে বন্দুক বা বোমার সঙ্গে লড়াই করা যায় না।

শনিচারি কতক্ষণ বসে বসে কী যেন চিন্তা করল।

তারপর একসময় বলল, তুমি ঠিক বলেছ ডাক্তার। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া লড়াইতে দীর্ঘস্থায়ী জয়লাভ অসম্ভব।

বললাম, অস্ত্রশস্ত্রের দিকে নজর দাও।

কেমন বিষণ্ণ করুণ একটা হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে।

বলল, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল ডাক্তার। আমার যা কিছু সম্বল, সবই ফেলে এসেছি ছোটনাগরায়। আমি জানি, ইংরাজরা তার খোঁজ হয়ত পাবে না, কিন্তু আমার সেগুলি আনার পথ যে বন্ধ হয়ে গেছে।

বললাম, চেষ্টা করে দেখ, একটা কিছু উপায় বের হবেই।

ও আবার ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে ভুলে গেল আমার অবস্থিতি। আমি কাজে বেরিয়ে এলাম হাসপাতালে।

হাসপাতাল থেকে ফিরে ডিসপেনসিং রুমে গিয়ে দেখি শনিচারি গভীরভাবে বামিয়ার সঙ্গে কি যেন আলোচনা করছে।

আমাকে দেখে শনিচারি উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

তুমি খুব ভাল ডাক্তার।

কী হল আবার। হঠাৎ আমার প্রশংসা শুরু করলে!

না ডাক্তার, তুমি না বললে আমি হয়তো আর চেষ্টা করার শক্তিই পেতাম না।

নতুন কি পরিকল্পনা নিচ্ছ?

শনিচারি হেসে বলল, সে অতি গোপনীয়। পরে পরে প্রকাশ পাবে। তবে এখন সোনার খনিতে ঢোকার চেষ্টা করছি।

ও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বলল, বামিয়াকে হাসপাতাল থেকে কয়েকদিন বাইরে রাখতে হবে ডাক্তার।

বললাম, বামিয়া কি এখনও আদেশের অপেক্ষায় আছে?

শনিচারি গম্ভীর হল। একসময় মুখ তুলে বলল, জানি, তোমার ওপর আমাদের অত্যাচার দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

তা ভেবে কিন্তু কথাটা বলিনি শনিচারি। এ নিছক কৌতুক।

ও বলল, কৌতুক হলেও কথাটা সত্য।

ওকে সহজ করে দেবার জন্যে বললাম, তুমি বড় বেশি গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ আজকাল। বামিয়াকে বাইরে পাঠাবে, এর জন্যে আমার অনুমতির দরকারটা কী পড়ল তা বুঝতে পারছি না। সাধারণ রোগী আর তোমার মধ্যে পার্থক্যটা কি নতুন করে বলে দিতে হবে।

শনিচারি সহজ হল।

বলল, বামিয়াকে ছোটনাগরায় পাঠাব।

সে কী, সেখানে যে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

শনিচারি কপট ক্রোধের ভান করে বলল. এ তোমার ভারী অন্যায় ডাক্তার। বামিয়া চিরদিন তোমার কাছে চাকরী করবে এমন দাসখত সে লিখে দেয়নি। তার এখন ইচ্ছে হয়েছে, ছোটনাগরার নতুন মনিবদের কাছে দু'দিন চাকরি করে।

এতক্ষণে ওদের পরামর্শের বিষয়টা আমার বোধগম্য হল।

শনিচারি ছোটনাগরায় বামিয়াকে পাঠিয়ে তার সঞ্চিত গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করবে, আর তাই দিয়ে কিনবে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

হেসে বললাম, বামিয়া তার নতুন মনিবদের চিত্ত আর বিত্ত দুইই হরণ করে ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক, এই কামনা করি।

ঝর্ণার কলধ্বনির মত হাসির ঢেউ তুলল শনিচারি।

সে হাসিতে আমিও যোগ দিলাম। শুধু বামিয়া বসে রইল অনুগত আজ্ঞাবহের মত।

২৫ ডিসেম্বর ঃ

হঠাৎ ডরোথি আর রেবেকা হাসপাতালে হাজির।

কী ব্যাপার!

ডরোথি অমনি বলল, অসুখ না হলে বুঝি আসতে নেই?

বললাম, তা কেন, তবে আমার কোয়ার্টার ঠিক কুম্‌ডির বাংলোর মত সুসজ্জিত কিংবা আরামদায়ক নয়, তাই বিশিষ্ট অতিথিরা এলে সঙ্কোচ বোধ করি।

রেবেকা আমাদের কথা শুনে মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন।

এবার মুখ খুললেন, ডরোথি হাসপাতালে আসবে বলে ক'দিন থেকে অস্থির করে তুলেছে। নিজেকে এ জন্যে ভাগ্যবান মনে করছি।

ভাগ্যটা ঠিক কোন্ পক্ষের তা এখুনি হলফ করে বলা যায় না মিঃ জনসন।

ডরোথি এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আমি ওদের ড্রইংরুমে এনে বসালাম।

বললাম, ব্যাচিলারের ডেরায় যখন এসে পড়েছেন তখন সবকিছু নিজেদের করে নিতে হবে কিন্তু।

রেবেকা বললেন, ও ভয় আমাদের দেখাবেন না ডাক্তার। আপনাদের চেয়ে ঘরকন্নার কাজ আশা করি আমরা আর একটু ভাল করেই করতে পারব।

ওঁরা ঘরে ঢুকলেন, আমি কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। শনিচারিকে এঁরা কেউ চেনেন না ঠিক, ওকে পেসেন্ট বলে চালিয়েও দেওয়া যায়, কিন্তু হাসপাতালে না রেখে ডিসপেনসিং রুমে রাখার কী কৈফিয়ৎ দেব আমি।

অবশ্য গোপন করা যেতে পারে সবকিছু, কিন্তু তার জন্যে দরকার প্রচুর সাবধানতা।

শনিচারিকে ওদের উপস্থিতির কথা জানাতেই ও বলল, রান্নাঘরের দিকে জানালাটা একেবারে বন্ধ করে দিলে তোমার কোয়ার্টারের সঙ্গে আমার আর কোনও যোগাযোগই রইবে না।

বললাম, সব কিছু খুব সাবধানে করে যেতে হবে।

শনিচারি বলল, আমাকে নিয়ে তোমার ভাবনার কোনও কারণ নেই, কেবল বামিয়ার জন্যে যা কিছু ভাবনা।

কেন, বামিয়া যে আমার এখানে কাজ করে তাতো ওদের অজানা নয়। সুতরাং তার হঠাৎ এসে পড়াতে ক্ষতি কি?

তুমি সত্যিই বোকা ডাক্তার। বামিয়ার হঠাৎ করে আসাটাকে কেউ লক্ষ না করলেও ওর হঠাৎ করে চলে যাওয়াটা কারো লক্ষ এড়াবে না।

ওকে একবার সাবধান করে দিলে ও রাতে আসতে পারবে।

সেই ব্যবস্থাই করতে হবে, বলল শনিচারি।

বেলা শেষে আজকাল ডরোথি আর রেবেকাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতে হয়। আমি যত রকমের ফুল আর লতার নাম জেনেছি, তাই ওদের এক এক করে চেনাই। ডরোথির এসব শিক্ষায় আগ্রহের শেষ নেই। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার ডরোথি যে শিল্পী তা আমার জানা ছিল না। ও সঙ্গে এনেছে ওর ছবি আঁকার সরঞ্জাম। পথে বেরুলেই সঙ্গে নিয়ে চলে স্কেচের খাতা। পাহাড়ি আঁকবাঁক, শালগাছ, আদিবাসীদের ঘর দোরের ছবি আঁকায় ওর বিশেষ আগ্রহ।

পাহাড়ি বস্তিগুলোতে প্রতিদিন ওদের একবার করে যাওয়া চাই। রেবেকা আদিবাসীদের সহজ সরল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী। ওদের সমাজজীবনের খুঁটি নাটি খবর লিখে রাখেন ওঁর ডায়েরীতে। বিবাহ পদ্ধতি, ধর্মকর্ম, গান, উপকথা, ইতিহাস বহু পরিমাণে সংগ্রহ করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে।

ডরোথি স্কেচের পর স্কেচ করে যাচ্ছে। মেয়েদের দল বেঁধে খোঁপায় ফুল গুঁজে নাচ, ছেলেদের আদুল গায়ে তীরধনু নিয়ে শিকার, ঝর্ণা থেকে মাথায় কলস বসিয়ে মেয়েদের ঘরে ফেরা, এইসব ডরোথির বিশেষ প্রিয় সাবজেক্ট।

সন্ধেবেলা কোয়ার্টারে ফিরে আমি একবার হাসপাতালে রাউন্ড দিয়ে আসি। তারপর

বারান্দায় বসে বসে গল্প শুরু হয়। দেশের গল্প। আত্মীয় পরিজনের কথা। লণ্ডনের জীবনযাত্রার ছবি ফুটে ওঠে আমাদের চোখের ওপর।

কতদিন নিজের দেশ দেখিনি। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কত দূরে সরে এসেছি। মাঝে মাঝে দু'একখানা চিঠি আসে। কতবার ফিরে ফিরে সে চিঠি পড়ি। আমার মেডিক্যাল কলেজের বন্ধুদের চিঠি।

মাকে হারিয়েছি ছেলেবেলা। বাবা প্রচুর অর্থের মালিক। তিনি আবার বিয়ে করলেন। আমার বিমাতার অনেকগুলি সন্তান। তারা লণ্ডনেই লেখাপড়া করছে। নিজের একটিমাত্র বোন। কত আদরই না তাকে করতাম। সে এখন সুখেই টমাসের ঘর করছে।

মনে মনে এমনি আমরা তিনটি প্রাণী হারিয়ে যাই আমাদের ফেলে আসা পুরনো জীবনে।

গল্পের ভেতর একদিন আমি পিটারের কথা তুলেছিলাম। ডরোথি দেখলাম একটুও আগ্রহ প্রকাশ করল না। ও প্রসঙ্গ থেকে সে নিজেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে চাইল। রেবেকা দু'চার কথা বললেন। অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা করলেন তিনি।

বুঝলাম, পিটার মুছে গেছেন ওঁদের মনের ক্যানভাস থেকে।

ডরোথি ভার নিয়েছে আমার পোশাক পরিচ্ছদের। আমি প্রথম প্রথম বিব্রত বোধ করেছিলাম, কিন্তু রেবেকাই মাঝে পড়ে আমার সংকোচ দূর করে দিয়েছেন।

রেবেকা বললেন, কুমারী মেয়ের কিছু কিছু সংসারের কাজ হাতে কলমে করা দরকার। ডরোথি যদি পোশাকগুলো যত্ন করে রাখতে পারে তাহলে সেটা তার শিক্ষা। সে সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারেন না ডাক্তার।

হেসে বললাম, আপনারা কোনও কাজে বিরক্তবোধ না করলে আমার দিক থেকে বিব্রত বোধ করার কোন কারণই থাকে না।

ডরোথি আজকাল আমার কাছে কাছেই থাকতে চায়।

সেদিন বলল, আমি আপনার সঙ্গে হাসপাতালের কিছু কিছু কাজ করতে চাই।

বললাম, বেশ ভাল, কিন্তু কি কাজ করবেন?

কিছু না পারলেও নার্সিং তো করতে পারব।

বললাম, নার্সিং খুব সহজ কাজ নয়। তবে মন বসাতে পারলে সব কাজই সহজ হয়ে আসে।

আমি চেষ্টা করব।

হেসে বললাম, কিন্তু কতদিন সে চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারবেন?

ও বলল, যতদিন না আপনি আমাকে বরখাস্ত করেন।

বললাম, মিঃ হাডসন আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে নিশ্চয়ই খুশি হবে না।

কি করে বুঝলেন?

এখানে রোগীদের ভেতর আদিবাসীর সংখ্যাই বেশি। ওদের সঙ্গে সরকারের যে ভাবটা চলেছে তাকে কোনমতেই সদ্ভাব বলা চলে না। এ অবস্থায় আদিবাসীর সেবা অমার্জনীয় অপরাধ।

আপনি করছেন কি করে?

আমি প্রথমে ডাক্তার, তারপর সরকারের লোক। আমার কাছে সব মানুষের জাতই এক।

ডরোথি চুপ করে রইল।

বললাম, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল হওয়া তৃপ্তির বা গৌরবের সন্দেহ নেই, কিন্তু সবার জীবন এক ধারায় বয় না।

আমি যদি সে জীবন গ্রহণ করি?

তাতে বাধা দেবার কিছু নেই। তবে আপনি যে জীবন পেয়েছেন তা চেষ্টা করলেই পাওয়া যায় না।

ডরোথি বিস্মিত হয়ে আমার দিকে চাইল।

হেসে বললাম, ফুল যদি তার নিজের গন্ধের কথা জানতে পারত তাহলে সে আত্মগর্বের জন্যে মানুষের কাছ থেকে এতখানি স্তুতি পেত না।

আমাকে বড় বেশি বাড়িয়ে তুলছেন ডাক্তার জনসন।

আপনার শিল্পসত্তাকে আমি শ্রদ্ধা করি জানবেন। ছবি আঁকতে চাইলেই আঁকা যায় না। ও প্রতিভা আসে ভেতরের অলক্ষ কোন ক্ষমতার থেকে।

ডরোথি কোনও উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করে রইল।

একদিন এসে পড়লেন হাডসন। হৈ হৈ জুড়ে দিলেন। কাজকর্মের বাইরে মানুষটি বিশেষ আমুদে।

বললেন, ডাক্তার তোমার রোগীরা কেমন আছে বল?

বিশেষ কোন জটিল কেস এখন হাতে নেই। মোটামুটি ভালই বলতে পারা যায়।

আমি কিন্তু তোমার হাসপাতালের সাম্প্রতিক দুই রোগীর কথাই বিশেষ করে জানতে চাইছি।

ডরোথি, রেবেকা আর আমি হেসে উঠলাম।

বললাম, রোগের বিশেষ কোন লক্ষণ এখনও ধরা পড়ছে না।

হাডসন বললেন, রোগ ধরার দু'রকমের চোখ আছে। আমাদের এই দুটো চোখে দেহের রোগ হয়তো ধরা পড়ে, কিন্তু মনের রোগ ধরার আলাদা চোখ চাই।

ডরোথি অমনি বলল, অপবাদটা বড় বেশি সোজাসুজি হয়ে যাচ্ছে।

হাডসনের হাসি আর থামতেই চায় না।

ডরোথি যে বিশেষ ধরনের রোগে ভুগছে, আশাকরি এ কথা না বলে দিলেও তুমি বুঝতে পারছ ডাক্তার।

মোটেই তা নয়, ডরোথি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু তা কি করে বিশ্বাস করি বল। আমরা ভুক্তভোগী। তোমার অবস্থা আমরা পার হয়ে এসেছি। অভিজ্ঞতার সঞ্চয় আমাদের আছে, তোমার কিংবা ডাক্তারের নেই।

আবার তেমনি উচ্ছল হাসি ছড়াতে লাগলেন হাডসন।

বললাম, ডাক্তার কিন্তু নিজের চিকিৎসা করতে চায় না।

হাডসন বললেন, এ ব্যাপারে ডিগ্রি না থাকলেও আমার ওপর চিকিৎসার ভার ছেড়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

বললাম, আক্রমণটা কিন্তু প্রথমে আমার দিকে ছিল না।

হাডসন বললেন, এ এক অদ্ভুত শিকার ডাক্তার জনসন। এ শিকারে একসঙ্গে দু'জনকেই লক্ষ করতে হয়।

এবার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম।

আপনার আর একটা শিকার কিন্তু অনেক দিন দেখিনি। উড়োপাখি শিকার।

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন হাডসন। বললেন, মানুষ শিকারের কাজ এখন বন্ধ আছে, চল সবাই মিলে পশুপাখি শিকার করে বেড়াই।

কবে যাচ্ছেন? ডরোথির গলায় কৌতূহল।

কালই চল।

চারটে ঘোড়া এল। আমরা শিকারে চললাম সদলবলে। আমাদের সঙ্গে রইল আদিবাসী কয়েকটি কুলি কামিন।

সারাদিন বনবাদাড় ভেঙে চলল শিকার পর্ব। ডজন খানেক বন মোরগ, আর কয়েকটা খরগোস কপালে জুটল। বনের মাঝে মিলল একটি খোলামেলা জায়গা। বড় সুন্দর জায়গাটি, পাশেই একটি ঝর্ণা। তার দু'দিকে বড় বড় নুড়ি পাথর পড়ে আছে। পাশে বেশ খানিকটা অংশ সবুজ সমতল।

আমরা কতদিন পরে কাজের বাইরে একই দেশের কজন মানুষ একসঙ্গে মিললাম।

গান গাইলেন রেবেকা। চমৎকার সুরেলা গলা। আগেও আমি রেবেকার গান শুনেছি। কিন্তু বনের এই নিভৃত লোকে রেবেকার গান বড় অদ্ভুত শোনাল।

রান্নার ভার পড়ল রেবেকার ওপর।

হাডসন সত্যিই সুখী। মনে হল, রেবেকার জীবন প্রভু যীশুর কৃপায় সুন্দর হয়ে উঠেছে।

মাংস তৈরির ভার আমার ওপর।

হাডসন বললেন, কেমন অপারেশন কর তা আজকে দেখা যাবে।

ডরোথি আর রেবেকা কাছে এল। আমি জীবদেহের এক একটা অংশ ওদের কাছে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে লাগলাম।

ডরোথি বলল, আজকের ঘটনার সবচেয়ে ইনটারেস্টিং বিষয় এই ডিসেকসন পর্ব।

হাডসন বললেন, এটা তোমার মত না সবার সেটা যাচাই করে দেখতে হয়।

রেবেকা বললেন, আমিও ডরোথির সঙ্গে একমত।

হাডসন বললেন, মন্ত্র জান ডাক্তার। ক'দিন হাসপাতালে থেকে ওরা তোমার ভক্ত হয়ে গেছে।

ডরোথি অমনি বলল, আপনিও এমনি হাসপাতালের ভার নিন, তাহলে আমরা আপনারও ভক্ত হয়ে পড়ব।

হাডসনের আবার সেই হাসি।

আমি খোদ চিড়িয়াখানার ভার নিয়ে বসে আছি।

আমাদের চিড়িয়া ভাবলেন নাকি?

আমার চিড়িয়াখানার চিড়িয়া না হলেও বিধাতার চিড়িয়াখানার জীব, এটা অস্বীকার করতে পার না।

হাসি, গল্প, গানে আমাদের সারাদিনের আসর জমে উঠল।

বেলা শেষে ফেরার উদ্যোগ করছি, এমন সময় খবর এল, পথে হাতি দেখা গেছে।

ডাইনে পাহাড়, বাঁয়ে খাদ, এর মাঝে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা, ঘোড়ায় চড়ে যাই কেমন করে। এদিকে বেলা শেষ হয়ে আসছে। অন্ধকার পথে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল।

আদিবাসীরা আমাদের বনের ভেতর অপেক্ষা করতে বলে আশেপাশে বস্তির খোঁজে খাদ বেয়ে নেমে গেল। আমরা কতক্ষণ ওই একই জায়গায় বসে রইলাম। সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলল সমস্ত বনভূমি।

চোখের ওপর পাহাড়ি পথটা মুছে গেল এক সময়। আদিবাসী লোকগুলো আর ফিরে এল না।

কারো মুখে কথা নেই। বিচিত্র সব কীট পতঙ্গ ডাকতে শুরু করল।

কিসের একটা খস্ খস্ শব্দ হতেই ডরোথি ভয়ে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরল।

হাডসন বললেন, আমার মনে হয়, কুলিরা পথ হারিয়েছে। ওদের নিশানা দেবার জন্যে ফায়ার করা যাক্।

বলার সঙ্গে সঙ্গে হাডসন বন্দুক তুলে ফায়ার করলেন পর পর কয়েকটা।

আধঘণ্টা কাটল। কোনও সাড়াশব্দ নেই। একই জায়গায় স্থানু হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করে আছি যে কোনও রকম একটা অঘটনের।

হঠাৎ রেবেকা চিৎকার করে উঠলেন, ওই যে বনের আড়ালে সারি সারি মশালের আলো দেখা যাচ্ছে!

আমরা উৎফুল্ল হয়ে সেদিকে তাকালাম।

হাডসন বললেন, আমার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার দেখছি কাজ দিয়েছে।

কিছু সময়ের ভেতর মশালধারীরা এসে পড়ল আমাদের কাছে।

কিন্তু একি, এদের ভেতর আমাদের পরিচিত লোকগুলি কই! দেখলাম, চেনা লোকগুলির একটিমাত্র রয়েছে ওদের সঙ্গে।

ওরা এসে প্রথমেই হাডসনের হাতের বন্দুকটা টেনে কেড়ে নিলে।

হাডসন এ রকম ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, তাই তিনি কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

ওরা এবার দু'দলে বিভক্ত হয়ে আমাদের আগে পিছে চলতে লাগল। বুঝতে পারলাম, আমরা আদিবাসীদের হাতে বন্দি হয়েছি।

এবার চড়াই উৎরাই ভেঙে আমাদের চলতে হল। কিছুক্ষণ চলার পর চাঁদ উঠল। আমরা এসে পৌঁছলাম একটা ভ্যালির এক প্রান্তে। দু'দিকে পাহাড় উঠে গেছে, মাঝে গিরিখাদ। ঐ গিরিখাদের ঠিক নীচেই ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর থেকে একটি আলোর রশ্মি এসে পড়েছিল। আমরা কিছু সময়ের ভেতর সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। কাছে যেতে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর চোখে পড়ল। পাথরের তৈরি দেয়াল। খড়কুটোর ছাউনি।

সারারাত সেখানে আমরা বন্দি হয়ে রইলাম। রেবেকা আর ডরোথিকে কোথায় যেন ওরা সরিয়ে নিয়ে গেল। ছেড়ে যাবার সময় দেখলাম, ওদের চোখেমুখে ভীতির ছায়া। আমাদের সামনের দরজাটা এক সময় চোখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সেই নির্জন রহস্যময় বনের ভেতর বন্দি হয়ে রইলাম।

হাডসনের মুখে কথা নেই। গভীরভাবে কী যেন ভাবছেন তিনি। হয়তো ভাবছেন মুক্তির উপায়, হয়তো বা ভাবছেন পরিণতির কথা।

সামনের দরজা আবার খুলল। কয়েকখানা রুটি আর সেদ্ধ ডিম ওরা রেখে গেল আমাদের সামনে। এবার ঘরের ভেতর বসিয়ে দিয়ে গেল একটা টেমি। টিম টিম করে জ্বলতে লাগল টেমিটা।

হাডসন চুপচাপ বসে আছেন দেখে বললাম, কিছু খান।

এ অবস্থায় কিছু খাওয়া যায় না জনসন। কথা কটি বলে আবার চিন্তায় ডুব দিলেন হাডসন।

কতক্ষণ পরে বললেন, ডরোথি আর রেবেকাকে কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, ওদের জন্য দুর্ভাবনা বেড়েই চলেছে।

বললাম. চিন্তার কোনও কারণ আছে বলে মনে হয় না আমার। তাহলে এত খাবার দাবার হয়তো দিত না।

মজার অনুমান তোমার জনসন।

বললাম, আমার যা ধারণা হয়েছে তাই বললাম।

আমাদের ঘরের একদিকে খুব ছোট জানালার মত ফাঁকা একটা ফোকর ছিল। তার ভেতর দিয়ে বাইরের চাঁদের আলো এসে পড়েছিল।

হাডসন সেখানে উঠে গিয়ে কী যেন দেখতে লাগলেন। কতক্ষণ কি যেন সব পরীক্ষা করে ফিরে এলেন।

কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললেন, একটা পাথর সরালেই ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে।

বললাম, ক্ষেপেছেন। আমাদের ঘরের চারদিকে নিশ্চয়ই পাহারা বসেছে। তাছাড়া অপরিচিত পথে গিয়ে কী শেষে বুনো জানোয়ারের মুখে প্রাণটা হারাবেন।

হাডসন বিমর্ষ হয়ে বললেন, তা ছাড়া রেবেকা ডরোথি রয়েছে. ওদের ছেড়ে পালানো সম্ভব নয়।

বললাম, বিপদ যখন এসেছে, তখন শেষ পর্যন্ত তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করা ভাল।

এরপর কোনও কথা হল না। আমরা পাশাপাশি দুজনে বসে রইলাম।

রাত তখন কত ঠিক জানি না, বোধকরি শেষ হয়ে এসেছিল. হঠাৎ দরজা খুলে গেল। আমরা প্রায় চমকে উঠলাম।

একটি লোক আমাদের বাইরে বেরিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল। আমরা ঘরের বাইরে এলাম। আরও কয়েকটি লোক আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের নির্দেশে আমরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললাম। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের আলো। আমরা কয়েক মিনিটের ভেতর একটি খোলামেলা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। চারিদিকে পাহাড় আর বন. মাঝে এই খোলা জায়গাটুকু।

আমরা এসেই দেখলাম, বনের কোল ঘেঁষে অনেকগুলি লোক তীরধনু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা সেই ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে ভেসে এল। কিছুক্ষণের ভেতর অশ্বারোহিণী এক মহিলা আমাদের একটু দূরে এসে দাঁড়াল। সমস্ত শরীর তার ঘোমটায় ঢাকা।

রহস্যময়ী রমণী বলল, মিঃ হাডসন. স্বেচ্ছায় আমাদের এলাকায় এসেছ. সেজন্যে ধন্যবাদ। অনেক চেষ্টা করেও তোমার দেখা পাইনি।

হাডসন বললেন, ধরা যখন পড়েছি, তখন তোমাদের যা খুশি তাই করতে পার।

হাসল মহিলাটি। বলল, আমার দেশের মানুষকে যেভাবে শাস্তি দাও, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সেভাবে শাস্তি দিতে পারি; কিন্তু তাতে কোনও কৃতিত্ব নেই। কাপুরুষ যারা, তারাই শুধু ব্যক্তি বিশেষের ওপর অত্যাচার করে আনন্দ পায়।

একটু থেমে আবার বলল, আর তাছাড়া কোন একটি ইংরাজকে শাস্তি দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তোমাকে হত্যা করলে, তোমার জায়গায় আর একজন আসবে।

তবে আমাকে নিয়ে তোমরা কি করতে চাও?

কিছু নয়, শুধু একটি অনুরোধ করব, আমার দেশের মেয়েদের ওপর, আমার দেশবাসীর ওপর পশুর মত অত্যাচার করো না।

আমরা সরকারের কর্মচারী। সরকারের নির্দেশ আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকি।

মহিলা বলল, আমি ইংরাজ জাতিকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমাদের দেশে যে কাজ করছ, যে কোন শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজ তা সমর্থন করবে না।

হাডসন বললেন, তোমরা সরকারকে স্বীকার করে নিলে কোন অত্যাচারের প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ইংরাজ সরকার তোমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা করে দেবে।

বনের হরিণকে তুমি যতই খেতে দাও হাডসন, ঘরের থেকে সে কেবল বনে পালাবার চেষ্টা করবে।

হাডসন বললেন, সে নিতান্ত বোকা বলে।

মিঃ হাডসন, যার মন বলে কিছু আছে, সে নিশ্চয়ই তোমার কথা মেনে নেবে না।

হাডসন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মহিলাটি বলল, একটু কষ্ট করে অপেক্ষা করতে হবে, এখুনি সঙ্গিনী দুটি ভদ্রমহিলাকে হাজির করছি।

মহিলাটি চলে গেল। কিছুক্ষণের ভেতর একটি লোক এসে আমাকে তার সঙ্গে যেতে ইঙ্গিত করল। হাডসন রইলেন, আমি চললাম।

কিছু পথ গিয়ে একটি ঘর দেখতে পেলাম। ঘরের সামনে পৌঁছে দিয়ে সঙ্গের লোকটি কোথায় চলে গেল।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়েছিলাম, ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শনিচারি।

বললাম, পায়ের ক্ষত নিয়ে এই রাতে এত পথ না এলেই হতো না?

ওরা তো ক্ষেপে গিয়েছিল, হাডসনকে খুন করবে বলে।

আমাকে বাদ দেবার কারণ?

শনিচারি হেসে বলল, তুমি কি মনে কর, ডাক্তার জনসনকে চিনতে আমার দেশের কারও বাকি আছে।

বললাম, কেমন করে তুমি আমাদের বিপদের কথা জানলে শনিচারি?

তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে।

ওর পায়ের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম, রক্তে ওর পোশাক ভিজে গেছে।

বললাম, তুমি হাসপাতালে তাড়াতাড়ি ফিরে না গেলে পা নিয়ে খুবই বিপদে পড়তে হবে।

শনিচারি হেসে বলল, তার চেয়েও ডাক্তার জনসনের সেবার লোভে ফিরে যেতে হবে।

বললাম, কখন যাচ্ছ?

তোমাদের আগে নিশ্চয়। সেখানে ডাক্তার জনসনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একজন লোক অন্তত রইবে।

আবার ফিরে এলাম মিঃ হাডসনের কাছে। এসে দেখি, ইতিমধ্যে রেবেকা আর ডরোথি সেখানে এসে গেছে।

আমাদের ঘোড়াগুলো আনা হল। আমরা ঘোড়ায় চড়ে আবার রওনা হলাম। ওদের কয়েকজন লোক আমাদের হাসপাতাল অবধি এগিয়ে দিয়ে গেল। হাডসন কেবল সেই দুর্গম বন-প্রদেশে তাঁর সাধের বন্দুকখানা রেখে আসতে বাধ্য হলেন। সেদিনের শিকার পর্ব আমাদের এমনি এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে শেষ হল।

১২ ফেব্রুয়ারি ঃ ১৯০২

ডরোথি আর রেবেকাকে আমার হাসপাতালে রেখে দিয়ে হাডসন ফিরে গেলেন কুম্‌ডিতে। যাবার সময় আদিবাসীদের সম্পর্কে আমাকে খুব হুসিয়ার করে দিয়ে গেলেন।

মনে মনে হেসে বললাম, আদিবাসীদের থেকে আপনাকেই বেশি সাবধান হতে হবে মিঃ হাডসন।

ডরোথি, রেবেকা আর আমি বেলাশেষে আজকাল হাসপাতালের বারান্দায় বসে গল্প করি। রেবেকা কিছুতেই আর বাইরে বেড়াতে যেতে রাজি নয়। আবার যদি আদিবাসীদের হাতে আমরা ধরা পড়ে যাই।

আমি বলি, আদিবাসীরা কিন্তু লোক খারাপ নয়। সেদিন ওরা আমাদের মেরে ফেলতে পারত কিন্তু কেমন ভদ্রতা করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেল।

ডরোথি বলল, আচ্ছা ওই মেয়েটিই কি শনিচারি, ওদের দলের নেত্রী?

বললাম, তাইতো শুনেছি।

রেবেকা বললেন, ওকে ঠিক মত দেখতে পেলাম না। সারা শরীর ওর কালো পোশাকে ঢাকা।

ডরোথি বলল, ঐ মেয়েটিকে নিয়েই যত হাঙ্গামা, ওকে ধরতে পারলে সব গোল চুকে যায়।

রেবেকা বললেন, আমার কিন্তু সেদিন মেয়েটির ব্যবহার বড় ভাল লেগেছিল।

কী রকম?

আমরা যে ঘরে ছিলাম, সেখানে এসে ও বলল, একটি অনুরোধ তোমাদের কাছে করব, তোমরা আমারই মত মেয়ে। আমাদের দুঃখ তোমরা যতটা বুঝবে আর কেউ তেমন বুঝবে না। আমাদের মেয়েদের ওপর যে বর্বর অত্যাচার করা হয়, তার বিরুদ্ধে তোমরা একটু প্রতিবাদ কর। নিজের দেশকে ভালবাসা তাদের কোনও অপরাধ নয়।

ডরোথি বলল, ওর খামখেয়ালীর জন্যেই তো তাদের ভুগতে হয়।

রেবেকা বলল, এ তোমার ভুল ধারণা ডরোথি। আমাদের দেশের খুব কম মেয়েই ওর মত সাহস আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে।

ডরোথি কথা না বাড়িয়ে চুপ করে রইল। আমি ইচ্ছে করেই আলোচনার ভেতর নিজেকে জড়ালাম না। শুধু বললাম, লক্ষ করেছেন বোধহয়, ও আমাদের দেশের ভাষাতেই কথা বলে।

ডরোথি এবার আমার পক্ষে এসে গেল।

বলল, শুধু আমাদের ভাষায় নয়, ওর উচ্চারণ কি করে এমন বিশুদ্ধ হল, তাই ভাবি।

রেবেকা বললেন, আমি বুঝতেই পারি না, একজন আদিবাসী মেয়ে ইংরাজী ভাষাটা শিখল কি করে।

বললাম, যাদের নেতা হবার ক্ষমতা থাকে, তাদের কাছে আপনাদের ওটুকু বিস্ময় কিছুই না।

শনিচারির প্রসঙ্গ শেষ করলাম। অনেকগুলি কথার ভেতর জড়িয়ে পড়লে নিজের মনের কথাই বেরিয়ে আসবে। তখন কোন্ ছিদ্র দিয়ে কি অঘটন যে ঘটে যাবে তা বলা যায় না।

ডরোথি আমার খুব কাছাকাছি থাকতে চায়। আমার পরিচর্যার ভার ধীরে ধীরে সে-ই হাতে তুলে নিয়েছে। এসব কাজে কাউকে বাধা দেওয়া যায় না। মাঝে মাঝে ও আমার কাছে এসে দাঁড়ায়, কিছু যেন বলতে চায়, কিন্তু আমার ভেতর বিশেষ কোন ভাবান্তর লক্ষ না করে অন্য কথার অবতারণা করে। আমি ওর মনের ভাব বুঝতে পারি। ডরোথির শিল্পসত্তাকে আমি শ্রদ্ধা করি; কিন্তু মনের যে আশ্রয়টুকুতে একটি মাত্র নারীকে এনে বসান যায়, সেখানে ডরোথির ছায়া পড়ে না। ডরোথি একদিন পিটারের প্রতি আসক্ত ছিল বলে আমি ওকে দূরে সরিয়ে রেখেছি, একথা মনে করলে ভুল হবে। আমি ডরোথিকে ঘৃণা করার কোনও কারণই খুঁজে পাই না। তবে মন ভালবাসার ক্ষেত্রে তার নিজের একটা পথ ধরে চলে; সেখানে বাইরের যুক্তি, বিবেচনার কোন ধারই সে ধারে না।

একদিন ডরোথি বলল, আজ বাইরে একটু বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে। আপনার আপত্তি না থাকলে আমার সঙ্গে যাবেন কি?

বললাম, আপনার দিদি হাসপাতালের বাইরে যেতে কি রাজী হয়েছেন?

না।

তাহলে দু'জনেই যাওয়া যাক্।

ডরোথি বলল, আমাদের কোয়ার্টারের ঐ পেছনের পাহাড়টাতে একটু ঘুরে আসি চলুন। ওখান থেকে চারদিকটা খুব সুন্দর দেখায়।

বললাম, সে তো খুব ভাল প্রস্তাব। দূরে কষ্ট করে যেতে হবে না, অথচ কাছে থেকে দূরের আশ্চর্য জগতটাকে নিকটে পাওয়া যাবে।

ডরোথি একটা মন্তব্য করে বসল।

আপনি আসলে কিন্তু কবি। ডাক্তার হয়েছেন, কেবল একটা বৃত্তিকে গ্রহণ করতে হয় বলে।

হেসে বললাম, এ কিন্তু আমার বৃত্তির ওপর কটাক্ষ করা হচ্ছে। সরকার আপনার মুখের এই বাক্যগুলি শুনলে আমাকে এই হাসপাতালে রেখে বেশি দিন কবিত্ব করার সুযোগ দেবে না।

ডরোথি আমার কৌতুকের ওপর কিছুটা গুরুত্ব দিয়ে বলল, আমি কিন্তু আপনার বৃত্তির ওপর কোন মন্তব্য করছি না। বরং আপনার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করার চেষ্টা করছি।

খুশি হলাম আপনার কথায়। নিজে শিল্পী বলে প্রতিটি মানুষকে আপনি সেই দৃষ্টিতে দেখেন। এখন চলুন আমরা পাহাড়ের ওপর উঠি।

ডরোথি বলল, আপনার পোশাক আমি শোবার ঘরে রেখে এসেছি।

কেন, যে পোশাকটা পরে আছি সেটা পরে গেলে হয় না?

আমার অনুরোধ; ডরোথি চোখেমুখে অনুনয়ের ভাব ফুটিয়ে বলল।

পোশাক ছাড়তে ঘরে গেলাম। আমার বিশেষ সখের একটি পোশাক ছিল, ডরোথি আজ তাই বের করে দিয়েছে। কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হলে সে পোশাক আমি ব্যবহার করি।

প্রথম যখন সাসাংদাতে চার্চের উদ্বোধনে যাই তখন এ পোশাকখানা পরেছিলাম। আজ হঠাৎ আবার এখানা পরতে হল।

বেরিয়ে এসে দেখি ডরোথি ইতিমধ্যে তার পোশাক পরিবর্তন করে ফেলেছে।

আমরা হাসপাতালের পেছনের পাহাড়টাতে উঠলাম। ডরোথি আমাকে ইসারায় ঝর্ণাটার কাছে যেতে বলল, ঝর্ণার ধারে কয়েকটা শালগাছ। শালগাছের পাশেই একশিলা একটা পাথর পড়ে আছে। আমরা ঐ পাথরটার ওপরে গিয়ে বসলাম।

ডরোথি আঙুল দেখিয়ে বলল, দেখুন ডাক্তার জনসন, সামনের ঐ ভ্যালি আর দূরের পাহাড়গুলো কি চমৎকার দেখাচ্ছে।

বললাম, ঐ অঞ্চলটাই ছোটনাগরা।

ডরোথি একটু ভেবে নিয়ে বলল, ওখানে আমাদের সঙ্গে আদিবাসীদের একটা লড়াই হয়েছিল না?

আপনার মনে আছে দেখছি।

সে যুদ্ধে আমাদেরই জয় হয়েছিল।

বললাম, যুদ্ধ ছাড়াও ঐ জায়গাটা আর একটি বিশেষ কারণে বিখ্যাত।

ডরোথি আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

বললাম, ঐ ছোটনাগরাই ছিল আদিবাসীদের নেত্রী শনিচারির রাজধানী। আর ওখানকার দুর্গে থেকেই শনিচারি ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

ডরোথি কিছুক্ষণ কি ভেবে বলল, আমার কিন্তু শনিচারিকে একেবারে আদিবাসী মেয়ে বলে মনে হয় না।

আপনার অনুমান মিথ্যে না হলেও একেবারে সত্য নয়। শনিচারি আদিবাসী এক রাজার মেয়ে। সেই আদিবাসী লোকটি ঘটনাচক্রে ইয়োরোপে গিয়ে শিক্ষিত হয়ে এসেছিল। আর শনিচারির মা ছিল রাজপুতানী।

ডরোথি বলল, ভারী মজার ইতিহাস। এ আপনি সংগ্রহ করলেন কি করে?

লোকমুখে শুনেছি।

ডরোথি বলল, রাজপুতদের ইতিহাস আমি বম্বে থেকে পড়েছিলাম। অত্যন্ত চমকপ্রদ। রাজপুত মেয়েরা অসি নিয়ে যুদ্ধ করে। তাছাড়া নিজেদের সম্মান রাখার জন্যে আগুনে পুড়ে মরতেও নাকি ভয় পায় না।

বললাম, সেই রাজপুত রক্ত ঐ শনিচারি মেয়েটির মধ্যে রয়েছে, তাই ওর এতখানি সাহস।

ডরোথি হঠাৎ বলে বসল, আর শনিচারির প্রসঙ্গ ভাল লাগছে না ডাক্তার জনসন, এখন আপনি আপনার নিজের গল্প করুন।

হেসে বললাম, আমার গল্প!

হ্যাঁ, আপনার জীবনের কথা। আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু বলুন। আপনি নিশ্চয়ই এই বুনো জায়গায় খুব বেশি দিন কাটাবেন না।

জায়গাটা আপনার ভাল লাগছে না বুঝি?

আপনিই বলুন, বেশি দিন এই বন কার ভাল লাগে। প্রথম প্রথম ছবি আঁকার মোহে পড়েছিলাম, এখন আর একটুও ভাল লাগছে না।

বললাম, আমার বেলা ঠিক উলটো। প্রথমে আমার এখানে এসে একটুও মন বসেনি, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই আমি এ বনের মোহে পড়ে যাচ্ছি।

আপনি কি দেশে একেবারেই ফিরবেন না?

একেবারে ফিরব না এ কথা কেমন করে বলি। তবে এই বন আমাকে কি যেন এক মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে।

কিছুসময় চুপচাপ মুখ নিচু করে বসে রইল ডরোথি। তারপর হঠাৎ বলল, আপনি যতদিন না দেশে ফেরেন ততদিন আর একটি মেয়েরও দেশে ফেরা হচ্ছে না জানবেন।

সে কি, কে সে মেয়ে! আমার জন্যে তার দেশে ফেরা বন্ধ থাকবে কেন?

হ্যাঁ, তার জায়গাটা ভাল না লাগলেও সে থাকবে এখানে।

ভাল না লাগলে সে থাকবেই বা কেন?

এই বন ছাড়াও তার এমন কেউ আছে, যার জন্যে তাকে এখানে থেকে যেতে হবে।

সে মানুষকে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান বলতে হবে, একটি মেয়ে যার জন্যে নিজের দেশের মায়া কাটিয়েও এইখানে থেকে যেতে চায়।

সে মেয়েটির ওপর আপনার কি একটুও মায়া হয় না? ডরোথি জিজ্ঞাসু চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, সে মেয়েকে আমি শ্রদ্ধা করি জানবেন।

হঠাৎ একটি শব্দে চমকে উঠলাম। আমাদের একেবারে পাশেই যে শালের গাছটা দাঁড়িয়েছিল, তার গায়ে এসে বিঁধে গেছে একটা তীর। আশ্চর্য, সেই তীরের সঙ্গে বাঁধা একটি সুতো থেকে দুলছে একগুচ্ছ মরশুমী ফুল।

ডরোথি ভয়ে, কৌতূহলে আমার হাতখানা জড়িয়ে ধরে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

আমি পেছন ফিরে তাকালাম। ডিসপেনসিং রুমের জানালায় বিদ্যুতের মত এক ঝলক হাসির রেখা দেখা দিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। ডরোথি আমাব দৃষ্টিকে অনুসরণ করে তাকাবার আগেই জানালাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

হাসপাতাল থেকেই আমি খাবার নিয়ে যাই শনিচারির ঘরে। রাতে যখন হাসপাতালের কাজ শেষ করে খাবার নিয়ে ওর ঘরে ঢুকলাম, দেখি, শনিচারি জানালার কাছে বসে গরাদ ধরে সামনের ভ্যালির দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি ভিতরে ঢুকলাম, কিন্তু ও আজ আর ফিরে তাকালো না। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল।

খাবারটা টেবিলে রেখে দিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম।

সারা ভ্যালি বিচিত্র রহস্যময় হয়ে উঠেছে। শীতের শেষ, তবু একেবারে শীত চলে যায়নি।

চাঁদের আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল, কিন্তু কুয়াশার একটা পাতলা চাদর ভ্যালির ওপর কে যেন পেতে রেখেছে।

সেদিকে তাকিয়ে বসেছিল শনিচারি।

বললাম, কি ভাবছ?

আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ও বলল, দেখ ডাক্তার, কি আশ্চর্য সুন্দর আমার এই দেশ।

তাইতো তোমার দেশকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না শনিচারি।

ও আমার দিকে তাকাল; তোমার অশেষ অনুগ্রহ ডাক্তার। আমার দেশের মানুষের হয়ে তোমার নতুন জীবনের উদ্দেশ্যে শুভ-কামনা জানাচ্ছি।

একটু থেমে ম্লান একটা হাসি হেসে বলল, কবে দেশে ফিরছ?

হঠাৎ দেশে ফেরার কথা কেন শনিচারি; আমি কি তোমাদের দেশের মানুষের সেবা যত্ন ঠিক মত করতে পারছি না?

এ কথা বলে আমাদের দেশের মানুষকে অপরাধী করো না ডাক্তার। আমি শুধু বলছিলাম, মিলিত জীবন সাধারণত মানুষ নিজের দেশেই কাটায়। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, কবে দেশে ফিরছ।

আমি তো মিলিত জীবন অনেকদিনই যাপন করছি শনিচারি।

অবাক দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

বললাম, তোমার দেশের মানুষের সঙ্গে আমার জীবন অনেক আগেই মিলিত হয়েছে। ফুলের উপহার আরও আগে আমার পাওনা ছিল শনিচারি।

ও কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমার দুটো হাত ওর হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বলল, ক্ষমা কর ডাক্তার, আমি তোমাকে চিনেছি বলে মনে মনে একটা গর্ব ছিল, কিন্তু সে গর্ব আমার আজ ভেঙে গেছে। তুমি আমার চেনার সীমানাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছ।

আমাকে এত বড় করে দেখবার চেষ্টা করে লজ্জা দিও না। তোমাদের দেশের মানুষের কাছে থাকতে পেরে, তাদের ভালবাসা পেয়ে আমি মনে মনে গর্ববোধ করি শনিচারি। আমি তোমাদেরই একজন, এটুকু অন্তত আমাকে সহজ করে ভাবতে দাও।

শনিচারি মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আমার হাতখানা সে আরও নিবিড় করে ধরে রইল তার হাতের মধ্যে।

১৪ মার্চ ঃ

আজও নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারছি না। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই মুখখানা। ডান দিকটা আগুনে পুড়ে ঝলসে গেছে। চৌদ্দ পনের বছরের কিশোর।

যেদিন প্রথম আগুনে পুড়ে এল আমার হাসপাতালে, সেদিন তার ভেতর যে সহ্য শক্তি দেখেছিলাম, তা আমার ডাক্তারী জীবনে নতুন এক অভিজ্ঞতা হয়ে আছে।

সেই মা বাপ হারা কিশোরটি ভাল হয়ে উঠল একদিন। হাসপাতাল থেকে যেদিন ডিসচার্জ করলাম, সেদিন ও এসে আমার কোয়ার্টারের আশেপাশে কেবল ঘুরতে লাগল।

ডেকে বললাম, বামিয়া তুই ভাল হয়ে গেছিস, এখন আর হাসপাতালে থাকতে হবে না, ঘরে ফিরে যা।

কোন কথা না বলে ও আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। ভোরে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, কে যেন হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি বামিয়া।

সারারাত ছেলেটা কিছু না খেয়ে এখানে পড়ে আছে। কেমন কষ্ট হল। ওকে উঠিয়ে রুটি আর দুধ খাওয়ালাম।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে চুপচাপ মুখ নিচু করে ও বসে রইল দাওয়ার এক কোণে।

কাছে ডেকে বললাম, কে আছে রে তোর বাড়িতে ?

ও মুখখানা আরও নিচু করে বসে রইল।

বললাম, বাবা নেই?

ও মাথা নেড়ে জানাল, নেই।

মা?

তাও না। মা বাপ, ভাই বোন কেউ নেই তার। কলেরা মহামারীতে সব উজাড় হয়ে গেছে।

বললাম, কি করতিস তাহলে তুই তোর গাঁয়ে?

বামিয়া এবার মুখ খুলল, গাঁয়ের মাতব্বরের ক্ষেতে কাজ করতাম। দিনে একবেলা করে খেতে দিত। রাতে শুয়ে থাকতাম 'জায়েরা'র আস্তানায়।

বললাম, এখন গাঁয়ে ফিরে যা।

ও চুপচাপ বসে রইল।

মনে হল, হাসপাতালে ক'দিন খেতে পেয়ে ছেলেমানুষ আর কষ্টের ভেতর ফিরে যেতে চাইছে না।

বললাম, যখন খুব ক্ষিদে পাবে তখন না হয় চলে আসিস এখানে।

ও হঠাৎ উঠে এসে আমার দুটো পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলে।

পা ছেড়ে দে, কাঁদছিস কেন?

বামিয়া তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিও না সাহেব। খেতে না দাও, তবু হাসপাতাল ছেড়ে যেতে বলো না। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

সেই থেকে বামিয়া রয়ে গেল আমার কাছে। ও আমার পোশাক-আশাক পরিষ্কার করত : আর হাসপাতালে খাবার দিয়ে আসত। যে কোন কাজ আমার বলবার আগেই ও করে রাখবার চেষ্টা করত। কথা বলত না বেশি। নীরবে কাজ করে যেত।

শনিচারি আসার পর ঘটনাচক্রে ও সরে গেল আমার কাজের ভেতর থেকে। আমি ওকে আর বাধা দিলাম না। দেশের কাজে বামিয়াকে দীক্ষা দিল শনিচারি। ঘরে বসেই ওকে করে তুলল দক্ষ তীরন্দাজ।

শনিচারিকে কি ভালই না বাসত ও। শনিচারির মনের কোণের একটি পাথর কি করে ও সরিয়ে ফেলেছিল। তার থেকে অজস্র ধারায় ঝরে পড়ত স্নেহ। সেই স্নেহের ধারায় স্নান করত বামিয়া।

কতদিন আড়াল থেকে আমি দেখেছি, বামিয়ার মাথায় চিরুণী দিয়ে দিচ্ছে শনিচারি। একসঙ্গে একই থালায় দু'জনে গল্প করতে করতে খাবার খাচ্ছে। বামিয়া ঘুমিয়ে থাকলে মায়ের চোখ মেলে কতক্ষণ তাকিয়ে ওকে দেখছে শনিচারি।

তাহলে কেন এমন হল। কত যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু মন কিছুতেই

শান্ত হচ্ছে না। কোথায় যেন একটা অস্থিরতার উৎস-মুখ খুলে গেছে। প্রবল গতি তার। শত চেষ্টাতেও যুক্তির পাথর চাপিয়ে তার প্রবাহ-পথ বন্ধ করা যাচ্ছে না। ইদানিং ও আমার হাসপাতালে বড় একটা আসত না। কোনদিন রাতে শনিচারিকে খাবার দিতে গিয়ে হঠাৎ দেখতাম, বামিয়া তার কাছে বসে আছে। উত্তেজনার ছবি আঁকা হয়ে থাকত ওর চোখেমুখে। আমাকে দেখে ও মাথা নিচু করত। তেমনি সংকোচ, প্রথম যেদিনটি ও হাসপাতালে বহাল হল, সেদিন যেমন সংকোচ দেখেছিলাম।

হেসে বলতাম, কি বামিয়া, হাসপাতাল ছেড়ে আজকাল কেমন আছ?

মাথা নেড়ে জানাতো, সে ভাল আছে।

বলতাম, তুমি না আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না বলেছিলে?

আমার কথা শুনে ও অপ্রস্তুত হয়ে যেত।

শনিচারি হেসে বলত, ও এখন দেশের কাজ করছে ডাক্তার। দেশ ওর কাছে এখন সব চেয়ে বড়।

বামিয়াকে উৎসাহ দিয়ে বলতাম, দেশের কাজে ডুব দিয়েছ, খুব খুশি হয়েছি বামিয়া।

ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

শনিচারি বলত, জান ডাক্তার, বামিয়ার মত আর দু'একটা ছেলে পেলে আমি তোমাদের হাত থেকে আমার দেশটাকে ছিনিয়ে নিতে পারতাম।

উত্তর দিতাম, তোমার বামিয়া যথার্থ কাজের ছেলে।

শনিচারি ওকে প্রথমে পাঠাল ছোটনাগরায়। উদ্দেশ্য, শনিচারির মায়ের সঞ্চিত প্রচুর সোনা বামিয়ার সাহায্যে উদ্ধার করা। সেই সোনা দিয়ে কেনা হবে বন্দুক, রাইফেল, লড়াই চলবে সমানে সমানে।

নিঃশব্দে কাজ চলল কিছুদিন। কোন কোন রাতে দেখতাম, বামিয়া এসেছে। হয়ত সঙ্গে এনেছে একতাল সোনা।

শনিচারি সোনার তালটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলত, এটা কি বলতো?

কেন, সোনার তাল।

শনিচারি অমনি মাথা নেড়ে বলত, হল না ডাক্তার, ওটা হল, পাঁচখানা বোমা আর তিনখানা রাইফেল।

হেসে বলতাম, আজ থেকে নতুন চোখ দিয়েই দেখব।

আচ্ছা ডাক্তার বলতো, ওটা কার সম্পত্তি?

এবার ভেবে চিন্তেই জবাব দিতাম, তোমার মায়ের।

না ডাক্তার, তোমার মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই। ওটা হল সারান্দা বনের প্রতিটি অধিবাসীর সম্পত্তি। আমার দেশের মানুষ এ সবের অধিকারী।

বলতাম, হার মানছি। তোমার মনের নাগাল পেতে গেলে আমাকে আরও কিছুদিন সাধনা করতে হবে।

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠত শনিচারি।

বামিয়া মাথা নিচু করে বসে থাকত চুপচাপ।

কিছুদিন থেকে লক্ষ করছিলাম, ওদের কর্মব্যস্ততা বেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে শনিচারিকে বাইরে যেতে হত। অবশ্য আমার দৃষ্টি এড়িয়ে ও বেশি দূর যেতে সাহস করত না। রাতে হাসপাতালের পেছনের পাহাড়ে অনেকগুলি লোকের আসা যাওয়ার সাড়া পেতাম। বারান্দায় বসে বসে শুনতাম ঘোড়ার খুরের শব্দ।

অনেক রাতে চুপি চুপি ডিসপেনসিং রুমের কাছে গিয়ে দেখতাম, শনিচারি তখনও বসে বসে কি যেন করছে।

দরজায় টোকা দিতাম। আমার হাতের শব্দ ওর চেনা ছিল। দরজা খুলে যেত।

ঘরে ঢুকে কোনও দিন দেখতাম, একরাশ নোট নিয়ে হিসেবপত্র করছে। আবার কোনও দিন নিজের হাতে ম্যাপ তৈরি করছে।

বলতাম, তোমার গোপন আড্ডার খবরটা এবার সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে।

হেসে ও বলত, আমার আড্ডা উঠে যাবে ঠিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে হাসপাতালও ছাড়তে হবে।

আচ্ছা শনিচারি, তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে, তোমরা আমাকে শাস্তি দেবে?

শনিচারি কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলত, শাস্তি তুমি নিজের মনের থেকেই পাবে। অন্য কারও কাছ থেকে শাস্তি পাবার দরকারই হবে না তোমার।

বলতাম, যত অপরাধই আমি করি, তুমি কিন্তু আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না।

শনিচারি গম্ভীর হয়ে বলত, হয় তুমি এখান থেকে যাও, নয় চুপচাপ বসে থেকে আমাকে কাজ করতে দাও। এ দুটোর বাইরে গেলেই আমি তোমাকে ঠিক শাস্তি দেব।

কি শাস্তি দেবে তুমি আমাকে?

এখুনি ঘোড়ায় চড়ে সারা বন বেড়িয়ে আসব। দেখ, ঠিক ঘুরে আসব আমি। তোমার কোন কথাই শুনব না।

এই আমি যাচ্ছি, তুমি তোমার কাজ কর। আর বেশি রাত্তির জেগে থেকোনা কিন্তু।

আমি উঠে পড়লেই ও হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বলত, কাজ কতদূর এগিয়েছে শুনবে না?

তোমার গোপন ব্যাপার যদি ফাঁস হয়ে যায়।

আবার সেই কথা! তুমি চুপচাপ বসে শোন, আমি বলে যাচ্ছি। তোমার মনে কোন রকম প্রতিবাদের ইচ্ছে জাগলেই কিন্তু বলে ফেল। তাতে আমার কাজের সুবিধে হবে।

বেশ বল।

শনিচারি বলত ছোটনাগরা থেকে সে কেমন করে বামিয়াকে দিয়ে সোনা সরাচ্ছে। তার পূর্বপুরুষদের আদিং বা আত্মা যে বেদির তলায়, সেখানেই রয়েছে তাল তাল সোনা। ছোটনাগরায় পুলিশদের কাছে ঘরদোর পরিষ্কারের কাজ নিয়ে ঢুকেছে বামিয়া। এই সুযোগে সে সরিয়ে আনছে সোনা।

এখন সেই সোনা বেচে সংগ্রহ করা হচ্ছে নোট আর টাকা। তারপর শুরু হবে অস্ত্র সংগ্রহ। এ কাজ অত্যন্ত জটিল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে কোন কাজই অসমাপ্ত থাকে না।

শনিচারি তার পরিকল্পনার কথা বলে যেত. আমি চুপচাপ বসে বসে শুনতাম। লক্ষ করতাম, কত সূক্ষ্ম আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে এই অরণ্য-কন্যা।

সেদিন হাসপাতাল থেকে এসে বসেছিলাম বারান্দায়। আমার পাশে বসেছিল ডরোথি আর রেবেকা। রোজকার মত গল্প হচ্ছিল সেদিনও।

হাডসনের কাছ থেকে ডাক এসেছে। ওরা দু'এক দিনের ভেতরেই হাসপাতাল থেকে চলে যাবে।

ডরোথি একটু বিষণ্ণ। ও আমার কাছ থেকে ওর প্রশ্নের সকৌতুক উত্তরই শুধু পেয়ে গেল, আমার মনের কথা জানতে পারল না। ওর মনের গুরুভার আমি বুঝি। কিন্তু সেই ভার সরিয়ে দেবার মানুষ আমি নই। এ সত্যটুকু আকারে প্রকারে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার অক্ষমতা, আমি ওকে তা কোনওরকমেই বোঝাতে পারিনি।

রেবেকা বললেন, এবার অনেকদিন একসঙ্গে আমরা কাটালাম, এ কথা বহুদিন মনে থাকবে।

বললাম, আপনাদের যাবার পরই কিন্তু দুঃখ শুরু হবে আমার।

রেবেকা বললেন, আপনার কিসের দুঃখ, ডাঃ জনসন?

একা একা ছিলাম একরকম। এখন আপনাদের সেবা পেয়ে বড় বেশি আয়েসী হয়ে পড়েছি। আবার তো সব নিজেকেই ঠিকঠাক করে নিতে হবে।

একটা করুণ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল ডরোথি।

মনে মনে ভাবলাম, কথাটা বলে ঠিক করিনি। অন্য একজনের মনের ক্ষতটাকেই খুঁচিয়ে তুললাম শুধু।

বেলা শেষ হয়ে আসছিল। বসন্তকালের এই সময়টুকু এ অঞ্চলে বড় তৃপ্তিদায়ক। ধীরে ধীরে বাতাস বইছিল। শাল ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল পাশের বন থেকে। আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে বেলা শেষের প্রকৃতির এই দানটুকু প্রাণ ভরে উপভোগ করছিলাম।

হঠাৎ একটা আওয়াজ ভেসে এল কানে। গুলির আওয়াজ। পর পর কয়েকটা শব্দ হল। আমরা বারান্দা থেকে পথের ওপর নেমে এলাম। ওদিকের পাহাড়ি রাস্তা ধরে একটি ছেলে প্রাণপণ হাসপাতালের দিকে দৌড়ে আসছে। তার পেছনে তাড়া করে আসছে একটি অশ্বারোহী পুলিশ। সে বার বার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে ছেলেটিকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। তার হাতে ঘুরে চলেছে একটা ফাঁস। ওটা ছুঁড়ে আটকাতে চাইছে পলাতককে।

ছেলেটার কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে একবার পাহাড়ে উঠছে, আর একবার পথে নেমে এঁকে বেঁকে দৌড়চ্ছে। কিছু দূরের থেকে চিনতে পারলাম। বামিয়া দৌড়ে আসছে হাসপাতালের দিকে!

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডরোথি আর রেবেকা। আমি চিৎকার করে বামিয়াকে থামতে বললাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। বামিয়া পথের ওপর বসে পড়ে আবার উঠে দাঁড়াল। বোধহয় পায়ে লেগেছে গুলি। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কিছুটা এগিয়ে এল। পাশের উপত্যকার অশ্বারোহী ততক্ষণে প্রায় তার কাছাকাছি এসে গেছে। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, বামিয়া পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেল।

কি হল বামিয়ার! গুলির আওয়াজ নেই। ও হঠাৎ পেছন দিকে ছিট্‌কে পড়ল কেন!

অশ্বারোহী পুলিশ এরপর কি ভেবে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াল। তারপর সে বামিয়াকে তুলে নিয়ে আমার হাসপাতালের দিকেই এগোতে লাগল।

এতখানি দূর থেকে কি হল আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। অস্থির উন্মাদনায় তাদের আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

বামিয়াকে ওরা হাসপাতালে এনে তুলল। কি আশ্চর্য, আমি স্তম্ভিত হয়ে বামিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম! একটি তীর ওর বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে।

তখনও বুকে সামান্য স্পন্দন ছিল। একটু বাতাসের জন্য ও প্রাণপণ জোরে শ্বাস টানছিল।

দৌড়ে গেলাম ডিসপেনসিং রুমে। চাবি খুলে ঢুকতেই যে দৃশ্য দেখলাম, তার জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।

মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদছে শনিচারি। পাশে পড়ে আছে তার ধনুক। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ও উঠে দাঁড়াল। এমন উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি আমি আর কখনো দেখিনি।

একটা ওষুধ নিতে যাচ্ছিলাম, শনিচারি আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

বামিয়াকে একটু শান্তিতে মরতে দাও, ডাক্তার। ওকে ওষুধ দিয়ে বাঁচালে ওরা তিলে তিলে মেরে ফেলবে।

কঠিন সুরে বললাম, আমি ডাক্তার শনিচারি। রোগীর সেবা আমার একমাত্র কাজ। পথ ছাড়, এক মুহূর্ত নষ্ট করার সময় আমার নেই।

ওষুধ নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম। শনিচারি কঠিন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

চেষ্টা করলাম। আমার সমস্ত শিক্ষা প্রয়োগ করলাম বামিয়াকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু না, শনিচারির ইচ্ছাই পূর্ণ হল। বুক থেকে তীরটা বের করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বামিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। সে শ্বাসটুকু সে আর ফিরিয়ে আনতে পারল না।

সরকারী পুলিশ নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। সে অনেক আশা করেছিল বামিয়াকে জীবিত অবস্থায় ধরে নিয়ে যাবে। তার কাছ থেকে আদায় করবে প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ।

কিন্তু কিছুই হল না। বামিয়া জীবন দিয়ে গুপ্তধনের খবরটুকু গোপন রেখে গল।

তখন গভীর রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ। কেউ কোথাও জেগে নেই। বারান্দায় পায়চারী করতে করতে ডিসপেনসিং রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। মনে হল, এখুনি হয়ত শনিচারির ঘরে শুরু হবে গোপন পরামর্শ।

কোথাও কোন সাড়া নেই। দরজায় ধাক্কা দিলাম। ভেজান ছিল, নিঃশব্দে খুলে গেল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, শনিচারি অন্ধকার এক কোমে মেঝের ওপর পড়ে আছে। খোলা জানলার ফাঁকে যেটুকু আলো এসে পড়েছিল, তাতে দেখলাম তার রাশিকৃত খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে। সেই চুলের রাশে ডুবে গেছে তার সমস্ত মুখখানা।

মেঝেতে নতজানু হয়ে বসে শনিচারির মাথায় হাত রাখলাম। ও ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর কেমন অর্থহীন চোখ মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বামিয়া শান্তিতেই চলে গেছে শনিচারি। তোমার তীর লক্ষভ্রষ্ট হয়নি।

আমার দিকে তাকিয়ে ও অদ্ভুত হাসি হাসল। পরক্ষণেই আবার কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

বললাম, তোমার ইচ্ছার কাছে আমাকে হার মানতে হল, শনিচারি।

ওকে কিছুতেই বাঁচাতে পারলে না, ডাক্তার?

বললাম, তুমি তো ওকে বাঁচাতে চাওনি।

ওকে মেরে সারা দেশকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম; কিন্তু এখন ভাবছি, ওকে ছাড়া সারা দেশটাই মরে গেল।

শনিচারিকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার ছিল না। কতক্ষণ শুধু বসে রইলাম নীরবে। ও তাকিয়ে রইল জানালার ফাঁকে উপত্যকার দিকে। দূরের পাহাড় আলো অন্ধকারে রহস্যময়। কি ভাবছে শনিচারি, কে জানে। ঐ তো সেই পাহাড়টা, যার কোলের পথ বেয়ে কয়েক ঘণ্টা আগে বামিয়া প্রাণপণে দৌড়ে আসছিল। এই সেই জানালা, যার ভেতর দিয়ে ধনুক থেকে তীরখানা ছুটে গিয়েছিল; শনিচারির অব্যর্থলক্ষ্য তীর।

হাসপাতালে এখনও শুয়ে আছে বামিয়া। ভোরের অলোর স্পর্শ পেলে সে হয়তো জেগে উঠবে। জেগে উঠেই লজ্জিত হবে। সংকোচে সে ঢুকবে গিয়ে খাবার ঘরে। কত আয়োজন করতে হবে, অথচ ঘুম ভেঙে উঠতে কত দেরী হয়ে গেল তার।

না, সে আর কোনওদিনও জাগবে না। আমার মিথ্যা কল্পনার পথ বেয়ে সে আর ফিরে আসবে না থলকোবাদের হাসপাতালে।

স্বপ্ন ভাঙল শনিচারির কথায়।

কেন এমন হল ডাক্তার।

নীরবে বসে রইলাম। শনিচারি বলে চলল, আমি তো ওকে মারতে চাইনি। ওকে আমার এই বুকের ভেতর আগলে রাখতে চেয়েছিলাম। আমি চাইনি, কেউ ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তিলে তিলে হত্যা করুক।

বললাম, তাই হয়েছে শনিচারি। আর কেউ তোমার কাছ থেকে বামিয়াকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

শনিচারি কিছু ক্ষণ থামল। তারপর একসময়ে বলল, কেন তুমি ওকে বাঁচাতে পারলে না, ডাক্তার। তোমার ওপর কি বিশ্বাস, কি ভারসাই না আমি রেখেছিলাম।

সাধ্যমত তোমার বিশ্বাসের যোগ্য হবার চেষ্টা করেছি শনিচারি, কিন্তু পারলাম না। যুদ্ধ করেছি, শেষে হার হয়েছে আমার।

আরও কতক্ষণ এমনি কেটে গেল। কত অসংলগ্ন চিন্তার ঢেউ বয়ে গেল দু'জনের ওপর দিয়ে।

একসময় শনিচারি আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে অজস্র যন্ত্রণা দিয়ে গেলাম, ডাক্তার। শুধু বিশ্বাস কর, প্রাণের থেকে তোমাকে কোনওদিন দুঃখ দিতে চাইনি।

তোমার ভেতর এই আশ্চর্য দেশের মূর্তি আমি দেখেছি, শনিচারি। তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমাকে এখানে আশ্রয় দিয়েছি। বামিয়া মরেছে, সে আঘাত আমার বুকের ভেতর ক্ষত সৃষ্টি করে গেছে। কিন্তু তুমি না থাকলে আমি সে যন্ত্রণার ভার বইতে পারতাম না। তোমার দিকে তাকিয়ে আমি আমার চরম দুঃখের সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি, শনিচারি।

ও আমার মুখের দিকে অবাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

আমি যে নিজের ভাইকে হত্যা করেছি, ডাক্তার।

এ হত্যা পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসে গৌরবের, শনিচারি।

ও অশান্তভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

আমি অসাধারণ হতে চাই না ডাক্তার। আমি গৌরব চাই না, চাই না এ বন্য মানুষের নেতৃত্ব। আমাকে শুধু সাধারণ একটি মেয়ে হয়ে বাঁচতে দাও। মা যেমন করে তার সন্তান মারা গেলে আকুল হয়ে কাঁদে, আমার বামিয়ার জন্য আমাকে তেমনি করে কাঁদতে দাও।

ঝর ঝর করে শনিচারির চোখ বেয়ে জলের ধারা বইল। ওকে একা কাঁদতে দিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

দূরের পাহাড়ে ভোরের অস্পষ্ট আলোর আভাস, পেছনের পাহাড়ে তখনও জমাট অন্ধকার। একটা বাতাস বয়ে এল। সামনের শালবনের পাতাগুলো কেঁপে উঠল থর থর করে।

তারপর দমকা হাওয়ায় তলাকার শুকনো পাতাগুলো করুণ একটা মর্মর ধ্বনি তুলে উপত্যকার দিকে উড়ে চলে গেল।

২ এপ্রিল

ডরোথি আর রেবেকা চলে গেছে। হাডসন এসে ওদের নিয়ে গেলেন। হাসপাতালে এসে খুব দুঃখ করলেন হাডসন।

বললেন, কয়েকটা ঘণ্টা যদি ছেলেটা জ্ঞান ফিরে পেত, তাহলে কত গোপন খবরই না বের করে নেওয়া যেত ওর মুখ থেকে।

বললাম, যেত বলা যায় না, মিঃ হাডসন। প্রথমবারের লড়াইতে কত চেষ্টাই তো করলেন, কিন্তু পারলেন এক কণা খবর বের করতে। প্রাণে মরল, তবু মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোল না।

হাডসন কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, ওদের এবার চূড়ান্ত শায়েস্তা করতে হবে। গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে দেওয়াই হবে আমাদের প্রথম কাজ। যারা সরকারের কথা মেনে চলবে, রোজ হাজিরা দিয়ে যাবে, তাদের জন্যে গড়ে তুলব নতুন আস্তানা। দেখি, বুনো জানোয়ারগুলোকে শায়েস্তা করতে পারা যায় কিনা।

হেসে বললাম, চেষ্টা করলে একটা কিছু ফল হয়তো পাওয়া যাবে।

হাডসন সক্ষোভে বললেন, ফল আগেই পাওয়া যেত। কেবল ঐ মেয়েটার জন্যে বার বার লড়াই লাগছে। তুমি দেখো, ওকে একবার ধরতে পারলে আর কোন হাঙ্গামাই থাকবে না।

বললাম, একটি জ্বলন্ত বাতি থেকে প্রথমে আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু পরে আর ঐ বাতিটার প্রয়োজন হয় না। আমার মনে হয় অরণ্যে যে আগুন জ্বলছে, এখন হয়তো আর শনিচারির দরকার হবে না।

তুমি জান না, জনসন, এই বনের মানুষগুলো একেবারে অশিক্ষিত। ঐ মেয়েটাই পেছনে থেকে সবকিছু চালাচ্ছে। শুনেছি ওর নাকি যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষা আছে। ওর বাবা আমাদেরই দেশ থেকে শিক্ষিত হয়ে ফিরে এসেছিল।

হেসে বললাম, এতো আমাদের আনন্দের কথা, মিঃ হাডসন। শনিচারি তাহলে আমাদের শিক্ষার ভেতর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

হাডসন এবার দেশের ওপর শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন, সে কথা ঠিক, ডাক্তার জনসন; ঐ মেয়েটির কৃতিত্ব দেখে মাঝে মাঝে আমার শ্রদ্ধা হয়। অবশ্য ওর সবটুকু কৃতিত্বই আমাদের দেশ থেকে পাওয়া।

প্রশংসার শেষে হাডসন নিজের দেশটিকে জুড়ে দিয়ে খুশি হলেন মনে মনে।

হাডসন ওদের নিয়ে যাবার পর আমার হাসপাতালের কাজেই সারাদিন নিজেকে ডুবিয়ে রাখলাম। আমার আগের জীবন আবার ফিরে এল। নিজের হাতে পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার

করতে লেগে গেলাম। বাবুর্চির কাজ কখনো কখনো আমি নিজেই করতাম। এমনি করে কাজের ভেতর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে ফেলে মনের দিক থেকে অনেকখানি হালকা হয়ে গেলাম। কেবল যখন শনিচারির ঘরে ঢুকতাম, তখন একটা ভারী আবহাওয়া আমার চারদিকে এসে ভীড় করত। বামিয়া মারা যাবার পর শনিচারি তার অসমাপ্ত কাজে আর হাত দেয়নি। রোজ গিয়ে দেখতাম, হাঁটুর ভেতর মাথাটি গুঁজে শনিচারি বসে বসে কি যেন ভাবছে। ওকে দেখে মনে হত, একটি জ্বলন্ত বনস্পতির প্রজ্বলন ক্রিয়াটা হঠাৎ থেমে গেছে। এখন তার অগ্নিদেহটা শত রেখায় ভেঙে খসে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বলতাম, আর কাজ করবে না, শনিচারি?

ম্লান হেসে ও বলত, হেরে গেছি ডাক্তার।

হার স্বীকার করলে চলবে কেন, শনিচারি। তোমার ওপর সারা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

বার বার লড়াই-এর ভেতর জয়ের কোন আশাই আমি আর দেখতে পাচ্ছি না ডাক্তার। মনে হয়, তোমার মত যদি মানুষের সেবা করে, বা অশিক্ষিত মানুষগুলিকে শিক্ষা দিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে অনেক কাজ হত। আর এতে নিজের মনেও শান্তি খুঁজে পেতাম।

কথার ভেতর লক্ষ করতাম, শনিচারি আজকাল কত শান্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু এই শান্ত পরিবেশের মাঝখানেও শনিচারির ভেতর কোথায় যেন একটা ব্যথার ছায়া আমি লক্ষ করতাম। নিজের মনের সেই গভীর যন্ত্রণাকে সে নানাভাবে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করত, কিন্তু তার থেকে সে মুক্তি পাবার কোন চেষ্টাই করত না। আমার মনে হয়েছে, বার বার ব্যর্থতা, বামিয়ার মৃত্যু, সবকিছুকেই ও মনের গোপনে লালন করবার চেষ্টা করত।

আজকাল মাঝে মাঝে ওর কাছে বসে গল্প করি। ও নিবিষ্ট হয়ে আমার গল্প শোনে। আমি আমার দেশের গল্প করি। আমার দেশের নদীর নাম, নগরীর নাম ওকে শোনাই। নগর জীবনের ছবি এঁকে যাই। এই সময়টুকু মনে হয় ও কিছুটা আনন্দ পায়। অতীতকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে ও নিজেই আলোচনায় যোগ দেয়।

আমাদের দেশের দু'চারটে নদী আর শহরের নাম ও উল্লেখ করে। এগুলো ওর বইয়ের থেকে জানা নয়, ওর বাবার মুখে ছেলেবেলায় শোনা।

আমি ওর কাছে বাইবেলের গল্প বলার চেষ্টা করেছিলাম একদিন।

ও হেসে বলল, বাইবেলের গল্প আমার মুখস্থ রয়েছে, ডাক্তার। বাবার কাছ থেকে তোমাদের ইংরাজী ভাষাটাই শুধু শিখিনি, বই পড়ার নেশাটাও পেয়েছি।

আমি অমনি বললাম, তাহলে তোমার দেশের উপকথা আমাকে শোনাও।

ও আমাকে অনেকগুলি বিচিত্র উপকথা শোনাল। কোন কোন উপকথার সঙ্গে আমাদের দেশের উপকথার আশ্চর্য মিল দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

মনে হল, সারা পৃথিবীর মানুষ জাতির মধ্যে কোথায় যেন একটা চিন্তার অবিচ্ছিন্ন মিল রয়েছে। প্রকৃতির নদ নদী, সমুদ্র পর্বত যতই ব্যবধানের সৃষ্টি করুক, সেই অদৃশ্য চিন্তাধারার মিলটুকুকে তারা নষ্ট করতে পারে না।

ইতিমধ্যে একদিন দুপুরে ডরোথি হঠাৎ হাসপাতালে হাজির।

স্বাগত জানিয়ে বললাম, কি মনে করে?

বলল, স্কেচের খাতাখানা সেদিন ফেলে গেছি এখানে। বড় অসুবিধে হচ্ছে, তাই চলে এলাম।

মনে হয়, ডরোথির খাতাখানা ফেলে যাওয়া একটা ছলনা। ও আমার সঙ্গে সবার আড়ালে কোন কিছু বলতে চায়।

হেসে বললাম, স্কেচের খাতা ফেলে না গেলে কি আসতে নেই?

ডরোথি বলল, হাসপাতালে আসার আর একটি মাত্র পথ আছে।

কি?

কোন একটা অসুখে পড়ে যাওয়া।

তাহলে অবশ্য সে পথ দিয়ে আসতে আপনাকে বারণ করব। যদিও যে কোন ভদ্রলোকের পক্ষে যে কোন ভদ্রমহিলাকে আসতে বারণ করা অভদ্রতা।

ডরোথি বলল, আমি যে আপনার এখানে আজ এসেছি, একথা দয়া করে কাউকে না জানালে খুশি হব।

কেন, বাড়িতে কাউকে বলে আসেননি বুঝি?

দিদিকে, এই আসছি বলেই চলে এসেছি।

বললাম, এ সময় একা একা পথে বের হওয়া কি ভাল?

ভালমন্দ বুঝি না, আসাটা আমার প্রয়োজনের তাগিদে।

হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। শনিচারির মনটাকে হালকা করে দেবার জন্যে আমি ছোটখাট দু'একটা কাজের ভার ওকে দিয়েছিলাম। দুপুরে রোগীদের জন্যে ফল আর দুধ ও সাজিয়ে রেখে যেত। এ সময়টা ও এসে ঢুকতো রান্নাঘরে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডরোথির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলাম, হঠাৎ দেখলাম ডরোথির মুখে ভাবান্তর উপস্থিত হল। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রান্নাঘরের দিকে।

মুহূর্তে পেছন ফিরে যা দেখলাম, তাতে সহসা আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

ডিসপেনসিং রুম থেকে বেরিয়ে শনিচারি রোজকার মত কিচেনে আসছিল। হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেছে ডরোথির।

ও কে, ডাক্তার জনসন?

মুখে হাসি টেনে বললাম, উনি যে আমার সমজাতীয় নন, তা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

ডরোথি বলল, দয়া করে এ সময় তাড়াতাড়ি আমার স্কেচের খাতাটা এনে দেবেন কি?

ডরোথি তাহলে অন্য কিছু সন্দেহ করেনি। ও নিছক কৌতূহল বশে শনিচারির একটা স্কেচ করতে চায়।

তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর ঢুকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে ওর খাতাটা এনে দিলাম।

ততক্ষণে শনিচারি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। ডরোথি স্কেচের খাতাখানা নিয়েই দৌড়ল সেখানে। এগিয়ে যেতে যেতে আমাকে ডাক দিয়ে বলল, আসুন ডাক্তার, মুখের এমন গড়ন আর পাওয়া যাবে না।

রান্নাঘরের ভেতর থেকে ডরোথি ওর হাত ধরে বাইরে টেনে আনল।

ডরোথির পেছনে থেকে আমি শনিচারিকে ইঙ্গিতে কোন কিছু বলতে বারণ করলাম।

শনিচারি বাইরে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ডরোথি কাঠের একটা টুলের ওপর বসে রেখায় রেখায় ওকে ফুটিয়ে তুলতে লাগল। স্কেচ শেষ হলে দেখলাম, শনিচারির নিখুঁত চেহারাখানা কাগজের বুকে ফুটে উঠেছে।

আঁকা শেষ হলে শনিচারি চলে যাচ্ছিল। ডরোথি জিজ্ঞেস করল, কি নাম তোমার?

ও ডরোথির দিকে রহস্যময় দু'টি চোখের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, ও আপনার কথা বুঝতে না পেরে দেখুন কেমন অবুঝের মত তাকিয়ে রয়েছে। ক'দিন আগে ও এখানে এসেছিল কাজের খোঁজে। ওকে রান্নাবান্নার কাজে বহাল করেছি।

ডরোথি বলল, এ ধরনের মুখ কিন্তু আদিবাসীদের নয়। আমি এই মুখখানা এনলার্জ করে আঁকব।

বললাম, অন্য কোন জাতের মেয়ে হবে হয়তো। ভারতবর্ষে মানুষদের মুখের চেহারা এত বিভিন্ন, দেখলে অবাক হতে হয়।

ডরোথি এবার আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথের দিকে এগিয়ে চলল। আমিও উৎসাহের সঙ্গে নানা কথার অবতারণা করে ওর মন থেকে শনিচারির ছবিটা মুছে দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

ডরোথি বলল, আমাদের বাংলোতে কবে যাচ্ছেন বলুন?

বললাম, যবে ডেকে পাঠাবেন।

তাহলে আজই চলুন।

হেসে বললাম, বেশ তাতে আমি রাজি আছি। শুধু আপনার দিদির কাছে গিয়ে বলব, আপনি আমাকে ডেকে এনেছেন।

ডরোথি এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, নিমন্ত্রণ ওখান থেকেই আসবে।

বললাম, তখন যাবার জন্য অবশ্যই তৈরি থাকব।

ডরোথি ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল। আমি দ্রুত ফিরে এলাম ডিসপেনসিং রুমে।

শনিচারি আমাকে দেখে বলল, ধরা পড়লাম এতকাল পরে, এতে অগৌরবের কিছু নেই, কি বল?

বললাম, তা হয়ত নেই, কিন্তু ধরা পড়ার দুর্লভ সৌভাগ্যটুকু তুমি এখনও অর্জন করতে পারনি।

কি রকম?

দেখলে তো, ও তোমার নামটুকু পর্যন্ত জানতে পারল না।

শনিচারি বলল, ডরোথি আবার কুমড়ির বাংলোতে গিয়ে গল্প না করে।

হেসে বললাম, সে পথ ও নিজেই বন্ধ করে এসেছে।

কৌতূহলী হয়ে উঠল শনিচারি।

কি রকম?

বললাম, আমার এখানে আসাটা ও গোপন রেখেছে।

হাসি আর থামতে চায় না শনিচারির। এতদিন পরে ওর মুখে প্রাণ খোলা হাসি শুনতে পেলাম।

বলল, তাহলে এই হাসপাতালটা সবার গোপনীয় স্থান, কি বল ডাক্তার।

হেসে বললাম, আর আমি সেই গোপন জায়গার মালিকানা ভোগ করি, তাই না?

কিছুক্ষণ থেমে কি ভাবল শনিচারি। তারপর বলল, তোমার ভেতর কেমন একটা আকর্ষণ শক্তি আছে, ডাক্তার। সবাই দেখি তোমাকে খুব ভালবাসে।

বললাম, শুধু একজন ছাড়া।

কি করে তুমি বুঝলে?

তাকে আমি জানি বলে।

শনিচারি অমনি বলল, আমি তাকে তোমাব চেয়ে কিছু কম জানি না ডাক্তার।

এরপর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ!

এক সময় শনিচারি বলল, ডরোথি খুব ভাল ছবি আঁকে, তাই না?

হঠাৎ কথার মোড় ফিরল। আমি একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

ও আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখেছে। খুব নিখুঁত ওর হাতের কাজ।

কথা শুনতে শুনতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল শনিচারি।

বলল, আমি যদি ছবি আঁকা শিখতাম, তাহলে আমার দেশের এই পাহাড়, শালের বনের কত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে পারতাম।

বললাম, কত মানুষ মনে মনে তোমার ছবি আঁকছে। তুমি আবার কার ছবি আঁকবে!

শনিচারি হঠাৎ বলল, আমি আমার বামিয়ার ছবি এঁকে রাখতাম। কেন আর্টিস্ট হলাম না, ডাক্তার।

আবার সেই পুরনো কথায় ও ফিরে এসেছে। এখুনি গভীর এক যন্ত্রণার ভেতর তলিয়ে যাবে ওর এই প্রসন্ন মনটা।

তাই তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে ফেললাম, ডরোথির ছবি দেখলে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে, শনিচারি।

ও আমার মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল।

তুমি ডরোথিকে খুব ভালবাস, তাই না ডাক্তার।

এ কথা কেন?

তার ছবি তোমার খুব ভাল লাগে।

যে গুণী, তার ওপর সকলেরই আকর্ষণ থাকে।

ও কি ভেবে বলল, আমি যদি গুণী হতে পারতাম।

বললাম, ফুল তার নিজের গন্ধ সম্বন্ধে কিছু জানে না বলেই কি ফুলের কোন গন্ধ নেই?

তাহলে তোমাদের সরকারী লোকেরা কেন আমাকে একটুও পছন্দ করে না।

গুণীরাই গুণীর আদর বোঝে। সরকারী লোক না বুঝলে কিছু এসে যায় না।

তুমি খুব ভাল, ডাক্তার। তোমার মত গুণী আমি দেখিনি।

শনিচারির মধ্যে আমি যেন অন্য কোন এক জীবনের স্পন্দন অনুভব করলাম। নিজের বিরাট শক্তির কথা ভুলে সামান্য ডরোথির মত মেয়ে হতে পারলে ও যেন সুখী হয়। আমি

ডরোথিকে ভাল বলেছি, তাই শনিচারির গোপন মনে হয়ত একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা উঁকি দিচ্ছে। ও জীবনের যে দিক সম্বন্ধে এতকাল সচেতন ছিল না, আজ ধীরে ধীরে সেই দিকের একটি দরজা মনে হল খুলে যাচ্ছে। শনিচারির মনে এক চিরন্তনী নারীকে আমি যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে দেখলাম।

১১ এপ্রিল ঃ

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। তখনও প্রকৃতির অগ্নিলীলা শুরু হয়নি। বসন্ত শালের বনে অজস্র ফুল ফোটানোর খেলায় মেতে আছে, পাখীরা ডালে ডালে ফলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছে। আদিবাসীদের গাঁয়ে গাঁয়ে মাদলের বোল বাজছে। বাহা পরবের স্রোত বইছে গানের সুরে। আগুন লাগল। সরকারের অশ্বারোহী পুলিশবাহিনী বনের অন্ধিসন্ধি খুঁজে পেতে আদিবাসীদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিতে লাগল।

হাহাকার উঠল চারদিকে। অসহায় মানুষগুলো পশুর মতো খোলা জায়গায় বনের ভেতর আশ্রয়হীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। আকাশ পথে পাখীরা সারান্দা ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গেল অন্য কোন আশ্রয়ের সন্ধানে।

হাডসনের এ পরিকল্পনা সরকারকে অনেকদিনের একটা জটিল সমস্যার হাত থেকে মুক্তি দিল। শুনতে পেলাম, বনের মানুষগুলো দলে দলে সরকারী শিবিরে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা কথা দিচ্ছে, আর কোনওদিন সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। সরকারকে তারা সাহায্য করবে মানুষ দিয়ে, শ্রম দিয়ে আর সাধ্যমত কর দিয়ে।

কথাগুলো আমার কানে এলো। শনিচারি পাছে দুঃখ পায় সেজন্য তাকে আর কোন কথা বললাম না।

যখন দূরে কোথাও আগুন লাগতো, তখন ও বারান্দায় বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত সেদিকে।

আমি পাশে বসে থাকতাম।

এমনি বসে থাকতে থাকতে একদিন শনিচারি বলল, জান ডাক্তার, এ আমার পাপের ফল।

এ কথা কেন বলছ, শনিচারি?

অনেক ভেবে দেখেছি, যাদের রক্ষা করার ক্ষমতা নেই, তাদের শুধু ধ্বংসের ভেতর ঠেলে দেবার কোনো অধিকারও নেই। আমি ওদের দুর্ভিক্ষের সময় খেতে দিতে পারিনি, তাই শুধু উত্তেজনার সৃষ্টি করলে কোন ফলই ফলবে না। অসহায় মানুষগুলো আরও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

বললাম, তুমি যা করেছ, দেশকে ভালবেসেই করেছ। তোমার দেশের মানুষকে সত্যিকারের মানুষের মত বাঁচাতেই তুমি চেয়েছিলে। সেখানে কোন খাদ নেই তোমার চিন্তায়। তবে আজ যাকে পরাজয় বলে মনে করছ, একদিন হয়ত দেখবে, সেই পথেই তোমার জয় আসছে।

শনিচারি নির্বাক বসে তাকিয়ে রইল দূরের আকাশের দিকে, সেখানে সূর্যাস্তের রঙ আগুনের রঙের সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে।

সেদিন সন্ধ্যা নামল। জ্যোৎস্নার ঢেউ আকাশ ছাপিয়ে উপচে পড়ল বনভূমির ওপর। কত শান্ত আর স্নিগ্ধ সে স্পর্শ। মনে হল, আর্ত সন্তানের গায়ে মায়ের কোমল হাতের সান্ত্বনা।

আমরা পৃথিবীর এই বিচিত্র রূপের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলাম। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ বলেই মনে হল।

শনিচারি তাড়াতাড়ি উঠে পাশের ঘরে আত্মগোপন করল।

দেখলাম, ঘোড়ার চড়ে হাসপাতালের দিকে কে যেন আসছে।

কাছে আসতেই দেখলাম রেবেকা। এগিয়ে গেলাম।

কি ব্যাপার, আপনি এ সময়, একা!

রেবেকা ঘোড়া থেকে নেমে হাঁপাতে লাগল।

সময় নেই ডাক্তার জনসন। জীবনে অনেক উপকার করেছেন আপনি, তাই যদি আপনার কোন উপকার হয় সে জন্যে দৌড়ে এলাম।

বললাম, হাঁপাচ্ছেন আপনি, বসুন এখানে।

রেবেকা বসলেন না। বললেন, এখুনি ফিরে না গেলে সবাই আমাকে সন্দেহ করবে। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।

তাকিয়ে রইলাম রেবেকার দিকে।

রেবেকা বললেন, সেই আদিবাসী মেয়েটি নাকি আপনার আশ্রয়েই রয়েছে। ডরোথির আঁকা একখানা ছবি দেখে ক্যাপ্টেন স্মিথ তাকে চিনতে পারেন। তিনি নাকি তাকে ছাতমবুরুর লড়াইয়ের সময় দেখেছেন! তারপর ডরোথিকে ওরা জিজ্ঞেস করে সব কথা জেনে নিয়েছে। আজ শেষ রাতে পুলিশের লোকেরা আপনার হাসপাতাল ঘেরাও করবে। সাবধানে থাকবেন ডাক্তার জনসন।

রেবেকা কথা ক'টি বলেই ঘোড়ায় চড়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বসে বসে আমি শুধু ভাবতে লাগলাম। গোপনতা কেন; আজ যদি ওরা আসে তাহলে শনিচারিকে নিয়েই বের হব ওদের সামনে। যদি কোন সেবা করে থাকি সরকারের, তাহলে তার পুরস্কার স্বরূপ চেয়ে নেব এই অরণ্য কন্যাটিকে। ওকে নিয়ে আমার দেশে চলে যেতে চাইলে আশা করি ইংরাজ সরকার বাধা দেবে না। তাহলে এই সারান্দার মানুষগুলোকে ক্ষেপিয়ে তোলার যে ভয়, তা আর থাকবে না সরকারের।

শনিচারিকে কিছু বললাম না। রেবেকা আর আমার কথাগুলো বোধ করি শোনেনি শনিচারি। তাহলে গভীর চিন্তায় ডুবে আছি দেখেও এমন সহজ মুখ-ভাব নিয়ে ও আমার সামনে এসে দাঁড়াতে পারত না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

শনিচারি অত্যন্ত শান্তভাবে বলল, আমাকে আজ একটি অনুমতি দিতে হবে ডাক্তার; আর কোনও দিন এমন করে তোমার কাছে চাইব না।

কিসের অনুমতি?

আগে কথা দাও আমার ইচ্ছা পূর্ণ করবে?

কথা দিলাম।

এই জ্যোৎস্না রাতে বনে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে বড় ইচ্ছে করছে। চল আমরা দু'জনে একটু ঘুরে আসি।

একটু ভেবে বললাম, ঘোড়া মাত্র একটি, দু'জনে যাব কি করে?

আমার ঘোড়া সন্ধে হলেই হাসপাতালের পেছনের পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তুমি তৈরি হয়ে এসো, আমি ওদিক দিয়ে পথে বেরিয়ে যাচ্ছি।

আমি পোশাক পরে বেরিয়ে এলাম ঘোড়া নিয়ে। পথের বাঁকে পৌছে দেখি শনিচারি তার ঘোড়ায় চেপে অপেক্ষা করছে।

ওর মুখোমুখি হয়েই গম্ভীর গলায় বললাম, পথ হারিয়ে এ অঞ্চলে এসে পড়েছ বুঝি। এ জায়গাটা আদিবাসীদের নেত্রীর পক্ষে খুব নিরাপদ নয়।

আমার কথা বলার ভঙ্গি দেখে ও হেসে ফেলল!

তুমি আমার কথার শোধ নিচ্ছ ডাক্তার জনসন?

বললাম, মনে আছে শনিচারি, ছোটনাগরার পাহাড়ের বাঁকে যেদিন আমাদের প্রথম দেখা হয়, সেদিন তুমি আমাকে এমনি একটা কথা বলেছিলে।

সেখানেও এমনি পাহাড়ের বাঁকে আমরা ঘোড়ায় চড়ে মুখোমুখি হয়েছিলাম।

বললাম, সেদিন তুমি আমাকে বর্ষার আগেই নদী পার করে দিয়ে গেলে। আমরা বিদায় নেবার ঠিক পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি সারাপথ আসতে আসতে কেবল ভেবেছি, নদীতে বান আসার আগেই তুমি পেরিয়ে যেতে পেরেছ কিনা।

শনিচারি বলল, আজও কিন্তু তোমার সেকথা জানা হয়নি।

বললাম, তোমাকে সশরীরে হাসপাতালের ভেতর পেয়ে আর সব কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

পাশাপাশি পথ চলতে চলতে ও বলল, প্রায় সারাটি রাত আমাকে সেদিন কাটাতে হয়েছে নদীর এপারে।

আমি খুবই লজ্জিত শনিচারি।

ও হেসে বলল, এই সামান্য কারণে এতদিন পরে তুমি যদি লজ্জা পাও তাহলে তোমার কাছে আমার লজ্জার যে সীমা থাকে না।

আমরা একটি ঝর্ণার ধারে এসে পৌছলাম। এখন ঝর্ণাটি ক্ষীণাঙ্গী, তবু নুড়ির নূপুর বাজিয়ে সে উপত্যকার দিকে ছুটে চলেছে।

শনিচারি সেখানে দাঁড়াল। আমিও তার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

কতক্ষণ সে ঝর্ণাটির দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় বলল, জান ডাক্তার, এই ঝর্ণার ধারে একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটা আজও আমার কাছে বড় রহস্যজনক হয়ে আছে।

ঘটনাটি শোনার জন্যে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

শনিচারি বলতে লাগল, বেশ কয়েক বছর আগে আমরা একবার এই পথ দিয়ে ছোটনাগরার দিকে যাচ্ছিলাম। তখনও বেলা ছিল। আমরা এই ঝর্ণাটার প্রায় কাছাকাছি এসে একটা চিৎকার শুনতে পেলাম।

কাছে এসে দেখি, ঝর্ণার জল খেতে এসে হরিণ বাঘের কবলে পড়েছে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল এই যে, ভয়ে হরিণটা একটা বাচ্চা প্রসব করে ফেলেছে। আসন্ন প্রসবা ছিল সে। আমরা হৈ চৈ করায় বাঘটা সরে গেল বনের ভেতর। আমি বাচ্চাটাকে তুলে নিলাম কোলে। হরিণটা তখুনি মারা গেল। বাচ্চাটা নিলাম, কিন্তু তাকে লালন-পালন করা এক সমস্যা। যাহোক অনেক চেষ্টায় বাচ্চাটা বড় হল। দেখতে দেখতে সে বিরাট আকার ধরল। শিং জোড়া হল তার দেখবার মত। ওকে ছেড়ে দিতাম, সারাদিন ঘুরে ফিরে ও আবার ঠিক ফিরে আসতো আমার ঘরে।

একদিন চরতে গিয়ে ও আর ফিরে এলো না। পরের দিন চারদিকে লোক পাঠালাম ওর খোঁজে।

এক রহস্যময় খবর পাওয়া গেল। এই ঝর্ণার ধারে আমার হরিণটি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, আর তার ধারাল শিংয়ের ভেতর বিঁধে আছে একটা চিতা বাঘ। বাঘটাও মারা গেছে।

আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবতে লাগলাম, আমার আস্তানার কাছেপিঠে এত ঝর্ণা থাকতে হরিণটা এত দূরেই বা এল কেন!

এ রহস্যের সমাধান আজও পাইনি।

কথাটা শুনে আমিও বিস্মিত হলাম। হরিণটা কি তার মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিল।

আমরা ঝর্ণটা পেরিয়ে এলাম।

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা। ওপরে বন, নিচে উপত্যকার কোথাও কোথাও বন; আবার কোথাও লোক বসতি। আমরা বনের পথ পার হয়ে চললাম।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল শনিচারি। পাহাড়ের ওপর থেকে একটা সণ্টলিক্ নিচে ভ্যালির দিকে নেমে গেছে। ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খুব সাবধানে আমার পেছন পেছন নেমে এসো।

আমি ওকে অনুসরণ করে নিচে নামতে লাগলাম। আমরা খুব ধীরে ধীরেই নামলাম। ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে মাঝে মাঝে নুড়ি পাথর ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়তে লাগল। নামতে নামতে শনিচারি আমাকে বারবার হুঁশিয়ার করে দিল।

এক সময় আমরা নেমে এলাম পাহাড়ের ওপর থেকে নিচের উপত্যকায়। কিছু পথ বনের ভেতর দিয়ে চলার পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। মনে হল এ স্থানটা একটা আদিবাসী গ্রাম ছিল।

শনিচারি বলল, এ গ্রামখানা সরকার আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে। দেখছ না, ভাঙা দেওয়াল, কালো কালো পোড়া চিহ্ন।

বললাম, এই নির্জন কবর ভূমিতে হঠাৎ এলে কেন? এখানে তো কোন মানুষ আছে বলে মনে হয় না।

ও কতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, দেবতা জেগে আছেন ডাক্তার, আর রয়েছে মৃত মানুষের আত্মা।

কতক্ষণ এদিকে ওদিক ও যেন কি খুঁজতে লাগল। এক সময় আমরা গাঁয়ের প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। এখানে পোড়া জিনিসের আর কোনও চিহ্ন নেই। এক জায়গায় কতকগুলো গাছ জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। শনিচারি সেখানে এসে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল। ঐ গাছগুলোর নিচে অজস্র পাথর ঠিক বেদির মত করে বাঁধান রয়েছে।

ও তারই তলায় প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে পড়ল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। অর্ধ উচ্চারিত একটা সুরেলা ধ্বনি মাঝে মাঝে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

একসময় ওর প্রার্থনা শেষ হল। ধীরে ধীরে উঠে এল বেদির কাছ থেকে। জ্যোৎস্নালোকে আমি দেখলাম, ওর মুখ বেদনায় থম থম করছে; কিন্তু একটি বিশেষ দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে ওর মুখে।

ও ঘোড়ায় উঠল। আবার আমরা ফিরে চললাম।

একসময় ও বলল, জান ডাক্তার, যে বেদির কাছে বসে আমি এতক্ষণ প্রার্থনা করলাম, ওখানে আমার বামিয়া রাতে এসে ঘুমিয়ে থাকত। কোন আশ্রয় ছিল না আমার বামিয়ার। বন দেবতা 'জায়েরা' তাকে রাতের আশ্রয় দিত। ওর আত্মার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে গেলাম।

আমরা সবাই সেই সন্টলিক ধরে পাহাড়ের ওপর উঠে এলাম।

শনিচারি বলল, ঐ যে দূরে পাশাপাশি দুটো পাহাড় দেখছ, ওর তলায় যে উপত্যকা, সেটি আমার জন্মস্থান। আমার কত দিনের খেলার আশ্রয়। সব ফেলে এসেছি ডাক্তার। ঘোড়া থেকে নেমে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। একসময় বলল, জান ডাক্তার, এই সময়ে সারা বন জুড়ে চলত বাহা পরব। এই বনভূমির প্রতিটি গ্রাম থেকে বাহা পরবের দল আমাদের ঐ ছোটনগরায় গিয়ে ভীড় জমাত। মেয়ে পুরুষের নাচ গান আর উৎসব আনন্দে ক'দিন ছোটনাগরার আকাশ বাতাস, বন পাহাড় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হত।

ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। যেন কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, হাজার হাজার মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। ভেসে আসছে, শত শত অরণ্য কন্যার কণ্ঠের বিচিত্র সুরধ্বনি।

শনিচারিও তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। গুন গুন করে তার সুরেলা গলা তুলতে লাগল বিচিত্র সুরের ঢেউ।

আমি ঘোড়া থেকে নামলাম। শনিচারি আমাকে লক্ষ করল না। সে আপন মনে সেই জ্যোৎস্না ধোয়া আকাশের নিচে অরণ্যবাসরে তার অতীত দিনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে চলল।

আমি মুগ্ধ হয়ে রাজকুমারী শনিচারিকে দেখতে লাগলাম।

একসময় পাহাড়ের কাছে গিয়ে লতাগুল্মের থেকে কিছু ফুল সংগ্রহ করে আনলাম।

আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম শনিচারির কাছে। ও তখনও নিজের ভেতর মগ্ন হয়েছিল। কাছে গিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। কেমন মোহাচ্ছন্ন চাহনি মেলে ও আমার দিকে তাকাল। এ দেশের মেয়েরা যেমন করে খোঁপায় ফুল গোঁজে, আমি তেমনি করে ওর খোঁপায় একরাশ ফুল পরিয়ে দিলাম। ও কেমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ওর হাত ধরলাম। দু'জনে একবার তাকালাম ছোটনাগরার সেই ধূমল পাহাড়ের দিকে।

একসময় ফিরে এলাম আমাদের পরিচিত জগতে। থলকোবাদের হাসপাতালে যখন এসে পৌঁছলাম তখন চাঁদ অস্ত গেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এসেছে।

আমরা রাতে খেতে বসলাম একই সঙ্গে। ও আমাকে পরিবেশন করতে লাগল। ওর চোখেমুখে আজ যেন কিসের তৃপ্তি উপচে পড়ছে।

আমিও মনে মনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

বিছানায় যাবার সময় ও আজ এল আমার কাছে।

বলল, তুমিও শোও ডাক্তার, আমি আজ তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ও বসে বসে আমার চুল নিয়ে খেলা করতে লাগল। কি যাদু ওর হাতের, আমি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল একটা ভারী জিনিস ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ার শব্দে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। ল্যাম্প জ্বেলে ঢুকলাম শনিচারির ঘরে। ঘর শূন্য। বেরিয়ে

এলাম পথের ওপর, অন্ধকার তখনও জমে আছে। আলো নিয়ে খুঁজতে লাগলাম। ঐ তো, শনিচারি পড়ে আছে পথের ওপর! রক্তে ভেসে যাচ্ছে পথ। হাসপাতালের পেছনে খাড়াই পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে।

তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে কোলে তুলে নিলাম ওর দেহটা। পরীক্ষা করলাম, শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

শ-নি-চা-রি.........

থরথর করে আমি কাঁপতে লাগলাম।

অতি ক্ষীণ আহত গলায় ও বলল, আমি মরতে চাইনি ডাক্তার।

তবে কেন এমন করলে!

তোমাকে খু-উ-ব ভালবাসি, তাই।

এ বনের থেকে তোমাকে মুক্ত করে আমার দেশে নিয়ে যাব মনে করেছিলাম শনিচারি।

তোমার দেশে! অস্পষ্ট যন্ত্রণার কাতরোক্তি করল ও।

হ্যাঁ শনিচারি, আমার দেশে। সেখানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতাম। বীরাঙ্গনার যোগ্য মর্যাদা।

যন্ত্রণার ভেতরেও একটা করুণ হাসি ফুটে উঠল শনিচারির মুখে। ওর একেবারে কাছে আমার মুখটা নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল ও।

কাছে গেলাম। ও ধীরে ধীরে বলল, আজ এই শেষ মুহূর্তে তোমাকে গ্রহণ করলাম ডাক্তার। পঙ্গু হয়ে, তোমার বিপদের কারণ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারলাম না। কথা দাও, আমার দেশের মানুষকে আমার মতই তুমি ভালবাসবে। কোনওদিন তাদের ছেড়ে যাবে না।

ওর হাতখানা আমার দুটি হাতের মধ্যে তুলে নিলাম।

ও নীরব হয়ে গেল।

অন্ধকার সরে গিয়ে পাহাড়ের আড়ালে আবির্ভাব হচ্ছে জ্যোতির্ময় আলোর। আমি নতজানু হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

আপনি ডাক্তার জনসনের ডায়ারি পড়া শেষ করে যখন উঠে দাঁড়াবেন, তখন সেই বৃদ্ধ পাদ্রীটি আপনার সামনে এসে, ঐ বেদি বাঁধানো আদিংয়ের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তারপর আপনার হাত থেকে ঐ ডায়ারিখানা নিয়ে মৃদু হাসি হাসতে হাসতে ঢুকে যাবেন চার্চের ভেতর।

ফিরে আসতে আসতে আপনার মনে হবে, ইনিই কি ডাক্তার জনসন! আমারও তাই মনে হয়েছিল।

●